সূচীপত্র।

বিষয়।

আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে উক্ত দুই উপায় ভিন্ন অন্য উপায় আছে কি না বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ভারটা কাহার স্কন্ধে রক্ষা করা উচিত। যদি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইত, অথবা কোন তর্কগ্রাহ্য বাক্যমাত্র হইত, তাহা হইলে এইরূপ প্রমাণের ভার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনাই আবশ্যক হইত না। ইন্দ্রিয়গোচর কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিলেও আমরা তাহাকে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব করাইতে সক্ষম হইতাম; তর্কগ্রাহ্য বাক্যমাত্র হইলে, আমরা তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করিয়া প্রতিবাদীকে সেই বাক্যে উপনীত করাইতাম। ঈশ্বর ও আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুও নহে এবং তর্কগ্রাহ্য বাক্যও নহে; ঈশ্বর ও আত্মা আত্ম[illegible] নিকটে স্বপ্রকাশ। ইতিহাসে ইহাও দেখিতে পাই যে, আত্মতত্ত্বের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে কত জাতির উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে। যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপর এত গুরুতর ফল নির্ভর করিতেছে, সেই আত্মতত্ত্ব আত্মবাদীগণ অনুভব করিলেও, কঠোর তর্কের দ্বারা বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলেই যদি অজ্ঞেয়বাদীদিগের মতে ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে প্রমাণের ভারগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা অনাবশ্যক মনে করি না; কারণ, যদি দেখি যে, আত্মবাদীদিগের উপর প্রমাণের ভার থাকা উচিত নহে, তবে যতক্ষণ অজ্ঞেয়-বাদীগণ ঈশ্বরের ও আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত গণ্য হইবে না।

আত্মবাদীগণ বলেন যে, তাঁহাদের আত্মতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি আছে এবং যতদি[illegible] অজ্ঞেয়বাদীগণ ঈশ্বর ও আত্মার অনস্তিত্ব স্পষ্ট প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের আত্ম-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। অ[illegible]দীদিগকে এই কথা বলিবার আত্মবাদীদিগের যথেষ্ট অধিকার আছে। আত্মবাদ কোনও নূতন মত নহে। ইহা মানবজাতির অতি পুরাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাস। মানবের যে অবস্থার বিবরণ উদঘাটন করিতে ইতিহাস অক্ষম, সে অবস্থাতেও এই আত্মবাদই মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল। এই আত্মবাদ ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ নহে এবং কালবিশেষেও বদ্ধ নহে। এই সুবিশাল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘুরিয়া আইস, দেখিবে যে, কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতিরই এই আত্মবাদে দৃঢ়বিশ্বাস। আত্মবাদের স্বপক্ষে যখন সমগ্র মানবজাতি একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তখন অজ্ঞেয়বাদীগণ সহসা আত্মবাদকেও ভ্রান্ত বলিতে পারেন না এবং বিরুদ্ধে যথেষ্ঠ প্রমাণ না দর্শাইয়া আত্মবাদীদিগকেও স্বমত সমর্থন করিবার জন্য সগর্ব্বে অহ্বান করিতে পারেন না। আত্মবাদীগণ বলিবেন "সমগ্র মানবজাতিই আমাদিগের মত ও বিশ্বাসের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষী; যদি কেহ ইহা অসত্য মনে করেন, তবে তিনিই ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করুন।" সম্মুখের উপবনে একটী আম্রবৃক্ষ আছে। আমার পিতৃপুরুষগণ সেই আম্রবৃক্ষ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন ও তাহার ফলভোগ করিয়াছেন; আবার আমরা সেই আমগাছ দেখিতেছি, দেখাইতেছি, তাহার ফল-

অনুরাগ।

রাঙা চরণের পাশে বসে বসে শুধু—
ফেলিব শ্বাস। আমি আঁখি জল,
আমার দুখভরা ওই সুখের গোধূলি
ঢেকে যাবে আঁখি ছল ছল।
আমি উষার পাশেতে নিশার মতন
রব মরণের পথে বসিয়া,
তুমি উষার মতন রবে আমি পরে,
একবার চেও হাসিয়া।
কত দিন হতে নয়নের জলে
ফুটায়ে বনের ফুল,
নিকুঞ্জ দুয়ারে গাঁথি থরে থরে
দুলায়ে দিতেছি ভুল।
আমি এ জগৎ কভু ছাড়িতে নারিব
তুমি জেগে রবে এখানে,

আমি শিশির হইয়ে শিশির ছায়াতে,
কাঁদে রব এই কাননে
যবে শাখাটি দুলায়ে ফুলটী তুলিতে,
দেখিবে গহনে চাহিয়া,
তোমার গোলাপি মুখে, এলোথেলো বুকে,
সব ঢেকে যাব ছাইয়া।
যবে কুসুম চয়নে ফিরি বনে বনে
যাবে আনমনে চুমিয়ে,
আমি শিশির নূপুর হইয়ে তখনি
ধরিব চরণে জড়ায়ে।
তুমি মুছে ফেলে দিও, ভুলে ফেলে দিও,
যবে রবি করে আগিয়া;
দেখো রাঙা চরণের রাঙা রাগ টুকু
গেছে শিশিরের মত উড়িয়া।

অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়-বাদ।

২। আত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার প্রণালী।

অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, আত্মবাদীগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আত্মায় বিশ্বাস করেন ও পরকালে বিশ্বাস করেন এবং অজ্ঞেয়বাদীগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, আত্মায় বিশ্বাস করেন না ও পরকালে বিশ্বাস করেন না। অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মবাদীদিগকে উপহাস করেন যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি তাঁহাদিগের স্বকপোল-কল্পিত বাক্য মাত্র—উহাদিগের কোন বাস্তব সত্তা নাই। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কোন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বর বা আত্মাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারেন নাই এবং কঠোর প্রামাণিক তর্ক দ্বারাও আত্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্বে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহাদের কথার ভাবে বোধ হয় যে, তাঁহাদিগের মতে উক্ত দুই উপায় ভিন্ন আত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার অন্য উপায় নাই। অন্য উপায় যদি থাকে, তবে তাহার এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ভার তাঁহারা আত্মবাদীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী ও তদুপরিস্থিত পঞ্চভূতাত্মক প্রাণীপুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চভূত সমুদয় পৃথ্বীদেশের পুঞ্জীকৃত ভূতরাশি হইতে বিকীর্ণ হইয়া যে অনন্ত দেশের কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে কে বলিতে পারে! এবং সেই সীমার পর যে এই সমুদয় ভূত আবার কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই বা কে বলিতে পারে! এই পঞ্চভূত সমুদয় তন্মাত্রে পরিণত হইয়া অনন্ত দেশের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে। মিলাইয়া আবার কি প্রকার তন্মাত্রে পরিণত হইয়া কোন লোকে সেই সমস্ত ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেবল অনন্তদেবই জানেন। এই সমস্ত লোকমণ্ডলে দেবতারা আবার কি প্রকার তন্মাত্রে গঠিত, তাহাই বা কে জানে! সে যাহা হউক, অনন্তদেশ যাহা দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, এই ভূমণ্ডল যখন তাহার কণামাত্র সেই কণায় যে ভূমণ্ডলস্থ প্রাণীপুঞ্জ যে অনন্তদেশের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। নিজে ভূমণ্ডলই যখন অনন্তের কণামাত্র, ভূমণ্ডলের প্রাণীপুঞ্জ আবার যখন সেই ভূমণ্ডলের কণামাত্র, তখন অবশ্য বলিতে হইবে সেই প্রাণীপুঞ্জ অনন্তদেশের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম কণা। আবার সমগ্র মানবকুল কি ভূমণ্ডলস্থ প্রাণীপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র অংশ নহে? মানবজাতি যখন ভূমণ্ডলস্থ প্রাণীপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র কণা, তখন কি আর পরিমাণ হয় সেই মানবকুল অনন্তের কত ক্ষুদ্রতম কণার কণামাত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় এ কণার পরিমাণ হয় না। যাহার পরিমাণ হয় না তাহা যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক অঙ্গে মিলিয়া থাকিবে তাহাতে আর সংশয় কি! সমগ্র মানবকুলের আমি কত কোটি অংশ? আমার দেহস্থিত একটি পরমাণু আমার বিশালদেহের যত অংশ, আমি সমস্ত মানবজাতির হয়ত তত অংশ হইবার সম্ভাবনা। সেস্থলে আমি অনন্তদেশের কোথায়! যখন সমগ্র মানবজাতি অনন্তের কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার স্থান যে অনুমানেও পরিমাণ হয় না! আমি কেবল বলিতে পারি আমি অনন্তের কোথায়! আমার প্রতিধ্বনি অমনি বলে, আমি অনন্তের কোথায়! বাস্তবিক অনন্তের মধ্যে যে আমি কোথায় লীন হইয়া আছি কল্পনায়ও তাহার ধারণা হয় না! অনন্ত হইতে সম্ভূত আমি অনন্তধামের যাত্রী এবং অনন্তে আমি লীন হইয়া যাইব। তবে আমি একবার রামপ্রসাদের সঙ্গে যাই :—

"বলদেখি ভাই কি হয় ম'লে?"
"ও তুই যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে
যেমন জলবিম্ব মিলায় জলে।"

কণে, অস্থিতে অস্থিরূপে প্রবাহিত করিতেছে। বায়ু আপনি যেমন দেহের সমস্ত আকাশদেশ পরিপূর্ণ করিতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনার ও বাহ্য রস লইয়া শরীরের সকল পরমাণু সিক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা যে সমস্ত পানীয় গ্রহণ করি তাহাও পরিপাক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরীরের সমস্ত রস কোন্ উপায়ে আহৃত হয়? সেই রস কি বাহ্য জগতের বায়ু সঞ্চারিত রস নহে? যে রস অনন্ত জগতে বায়ুর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট ও সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই রস আমাদের শরীরেও অনুবিদ্ধ হইয়া জগতের রসের সহিত শরীরকে রসসিক্ত করিয়া অনন্তের রসের সহিত শারীরিক পরমাণু পুঞ্জকে রসপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। শরীরের জল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ ও শোণিত শুদ্ধ যে পানীয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে এমত নহে, অনন্ত আকাশের রসেও তাহা পরিবর্দ্ধিত ও প্রশমিত হইতেছে। শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সমুদয় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল বায়ু ও অগ্নি নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে এমত নহে, মনুষ্যদেহকে অনন্ত দেশের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

জল, বায়ু, অগ্নি ও ব্যোম এই চতুর্ভূত দ্বারা মানবদেহ যেমন অনন্তের সহিত একাধার হইয়া আছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম ভূত ক্ষিতির কথা। যদি আমাদের পৃথ্বীতল অনন্তের অংশমাত্র হয়, যদি পৃথিবী দেশ বাহির আকাশময় হয়, যদি সমস্ত আকাশময় ভূমণ্ডল বায়ুরাশি পরিপূর্ণ হয়, যদি ভূগাত্র সর্ব্ব পদের ব্যাপী হয়, যদি অধি ক্ষিতিতলের স্তরে স্তরে সংলিপ্ত ও বিলীন থাকে, তবে এই কঠিন মেদিনীমণ্ডল তাহার কাঠিন্য সত্ত্বেও সহিত অনন্ত দেশে মিশাইয়া রহিয়াছে না কি? এবং আমাদের দেহযষ্টি যে সেই পৃথ্বীদেশের অংশমাত্র তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি এই দেহ ক্ষিতিরই অংশ হয়, এবং ক্ষিতি যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হয়, তবে আমাদের শরীর যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অংশ নয়, কে বলিতে পারে? আর ভূমণ্ডল যদি ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক হয়, যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভূমণ্ডলকে এক অঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে এই মনুষ্য দেহরূপ ভূমণ্ডলের অংশও অনন্ত দেশের সহিত মিশাইয়া আছে। ভূমণ্ডলে পঞ্চভূত ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। মানব দেহ যেমন ইন্দ্রিয়াত্মক পঞ্চভূতের ঘনীভূত মূর্ত্তি, ভূমণ্ডল সেইরূপ অনন্ত দেশের এক ঘনীভূত মূর্ত্তি। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রাজ্যে ও অনন্ত আকাশে যে এইরূপ কত কোটি কোটি ঘনীভূত মূর্ত্তি আছে কে বলিতে পারে। যেমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইয়ত্তা নাই, তেমনি গগণদেশের জ্যোতিষ্ক, এবং গ্রহ, নক্ষত্র রাশিরও ইয়ত্তা নাই। অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে এই সমস্ত ঘনীভূত মূর্ত্তি স্থাপিত ও ভ্রাম্যমান হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য দেহ এবং এই রসাতলের প্রাণিপুঞ্জ সেই অনন্ত দেশের নগণ্যপ্রায় অংশমাত্র। অনন্ত দেশের যে অংশ পৃথ্বীতলের নিকটবর্ত্তী, সেই অংশে যে জলাগ্নি সমুদয় স্থাপিত বা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই ঘনীভূত হইয়া

রসও আমাদিগকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। বাহ্যজগৎ অগ্নি ও তেজোময়, আমাদিগের শরীর অগ্নিময়। অগ্নি আমাদের সমুদয় দেহকে জীবিত ও উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের অগ্নি আমাদিগের গাত্রকে শীতল ও উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। যে অগ্নি বাহিরে বর্ত্তমান, সেই অগ্নিই দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। কেবল স্থানবিশেষে অবান্তর কারণবশতঃ তাহার আধিক্য ও অনাধিক্য ঘটিতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস এই অগ্নিকে জ্বালিতেছে ও উহার উষ্ণতা বাহিরে আনিতেছে। বাহিরের উত্তাপ গাত্র দিয়া দেহ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। প্রবিষ্ট হইয়া দেহাগ্নিকে রক্ষা করিতেছে। দেহের তাপ আবার গাত্র দিয়া বাহিরের সহিত মিশিতেছে। মহাভারত বলিতেছেন "অগ্নি প্রাণিগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।" "অগ্নি শরীর মধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে।" "জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে সমুদয় শিরা দ্বারা সমুদয় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে।" *

বায়ু কেমন দেহাগ্নিকে শরীরের সর্ব্বত্রে লইয়া যায় তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহিরের অনন্ত দেশে যে অগ্নি কোথাও লীনাবস্থায় কোথাও স্ফূরিতাবস্থায় রহিয়াছে, শরীর মধ্যেও সেই অগ্নি তদ্রূপ রহিয়াছে। বাহ্যজগতের প্রভাবে তাহা কখন উদ্দীপ্ত কখন বা ঈষৎ আবির্ভূত হইতেছে। দেহের প্রতি পরমাণুতে অগ্নি সমাশ্রিত। সেই লীন অগ্নি কভু উদ্দৃক্ত কভু বা আবার বিলীন হইতেছে। জীব অগ্নিময় হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রতিক্ষণে যে সৃষ্টিকাণ্ড চলিতেছে, যাহা দ্বারা অন্ন ও রসের পরিপাক হইয়া তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে, সেই সৃষ্টিব্যাপার অগ্নি ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টি অগ্নিময় ব্রহ্মা অগ্নিময়। চতুর্ব্বিধ অগ্নি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডময় ও অনন্তদেশে বিস্তৃত, জীবও অগ্নিময়। একই অগ্নি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

শুদ্ধ আকাশ, বায়ু ও অগ্নিই কি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে, জল এবং রসও তাহাকে অনন্তের সহিত একত্রীভূত করিয়াছে। মনুষ্যের দেহাগার রসে পরিপূর্ণ, বায়ুও রসে পরিপূর্ণ। যে রস বায়ুকে সিক্ত করিয়া শীতল করিতেছে, সেই রস সেই বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিতেছে। শরীরের উত্তাপ এই রসে কিয়দংশ প্রশমিত হইয়া মন্দীভূত হইতেছে। শরীর বহির্দ্দেশীয় রসে প্লাবিত হইয়া অনন্ত জগতের রসে মিশিয়া রহিয়াছে। বায়ুতরঙ্গ, সেই রস দেহের অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, কূপে

* মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ দেখ।

সেই আকাশই ও অনন্ত আকাশে আসিয়া মিশিয়াছে। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে, আমি অনন্ত আকাশে মিশিয়া আছি।

আমি বায়ু সাগর বেষ্টিত। এই বায়ু সাগর মধ্যে আমি একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। শুদ্ধ দ্বীপ নহে, বায়ু এই দ্বীপের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট। বায়ুই এই দ্বীপের অঙ্গ। আমার দেহের কোন্ স্থানে বায়ু নাই? সেই বায়ু কি বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিত নহে? বাহিরের বায়ুর শেষ কোথায়? কে জানে অনন্তদেশ কি পদার্থে পরিপূর্ণ? যে বায়ু সাগর অথবা তৎসম পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া আছে যাহারা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতেছে, সেই বায়ু দেহাভ্যন্তরিক সমুদয় আকাশ-দেশ পূর্ণ করিয়া তোমাকে অনন্ত বায়ু সাগরের সহিত মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি লোমকূপ দিয়া দেহাভ্যন্তরে গিয়া, গাত্রের প্রতি ছিদ্র ও অণুছিদ্র পূর্ণ করিয়া, প্রতি অস্থির ছিদ্রদেশে থাকিয়া প্রতি নাড়ীর আকাশদেশে অবস্থিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেহ মধ্যে কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতেছে। মহাভারত বলিতেছেন, "সমান বায়ুস্রোত দেহাগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকের প্রযত্ন কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে উদান বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের শরীর সন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে।" "প্রাণবায়ু অগ্নিবেগ প্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগ-কূর্ম্মাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদয় দ্বারা শরীর মধ্যে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে পরিচালিত হয়।" * বায়ুস্রোত যে কেবল শরীরের বাহিরে অবস্থান করিতেছে এমত নহে, দেহের অভ্যন্তরেও তাহার কার্য্য চলিতেছে। স্রোত যে কেবল অনন্ত বায়ুসাগরে প্রবাহিত এমত নহে, দেহ জগতেরও আভ্যন্তরিক আকাশে প্রবাহিত হইতেছে। বায়ু আমাদের শরীরকে অনন্ত দেশের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। তাহা শুদ্ধ নাসিকার রন্ধ্র দিয়া যে দেহাভ্যন্তরে যাইতেছে এমত নহে, দেহের সর্ব্বদেশ দিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে এবং দেহকে অনন্ত দেশের সহিত একত্র করিয়া রাখিয়াছে। এই বায়ুই শরীরের প্রাণ। জীব বায়ুতে নিয়ত অবস্থান করিয়া তবে জীবিত রহিয়াছেন। জীবের চারিদিকে যেমন অনন্ত আকাশ তেমনি অনন্ত বায়ু সাগর। জীব বায়ু সাগরে মিশিয়া রহিয়াছেন। রস ও অগ্নি এই বায়ু দ্বারাই দেহ মধ্যে বিচরণ করিতেছে। জীব বায়ুময়, বায়ু তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

বায়ুজগতের শুদ্ধ আকাশ ও বায়ু-রাশি দ্বারা যে আমরা অনন্তের সহিত মিলিয়া আছি এমত নহে, অগ্নি এবং

* মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদ দেখ।

বীজের কল্পনা করিতে হয়। মনুষ্যের আদি কোথা—তাহাও মনুষ্যের নিকট ঘোর প্রহেলিকা। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জীব জরায়ুতে বর্ত্তমান। জরায়ুর পূর্ব্বে জীব শোণিত শুক্রময় বীজে বর্ত্তমান। এই শোণিত শুক্র জৈবিক পদার্থে পরিপূর্ণ। সেই জৈবিক পদার্থের মিলন ও মিশ্রণে বীজের উৎপত্তি। সুতরাং বীজের পূর্ব্বে জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান। সেই জৈবিক পদার্থ ও কোষ সমুদয় পিতামাতার শরীরে বর্ত্তমান। আমি নিজে যেরূপে উৎপন্ন আমার পিতামাতাও সেইরূপে উৎপন্ন। আমি পিতামাতার আত্মজ। আবার আমার পিতামাতা তাঁহাদের পিতামাতার আত্মজ ও আত্মজা। শরীর হইতে শরীরের উৎপত্তি। শারীর পদার্থ ভিন্ন শারীর পদার্থের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। উদ্ভিদের যেমন, বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, মনুষ্যেরও তেমনি মনুষ্য হইতে বীজ, বীজ হইতে মনুষ্য। আজি যেরূপে মনুষ্য উৎপন্ন, শতবর্ষ পূর্ব্বে, সহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও সেই প্রকারে উৎপন্ন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, হইতেও পারে না। সুতরাং মনুষ্যের আদি ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনন্ত পর্য্যায় আসিয়া পড়ে। অনন্ত শ্রেণী মনুষ্য বংশপরম্পরায় জন্মিয়া আসিয়াছে। এই বংশপরম্পরার শেষ নাই। দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের উৎপত্তি যদি হঠাৎ শূন্য হইতে সম্ভব হয় তবে আজিও হইতে পারে। কিন্তু আজিত কোন জীবকে হঠাৎ শূন্য হইতে জন্মিতে দেখি না। এ কথা কেবল কল্পনা মাত্র—মূর্খের জন্য কল্পনা। প্রাকৃতিক নিয়মের কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কখন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহা মনুষ্যের দৃষ্টান্তে সত্য, তাহা অন্যান্য জীবেও সত্য। সুতরাং জীব অনাদি। এই জীব সমূহ সেই অনন্ত দেবের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীন হইয়া আছে। অনন্ত দেবের শরীরে জীবদেহ কিরূপে লীন হইয়া আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা মনুষ্যের দৃষ্টান্ত লইয়া এই তত্ত্বের আলোচনা করিব।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা অতি গুরুতর কথা, সে কথা এখন ছাড়িয়া দাও। যাহা সকলে বুঝিতে পারে, যাহা সকলে স্পষ্ট দেখিতেছে সেই শরীর গ্রহণ কর। বিষ্ণু-পুরাণ বলিতেছে।

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তকরণং পুরুষাখ্যং হিযজ্জগৎ॥

যাহা আমি আমার দেহ বলি, সেই দেহের সীমা কোথায়? কই স্থূল দেহত আমার সীমা নহে, আমি যে অনন্তদেশে লীন হইয়া রহিয়াছি। মহাসাগরের একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ যেমন সেই মহাসাগরেরই অঙ্গ, আমিও তেমনি অনন্তদেশের মহাসাগরের একটী ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মাত্র। আমার বাহিরে চারিধারে আকাশ, আমার অভ্যন্তরে দেহময় আকাশ। বাহিরের আকাশ আমার দেহের লোম, ভিতরে ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমার স্থূলদেহ ছিদ্রময়, অস্থি ছিদ্রময়, নাড়ীসকল ছিদ্রময়। দেহের প্রতিঅংশ, অংশেরও প্রতিঅংশ, এবং তাহারও অণু সমুদয় ছিদ্রময়। দেহের এমত পরমাণু নাই, যাহা ছিদ্রময় নহে। তবে আকাশ আমার কোথায় নাই? আকাশ আমার দেহের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমারে দর্শন করিতেছেন। আমি এই সমস্ত লোকসমষ্টিব্যাপারে তোমার বহুনয়ন ও অনেক মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু উরু ও বহুচরণযুক্ত, অনেক উদর পরিশোভিত ও বহু দংষ্ট্রাকরাল আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী বহু বর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাললোচন ও অতিপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। হে জগন্নাথ তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নি সন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিকভ্রম জন্মিয়াছে; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

ব্যাস পৌরাণিক ভাষায় নারায়ণের বিশ্বরূপ এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়া সংসারের অনাদিত্ব তদ্রূপ পৌরাণিক ভাষায় এই প্রকার বর্ণন করিতেছেন।

"হে অর্জ্জুন, সংসাররূপী এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; ঊর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোভাগে উহার শাখা, বেদ সমুদয় উহার পত্র, যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন তিনি বেদবেত্তা। এই বৃক্ষের শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, উহা সত্বাদি গুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের কর্ম্মানুবন্ধী বহু প্রতিশাখা মূল সকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধমূল সুদৃঢ় অশ্বত্থবৃক্ষ নিঃসঙ্গরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া উহার মূলীভূত ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিবে; উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।"

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ। সেই শাস্ত্রমতে বুঝ যে নারায়ণ অনন্ত ও অনাদি এমত নহে, যে ব্রহ্মাণ্ড নারায়ণের রূপ ও দেহ সেই ব্রহ্মাণ্ডও অনাদি এবং অনন্ত। ব্রহ্মাণ্ড অনাদি ও অনন্ত এবং এই সংসারও অনাদি ও অনন্ত। সংসারস্থ জীবস্রোত সেই অনাদি ও অনন্তদেবের স্থূল শরীর মাত্র। এই সংসারের জীবস্রোত অনন্ত পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। উহার আদি অনুমান কল্পনা মাত্র। ন্যায় ও প্রমাণে সে আদি সাব্যস্ত হয় না। জীবস্রোতের আদি দেখিতে গেলে আমরা অনন্ত বংশপরম্পরায় উপনীত হই। উহার আদি খুঁজিয়া পাই না। সংসারের জীবস্রোত অবলম্বন করিয়া যত উচ্চ উঠি না কেন অবশেষে অনন্ত দেশে মিশাইয়া যাই, তখন কাজেকাজেই বলিতে হয় সংসার ও জীবস্রোত অনাদি। উদ্ভিদ জীব দেখ, তাহাও অনাদি। কোন্ বৃক্ষের উৎপত্তি আদি খুঁজিয়া পাও? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মিতেছে। বৃক্ষ ও বীজ, চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রথম বীজ কল্পনা করিলে প্রথম বৃক্ষের কল্পনা আবশ্যক হয়। প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিলে প্রথম

করিলে। সুতরাং নারায়ণ যদি অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে এই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই নারায়ণের শরীর ও রূপ। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন; এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বাসুদেবে অবস্থান করিতেছে।

যাহা অনন্ত তাহা অবশ্য অনাদি। যাহার আদি আছে তাহার সীমা ও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না। সুতরাং অনন্ত পদার্থ অনাদি। এই অনন্ত পদার্থেরই বিকাশ ও দেহ যদি ব্রহ্মাণ্ড হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ড অবশ্য অনাদি। এই ব্রহ্মাণ্ড, অনাদি ও অনন্ত নারায়ণের রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডও অনাদি। ব্যাস মহাভারতে ব্রহ্মার রূপ এইরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন।

"পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি; মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা, এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয় রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল।"

ভগবৎগীতায় ব্যাস বাসুদেবের বিরাট বিশ্বমূর্ত্তির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে বহুমুখ ও বহু নয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ুধধারী, দিব্যমাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্য গন্ধচর্চ্চিত, সর্ব্বতোমুখ, অদ্ভুত দর্শন, পরম ঐশিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ধনঞ্জয় তাঁহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত, একস্থানস্থিত, সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে দেব! আমি তোমার দেহ-মধ্যে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্র-সম্পন্ন অনন্তরূপ নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু ইহার আদি, অন্ত, ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি তোমারে কিরীট-ধারী, গদাচক্রলাঞ্ছিত, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সূর্য্যসঙ্কাশ, নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষর, পরব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন ধর্ম্মপ্রতিপালক ও অনন্তবীর্য্য; হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃ প্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ এবং একাকী হইয়াও অন্তরিক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার এই ভীষণ অদ্ভুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে। এই সকল সুরগণ শঙ্কিত মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন। রুদ্র,

* শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম দ্বাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বিবিধ-সাহিত্য-বিজ্ঞান

সঞ্জীবনী

[illegible] খণ্ড। | সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। | ৩য় সংখ্যা।

আমি কি।

[illegible]
[illegible]

বিষ্ণুপুরাণ।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদি ও অনন্ত। অনন্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলে, তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত সত্তা এক বই দুই হইতে পারে না। যে বস্তু অনন্ত, [illegible]। যাহা অনন্ত রূপে সর্ব্বব্যাপী তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্র [illegible] স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্তু সর্ব্বব্যাপী থাকে না। যে বস্তু অনন্ত তাহাতে সমস্ত বস্তুই অবস্থান করিতেছে। এজন্য [illegible] নাম [illegible]। যে বস্তু অনন্ত, যদি তাহাতে অন্য সমস্ত বস্তু অবস্থান না করে, তবে তাহা অনন্ত নহে। কারণ এক অনন্তে সমস্ত বস্তুই নিহিত আছে।

এ কথা যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয় তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসত্য। জগৎ আবার ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদি এ জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএব জগৎ ব্রহ্মেতেই অবস্থান করিতেছে। এক নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। কোন স্থানে [illegible] খণ্ডিত হইতে পারে [illegible]। যাঁহারা বলেন পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, [illegible] অথচ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] স্বীকার করেন [illegible] [illegible] পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও [illegible] [illegible] স্বতন্ত্র [illegible]

[illegible] নাম [illegible] [illegible] পৌরাণিক [illegible]।

আয়ুর্ব্বেদ—শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন গুপ্ত।

[৵৹]

ভোগ করিতেছি ও করাইতেছি। এখন যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি সেই আমগাছ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বলে, 'তোমরা যে আমগাছের কথা বলিতেছ, তাহা তোমাদের কপোলকল্পিত, তোমাদের আমগাছের বাস্তব সত্তা নাই; কারণ, তাহার বাস্তব সত্তা থাকিলে আমি দেখিতে পাইতাম বা অনুভব করিতে পারিতাম', তাহা হইলে কি তাহার বাস্তব সত্তা অস্বীকৃত হইবে? তাহার সত্তার প্রমাণ আমরা দিতে বাধ্য নই; কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ জানিতেছি যে, আমগাছটী আছে; পরন্তু, সেই অন্ধব্যক্তিই আমগাছের অসত্তাসম্বন্ধে তাহার নিজের অনুভব করিবার অক্ষমতা ব্যতীত অন্য প্রমাণ দিতে বাধ্য। সেইরূপ, যখন সমগ্র মানবজাতি আত্মবাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, তখন অজ্ঞেয়বাদীদিগের ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, মানুষ ঈশ্বর ও আত্মাকে জানে না, জানিতে পারে না এবং ইহা বলিলেও চলিবে না যে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বের স্বপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে, বিপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। তাঁহাদের মত সুদৃঢ় রাখিতে গেলে প্রমাণ করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর ও আত্মা নাই বা থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা এই পথে না চলিয়া ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ভার আত্মবাদীদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলিলাম, তাহাতেই কতকটা বুঝা গিয়াছে যে, অজ্ঞেয়বাদীদিগের মত তেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে। তবে যে আজকাল তাঁহাদের দলপুষ্টি হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, হক্সলি, টিণ্ডাল প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিতেছেন। জনসাধারণের স্বভাবই এই যে, বিদ্বান্ লোকে এক বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া অপর অপর বিষয়ে মূর্খের ন্যায় কথা বলিলেও তাহারা সেই কথা নির্ব্বিচারে শিরোধার্য্য করে। তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, বক্তা কোন্ বিষয়ে পণ্ডিত। হয়ত কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা এক সময়ে অল্পস্বল্প চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগী ব্যক্তি রোগের সময়ে সেই জ্যোতির্ব্বেত্তাকে আহ্বান করিবে অথবা কোন সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেইরূপ সাধারণের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, হক্সলি, টিণ্ডাল, ডার্ব্বিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটে বিজ্ঞানের বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এবং ব্রহ্মবাদীদিগের নিকটেই আত্মতত্ত্ব জানিতে গেলে সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে।

যাহাই হউক, এখন দেখিতেছি যে, অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মতত্ত্ব (জীবাত্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব) অবগত হইবার প্রণালী প্রদর্শনের ভার আত্মবাদীদিগের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আত্মবাদীগণের অবলম্বিত প্রণালী প্রদর্শনের পূর্ব্বে অজ্ঞেয়বাদীগণ যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে অক্ষম হইয়াছেন, সেইগুলি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, ঈশ্বর ও আত্মাকে কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না এবং কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী

দ্বারাও ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় না; সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারেন না, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না। ইহা বৃথা জল্পনা। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের কোনই সম্পর্ক নাই। ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং জড়পদার্থ এবং তাহারা বহির্ব্বিষয় জড়-পদার্থেরই অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে; জড় ইন্দ্রিয়গণ আপনা-দিগের কারণকে প্রকাশ করিতে পারে না। কঠোপনিষদেও আছে—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্ব্বিষয় ব্যাপৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে তাহারা বহি র্ব্বিষয়ই অনুভব করিতে পারে, অন্ত-রাত্মাকে পারে না। আত্মবাদীদিগের স্বীকৃত ঈশ্বর ও আত্মার যদি প্রকৃতই অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলেও কখনই ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না, কারণ তাঁহারাই বলেন যে, ঈশ্বর ও আত্মা উভয়ই ইন্দ্রিয়াতীত। যদি অনন্ত আকাশে "ঈশ্বর আছেন," "আত্মা আছে" এই কথাগুলি খোদিত দেখিতে পাই বা ধ্বনিত শুনিতে পাই, তাহা হইলেও আমাদিগের আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা হইল না—আমরা একটী লেখা দেখিতে পাইলাম বা একটী কথা শুনিতে পাইলাম মাত্র।

যে কারণে ঈশ্বর ও আত্মাকে ইন্দ্রিয়-গোচর করা যায় না, সেই কারণেই তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা আবিষ্কার করিবার কথা কহাও বাতুলতা মাত্র। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জড় ইন্দ্রিয়গণ জড়-তত্ত্বই আবি-ষ্কার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতই সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী হউক না কেন, তাহা জড় পদার্থেরই কার্য্য বিবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নানা জড়তত্ত্ব আবিষ্কারে কৃতকার্য্যতাবশত আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া এই স্থূল কথাটী ভুলিয়া যান। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের যন্ত্রাদির নিকটে কি জড়তত্ত্ব, কি আত্মতত্ত্ব কিছুই অপ্রচ্ছন্ন থাকিবে না। তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশ-বর্ত্তী হইয়া আত্মা সম্বন্ধে বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলেই স্বীয় পাণ্ডিত্য স্মরণ করিয়া কিছু গর্ব্বিতস্বরে উপহাস করি-তেও ত্রুটি করেন না। কেহ (১) কল্পনা-বলে স্থির করিয়া ঘোষণা করিলেন, "ঈশ্বরের প্রাণসৃষ্টি অপেক্ষা না করিয়া জড়পদার্থ স্বয়ং প্রাণী উৎপাদন করিয়া থাকে"; (২) কেহ বা বলিলেন যে, তিনি সমস্ত আকাশ দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও কুত্রাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই; কেহ বা বলিলেন যে, তিনি সমস্ত মস্তিষ্ক অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিয়াও আত্মাকে দেখিতে পান নাই; নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতি-র্ব্বিদ লাপ্লাসকে (Laplace) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহার স্বপ্রণীত পুস্তকে (Mechanique Celeste) ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই কেন,

(১) অধ্যাপক হেকেল ও ব্যাষ্টিয়ান্ (Prof. Haeckel and Dr. Bastian)।

(২) ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ্ লালাঁদ্ (Lalande) বলিয়াছেন :—"I have swept the heavens with my telescope and have not found a God".

তখন লাপ্লাস তদুত্তরে বলিলেন যে, তাঁহার সেরূপ কোন কল্পনা করা আবশ্যক হয় নাই (১)। এই সকল বিদ্রূপ উপহাসে আত্মবাদীগণ কিছুমাত্র বিচলিত হন না, কারণ তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে জানেন যে, সহস্র দূরবীণ, সহস্র অনুবীক্ষণ, ঈশ্বর বা আত্মার কিছুমাত্র অনুভব করাইতে সক্ষম হয় না। আর ইহাও বলা দ্বিরুক্তিমাত্র যে, যখন ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়াতীত কোন পদার্থ অবগত করাইতে পারে না, তখন যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা যন্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া সেই ইন্দ্রিয়গণই কার্য্য করিতেছে, সেই সকল প্রণালী বা যন্ত্রাদি কিছুতেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিবে না।

অজ্ঞেয়বাদীদিগের দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহারা কঠোর তর্করাশির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও আত্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেবল তর্কের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় না। আমাদের ঋষিরা এই কথা অতি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। একদিকে মহামতি ব্যাসদেব বলিতেছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" তর্কের দ্বারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা হয় না (বে, সূ), অপরদিকে উপনিষদ্‌কারগণও বলিতেছেন "অতর্ক্যং" "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না (কঠোপনিষদ)। কঠোর তর্কের দ্বারা কেন যে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না, তাহা তর্কপদার্থের প্রতি একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। তর্কের নিয়মই এই যে, তাহার একটা মূল অবলম্বন চাই—মূল অবলম্বন না পাইলে তর্ক দাঁড়াইতেই পারে না। শূন্যে শূন্যে তর্ক চলিতে পারে না। তর্কের আর একটী নিয়ম এই যে, তর্কের উপসংহার, মূল অবলম্বনের সহিত সমধর্ম্মী হইবে। আমি যদি জ্যামিতি সম্বন্ধীয় কোন কথাকে মূল অবলম্বন করি, তবে তদবলম্বিত তর্ক পরম্পরার উপসংহারও জ্যামিতি সম্বন্ধীয়ই হইবে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হইতে পারিবে না; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল অবলম্বন করিলে উপসংহার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় হইতে পারিবে না; মন সম্বন্ধীয় মূল অবলম্বন করিলে উপসংহার জড় সম্বন্ধীয় হইতে পারে না। স্থান সম্বন্ধীয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল যেমন জ্যামিতির মূল অবলম্বন, সেইরূপ মানসিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল প্রামাণিক তর্কের অবলম্বন। প্রামাণিক তর্কের মূল অবলম্বন প্রকৃত পক্ষে মনের বাহিরে কোন কিছু হইতে পারে না; আমরা আমাদিগের মনের চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যের অতিরিক্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না এবং বাহিরেরও যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহাও মনেরই কার্য্যের মধ্য দিয়া অনুভব হয়। সুতরাং দেখিতেছি যে, আমরা প্রামাণিক তর্কের বলে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভব করি, তাহা সম্পূর্ণ মানসিক—তাহার অন্তঃসত্ত্বা আছে; কিন্তু সেই মানসিক অনুভবের (Subjective conception) অনুযায়ী পদার্থ সমূহের যে বহিঃসত্ত্বা (Objective existence) আছে, তাহার বিশেষ কোন প্রামাণিক প্রমাণ নাই। হইতে পারে যে, মানসিক অনুভবের অনুযায়ী পদার্থের বহিঃসত্ত্বা আছে, কিন্তু তাহা যে থাকিতেই হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই;

(১) "I have no need of this hypothesis."

অর্থাৎ আমরা কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বলিতে পারি না যে, আমরা যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, সেই সকলের বহিঃসত্তা বা প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। বাহ্যবস্তুর বহিঃসত্তা আমরা তর্করাশির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জানিতে পারি না, অথচ ইহাও জানি যে, আমরা বাহ্যবস্তুর বহিঃসত্তা দর্শনাদি দ্বারা পরোক্ষভাবে মানসিক কার্য্যের মধ্য দিয়া জানিতেছি। কিন্তু মানসিক ভাব হইতে বহিঃসত্তায় যে কিরূপে উপনীত হই, তাহা প্রামাণিক তর্কের অতীত

যাহই হৌক্, এখন দেখিতেছি যে, আমরা মানসিক ভাব ও চিন্তার অন্তঃসত্তাও জানিতে পারি এবং (যদিও প্রামাণিক তর্কের দ্বারা নহে) বাহ্যবস্তুর বহিঃসত্তাও নিঃসংশয়ে জানিতে পারি। সুতরাং মানসিক ভাব ও বাহ্যবস্তু এই উভয়ই আমাদের বুদ্ধির গ্রাহ্য এবং আমরা উভয় হইতেই প্রামাণিক তর্কের মূলসূত্র গ্রহণ করিতে পারি। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, তর্কের নিয়মই এই যে, তর্কের মূলসূত্র যে বিষয়ের হইবে, উপসংহারও তদ্বিষয়ক হইবে। ইহাও আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, মানসিক ভাবকে তর্কের মূলসূত্র ধরিয়া উপসংহারকালে মানসিক বিষয়েই আসিয়া পড়িতে হয়। সেইরূপ আমরা যদি বাহ্যবস্তুবিষয়ক কোন মূলসূত্র অবলম্বন করি, তাহা হইলে তর্কের পরিণামে আমাদিগকে বাহ্যবস্তুবিষয়ক উপসংহারে আসিতে হইবে; কঠোর দার্ষ্টান্তিক (Inductive) তর্কের নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আমরা কখনই বহিঃপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া মানসিক রাজ্যে পৌছিতে পারিব না।

এখন, আমরা আত্মতত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থির করিতে চাহিলে, ঈশ্বর ও আত্মাকে আমাদের মানসিক ভাবোদ্ভূত তর্কপরম্পরার উপসংহার মাত্র হইতে হয় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে হয়। পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ঈশ্বর ও আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অথবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় না। তাঁহারা যদি তর্কপরম্পরার উপসংহারমাত্র হয়েন, তথাপি আমরা প্রামাণিক তর্কের অনুরোধে ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না যে, আমাদের মানসিক তর্কপরম্পরায় অস্তিত্ব ব্যতীত তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না। যদি তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (objective existence) থাকে, তবে তাহা প্রামাণিক তর্কের অতীত। আর যদি তর্কপরম্পরায় মাত্র তাঁহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তবে তাঁহারা আত্মবাদীগণের অবলম্বিত ঈশ্বর ও আত্মা হইতে পারেন না। আত্মবাদীগণ বলেন যে, তাঁহারা যে আত্মাকে জানেন, সে আত্মা শূন্য আত্মা নহে, সে আত্মা জীবন্ত জাগ্রত পরমেশ্বরের জীবন্ত জাগ্রত "হিরণ্ময়কোষ"; এবং তাঁহারা যে জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তিনি যেমন কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থ নহেন, সেইরূপ কোন প্রকার পরিমিত জীবের মানসিক ভাবের সীমা দ্বারাও আবদ্ধ নহেন; তিনি নিরবয়ব, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ।

কঠোর প্রামাণিক তর্কের দ্বারা প্রকৃতি হইতেও, তাহার কারণরূপে, শিল্পীরূপে, নিয়ন্তারূপে, বা অন্য কোনরূপে আত্মবাদীদিগের অবলম্বিত প্রকৃতির অতীত

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। প্রামাণিক তর্কের নিয়মে প্রকৃতি হইতে কারণ খুঁজিলে প্রাকৃতিক কারণই দেখিতে পাইব; প্রকৃতির কার্য্যের অকৃত কারণ উপলব্ধি করা প্রামাণিক তর্কের অতীত। তর্কের দ্বারা প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরকে তাহার শিল্পীরূপে স্থির করিতে পারি না। প্রাকৃতিক কার্য্যসম্বন্ধে আমরা কোনপ্রকার মানসিক কারণ কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই; সুতরাং যদিও আমরা আমাদিগের সহজজ্ঞান পরিচালনা করিয়া বুঝিতে পারি যে,এই জগৎশিল্পের রচয়িতা এক পূর্ণ পুরুষ আছেন কিন্তু কঠোর তর্কের নিয়ম অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি না যে, প্রকৃতির শিল্পী ও নিয়ন্তারূপে এক পূর্ণ পুরুষ বিদ্যমান। এতক্ষণে দেখিলাম যে, কঠোর প্রামাণিক তর্ক অবলম্বন করিয়া কোনরূপেই তর্কের অতীত, প্রকৃতির অতীত, আত্মবাদীদিগের স্বীকৃত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে না।

অজ্ঞেয়বাদীগণ এই সীমাপর্য্যন্ত আসিয়া যখন দেখেন যে, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা বলেন যে,আত্মতত্ত্ব কোন উপায়েই জানা যাইবে না, সুতরাং তাহা আর অধিক অন্বেষণ করিবারও আবশ্যকতা নাই। ঈশ্বর ও আত্মাকে জানিবার যে অন্য প্রকৃষ্ট পথ আছে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। তাঁহারা স্বচিহ্নিত ক্ষুদ্রপথে গমন করিয়া যে, আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন না, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া আত্মবাদীদিগের অবলম্বিত সুবিস্তীর্ণ রাজপথ ধরিয়া চলিতে হইবে। আত্মবাদীগণ বলেন, ব্রহ্ম যখন সকলেরই কারণ এবং আত্মা যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন, তখন আত্মতত্ত্ব জানিতে গেলে সকল জ্ঞানের আদিজ্ঞান, সকল তর্কের মূলাধার ও সকল বিজ্ঞানের আশ্রয়ভূমি-সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিতে হয়। এই সহজজ্ঞানই আত্মতত্ত্বে উপনীত- হইবার সুবিস্তীর্ণ রাজপথ। ইহারই অপর নাম আত্ম-প্রত্যয়। এই সহজজ্ঞান অজ্ঞেয়বাদীদিগের অবলম্বিত তর্ক প্রভৃতি উপায়গুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সহজজ্ঞান হইতে আমরা আমাদে[র] নিজনিজ অস্তিত্ব কর্তৃত্ব উপলব্ধি করি এবং ইহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব উপলব্ধি করি। অজ্ঞেয়বাদীগণ মুখে যতই কেন সহজজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া তর্করাশি অবলম্বন করুন না, কার্য্যতে তাঁহারা তাহা করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছি যে, তর্ক করিতে গেলেই তাহার মূলসূত্র চাই। কাপড়ের কলে তুলা না দিলে যেমন কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না, সেইরূপ মূল অবলম্বন না পাইলে তর্করাশি কোন প্রকার জ্ঞানই প্রকাশ করিতে পারে না। যদি ইহা বলা যায় যে, আমি যে তর্ক করিতেছি, তাহার মূলসূত্রগুলি পূর্ব্বতর্কপরম্পরার উপসংহার মাত্র, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সর্ব্বপ্রথম তর্কের মূলসূত্রগুলি তর্কের অতীত হইয়া আসিয়াছিল; তর্কের দ্বারা সেইগুলি পাওয়া যায় নাই, কারণ সেইগুলি প্রথমেই না পাইলে তর্কই চলিতে পারিত না। এখন প্রশ্ন এই যে, সেই মূলসূত্রগুলি কোথা হইতে আসিল? অন্য যাহাই হউক, [সেই]গুলি তর্ক পরম্পরা হইতে উদ্ভূত [হয় না।] শীল-

স্বীকার করিতেই হইবে। আবার সেই-গুলি না পাইলে যখন আমরা তর্কশক্তি বা বিবেচনাশক্তি পরিচালনা করিতে পারিতাম না, তখন সেইগুলিকে আমাদের জ্ঞানের মূলভিত্তি, বিজ্ঞানের প্রথম সোপান, সহজজ্ঞানের বিষয় ব্যতীত আর কি বলিব? যদি সেইগুলি আমাদের নিকটে সত্য প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয়ই সেইগুলি তর্কের অতীত সত্যজ্ঞান; আর যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই মিথ্যা, ভ্রান্ত। হয় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের অন্তরে তর্কের অতীত অনেক জ্ঞান নিহিত আছে; অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা একবারে কিছুই জানি না। আমরা একবারে কিছুই জানি না, ইহা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ আমরা জানিতেছি যে, আমরা অনেক বিষয় জানি। ইহা স্বীকার না করিলে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তিই থাকিতে পারে না এবং আমাদিগকে মৃত স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি যে, তর্কের অতীত জ্ঞানের (যেমন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক) উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে অনেক কার্য্য করিতে হইতেছে; সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তর্কের অতীত, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের অতীত অনেক জ্ঞানমূল আমাদের অন্তরে নিহিত আছে। ইহাই আমাদিগের সহজজ্ঞান। এই সহজজ্ঞানই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্য্য করিতেছি। এই সহজজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়াই আমরা আত্মতত্ত্ব (জীবাত্মা ও পরমাত্মতত্ত্ব) জানিতে পারি। এই সহজ জ্ঞানই ঈশ্বরকে জানিবার প্রকৃষ্ট অবলম্বন। আমরা ক্রমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে, এই সহজ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। আর ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অজ্ঞেয়বাদীগণ এই সহজজ্ঞানকে ছাড়িয়াই কিরূপ গুরুতর ভ্রান্তিজালে পড়িয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর রহস্য।

প্র। বিজয়ার দিবস হইতে মা দুর্গা কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন?

উ। দুর্গাপুরে।

প্র। ৬ বৃন্দাবনের কোন্ স্থানে ঝড় তুফানের ভয় নাই?

উ। ধীর সমীরে।

প্র। কোন্ স্থানের লোকেরা দধি দুগ্ধের কারবার করে।

উ। আহিরীটোলায়।

প্র। কোন্ খোলায় স্বর্ণ গালান হয়?

উ। মুচীখোলায়।

প্র। কলিকাতার কোন্ স্থানটী বেশ সদ্গন্ধে পরিপূর্ণ?

উ। চাঁপাতলা।

প্র। কৃষ্ণ কোন্ নগরে এত সরভাজা পাইতেন?

উ। কেন?—কৃষ্ণনগরেই।

প্র। গয়া লাইনে কোন স্থানটী সমুদ্র-তীরে অবস্থিত?

উ। বেলা।

প্র। রেল পথে কোন রাস্তাটী বরুণদেবের নামে প্রসিদ্ধ ?

উ। জলেশ্বর রোড।

প্র। কোন্ রাজ্যে গ্রীষ্মকালেও শীতলতা উপভোগ করা যায় ?

উ। পাটিয়ালা রাজ্যে।

প্র। শচীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল কোথায় ?

উ। পুরন্দরপুরে।

প্র। দেবগণ রাত্রি জাগরণ করেন কোথায় ?

উ। দেবীপুরে।

প্র। গঙ্গা নদী ঐরাবতকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ নদী তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ?

উ। ঐরাবতী।

প্র। কোন পুকুরে ভ্রমরেরা যাতায়াত করে ?

উ। পদ্মপুকুরে।

প্র। কোন্ হ্রদটী চিল্ পক্ষীদিগের অধিকৃত ?

উ। চিলি।

প্র। কোন্ গ্রামটী ৬০০ শত কাঠা পরিসর ?

উ। ত্রিশবিঘা।

প্র। অমাবস্যার রাত্রিতেও কোথায় চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে ?

উ। মহেশমুণ্ডে।

প্র। কোন্ গ্রামটী জন শূন্য ?

উ। বনগ্রাম।

প্র। পূর্ব্বে কোন্ নগরটী অতি বৃহৎ ছিল ?

উ। বিরাট নগর।

প্র। মর্ত্ত্যে পাতাল কোথায় অবস্থিত ?

উ। নাগপুরে।

প্র। মহারাণী কোথায় বাস করেন ?

উ। মহারাজপুরে।

প্র। কোন্ বাজারে অনাথগণ অন্ন পায়?

উ। অনাথনাথের বাজারে।

প্র। কলম্ব কোথায় পাওয়া যায় ?

উ। লঙ্কার মধ্যে।

প্র। কোন্ নদীর জল কৃষ্ণবর্ণ ?

উ। কালী নদীর।

প্র। কোন্ স্থানে অন্তর প্রফুল্ল থাকে

উ। নিউ-বিয়ায়।

প্র। কোন্ পোলে গবাদি পশু পিঁজরা বদ্ধ থাকে ?

উ। পিঁজরা পোলে।

প্র। সকল গ্রাম অপেক্ষা কোন গ্রামটীর পায়া ভারি ?

উ। গোদার।

প্র। কোন্ নদের গর্ভে একটুও জল নাই, খালি দাম ?

উ। দামোদরের।

প্র। কাষ্ঠ তরণীতে সকল নদীতেই গমনাগমন করা যায়, কিন্তু সরস্বতী নদীতে কোন্ তরণী দ্বারা গমন করা যায় ?

উ। বৈ-তরণীর দ্বারা।

প্র। সকল নদীই ত সরল দেখিতে পাই একটুও বক্র নয়, কিন্তু কোন্ নদীটি বক্র ?

উ। বাঁকা নদী।

প্র। কোন্ দহে সকলে মজে ?

উ। বিশালাক্ষীর দহে।

প্র। ত্রিহুত জেলার কোন্ স্থানে উকীলদিগের অন্ন জুটে ?

উ। বারে।

প্র। বিদ্রোহের ভয় নাই কোথায়?

। সুরুলে।

। কোন্ মেলাতে কেবল কাল ও সাদা ছাতা পাওয়া যায়?

উ। হরিহর ছত্রের মেলাতে।

প্র। কোন্ বাজারে নয়নের প্রীতিকর পদার্থ সব থাকে?

উ। শোভাবাজারে।

প্র। বিলাতে কোন্ স্থানটী মহারাণীর আয়ার অধিকৃত?

। আয়ারল্যাণ্ড।

। কোন্ স্থানে পাবেশ গরমে থাকে?

। ফরমোজায়।

প্র। কোন্ স্থানে ঘোটকদিগের বড় আমোদ?

দানাপুরে।

প্র। কোন্ স্থানে পর্দ্দা নাই?

উ। একতারায়।

প্র। কোন্ নদীর পাশ নাই?

উ। বিপাশায়।

প্র। কৃষ্ণনগরের বামে কোন্ নগর?

উ। রাধানগর।

প্র। কোন্ ঘাটটী পীতবর্ণে রঞ্জিত?

উ। হলদি ঘাট।

প্র। ব্রহ্মার উৎপত্তি কোথায়?

উ। হরিনাভিতে।

প্র। তৈল পাওয়া যায় কোথায়?

উ। কলুটোলায়।

প্র। কোন্ স্থানে মণিময় কর্ণিকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়?

উ। মণিকর্ণিকার ঘাটে।

প্র। ৺ কাশীর কোন্ ঘাটে নামিলে পা কাটিবার সম্ভাবনা?

উ। অসি ঘাটে।

প্র। কোন্ স্থানে মহারাণীর পশ্চিম-দেশীয় মন্ত্রী বাস করেন?

উ। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে।

প্র। কোন্ স্থানে পা দিলে পা বসিয়া যায়?

উ। বজবজেতে।

প্র। কোন্ স্থানে শৃগালের উপদ্রব অধিক?

উ। শিয়ালদহে।

প্র। কোন্ পর্ব্বতশ্রেণী লোহিতবর্ণে রঞ্জিত?

উ। আলতাই পর্ব্বতশ্রেণী।

প্র। কোন্ স্থানটী রত্ন বিনির্ম্মিত?

উ। মণিপুর।

প্র। পান পাওয়া যায় কোথায়?

উ। বারুইপুরে।

প্র। গীতালাপ হয় কোথায়?

উ। বেহালায়।

প্র। কোন্ স্থানে চুয়া পাওয়া যায়?

উ। চুয়াডাঙ্গায়।

প্র। কোন্ স্থানে পিত্ত নাশ হয়?

উ। পল্তায়।

প্র। কোন্ গ্রামে পেটের অসুখ হইলে ভয় নাই?

উ। বিল্বগ্রামে।

সঙ্গীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

প্রথম প্রস্তাব।

সঙ্গীত বলিলে গীত বাদ্য নৃত্য এই তিনটী বিষয় বুঝায়। "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ঃ সঙ্গীত মুচ্যতে"। ইহাদের মধ্যে গীত সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। গীতই সঙ্গীতের প্রাণ। গীত হইতেই সঙ্গীত কথাটীর উৎপত্তি হইয়াছে। গীতই সঙ্গীতের সারাংশ; বাদ্য ও নৃত্য তাহার আনুসঙ্গিক বিষয়। সঙ্গীত-সংগীত; সংএর অর্থ সঙ্গ বা একত্র; ইহাতে আমরা গীত কথাটীকে শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান দেখিতে পাই, বাদ্য ও নৃত্য তাহার সহচররূপে সং কথার মধ্যে অপ্রধানভাবে প্রকাশ পাইতেছে। গীতের সহগামী বলিলেই বাদ্য ও নৃত্যকে বুঝায়, বাদ্যের সুরতালাদি আর নৃত্যের ছন্দময় অঙ্গবিক্ষেপাদি অস্ফুট বা স্ফুটভাবে গীতের অনুসরণ করিয়া তাহাকে সম্যক্‌রূপে পুষ্ট করিয়া তুলে। বাদ্য ও নৃত্য গানকে অলঙ্কৃত করে মাত্র; তন্মধ্যে বাদ্য গানের অত্যন্ত আবশ্যকীয় অলঙ্কার, বাদ্য না হইলে গান সচরাচর ভাল শুনায় না। বাদ্য মুখ্যভাবে এবং নৃত্য গৌণভাবে গীতের অনুবর্ত্তন করে। শার্ঙ্গদেব তাঁহার সঙ্গীতরত্নাকরে বলেন—

"নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবর্ত্তি চ।
অতো গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে॥"

অহোবল তাঁহার সঙ্গীত পারিজাতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎসঙ্গীত মিতীরিতম্॥"

এই হেতু নৃত্য বাদ্য শিখিবার পূর্বে আমাদিগের গান ভালরূপে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। গান শিখিলে মন উদার, বক্ষ প্রশস্ত, ফুস্‌ফুসিতে বলসঞ্চার, শিরানাড়ী সতেজ এবং শরীরের মধ্যে এক প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ হয়।

গান মানবের অন্তরস্থভাবের স্বরময় উৎস। ইহা উৎসারিত হইয়া আমাদিগের মন প্রাণ স্নিগ্ধ করে ও হৃদয়ে সরসতা আনিয়া তাহার নীরসভাব অপসারিত করিয়া দেয়। গান আমাদের অন্তরের ধ্বনিময় সত্য এবং কণ্ঠযন্ত্রে সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বিলাতের সুবিখ্যাত পত্রিকা Westminister Reviewয়ের একজন লেখক বলেন:—

Song is but the eloquence of truth—the truth of our inmost souls—the truth of humanity's essence, brought up from those abysses which exist in every bosom, and just moulded into metre without being concealed or disfigured by the workmanship".

যাহার অন্তরে যে প্রকার সত্য নিহিত থাকে তাহার গানও সেইপ্রকার হয়। ইহা লোকভেদে বা জাতিভেদে ভিন্নরূপ আকার ধারণ করে। লোক বা জাতি অসৎ হইলে তাহার গানও অসৎ, সৎ হইলে সৎ, অসভ্য হইলে অসভ্য এবং সভ্য হইলে সভ্য হয়। যাহারা যেরূপ তাহাদের গানও সেইরূপ

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

...ই অসভ্য অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগের ...খঃ—তাহাদের অন্য বিশেষ ...য নাই, তাহারা শীকার ও আহার ...নেই প্রধানতঃ কালহরণ করে, তাহা-...র গানও তাই আহারামোদের সীমা ...তিক্রম করে না; তাহারা পূর্ণিমা ...জনীতে তাহাদিগের করোববি নামক একটী বিশেষ নৃত্যোৎসবে এইরূপ গান করিয়া থাকে :--

"খাও বেশী ক'রে ;
খাও খাও খাও
খাও ফের আবার ;
অনেক আছে খেতে
খাও আরও বেশী
খাও খাও খাও।

বোর্ণিও দ্বীপের আদিম অধিবাসী, ...মুণ্ডপ্রিয় ভীষণ ডায়কজাতির পাহাড়ী গোষ্ঠীর গানেরদিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে তাহা নরমুণ্ডের ভীম হর্ষোল্লাসময়। ঐ পাহাড়ী ডায়ক গোষ্ঠী সচরাচর তাহা-দের নিম্নভূমিস্থ গোষ্ঠীর ন্যায় সহজে মুণ্ড পায় না বলিয়া একদিন সহসা একটী নূতন নরমুণ্ড পাইলে সেই নরমুণ্ড লাভ-জনিত হর্ষ তাহাদিগের অন্যান্য গোষ্ঠীর অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে উথলিয়া উঠে ; তাহারা নরমুণ্ডের পানে চাহিয়া এইরূপ গান করে :—

তোর মাথা তোর প্রেত এখন আমাদের
আমরা যাতে মারতে পারি
এখন লোভ দেখা সেই জাতভেয়েদের
ক্ষেতের মাঝে ঘুরতে দে তাদের
তা হ'লে মোরা মুণ্ড এনে তোর ভেয়েদের
ঝুলিয়ে রাখবো পাশে তোর মুণ্ডের।

কি ভয়ানক গান! গানটীর কি বীভৎস ভাব!——মরুভূমির বিডুইন আরব জাতির গানের প্রতি যখন প্রণিধান করি, দেখি তাহা মরুর ভাবময়। মরুর সৌন্দর্য্যপূর্ণ গান মরুপ্রিয় বিডুইনের বড় আদরের বস্তু। মরুর গান সহজে সে ভুলে না; তাহার গানে সতত সে মরুর মাধুর্য্য ফুটাইতে চায়, মরুভূমির স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে বড় সুখ অনুভব করে। তাহার গানে মরুর বিস্মৃতি আনয়ন করা সহজসাধ্য নহে; সে সহজে মরুর গান ভুলিয়া যাইবার পাত্র নহে। এ সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছেঃ—মোআবিয়া নামে এক আরবরাজপুত্রের একটী বিডুইন বধূ ছিল। তাহার নাম মাইসুনা। সে রাজবধূ হইলেও মরুভূমির আনন্দ কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই, তাহা প্রবলরূপে তাহার হৃদয়কে অধি-কার করিয়া থাকিত; ডমস্কসের শত ধুম-ধাম, হর্ষধ্বনি ও আনন্দ কোলাহল এবং প্রাসাদের সহস্র সুখোল্লাস তাহার অন্তর হইতে মরুর আনন্দ দূর করিতে সমর্থ হয় নাই; মাইসুনা বিরলে বসিয়া মরু-ভূমির গান গাহিয়া অত্যন্ত সুখানুভব করিত। (এই কারণে মোআবিয়া তাহাকে পুনরায় মরুভূমিস্থ আমেন সহরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন)। সেই গানের একটী চিত্র কার্লাইল অঙ্কিত করিয়াছেন।

"The russet suit of camel's hair, With spirits light and eye serene, Is dearer to my bosom far, Than all the trappings of a queen. The humble tent and murmuring breeze, That whistles through its fluttering walls, My unaspiring fancy please, Better than towers and splendid halls.

The attendant colts, that bounding fly, And frolic by the litter's side, Are dearer in Maisuna's eye, Than gorgeous mules in all their pride. The watchdog's voice, that bays whene'er A stranger seeks his master's cot, Sounds sweeter in Maisuna's ear, Than yonder trumpet's loud drawn note. The rustic youth, unspoil'd by art, Son of my kindred, poor but free, Will ever to Maisuna's heart Be dearer, pamper'd fool, than thee!

ডন্‌কসাকদিগের মধ্যে একটী গান প্রচলিত আছে; সেই গানে তাহাদিগের ভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়; তাহা কসাকযুবক যুবতীর কথোপকথনচ্ছলে গীত হইয়া থাকে। ডন নদীতীরস্থ বীর কসাক যুবক যখন যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে সংগ্রামোন্মত্ত হইয়া তাহার প্রিয়াসমীপে গান করে সে গানের ভাব একরূপ, তাহা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয় বীর কসাকের * উপযুক্ত বটে, তাহাতে বীরত্ব—পুরুষের যোগ্য বিক্রম ভাব প্রস্ফুটিত। পুনরায়, কসাকযুবতী সেই গানের উত্তরে থেকে থেকে যে গান করে তাহাতে স্ত্রীপ্রকৃতি সুলভ কোমলতা বিদ্যমান দেখিতে পাই। নিম্নে সমগ্র গীতটী দিতেছি পাঠকেরা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কসাকযুবক।

ওই করিতেছে তাহারা বীভৎস ধ্বনি
যুদ্ধের অশ্ব মোর আঘাতিছে ধরণী
পাই হ্রেষারব শুনিবারে
ওঃ যেতে দাও আমারে

কসাকযুবতী।

যেতে দাও আর সবে কোলে মরণের
তুমি অতি ছোট নয় ভদ্রঘরণের
এখনো দেখিতে হইবে আমাদের গৃহকুটীর
তুমি যেওনাকো ছেড়ে এই ডন নদীতীর

কসাকযুবক।

ওইশত্রু! ওইশত্রু!—শস্ত্র উঠাই
তব লাগি আমি যুদ্ধ করিতে যাই
শত্রুর বিরুদ্ধে না গিয়া
যদি থাকি হেথা বসিয়া,
যদিও অল্পবয়স তবুও আছে সাহস;
যদি থাকি আমি পিছনে পড়িয়া
লজ্জারোষে বুড়ো কসাক উঠিবে রুখিয়া।

কসাকযুবতী।

দেখ তোমার জননী করিছেন ক্রন্দন
দেখ তাঁর শরীর ক্রমে হ'তেছে ভগন
এখন শত্রু দেখিবার আগে
মোরা মরিব তোমার ও রাগে।

কসাকযুবক।

যখন তারা সংগ্রামের কথা কয়
আমারে হেরে ভীরুবলে অতিশয়
কিন্তু যদ্যপি মরি আমি রণে—
আমার যশ গায় সঙ্গীগণে
অশ্রু শুকাবে ত্বরা ওনয়নে।

* কসাকেরা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতি। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন "যদি একশত কসাক পাই তাহা হইলে পৃথিবী জয় করিতে পারি"।

কসাকযুবতী।

কভুনা! ঘুমাবদোঁহেসমাধিগৃহেসেইঅন্ধকার
যদি তুমিচলে যাবে—আমি করি অনুসরণ
যাও! তবু একসাথে মোদের হইবে পতন।
বিদায়! বহিয়াগেছেনয়নেমোরকতঅশ্রুধার

এরূপ গানের অভিনয় কসাকদিগেরই সম্ভবে, রণানুরাগী জাতিরই সম্ভবে; আমরা বাঙ্গালী শান্তজাতি আমাদের গানে কোথাও এপ্রকার ভাব পাইবার বো নাই। আমাদের ভাবের অনুযায়ী আমাদের দেশের গান। নির্ব্বিবাদী শান্তরাশ্রিত গানই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করি। আমাদের শান্তভাবানুসারে রণসজ্জায় বিরহ মিলন আমাদিগের গানে শোভা পায় না। আমাদিগের মিলন বিরহ নিরিবিলি গৃহের অন্তঃপুরে বিরাজ করে, এই বঙ্গদেশের গানও সেই জন্য বেশ একটী কোমল গৃহীর ভাব ধারণ করে, গৃহের কোমল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সদৃশী জননী—প্রকৃতকে পূজা করিবার জন্য প্রধানতঃ ব্যাকুল হইয়া উঠে। মাতৃস্নেহ পাইবার জন্য বঙ্গবাসী বড়ই আকুল, মাতৃস্নেহ না পাইলে তাহার গান যেন পরিতৃপ্তি লাভ করে না। বঙ্গকবি মায়ের নামে যত উথলিয়া উঠেন, পিতার নামে তত উচ্ছ্বসিত হন না। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শিবকে ছাড়িয়া ভবানীর নামেই গান করিবার জন্য ব্যাকুল। দুর্ব্বল সন্তান যেমন সহজেই মাতার প্রতি ধাবিত হয়, আমরা দুর্ব্বল বাঙ্গালী সেইরূপ সহজেই মাতৃস্তুতি গানে বিভোর হইয়া পড়ি। হিন্দুস্থানীরা আমাদের অপেক্ষা দৃঢ় ও বলবান, তাহাদের গানে শিবের সম্মানই অধিক দেখা যায়। তাহারা আমাদের অপেক্ষা পুরুষবিক্রমী, তাই তাহারা তাহাদের গানে ভবানীর পরিবর্ত্তে বেশীভাগ শিবকে লইয়া ধূমধাম করিতে ভালবাসে। তাহাদের গানে কেমন এক প্রকার বিক্রম অনুভূত হয়, আমাদের বাঙ্গলা গানের মধ্যে সাধারণতঃ সেপ্রকার বিক্রম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাঙ্গলা গানে যেটুকু বিক্রম প্রবেশ করিয়াছে তাহা প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী গানের স্পর্শ। অন্যান্য দেশীয় ভাবের স্পর্শে আমাদিগের ভাবও যেমনপরিবর্ত্তিত হইবে আমাদিগের গানও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে। সেই হেতু যদি আমরা আমাদের গানের উন্নতি সাধনে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ভাবের উন্নতি করা—নিজেদের উন্নত হওয়া। আমরা নিজে ভাল না হইলে আমাদিগের গান ভাল হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই ভারতে যাঁহারা গানের উন্নতি করিয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় উন্নতমনা, সাধক বা যোগী ছিলেন। গানের উন্নতির জন্য তাঁহারা শরীর মন প্রাণ সকলই বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। গান বিদ্যা আয়ত্ত করিতে অত্যন্ত যত্নের আবশ্যক, তাহার জন্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কত শ্রম কত কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন; "গানাৎ পরতরং নহি" এ কথার মর্য্যাদা তাঁহারাই যথার্থ বুঝিতেন বটে। অনেক যত্ন করিয়া তাঁহারা গানকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভারতের ন্যায় এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গানকে দাঁড় করাইতে অন্য কোন দেশ সক্ষম হয় নাই। ভারতের সঙ্গীতাচার্য্যদিগের

গানের দ্বারা অন্তরের স্বাভাবিক সত্য ফুটাইবার দিকে আশ্চর্য্যরূপ যত্ন ছিল। সার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় বলেন যে হিন্দু সঙ্গীতের প্রণালী ইয়োরোপীয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সত্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; সমস্ত দেশীয় গায়কদিগের নৈপুণ্য প্রধানতঃ অন্তরের প্রবল বৃত্তি সমূহের অভিব্যক্তিকরণের দিকে নিযুক্ত হয়, বাস্তবিক তাহাতেই হিন্দু গীতি উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বেহালাবিৎ ইটালীদেশীয় রেমিনি সাহেব, যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে একবার ভারতবর্ষে আসিয়া জনসাধারণকে বেহালা বাদ্যের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি এ দেশীয় গান শ্রবণ ও বাদনের সময় তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আরও অনেক ইউরোপীয় আছেন, যাঁহারা দেশীয়দিগের সহিত একটু ভালরূপে মিশিয়াছেন বা ভালরূপ গান শুনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় গানের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মুসলমানেরা আমাদের দেশে মিশিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমাদের গানের দ্বার অবারিত হওয়াতে তাঁহারা আমাদিগের ভারতীয় গানের মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা আমাদের সঙ্গে তত মিশিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা আমাদের গানের ভাবও মুসলমানদিগের ন্যায় ততটা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না, তাঁহারা প্রধানতঃ উপর উপর বুঝিয়াই আমাদিগের গানের সমালোচনা করিতে বসেন।

"অশ্রু মাহাত্ম্য।"

চক্ষের জল অতি পবিত্র জিনিষ। দেশকাল ভেদে একবিন্দু চক্ষের জলে যে কত মহা কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার প্রভাবও অতুলনীয়। প্রেমে ইহার উৎপত্তি উচ্ছ্বাসে ইহার বিকাশ। কাঠিন্যকে কোমলে পরিণত করিতে, অসদ্বৃত্তিকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে ইহার অমোঘ প্রতাপ পরিদৃষ্ট হয়। তুমি বরং চোরকেও বিশ্বাস করিও, তথাপি যে জীবনের মধ্যে, কস্মিনকালে, কোন ঘটনায় অন্ততঃ একবারও না কাঁদিয়াছে, একবিন্দুও অশ্রুজল না ফেলিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস করিও না। আজ একটী সামান্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, আমরা এই "অশ্রু মাহাত্ম্য" বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একদা এক পরী সুন্দরী, কোন কারণবশতঃ শাপগ্রস্তা হইয়া, স্বর্গভ্রষ্টা হইয়াছিল। সে প্রতিনিয়তই মলিনবেশে—রুক্ষকেশে, অনাহারে পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং শিরে করাঘাত করিয়া রোদন ও বিলাপ করিত। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল।

তাহার কাতরতা দেখিয়া একদিন স্বর্গাধিপতি, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ, তুমি আবার স্বর্গধামে

অবস্থিতি করিতে পার, যদি একটি কায কর।”

অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় আছে শুনিয়া, দুর্ভাগাবতী পরী, দেহে প্রাণ পাইল। আশ্বস্ত হৃদয়ে, ব্যাকুলভাবে কহিল,—“দেব, কি কর্ম্ম করিতে হইবে বলুন; আমি প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।”

স্বর্গের অধীশ্বর কহিলেন,—“দেখ, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু যদি তুমি লইয়া আনিতে পার, তবে তোমার পুনরায় স্বর্গলাভ হইবে; নচেৎ ইহজীবনে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না।”

এই কথা শুনিয়া পরী ছলছলচক্ষে, কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু? সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু এ পৃথিবীতে কি আছে বলিয়া দিন, আমি যেরূপে—যেমন করিয়া পারি, আনিয়া দিব।”

স্বর্গাধিপতি ঈষৎ হাস্যে উত্তর করিলেন,—“না,—তা হইবে না; সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু—কি, বলিয়া দিব না। সেইটি সংগ্রহ করাই তোমার কার্য্য এবং এই নির্ব্বাচন টুকুই তোমার পরীক্ষা।”

অভাগিনী পরী, অনেক অনুনয় বিনয় করিল; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি, জানিতে অনেক কাকুতি মিনতি করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,—“পরী, কেন তুমি বৃথা অনুনয়-বিনয় করিতেছ? নিরর্থক কালহরণ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন থাকিলে, তোমারই সমূহ ক্ষতি। অতএব যাও,—সংসারের প্রত্যেকস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখ,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু—কি এবং বিধিমতে তাহার পরীক্ষা কর। অতঃপর সফল মনোরথ হইয়া, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।”

পরী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—“পরীক্ষাত আপনি গ্রহণ করিবেন। কোন্ স্থানে আপনাকে—”

স্বর্গাধিপতি বাধা দিয়া কহিলেন,—“আমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে না। এই স্বর্গ-দ্বারই তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিবে।

কথা শুনিয়া পরী বিস্মিতার ন্যায় চাহিয়া রহিল ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,—“আশ্চর্য্য হইতেছ? হাঁ—তুমি সংসারের সার বস্তু আনয়ন করিলেই এই স্বর্গদ্বার আপনি উদ্ঘাটিত হইবে; অন্যথা সহস্র চেষ্টায়ও তুমি সফলকাম হইতে পারিবে না,—কিছুতেই এ পুণ্যদ্বার খুলিবে না।

বৃথা বাক্যব্যয়ে কিছু হইবে না বুঝিয়া পরী বিধাতাপুরুষের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। স্বর্গপ্রাপ্তির আশায়, প্রাণপণে ঐকান্তিক যত্নে, দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে একে একে গ্রাম, নগর, দেশ, জনপদ, অরণ্য, প্রান্তর—সর্ব্বস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারবস্তু কোথায়, মিলিতে পারে।

দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ, একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। প্রতিবাসী আত্মীয়গণ সকলেই অগ্নি নির্ব্বানের চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু প্রাণভয়ে, কেহ গৃহ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেই অগ্নিময় গৃহে গৃহস্থের একটি শিশু-সন্তান নিদ্রা যাইতেছিল। শিশুটি মাতৃহারা। পিতাও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে। এ অবস্থায়,

সকলেই মুখে 'হা—হুতাশ' করিতে লাগিল,—হায়, কিরূপে শিশুটির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে! বারংবার এই কথা শুনিয়া, এক অসমসাহসী দয়াবান্ যুবা, প্রাণের মমতা ত্যাগ করতঃ, সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রিত শিশুকে, দগ্ধহীন অক্ষত শরীরে বাহিরে আনয়ন করিল। চারিদিক হইতে অমনি 'সাধু,' 'সাধু' রব পড়িয়া গেল। কিন্তু হায়, সেই সাধুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, মহা পরোপকারী, উদারহৃদয় যুবকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। জ্বলন্ত আগুনের তীব্র জ্বালাময় উত্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া দেবচরিত্র যুবক প্রাণত্যাগ করিল। পরী অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল। যাই যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অমনি ব্যাকুল হৃদয়ে পরী তাহার আত্মা লইয়া অনন্তধামে চলিল। ভাবিল, "পরার্থে যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তাহার তুল্য মহৎ আর কে আছে? অতএব এই যুবকের আত্মাই পৃথিবীর সার দ্রব্য।"

আনন্দিত হইয়া পরী, গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল। কিন্তু হায়, তাহার বাসনা পুরিল না,—স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না।

পরী মনে মনে ভাবিল,—"একি! এমন মহাদ্রব্যের সংস্পর্শেও স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না? দেখি, ইহা অপেক্ষা আরও কি সারদ্রব্য পৃথিবীতে মিলিতে পারে?"

আর একদিন পরী দেখিল,—এক মহাশ্মশানে এক শবদেহ দাহ হইতেছে, পার্শ্বে আর একটি চিতা সজ্জিত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শব নাই। ক্ষণেক পরে চিতা অগ্নিস্পৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে একটি অনুপমা মোহিনীমূর্ত্তি, সেই প্রজ্জ্বলিত চিতাকুণ্ডে আরোহণ করিল। অমনি চারিদিক হইতে মাঙ্গলিক শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পতি বিরহে সতী সহমরণে গমন করিল। পাতিব্রত্যের এ উদ্দাম ভাবপূর্ণ করুণ দৃশ্য দেখিয়া পরীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিল, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে আর কি হইতে পারে? অমনি সাগ্রহে সানন্দচিত্তে সেই সতী নারীর পুণ্যাত্মা লইয়া, পরী তাহার অভীপ্সিত পথে গমন করিল। কিন্তু একি,—এবারও সে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। পরী ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিল,—"একি, বিধাতাপুরুষ আমাকে ছলনা করিলেন নাকি? এমন অনুপমা পতিপ্রেমও কি পৃথিবীর সারবস্তু নহে?"

আর একদিন আর এক দৃশ্যে, পরী আশ্বাসিতা হইল। ভাবিল, এইবার নিশ্চয়ই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। দেখিল, * * * দেশে সমরানল জ্বলিয়াছে। শত সহস্র যুদ্ধার্থী বীরপুরুষ, প্রাণের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, স্বদেশ রক্ষার্থে ব্রতী হইয়াছে। বিপক্ষপক্ষও অমিত বল-বিক্রমে, যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইল। স্বদেশ রক্ষায়, সর্ব্বপ্রথমেই যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন, পরী সেই মহাপুরুষের মহদাত্মা লইয়া গন্তব্যস্থানে পঁহুছিল। কিন্তু হায়, এবারও সে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না।

বারবার নিরাশা হইয়াও স্বর্গাভিলাষিণী পরী, পশ্চাৎপদ হইল না। এইরূপ এক এক করিয়া অনেক পরীক্ষা করিল; পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার দ্রব্য অন্বেষণে বহু পন্থার অনুসরণ করিল;

অবস্থিতি করিতে পার, যদি একটি কায কর।"

অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় আছে শুনিয়া, দুর্ভাগাবতী পরী, দেহে প্রাণ পাইল। আশ্বস্ত হৃদয়ে, ব্যাকুলভাবে কহিল,—"দেব, কি কর্ম্ম করিতে হইবে বলুন; আমি প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

স্বর্গের অধীশ্বর কহিলেন,—"দেখ, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু যদি তুমি লইয়া আসিতে পার, তবে তোমার পুনরায় স্বর্গলাভ হইবে; নচেৎ ইহজীবনে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া পরী ছলছলচক্ষে, কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু? সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু এ পৃথিবীতে কি আছে বলিয়া দিন, আমি যেরূপে—যেমন করিয়া পারি, আনিয়া দিব।"

স্বর্গাধিপতি ঈষৎ হাস্যে উত্তর করিলেন,—"না,—তা হইবে না; সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু—কি, বলিয়া দিব না। সেইটি সংগ্রহ করাই তোমার কার্য্য এবং এই নির্ব্বাচন টুকুই তোমার পরীক্ষা।"

অভাগিনী পরী, অনেক অনুনয় বিনয় করিল; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি, জানিতে অনেক কাকুতি মিনতি করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,—"পরী, কেন তুমি বৃথা অনুনয় বিনয় করিতেছ? নিরর্থক কালহরণ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন থাকিলে, তোমারই সমূহ ক্ষতি। অতএব যাও,—সংসারের প্রত্যেকস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখ,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু—কি এবং বিধিমতে তাহার পরীক্ষা কর। অতঃপর সফল মনোরথ হইয়া, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।"

পরী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"পরীক্ষাত আপনি গ্রহণ করিবেন। কোন্ স্থানে আপনাকে—"

স্বর্গাধিপতি বাধা দিয়া কহিলেন,—"আমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে না। এই স্বর্গ-দ্বারই তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিবে।

কথা শুনিয়া পরী বিস্মিতার ন্যায় চাহিয়া রহিল ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,—"আশ্চর্য্য হইতেছ? হাঁ—তুমি সংসারের সার বস্তু আনয়ন করিলেই এই স্বর্গদ্বার আপনি উদ্ঘাটিত হইবে; অন্যথা সহস্র চেষ্টায়ও তুমি সফলকাম হইতে পারিবে না,—কিছুতেই এ পুণ্যদ্বার খুলিবে না।

বৃথা বাক্যব্যয়ে কিছু হইবে না বুঝিয়া পরী বিধাতাপুরুষের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। স্বর্গপ্রাপ্তির আশায়, প্রাণপণে ঐকান্তিক যত্নে, দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে একে একে গ্রাম, নগর, দেশ, জনপদ, অরণ্য, প্রান্তর—সর্ব্বস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারবস্তু কোথায়, মিলিতে পারে।

দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ, একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। প্রতিবাসী আত্মীয়গণ সকলেই অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু প্রাণভয়ে, কেহ গৃহ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেই অগ্নিময় গৃহে গৃহস্থের একটি শিশু সন্তান নিদ্রা যাইতেছিল। শিশুটি মাতৃহারা। পিতাও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে। এ অবস্থায়,

সকলেই মুখে 'হা—হুতাশ' করিতে লাগিল,—হায়, কিরূপে শিশুটির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে! বারংবার এই কথা শুনিয়া, এক অসমসাহসী দয়াবান্ যুবা, প্রাণের মমতা ত্যাগ করতঃ, সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিল এবং অনতি-বিলম্বে নিদ্রিত শিশুকে, দগ্ধহীন অক্ষত শরীরে বাহিরে আনয়ন করিল। চারিদিক হইতে অমনি 'সাধু,' 'সাধু' রব পড়িয়া গেল। কিন্তু হায়, সেই সাধু-বাদের সঙ্গে সঙ্গে, মহা পরোপকারী, উদারহৃদয় যুবকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। জ্বলন্ত আগুনের তীব্র জ্বালাময় উত্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া দেবচরিত্র যুবক প্রাণত্যাগ করিল। পরী অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল। যাই যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অমনি ব্যাকুল হৃদয়ে পরী তাহার আত্মা লইয়া অনন্তধামে চলিল। ভাবিল, "পরার্থে যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তাহার তুলা মহৎ আর কে আছে? অতএব এই যুবকের আত্মাই পৃথিবীর সার দ্রব্য।"

আনন্দিত হইয়া পরী, গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল। কিন্তু হায়, তাহার বাসনা পুরিল না,—স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না।

পরী মনে মনে ভাবিল,—"একি! এমন মহাদ্রব্যের সংস্পর্শেও স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না? দেখি, ইহা অপেক্ষা আরও কি সারদ্রব্য পৃথিবীতে মিলিতে পারে?"

আর একদিন পরী দেখিল,—এক মহাশ্মশানে এক শবদেহ দাহ হইতেছে, পার্শ্বে আর একটি চিতা সজ্জিত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শব নাই। ক্ষণেক পরে চিতা অগ্নিস্পৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে একটি অনুপমা মোহিনীমূর্ত্তি, সেই প্রজ্জ্বলিত চিতাকুণ্ডে আরোহণ করিল। অমনি চারিদিক হইতে মাঙ্গলিক শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পতি বিরহে সতী সহমরণে গমন করিল। পাতিব্রত্যের এ উদ্দাম ভাবপূর্ণ করুণ দৃশ্য দেখিয়া পরীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিল, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে আর কি হইতে পারে? অমনি সাগ্রহে সানন্দচিত্তে সেই সতী নারীর পুণ্যাত্মা লইয়া, পরী তাহার অভীপ্সিত পথে গমন করিল। কিন্তু একি,—এবারও সে স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না। পরী ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিল,—"একি, বিধাতাপুরুষ আমাকে ছলনা করিলেন নাকি? এমন অনুপমা পতি-প্রেমও কি পৃথিবীর সারবস্তু নহে?"

আর একদিন আর এক দৃশ্যে, পরী আশ্বাসিতা হইল। ভাবিল, এইবার নিশ্চয়ই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। দেখিল, * * * দেশে সমরানল জ্বলিয়াছে। শত সহস্র যুদ্ধার্থী বীরপুরুষ, প্রাণের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, স্বদেশ রক্ষার্থে ব্রতী হইয়াছে। বিপক্ষ-পক্ষও অমিত বল বিক্রমে, যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইল। স্বদেশ রক্ষায়, সর্ব্বপ্রথমেই যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন, পরী সেই মহাপুরুষের মহদাত্মা লইয়া গন্তব্য-স্থানে পঁহুছিল। কিন্তু হায়, এবারও সে স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না।

বারবার নিরাশা হইয়াও স্বর্গাভি-লাষিণী পরী, পশ্চাৎপদ হইল না। এই-রূপ এক এক করিয়া অনেক পরীক্ষা করিল; পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার দ্রব্য অন্বেষণে বহু পন্থার অনুসরণ করিল;

কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না।

একদিন, এক নগরোপকণ্ঠের এক নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে, গোধূলি সময়ে পরী গালে হাত দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, মনোহর সরসীতীরে, সুস্নিগ্ধ শ্বেত প্রস্তর সোপানে বসিয়া একটি সুন্দর বালক নিমীলিত নেত্রে, নিবিষ্টচিত্তে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভগবানের ধ্যান করিতেছে, আর তার অনতিদূরে এক অশিতীবর্ষের পক্ককেশশ্মশ্রু বিশিষ্ট বৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়া, প্রেমে পুলকিত হইয়া মনে মনে কহিলেন,—"আহা, এ দুগ্ধপোষ্য শিশুর হৃদয়ে ভগবান এত প্রেম দিয়াছেন, আর আমি বার্দ্ধক্য দশায় পতিত হইয়াছি, শমন, শিয়রে সমুপস্থিত, আমি সে পতিতপাবনকে ভুলিয়া আছি। দীননাথ, কত দিনে এ দীনের প্রতি সদয় হইবেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অশ্রুকোণে একবিন্দু প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। এ দৃশ্য দেখিবামাত্র পরী ত্বরিত পদে তথায় উপনীত হইল এবং মায়াবলে, অলক্ষ্যে সেই প্রেমাশ্রুটুকু লইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

হরি হরি!! পরী স্বর্গদ্বারে উপনীত হইবামাত্র, এবার সে স্বর্গদ্বার আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইল। অমনি শত শত স্ত্রীপুরুষ আসিয়া পরীকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বয়ং স্বর্গাধিপতি বিধাতাপুরুষ আসিয়া হাসিমুখে, মহাসমারোহে, পরীকে স্বর্গধামে লইয়া গেলেন। কহিলেন, —"পরী, তুমি যে যে দ্রব্য আনিয়াছিলে, সকলই মূল্যবান্ বটে; কিন্তু "প্রেমাশ্রু" তুল্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারবস্তু পৃথিবীতে আর নাই। কারণ, প্রেমিকের এক বিন্দু অশ্রুপাতে পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ও ঘটিতে পারে।"

বস্তুতঃ প্রেমাশ্রুর তুল্য, মহার্ঘ, পবিত্র, পুণ্যময় তীর্থ আর নাই।"

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লিখিতে হইলে প্রথমতঃ তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই স্থির করিতে হয়। আমাদিগের পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত সমূহের কাল নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, তখন এখনকার শকাদির প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে পুরাণে মহাভারতের দুই একটি ঘটনার কাল নির্ণয় করাতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল নির্ণয় কিছু সহজ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে এবং বিষ্ণু পুরাণে প্রায় একরূপই প্রণালীতে ঐ কালের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থাংশের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে লিখিত আছে:—

"সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন দ্বিজোত্তম॥"

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে নৈঋতকোণস্থ পুলহ এবং ক্রতু নামে যে দুইটি তারা প্রথমে উদিত হয়, তাহার মধ্যস্থলে দক্ষিণোত্তর রেখার সমদেশ অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের এক একটি নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। ঐ এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসর ধরিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। রাজা পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নামক নক্ষত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদনুসারে রাজতরঙ্গিণী প্রণেতা কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রায়স্তৃতীয়গোনর্দ্দাদারভ্য শরদাং তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ম্‌॥
বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড়ভিশ্চ সংযুতঃ॥"

গোনদ্দের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের রাজত্বকাল ১২৬৬ বৎসর, তৃতীয় গোনদ্দের সময় হইতে অতীত ২,৩৩০ বৎসর, তদুভয়ের সমষ্টি, ৩,৫৯৬। এইটি কহ্লনের গণিতকাল। কহ্লনের সময় হইতে ৭৫৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং সম্প্রতি ৪৩৪০ মহাভারতের বা রাজা পরীক্ষিতের সময়। এই গণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল ন্যূনাধিক ৪৪৪০ বৎসর।

শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য সকল বা চরিত্র সাধারণ লোকের কার্য্য বা চরিত্রের অনুরূপ নহে। তাঁহার বাল্যলীলা হইতেই তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগের ঐ অনিচ্ছার কারণ, মহাভারতে ঐ বাল্যলীলার বিস্তৃত বিবরণের অভাব। মহাভারতে বিস্তৃত বিবরণ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র উপেক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহার চরিত্র অলোক সাধারণ, বাল্যকালে তাঁহার সেই চরিত্রের যে, কিছু আভাস না থাকিবে, এরূপ হইতেই পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই ঃ—

ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—শূরসেন নামে নরপতি মথুরাপুরীতে বাস করিতেন। ঐ সময় হইতেই মথুরানগরী যাদবগণের রাজধানী হয়। এই শূরসেনের বংশেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব জন্ম গ্রহণ করেন। বসুদেব ঐ বংশীয় দেবকের কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কংস যদুবংশের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংসের পিতা উগ্রসেন ও দেবক, ইহাঁরা দুই সহোদর। দেবকীর বিবাহের সময় উগ্রসেন বর্ত্তমান থাকিলেও কংস, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিতেছিলেন। এই কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। সৌভপতির ঔরসে উগ্রসেন পত্নীর গর্ভে কংসের জন্ম হয়। কংস ন্যায়তঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। দেবকীর পুত্রই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ফলতঃ ইহা জানিয়াই দুরাত্মা কংস পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করে। সে যাহা হউক, নির্ব্বোধ কংস পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের সারথ্যে নিযুক্ত হয়। পথিমধ্যে এই দৈববাণী শ্রবণ করে, সে যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাহাকে বিনাশ

করিবে। এই দৈববাণী শ্রবণে কংসের চৈতন্য হইল। দুরাত্মা তখনই ভগিনীর সংহারে উদ্যত হইল। বসুদেব তৎকালে নানা প্রকারে তাহার সান্ত্বনার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই সফল মনোরথ না হইয়া পরিশেষে দেবকীগর্ত্তজাত সমস্ত সন্তান তাহাকে অর্পণ করিবেন বলিয়া পত্নীর প্রাণ রক্ষা করেন। কংস তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু পরে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেবকীর সহিত পিতার ন্যায় কারারুদ্ধ করে। ঐ কারাগারে মধ্যেই দেবকীর গর্ব্ভে উপর্য্যুপরি ছয়টি পুত্র জন্মে। কংস একে একে তাহাদিগেব সকলগুলিকেই সংহার করে। কথিত আছে, দেবকীর এই ছয়টি পুত্র হিরণ্যকশিপুর পৌত্র, পিতামহের শাপে এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করে। দেবকীব সপ্তম গর্ব্ভে বলরামের জন্ম হয়। ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক এই সপ্তম গর্ভ বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ব্ভে সন্নিবেশিত হয়। রোহিণী বৃন্দাবনে নন্দগোপের আলয়ে বাস করিতেছিলেন। কংসের দৌরাত্ম্যই তাঁহার প্রবাসের কারণ। গোপরাজ নন্দের সহিত বসুদেবের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। বসুদেবের পিতার বৈমাত্রেয়ের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ব্ভে নন্দের জন্ম হয়। এই গোপরাজের আবাসেই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা সমাহিত হইয়াছিল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নিশীথে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। পিতা বসুদেব দেবকীর সহিত পুত্রের অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহার বিস্তর স্তবস্তুতিও করেন। কিন্তু পরিশেষে পরমেশ্বরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রভো! তোমার এই অলৌকিকরূপ উপসংহার কর। এবং দুরাত্মা কংস যাহাতে আমাদিগের হইতে তোমার জন্ম না জানিতে পারে, তাহার উপায় কর। শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে প্রাকৃত বালকের রূপধারণ করিয়া তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিতে বলেন। তৎকালে ভগবানের আবির্ভাব অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত ঐ কারাগৃহ মধ্যে ব্রহ্মশিবাদি দেবগণেরও আগমন হইয়াছিল, এরূপ লিখিত আছে।

সে যাহা হউক, ভগবানের কারাগারের প্রহরী সকল নিদ্রিত ও দ্বারাদি উন্মুক্ত হইলে, বসুদেব সদ্যোজাত তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া অগাধ সলিলা যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং নিদ্রিত যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে লইয়া পুনর্ব্বার কারাগৃহে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে থাকেন। তৎকালে যে কিছু অলৌকিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সকলই ভগবানের ইচ্ছানুসারে জানিতে হইবে।

এদিকে দ্বাররক্ষকগণ জাগরিত হইয়া দেবকীর সূতিকাগৃহে কন্যার রোদনধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক সত্বর কংসের নিকট উক্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কংস তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই কন্যাটিকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু দৈবগতিকে নৃশংস আচরণে অসমর্থ হইয়া ভগিনী ও ভাগিনীপতিকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তৎকালে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই কংস তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদ-

র্শন করিয়াছিল। ভাগবন্মায়াই ইহারও কারণ। দুরাত্মা কংস পরদিন প্রভাতে নিজ দুষ্ট মন্ত্রিগণের নিকট রাত্রিবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তাহারা কংসকে অধিকতর পাপানুষ্ঠানে পরামর্শ প্রদান করিল। তদবধি সদ্যোজাত শিশু সকলের সংহার এবং গোব্রাহ্মণদিগের হিংসার ব্যবস্থা ঘোষিত ও অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে নীত হইয়া গোপগোপীবৃন্দের আনন্দোৎসবের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনলীলা। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি লীলাই সম্পাদন করেন। তাঁহার তত্রত্য সমুদায় লীলাই অলৌকিক ও রহস্যময়। অলৌকিক ও রহস্যময় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সমালোচকগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই তাঁহার ঐ সকল লীলাকে কবিকল্পনা প্রসূত বলিয়া শ্রদ্ধাবিহীন হয়েন। আমরা বলি, কেবল শ্রীবৃন্দাবন লীলা কেন,তাঁহার জন্ম হইতে যদুকুলধ্বংস পর্য্যন্ত সকল লীলাই ঐরূপ। উহার একটিও লৌকিক বা রহস্যশূন্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের অবতারের যদি সত্যতা থাকে, শ্রীকৃষ্ণের লীলার যদি কোন অংশ স্বীকার করিতে হয়, তবে উহার কোনটিকেই কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের লীলাও যদি মনুষ্যের ন্যায় লৌকিক ও রহস্যরহিত হয়, তবে জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ কি থাকিল! ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা কি লৌকিক ও রহস্যশূন্য! তাঁহার এই বিশ্বসৃষ্টি যদি লৌকিক ও রহস্যবিরহিত না হয়, তবে তাঁহার পালনরূপ লীলাও অবশ্য অলৌকিক ও রহস্যময় হইবেই হইবে।

এই লীলারহস্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব বিচারের প্রয়োজন হইতেছে। কারণ, ঐ অবতারতত্ত্ব বিচারিত হইলেই লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিবে। ঈশ্বরের অবতারের উপরই তাঁহার লীলা সকল নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অবতার সম্ভব কি না? যদি অবতার সম্ভবই হয়, তবে ঐ অবতার কাহাকে বলে এবং তাঁহার অবতারের প্রয়োজনই বা কি, ইহাও দেখিতে হইবে। ফলতঃ এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা হইলেই লীলাসম্বন্ধীয় নিখিল প্রশ্নই আপনা আপনি মীমাংসিত হইয়া আসিবে।

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খৃষ্টীয়গণের—সমস্ত ইউরোপবাসীর তীর্থস্থান জেরুজেলাম মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ১১৮৯ খৃঃ অব্দে হেনরীর তৃতীয় পুত্র রিচার্ড সিংহাসনাধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল দশ বৎসর ইংলণ্ডের সিংহাসন শূন্য পড়িয়াছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে দুইবারমাত্র তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তাহাও কেবলমাত্র কতিপয় ইংরাজের রোষ কষায়িত লোচনের ভ্রুকুটীভঙ্গে এই ভ্রুকুটীর তীব্র জ্বালাতেই প্রবল ব্রহ্মদেশ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত। শ্যামের শুভাদৃষ্ট যে ইংরাজের শ্যাম গ্রহণের অভিলাষ জন্মে নাই। ব্রহ্মের দুরদৃষ্ট উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, মিতাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরিণত অবস্থায় পররাজ্য গ্রাসতৃপ্ত ইংরাজের মেষমস্তিষ্ক ভক্ষণের স্বাদ জন্মিয়াছিল।

ত্রিয়োরির প্রথম যুদ্ধে রণক্ষেত্রে পরাভূত ও আহত মহম্মদ ঘোরী আঘাত হইতে যদি মুক্তিলাভ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতকে যবনকবলে আর পড়িতে হইত না। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আফগান মহারাষ্ট্রীয়ের সংঘর্ষণে উদ্ধত সদাশিবের কুনীতি প্রণোদিত মহারাষ্ট্র চমূর অকারণ ধ্বংস যদি না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ছয় শতাব্দী পরে দিল্লীর সিংহাসন আবার হিন্দুরাজা বক্ষে ধারণ করিত; ইংরাজকে বণিকবেশেই বোধ হয় ভারতে চির অবস্থান করিতে হইত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইংরাজ-ফরাসীযুদ্ধে আইরিস্ বিদ্রোহীগণের সহায়তায় প্রেরিত ফরাসী রণতরী প্রবল বাত্যায় যদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আজ ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত না (১)। কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতের ভীষণ ঘর্ঘর প্রদেশে তুষাররাশী মধ্যে নেপোলিয়নের অক্ষৌহিণী সেনার যদি জীবন্ত সমাধি না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় মহাবীর ওয়েলিংটনকে ওয়াটারলু সমরক্ষেত্রের সন্নিধানেও উপস্থিত হইতে হইত না।

নিয়তি মনুষ্যের অধীন নহে মনুষ্যই নিয়তির অধীন এই ভাগ্য চক্রে পড়িয়া মানবকুল নিয়তই ঘুরিতেছে আজি যাহা অসম্ভব কালি তাহা সম্ভব কালি যাহা

(১) তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে পিটের মন্ত্রীত্ব সময়ে আয়রল্যাণ্ডবাসীগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। বিদ্রোহীগণ ফরাসীর সহায়তা প্রার্থনা করিলে ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সাইত্রিশখানি ফরাসী রণতরী পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য বক্ষে করিয়া আয়রল্যাণ্ডের উপকূল উদ্দেশে অভিযান করে। আসিতে আসিতে মধ্যপথে সেই সকল রণতরীর একখানি ঘোর অন্ধকারে জলমগ্ন হইয়া যায়, কতকগুলি ঝড়ে বিপরীতদিকে পরিচালিত হয়। পোতাধ্যক্ষ হক আয়রর্ল্যাণ্ডে পৌছিতে পারেন নাই

সম্ভব ছিল আজি অসম্ভব দাঁড়াইয়াছে। মনুষ্য আপন ক্ষমতা বলে ভবিষ্যতের উপর আধিপত্য করিতে পারে না মহাপুরুষ নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করিতেন।

রিচার্ড এই দশ বৎসরের মধ্যে দুইবারমাত্র ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তাহাও কেবলমাত্র কতিপয় মাসের জন্য। এই দশবৎসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি মুসলমানগণের হস্ত হইতে জেরুজেলাম উদ্ধারের জন্য তুরস্ক দেশে মুসলমানরাজ সালাদিনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; ইংলণ্ডে ফিরিতে পারেন নাই। অসাধারণ বীর, ঔপন্যাসিক বলবান, উদ্ধত ও গর্ব্বিত রিচার্ড সমরক্ষেত্রেরই উপযুক্ত ছিলেন। রাজার তৃতীয় পুত্র বলিয়া, দ্বিতীয় হেনরীর ফ্রান্সস্থ অধিকারগুলির শাসনকার্য্যে উপযোগী হইবার জন্য বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞানশূন্য, নীচমনা, অর্থলোভী তিনি রাজসিংহাসনের উপযোগী ছিলেন না। এমন রাজা দেশে থাকিলে প্রজাগণের সহস্র নৈতিক ধর্ম্মাচ্ছাদনেও দেশের শান্তি, প্রজার মঙ্গল রক্ষিত হইত না। দৈবানুগ্রহে রিচার্ডের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সিংহাসন দশ বৎসরের জন্য শূন্য ছিল। রাজ্যে রাজা ছিল না, অথচ দেশ অরাজক হয় নাই। সুতরাং এই সময় হইতেই ইংলণ্ডবাসীগণের অবস্থা উন্নতির দিকেই পরিবর্ত্তিত হয়।

ইংলণ্ডের শূন্য সিংহাসন
১১৮৯-১১৯৯ খৃঃ অব্দ

প্রথম হেনরীর রাজত্বকালেই ইংলণ্ডে জাতীয়তার সূত্রপাত হয়। রাজা নিজেই স্যাক্সন রমণীর পাণিগ্রহণ করতঃ ইংলণ্ডীয় হইয়াছিলেন। তাহার উপর উচ্ছৃঙ্খল ওমরাহগণের অধিকাংশকেই অধিকারচ্যুত করিয়া এবং তত্তৎপদে মধ্যবিত্ত নরম্যানগণকে অধিষ্ঠিত করিয়া তিনি অজ্ঞাতে দেশমধ্যে জাতীয়তার বীজ বপন করেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রজাদিগের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। দুইটী কারণ—প্রথমতঃ, বিদেশীয় হইলেও স্যাকসনগণের সহিত নরম্যানগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরস্পরের সহিত সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কাহারও আপত্তি ছিলনা। অনেক নরম্যান, স্যাক্সন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্যাক্সন কুটুম্বসদনে গৃহবাসী হইয়াছিল। অনেক স্যাক্সন, বিজেতা নরম্যানকে কন্যাদান করিয়া গৃহরাজত্বে জামাতার উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। গৃহবিসম্বাদে অনেক নরম্যান পুত্র পিতৃপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মাতুল মাতামহের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, অতিসম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ প্রথম উইলিয়মের সহিত আসিয়া রাজাকে শ্রেষ্ঠাংশ প্রদান করিয়া রাজ্যের অবশিষ্টাংশ যেমন আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল, মধ্যবিত্ত নরম্যানগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তাহাদিগের অধিকাংশই রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। রাজা ও জমীদারদিগের সহিত প্রজাগণের সাক্ষাত সম্বন্ধ কোনকালেই বড় একটা থাকেনা। তখনও যে ছিলনা একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং রাজকর্ম্মচারী-মধ্যবিত্ত নরম্যানগণের সহিত প্রজাগণের কতকটা ঘনি-

জাতীয়তার
সূত্রপাত

ষ্ঠতা সংঘটিত হইয়াছিল (১) বিশেষতঃ স্বদেশে তাহাদের কোনও ভুম্যধিকার ছিলনা। কাজেই নূতন কুটুম্বের মধ্যস্থলে আসিয়া রাজানুগ্রহে ভূমিভোগের অধিকারী হইয়া নবসৃষ্ট ওমরাহ সম্প্রদায় প্রায় সম্পূর্ণই ইংলণ্ডীয় হইয়া গেল।

দ্বিতীয় হেনরী অবশিষ্ট জমীদারবর্গের দুর্গ সকল ভগ্ন করিয়া দিয়া তাহাদিগের বল অপহরণ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বল হইয়া তাহারা প্রজাপীড়নে সাহস করে নাই। পরন্তু রাজার অনুগ্রহ হারাইয়া, সম্ভ্রম ও স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য তাহারা প্রজাগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল।

প্রথম উইলিয়মের ইংলণ্ড বিজয়ের পর শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে শত বৎসরের অধিষ্ঠিত নরম্যান—ভয়ে, মিত্রতায়, সম্বন্ধবন্ধনে, রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদনে, বিজিতদিগের সহিত সম্মিলিত, নরম্যান আর বিদেশীয় নাই। নিতান্ত বৃদ্ধ ব্যতীত বিজেতা বংশধরের পূর্ব্ব জন্মভূমির কথা আর মনেই পড়ে না। সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, দূরে, সন্নিকটে,—নরম্যানসন্তান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আত্মীয় স্বজন দেখিতে পায়। কি দিবস, কি রাত্রি, সকল সময়েই সেই আজন্ম দৃষ্ট প্রতিবেশিগণের সহিত, আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, আনন্দ উপভোগ করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে ক্রোধ প্রকাশে, বিশেষ প্রয়োজন হইলে বিবাদ বিসম্বাদে, তাহাদিগের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া মনের বেগ দমন করিতে হয়। তাহারা কে? আজন্ম সম্মিলিত, বাল্যের বন্ধু, যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্বী, বার্দ্ধক্যের অনুচর চতুর্দ্দিকস্থ জন সাধারণ—ইহারা কোথা হইতে আসিল? প্রতিবেশিগণ তাহাদের দেশে আসিয়াছে কিম্বা তাহারা প্রতিবেশিদিগের দেশে আসিয়াছে, এই কথা ইতিহাসানভিজ্ঞ নরম্যানের মনে উদিত হইবার সময় আসিয়াছিল। অনুসন্ধিৎসুর মানসে এই প্রশ্ন সমুদিত হইবার শুদ্ধ একটীমাত্র কারণ ছিল। নরম্যান-স্যাকসন সম্মিলনের সহিত, তখনও ভাষা সম্মিলন হয় নাই। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর নরম্যানগণের ভাষার সহিত স্যাকসনগণের ভাষা কিয়ৎপরিমাণে বিজড়িত হইলেও সম্ভ্রান্ত নরম্যানগণের ভাষা তখনও সম্পূর্ণ বিদেশীয় ছিল। সম্ভ্রান্তগণ ফরাসী ভাষায়, মধ্যবিত্ত নরম্যান ও স্যাকসন মিশ্রিত ভাষায় ও নিম্নশ্রেণীর স্যাকসনগণ, (তাহাদের সহিত নরম্যানদিগের ঘণিষ্ঠতা অল্পই ছিল) স্যাকসন ভাষায় কথা কহিত। কিন্তু ভাষা সম্মিলন না হইলেও কোনও নরম্যান আর আপনাকে বিশুদ্ধ নরম্যান বলিতে পারিত না। প্রতি নরম্যান শরীরেই অল্পবিস্তর স্যাকসন শোণিত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে নরম্যানগণ প্রতিবেশি স্যাক্সনগণের সহিত সামাজিক কার্য্যে

(১) মধ্যবিত্ত নরম্যানগণের অনেকেই সেরিফের পদে নিযুক্ত হন। সেরিফের কার্য্য, আমাদের দেশে জমীদারের নায়েবের মত। তাঁহারা পরগণা সম্বন্ধে প্রধান রাজকর্ম্মচারী। রাজস্ব আদায়ের ভার ও গ্রামস্থ মাতব্বর লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তির ভার, তাঁহাদেরই উপরে থাকিত।

যোগদান করিতে লাগিল (১) ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য পঞ্চায়তে তাহারা স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজকার্য্য এখন আর সকল নরম্যানের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। ইংলণ্ডে কিছুকালের জন্য রাজ সরকারের কাজ করিয়া এখনকার ভারতীয় ইংরাজের মত, তখনকার রাজার আত্মীয় কুটুম্বগণ, স্বদেশীয়গণ, আর দেশে ফিরিয়া যাইত না। কিছুকাল পরেই বিদেশীয়দিগের সন্ততি এত বৃদ্ধি পাইল যে সকলের আর রাজ সরকারে স্থান হয় না। অনেকেই ভূমি কর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। বিজেতা বিজিতের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। করনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে, অনেক নরম্যান এখন প্রতিবেশি স্যাকসনগণের সহিত, প্রতিবাদের প্রয়োজন হইলে, একবাক্যে প্রতিবাদ করিতে লাগিল। প্রয়োজন না হইলে, তাহাদের সহিত একবাক্যে মত দিতে লাগিল। করভারে প্রপীড়িত হইলে, অনেক নরম্যান, গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভা স্যাকসন মণ্ডলের কাছে আসিয়া প্রতিকারের জন্য পরামর্শ জানিতে আসিতে লাগিল। বিজেতা বিজিতের মধ্যে [illegible] ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রাজশক্তি সংস্থাপিত হইলেও তখনও প্রজাগণের, নরম্যানই হউক কিম্বা স্যাক্সনই হউক, কাহারও রাজকার্য্যে প্রতিবাদ করিবার সাহস জন্মে নাই। অথচ জাতির অভ্যুদয়ে কোনও দেশ উন্নতির পক্ষে অগ্রসর না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। দেশবাসীগণ রাজার নিকট হইতে স্বত্বক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম হেনরীর রাজত্বকালেই অনেক বার্দ্ধিষ্ণু নগর রাজার নিকট স্বত্বক্রয় করিতে আরম্ভ করে। লণ্ডন নগর সেরিফ ও বিচারপতি মনোনীত করিতে অনুমতি পাইল। ব্যবসায় কর হইতে অব্যাহতি পাইল। আর অনুমতি পাইল যে লণ্ডন নগর-বাসী লণ্ডনস্থ বিচারালয় ভিন্ন অন্য কোন বিচারালয়ে নীত হইবে না।

দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্ব কালে, মঙ্গল কামনায় প্রজামণ্ডলীকে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। সদাশয় নীতিজ্ঞ নৃপতি আপনা হইতেই সুবিধি প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীগণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হন। প্রজাগণ বড় সুখেই তাঁহার রাজত্ব কাল অতিবাহিত করে। ষ্টিফেনের রাজত্ব কালে ধন, মান, প্রাণ লইয়া সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ১১৫৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সকলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ অনুভব করিয়া সে লোভ আর সম্বরণ করিতে পারিল না।

রিচার্ডের অবকাশে প্রজাগণ রাজার ঘর হইতে সযত্ন রক্ষিত স্বাধীনতার পেটিকাটী হইতে সেই অমূল্য রত্ন বাহির করিতে হস্ত প্রসারণ করিল।

(১) স্যাকসনগণের রাজত্বকালে এক শত খানি ক্ষুদ্রগ্রাম একত্র লইয়া এক একটী পরগণা হইত ইংরাজীতে এই পরগণাকে হাণ্ড্রেড বলিত। এইরূপ দুই তিনটী পরগণা একত্র হইলে তাহাকে শায়র অর্থাৎ জিলা বলিত। এক একটী শায়রে এক একটী প্রজাসভা ছিল। তাহাকে শায়র মুট বলিত। এক একটী শায়রে এক একটী সেরিফ থাকিতেন, তিনি উক্তগ্রাম্য পঞ্চায়তের সাহায্যে কর আদায় করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া জমী সংক্রান্ত বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করিতেন। নরম্যানাধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চায়ত উঠিয়া যায়। প্রথম হেনরীর সময়ে প্রজাগণ এই অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

মাদক মঙ্গল।

দুর্ভিক্ষ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যদি নদী জলের সহায়
কোথাও জনমে শস্য হেন দেখা যায়
শুষ্ক মেঘে বসি অকালেতে
ডুবাই সে ক্ষেত্রচয় মুসল ধারেতে
লোকময় করে হাহাকার
কি ধনী কি কৃষি সমগতি সবাকার
শস্যাভাবে অনাহারে মরে
হীরা মণি কাঞ্চন রজত রয় ঘরে
দৈবে খাদ্য রয় ঘরে যার
দুর্গতি অধিক তায় ঘটে আরো তার
বুভুক্ষায় কি পাপ না করে
গ্রামবাসী প্রাণ নাশি শস্য তার হরে
ধরাধামে ভারত যেমন
নয় আর কোন ভূমি সুফলা তেমন
শক্তি তথা জেনেছে আমার
পশ্চিমে পূর্ব্বেতে রাঢ়ে উৎকলে এ..র
ইংরাজের রাজত্ব সময়
বিপুল বাণিজ্যে নাই দুর্ভিক্ষের ভয়
প্রজা এই ভেবেছিল সার
কার সাধ্য নিবারিবে প্রভাব আমার
বিলাতের বড় বড় তরী—
আনে তারা কাঁচ কাষ্ঠ লোহা টীন ভরি
ধান্য সম কোথা পাবে আর
ভারতের শস্যে বাঁচে অর্দ্ধেক ধরার
রাজ বর্গ অন্ধ দল সম
কেহ না দেখিতে পেলে আবির্ভাব মম
বধি প্রজা হেথায় সেথায়
চক্ষু মুদি তবু বলে দুর্ভিক্ষ কোথায়
সুখে তারা বিলাসে বিহরে
আমি প্রজাদলে পশি বধি অকাতরে
হলো সবে নিহত যখন
কে কারে দূষিবে ভেবে না পায় তখন
বড় গাছে ঝড় করে ভর
প্রধান প্রধান দূষী বঙ্গ গবর্ণর
বলি রঙ্গ করেছি যেমন
তৃণ লতা তরু পাতা করিল ভোজন
পেলে পরে কৃমি কীটচয়
মানব জীবন তায় কত দিন রয়
কেহ কভু খায় নাই তাহা
রাঢ়ে আর উৎকলে ক্ষুধায় খেলে যাহা
নর হলো পশুর অধম
অনায়াসে গ্রাসে তুল নদীর কর্দ্দম
দেখে তায় বাঁচে না জীবন
ভক্ষ্য আসে বাস ছাড়ি পলায় তখন
হের তথা নিশি অবসানে
জন শূন্য ঘর, ছিল নগর যেখানে
রক্ত আঁখি জীর্ণ কলেবর
শুষ্ক সরুঃ থাল সম বিশাল উদর
চলে কুপ্ত রাক্ষসের প্রায়
আহারে দেখিলে তার গ্রাস কাড়ি খায়
রবি শশি দেখেনি বদন
নগ্নকায় ধায় হেন কুলবতীগণ
নর জাতি করে অভিমান
দয়াবান নাহি জীবে তাহার সমান
সে গর্ব্ব করেছি আমি ক্ষয়
পুত্র মুখগত গ্রাস মাতা কাড়ি লয়
কেহ হয়ে ক্ষুধায় বিকল
শিশু সুতে বধিল আছাড়ি ধরাতল

কেহ অতি হতাশার ভরে
অপত্যে নদীতে ফেলি ঝাঁপ দিল পরে
কেহ মুষ্টি তণ্ডুলের দায়
বিক্রয় করিল স্বীয় প্রেয়সী জায়ায়
সুকুমারি দ্বিজের কুমারি
আহার কারণ হলো যবনের নারী
দাস দাসি সেবিত তখন
দাসী হয়ে তারা পদ সেবিছে এখন
প্রাণ মান লজ্জাশীল কুল
এ সব সহিত নবে করেছি নির্ম্মূল
শবরাশি শিখরের প্রায়
মাংস বসা রস ঝরে শৃগালে না খায়
দেশময় দুর্গন্ধে পূরিল
কে কাহার তত্ত্ব করে কে কোথা মরিল
বাত্যা শব শকটে বহিল
কাটিয়া দির্ঘীকা শব উৎকলে পুতিল
উৎকলে করেছি যত ক্ষয়
অতিবাদ নয় বলা প্রদেশ প্রলয়
সংগ্রহিলে শবের পঞ্জরে
সেতু বান্ধা হতে পাবে বঙ্গের সাগরে
বাত্যা ব্যাধি বিগ্রহে নিধন
হয় নর রয় তবু স্বভাবে আপন
হেন রঙ্গ কে করে কোথায়
মানবে মানব খায় পিশাচের প্রায়
বাত্যা বল রয় কতক্ষণ
ক্ষণস্থায়ী বাত্যা সম বলে নরগণ
ব্যাধিযোগে ক্রমে ক্ষীণে নরে মরে
অকস্মাত বাত্যায় বিগ্রহে কোপভরে
বিশেষ মরণ আস্বাদন
কে নরে জানায় আর দুর্ভিক্ষ যেমন
জঠরের অনল শিখায়
অস্থি তন্ত্র মজ্জা পচে শোণিত সুকায়
বেঁচে থেকে পায় তার ত্রাণ
নিজ অঙ্গে পূতী গন্ধ শবের সমান
কর কাল অবধান তবে
ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ কি মম সম হবে
তোমার উন্নতি এ প্রকার
উৎকলে গমন মম কারণ তাহার
আছে কি তথায় নর আর
এসেছে অধিক ভাগ আলয়ে তোমার
যদি দিতে চাহ পুরস্কার
আমি ভিন্ন অন্যের না তায় অধিকার
পরাজিযা প্রতিযোগী দলে
গর্ব্বভরে দুর্ভিক্ষ বসিল সভাতলে।

মাদকতা।

ঢুলু ঢলু আঁখি দুটি, ঘুর্ণিত অলসে;
উঠিতে কটির বাস খসে,
পদ্ম দল গত জল, কলেবর, ঢল ঢল,
এলো চুল ভূতল পরশে,
সভায় কামিনী হেন উঠিল সরসে।

মৃদু হাসে গদ গদ ভাবে বামা কয়
জান না আমার পরিচয়
পাপের কুমতি নারি, আমিগো দুহিতা তারি
কুসঙ্গ আমার পতি হয়,
মাদকতা নাম মম পূজা লোকময়

দিবা নিশি থাকি আমি মুদিত নয়নে
তাই মম অনুচর গণে,
জানে না, আমার মান নিজ নিজ গুণ গান
করে সবে আপন বদনে
ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ চারি জনে

এ সকলে ধরাতলে করিলে গমন
কান্দে "কটুভাষ নরগণ,
যেখানে সেখানে যাই আমি সমাদর পাই
হাসি মুখে বিনাশি কেমন!
মরে তবু নিন্দা কেহ করে না কথন

কৌশলে এরা সবে লয় পায়
কে নিবারে আমায় ধরায়
গুরু বাক্য নাহি ধরে, পরিজন পরিহরে
তবু ত্যাগ করে না আমায়
হিত বলে বন্ধুদলে শত্রু ভাবে তায়

বায়ুর মণ্ডল যদি বেঁধে রাখাযায়
সিন্ধু যদি আজ্ঞায় শুকায়
যদি না অনল জ্বলে, রবি যদি নভস্থলে
নিভে যায় প্রদীপের প্রায়
তবু না ছাড়াতে পারে আমি ধরি যায়

নিধন কৌশল এরা জানে কোন জন
আপন ইচ্ছায় নরগণ
কষ্টের অর্জ্জিত ধনে, বিতরিয়া সযতনে
লয় আসি আমার শরণ
কারকাছে যাচে আর মরণ এমন

ধরাধামে নানা অংশে হই অবতার
ত্বরিতা * সে চিকর আমার
তাই জটা ঘটা তার, অহিফেন মেদপ্রায়
ত্বকে তাম্রকূটের সঞ্চার
প্রানের সুসার সুরা শোনিত আমার

আমায় অধিক আরো রত তত হয়
দিন দিন যত করি ক্ষয়
তখনি মরিতে যায়, তবু সে আমায় চায়
চির প্রেমে ব্যাকুল হৃদয়
বিফলে বান্ধবে কানে রামনাম কয়

ভোগ আশে সেবা মম করে ধনীগণে
দুখি ক্লান্তি শান্তির কারণে
মূর্খে বিদ্যা কামনায় বিজ্ঞেপেতে কবিতায়
সিদ্ধিহেতু যোগীসুর গণে
আময় হরণে রোগী আরোগী বারণে

প্রকাশে যদ্যপি কেহ গায় মম দোষ
তায় না আমার হয় রোষ
অপরাধ ক্ষমা তরে, গোপনে সে সেবা করে
হয় তায় মম পরিতোষ
গুপ্ত উপাসকে শক্তি বিশেষ সন্তোষ *

ব্যাধি তব এত গর্ব্ব শোভা নাহি পায়
মম যত সেবক ধরায়
ঔষধে কি তেজ করে, সে সব শিবের পরে
নিত্য যারা কালকুট খায়
তাই এত নব হত এখন তোমায়

বিশেষতঃ বৈদ্য যত ধরায় এখন
মম অনুগত সব জন
নেত্ররোগ বলে জ্বরে, বিনা ব্রণে অস্ত্র করে
পথ্যে সুরা করায় সেবন
বধি আমি, ব্যাধি মাত্র নিন্দার ভাজন

ভেবনা বিগ্রহ যোগ নাই তব সনে
কত সুরা ব্যয় হয় রণে
মেতেমাত্র সম্বিদায়, মঙ্গল ঘটালে তায়
বিদ্রোহ ইংরাজ-রাজ সনে
ভারত ভাসিল যায় রুধির প্লাবনে

* গাঁজা ত্বরিতানন্দ দায়িনীর সংক্ষেপোক্তি

* গুপ্ত রতী প্রীতিপদ পরম সন্তোষ

বাত্যা তুমি যা বধেছ অর্দ্ধভাগ তার
হত হয় প্রভাবে আমার
মাদকে মাতিয়াছিল কিছু যারা না জানিল
কিসে হলো কখন সংহার
স্বভাবে থাকিলে তারা লভিত নিস্তার

দুর্ভিক্ষ ভেব না একা করেছো নিধন
যদি সুরা প্রস্তুত কারণ
বিলাতে না চাল যেতো তবে কি হে হতে
পেতো
ভারতের দুর্ভিক্ষ এমন
বর্ষ শস্যে হয় যথা ত্রিবর্ষ যাপন

স্বভাব অন্যথা তুমি কত কর আর
দেখ দেখি প্রভাব আমার
ধীরদলে গণ্য যারা নগ্ন অঙ্গে নাচে তারা
ভক্ষাভক্ষে রাখে না বিচার
অতুল বাতুল যত সেবক আমার

পিতা মাতা দারা সুত করিতে নিধন
না ডরায়, যদি হয় মন
ঈশ্বরে বা নরবরে তারা নাহি শঙ্কা করে
নাহি গণে আপন জীবন
দৈত্য প্রেত পশু সম মম দলগণ

আমা বিনা তাদের না কোন কায হয়
কি বিষাদ কি উৎসব সময়
অপত্য জনমে ঘরে, কিম্বা যদি পিতা মরে
আগে মম আবাহন হয়
শিষ্যে সুরা দেয় গুরু দিক্ষার সময়

তোমাদের গতি হয় কখন কখন
হও তায় নিন্দার ভাজন
আমার বিনাশ ক্রিয়া দিন দিন দেখ গিয়া
রবি গতি সমান নিধন
অবিরাম অলক্ষ্য অসীম আয়তন

স্বগণের স্বদেশের সাধিবারে হিত
হয় যারা আশার লক্ষিত
অমি পানে মগ্ন মবে হেন হিন্দুগণ
না হইতে যৌবন অতীত
হিন্দু নিশায় রবি হবে না উদিত

বালো বিদ্যা লভেছিল শ্রমে অতিশয়
দেখ তার যৌবন সময়
সম ধর্ম্মীগণ সনে, কাঁদাইয়া পরিজনে
কাটে কাল সৌণ্ডিক আলয়
কিম্বা বাস গুলি গৃহে কদাচারময়

কুবের সমান পিতা ধনী ছিল যার
এখন কি দশা দেখ তার
আশায় হারায়ে ধন করি দুষ্ট আচরণ
নিবাস করেছে কারাগার
মরে রাজ দণ্ডে যায় পারাপার পার

বাতুল করেছি কত সুধীর সুজন
অঙ্ক পদ্ম পলাশ লোচন
হেন বেঁচে আছে যারা দুঃখের প্রতিমা তারা
নরদলে না হয় গণন
সমাজে না পায় দয়া অভাগা এমন

নরে ধর্ম্ম কি কব দেবত্ব দেবে নাশি
তবু সবে আমার প্রয়াসি
ফাঁসিতে ঝুলিতে যায় তখনো আমায় চায়
তত্ত্ব কারে কারাগারে আসি
ভুলে না হলেও পারাপার পারবাসী

মহম্মদ ঈশ্বরের শাখার সমান
হেন জ্ঞান করে মুসলমান
কোরাণেতে বারম্বার মাদকে নিষেধ তার
আর তায় নাহি দেয় কান
মুন্সী মোল্লা মৌলবী মদিরা করে পান

—

সবে হেন রঙ্গ মম করে দরশন
তবু দেখ কৌশল কেমন
আমার না নিন্দা করে মন্দ বলে সেই নরে
সাধি আমি যাহার পতন
দস্যু নয় দোষি দস্যু লুটে যার ধন

—

সমভাবে জ্বলে সবে অগ্নি পরশনে
তবু ভ্রান্ত মম ভক্তগণে
আগে যে নিপাত হয়, তারে গর্ব্বে মূর্খ কয়
নিজ ভাবি ভাবনা না গণে
গোময়ের হাসি হায় ঘুঁটের দহনে

—

হিন্দুর মহিলা সতী বিখ্যাত ধরার
সেগর্ব্ব এখন নাই আর
দেখ বারাঙ্গনা দল বঙ্গে না কুলায় স্থল
নগরে শোভিছে তারাকার
চিরদিন ব্যভিচার কিঙ্কর আমার

—

হিন্দু যুবাগণ সবে মাতিয়া আমায়
জায়া ছেড়ে আরাধে বেশ্যায়
রসাল ছাড়িয়া কায় মজে বিম্ব লালসায়
কুলস্ত্রী কুলটা হয় তায়
তরী স্থির না রয় কাণ্ডারি নাই যায়

—

গৃহীর হইত যারা গৃহের ভূষণ
প্রসবিত সুত সুতাগণ
লয়ে পুত্র কন্যা পতি, দয়া ধর্ম্মে রেখে মতি
চরিতার্থ করিত জীবন
দাসী হয়ে সেবে তারা রিপু দাসগণ

—

রবি শশী দেখে নাই যাদের বদন
নগ্নাঙ্গিনী রঙ্গিণী এখন
অন্তর দুখেতে ভরা অথচ হসিতা ধরা
ভুলাইয়া করিতে নিধন
স্বেদাধার রূপে দেহ বেচে লয় পণ

—

এখন সভায় সবে করহে বিচার
কে পাইতে পারে পুরস্কার
বিবিধ কৌশল ভরে কে হেন নিধন করে
প্রতিদিন মানবে ধরার
মরে তবু নরে হেন অনুগত কার

—

তবু যদি গণ্য নয় যোগ্যতা আমার
বলি এক রহস্য ব্যাপার
দেহ আত্মা পরস্পরে জীবরূপী হয় নরে
সেকি মরে আত্মা রয় যার
দেহ নাশ জীর্ণ বাস ত্যাগের প্রকার

—

ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ যত জন
সাধে সবে দেহের পতন
আত্মায় বধিতে নরে কে আর প্রভাব ধরে
আমি মাত্র আছি একজন
ধর্ম্মের নিধনে সাধি আত্মার নিধন

—

"অমর আমার আত্মা" ভেবে নরে সার
না ডরায় কৃপাণের ধার
ব্যাধি বাত্যা নাহি ডরেদুর্ভিক্ষ সে মনে করে
শেষ হবে ভব যাতনার
সে গর্ব্ব কোথায় যার আমার সংহার

—

পুণ্য উপার্জ্জিয়া কালে ছাড়ে জীর্ণ কায়
কিম্বা জন্মভূমির রক্ষায়
রণে হত হয় নরে কিম্বা খাদ্যাভাবে মরে
হয় দৈবে নিহত বাত্যায়
বিনা দোষে আসে তারা রয়না হেথায়

আমার নিহত যত রবে চিরদিন
অগ্নি হ্রদে এখানে বিলীন
অন্য পাপ নাহি যার তবু আত্মহত্যা তার
লেখা হেথা আছে প্রতিদিন
পাবে কি হে আর তারা মুক্তি কোন দিন

কাল মহামতি তবে করহে বিচার
কে পাইতে পারে পুরস্কার
দেহনাশে মরে যারা দেখা দিয়া যায় তারা
রয় যারা আমার সংহার
মম সম কালের কে প্রিয়কারী আর

চলিতে চলিতে হেন বলিতে বলিতে
স্মিতাননা লাগিলা হাসিতে
স্বর্গের শোভায় তায় যমালয় দিপ্তিপায়
হরে মন চকিতে আঁখিতে
চাহিয়া বামায় কাল লাগিল কহিতে

কাল। ধনি আমি জানি গুণ অশেষ তোমার
তব সম কে সাধিবে উন্নতি আমার
সত্য সেই হত আত্মা হত হয় যার
সেই চিরবাস করে আবাসে আমার
ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ অহঙ্কার
হরিনরে পুরস্কার প্রস্তাব আমার

কি চাও কিপেলে হয় সন্তোষ তোমার
যা চাহিবে দিব সত্য প্রতিজ্ঞা আমার

কিসের অভাব আছে কি চাহিব আর
এক মাত্র ডর আছে অন্তরে আমার
রাজাগণে পাছে হিত গণিযে প্রজার
রাজ্যে প্রবেশিতে না আমায় দেয় আর
ডরে প্রজা না পারিবে শাসনে রাজার
মম অনুগত হয়ে লভিতে সংহার
বলেদাও আমায় এমন অধিকার
যথা চির আদরিণী রহিব রাজার
নানা মতে ধন প্রাণ নাশিব প্রজার
তবু চির প্রণয়িনী রহিব রাজার
অভয়ে চরিয়া তথা করিব সংহার
প্রতি দিন পুরাইব তব অধিকার
নিহত পাপিতে স্থান কুলাবে না আর
নূতন রচিতে হবে নরক তোমার
দেহ এই বর যদি দিবে পুরস্কার
অন্য ধন রতন না চাই আমি আর

ভাল পুরস্কার ধনি চেয়েছো আমায়
যাও হিন্দুস্থান রাজা ইংরাজ যথায়
বিশাল সুফলা নানা রত্ন জন্মেতায়
আদি সভ্য নর জাতি নিবাস তথায়
সাদরে যতনে তথা পালিবে তোমায়
প্রজার অধিক প্রিয় ভাবিবে রাজায়
আপনি করিবে রাজা তব ব্যবসায়
"আপকারি" নামে তুমি খ্যাত হবে তায়
মন্দির রচিবে তব পন্থায় পন্থায়
ক্ষিরের অধিক পণে কিনিবে সুরায়
যেবর চাহিলে তাই দিলাম তোমায়
অভয়া অভয়ে বধ প্রজায় তথায়

শুন ব্যাধি বাত্যা সবে আমার আজ্ঞায়
মাদক মঙ্গল আজি গাওহে সভায়
ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ চারিজন
কালের আজ্ঞায় ত্বরা উঠিয়া তখন
মাদকতা ঘেরিয়া মণ্ডলে দাঁড়াইল
কিবা অপরূপ শোভা সভায় হইল
ক্ষিরোদ মন্থনে যথা দানব মণ্ডলে
মায়াহিনী মোহিনী ভাসিতে কুতূহলে
চারিজনে মেলি করতালি দিয়া করে
সপুলকে মাদক মঙ্গল গান করে

সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবি জয় জয়
আত্মা সনে নরগণে কর তুমি ক্ষয়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্পর্শে পায় লয়
ব্যাধি। দাসে দেবী রেখ মনে যেন আমি তব সনে
ভারতে চরিতে পারি সদাই অভয়,
ঔষধ না ধরে যেন করো নর দেহ হেন
ভিষক তোমায় যেন সদা রত হয়
মাদকতা। তাইহবে তাইহবে নাই কিছু ভয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়

বিগ্রহ। রাজায় রাজায় রণ সদাই সংঘটন
প্রজাগণ দেবী যদি তব রত রয়
পিতা পুত্রে হবে রণ প্রতিদিন নরগণ
বিস্তর বধিতে আমি পারিব নিশ্চয়
মাদকতা। তাই হবে তাই হবে নাই কিছু ভয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়

বাত্যা। মম এই নিবেদন যেন দেবী নরগণ
আমার প্রভাব কালে অচেতন রয়
উপায়ে বাঁচিতে আর শক্তি তবে রবে কার
অনিবার্য্য সংহার করিব লোক ময়

মাদকতা। তাইহবে তাইহবে নাই কিছু ভয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়
দুর্ভিক্ষ। নিবেদি তোমার পায় যেন সুরা লালসায়
ভারতের তণ্ডুল বিলাতে হয়ে লয়
ভারতে পরম হর্ষে তবে আমি প্রতিবর্ষে
বিহারির বিনাশিব কতই নিশ্চয়

মাদকতা। তাইহবে তাইহবে নাই কিছু ভয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয়
আত্মা সনে নরগণে কর তুমি ক্ষয়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্পর্শে পায় লয়
ব্যাধি। ঔষধে কে ডরে তবে আর
বিগ্রহ। নিত্য বিনাশ আমার
বাত্যা। হবে প্রচুর সংহার
দুর্ভিক্ষ। শস্যেসুরা হবে আমি ভ্রমিব অভয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়
আত্মা সনে নরগণে কর তুমি লয়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্পর্শে পায় লয়
ব্যাধি। জয় ভূত নিরোধিনী
বিগ্রহ। শান্তি বিনাশিনী
বাত্যা। উদাম বাহিনী
দুর্ভিক্ষ। ভক্ষ বিনাশিনীজয় তব জয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়
আত্মা সনে নরগণে কর তুমি লয়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্পর্শে পায় লয়

ব্যাধি। জয় ব্যাধি প্রপালিনী
বিগ্রহ। বৈর প্রসবিনী
বাত্যা। চেতন হারিনী
দুর্ভিক্ষ। আসব রূপিনী জয় তব জয়
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়

ব্যাধি। জয় সৌরিক বালিকা
বিগ্রহ। বন্ধু বিশোধিকা
বাত্যা। বাক্য বিঘাতিকা
দুর্ভিক্ষ। বিশ্ব বিনাশিকা জয় তব জয়।
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়।
ব্যাধি। ত্বং তনু অমরা
বিগ্রহ। ত্বংরণ রূপয়া
বাত্যা। ত্বং বল সংলয়া
দুর্ভিক্ষ। ওদন সংক্ষয়া জয় তব জয়।
সকলে। জয় জয় মাদকতা দেবী জয় জয়।
মাদক মঙ্গল গীত হ'লো সমাপন
সানুচরে সদলে শমন হৃষ্ট মন। *

---

* মুঞ্জকুঞ্জে যিনি বিরহিণীর বিরহে তপোবনে ঋষিকন্যার পূর্ব্বরাগে কবিকল্পনা লীলাময়ী দেখিয়াছেন, তিনি দুর্দ্দান্ত দুরন্ত কালান্তকের সভায় ব্যাধিবিগ্রহবার্ত্তাদুর্ভিক্ষের সম্মিলনে কবিকল্পনা কি অপূর্ব রঙ্গ করিয়াছে, দেখুন। মাদক-মঙ্গল পড়িয়া বুঝিতে বাকি থাকে কি—কবিকল্পনা নীরস মরুভূমেও ফুল ফুটায়? ব্যাধির উক্তি পাঠকালে কবির কবিত্ব শক্তিতে চমৎকৃত হইতে হয়; চমৎকৃত হইতে হইতে মূর্ত্তিমান ব্যাধিকে সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়।

"যথা জীব আমি তথা, কায়া সহ ছায়া যথা,
ভ্রমি বনে, প্রান্তর, নগরে।
বিশ্বক্ষেত্র সুবিশাল, চরে জীব পশুপাল,
শুধু মম মৃগযার তরে।

জগতের মধ্যে কজন কবি একথা এমন করিয়া বলিতে পারিয়াছেন? বাঙ্গালা ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ নূতন। নট-কবি গিরীশচন্দ্রের চৈতন্য-লীলার পাপের সভার সহিত মাদক মঙ্গলের যমের সভার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সাধারণে সুরেন্দ্রনাথের উপর কটাক্ষপাত করিবেন না, স্বয়ং গিরীশচন্দ্র এ কটাক্ষপাতে কুণ্ঠিত হইবেন। চৈতন্য-লীলা প্রণয়ন কালে মাদক-মঙ্গলের কবি জীবিত ছিলেন না, তবে মাদক-মঙ্গল অপ্রকাশিত ছিল; গত শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বেও অপ্রকাশিত ছিল। এখন ইহা প্রচারে, পাঠক, তুলনায় সমালোচনে যেন ভ্রমে পতিত না হন, ইহা তাহারই সঙ্কেত।

কার্ত্তিকের প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা সম্বন্ধে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১২৭৬ সালে "অবোধবন্ধু"তে যে কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একাংশের সহিত বাত্যার উক্তির একাংশের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহা আজি পঞ্চবিংশতি বর্ষের অতীত কথা। পাঠকগণকে দেখাইবার জন্য কবি বিহারী লালের কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"বুঝিহে প্রভাত নাথ, হ'ল এতক্ষণে,
ওই শুন মানুষের কলরব ধ্বনি;
বাতাসেরো ডাক আর বাজেনা শ্রবণে,
কার মনে ছিল, আজ পোহাবে রজনী?

তরুণ অরুণ আহা হইবে উদয়,
শান্তিময়ী উষার ললাট আলো করি!
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদয়,
তাঁর মুখ চেয়ে সবে আছে প্রাণ ধরি।"

ইহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের

"মনে আশা ছিল না লোকের,
পোহাবে এ নিশি প্রলয়ের
আলোক দেখিবে আর;"

কেমন একটু সৌসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। এখানেও আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। মাদক-মঙ্গল লিখিবার পূর্ব্বে কবি বিহারীলালের কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রায় দুজনেই তুল্য মূল্য শক্তিশালী; সুতরাং একের অপহরণ অন্যের সম্ভবে না। দুঃখ এই, বাঙ্গালী পাঠক, কি সুরেন্দ্রনাথ, কি বিহারীলাল, কাহাকেও চিনিতে পারিল না। ইহা বস্তুতঃ বাঙ্গালা পাঠকদিগের দুর্ভাগ্য।

সম্পাদক

দূর-শ্রবণ যন্ত্র।

(Telephone.)

পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞান প্রসূত বহু-বিধ মানব হিতকারী যন্ত্র মধ্যে এই দূর-শ্রবণ যন্ত্রটি অতীব বিস্ময়কর; বৈজ্ঞানিক চিন্তার অতি অদ্ভুত সুখময় ফল। তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্রযোগে পরস্পর বহু দূরবর্ত্তী দুই স্থানে সংবাদ প্রেরিত অথবা কথোপকথন সাধিত হইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন চলিতে পারে না। তাহাতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ভাষার অক্ষর বাচক স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহ উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে তাড়িতপ্রবাহ সহকারে এক স্থান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই চিহ্নগুলিকে আবার নির্দ্দিষ্ট অক্ষরে পরিণত করিয়া লইতে হয়। কোন চিহ্ন ভাষার কোন্ অক্ষর বাচক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শিক্ষা করিতে হয়, এবং অভ্যাস বশতঃ সহজেই প্রেরিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে অক্ষরে তদনন্তর ভাষায় পরিণত করিয়া লওয়া যায়। দূর-শ্রবণ যন্ত্রে এরূপ সঙ্কেতের প্রয়োজন হয় না। এতদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন চলিয়া থাকে। তুমি যন্ত্র মধ্যে মুখে যাহা কহিবে, দূরস্থিত অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ আর একটি যন্ত্র কর্ণে ধারণ করিয়া ঠিক্ সেই কথাগুলি শুনিতে পাইবে। সুতরাং টেলিগ্রাফ যন্ত্র অপেক্ষা এই অভিনব যন্ত্রটির কার্য্য এককালে অনেক সহজ ও অতি সুন্দর। নিকটে বসিয়া দুই জনে যেমন পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকে, এই যন্ত্র সাহায্যেও ঠিক্ তদ্রূপ হয়, কেবল ঐ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে দেখিতে পায় না, এই মাত্র প্রভেদ।

দূর শ্রবণ যন্ত্রের গঠন যেমন সামান্য ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যও অতি অল্প ব্যয়-সাধ্য। আজি কালি কলিকাতা সহরে প্রায় সকল আফিসে ও অনেক বাটীতে পর্য্যন্ত টেলিফোণ যন্ত্র বসিয়াছে। এতদ্দ্বারা যে কত সময় ও কত ব্যয় বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। এরূপ অতি প্রয়োজনীয় মহোপকারী যন্ত্রের গঠন ও প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ সাধারণ পাঠক মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতে পারে, সেই বিশ্বাসে আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

শব্দ, তাড়িত ও চুম্বক বিজ্ঞান এই যন্ত্রের ভিত্তিমূল স্বরূপ। শব্দের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাড়িত স্রোতের গতিবিধি কিরূপ, এবং চুম্বকের কি ধর্ম্ম, এই তিনিটি বিষয় যৎসামান্য মাত্র বুঝিয়া লইলেই দূর-শ্রবণ যন্ত্রের গঠন প্রকরণ ও তাহার কার্য্য প্রণালী সহজেই বুঝা যাইবে।

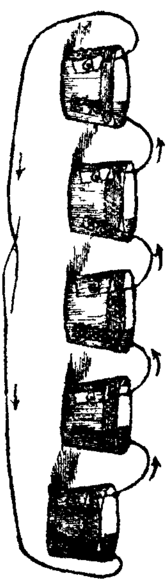
অনেকের এরূপ ধারণা যে, বিস্তৃত তার মধ্যদিয়া শব্দ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রবন্ধপাঠে পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, ইহা কতদূর ভ্রম-মূলক।

শব্দ তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে তবে আমাদের শব্দজ্ঞান

জন্মে। কোন পদার্থের উপর আঘাত করিলে, ঢোলে কাঠী দিলে, সেতারের তারে টঙ্কার মারিলে, ঘণ্টা বাজাইলে, কথা কহিলে, ফলে যে কোন প্রকারে শব্দ করিলে শব্দোৎপাদক পদার্থের জড়-কণা সমূহ দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে। সেই আণবিক পরিকম্পন বায়ুতে পরি-চালিত হয়, অর্থাৎ বায়ুর যে অংশটুকু সেই পরিকম্পিত পদার্থগাত্র স্পর্শ করিয়া থাকে, সেই অংশটুকু কাঁপিতে থাকে, ক্রমে চতু পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র বায়ু তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। শব্দের তীব্রতা বা আধিক্য অনুসারে অল্প বা অধিক দূর পর্য্যন্ত বায়ু এইরূপে পরিকম্পিত বা তরঙ্গায়িত হয়। সেই বায়ুতরঙ্গ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণাবরে কর্ণপটাহ নামক একখানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম পরদা বিস্তৃত আছে। ঐ বায়ুতরঙ্গ সেই কর্ণ-পটাহে গিয়া আঘাত করে, তাহাতে ঐ চর্ম্ম-পর্দ্দারও আন্দোলন বা পরিকম্পন উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ উহা দ্রুতবেগে কাঁপিতে থাকে। তখন সেই পটাহ স্পর্শ করিয়া যে শ্রবণ জ্ঞানোৎপাদক শিরা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, সেই শিরা দ্বারা ঐ পরিকম্পন মস্তিষ্কে নীত হয়। তখন আমাদের শব্দ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। বায়ু না থাকিলে কোন শব্দ জ্ঞানই লাভ করা যাইত না। বায়ু বিরহিত স্থানে কোন উপায়ে শব্দ উৎপাদিত করিলে, সেই শব্দ আমাদের কর্ণ স্পর্শ করিতে পারিবে না। শব্দোৎপাদক পদার্থের দ্রুত পরিকম্পন বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া গিয়া কর্ণপটাহের পরিকম্পন সম্পাদন করে। তদনন্তর কর্ণপটাহ স্পর্শ করিয়া যে শ্রুতিশিরা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে সেই শিরা যোগে ঐ পরি-কম্পন আমাদের অনুভূতির আধার মস্তিষ্কে গিয়া পহুঁছে। তখন আমাদের শব্দজ্ঞানের উদয় হয়।

এখন তাড়িত প্রবাহের বিষয় কিছু বলিব।

কাচ, চিনেমাটি অথবা সাধারণ মাটি বিনির্ম্মিত একটি পাত্র, দুইখানি দুই প্রকার ধাতু নির্ম্মিত ফলক বা পাত ও লবণ অথবা অম্ল বা দ্রাবক মিশ্রিত জল, এই তিনটি উপকরণের একত্র সমাবেশে এক একটি তাড়িত ব্যাটারি সংগঠিত হইয়া থাকে। ব্যাটারির ভিতর তাড়িত বলের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অনেকগুলি ব্যাটারিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া একটি বৃহৎ বলশালী ব্যাটারি রচিত হইয়া থাকে। নিম্নে (১ম চিত্র) এইরূপ একটি মিশ্র ব্যাটা-রির প্রতিরূপ প্রদত্ত হইল। প্রতি পাত্রে



১ম চিত্র।

একখানি করিয়া তামা ও একখানি করিয়া দস্তাফলক অম্লাক্ত জলে নিমজ্জিত থাকে। একের তাম্রফলকের সহিত পরবর্ত্তী দস্তাফলকখানির ধাতু সংযোগ থাকে, অর্থাৎ ধাতুপাত দ্বারা এইরূপ যোড়া যোড়া সংবদ্ধ থাকে। এই প্রকার ক্রমবিন্যাস দ্বারা প্রথম পাত্রের প্রথম ফলক দস্তা হইলে শেষ পাত্রের শেষ ফলক তাম্র ফলক হইবে। এই দুই ফলক সংলগ্ন দুইটি ধাতু-তার সন্নিবিষ্ট থাকে। ঐ তার দুইটি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে তন্মধ্যে তাড়িত স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহার বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে; ব্যাটারির তার-প্রান্ত দুইটির পরস্পর সংস্পর্শে একগাছি সরু তার সংবদ্ধ করিয়া দিলে ঐ তার উত্তপ্ত হইয়া লাল-বর্ণ হইয়া উঠিবে; প্রান্তদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিয়া ধরিলে তন্মধ্যে অতি প্রখর তাড়িতালোক প্রকাশমান হইবে; প্রান্তদ্বয় জীবশরীরে সংলগ্ন করিয়া দিলে শরীরে সংক্ষোভ বা আঘাত প্রদান করিবে; দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আনিলে ঐ পদার্থ প্রজ্জ্বলিত হইবে; লৌহখণ্ড প্রান্তদ্বয় জড়াইয়া দিলে ঐ লৌহখণ্ড চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উহা অপর লৌহকে আকর্ষণ করিবে, কিন্তু ব্যাটারির তার-প্রান্ত হইতে যেইমাত্র লৌহখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিবে, অমনি তৎক্ষণাৎ উহার চুম্বকধর্ম্ম নষ্ট হইবে। এই সমস্ত বিস্ময়-কর কার্য্য দর্শনে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ব্যাটারি মধ্যে তাড়িতবলের উৎপত্তি হইয়া সংযোজক তার দুইগাছি মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে।

ব্যাটারি সংলগ্ন তার দুইটি এক হাত পরিমিতই হউক অথবা শত সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ হউক, তাহাদের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি রাখিয়া প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে অথবা প্রান্তদ্বয় কোন যন্ত্রে বা পরিচালক পদার্থে (ধাতু, জল, জীব-দেহ প্রভৃতি) সন্নিবিষ্ট করিলে ঐ তার মধ্যে অবিশ্রান্ত তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহাকেই তাড়িত স্রোত পূর্ণ করা কহে। ব্যাটারির এক প্রান্তস্থ ধাতু ফলক হইতে তাড়িত প্রবাহ নির্গত হইয়া তদসন্নিবিষ্ট তার মধ্যে ধাবিত হয় এবং ব্যাটারির অপর প্রান্তস্থ ধাতুফলক সন্নিবিষ্ট তার মধ্য প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় ব্যাটারি মধ্যে আসিয়া পঁহুছে। তাড়িত-বলের এইরূপ গতিবিধি অপরিমিত ত্বরিতবেগে হইয়া থাকে। পৃথিবী বেষ্টন করিয়া যদি ব্যাটারি তার বিস্তৃত রাখা যায়, তাহাতেও নিমেষ মধ্যে তাড়িত-স্রোত ব্যাটারির এক প্রান্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ তার মণ্ডল মধ্যে প্রবা-হিত হইয়া ব্যাটারির অপর প্রান্তে আসিয়া প্রবিষ্ট হইবে। পৃথিবীকে এইরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া আবর্ত্তন করিতে পরিমিত সময় লাগিবে না। দ্রুতগামিতার এরূপ চরম দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

ব্যাটারির তারপ্রান্ত দুইটি পরস্পর সংলগ্ন করিলে অথবা তন্মধ্যে ধাতুসংযোগ থাকিলে, তার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তাড়িত-প্রবাহ আবর্ত্তন করিতে থাকিবে। তাড়িত-স্রোত পূর্ণ না হইলে তাড়িতবলের কোনও কার্য্যই দেখা যায় না। এই জন্য ব্যাটারি প্রান্ত দুইটীকে ধাতুতার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। আবার ব্যাটারি-তার প্রান্তদ্বয়কে পরস্পর বিযুক্ত বা পৃথগ্‌ভূত করাকে তাড়িত-স্রোত ভঙ্গ করা কহে।

তাড়িত বল সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বুঝিলেই চলিবে।

এক্ষণে চুম্বকতত্ত্বের বিষয় কিছু জানা আবশ্যক।

চুম্বক এক প্রকার খনিজ লৌহ বিশেষ। উহার প্রধান ধর্ম্ম এই যে, উহা লৌহ ও ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। তদ্ব্যতীত নিকেল ও কোবল্ট ধাতু দুইটিকেও চুম্বক আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বকের আরও একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, উহার সংস্পর্শে অথবা সন্নিধানে—উহাকে স্পর্শ করিয়া অথবা উহার অতি নিকটে লৌহখণ্ড রাখিয়া দিলে ঐ লৌহখণ্ডও ততক্ষণ চুম্বক হইয়া উঠিবে অর্থাৎ লৌহখণ্ড যতক্ষণ চুম্বকের নিকটে থাকিবে কিম্বা চুম্বককে স্পর্শ করিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ঐ লৌহখণ্ড চুম্বকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজেই একটি চুম্বক হইয়া দাঁড়াইবে। চুম্বক সন্নিধান হইতে স্থানান্তরিত কর, লৌহখণ্ডের চুম্বকশক্তি তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। চুম্বক সংস্পর্শে বা সন্নিধানে লৌহখণ্ড যে চুম্বক হয়, ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় চুম্বক-সংক্রামণ কহে।

সরল অথবা বক্র চুম্বকদণ্ডের গাত্রোপরি ব্যাটারি সংলগ্ন তার জড়াইয়া দিলে যতক্ষণ তার মধ্যে তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ ঐ লৌহদণ্ড চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে; তাড়িত-স্রোত ভঙ্গ কর, অমনি তৎক্ষণাৎ লৌহখণ্ড পূর্ব্ব স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ উহা চুম্বকশক্তি শূন্য হইয়া পড়িবে। আবার তাড়িত-স্রোত পূর্ণ করিয়া দাও, তাড়িত সমাগমে লৌহখণ্ড চুম্বক হইবে। ইহাকে তাড়িত-চুম্বক কহে। সরু তামার তারের গায়ে রেশম মুড়িয়া লইয়া উহার দুই প্রান্ত হইতে খানিকটা বাদ রাখিয়া উহাকে লৌহদণ্ডের গায়ে ফেরের পর ফের দিয়া স্ক্রুর প্যাঁচের ন্যায় জড়াইয়া লইয়া তার-প্রান্ত দুইটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে সংলগ্ন করিয়া দিলেই হইবে। তাড়িত-চুম্বকের নিকট সূচ অথবা অন্য কোন লৌহখণ্ড ধরিলে দেখিবে, উহা ঐ লৌহ খণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া নিজ গাত্র সংলগ্ন করিয়া রাখিবে।

আবার চুম্বকদণ্ডের গাত্রোপরি যদি ব্যাটারি-তার পূর্ব্বোক্তরূপে জড়াইয়া দেওয়া যায় অর্থাৎ চুম্বকদণ্ড বেষ্টন করিয়া যদি তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হয়, তবে ঐ চুম্বকদণ্ডের চুম্বকশক্তি অর্থাৎ লৌহ আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। প্রযুক্ত তাড়িতবল যে পরিমাণে প্রবল বা অধিক হইবে, চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিও সেই পরিমাণে অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। চুম্বকদণ্ড বেষ্টন করিয়া তাড়িত স্রোতের আবর্ত্তনকাল মধ্যেই চুম্বকদণ্ডের বলাধিক্য ঘটিবে। কিন্তু স্রোত ভঙ্গ করিবামাত্রই চুম্বকের বলাধিক্য তিরোহিত হইবে।

চুম্বক ও তাড়িতশক্তির আর একটি পরমাশ্চর্য্য গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিখ্যাত বিলাতী তাড়িত বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত মাইকেল ফ্যারাডে ঐ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। দূর-শ্রবণ যন্ত্রে প্রধানতঃ ঐ ধর্ম্মের নিয়োগ হইয়াছে। চুম্বক ও তাড়িতশক্তির ঐ গুণ অবলম্বন করিয়া আমেরিকা নিবাসী বেল্ সাহেব প্রচলিত টেলিফোণ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন।

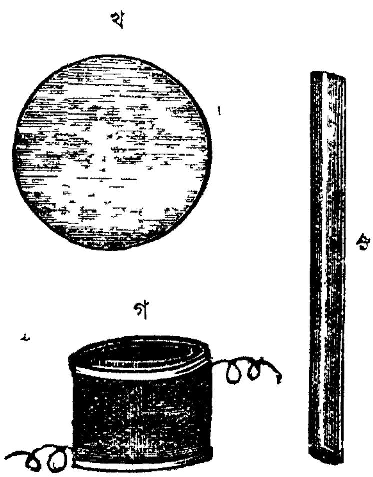
একটি তার মণ্ডলের সন্নিধানে যদি একটি চুম্বক দ্রুত আন্দোলিত হইতে থাকে, অর্থাৎ ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে,

চুম্বকটি একবার তারমণ্ডলের অভিমুখে অগ্রসর হয়, আবার পরমুহূর্ত্তে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হয়, এইরূপে ক্রমাগত অগ্র পশ্চাৎ গতিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ তারমণ্ডল মধ্যে তাড়িত স্রোতের উদ্রেক হইবে ও তন্মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে থাকিবে। রেশম-মণ্ডিত একগাছি দীর্ঘ ধাতুময় তার লইয়া তাহাকে স্ক্রুর প্যাঁচের ন্যায় বহুসংখ্যক ফেরে জড়াইলে উহা একটি চোঙ্গার আকার ধারণ করিবে। ঐ তার-চোঙ্গার প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন অথবা কোন ধাতুময় পদার্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়া যদি তার চোঙ্গার এক প্রান্তদেশের অতি সন্নিহিত একখানি চুম্বক ত্বরিতবেগে পরিকম্পিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ তার চোঙ্গার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তাড়িত স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। চুম্বকের প্রতি কম্পনে বা তার-চোঙ্গার সন্নিধানে চুম্বকের অগ্র পশ্চাৎ গতির সহিত তার চোঙ্গা মধ্যে একটি করিয়া তাড়িত স্রোতের উদ্রেক হইবে। চুম্বক তারমণ্ডলের অভিমুখে একবার অগ্রসর হইলে তারমণ্ডল মধ্যে একটি তাড়িত স্রোতের সমাবেশ হইবে, আবার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবার সময় আর একটি তাড়িত স্রোতের উদ্রেক হইবে।

এই দুই তাড়িত-স্রোতের কেবল দিগান্তর ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ তারমণ্ডলের অভিমুখে চুম্বকের গতির সহিত যে স্রোতের উদ্রেক হয়, তাহার গতি তারমণ্ডলের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে বাম প্রান্তাভিমুখে হইলে তদ্বিপরীতদিকে চুম্বকের গতির সহিত তারমণ্ডলের বাম প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্তাভিমুখে তাড়িত স্রোত প্রবাহিত হইবে। ফলে, তারমণ্ডলের নিকটে চুম্বক যেমন ঘন ঘন পরিকম্পিত হইবে, তৎসঙ্গে সন্নিহিত তারমণ্ডল মধ্যে উপর্য্যুপরি ক্রমান্বয়ে দুই বিপরীতদিকে দুইটি তাড়িত স্রোত উৎপন্ন হইবে। তাহার ফলে তারমণ্ডল মধ্যে অপরিমিত ত্বরিতবেগে নিরবচ্ছিন্ন তাড়িত স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

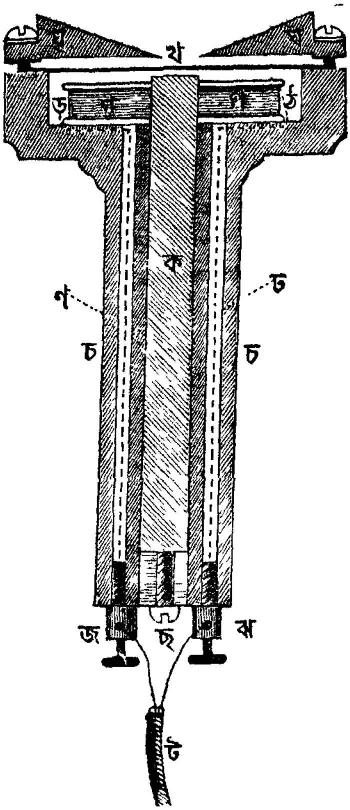
এক্ষণে দূর শ্রবণ যন্ত্রের গঠন প্রণালী কিরূপ দেখা যাউক।

একটি সরল দণ্ডচুম্বক, 'ক' (২য় চিত্র) একখানি পাতলা লৌহচাক্তি 'খ', ও রেশমমণ্ডিত তার জড়িত একটি গুটি 'গ'।



২য় চিত্র।

এই তিনটিমাত্র প্রত্যঙ্গে একটি দূর শ্রবণ যন্ত্র রচিত হইয়া থাকে। ইহাতে মূলে তাড়িতব্যাটারির নিয়োগ নাই। প্রচলিত দূর-শ্রবণ যন্ত্র যেরূপ সংগঠিত হইয়া থাকে তাহার একটির প্রতিরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।



৩য় চিত্র। *

'ক' চিহ্নিত একটি ৪ ইঞ্চ লম্বা ও ১ ইঞ্চের ৮ ভাগের ৩ ভাগ পরিমিত মোটা সরল দণ্ড চুম্বক, 'চ' চ' একটি শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা কাঠের চোঙ্গা—তন্মধ্যে চুম্বক দণ্ড প্রবিষ্ট। ঐ চোঙ্গা যন্ত্রের হাতলেরও কায করে, অর্থাৎ চোঙ্গাটি ধরিয়া যন্ত্রটি কাণে দিয়া শুনিতে হয় আবার মুখের নিকট আনিয়া তন্মধ্যে কথা কহিতে হয়। চুম্বক দণ্ডের এক প্রান্তদেশের গাত্রে ১ ইঞ্চের ৮ ভাগের ৩ ভাগ পরিমিত মোটা ও সওয়া ইঞ্চ বেড়, এরূপ একটি গুটি 'গ' 'গ' পরান। ঐ গুটির গায়ে ১২০ হাত ৩৬ নং রেশমমোড়া তার জড়ান। 'চ' 'চ' কাষ্ঠ আবরণের মধ্যে চুম্বকের দুই পার্শ্বে লম্বালম্বি 'ট' ও 'ণ' দুইটি সরু ছিদ্র থাকে। গুটির সরু তারের 'ঠ' ও 'ড' চিহ্নিত ভিতর ও বাহির প্রান্ত দু'টি, দুইগাছি অপেক্ষাকৃত মোটা তারের (উহাও রেশম মোড়া) দুই প্রান্তে সংবদ্ধ এবং ঐ তার দুইগাছি 'ট' ও 'ণ' চিহ্নিত দুই ছিদ্র মধ্যে বিস্তৃত থাকে। উহার অপর দুই প্রান্ত 'জ' ও 'ঝ' চিহ্নিত দুইটি বন্ধনী স্ক্রু গাত্রের দুই ছিদ্র মধ্য দিয়া পরান এবং সুবিধার জন্য 'ট' চিহ্নিতরূপে একত্রে জড়ান। প্রয়োজন-মত 'ট'কে দীর্ঘ করিয়া লইতে হয়।

ক' চুম্বকের ঊর্দ্ধ প্রান্ত সন্নিহিত আড়াই ইঞ্চ পরিধি 'খ' একখানি লৌহচাক্তি 'চ' চিহ্নিত কাষ্ঠ ফ্রেমের মাথায় স্থাপিত। কাষ্ঠাবরণের ঢাক্‌নি 'ঘ' 'ঘ', দুই পার্শ্বে দুইটি স্ক্রু দ্বারা 'চ' 'চ' এর সহিত সংবদ্ধ। এইরূপে সংবদ্ধ হইলে 'ঘ', ধাতুপাত-খানির কিয়দংশ ধার বা কিনারা চাপিয়া ধরিয়া 'খ'কে স্বস্থানে স্থির করিয়া রাখিবে, উহা কোন দিকে সরিয়া যাইতে পারিবে না। চিত্রে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে স্ক্রু দুইটির আর দুই এক প্যাঁচ ঘুরাইলেই ঢাকনিখানি লৌহচাক্তির কিনারা চাপিয়া বসিয়া যাইবে।

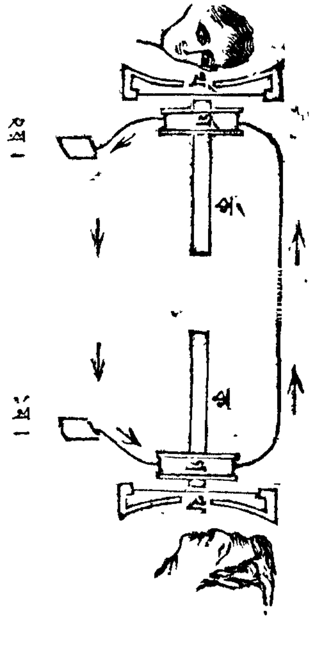
অবিকল এইরূপ আর একটি যন্ত্র, স্থানান্তরে যাহার সহিত কথোপকথন করিবে, তাহার নিকট থাকিবে। এই দুই যন্ত্রের মধ্যে ধাতুময় সংযোগ থাকা আবশ্যক। একের গুটির তার প্রান্ত

* যন্ত্রটি মাঝামাঝি লম্ব ছেদ দিয়া দু আধখানা করিয়া চিরিয়া ফেলিলে ভিতর দিক্ যেরূপ দেখায় সেইরূপ চিত্রিত হইয়াছে।

দুইটীতে দুইগাছি তারের দুই প্রান্ত সংবদ্ধ করিয়া দিয়া ঐ তার দুইটি বরাবর দ্বিতীয় স্থানের যন্ত্রটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া তথায় ঐ ২য় যন্ত্রের গুটির তার প্রান্ত দুইটিতে বিস্তৃত তারের অপর প্রান্ত দুইটি বাঁধিয়া দিলেই হইবে। 'ট'কে আবশ্যকমত দীর্ঘ রাখিয়া তন্মধ্যস্থ তার দুইটিকে আবার বাহির করিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হয়। ঐ তারের দুই প্রান্ত গুটির তার-কুণ্ডলের দুই প্রান্ত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। তখন ঐ দুই প্রান্তের সহিত আর দুইগাছি মোটা তারের প্রান্তদ্বয় বাঁধিয়া দিয়া ঐ মোটা তার দুইগাছি দ্বিতীয় যন্ত্র যথায়, সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাখিয়া তথায় আবার ঐরূপে উহার অপর প্রান্তদ্বয় ঐ ২য় যন্ত্রের তার কুণ্ডলের দুই প্রান্তে সংবদ্ধ করিয়া দিলেই উভয় যন্ত্রের ধাতু সংযোজনা ঠিক্ হইল।

নূতন আবিষ্কার মত দুইগাছি সুদীর্ঘ তার বিস্তৃত রাখিতে হয় না। দ্বিতীয় লম্বা তারের স্থানে প্রত্যেক যন্ত্রের এক তার প্রান্তে একখানি করিয়া ধাতুফলক সংবদ্ধ করিয়া দিয়া ফলককে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেই হয়। অথবা তার প্রান্ত জলের কলের পাইপ কিম্বা গ্যাসের পাইপের সহিত বাঁধিয়া দিলেই হইবে। ধরাপৃষ্ঠস্থ মাটি অপর বিস্তৃত তারের কার্য্য করিবে।

নিম্নবর্ত্তী চিত্রে এই সংযোজনা প্রকরণ দেখান গেল। ১ম যন্ত্রের 'গ' গুটির তার কুণ্ডলের এক প্রান্ত দীর্ঘ তারের এক প্রান্তে সংবদ্ধ ও ঐ তারের অপর প্রান্ত ২য় যন্ত্রের 'গ' গুটির তার-কুণ্ডলের এক প্রান্তে সংবদ্ধ; এবং 'গ' এর অপর প্রান্তে একখানি ধাতুফলক সংবদ্ধ ও ঐ ফলক পৃথিবীতে পোতা থাকে। এইরূপে 'গ'এরও অপর প্রান্তে আর একখানি ধাতুফলক সংবদ্ধ ও ভূগর্ভে প্রোথিত। প্রোথিত ঐ দুই ধাতুফলক মধ্যবর্ত্তী ধরাপৃষ্ঠস্থ মাটি এস্থলে দ্বিতীয় বিস্তৃত তারের কার্য্য করে। ইহাতে অনেক ব্যয় কমিয়া গিয়াছে। পরস্পর বহু দূরবর্ত্তী দুই স্থানের দুইটি যন্ত্র মধ্যে কেবল একগাছিমাত্র ধাতুতার বিস্তৃত করিয়া রাখিলেই হয়। পূর্ব্বে দুইগাছি তারের আবশ্যক হইত; সুতরাং এক্ষণে আর একগাছি তারের ব্যয় বাঁচিয়াছে।



৪র্থ চিত্র।

এক্ষণে যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহাই বুঝিতে হইবে।

মনে কর, ১ম দূরশ্রবণ যন্ত্রে কথা কহিলে সেই কথা সকল ২য় দূরবর্ত্তী স্থানের যন্ত্রে অবিকল শুনা যাইবে। বিস্তৃত সংযোজক তার কি কথাগুলিকে দূরে বহন করিয়া লইয়া যায়?—না। বাক্যবলে ১ম যন্ত্রে তাড়িত-বলের উৎপত্তি হয়, সেই তাড়িতবল বিস্তৃত তার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়া ২য় যন্ত্রে আবার সেই বাক্যে পরিণত হয়। কিরূপে দেখ:—বাক্যবলে বায়ু তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, সেই বায়ুতরঙ্গের আঘাতে (১ম যন্ত্রের) 'খ' ধাতুচাক্তি দ্রুত আন্দোলিত বা ঘন পরিকম্পিত হয়; অর্থাৎ একবার চুম্বকের অভিমুখে অগ্রবর্ত্তী পরক্ষণে পশ্চাদবর্ত্তী বা চুম্বক হইতে দূরবর্ত্তী হয়। 'খ', 'ক' চুম্বকের সান্নিধ্য হেতু নিজে চুম্বকধর্ম্মী হইয়াছে। সুতরাং 'খ' চুম্বকের দ্রুত পরিকম্পনে 'গ' তারকুণ্ডল মধ্যে তাড়িতস্রোতের সমাগম হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, দুই প্রান্ত পরস্পর সংযুক্ত এমন একটি তারকুণ্ডলের সন্নিধানে যদি একটি চুম্বক দ্রুত আন্দোলিত হয়, তবে সেই চুম্বক আন্দোলন হেতু ঐ তারকুণ্ডল মধ্যে তাড়িতস্রোতের উৎপত্তি হইবে। 'ক' চুম্বকের অভিমুখে 'খ'এর একবার গতিতে তারকুণ্ডল মধ্যে একটি তাড়িত স্রোতের উৎপত্তি, আবার পরক্ষণেই 'খ' এর এক পশ্চাদ্‌গতিতে বিপরীত দিকে আর একটি তাড়িত স্রোতের উৎপত্তি হয়। 'খ' ধাতুচাক্তি যে পরিমাণ বেগে, যত বলে ও যে ভাবে পরিকম্পিত হইবে, তন্নিকটবর্ত্তী তারকুণ্ডল মধ্যে উপর্য্যুপরি ততবার, তত কমবেশী বা সেই পরিমাণে ও সেই ভাবে তাড়িতস্রোতের উৎপত্তি ও গতিবিধি হইবে। সেই তাড়িতস্রোত তখন বিস্তৃত সংযোজক তার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ২য় স্থানের 'গ' চিহ্নিত তারকুণ্ডল মধ্যে আবর্ত্তন করিবে। তন্নিবন্ধন তাহার সহিত সংবদ্ধ 'ক' চুম্বকের বলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। চাক্তির সম্মুখ গতিতে চুম্বকের বলাধিক্য ও উহার পশ্চাদ্‌গতি হেতু চুম্বকের বলের হ্রাস হয়। আবার বৃদ্ধি, আবার হ্রাস, উপর্য্যুপরি এইরূপে চুম্বক বলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে থাকে।

'ক' চুম্বকবলের এইরূপ আধিক্য ও ন্যূনতা বশতঃ তাহার সন্নিহিত 'খ' ধাতুচাক্তি একবার 'ক' চুম্বকের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়, পরক্ষণে দূরে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে ঘন ঘন আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপন গুণে 'ঘ'এর পরিকম্পন উৎপাদিত হয়। 'খ'এর এই পরিকম্পন ঠিক্ ১ম স্থানের 'খ'এর পরিকম্পনের অনুরূপ। তাহাতেই, 'খ'এর এইরূপ দ্রুত পরিকম্পন বা আন্দোলন হেতু তাহার সন্নিকটস্থ বায়ুও অবিকল সেইভাবে সন্তাড়িত হয়; অর্থাৎ বায়ুতে ১ম স্থানের বায়ুর অনুরূপ তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়। সুতরাং তখন সেই বায়ুতে কর্ণপাত করিলে, সেই বায়ু-তরঙ্গ কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণপটাহে গিয়া আঘাত করিবে। তখন অবিকল ১ম স্থানের যন্ত্রের নিকট কথিত বাক্যের অনুরূপ শব্দজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ১ম যন্ত্রে যেমন কথা কহিবে, দূর স্থানের যন্ত্রে ঠিক্ তদনুরূপ কথা শুনা যাইবে। তবেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উভয় স্থানের দুই যন্ত্রের দুইখানি ধাতুচাক্তি যুগপৎ একইভাবে আন্দোলিত বা পরিকম্পিত হয়। তাহাতেই, উভয় স্থানের বায়ু একইভাবে সন্তাড়িত হইলে উভয় স্থানে সম শব্দের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১ম যন্ত্রে কথা কহিলে, সেই কথিত বাক্যবলে বায়ু-তরঙ্গের উৎপাদন, সেই বায়ু তরঙ্গাঘাতে ধাতুচাক্তির দ্রুত পরিকম্পন, সেই পরি কম্পন হেতু তারকুণ্ডল মধ্যে তাড়িত-প্রবাহের সমাগম হয়। সংযোজক তার তখন সেই তাড়িত প্রবাহ বহন করিয়া ২য় স্থানের যন্ত্রে আনয়ন করে। তখন ২য় যন্ত্রের তারকুণ্ডল মধ্যে সেই তাড়িত-স্রোতের আবর্ত্তন, তন্নিবন্ধন তথাকার দণ্ড চুম্বকের হ্রাস বর্দ্ধন, তৎসঙ্গে তৎ-সন্নিহিত ধাতুচাক্তির দ্রুত পরিকম্পন; সেই পরিকম্পন তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুতে সঞ্চালন এবং সেই বায়ুতরঙ্গ কথিত শব্দের অনুরূপ বাক্যের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক মুহূর্ত্তে এরূপ শত সহস্র পরিকম্পন সমুৎপন্ন হয়। ১ম ধাতুচাক্তি অপরিমিত দ্রুতবেগে পরিকম্পিত হইয়া মশকের ডাক 'পোঁ' শব্দের উৎপত্তি করিলে তন্মুহূর্ত্তেই ২য় যন্ত্রে অবিকল ঐ 'পোঁ' শব্দের উৎপত্তি হইবে। ফলে এই যন্ত্র সহযোগে বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ, মানুষের কথা, হাসি, কান্না প্রভৃতি শব্দ মাত্রই প্রেরিত হইতে পারে।

অভাগিনীর আত্মকথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুসুমময়ী প্রতিমা।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, গাড়ীর ভিতর যমদূতের মত সেই দুইটা লোক ও আমি। বোধ হইল যেন দেহ-মুক্ত পাপপ্রাণকে লইয়া দুটো যমদূত নরকের দিকে ছুটিতেছে। আমি কত কাঁদিলাম, কত অনুনয় বিনয় করিলাম; বলিলাম "একবার বাবাকে দেখাও, বাবাকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমাকেও সেইখানে লইয়া চল। আমি বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" সমস্তই অরণ্যে রোদন,—আমার কান্না কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিল না। কেহই আমাকে একটী কথায় সান্ত্বনা করিল না। তখন আর একটী চিন্তা আমাকে ব্যাকুল করিল। ইহারা কে? কেনই বা আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে? বাবাকে কেনই বা গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিল? প্রথমে ভাবিলাম, ইহারা কি ডাকাত? গহনার লোভে আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে কিন্তু আমার বেশ মনে আছে আমার গায়ে একখানিও গহনা ছিল না। ইতিপূর্ব্বে যে দুই চারিখানি ছিল, সেই সর্ব্বনাশের দিনে শ্মশানে আসিবার সময় আমার ননদ সেগুলি সব খুলিয়া লইয়াছিল। আমি বারণ করিলেও সে শুনে নাই,—জোর করিয়া হাতের লোহা খুলিয়া ও সীঁতের সিন্দূর মুছিয়া ফেলিয়া কর্ক্কশ স্বরে বলিয়াছিল, "তোর কপাল পুড়িয়াছে, আবার সখ করিয়া গহনা পরিতে হইবে না কি?"

আমি কাঁদিয়াছিলাম, কিছুই বলি নাই। সুতরাং আমার গায়ে তখন একখানিও গহনা ছিল না। তবে ইহারা কিসের জন্য আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে? হায় অভাগিনী, আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না যে, রমণীর সার রত্ন, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হরণ করিবার চেষ্টায় পাপাত্মারা আমাকে চুরি করিয়াছে। এইরূপ আকাশ পাতাল ভাবিতেছি,—এমন সময় দেখিলাম, গাড়ীর বেগ থামিয়াছে; সেই দুটো যমদূত গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। হঠাৎ অপর একটী লোক গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আমার চোখে কাপড় বাঁধিয়া দিল এবং ধীর নম্র ভাবে আমার হাত ধরিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "মা, ভয় নাই, নামিয়া আইস।" "মা" এই কথা শুনিয়াই আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল; চিন্তা স্রোত অন্য দিকে ছুটিল। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তখনই গাড়ী হইতে নামিলাম এবং তাহার হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিছু দূর গিয়াই একটী কাঠের সিঁড়িতে উঠিলাম; নিকটে বা দূরে কোথাও কোন শব্দ নাই;—কেবল আমাদের দুই জনের ধীর পদশব্দ; সেই শব্দেই আমি এক একবার চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। কোথা যাইতেছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। সেই লোকটী আমাকে যে দিকে লইয়া চলিল, আমি সেই দিকেই চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি শেষ হইলে একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, আমার চোক বাঁধা সুতরাং সেটী ঘর কি ছাদ, প্রথমে তাহা জানিতে পারি নাই; কিন্তু এক একবার মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া মাঘের শিশিরসিক্ত বায়ু হিল্লোল মধ্যে মধ্যে গায়ে লাগাতে বোধ হইতে লাগিল, এটী ঘর; আমার মস্তক অনাবৃত ছিল, ছাদ হইলে উন্মুক্ত আকাশের স্বাধীন সমীরণ বুঝিতে পারিতাম। সুতরাং সেটী ঘর, কিরূপ ঘর, কত আয়তন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; দশ বার পা যাইয়াই বাঁদিকে ফিরিলাম। সেখান হইতে আর একটী ঘর,ঘরের ছাদ,ছাদের পর আবার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়া সেই লোকটী আমাকে নামাইয়া লইয়া চলিল। এক একবার মনে হইল, জিজ্ঞাসা করি, কোথায় লইয়া যাইতেছে, কিন্তু শোকে, ভয়ে, বিস্ময়ে হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে শরীর অবসন্ন হইবার উপক্রম হইল, আর কথা কহিতে পারিলাম না; তথাপি জন প্রাণ শূন্য দেহযষ্টী কোন মন্ত্রের প্রভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অতি কষ্টে সিঁড়ি হইতে নামিয়া, আর একটী ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন সেই লোকটী আমার হাত ছাড়িয়া দিল। পরক্ষণে অপর কে আসিয়া আমার হাত ধরিল, হাত ধরিবার সময় হাতে গহনার শব্দ পাইলাম এবং কোমল করস্পর্শ অনুভব করিলাম। প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তবে আমি কোথায় আসিলাম? এই চিন্তা মনোমধ্যে উঠিতে না উঠিতে আমার চখের বাঁধন খুলিয়া দিল;—কে খুলিয়া দিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখনি চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম,আর এক পাও সরিতে ইচ্ছা হইল না। যাহা দেখিলাম, তাহাই

একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম,—একি! কুসুমময়ি প্রতিমা! শরীরের সর্ব্বস্থল হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীরিত হইতেছে, যেন বিধি বাছিয়া বাছিয়া জগতের কুসুমসার লইয়া ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ রচনা করিয়াছেন; তাহাব যে অঙ্গ দেখিলাম, সেই অঙ্গই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল, ভাবিলাম ইহা কি বাস্তবিকই সজীবনা প্রতিমা! একদৃষ্টে মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম। বিশাল নয়নে পলক মাত্রও নাই, চোখের পাতা যেন স্থির ও নিশ্চল। পরক্ষণেই ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম তেমন সুন্দর ঘর পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। বাবার কাছে ইন্দ্রপুরের কথা শুনিয়াছিলাম, ইহা কি তাহাই? ঘরের চারি দিকে আলো জ্বলিতেছিল, বিমলশুভ্র স্ফটিকবৎ আলোক। সেই আলোকেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়াছিল অথবা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে ঘরের শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়াই রহিলাম। প্রথমে যে রমনি আমাব হাত ধরিয়াছিলেন, ইনি তিনি, কি না, তাহাও জানিতে পারিলাম না; কাবণ চোখের বাঁধন খুলিয়া দিবার সময় আমার হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; যে পুরুষটী আমাকে এই ঘরে আনিয়াছিল, তাহাকে খুঁজিলাম কিন্তু দেখিতে পাইলাম না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সুন্দরীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইল, গণ্ডস্থল ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুইখানি একটু কাঁপিল, মুক্তার মত দাঁতগুলি অল্প অল্প বাহির হইল, মৃদু মধুর হাস্যে ধীরে ধীরে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভগ্নি! কাতর হইয়াছ বিশ্রাম কর, ইহা তোমারই ঘর"; তখন বুঝিলাম, সেই কুসুম-প্রতিমা সজীব। একটু সাহস হইল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে? আপনি কি কোন দেবতা? যদি তাহাই হন, বলিয়া দিন, আমি কোথায় আসিলাম। বলিয়া দিন, বাবা বাঁচিয়া আছেন কি না? আর যদি পারেন, তবে—তবে—ধীরে ধীরে আমার প্রাণ বায়ু শোষণ করুন।"

তিনি আবার হাসিলেন, বলিলেন ভয় নাই, তোমার বাপ বাঁচিয়া আছেন; তিনি তোমাব নিকটেই আছেন, তাঁহার জন্য চিন্তা নাই; তুমি কাতর হইয়াছ, বিশ্রাম কর, একটু সরবৎ খাও; বলিতে বলিতে একটী রূপার গ্লাশ আমার হাতে দিলেন। গ্লাশটী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম "সরবৎ খাইব না, বিষ থাকে ত আমায় দিন, আমার বাঁচিবার সাধ নাই। যদি বিশ্রাম করিতে হয়, যেন অনন্ত বিশ্রাম আমি পাই।"

সুন্দরীর মুখমণ্ডল একটু গম্ভীর হইল। চোখের জ্যোতি অল্প কমিয়া আসিল—তখনই চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখিলাম, বুঝিলাম আমি খাইলাম না বলিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু কেমন করিয়া খাইব, এখনও এক রাত্রি পোহায় নাই শ্মশানে প্রাণের প্রাণকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম, তাহার পর আবার এই সর্ব্বনাশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিন যায় দিন আসে, কিন্তু যে দিন একবার যায়, সেদিন আর ফিরিয়া আসে না। সেই একই সূর্য্য দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন করিতেছে, কিন্তু সে দিন আর ফিরিয়া আসে না; আসিলে জগতে এত কষ্ট—এতদুঃখ—এত যাতনা থাকিত না, সুখের মধ্যাহ্ন কখনও দুঃখের গভীর অমানিশায় মিলাইয়া যাইত না;—যে সুখী, সে চিরকাল সুখীই থাকিত, যে দুঃখী তাহার চিরদিনই দুঃখে কাটিত। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, আলোক ও অন্ধকারের এ ভোজবাজী—ভাগ্যের বিড়ম্বনা দেখিতে—সহিতে হইত না। হায়, মানব কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর! একটা সামান্য কীটের যে স্বাধিনতা আছে, তাহা তোমার নাই। কীট আপনি চলে, আপনি ফেরে, আপন ইচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সুখের জন্য লালায়িত বা দুঃখের জন্য কাতর হয় না, সুখদুঃখ তাহার সমান—যে বিষ্ঠার কৃমী সে বিষ্ঠার হ্রদে স্বর্গ সুখ অনুভব করে, কিন্তু তুমি মানব প্রকৃত স্বর্গ হাতে পাইয়াও সুখী হইতে পার নাই! এ সুখের ধারনা, এ মায়ার কল্পনা কোথায় পাইলে? সুখ তোমার, কি তুমি সুখের, স্মৃতি তোমার, না তুমি স্মৃতির? সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম বলিয়া তুমি গর্ব্ব করিয়া থাক, যেন মন তোমার অধীন এবং সুখ দুঃখ তোমার হাতের পুতুল মাত্র, কিন্তু তাহা কই? যে বশিষ্ঠ পরম যোগী, তিনিও পুত্র শোকে গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ডুবিতে গিয়াছিলেন; যে ব্যাস পরম পণ্ডিত, তিনিও প্রিয়তম পুত্র শুক দেবকে সংসার ছাড়িতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন, আবার যে শুকদেব যোগ ও সন্ন্যাসের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিও একদিন আগুণ ভয়ে আপনার দণ্ড কমণ্ডলুর জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; তবে তোমার যোগ, তোমার সন্ন্যাস, তোমার পাণ্ডিত্য কোথায়? নীচ স্বার্থপরতা তোমাকে নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তোমার সমুদয়ই ভণ্ডামি। অন্তরের আবরণ খুলিয়া ফেল, মনের মালিন্য সপ্ত সমুদ্রের জল দিয়া ধৌত কর, নিরপেক্ষ ভাবে একবার হৃদয় খুলিয়া দেখ, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিবে। তখন বুঝিতে পারিবে যে, ক্রূর সর্পেরও যে সরলতা আছে, তোমার তাহা নাই, তুমি সর্প অপেক্ষাও ক্রূর; ঈশ্বরের অনুগ্রহে সংসারের শ্রেষ্ঠজীব হইয়া তুমি সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহের অবমাননা করিতেছ, আপনার ক্ষমতা ও বিদ্যার দোহাই দিয়া সুনিয়মের রাজ্যে অনিয়মের বাজার বসাইয়াছ।

সেই সুন্দরীকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, মনে হইল আহা, এ শুভ্র জ্যোৎস্নাতেও মালিন্য! এই স্বর্গীয় প্রতিমাতেও দুঃখ! চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিয়া সাদরে বলিলাম, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আমি নাইবা খাইলাম, সে জন্য আপনার দুঃখ কি? আজ আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি কিছুই খাইব না।

আমি খাইলাম না বলিয়া তিনি যে কেন কাঁদিলেন, তাহা আমি তখন বুঝিতে

পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গে এই প্রথম দেখা; ইহার পূর্ব্বে তিনিও আমাকে জানিতেন না; আমিও তাঁহাকে জানিতাম না, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা সমবেদনা জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তখন আমি এত ভাবনা কিছুই ভাবি নাই। সেই অজানিত শত্রুপূর্ণ স্থানে তাঁহাকে আমার জন্য দুইবিন্দু অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া ভাবিলাম, তিনি আমার প্রকৃত বন্ধু; ভাবিলাম, বুঝি এই বিপদ হইতেই ক্রমে সম্পদের সূচনা হয়; কিন্তু আমি সে দিন কিছুই খাইব না সুতরাং তিনি বার বার অনুরোধ করিলেও আমি তাঁহার কথা রাখিতে পারিলাম না। তাঁহার হাত হইতে গ্লাসটী লইয়া "ইহাতেই আমার খাওয়া হইল" বলিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলাম, তখন তিনি আমার হাত ধরিয়া সম্মুখস্থ একখানি খাটের উপর বসাইলেন, নিজেও বসিলেন এবং শারদীয়া শতদলের ন্যায় বিশাল নয়ন দুইটী আমার মুখের উপর সংযত করিয়া মধুর হাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই তোমার নামটী কি?"

"মনোমোহিনী"

নামটী শুনিয়া তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন, সুন্দর গ্রীবা ঈষৎ বাঁকাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন কি ভাবিলেন, পরক্ষণেই হাসিয়া আমায় বলিলেন, "তবে তো তুমি বাস্তবিকই আমার ভগিনী।"

আমি বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম, ইহাঁর সহিত সত্য সত্যই কি কোন সম্বন্ধ আছে নতুবা প্রথম দর্শনেই এত যত্ন, এত ভালবাসা কেন? একটু ভাবিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা হইলে আজ হইতে তুমি আমার দিদি হইলে, কিন্তু দিদি, তোমার নামটী কি তাহা আমি জানিতে পারি না?

"ভুবনমোহিনী"

রূপ যেমন, বাস্তবিক নামটীও ঠিক তাহার উপযোগী

কোজাগর।

ষড়্ দোষা পুরুষেনেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

শেহলি! ঢাল কুসুম মৃদু ভার,
চন্দ্রমা অমিয় বিলায়ে।—
মৃদুল শিশিরকণ বাট ভিজায়ল,
চামর পল্লব ঢুলায়ে।
মাগে শরদ আজ, চরম বিদায়,
কৌমুদী কিরণ বিছায়ে।
গাঁথ কুসুম সব লতিকা! নিকুঞ্জে,
পরিমল বহসি সমীর!

জ্বাল প্রদীপচয়, নিরমল তারক!
বারিধি! গাহ গভীর।
আয়ল ভারত, জগজন মাতা,—
দুন্দুভী মধুর নিঘোষ;
গাহ জগজন! মঙ্গল গীতি,
অলস বিবশ পরিমোষ।
লাও সখীগণ! পাবন বারি,
বিল্ব তুলসী ফুলভার,
স্থাপ কদলীঘট, রচহ রসালে
তোরণ পল্লব হার।

দীন নয়না আজু, ভারতমাঝি,
মলিন বসন পরিধান,
শোক তমস ঘন—চিত্ত পরিখেদিত
চন্দ্র বদন পরিম্লান।
উঠ উঠ ভামিনি! শোক অধীরে!
মুছ মুছ নয়ন কি বারি,
আয়ল প্রিয়সখী, জননি! তুহারি
লহ লহ কোর পসারি।
চরণ কমল পর পরিমল লোলুপ
গুঞ্জে ভ্রমর অবরাম,
শ্রীকর কমল ধৃত কুবলয় কোমল
কণ্ঠে বিকচ ফুল দাম।
তরুণ অরুণ নিভ রক্তিম অম্বরে
আবৃত চম্পক আভা,
রতন মুকুট পর ঝলসিত দামিনী
রাকা বিশদ মুখশোভা।
চামর স্থচিকন, অঞ্জন গঞ্জিত
পৃষ্ঠে পতিত কেশ পাশ,
উজল দশন মতি—বিজড়িত বাঁধুলী
অধরে মধুর মৃদু হাস।
উঠ উঠ ভারত! ক্ষণ পরিরম্ভন
বিরহ কি দহন নিভাও,
ক্ষণিক চিরন্তন তমস গভীরে
চন্দ্রিকা চমক মিলাও।
যাপ রজনী আজু, ভারত সন্ততি!
মোহ বিহীন আঁখি তারা,
ক্ষণিক বিমুঞ্চত, অলস বিলাসে,
জাগর জননী পিয়াবা!
ঘোর তিমির ঘন, বরষ সংস্রে
ছায়ল ভারত ধাম,
অতল জলধীতল গাঢ় নিমজ্জিত
চিরতর ভূতি বিরাম।
কাহে জননী! তুঁহু সাগর পারে,
কহ কহ কোন বিষাদে?
অধম-অবশ-মৃত ভারত সন্ততি
পতিত বিষম পরমাদে।
আও চপলে! পুনু, নিদয় পাষাণী
ডাকে ভকত যুগ পানি,
বাস চিরন্তন, ভারত তুহারি,
ঘোষে জগত ইহ বাণী।
আও জননী! পুনু, চরণ প্রখালিব
প্রেম নয়ন কণ দানে।
আজু রজনী সবে, নয়ন বিনিদ্রিত
যাপিব তব গুণ গানে।

হিন্দু-মহিলা।

(৩)

আমি অদ্য যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, একখানি উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছি। ইহার উপাদান-নিচয় সম্পূর্ণ ঔপন্যাসিক হইলেও ইহার অনুশীলন অতীব দুরূহ। কারণ, ইহার কোন কূল কিনারাই পাওয়া যায় না। ইহা অতি প্রাচীন—আদিম কালের বিষয়। যখন মানব অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন,—পাশবী প্রবৃত্তির স্রোতে নিয়ত ভাসমান, আত্ম-সংযমে অপারগ, আত্ম-চিন্তায় অক্ষম, আত্ম-রক্ষণে প্রায়ই অসমর্থ; যখন সমাজ-বন্ধন সুদূর-পরাহত, রাজশাসন কল্পনায় পর্য্যবসিত, বহির্জগতের প্রভাবে মানব বাহ্য প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নকরূপে অবস্থিত;—

আদিম জগতের সেই শোচনীয় দুরবস্থা দূর করিয়া মানব কি প্রকারে সভ্যতার সৃষ্টি করিল, পশুজগতে কি প্রকারে দেবভাব প্রাদুর্ভূত হইল, বিদ্যার বিমল আলোকে—সত্বগুণের স্বর্গীয় প্রভাবে, কিরূপে নরকের অন্ধকূপে স্বর্গের আবির্ভাব হইল, ছিন্ন ভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, পাশব স্বার্থসাধনে ইতস্ততঃ উদ্দামগতিতে ধাবমান মানবগণের মধ্যে কিরূপে সুদৃঢ় সমাজ শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হইল, কিরূপে আত্মবিস্মৃত, বিড়ম্বিত হিন্দু রমণীগণ জগতের অন্যান্য রমণীগণের ন্যায় সমাজের আকর্ষণদণ্ডরূপে পরিগণিত হইল,—নিজের স্বার্থ বুঝিয়া পাইল, কমনীয় ভাবের সুকুমার প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তিস্থল হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

মানব সমাজের সেই শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় ভাবিয়া কে কল্পনা করিয়াছিল যে, মনুষ্যসমাজ একদিন উন্নত হইয়া দেবতারও সমকক্ষ হইবে? একদিন মানব বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপরও স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া জগতের চক্র চালিত করিবে? অবশ্য এই সকল দুরূহ প্রশ্ন এক দিনে, এক সময়ে একজনের মনে উত্থিত হয় নাই, এক ব্যক্তিও এই সকলের মীমাংসা করে নাই;—অভাব ও আবশ্যকতার অনুসারে নিয়ন্ত্রিত বা গঠিত হইয়া এক একটী সমস্যা কালে কালে এক একটী মহাপুরুষের মনোমধ্যে উদিত এবং তাঁহা কর্ত্তৃকই মীমাংসিত হইয়াছে। যেখানে অভাব গুরুতর ও অধিকতর দুঃসাধ্য; বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব যেখানে ঘোরতর প্রতিকূল, সেইখানে সিদ্ধিলাভের জন্য মানবকে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত প্রচণ্ড সমর করিতে হইয়াছে। একটী প্রশ্নের সমাধানে—একটী অভাবের দূরীকরণে কোন কোন ব্যক্তি চিরজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হয়ত দুই তিন পুরুষ ধরিয়া সেই চেষ্টা চলিয়াছে; শেষে কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্যার মীমাংসা করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজশরীর একদিনে গঠিত হয় না, একমাসে বা বৎসরে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। যে সময়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তখন জগৎ শৈশবে মাত্র প্রবিষ্ট। শিশু প্রসূত হইবামাত্রই কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই কখনও ফল পুষ্পান্বিত প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হয় না;—মানবের শত চেষ্টা ও সহস্র সাধনাও কখনই একদিনে বা এক মুহূর্ত্তে এই অসম্ভব অবস্থান্তর ঘটাইতে পারে না। সংযোটক অবস্থানিচয়ের আনুকূল্যে, উপযুক্ত পোষণ দ্রব্যের সাহায্যে শিশুর শরীর ও মন যেমন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে; ক্রমে যৌবনে পিতা মাতার স্নেহ, পরিজনবর্গের যত্ন, গুরুর উপদেশ, দম্পতির সাহচর্য্য এবং দেশ ও কালের প্রভাব তাহার মনোবৃত্তি নিচয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তিলাভে সহায়তা করে; বিরাট মানবসমাজ সেইরূপ বিবিধ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক অর্থাৎ মানবীয় অবস্থা ও প্রভাব দ্বারা নিয়মিত হইয়া ক্রমান্বয় উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। একটীমাত্র মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণে বাহ্য অন্ত-

জগতের যতটুকু আরাম ও যত্ন, এবং কালের যে পরিমাণ প্রভাব আবশ্যক হয়, তাহার সহস্র গুণ প্রযুক্ত না হইলে কখনও একটা বিশাল সমাজের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং সুবিশাল মানবসমাজ ভিন্ন ভিন্ন মানবমাত্রেরই কার্য্য পরম্পরার ফলসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে দেশের মানবীয় কার্য্য সমধর্ম্মান্বিত, সেই দেশের মানব সমাজ শীঘ্র শীঘ্র স্ফুরিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে দেশে ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে দেশে মানবীয় কার্য্যাবলী পরস্পর বিসম্বাদী, তত্রত্য সমাজ শরীর নিত্য গঠিত ও ভগ্ন হইয়া অবশেষে জীবন সংগ্রামের পর্য্যবসানে এক প্রকার স্থায়িত্ব লাভ করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রমণীই সমাজের আকর্ষণদণ্ড; সমগ্র মানব সমাজই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় ইহাদের একটী অনুপম শক্তি দ্বারা এই দণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই অনুপম শক্তি ইহার প্রত্যেক পরমাণুর ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং সেই শক্তির সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজ সৃষ্ট বা গঠিত, পরিপুষ্ট ও পরিণত হইয়া থাকে। ভারতীয় আর্য্য-মহিলার অবস্থান্তরের সহিত ভারতীয় আর্য্যসমাজ কিরূপে রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য কিন্তু এ আলোচনা অতীব দুরূহ, ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থেই ইহার কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না,—কোন স্থানেই ইহার কোন উপকরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং অনেকস্থলে অনুমানের সাহায্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। তবে সকল বিষয়েরই যেমন একটা বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট গতি আছে, প্রাচীন পরিণত হিন্দুসমাজের আলোচনা করিলে আদিমকাল হইতে তাহা কিরূপ গতিতে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতির বিশাল মানচিত্র এ বিষয়ে আমাদের প্রধান সহায়। আমরা সেই মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণীপুঞ্জের প্রত্যেক কার্য্যের অনুশীলন করিতেছি। জননীর স্নেহ, দম্পতীর সাহচর্য্য, আত্ম-রক্ষার্থ অথবা শত্রুবিরুদ্ধে একের অথবা একীভূত সম্প্রদায়ের সমবেতচেষ্টা, ইহা আমরা সামান্য স্বেদজ ও অণ্ডজ কীট-দিগের—এমন কি ইহার কোন কোন বৃত্তি উদ্ভিজ্জগণেরও মধ্যে দেখিতে পাই। এইগুলির মধ্যে একমাত্র জননীর স্নেহ ভিন্ন অপর বৃত্তিগুলির স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়েরই মধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়। নিরুপায়, সম্পূর্ণ অশক্ত, অনন্যগতি শিশু সন্তানের রক্ষা ও লালন পালন, শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার জীবন রক্ষার্থ নিজ জীবন ত্যাগেও অকুণ্ঠতা; মৃদুতা, বিনয়, ব্রীড়াশীলতা, অপ্রগল্‌ভতা;—এগুলি স্ত্রীজাতির স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। এ সকল ধর্ম্মের ব্যভিচার হইলে স্ত্রীর আর স্ত্রীত্ব থাকে না। এই গুলিকে সুকুমার বৃত্তি বলা যায়। এই সকল সুকুমার বৃত্তি, স্ত্রীজাতি যে সৃষ্টির আদিম কাল হইতে অধিকার করিয়া আসিতেছে, তাহা সকল জাতির সৃষ্টিবিষয়ক বিবরণ পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই স্ত্রীজাতি পুরুষের ছায়া অথবা অঙ্গজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইতর প্রাণী বর্গের ও স্ত্রী চরিত্র বিশ্লেষিত

করিলে এইরূপ অবস্থা নিশ্চয়ই লক্ষিত হয়। কি কারণে স্ত্রীজাতি এই সকল সুকুমার বৃত্তির অধিকারিণী হইল, অদ্যাপি কেহই সেই গভীর রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারে নাই। কপিল, পাতঞ্জল, এরিষ্টট্‌ল, প্লেটো, ডারউইন, সেল্‌স্পার প্রভৃতি দিগ্‌গজ দার্শনিকগণ এই মহা রহস্যের উদ্‌ঘাটনে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না। যাহা বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের নিজস্ব, তাহার কারণানুসন্ধানে চেষ্টা মানবের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

বউ কথাকও পাখী।

সরস নিহার হারে ফুল কুলে কি শোভারে
নীরবে আঁধার ছাড়ে নীলিম মণ্ডল
মধুর উচ্ছ্বাস শ্বাসে বঁধুর পরশ বাসে
সোহাগে সমীর চালে উষার অঞ্চল

রঙ্গিল কিরণ আলা পরিমল পূত ডালা
প্রতিকৃতি প্রকৃতির সহাস বয়ান
এ সময়ে কেবে পাখী বল কার মন রাখি
বরষ সুধার ধারা মধুময় তান

প্রতিধ্বনি প্রীতিআশে সুস্বর লহরে ভাসে
দিগন্ত শিহরে স্বরে পুলক প্লবিত
কুমুদিনী নিরাশায় শেষ শশী পানে চায়
সুধাংশু সুশীত গতি কমল কম্পিত

কেবা তোরে শিখাইল কি হেতু বলরে বল
এ মধু সাধক গীত পীরিত পিয়াসে
ললিত বল্লরী লাজে 'বউ কথাকও' বাজে
নিভৃত নিকুঞ্জে ঘন কি সাধ আভাসে

সুখ নিশা সুবাহিত বিনোদিনী বিগলিত
অধীর অধরে যুবা আদরে যতনে
তব তান অনুরাগে কামিনী সোহাগে জাগে
বিলাস বিলোল হাসি অলস নয়নে

পরশে সরসে চিত প্রাণে প্রাণ বিকসিত
ঝরিত ললিত গীত প্রেম প্রস্রবণ
কি মন রমণ তান সলাজে শিথিল মান
মিলিত মানিনী কাণে পীড়ন চুম্বন

বিরহিণী ম্লানমুখী শমন স্মরণে সুখী
হৃদে সাধ-অপবাদ অভাবে বিভোরা
'উহু উহু' প্রেম দায় কোকিল কুজন তায়
বিরহি নয়নে জল কোথা মনচোরা

হিল্লোলে হেলিত শাখী নির্ভয় নিলাজ পাখী
পাগল প্রাণের দায় শুনাও কাহারে
এ গাথা কোথায় পেলে কাবে হৃদি দাও ঢেলে
সুধাই ব্যথার ব্যথী কহনা আমারে

কারে মুখ না দেখাও আর্দ্রিত অন্তরে
বিজন নিকুঞ্জে যাও কিবা অন্বেষণে
পাখিরে তোমার মত আমিও গেয়েছি কত
সেধেছি হৃদয় দিয়ে তাহার চরণে

ভুলিব কি ভালবাসি আমিও বিজনবাসী
আমিও পাগল পাখী সে মম উদাস
কি তব মোহন গীত হের হৃদি উছলিত
শুষ্ক নেত্রে হের নব আশার আশ্বাস

কত দেশে মধু ঢাল গাও পাখী গাও ভাল
যাবে কি যাবেরে কভু যথা সে আমার
যাও যদি বল তাকে কেন সে নীরবে থাকে
পাখীরে মধুর কণ্ঠে কিবা বল আর?

বায়ু, পিত্ত ও কফ।

যে তিনটী দোষে সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র গ্রথিত, যে বায়ু পিত্ত কফ দ্বারা সমুদায় রোগ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হইয়া আসিতেছে, যাহাদের সমতাকে আরোগ্য ও বৈষম্যকে ব্যাধি বলা যায়, যে দোষ ত্রয়ের গতি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে রোগ সমুদায় অনায়াসে প্রতিকৃত হয় এবং যথাযথ অবধারণ করিতে না পারিলে শত শত ঔষধেও কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই বিষয় বিবৃত করা যুক্তিযুক্ত।

"বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ।
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ॥

মহর্ষিগণের এই সারময় বাক্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ব্যাপার নহে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পিত্ত এবং শ্লেষ্মার উৎপত্তি, আকার, আশ্রয়, লক্ষণ এবং উহারা আমাদিগের শরীর ধারণের অনুকূল যে যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বায়ু যে কি কারণে দেহ ধারণের প্রধান উপকরণ বলিয়া আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না, এইরূপ সন্দেহ ও তর্ক বিতর্ক অনেক সময় অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, তাই আজ যথাসাধ্য বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বরূপ, কার্য্য, আশ্রয় ও প্রকোপাদি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বায়ু, পিত্ত এবং কফ সংক্ষেপতঃ এই তিনটী দোষ বিকৃত হইয়া শরীরকে বিনাশ করে এবং অবিকৃত থাকিয়া শরীরকে বর্দ্ধন করে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

বাত পিত্ত শ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভব হেতবঃ। তৈ রব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধ সন্নিবিষ্টৈঃ শরীর মিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভি স্তিসৃভি রতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। তএব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতব। তদেভিরেব শোণিত চতুর্থৈঃ সম্ভব স্থিতি প্রলয়েষ্বপি অবিরহিতং শরীরং ভবতি।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মাই দেহোৎপত্তির কারণ। যেমন তিনটী স্তম্ভে একটী গৃহ ধৃত হয়, সেইরূপ ইহারাও অধঃ, মধ্য এবং ঊর্দ্ধদেশে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে ধারণ করিতেছে। একারণ কেহ কেহ এই শরীরকে ত্রিস্থূণ বলিয়া থাকেন। আবার ইহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হইলেই শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং শোণিত এই চারিটী পদার্থ বিনাশকাল পর্য্যন্ত জীব শরীরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহমান থাকে।

গত্যর্থ বা ধাতু উ প্রত্যয় করিয়া বায়ু পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা দ্বারা দেহযন্ত্র সম্যক্‌রূপে পরিচালিত হয়, তাহাকে বায়ু বলে, তপ ধাতু হইতে পিত্ত অর্থাৎ শরীরের উত্তাপ যদ্দ্বারা রক্ষিত হয়, ঐরূপ আলিঙ্গনার্থ শ্লিষ ধাতু হইতে শ্লেষ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীর ও ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ আচ্ছাদিত থাকে তাহাকেই শ্লেষ্ম কহে।

তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধো মধ্যোর্দ্ধ সংশ্রয়াঃ।
বয়োঽহো রাত্রি ভুক্তানামন্ত মধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ॥

সেই বাত পিত্ত শ্লেষ্ম সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইলেও তাহাদের এক একটী বিশেষ আশ্রয়স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে নাভীর নিম্ন অর্থাৎ কটিদেশ ও মলাশয় বায়ুর আশ্রয়স্থান। হৃদয়ের অধঃ নাভীর উর্দ্ধ পক্কাশয়, ঐ পক্কাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যস্থান পিত্তের আশ্রয় এবং হৃদয়ের উপবিভাগে আমাশয়, ঐ আমাশয় শ্লেষ্মার আশ্রয়স্থান।

ঐ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা বয়স, দিন, রাত্রি এবং ভোজনের অন্ত, মধ্য ও আদিতে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় বায়ু, মধ্যাবস্থায় পিত্ত ও শৈশবে শ্লেষ্মা প্রধানভাবে বহমান থাকে, দিবস ও রাত্রির অন্তে বায়ু, মধ্যে পিত্ত এবং আদিতে শ্লেষ্মার প্রকোপ পরিলক্ষিত হয় ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বায়ু, পচ্যমান অবস্থায় পিত্ত এবং ভোজন করিবামাত্র শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।

বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগৎ দেহং কফপিত্তানিলা স্তথা॥

যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু বিসর্গ (ক্ষরণ) আদান, (আকর্ষণ) ও বিক্ষেপ (সঞ্চালন) ক্রিয়া দ্বারা জগৎরূপ বিরাট দেহকে ধারণ করিয়া আছেন সেইরূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু জীবদেহ ধারণ করিতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যেরূপ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেইরূপ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা জীব দেহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সমাধান করিতেছে।

ভিষগ্‌বর সুশ্রুত বলিয়াছেন—

স্বয়ম্ভূরেষ ভগবান্ বায়ু রিত্যভিশব্দিতঃ।
স্বাতন্ত্র্যা ন্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বা ত্তথৈব চ॥
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
স্থিত্যুৎপত্তি বিনাশেষু ভূতানা মেষ কারণম্॥
ইত্যাদি।

ভগবান স্বয়ম্ভুই বায়ুনামে অভিশব্দিত হইয়া থাকেন। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগত। সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সর্ব্বাত্মাস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি জীব সমূহের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের কারণ। এই বায়ু স্বয়ং অব্যক্ত কিন্তু ইহার ক্রিয়া সমুদায় প্রত্যক্ষ করা যায় ও তদ্দ্বারাই ইহার অনুমান করা হইয়া থাকে।

বায়ু রুক্ষ, শীত, লঘু, খর, তির্য্যগ্‌গামিত্ব, শব্দ এবং স্পর্শ গুণবিশিষ্ট ও রজোগুণ-বহুল, ইহার শক্তি অচিন্ত্য। বায়ু দেহস্থ দোষ সমূহের নায়ক ও রোগ সমূহের রাজা। এই বায়ুই দেহ মধ্যে আশু কার্য্যকারী ও শীঘ্র বিচরণ-শীল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার অশ্রয়স্থান। বায়ুর এই একটী নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় স্থান হইলেও উক্ত বায়ু ক্রিয়া প্রভৃতির পার্থক্য বশতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ স্থানে থাকিয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা করিতেছে। যে বায়ু মুখমধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণ বায় বলে, প্রাণ বায়ু দ্বারা ভুক্ত বস্তু জঠরগত ও দেহ রক্ষিত হয়। যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে শ্বাস প্রশ্বাসকালে তাহাকে উদান বায়ু বলে। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করতঃ যে বায়ু ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে ও সেই সমস্ত রস পৃথক্ করিয়া দেয়, তাহাকে সমান বায়ু কহে।

সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ-শীল বায়ুকে ব্যান বায়ু বলে। এই ব্যান বায়ু আহারীয় রস সমুদয়কে সর্ব্বশরীরে পরিচালিত করে এবং ইহা দ্বারা ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাবাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। অপান বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিতি করে। ইহা দ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ, আর্ত্তব ও শোণিত আকৃষ্ট হইয়া যথাকালে অধোনিঃসারিত হয়। এই অপান বায়ুর প্রকোপেই বস্তি ও গুহ্যদেশ-সংশ্রিত পীড়া জন্মে। এই অপান ও ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া শুক্রদোষ ও প্রমেহাদি জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত বায়ু সমুদয় যুগপৎ কুপিত হইলে নিশ্চয়ই দেহ বিনষ্ট হয়। এতাদৃশী মহিয়সী শক্তি সন্দর্শনে মহর্ষিগণ বায়ুকে বিশ্ব ব্যাপক বিষ্ণু বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ ও অপরাপর গ্রন্থকার পাঁচটী প্রধান বায়ু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পাদক প্রাণ বায়ু তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে দেহস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সেই প্রাণ বায়ু সম্ভূত হইয়াছে। তাঁহারা সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া বাহেন্দ্রিয়কার্য্য ও আভ্যন্তরিক কার্য্যের প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। তন্ত্রকারগণ আরও বলেন যে বায়ুবাহিনী ধমনী সমস্ত মেরুদণ্ডে সংলগ্ন। জ্ঞানশক্তি-বাহিনী, ইচ্ছাশক্তি-বাহিনী ও ক্রিয়া-শক্তিবাহিনী এই তিনটী নাড়ী প্রধান বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল ধমনী দ্বারা তড়িন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি দেহে এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিতা হয়।

হয়ত বায়ু পিত্ত কফের এতাদৃশী শক্তি সমালোচনা সন্দর্শনে পাণ্ডিত্যাভিমানী পাশ্চাত্য চিকিৎসালোক প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, লেখক নিতান্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, নতুবা এরূপ কথা কেন লিখিবেন। যাহার মনে যাহা উদিত হয়, তিনি তাহাই বলুন কিন্তু আমারা এই অদূরদর্শী লোকের অকিঞ্চিৎকর উপহাসে বিরত থাকিব না। পরম কল্যাণকরী আর্য্য চিকিৎসার যথার্থতত্ত্ব ও উৎকর্ষ সহস্র বার সহস্র মুখে ব্যক্ত করিব। ঘরের ধন পরের কথায় কেন ত্যাগ করিব। অন্ধ যদি মনোহর চিত্র দর্শনে বঞ্চিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঘৃণা করে, বধির যদি সুমধুর সঙ্গীতে বঞ্চিত হইয়া মিথ্যা কর্ণ পীড়াকর বলিয়া নিন্দা করে, মূক যদি সৎসঙ্গের সদালাপকে কালক্ষয়কর বৃথাশ্রম বলিয়া মনে করে, তবে কি সকলে নয়ন পরিতৃপ্তিকর চিত্র দর্শন করিবে না? শ্রবণ সুমধুর মনোরঞ্জন সঙ্গীত শ্রবণ করিবে না? জগতের একমাত্র সারকর্ম্ম সজ্জন-সদালাপ করিতে বঞ্চিত থাকিবে? ইহা কখনই সম্ভবেনা, সুতরাং যাহার যাহা মনে লয় বলুন না কেন, আমরা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। বায়ুঃ পিত্তং কফঃ ইত্যাদি—এইরূপ সূত্র কোন্ প্রণালীর চিকিৎসাগ্রন্থে অদ্যাবধি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে? কোন্ চিকিৎসা শাস্ত্র এইরূপ এক অক্ষুণ্ণ সূত্রে অবলম্বিত? অদ্যাবধি এই ঋষিবাক্যের ন্যায় একটী বাক্য ও প্রকাশিত

জগতে হয় নাই, বোধ হয় হইবেও না। আর বাস্তবিকই এইরূপ বাক্য যাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি কখনই সামান্য মানব বলিয়া প্রতীত হন না, নিশ্চয়ই তিনি মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই।

অনন্তর পিত্তের আকৃতি ও কার্য্যাদি বিশেষরূপে প্রকাশ করা যাইতেছে—

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণ মম্লন্তু পাকতঃ॥

পিত্ত উষ্ণ, দ্রব, পীত, নীল, অর্থাৎ আমরস শূন্য পিত্ত পীতবর্ণ এবং আমরসযুক্ত পিত্ত নীলবর্ণ, রজোগুণাত্মক, সারক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ এবং অম্লবিপাক।

একই পিত্ত নাম, স্থান ও কর্ম্মভেদে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এই পাঁচটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নি বলবর্দ্ধনম্॥

পাচক পিত্ত আম পক্কাশয় মধ্যস্থ ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই ষড়্‌বিধ ভুক্ত বস্তুর পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ভুক্ত বস্তুৎপন্ন রস বায়ু পিত্ত কফ ও মূত্র পুরীষ প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়।

তদগ্ন্যাশয়স্থমেব স্বশক্ত্যা রসরঞ্জন হৃদয়স্থ কফতমোঽপনোদন রূপগ্রহণ প্রভাপ্রকাশন অভ্যঙ্গ লেপাদিপাচনাদ্যগ্নিকর্ম্মণা শেষাণাং পিত্তস্থানানা মনুগ্রহং করোতি।

সেই অগ্ন্যাশয়স্থ পিত্ত স্বীয় শক্তিবলে ভুক্তদ্রব্যোৎপন্ন রসের রঞ্জন, হৃদয়স্থিত কফ ও তমোগুণের অপনোদন, রূপগ্রহণ, চন্দনাদি আলেপনের পরিপাক ও দৈহিক শোভা প্রকাশ প্রভৃতি অগ্নি কর্ম্ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ পিত্তস্থান সমুদয়ের সাহায্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ রঞ্জকাদি পিত্তের আশয় যকৃৎ প্লীহাদি যন্ত্রে উপস্থিত হইয়া তত্তৎস্থানীয় রঞ্জনাদি কার্য্য সমুদয় দ্বারা উপকার করিয়া থাকে।

শেষাগ্নি বলবর্দ্ধনমিতি শেষাঃ অগ্নয়ঃ পৃথিব্যাদি মহাভূতগতাঃ সপ্তধাতুগতাশ্চ।

পাচক পিত্ত পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যানন্তর ভূমি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতাগ্নি ও রস রক্তাদি সপ্তধাত্বগ্নির শক্তিকে বর্দ্ধিত করে।

যথা গৃহে স্থাপিতানি রত্নানি খদ্যোতবৎ দূরভাস্বরাণি তান্যপি দীপজ্যোতিষা দূর প্রকাশকানি ভবন্তি তথা অগ্ন্যাশয়স্থ পাচকাগ্নি তেজসা সর্ব্বে অগ্নয়ো বলবন্তো ভবন্তি।

গৃহস্থিত রত্নাদি যেমন সূর্য্যের ন্যায় দীপালোকে অধিকতর তেজঃসম্পন্ন হইয়া সুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করে, সেইরূপ পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে থাকিয়া স্বীয় তেজঃ দ্বারা অপরাপর অগ্নির তেজঃ বৃদ্ধি করে।

পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থানে যে পিত্ত অবস্থান করে, যে পিত্ত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাত্মক হইলেও আগ্নেয় গুণের আধিক্য হেতু জলীয়ভাগ বিহীন হইয়া পাকাদি কর্ম্ম অব্যাহত রূপে সম্পাদন করিয়া অগ্নি নামে খ্যাত, যে পিত্ত ভুক্ত বস্তুকে পরিপাক করে এবং

ঐ অন্নের সারভাগ ও মলকে পৃথক্ করে ও যে পিত্ত আমাশয় এবং পিত্তাশয়ের মধ্যে থাকিয়া অবশিষ্ট পিত্ত সকলের শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম পাচক পিত্ত বা জাঠরাগ্নি।

উক্ত মীমাংসায় একটী সন্দেহ হইতে পারে যে, পিত্ত ও অগ্নি এক বস্তু হইলে গুণের পার্থক্য দেখা যায় কেন? ঘৃত পিত্তনাশক অথচ অগ্নির উদ্দীপক, মৎস্য পিত্তবর্দ্ধক অথচ অগ্নির দীপ্তি করে না, ইহা কিরূপে সম্ভবে? ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ করিতে হইবে যে, পিত্তই অগ্নির আধার এবং তেজোময় পিত্তের উষ্মাই অগ্নি। পিত্তের উষ্মাস্বরূপ সেই কুক্ষিস্থ অগ্নি ধমনী সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চরণ করে, ইহাই কায়াগ্নি বা কায়োষ্মাদি নামে অভিহিত হয়।

কেহ কেহ বলেন জাঠরাগ্নি ভিন্ন পদার্থ। তাঁহাদের মতে নাভীর কিঞ্চিৎ বাম পার্শ্বে সোমমণ্ডল, সেই সোমমণ্ডলের মধ্যে কাচপাত্রাচ্ছাদিত (চিমনীর মধ্যস্থিত) দীপের ন্যায় জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি অবস্থিতি করে।

ব্যাখ্যা মধুকোষকার বলিয়াছেন যে, দ্রবভাগ ও তেজোভাগ এই সমুদয়াত্মক পিত্তের তেজোভাগই অগ্নি, একারণ পিত্তকেও অগ্নি বলা যায়। যেরূপ অগ্নি সন্তপ্ত লৌহ পিণ্ডকে অগ্নি বলা যায়, সেইরূপ। পরমার্থত স্থূল অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ সন্দেহ নাই।

যকৃৎ এবং প্লীহার মধ্যে যে পিত্ত অবস্থিতি করে তাহাকে রঞ্জক পিত্ত বা অগ্নি বলা যায়, ঐ পিত্ত দ্বারা আহারজাত রস রঞ্জিত (রক্তাকারে পরিণত) হয়।

যে পিত্ত হৃদয়স্থানে অবস্থিতি করে, তাহাকে সাধক অগ্নি বা পিত্ত বলা যায়, ঐ পিত্ত দ্বারা হৃদয়ের শ্লেষ্মা ও তমো গুণ দূরীকৃত হইয়া মানসিক অভিলাষ উৎপাদিত হয়।

যে পিত্ত দৃষ্টিস্থানে অবস্থিত, তাহাকে আলোচক বলা যায়। ঐ পিত্ত দ্বারা বাহ্য বস্তুর রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়।

শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণবহুল ও মধুররস। ইহা বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়।

শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়। ঐ স্থান পিত্তাশয়ের উপরিভাগে। শ্লেষ্মা ও পিত্ত পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। পিত্ত ঊর্দ্ধগতি। চন্দ্র যেরূপ সূর্য্যের ক্রিয়ার আধার, শ্লেষ্মাও সেইরূপ চারি প্রকার আহারের আধার। সেই আমাশয়ের স্থানে শ্লেষ্মার জলীয় গুণ দ্বারা সকল প্রকার ভুক্ত দ্রব্য ক্লিন্ন হয় ও একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তাহাতে অনায়াসেই জীর্ণ হয়। আমাশয় স্থানেই শ্লেষ্মার উৎপত্তি। মাধুর্য্য এবং পিচ্ছিলভাব থাকাতে ভুক্ত দ্রব্য ক্লিন্ন করে, ইহা মধুর রস ও শীতল গুণ বিশিষ্ট।

একঃ শ্লেষ্মা বাতপিত্তবন্নামস্থান কর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ।

একমাত্র শ্লেষ্মা নাম স্থান ও কর্ম্ম-ভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মণ।

উক্ত পঞ্চবিধ শ্লেষ্মা আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধিস্থানে যথাক্রমে অবস্থিতি করে।

ক্লেদন শ্লেষ্মা স্বশক্তিতে অন্ন পিণ্ডকে ক্লেদযুক্ত করে এবং উদক কর্ম্ম দ্বারা অন্যান্য শ্লেষ্মস্থান সমুদয়ের সাহায্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ ক্লেদন নামক কফ ভুক্ত বস্তুকে ক্লিন্ন ফলতঃ বিভিন্ন করিয়া ফেলে, অনন্তর হৃদয়াদি শ্লেষ্মস্থানে গমন করিয়া উদক কর্ম্ম দ্বারা হৃদয়াবলম্বন, ত্রিকসন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রিয় সমুদয়ের তর্পণ ও সন্ধি সংশ্লেষণ প্রভৃতি আনুকূল্য করে।

বক্ষঃস্থিত অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা অন্নরসমিশ্রিত হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা হৃদয়াবলম্বন ও ত্রিকস্থান (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধিস্থলকে) ধারণ করিয়া থাকে।

রসন নামক জিহ্বামূল ও কণ্ঠস্থ কফ রসনেন্দ্রিয়ের সমান, যেহেতু উভয়ই সোম-গুণবিশিষ্ট, পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও রস জ্ঞানের আধার। এই শ্লেষ্মা দ্বারা রস-জ্ঞান হয়।

শিরস্থ স্নেহন নামক শ্লেষ্মা স্নেহ পদার্থ প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে।

শ্লেষ্মণ নামক সন্ধিস্থ শ্লেষ্মা সন্ধি সমূহের সংশ্লেষ বিধান করে অর্থাৎ বন্ধন করিয়া রাখে।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান

এবং

সমীরণ।

১ম খণ্ড। } সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। { ৪র্থ সংখ্যা।

ফুলরা।

প্রথম অধ্যায়।

ফুলবিনা ফুলবার, নাই আর অলঙ্কার
ফুল বিনা ফুলরার নাই আব ধন
নিত্য যদি ফুল পায়; ফুলরা না কিছু চায়
ফুল তুমি ফুলরার জীবন ভূষণ
প্রফুল্ল ফুলের মুখে হাসি
দেখিতে যে কত ভালবাসি
কি করি বেচিতে হয় না বেচিলে নয়
ভালগুলি বেছে তবু পাবি সমুদয়

গড়ি কানের কুণ্ডল, গড়ি কটিব শৃঙ্খল
বাহুবন্ধ সিঁথিহার কত গড়ি আর
লক্ষ টাকা দিলে পরে, সেগুলি না দিই পরে,
ফুল বিনা ফুলরার নাই অলঙ্কার
আজ এ দুটি চাঁপায়
বেচিব না রেখে দিব পরিব খোঁপায়
ভানু না উঠিতে আগে প্রভাতে ফুলরা জাগে
ভয় হয় পাছে তুলি লয় কেহ আর

ফুল বিনা গতি আব কি আছে আমার
কুহু কুহু স্বরে তমালের পরে
কোকিল ডাকিছে
আর কি ফুলের ভয় বসন্ত আসিছে

দেবতরু শিরোপরে, সোনার বরণ ভরে
রবিকর জ্বলে, হলো বেলা বাজারের
সুন্দর মল্লিকাগুলি ত্বরা করে লই তুলি
মমতা কি ছাড়া যায় এমন ফুলের
শীতল বিজন বনে ভৃঙ্গের গুঞ্জন স্বনে
গায় গীত ফুলরা সুন্দরী
অঞ্চল চঞ্চল বায় বিনত কোমল কায়
তোলে ফুল ডালি করে ধরি
তরুণ উরোজ সনে তুলনায় ক্ষণে ক্ষণে
অশোক স্তবক আলিঙ্গিত।
কোমল পরশ ভরে কোমল কামিনী ঝরে
চাঁপা কলি অঙ্গুলিমিলিত

হেঁসে কুন্দে তুলে লয়, করে দলি কিসলয়
কুন্তল লতায় বিজড়িত
কপোলে অলকা নড়ে, ফুলে অলি উড়ে পড়ে
সুষমায় সুষমা মিলিত
ফিরে বালা দেখে চেয়ে, আছে কাছে মুখ চেয়ে
অজানিত যুবা একজন
সরে নব বয়োধর, মনোহর কলেবর
আছে ধন জানায় ভূষণ
ফুলরা অভয় মেয়ে, বারেক নীরবে চেয়ে
পুন ফুল তুলে অকাতরে,
"ভয় কি হয় না মনে, একাকিনী আছ বনে"
জিজ্ঞাসিল যুবা মধুস্বরে
হেসে বালা চেয়ে কয়, "কি হেতু করিব ভয়
কার কোন ক্ষতি নাহি করি
তুলিব বনের ফুল, বেচিব লইয়া মূল,
হিন্দু দেশে কারে তায় ডরি"
পুন যুবা হেসে কয়, যার সঙ্গে ধন রয়,
ধনি! তার পায় পায় ভয়
"ফুল বিনা ফুলরার, কোন ধন নাহি আর"
সরলা ফুলরা পুন কয়
যুবা বলে "তব কাছে, যে অনন্য ধন আছে
চোর তায় হয় সাধু জন"
তখন বুঝিয়া ছল, বলে হেসে ঢল ঢল
"সাধু চোর হয় কি কখন?"
ব্যঙ্গ ছাড়ি যুবা বলে, "থাক তুমি কোন স্থলে
কিবা জাতি কে আছে তোমার"
"নগরের প্রান্তে ঘর, জেতে আমি মালাকর
অন্ধ মাতা কেহ নাহি আর"
"হয়েছে কি পরিণয়" শির নেড়ে পরিচয়
দিল নিজ অনূঢ়াদশার
রব হীন যুবা রয়, মুখভঙ্গি চিন্তাময়
ফুল তোলা সাঙ্গ ফুলরার
বাজারে বেচিতে চলে, "কোথা যাবে" যুবা বলে
"যাই ফুল বেচিতে বাজার
রোদে ফুল শুষ্ক হয়", "তাপ তবে" যুবা কয়
"কুসুমাঙ্গে সবে কি তোমার
"আমি লই দেহ ফুল, বল কি লইবে মূল"
"আমি না বেচিব সমুদয়
ভাল ভাল আছে যত, অলঙ্কার মনোমত
রচিয়া পরিব বালা কয়
"ভ্রমি না বেচিতে হবে, আগে তুমি পর তবে
এখানে বসিয়া অলঙ্কার,
শেষে শেষ রবে যাহা, মূল্য দিয়া লব তাহা
যাবে তবে কি হেতু বাজার
"নাই সুতা কি গাঁথিব, যুবা বলে আমি দিব
দিল নিজ উত্তরি ছিঁড়িয়া
নীল তমালের তলে, বসে বালা কুতূহলে
বসে যুবা নিকটে আসিয়া
ভুজবন্ধ সিঁথি হার, রচি নানা অলঙ্কার
সুখে বালা পরে যথাস্থলে,
চাঁপা দুটি বেধে ছল কবরীতে পরাইল
দেখে "যুবা হয় নাই" বলে
"আমি দিই পরাইয়া" চিবুকেতে কর দিয়া
পরশ সুরস পিয়ে ছলে
দুজন দুজনে চায়, কণ্টকিত দুই কায়
চার আঁখি মিলে গলে, জ্বলে
বিরলে বিজন বনে, নব বয় দুইজনে
সুসম্ভাবে বাসন্তী উষায়
মুঞ্জরী মুকুলে কুঞ্জে, ভৃঙ্গি ভৃঙ্গ রঙ্গে গুঞ্জে
কুহু ডাকে কোকিল শাখায়
ফুলরার ফুলকায়, ফুল আভরণ তায়
ফুলধনু হানে ফুলশর
নয় কহিবার কথা, হৃদয়ে কোমল ব্যথা
যুবক যুবতি জর জর
মৌনানন দুজন, নেত্রে নেত্রে আলাপন
তায় তত ঘুচে না সংশয়
যুবতির হৃদি টুটে, মুখেতে না বাক্য ফুটে
তত ধৈর্য্য যুবার না রয়

"ফুলরারে প্রাণেশ্বরী! ফুলবাণে প্রাণে মরি,"
বলে পড়ে কোলে ফুলরার
ফুলরা অবশ কায়, নাশায় না শ্বাস পায়
রয় স্থির প্রতিমা প্রকার
ক্ষণেক স্বভাব পেয়ে, কহিল যুবায় চেয়ে
একি কর আমি কাঙ্গালিনী
কোন ধন নাই আর, ধর্ম্ম সবে ধন তার
ক্ষমা কর ব'ধনা কামিনী
দেখা হলো তব সনে, দাসী বলে রেখো মনে
বলে বালা নিশ্বাস ছাড়িল
উঠি যুবা ধীরে ধীরে, করে ধরি সুন্দরীরে
"শুন প্রিয়ে" সুধীরে কহিল
"শুনেছ বণিক পতি, হেমরাজ মহামতি
সবে এক পুত্র আমি তাঁর
কি জানি কি হ'ল মন, সেবিবারে সমীরণ,
আইলাম এ বন মাঝার
করিতেছি সত্যপণ, সাক্ষী হও দেবগণ
অন্য নারি বিয়া না করিব
স্বাধীন হইলে পরে, তোমায় আনিব ঘরে
জাতি কুল জ্ঞাতি না চাহিব
যে বিপুল ধন আছে, নত নই কার-কাছে
শঙ্কা করি কেবল পিতার
আজি হতে প্রণয়িণী, নও আর কাঙ্গালিনী
মনিরাজ কিঙ্কর তোমার
ভিন্নজাতি যদি হয়, তবু হলে পরিণয়
ধর্ম্ম লোপ কথায় না হয়
জাতি গড়া মানুষের, প্রেম সৃষ্টি ঈশ্বরের
কেন ধনী কর তবে ভয়
সে ভয় কর'না চিতে, পিতা মাতা পুরহিতে
না দিলে বিবাহ নাহি হয়
চায় যদি পরস্পরে, গন্ধর্ব্ব বিধান ভরে
প্রেমিকের সিদ্ধ পরিণয়
বৃথা ভয় পরিহরি, রাখ প্রাণ প্রাণেশ্বরি,
নয় মরি দেখ সুখভরে
কিছু দিন সযতনে, রাখ প্রেম সংগোপনে
সব শঙ্কা দূর হবে পরে
নারী হৃদি নবনীর, স্পর্শে অগ্নি পিরীতির
কতক্ষণ না গলিয়া রয়
যুবার বচন শুনে, কুসুম শরের গুণে
ফুলরা ভুলিল সমুদয়
যুবায় চাহিয়া কয়, "হেন যদি সত্য হয়
ভয় তবে নাই ফুলরার
কিম্বা যদি অবলাকে, বধিতে বাসনা থাকে
অন্যরূপে বধ প্রাণ তার
কণ্ঠ ধরি দুই করে, কপোলে পুলক ভরে
চুম্বি যুবা বলে, "তবু ভয়?"
বালার বদন পরে, প্রবল তরঙ্গ ভরে
ধাইল শোণিত সমুদয়
এ জীবনে শত শত, সুখ দুঃখ ঘটে কত
কালে সব হই বিস্মরণ
জিজ্ঞাসহ জনে জনে, কার না রে আছে মনে
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন
রসাল অধর পুটে, কোমল কপোল জুটে
রসাল রসনা মিলে তায়
কেমন কোমল স্বরে, বিয়োগে বিলাপ করে
প্রেমে রব প্রকারে জানায়
দেখরে প্রেমের খেলা, পথিকে ২ মেলা
প্রাণ প্রিয় দুজন এখন
কটাক্ষে যে প্রেম হয়, ধন রত্ন করি ব্যয়
আয়াসে তা না হয় সাধন

ফুলরা কহিল তবে, "পুন কাল দেখা হবে"
বলে যুবা সংশয় কি তায়
দেহে যদি রয় প্রাণ, দীর্ঘ দিবা নিশামান
প্রণয়িনী না দেখে তোমায়
একচক্র রথ ধায়, ক্রমে দিবা বৃদ্ধিপায়
দূরে নগরের কোলাহল

নীল তরুদল পরে, আর না নীহার ঝরে
আতপে মলিন ফুল দল
প্রণয় সময় চোর, ভাঙ্গিল প্রেমের ঘোর
ফুলবালা নিকেতনে যায়
দুদিকে দুজন যায়, দুজন দুজনে চায়
প্রেমরজ্জু টানে পায় পায়

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১
কন্দর্প কি পেয়েছিলে হৃদয় এমন
বিন্ধে না কুসুম শর যায়
তোমার মধুর বিষ রস আস্বাদন
আছে কি যে কখন না পায়

২
আছে যে দিনান্তে করে তরু পত্রাসন
আহার লালসা নাই তার
দেখেছি যে দেখে হীরা রজত কাঞ্চন
খনি গুহে পুরীষ ধরার

৩
আছে হেন মানব যে ছেড়ে সিংহাসন
ভালবাসে কাননে থাকিতে
ভালবাসে নাই কভু, কভু হেন জন
ধরায় না পেলেম দেখিতে

৪
না ফুটিতে শ্মশ্রু কারু আগে প্রেম ফুটে
কারু প্রেম জাগে শ্মশ্রু সনে
হায় হাসিবার কথা কারু প্রেম ফুটে
শ্মশ্রু হয় ধবল যখনে

৫
তরুণী তরণী বায় বসি তরিপরে
বায়ুভরে চঞ্চল বসন
কি রহস্য দ্বৈপায়ন জন্মে দ্বিপোপরে
ধন্য তুমি ধানুকি মদন

৬
মুগ্ধমতি ব্রহ্মা প্রেমে নিজ আত্মজার
দেখা যায় পুরাণ পঠনে
প্রেম হীন প্রাণ যদি হবে বিধাতার
সৃষ্টি তবে কোন প্রয়োজনে?

৭
ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মায়া, প্রণয় বা আর
হোক প্রেম যে নাম তোমার
কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি, বাঁধিতে সংসার
সীমন্তিনী তব স্বর্ণকার

৮
জন্মমাত্র ক্ষীণ করে, করি অন্বেষণ
ক্ষীরের হৃদয় জননীর
চির নারী হৃদি ভবে চায় নরগণ
কে ভুলিবে শিক্ষা প্রকৃতির?

৯
প্রেমের সরল পাঠ শিখান মাতার
কে তেমন প্রেম গুরু আর
বনিতার কাছে দিয়া পরীক্ষা তাহার
পুত্র রত্ন পাই পুরস্কার

১০
হ'ক নর কঠোর শ্বাপদ দল প্রায়
তায় দুখ নাহি বাসি অতি
প্রেমময় হৃদি যার রূপময় কায়
সে নারীর পাপে কেন মতি?

১১
লোক পতি মন প্রেম তুমি তার পতি
হতে তুমি রাজার প্রধান
না ভজিতে মন্ত্রি যদি কাল ক্রূরমতি
বিদ্রোহী না হ'ত যদি জ্ঞান

১২
রঙ্গি জাতি অনুরাগ, পতি করুণার
তুমি প্রেম তাদের কুমার
শিখিয়াছ স্তুতি গীত, পঠন পিতার
অশ্রু আঁখি প্রকৃতি মাতার

১৩
জাতি ধন অভিমান, করি পরিহার
হলে তুমি দাস ফুলরার
মনিরাজ কে না নিন্দা করিবে তোমার
হ'লে গুপ্ত রহস্য প্রচার

১৪
আশা কি করেছ প্রেম রাখিবে গোপনে
কহিবে না অতি মিত্র জনে
পরিচয় নীরবে জানাবে প্রতি জনে
সরল সজীব দুনয়নে

১৫
হাস্যাননে আঁখি করে নিরশ্রু রোদন
কপট, অশ্রুতে ডুবে হাসে
বিশেষতঃ বাতুলের প্রেমিকের মন
সদাই চখের পরে ভাসে

১৬
বণিক কুলীন পিতা বিভবের পতি
একমাত্র পুত্র তুমি তার
কি করিবে নিতান্ত কুটিল রতি পতি
কুটিল কুন্তল ফুলরার

১৭
ক্ষতচিহ্ন দেখে বটে, সে হাসিতে পারে
আঘাত না লাগিয়াছে যার
মনিরাজ সেই নিন্দা করিবে তোমার
যে না জানে ফুল শরধার

১৮
কুল ধন অভিমান নরের রচনা
কি ক্ষতি করেছ বিসর্জ্জন ?
রূপ রত্ন লাভ সে না অলিক কল্পনা
বিধির বিনোদ বিশেষণ

১৯
মুদ্রা করে লয়ে কোথা জন্মে কোন জন
কৌলিন্যের চিহ্ন থাকে কার ?
বিধাতার কর কে না করে দরশন
অঙ্গে তার, রূপ আছে যার

২০
নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয়
এল গেলো ক্ষণিক প্লাবন
চির নব যদিও না চির দিন রয়
তথাপি সে রূপ পুরাতন

২১
যত্নে চায় অসিত পক্ষের শশধরে
যত্নে চায় গ্রীষ্ম সরোবরে
ব্যয়ে ক্ষয় দেখে ধন যত্নে চায় নরে
প্রিয় আরো প্রিয় হ্রাস ভরে

২২
প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ
বিশ্ব পটে স্নেহের মার্জ্জন
রূপ তুমি প্রণয়ের অগ্রজ নন্দন
কর যত্নে পিতার পালন

২৩
যে যারে সাজায় তারে প্রেম থাকে তার
সামান্য এ কথা বুঝিবার
অঙ্গে রূপ ভালবাসা দান বিধাতার
ভালবাস অঙ্গে রূপ যার

২৩
রূপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া
উপাসিব পুলকে ধাতার
পাষাণ কাষ্ঠের বেদী কি কায রচিয়া
কি কায বা পট প্রতিমায় ?

২৫

ফুলরার রূপ নয় সে রূপ রচিত
হেথা সেথা দেখি বার বার
গোপনে প্রকৃতি ফুল বনে বিকশিত
না পাইবে উদ্যানে রাজার

২৬

অস্থূল কমল তনু কোমল এমন
অস্থি যেন মৃণালে রচিত
কোমল কমল দলে তনুর গঠন
চম্পকের বরণে চিত্রিত

২৭

কাম্মা কেশ মাঝে সাজে সীমন্ত ধবল
ছায়া পথ অসিত গগণে
মুখ শশী সনে খেলে শিশু মেঘ দল
অলকা চপল সমীরণে

২৮

কি বিশাল ভ্রু কার্ম্মুক আকর্ণকর্ষিত
পক্ষ পূর্ণ তূন দুনয়ন
কটাক্ষ সন্ধানে শর সঘনে চালিত
ধানুকী অনঙ্গ অদর্শন

২৯

হাস্য আন্দোলনে সে লাবণ্য সরোবরে
কপোলে কি আবর্ত্ত লক্ষিত
মদন মাতঙ্গ তায় ডুবিয়া বিহরে
কুম্ভ দুটি হৃদে বিভাবিত

৩০

নাভিরন্ধ্র তনু তুল দণ্ডের মাঝারে
রোমাবলী রজ্জুর সমান
বসিয়াছে কটিতে অনঙ্গ বুঝিবারে
দুদিকের গুরু পরিমাণ

৩১

হারি কাল মুখ কুচ উঠিল উপরে
কোমল নিতম্ব নতভাবে
বিধাতার কৃপা নাই কঠিনের পরে
প্রিয়জন পীড়াপ্রদ তারে

৩২

ফুলরার হেন রূপ ফুল আভরণে
সহসা লক্ষিত হলো বনে
বসন্তের প্রিয়া বলে ভ্রম হয় মনে
মানুষি রূপসি এ বিজনে

৩৩

দুসন্ধ্যায় কাননে ফুলবা ত্বরা যায়
নয় সুধু কুসুম তুলিতে
চলে মনিরাজ সে কাননে দু সন্ধ্যায়
নয় সুধু সমীর সেবিতে

৩৪

উপযুক্ত বর বন প্রণয় তোমার
সুখ রাজ্যে স্বভাব রাজার
নাহি বাধা জাতি কুল মান ব্যবহার
ব্যবধান নর গঞ্জনার

৩৫

লতা অলি ফুল্ল ফুল কপোত স্বরীতে
প্রণয়ীরে শিখায় যথায়
আলিঙ্গিতে আলাপিতে পুলকে হাসিতে
বিলাপিতে বিচ্ছেদ দশায়

৩৬

সময় তাদের প্রতি সদয় এখন
খল বন্ধু মিলিত কেবল
সুচারু চিত্রিত খানি শীত পরশন
পরে উগারিবে হলাহল

ক্রমশঃ—

বৰ্দ্ধমান রাজবংশ।

ভাগিরথীর পূর্ব্বাঞ্চল যেরূপ নবদ্বীপ রাজবংশের গৌরবে গৌরবান্বিত, পশ্চিমাঞ্চল সেইরূপ বৰ্দ্ধমান রাজবংশের মহিমায় মহিমান্বিত। নবদ্বীপাধিপতির অধিকার যেমন এক সময়ে পদ্মাতীর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বৰ্দ্ধমানাধীপের রাজ্যও সেইরূপ বহুবিস্তৃত ছিল। এমন কি বিষ্ণুপুরের রাজা, চন্দ্রকোণার রাজা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণ এক সময়ে বৰ্দ্ধমানরাজের অধীনস্থ ছিলেন। বৰ্দ্ধমানের যশঃ ও খ্যাতি মহারাজা চাঁদ বাহাদুরের অধীনে বিশেষরূপে প্রচারিত হয় এবং মহারাজা মহাতাপচন্দের সময়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বকাল হইতে বৰ্দ্ধমান নিম্নবঙ্গবাসীদিগের নিকট সুপরিচিত।

রায় গুণাকর বৰ্দ্ধমানকে এদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন বৰ্দ্ধমানের নাম বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি বৰ্দ্ধমানের যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অদ্যাপি লোকে বৰ্দ্ধমানকে কবির কল্পনাচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। বৰ্দ্ধমানের নাম করিবামাত্র যেন ভারতের বর্ণিত সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নগর, "চৌদিকে সহরপাল" নয়নপটে প্রতিবিম্বিত হয় সেই বকুলতলা, সেই মালিনীর গৃহ, রথের তলা, সুড়ঙ্গ দক্ষিণ মশান প্রভৃতি একেবারে চক্ষের সমক্ষে প্রকাশ পায়। এহেন স্থানের অধীশ্বরের বংশাবলীর বিবরণ জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। বৰ্দ্ধমানের রাজারা এদেশবাসী নহেন, তাঁহারা কপূর উপাধিধারী পঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। কিরূপে তাঁহারা এদেশে আসিয়া এতদূর প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিলেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাহা বিবৃত করিব; আর সেই সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী যে কেবল কল্পনাসম্ভূত ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তাহাও পাঠকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আবু রায় চৌধুরী প্রকৃতপক্ষে এদেশে বৰ্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আড়াই শত বৎসর কি তাহার আরও অধিককাল অতীত হইল, আবুরায় বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে সপরিবারে পঞ্জাব হইতে বৰ্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন। ১৬৫৭ সালে সম্রাট সাহজেহানের অনুগ্রহে তিনি বৰ্দ্ধমানের চৌধুরীর পদে নিযুক্ত হন। আবু রায় আপনার কার্য্যে সম্রাট্‌কে এরূপ সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে অল্পদিন পরেই তিনি ফৌজদারের পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। আবুরায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বাবুরায় পিতৃপদে নিযুক্ত হন। পিতার ন্যায় পুত্রও কার্য্য কুশল ও বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। বাবু রায় পিতৃপদ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পরগণা বৰ্দ্ধমান ও অপর কয়েকখানি জমীদারী করায়ত্ত করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র ঘনশ্যামরায় জমীদারীর উত্তরাধিকারী হন। ঘনশ্যামরায়ের পর তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। কৃষ্ণরাম রায় বাদসাহের অনুগ্রহে আরও

কতকগুলি জমীদারী লাভ করিয়া আপনার অধিকার বিস্তার করেন। তিনি সম্রাট্ আরঙ্গজেবের এতদূর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন যে, দিল্লী হইতে এক ফর্ম্মান পাইয়া রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণরাম রায় অধিক দিন সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পান নাই। ১৬৯৬ সালে শোভা সিংহ নামে একজন তালুকদার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান শোভাসিংহের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহাগ্নি প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত করে। তাহারা প্রথমেই কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, যুদ্ধে কৃষ্ণরাম সপরিবারে নিহত হন কেবলমাত্র পুত্র জগতরাম রায় পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের এক কন্যাকে বন্দী করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। এদিকে জগত রায় ঢাকায় পলায়ন করিয়া নবাবের শরণাপন্ন হইলেন এবং নবাবের সহায়তায় পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। জগতরাম আপনার বুদ্ধিবলে অনেকগুলি জমীদারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং নবাব সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতার ন্যায় তিনিও সম্রাটের নিকট হইতে ফর্ম্মান পাইয়াছিলেন। জগতরাম রায়ের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, কনিষ্ঠ মিত্রসেন রায়। জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক ১৭০২ সালে জগতরাম রায় নিহত হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র রায় পিতৃ গদিতে আরোহণ করেন। কীর্ত্তিচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজবংশের কীর্ত্তিচন্দ্র।

ইঁহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার সে সময়ে এ অঞ্চলে কেহ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাহুবলে আপনার অধিকার বহুদূর বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রকোণা ও বারদহের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ করেন, তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বালঘরার যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। কীর্ত্তিচন্দ্র এইরূপে আপনার অধিকার বিস্তারিত করিয়া তাহা নবাবের অনুমোদিত করিয়া লইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। নবাব তাঁহার সে মনোরথ পূর্ণ করেন। নবাবের অনুগ্রহে অধিকতর সাহসী হইয়া কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণুপুরের রাজারা সে সময়ে বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন। এমন কি মহারাষ্ট্রীয়েরাও ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনকারী ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া কিরূপ পরাজিত হইয়াছিলেন সে কাহিনী বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কীর্ত্তিচন্দ্র তাহা জানিয়াও বিষ্ণুপুর রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হন। সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হন, বিষ্ণুপুরাধিপ পরাস্ত হন। কীর্ত্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজাকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নবাবের যথেষ্ট সহায়তা করেন।

১৭৪০ সালে কীর্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন। পুত্র চিত্রসেন রায় পিতার ন্যায়

প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তিনিও মণ্ডলঘাট আরশা চন্দ্রকোণা প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা আপনার অধিকারভুক্ত করেন। চিত্রসেন রায়ই বৰ্দ্ধমান রাজবংশের প্রথম রাজা। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা যদিও বাদসাহের নিকট ফর্ম্মান পাইয়া রাজ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদিগের কেহই রাজোপাধি লাভ করেন নাই। চিত্রসেন রায়কেই দিল্লীশ্বর প্রথমে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তিনি চারি বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ১৭৪৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। চিত্রসেন রায় অপুত্রক ছিলেন সুতরাং মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র তিলকচন্দ্র রায় সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৭৫৩ সালে বাদসাহ আহম্মদ সাহ তিলকচন্দ্রকে নূতন সনন্দ প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজা চিত্রসেনের উপাধি, সম্মান ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষনা করেন। তিলকচন্দ্র বাদসাহের এতদূর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন যে তাঁহার রাজোপাধি লাভের কয়েক বৎসর উচ্চতর সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" ও 'পঞ্চহাজারী" অর্থাৎ পাঁচ সহস্র থানার মনসবদার এই উপাধি প্রদান করেন। শেষোক্ত উপাধিটী কেবল তিলকচন্দ্রের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল, কিন্তু প্রথমোক্ত উপাধিটী অদ্যাবধি বৰ্দ্ধমান রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদিগের নামে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে ১৭৪১ সালের পর রাজা চিত্র সেনের রাজোপাধি লাভের সময় হইতে বৰ্দ্ধমানাধিপগণ এদেশে রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত যে এ বংশের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

তিলকচন্দ্র যখন বৰ্দ্ধমান রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন নদীয়ায় রাজ সিংহাসনে পূর্ণ প্রভায় বিরাজমান। শুনা যায় কোন বিশেষ কারণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৰ্দ্ধমান রাজপরিবারের সহিত মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল। সেই হেতু তিনি তাঁহাদিগকে লোক চক্ষে হীন প্রতীয়মান করিবার জন্য রাজকবি ভারতচন্দ্রকে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে বৰ্দ্ধমান পরিবারকে উল্লেখ করিয়া একখানি বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর লিখিতে আদেশ করেন। ভারতচন্দ্রও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর"।

এই ভনিতাতেই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন। কবিরঞ্জনও ভারতচন্দ্রের ন্যায় নবদ্বীপাধিপতির অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। তিনিও যে মহারাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যখন মনে হয় সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের প্রণেতা এবং ভারতচন্দ্রের অগ্রনী তখন মনে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। প্রাণারাম দাস বলিয়া এক ব্যক্তি কবিরঞ্জনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল ভারতচন্দ্রই এ কাহিনী ফুটাইয়া তুলিয়া

ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব মাধুর্য্যে সে কালের লোক এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, কাহিনীটী প্রকৃত বলিয়াই তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। এবং সেই ধারনা বংশ পরম্পরাক্রমে বঙ্গদেশবাসীগণের হৃদয়ে চিরস্থায়ীভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কথা অমূলক একথা মনে করিতেও যেন আমরা ব্যথা পাই। মহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনার ন্যায় একথা বলা যায় যে, রামায়ণ, মহাভারতকে অলীক কবিকাহিনী কহিলে যেমন আমাদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগে, বিদ্যাসুন্দরকেও অলীক বলিলে ততটা না হউক, কতক পরিমাণে হৃদয়ে বাজে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যায় না, কাজেই সে বেচারার খাতিরে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সহিত বর্দ্ধমান রাজবংশের কোন প্রকার সংস্রব নাই।

বিদ্যাসুন্দরের কথা ভারতচন্দ্র এইরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, যশোরাধীপ মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আসেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ব পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তখন বাঙ্গালার কানঙ্গু, মানসিংহ বর্দ্ধমানে পৌঁছিলে মজুমদার তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ উপঢৌকনাদি লইয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন এবং যে কয়েক দিন মানসিংহ বর্দ্ধমানে ছিলেন, মজুমদার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন, বর্দ্ধমানের দর্শনীয় স্থান সকল দেখাইতেন। একদিন মানসিংহ একটী সুড়ঙ্গপথ দেখিতে পাইয়া মজুমদারকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। মজুমদার তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম কাহিনী যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র তাহাই কাব্যে রচনা করিয়াছেন।

ভারত, গ্রন্থারম্ভে এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঐতিহাসিক অনভিজ্ঞতার আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন দুইবার। দ্বিতীয় বারে তিনি উড়িষ্যা জয় করিতে আসেন। সেই বারেই তিনি প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনা ঘটে ১৫৯২ সালে। আর বর্দ্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ আবুরায় বর্দ্ধমানের চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হন ১৬৫৭ সালে। অতএব ভবানন্দ যে মানসিংহকে বলিয়াছিলেন।

শুন রাজা সাবধানে, পূর্ব্বে ছিল এইখানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।

এ উক্তি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক সুতরাং অলীক। অতএব বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্দ্ধমান রাজবংশের কলঙ্ক নিশান বলিয়া লোক চক্ষে কি জন্য প্রতীয়মান হইবে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে সময়ে বিদ্যাসুন্দর প্রচারিত হইয়াছিল সে সময়কার লোকদিগের মনে এই কাহিনী সমূলক বলিয়া ধারনা জন্মিবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ অশেষ গুণশালী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণে লোকে বিমুগ্ধ ছিল। তাহার পর তাঁহার আদেশে তাঁহার প্রিয় কবি ভারতচন্দ্র যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে অলীক হইতে পারে ইহা লোকে মনে করিতে পারিত না। পিতৃ পুরুষদিগের এই ধারণা সমানভাবে পরবর্ত্তী বংশীয়দিগের মধ্যে অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছে বলিয়া আজিও

লোকে এ কাহিনীকে অলীক মনে করিতে পারে না। কিন্তু ইতিহাস চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের এ ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশঃ অপনীত হইয়া যাইবে।

বিদ্যাসুন্দরের কথা ছাড়িয়া আমরা এক্ষণে মূল প্রবন্ধের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। মহারাজা তিলক মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে রাজসুখ ঘটে নাই। তিনি যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন বর্দ্ধমানে বর্গীর হাঙ্গামা বড়ই প্রবল হইয়াছিল। ইহাদিগের অত্যাচারে বর্দ্ধমানকে এতদূর বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল যে কিছুদিনের জন্য তিলকচাঁদ বাহাদুরকে বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি মাতার সহিত বর্দ্ধমান হইতে পলায়ন করিয়া ২৪ পরগণার মূলাযোড় গ্রামের নিকট কাউগাছিতে আসিয়া আশ্রয় লন। এইস্থান তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। মহারাজা তখন মূলাযোড় কবি ভারতচন্দ্রকে ইজারা দিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজা তিলকচাঁদ ভাবিলেন কাউগাছিতে বাস করিলে পাছে তাঁহার হস্তী গো অশ্ব প্রভৃতি পশু মূলাযোড়ে প্রবেশ করিয়া ভারতচন্দ্রের বৃক্ষাদি নষ্ট করে, তাহা হইলে ব্রহ্মশাপে পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নবদ্বীপাধিপতির নিকট মূলাযোড় পত্তনী চাহেন। বর্দ্ধমানেশ্বর তাঁহার পত্তনীদার হইবেন ইহাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে বিশেষ করিয়া মূলাযোড় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বারাসতের নিকট গুস্তে গ্রামে কতকগুলি ভূমির স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রদান করিতে চাহেন। ভারতচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন। মহারাজা আপন কর্ম্মচারি বামদেব নাগের নামে মূলাযোড়ের পত্তনীদার হইয়া মূলাযোড়ে বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই অত্যাচারে ক্রোধান্ধ হইয়া ভারত, নাগাষ্টক নামে একটী সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন।

কাউগাছির রাজ ভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্রের বিবাহ কার্য্য শেষ হয়। এই বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। ফরাসডাঙ্গার ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনাথ চৌধুরী বিবাহের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ফরাসীদিগের সৈন্য আসিয়া বিবাহের সময় কাউগাছির রাজভবন রক্ষা করিয়াছিল। কাউগাছির গড়ের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। অনেকে ইহাকে শ্যামনগরের গড় বলেন।

বর্গির হাঙ্গামা থামিলে তিলকচাঁদ বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন দেশ ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রজারা নিরন্ন হইয়াছে। তাহাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিয়া তিনি যে কোম্পানির মালগুজারী করিবেন তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে নবাব কাশিম চাকলা বর্দ্ধমান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি নিরূপায় হইয়া কোম্পানিকে পত্র লিখিলেন এবং কিস্তিবন্দী করিয়া সরকারের প্রাপ্য টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বর্গীরা দেশের এরূপ অনিষ্টসাধন করিয়াছিল যে তিলকচাঁদ তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই ১৭৭০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, শূন্য রাজ-

কোষ লইয়া পুত্র তেজচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তেজচাঁদ বাহাদুর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজকোষের উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান হন। যাহাতে নিয়মিতরূপে কোম্পানির মালগুজারী করিতে পারেন সে জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার ইজারাদার ও পত্তনীদারেরা নিয়মিত সময়ে খাজানা প্রদান না করাতে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। দিন দিন মালগুজারী বকেয়া পড়িতে লাগিল। কোম্পানি তাঁহাকে টাকা দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই মহারাজা ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তাঁহার জমীদারী ক্রোক হইল রাজা নবকৃষ্ণ ক্রোক নিষ্পত্তির জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না। পরিশেষে বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেবের পরামর্শে কতকগুলি জমীদারী বিক্রয় করা স্থির হইল এবং একে একে অনেকগুলি জমীদারী বিক্রয় হইল। এই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও হুগলিতে অনেক নূতন জমীদারের সৃষ্টি হইল। সিঙ্গুরের সিংহ বাবুরা, ভাস্তাড়ার ছকু বাবু, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়েরা, তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বর্দ্ধমান রাজার জমীদারী ক্রয় করিয়াই প্রসিদ্ধ হন।

মহারাজমাতা বিষ্ণুকুমারী জমীদারীর এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভয়বিহ্বলা হইলেন, এবং নিরুপায় হইয়া পুত্রের নিকট কয়েকখানি জমীদারী আপনার নামে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বে জমীদারীর কার্য্যভার তিনি স্বয়ং লইয়াছিলেন এবং তাঁহারই বুদ্ধিবলে পরিণামে তেজচাঁদ বাহাদুর সৌভাগ্য সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহারাণী বিষ্ণুকুমারী যখন দেখিলেন অনেক জমীদারী বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, তখন আপনার কর্ম্মচারীদিগের নামে সেই সকল ডাকিয়া লইতে লাগিলেন। এই উপায়ে তিনি অনেক সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরে মহারাণীর মৃত্যু হয়। তখন তেজচাঁদ বাহাদুর আবার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। যাহাতে জমীদারীর আয় নষ্ট না হয়, সেই অভিপ্রায়ে তেজচাঁদ বাহাদুর জমীদারী পত্তনী দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইনিই এদেশে জমীদারী পত্তনী দিবার প্রথম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইরূপে জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর রাজভাণ্ডারের স্বচ্ছলতা সম্পাদন করেন এবং প্রজাদিগের উপকারার্থে নানা প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। বর্দ্ধমান রাজবংশ চিরদিনই সদ্ব্যয়ী। উৎসবে, পার্ব্বনে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মুক্তহস্ত। বৃক্ষ সরোবরাদি প্রতিষ্ঠা, দেবালয় সংস্থাপন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সাহায্য দান ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহাদের সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন বঙ্গদেশে এরূপ ভূস্বামী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে একমাত্র নবদ্বীপ রাজবংশ তাঁহাদিগের সমকক্ষ। পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুরও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে কালনা পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ দেখিতে পাওয়া যায় তেজচাঁদ বাহা-

দুর উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মগরার প্রসিদ্ধ সেতুও তাঁহারই কীর্ত্তি।

তেজচাঁদ বাহাদুরের একটীমাত্র পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তাঁহার নাম প্রতাপ-চাঁদ। ইনি যৌবনে নিরুদ্দেশ হইবার কারণ এবং কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের কথা অনেকেই অবগত আছেন। সে কাহিনী কহিয়া এ প্রবন্ধ দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জাল প্রতাপচাঁদ গ্রন্থে সে কাহিনী বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়াতে তেজচাঁদ বাহাদুর শ্যালক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনিই মহারাজা মহাতাপচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৮৩২ সালে মহা-রাজা মহাতাপচাঁদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজা মহাতাপচাঁদ বর্দ্ধ মান রাজবংশের নাম কিরূপ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি যেরূপ বঙ্গবাসীর সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টের নিকটও সমাদৃত হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ সম্মান কবিতেন। ১৮৬৪ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিযুক্ত করেন। প্রজাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাহাদিগের দুঃখ দারিদ্র্য দূরী-করণ, দেবসেবা, অতিথিসেবার সুব্যবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য মহা-রাজা মহাতাপচাঁদ এদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন।

মহারাজা মহাতাপচাঁদও অপুত্রক ছিলেন। তিনিও শ্যালকপুত্র আফতাব-চাঁদকে পোষ্যপুত্র লন। আফতাবচাঁদ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অল্পদিন পরে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মানব-লীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে তাঁহার পোষ্যপুত্র বিজনচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান সিংহাসনের অধিশ্বর। ইনি সুবিখ্যাত লালা বনবিহারী কপূরের আত্মজ। বিজনচাঁদ এক্ষণে কিশোর বয়স্ক। ভগ-বানের নিকট প্রার্থনা তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমান রাজবংশের গৌরব উজ্জ্বলী-কৃত করুন।

ম্যাক্‌বেথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"It may be Said of Shakspeare that those who are not for him, are against him, for indifference is here the height of injustice"

"The poetry of Shakspeare was inspiration indeed; he is not so much an imitatoı is an instrument of nature; and it is not so Just to say that he speaks from her as that she speaks through him"

"He *might be said* (shakspeare) to have been a Joint worker with nature and to have Created an imaginary world of his own, which has all the appearance and the truth of reality"

"Of all poets, perhaps, he alone portrayed the mental diseases—melancholy,—deliriom, lunacy—with such inexpressible, and, in every respect, definite truth, that the physician may enrich his observations from them in the same manner as from real cases".

এই পাপে ঔদাসীন্য যথার্থ ম্যাকবেথ-চরিত্রের মূল, কি, প্রেমময়ী বনিতার নিকট ইহা স্বামীর আপেক্ষিক আত্ম-প্রকাশ মাত্র, তাহা বিচার্য্য। বামার এই স্বামীচরিত্র বিশ্লেষণের ভিতর স্বামীর সন্নীতি উদ্দেশে একটু শ্লেষ আছে। স্বামীর আশা—দুরাশা সুপথে সহজ-পথে সৎপথে ফলিবার নহে এবং এই ফলসিদ্ধিপক্ষে স্বামীর মনকে আঁখিঠার আছে, ইহা বামা স্পষ্ট দেখে এবং দেখায়। বামার ইতিচিন্তাকালে একজন দূত আসিয়া রাজাগমন বার্ত্তা শুনাইল। যেমনি ক্ষুধা অমনি খাদ্য, ইহা ভয়ঙ্করী বামার বিশ্বাস হইল না; ম্যাকবেথেরও কদরাধিপতালাভে প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। যুগল বটে!! দূত, শেষ স্বরূপ জ্ঞাত করাইতে বলিল,—"আমার জনেক সহচর এ সংবাদ আনিতে এত দ্রুত আসিয়াছে যে, এখান অবধি আসিতে আর তাহার শ্বাস রহিল না এখন সে শ্বাসরুদ্ধ।" সংবাদ দিয়া দূত নিষ্ক্রান্ত হইল। দূতের শ্বাস-রুদ্ধবার্ত্তাশ্রবণে ম্যাকবেথপত্নীর উচ্ছ্বাস বহিল, বামার উচ্ছ্বাসের তাৎপর্য্য এই—ভাবী শ্বাসরুদ্ধের বার্ত্তা যে বহন

করে তাহাকে বর্ত্তমানেই শ্বাসরুদ্ধ হইতে হয়। এইখানে বামার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। নারীপ্রকৃতি কোমল হইতে কত কঠোরে উঠিতে পারে, ইহা তাহার চূড়ান্ত দৃশ্য, চূড়ান্ত চিত্র। ভয়ঙ্করীর ভয়ানক কল্পনাকালে ম্যাকবেথ উপস্থিত হইলেন। ডান্‌ক্যানের আগমনবার্ত্তা স্বামী আসিয়া স্ত্রীকে শুনাইলেন। স্ত্রী, রাজার প্রত্যাগমন বার্ত্তা স্বামীকে শুধাইলে স্বামী উত্তর করিলেন "কল্য যাইতে তাঁহার বাসনা।"—শুধু কল্য নয়, "কল্য যাইতে তাঁর বাসনা" বাসনার অর্থ এ বাসনা পূরণ হইবে কি? হত্যা-কল্পনা স্ত্রীর মুখ হইতে স্বামী কৌশলে নির্গত করাইল। মনকে লোকে আঁখি-ঠারে অন্য পরে কা কথা! ছলনার বাড়াবাড়ি করিতে পত্নী স্বামীকে মনোভাব গোপন রাখিতে পরামর্শ দিল। স্বামীর যেমন ঠারেঠোরে স্ত্রীকে ইঙ্গিত করা, স্ত্রীর জবাবও ঐ রকম ঠারে, স্পষ্ট কথায় নয়। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব বলিয়া ম্যাকবেথ আপন পত্নীকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য—রাজার পুত্র পারিষদ ব্যাঙ্কো, রস প্রভৃতির সহিত ম্যাকবেথের দুর্গে প্রবেশ। ইহার পর ম্যাকবেথপত্নীর রাজসদনে আগমন এবং রাজাকে পতি-সন্নিধানে লইয়া গমন। রাজ সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেই গেল। পতিপত্নীর নেপথ্য ব্যবহিত এই কাল ৭ মুহূর্ত্তকাল মাত্র। ইহার মধ্যে পূর্ব্বকথার পুনরালোচনা সম্ভবে কি?

সপ্তম দৃশ্য—প্রথমাঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্ক। ম্যাকবেথ এইখানে নিভৃতে একাকী পাপে পুণ্যে সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে ক্ষতিতে লাভেতে, কলঙ্কে যশে, ইহকালে পরকালে তারতম্য খতাইতে লাগিলেন। প্রবৃত্তিটা পাপের পথে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের টান একবারে যায় নাই। পাপীর পাপসাধনের পথে ধর্ম্মের দোহাই দুই কারণে চলে। এক পাপে অশক্ত হইলে চলে, আর পাপ নূতন ঠেকিলে চলে। নরহত্যায় ম্যাকবেথের ভয় কি? নরহত্যায় ম্যাকবেথের পৌরুষ, নরহত্যায় ম্যাকবেথ দীর্ঘকাল নিযুক্ত। এ হেন লোকের নরহত্যায় গ্লানি জন্মে কি? তবে ধর্ম্মের কথা কেন? ইহা হত্যায় গ্লানি, না, হত্যায় ভীতি?

"বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম।
যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে,
দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে ভূপালে,
জ্ঞাতিত্ব প্রথমে, তাহে প্রজা আমি তাঁর,
উভয়ে প্রবল বোধ এ কার্য্য সাধনে।
দ্বিতীয়তঃ মমাশ্রয়ে অতিথি সে জন,
ঘাতকে রোধিতে দ্বার উচিত আমার,
আপনি ধরিব ছুরি
এ হ'তে সম্ভবে পাপ কিবা?"

এ চিত্র পাপীর চিত্র, পাপের চিত্র নহে। মনুষ্য সহস্র পাপ করিলেও পাপী—পাপ নয়। পাপ পুণ্য—মনে ধ্যানে—জ্ঞানে। ম্যাকবেথ যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র নরবধে ভীত হন নাই, সে নরবধে পাপ জ্ঞান ছিল না বলিয়া। আরও এই পাতকে মহাপাতকে ম্যাকবেথের পরিষ্কার দৃষ্টি রহিয়াছে জ্ঞানকৃত পাপ বলিয়া এবং পাপজ্ঞান আছে বলিয়াই পাপ সাধনে যত ইতস্ততঃ দেখা যাইতেছে। রাজার বিরুদ্ধে ম্যাকবেথ একটা তুচ্ছ দোষও পাইলেন না যাহার বলে বা ছুতায় এ হত্যায় আপনাকে আংশিক রূপেও ন্যায়তঃ নিযুক্ত করিতে পারেন। এ প্রতিহিংসা নহে, এ গুপ্ত হত্যা, এ

রাজদ্রোহ, এ জ্ঞাতিবধ, এ প্রভুনাশ, এ অতিথিনিপাত, এ বড় সর্ব্বনাশের অভিনয়। পাপের এ নগ্ন মূর্ত্তি! এ পাপের উপর কোনরূপ আবরণ নাই। এ পাপের সাফাই নাই, ইহার লক্ষ্য বটে সিংহাসন এ কিন্তু পাপের জন্য পাপ। এই সন্ধি-ক্ষেত্রে পাপ থাকে কি পুণ্য থাকে ইতি-চিন্তাকালে প্রবৃত্তিরূপা ভার্য্যা আসিয়া পড়িল। ম্যাকবেথের সহায় এখন আপন ক্ষীণ সুমতিটুকু, একে আপনার কুমতি রাক্ষসী প্রবলা তায় কুপ্রবৃত্তিরূপা ভার্য্যার যোগদান, কাজেই সুমতির অ চল ধরিয়া ম্যাকবেথ সয়তানীর হাত হইতে রেহাই চাহিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আভাসও দিলেন, ইহাতে ইহলৌকিক বিস্তর ক্ষতি আছে। স্ত্রী, স্বামীকে বিলক্ষণ দুকথা শুনাইয়া হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইল। এই কড়া কড়া কথার ভিতর স্ত্রীর অভিমান আব্দার একটু আছে,—"এখন হইতে আমার প্রতি তোমার প্রেমও অসার জানিব।" এ কথায় ম্যাকবেথ দুঃখিত, মিনতি করিয়া মনুষ্যধর্ম্মের দোহাই দিয়া জানাইলেন, "মানুষ হইয়া পিশাচের কর্ম্ম কে করিতে পারে?" মাগী ছাড়িবার নয়, মাগী হাঁকিল,—ভয়ঙ্করী ভয়ানকের পরিচয় দিতে দিতে বলিল "যদি তোমার মত আমি প্রতিজ্ঞা করিতাম তাহা হইলে—

"স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বু কর উপরে,—
হেন শিশু যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে,
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদাপি করি তোমার সমান।"

এই কথায় বোধ হয় যে, ম্যাকবেথ-পত্নীর সন্তান জন্মিয়াছিল। ম্যাকবেথ-পত্নীর সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু ম্যাক-বেথের সন্তান জন্মায় নাই। ম্যাকবেথ-পত্নীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসে সন্তান জন্মিয়া-ছিল। এত কথায় ইহাতেও যখন নিস্তার নাই, ম্যাকবেথ দেখিলেন, তখন ধর্ম্মের দোহাই ছাড়িয়া দুনিয়ার দোহাই দিলেন, "যদি কার্য্যে বিফল হই," অর্থাৎ সাপ না মরে, লাঠিও ভাঙ্গে। ধর্ম্মের দোহাই ছাড়িয়া মানুষ যখন দুনিয়ার দোহাই ধরে তখন তাহাকে বুঝাইতে আর বিলম্ব লাগে না। পাপের বাধা ধর্ম্মভয় সরিয়া গেলে কলঙ্কভয় সহজেই সরিয়া যায়। বালকবুঝান বালকভুলান কথায় ম্যাক-বেথ ভুলিলেন—

"হত্যাদোষ মদ্যপায়ী রক্ষকের পরে
অর্পিতে কি হবে ভার।"

পত্নীর এই কথাতেই ম্যাকবেথ ভুলিলেন। প্রত্যুত্তরে ম্যাকবেথ আপন ভার্য্যাকে শুধু পুংপ্রসব করিতে বলেন কেন না লেডি ম্যাকবেথের প্রকৃতি নারীপ্রকৃতির ধার দিয়াও যায় না। এই কথা কিন্তু এই বালক ভুলান কথার প্রত্যুত্তর নয়। ইতিপূর্ব্বে ভয়ঙ্করীর ভয়ানক মূর্ত্তি যে ম্যাকবেথ দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার মস্তিষ্কে ঘুরিতেছিল। সেই ভয়ঙ্করীর ভয়ে সতীর দশমহাবিদ্যা-রূপ দর্শনে শিবের ন্যায় অগত্যায় ম্যাকবেথ, পত্নীর মতে সায় দিলেন। এই মতপ্রদান কিন্তু পরোক্ষে—প্রকাশ্যে নয়। প্রকাশ্যে মত দিবার পূর্ব্বে স্ত্রীর ঐ কথাটা একবার কষিয়া লইলেন,—

"প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে সাধন,
রক্তাক্ত যদাপি করি সেই দুই জনে,
ক'বে নাকি সবে
হত্যাকাণ্ড ক'রেছে তাহারা?"

কথার কষ্ঠীও চমৎকার! সুরে সমান সুর। "কে অন্যমত ভাবিতে সাহস করিবে, যখন উচ্চশোকরবে মৃত্যু তার করিব প্রচাব?" ম্যাকবেথ এইবার একবারে মুইয়া পড়িলেন, মহাপাপে মহাপাপী অগ্রসর হইবেন স্থির করিলেন। নাটকের উপ্ত বীজ এতক্ষণে পুষ্টি পাইল। ইহার পর রাজভোজ আমোদ প্রমোদে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

চিত্রলেখা।

জগৎ সংসাররূপ বৃক্ষমূলে প্রবৃত্তিরূপা যমুনাতীর। নারায়ণ শ্যামরূপে শান্তি বংশীর মধুর স্বরে ব্রজবাসীগণকে (সংসার মায়া হইতে ব্রজবাসি ভক্তগণকে) ডাকিতেছেন। ভক্তি-রূপা রাধার (আরাধনাশক্তি ধ্যানজরূপ সেই শ্যাম বংশীধারী। ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি অষ্ট সহচরী রাধার কৃষ্ণলীলায় উন্মত্তা। যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইলে যখন তাহার চিত্তে ধ্যানজরূপ আস আস হইয়াছে, তাহার তখনকার চিত্ত এই কবিতায় চিত্রিত।

১

এ কারে আনিলি তুই সাজায়ে বিশাখা?
এ ত নয় চিত্ত-চোর মোর প্রাণসখা!
সে যে অতি অপরূপ
মদন মোহন রূপ
আছে মোর হৃদয়েতে তাঁর চিত্র রেখা।
যে রূপেতে লিখেছিলি,
শ্যাম নাম বলে দিলি,
বলে ছিলি এনে দিবি পেলে তার দেখা।
এ ত নয় সেরূপ যেরূপ মনে লেখা।

২

এ তোর কেমন সখি, সখী মন রাখা?
এনে দিলি কারে তুই কার মনোরাখা?
এ যে কোন্ রাজরূপ,
কোন্ ইন্দ্রানীর ভূপ,
শোভিছে ববাঙ্গে কিবা রঙ্গ অঙ্গ রাখা!
রাজ মুকুটের আলো,
সেজেছে বদনে ভাল,
ভুবণে পড়েছে কত অঙ্গরাগ ঢাকা।
এ ত নয় সেরূপ যেরূপ মনে আঁকা।

৩

শিরে তার চূড়া বটে কিন্তু বামে বাঁকা।
সে চূড়ার শিরে শোভে শিখিপুচ্ছ পাখা।
এমনি সে জ্বলে বটে,
রাজার হৃদয় পটে,
কিন্তু সে মোহন দ্যুতিঃ পুরঞ্জন মাখা।
সে চূড়ার চন্দ্রভাসে,
শ্যাম মুখ সদা হাসে,
বিকাশে কতই তাহে মাধুরীর রেখা!
সে মুখলাবণ্য আছে মনোমাঝে লেখা।

৪

এ কাল বরণ বটে কিন্তু রূপে আলো!
সুচিকণ আভা তার সাজে অঙ্গে ভাল।
নব জলধর শ্যাম,
নয়নের অভিরাম,
কালিন্দীর নীর তার প্রতিবিম্ব কাল।

নীলকান্ত মণি লাজে,
লুকায় ধরণী মাঝে,
কোকিল করেছে সার তমালের ডাল।
সবে জিনিয়াছে সেই বৃন্দাবন-আলো।

৫

পীতবাস বটে কিন্তু এ বিলাস নয়।
কটীদেশে ধটী বাঁধা অতি শোভাময়!
দুটি পায় জড়াজড়ি
ধড়া তায় গড়াগড়ি,
ছড়াছড়ি কত চন্দ্র নখচন্দ্রে হয়।
সেধড়া বন্ধন বাসে
শতদল পরকাশে,
এ হৃদয় পটে ফুটে কত ফুল রয়!
এ ত নয় সে রূপ যে রূপ মনে লয়।

৬

লিখেছিলি চিত্র পটে—যমুনার কূলে
শ্যামের মোহন রূপ বকুলের মূলে!
করে তার শোভে বাঁশী,
মুখেতে মধুর হাসি,
চারিদিকে গোপবালা চারু চক্ষু খুলে—
চেয়ে আছে তার পানে,
যেন কি পীযূষ পানে,
আত্মহারা মাতোয়ারা গেছে তারা ভুলে!
রাখিয়াছি সেই রূপ হৃদি পটে তুলে।

৭

এনে দেরে সেইরূপ মোর শ্যামচাঁদে।
যে রূপ লিখেছ হৃদে তুলিকার ছাঁদে।
যমুনার কূলে গেলে,
কতবার দেখা পেলে,
আপনি পড়েছ ভুলে বুঝি রূপ ফাঁদে।
নিতি নিতি সখি যাও,
তার যদি দেখা পাও,
বলো তাঁরে তাঁর তরে এ পরাণ কাঁদে।
এনে দেরে দেখি তাঁরে সেই শ্যামচাঁদে।

৮

দেখিতে দেখিতে কালা ধরিল সে রূপ!
ত্রিভঙ্গ মুরারি ঠাম অতি অপরূপ!
ভুলিল রবির মন,
মেলি দেখে দুনয়ন,
সেই পীত ধড়া চূড়া সকলি স্বরূপ।
সঙ্গে লয়ে সে বিশখা,
রঙ্গে লয়ে প্রাণ সখা,
যায় রাধা কুঞ্জবনে সংসারে বিরূপ।
হৃদয়ে এঁকেছে যাঁরে পেয়েছে সেরূপ।

পাতঞ্জল দর্শন।

অনুক্রমণিকা।

দর্শন শাস্ত্র সকল শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই শাস্ত্রসমূহের অনুশীলনে মানবগণের জ্ঞান ক্রমশঃ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ঈশ্বরনিরূপণ ও তাঁহার উপাসনাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তভেদে—দর্শন ছয়প্রকার। এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগের বিষয় বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। যোগের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ জগতীতলে আর নাই, যেহেতু যোগদ্বারা সদ্গতি এমন কি ইহা দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। কোন এক বাহ্যবস্তুতে অপর কোনও বাহ্যবস্তু সংলগ্ন করার নাম যোগ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের নাম যোগ। চিত্তকে একাগ্রকরণের নাম যোগ, এইরূপ যোগের লক্ষণ নানাবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাতঞ্জলোক্ত যোগলক্ষণ আমরা যথাস্থানে বলিব। এই যোগের বল অপরিসীম, এই যোগবলের নিকট উত্তাল তরঙ্গমালা সম্বলিত অকূল সমুদ্র পরাভূত, এই যোগবলের নিকট হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ভঞ্জনকারী প্রবল বাত্যামণ্ডল পরাজিত, এই যোগবলের পদতলে অপরিমেয় সৈন্যবল সমন্বিত অখণ্ড ভূমণ্ডলের মহারাজ চক্রবর্ত্তী ও কিঙ্কুলুকের ন্যায় নিপতিত। এই যোগবলে, অনন্ত আকাশ মণ্ডল মধ্যে অবলীলায় বিচরণ করিতে পারা যায়। এই যোগবলে অনাহারে থাকিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে পারা যায়। এই যোগবলে জলের উপরিতলে দণ্ডায়মান হইয়া অনায়াসেই বিচরণ করিতে পারা যায়। এই যোগবলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই শত সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়। এই যোগবলেই অখিল ত্রৈলোক্য মণ্ডল মধ্যে যেখানে যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহা অবগত হইতে পারা যায়, এই যোগবলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। এই যোগবলে অলৌকিক কার্য্য সকল সাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, অধিক কি যোগবলে সাধিত হইতে না পারে এমন কার্য্যই নাই, যেহেতু যোগ দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। যোগবলে সমস্তই সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যোগবল লাভ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার পরিহার করিয়া যোগ সাধনই যোগবল লাভের প্রশস্ত উপায়। বিষয়ে অনাসক্ত হইতে পারিলে গৃহে থাকিয়াও যোগসাধন সম্পাদিত হইতে পারে, যোগিবর ও নৃপবর জনক তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। ফলতঃ যোগ সাধন করিতে হইলে একাগ্রতা নিতান্তই প্রয়োজন। একাগ্রতায় এমত একটি ঐশী শক্তি বিদ্যমান আছে, যে, তদ্দ্বারা অতিশয় আশ্চর্য্য কার্য্য সকলও সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবিধ ইন্দ্রিয় পথ দিয়া বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, বহু বিস্তৃত

স্থলে ব্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তমরূপ যত্ন দ্বারা পথ নিরোধ দ্বারা একত্রিত করার নাম একাগ্রতা। উক্ত কার্য্য দ্বারা ক্রমে পুঞ্জীকৃত হইয়া সেই বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রবর্ত্তী যে কোন বস্তু হউক তৎ সমস্তই প্রকাশ পাইবে, তাহা দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। লৌকিক বিষয়েও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিগণ তাহা প্রকৃতি পুস্তক হইতে আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃ সন্ দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ।

সূর্য্যের সংযোগ হেতু সূর্য্যকান্তমণি বহ্নি প্রকাশ করে সেই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞানোপদেশে কি সার পদার্থ নিহিত আছে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা তাড়িত বিজ্ঞান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। ইহা দ্বারা অতীত ও অনাগতাদি বিষয় সকল প্রকাশিত হয়। এইরূপ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বুদ্ধিতত্ত্ব পুঞ্জীকৃত করিতে পারিলে ভুবনস্থিত কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকে না।

বুদ্ধিতত্ত্বের একাগ্রতা সাধন করিতে হইলে দীর্ঘজীবন, অনাহার, বায়ুসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযমাদির প্রয়োজন। আসন ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা ঐ সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আসন দ্বারা শরীর দৃঢ় ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস ক্রিয়ার লঘুতা সাধিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়া পড়ে। এই সকল বিষয় যোগিগণ ভেকাদির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নাশ্নন্তি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চ স্বাঙ্গগোপ্তারো দৃষ্টান্তো যোগিনো মতাঃ॥

শীতকালে ভেক এবং সর্পজাতি গর্ত্তাদি আশ্রয় করিয়া জড়বৎ অবস্থিতি করে ঐ কালে তাহারা আহার করে না; সর্পজাতি গিরি গহ্বরাদি আশ্রয় করিয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, কচ্ছপজাতি নিজ অঙ্গ গোপন রাখিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকে। তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাদি চেষ্টা বর্ত্তমান থাকে না। বর্ষার প্রারম্ভে তাহারা আহার বিহারাদি বিষয়ে চেষ্টিত হয়। যোগিগণ এই সকল প্রাণীর কার্য্য দেখিয়া অনাহারে জীবন ধারণ, দীর্ঘজীবন ও সমাধি অভ্যাস করিয়াছেন।

প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস ক্রিয়ার লঘুতা সাধিত হয়। যে জীব যত অল্প সংখ্যক নিশ্বাস প্রশ্বাস করে, সে জীব তত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস ক্রিয়ার লঘুতা সাধন করিয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হন, এবং আপনা আপনিই ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়া পড়ে। এইরূপে যোগিগণ শ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া অনশনে দীর্ঘ কাল থাকিলেও তাঁহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয় না। এই বিষয়ের একটি বিশ্বস্ত প্রমাণ আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

হরিদাস নামে এক যোগিবর মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমকালিক। তিনি যোগবলে সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ৮।১০ মাস পর্যন্ত অনাহারে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রাণ বিনাশ হয় নাই। এই যোগী জলের উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেন,

চক্ষুর উপর পুরু করিয়া কাপড় বাঁধিয়া দিলেও সম্মুখে পুস্তক রাখিয়া ছত্রে ছত্রে অঙ্গুলি দিয়া পুস্তক পড়িতে পারিতেন। ফলতঃ বোধ হয় অষ্টবিধ সিদ্ধি এই মহাযোগীর আয়ত্ত ছিল। জলস্রোতে তিন মাস, অমৃতসার এক মাস, জম্বুতে তিন মাস, জসলমিরে এক মাস, লাহোরে চল্লিশ দিন, অনাহারে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিলেন, ম্যাক্‌নটেন্ সাহেবের ঘরে সিন্দুকে পোরা ১৩ দিন ঝুলান ছিলেন। এই সকল দ্বারাও তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। এইরূপে তিনি কয়েকবার সমাধির পর জীবিত হইলে, তাঁহার এক শেষ পরীক্ষা করা হইল, এই পরীক্ষাব বিষয় আমরা শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হরিদাস নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কিছুকাল অতীত হইলে এক দিন রণজিৎ সিংহ, জেনারেল ভেঞ্চুরা ও ওয়েড্ সাহেবের কাছে এই গল্প করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "ভাল সন্দেহ রাখিয়া কাজ কি যোগীর আর একবার পরীক্ষা লওয়া যাউক। ওয়েড্ সাহেব জেনেরেল ভেঞ্চুরাকে বলিলেন আপনি সতর্ক হইয়া হরিদাসকে পুঁতিবেন। পরে তাঁহাকে উঠাইবার দিন আমি উপস্থিত থাকিব।" এই কথাই স্থির হইল। রণজিৎ সিংহ সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া বলিলেন, মহাশয় আর একবার আপনার সমাধি ধারণ দেখিবার নিমিত্ত আমাদের অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যে সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে হয় আপনি শেষ করুন, এবার আপনাকে দশ মাসকাল মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে হইবে।" হরিদাস যে আজ্ঞা বলিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। দশ বার দিন অন্তর্ধৌতি ও যোগের অন্যান্য পূর্ব্বানুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। সন্ন্যাসী প্রস্তুত হইয়া মহারাজকে সংবাদ দিলেন। বেলা দুই প্রহর; হুজুরি বাগ-লোকে ভরিয়া গেল। স্বয়ং মহারাজ প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং জেনেরেল ভেঞ্চুরা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন।

যোগী এক একটি করিয়া পূর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া সমাধিতে বসিলেন। তিনি পূর্ব্বার মত তুলা ও মোমে চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ করিলেন এবং জিহ্বা উল্টাইয়া মৃতবৎ হইয়া গেলেন। এ পর্য্যন্ত কাহার কোনও দ্বিধা থাকিল না। সেনাপতি ভেঞ্চুরা মনের মত করিয়া যোগীর শরীর পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারও সন্দেহ মিটিল। তৎপরে সন্ন্যাসীকে বস্ত্রে জড়াইয়া স্থানে স্থানে রণজিতের স্বনামের মোহর করা হইল। এবারও হরিদাসকে একটি কাষ্ঠের সিন্দুকে পূরিয়া মৃত্তিকার পোতা হইয়াছিল। কিন্তু এবারে সমাধি গৃহটি অন্যরূপ। সহসা কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিবে না বলিয়া সমাধির জন্য একটি সংকীর্ণ গুম্বজ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। যে সকল সান্ত্রী প্রহরী ছিল, তাহারা রণজিৎ সিংহের নিতান্ত বিশ্বাসী।

দশ মাস পূর্ণ হইল। রণজিৎ সিংহ লুপ্তিয়ানায় ওয়েড্ সাহেবকে পত্র লিখিলেন। ওয়েড্ সাহেব লাহোরে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে গেলেন। যোগীকে তোলা হইল। সকলেই দেখিলেন, মৃত দেহের মত যোগীর শরীর শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রাণ নাই, চেতনা নাই। কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার জীবন সঞ্চার হইল।

এই ঘটনার পর হিন্দুদের ধর্ম্মরাজ বিজয়োৎসব পড়িয়া গেল, দ্বারে দ্বারে কল্যাণ রচনা ঝুলিতে লাগিল। শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গল বাদ্যে লাহোর নগর উথলিয়া উঠিল।”

প্রাণায়াম ও সমাধি দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সমূহ সাধিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ফলতঃ যোগের তুল্য মানবগণের অনুষ্ঠেয় উৎকৃষ্ট কার্য্য আর নাই। যিনি দুঃখের কঠোরতম হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চান, এই যোগ ব্যতিরেকে তাঁহার অন্য উপায় আর নাই। যোগের গুণ অনির্ব্বচনীয়, আমরা কিঞ্চিন্মাত্র কহিলাম। যিনি অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র এবং গুরুর আশ্রয় লইলেই তাহা জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আমরা প্রকৃতের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

পতঞ্জলি মুণিকর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া এই যোগশাস্ত্রের নাম পাতঞ্জল। ইহা চারিপাদে বিভক্ত। প্রথমপাদে যোগারম্ভ প্রতিজ্ঞা করিয়া যোগলক্ষণ ও সবিস্তার সমাধির বিষয়। দ্বিতীয়পাদে উথিত চিত্তের ক্রিয়াযোগ এবং যমাদি পঞ্চ বহিরঙ্গসাধন, তৃতীয়পাদে ধারণা ধ্যান সমাধি এই সংযম পদবাচ্য অন্তরঙ্গত্রয় এবং তাহার অবান্তর ফলস্বরূপ বিভূতি সমুদয়, চতুর্থপাদে সমাধিজাত সিদ্ধিপঞ্চক বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়া পরম প্রয়োজনরূপ কৈবল্য নামক মুক্তি এবং প্রকৃতি মূলক পঞ্চবিংশতি সত্ত্ব ও প্রাচীন সম্মত ষড়্বিংশ তত্ত্বস্বরূপ ক্লেশ কর্ম্ম-বিপাক ও আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ পরমেশ্বর সৃষ্টির নিমিত্ত শরীরধারণ পূর্ব্বক লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক এবং সংসাররূপ প্রজ্বলিত অঙ্গারে তপ্যমান প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহকারক পরমেশ্বরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

মহামুনি পতঞ্জলি বুদ্ধিমান্, ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির অঙ্গ স্বরূপ বিষয় প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অধিকারিরূপ অনুবন্ধ চতুষ্টয় প্রতিপাদন করিয়াছেন এক্ষণে ক্রমানুসারে তৎসমুদায় উক্ত হইতেছে।

১ম সমাধিপাদ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥ হিরণ্যগর্ভাদি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট যোগশাস্ত্র আরম্ভ করা যাইতেছে। যোগিবর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে হিরণ্যগর্ভই যোগশাস্ত্রের বক্তা অন্য কেহই পুরাতন যোগ বক্তা নাই। তদনুসারে ভগবান্ পতঞ্জলি তৎসমুদায় সংগ্রহ পুরঃসর সম্মার্জ্জিত ও সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া জীবগণের দুঃখরাশি দূরীকরণের নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥ মনের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করার নাম যোগ। যোগিবর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে “সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥”

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহার নাম যোগ। এখানে বলা হইয়াছে যে, মনোবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই উভয় লক্ষণের অর্থ এক, কিন্তু ভাল করিয়া না তলাইলে বুঝিতে পারা যায় না। যোগ জানিতে হইলে মনোবৃত্তি কি ও কত প্রকার এবং বৃত্তিই বা কি তাহা জানিতে হয়। এক্ষণে তৎসমুদয় বলিতেছি। বিষয়যোগ হেতু চিত্তের যে পরিণাম, তাহার নাম বৃত্তি; পরে ইহা বিশেষরূপে কথিত হইবে। মানবগণের মানসিক অবস্থা পাঁচপ্রকার। যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনুষ্যদিগের মনোবৃত্তি অসংখ্য প্রকার হইলেও তৎসমস্তই এই পাঁচপ্রকারের অন্তর্গত। বাহ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা মন ইহা হউক উহা হউক, ইহা চাই উহা চাই তাহা চাই এইরূপে যে অস্থিরতা প্রাপ্ত হয় তাহা ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যখন কামক্রোধাদি ও নিদ্রা তন্দ্রাদি দ্বারা মোহিত হইয়া অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে তখনই তাহার মূঢ়াবস্থা।

মন অত্যন্ত চঞ্চল হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থির থাকে, অর্থাৎ মনের ক্ষণিক চাঞ্চল্য ও ক্ষণিক স্থিরতা অবস্থার নাম বিক্ষিপ্ত।

চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া বায়ুশূন্য স্থানস্থিত নিশ্চল ও নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায় স্থিরভাবে বর্ত্তমান থাকে কিম্বা চিত্তের রজঃ ও তমোবৃত্তি অভিভূত—হইয়া কেবল সাত্ত্বিকী বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে তখন তাহাকে মনের একাগ্র অবস্থা বলে।

চিত্ত যখন সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় কারণ স্বরূপ প্রকৃতিকে পাইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, অর্থাৎ তৎকালে তাহার কোনও বিষদৃশ পরিণাম থাকে না, পরমাত্মার অস্তিত্ব দ্বারাই তাহা বিধৃত ও অধিকৃত থাকে। মনের এই অবস্থাকেই নিরুদ্ধ অবস্থা বলে।

শাস্ত্রে এই অবস্থার নাম ভূমি। এই পঞ্চভূমির মধ্যে তিনটি অবস্থার সহিত যোগের সম্পর্ক নাই। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থার সহিতই যোগের সম্পর্ক। তন্মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থার সহিতই যোগের প্রকৃত সম্পর্ক। এই অবস্থাতেই জীব ও আত্মার সংযোগ হয়, অতএব এক্ষণে "চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ" এইরূপ যোগের লক্ষণ করা যাইতে পারে। নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয় পরে তাহাই কথিত হইবে। ক্রমশঃ—

প্রশ্নোত্তর রহস্য।

প্র। কোন সহরের লোক মরে না?
উ। অমৃত সহরের।
প্র। কোন্ জিলায় বাস করিলে লোকের অপযশ হয়?
উ। যশোহর জিলায়।
প্র। কোন্ স্থানে শ্রীরাধা মান করিয়াছিলেন?
উ। মান মন্দিরে।
প্র। জয়, বিজয় দ্বারী ছিলেন কোথায়?
উ। হরিদ্বারে।
প্র। কোন্ স্থানে লোকে কফগ্রস্ত হয়?
উ। কাশিতে।
প্র। কোন্ স্থানে কায়ক্লেশে গমন করিতে হয় না?
উ। কোচবিহারে।
প্র। কোন্ স্থানে সিংহ পাওয়া যায়?
উ। সিংহল দ্বীপে।
প্র। কোন্ স্থানে এক প্রকার মাথা গুঁজিয়া বাস করা যায়?
উ। হোগলকুঁড়েয়।
প্র। কোন্ স্থানে মাহুতের আবশ্যক?
উ। হাতিবাগানে।
প্র। কোন্ স্থানে বেশ সুখে সচ্ছন্দে বাস করা যায়?
উ। বালাখানায়।
প্র। হিন্দুগণ যজ্ঞকালে কুশ আহরণ করেন কোথা হইতে?
উ। হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে।
প্র। রাজপুতনার কোন্ অংশে ইন্দুরেরা খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করিতে পারে না?
উ। সিকাবতী নগরীতে।
প্র। ব্যাঘ্র বিক্রয় হয় কোথায়?
উ। বাঘহাটে।
প্র। কোন্ পথে আহারাদি করিবার বেশ সুবিধা?
উ। খাইবার পাসে।
প্র। কোন্ ভূমিখণ্ডে প্রচুর শিং পাওয়া যায়?
উ। শিংভূমে।
প্র। কলিকাতার কোন্ স্থানের জমী বড় রসাল।
উ। রসাপটীর।
প্র। কোন্ স্থানে প্রচুর মানগাছ আছে?
উ। মানভূমে।
প্র। চিরবসন্ত কোন্ স্থানে বিরাজমান?
উ। মধুপুরে।
প্র। কোন্ পল্লী পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থিত?
উ। উত্তরপাড়া।
প্র। কোন্ পুষ্করিণীর জল লোহিতবর্ণ?
উ। লালদিঘীর।
প্র। কোন্ গ্রামটী ধসিয়া গিয়াছে?
উ। ধসা।
প্র। গঙ্গানদীর উৎপত্তি স্থান কোথায়?
উ। বিষ্ণুপুরে।
প্র। কোন্ ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করে না?
উ। ব'বুঘাটে।
প্র। কোন্ ঘাটে কল নাই?
উ। কল্‌ভিনঘাটে।
প্র। কোন্ দুর্গ আলি দ্বারা বেষ্টিত?

উ। আলিগড়।

প্র। কোণ্ স্থানে মায়াদেবীর অধিষ্ঠান?

উ। মায়াপুরে।

প্র। কোন্ স্থানে কামানের গোলা মারিলে ভাঙ্গে না?

উ। গড়ওয়ালে।

প্র। দাড়িম্ব কোথায় পাওয়া যায়?

উ। আনরপুরে।

প্র। কোন্ পর্ব্বতে সুবর্ণময় সলিল প্রবাহিত হয়?

উ। কাঞ্চন গঙ্গায়।

প্র। কোন্ নয়টি পল্লী পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত?

উ। পূর্ব্বনপাড়া।

প্র। সাগরে মুক্তা পাওয়া যায় সকলেই জানে কিন্তু অন্য কোন জলাশয়ে মুক্তা পাওয়া যায়?

উ। মতিঝিলে।

প্র। ৮ কাশীধামে কোন্ বাড়ীটি চলাবুলা করিতে পারে?

উ। জঙ্গমবাড়ী।

প্র। পূর্ব্বে কোন্ নগরে দর্ভ পাওয়া যাইত না?

উ। বিদর্ভ নগরে।

প্র। কোন্ দ্বীপটী সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট হইয়াছে?

উ। অগ্রদ্বীপ।

প্র। বনেই সকলে শিকার করিতে যায় কিন্তু এমন একটি সহরের নাম কর যেখানে শিকার করিবার সুবিধা আছে?

উ। শিকারপুর।

প্র। উড়িষ্যার মধ্যে কোন্ অঞ্চলের জল অম্লরস?

উ। কটক অঞ্চলের।

প্র। কোন্ রেলে ইন্দ্রের রাজধানী যাওয়া যায়?

উ। অমরাবতী রেলওয়েতে।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

৩। আত্মা ও আত্মজ্ঞান।

ওয়াল্ট হুইটম্যান বলিয়াছেন "we will joyfully accept modern science, and loyally follow it; but there remains a still higher flight, a higher fact—the eternal soul of man. * * * To me the crown of scientism will be, to open the way for a more splendid theology, for ampler and diviner songs" মার্কিন কবি গভীর বিশ্বাসের সহিত এই যে তাঁহার প্রাণের আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এই আশা নিশ্চয়ই একদিন সফল হইবে, সত্যে পরিণত হইবে। আমরা ততদিন ইহলোকে জীবিত থাকি বা না থাকি, বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা স্পষ্টই জানিতেছি যে, সেই একদিন আসিবে, যেদিন বিজ্ঞান আত্মতত্ত্বের নিকট যাইয়া বলিবে "আমি তোমারই অঙ্গমাত্র" এবং আত্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে মিলিয়া সেই ত্রিভুবনপালক মহান্ আত্মার বিজয়-সঙ্গীত

গাহিয়া চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে থাকিবে। আধুনিক সঙ্কীর্ণ হৃদয় বৈজ্ঞানিকগণ সহস্র কুতর্কজালে প্রকৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন করাতে এই শুভদিবস আসিবার বিলম্ব ঘটিতেছে মাত্র, কিন্তু এই দিন যে আসিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ জড়তত্ত্বেরই আলোচনায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া, জড়তত্ত্বে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া, কেবল বিরোধ করিবার আশায়, সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়াতীত গূঢ় রহস্য আত্মতত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে, আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রকৃত সত্য যে জানিতে পারিবেন না, তাহাতে কি আর কোন বক্তব্য আছে? তাঁহারা আত্মতত্ত্বে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন না করিয়া কেবলই তর্কজাল বিস্তার করেন। আত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার প্রকৃষ্ট পথ যে আত্মার সহজজ্ঞান, তাহা পূর্ব্বপ্রস্তাবে বিবৃত হইয়াছে, এইস্থলে তাহার পুনরায় বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে আত্মার সহজ জ্ঞানের প্রতি যদি আমাদের সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কেবল ঈশ্বর-জ্ঞানের কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আপনার সত্তা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ রাখিতে পারেন, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না। অজ্ঞেয়বাদীগণও আত্মার এই সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পূর্ব্বপ্রস্তাবে দেখিয়া আসিয়াছি যে বাহ্যবস্তু কর্ত্তৃক উৎপাদিত মনশ্চিত্রিত ভাব হইতে সেই বস্তুর বহিঃসত্তায় উপনীত হওয়া যুক্তিতর্কের অতীত একমাত্র সহজ-জ্ঞানই আমাদিগের সংশয় দূর করিয়া তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি করাইয়া দেয়। সহজ জ্ঞান এইরূপে কি জড়তত্ত্ব, কি আত্মতত্ত্ব সকল বিষয়ক জ্ঞানেরই ভিত্তিস্বরূপে অবস্থিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সহজ জ্ঞান জড়তত্ত্ব বিষয়ক যাহা কিছু প্রকাশ করে, অজ্ঞেয়বাদীগণ তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেন; কিন্তু সহজ জ্ঞান আত্মতত্ত্বের যেটুকু প্রকাশ করিবে, তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত ও ভীত (১) হয়েন। তাঁহাদিগের অবলম্বিত প্রণালী সমূহের সামঞ্জস্য বুঝিতে আমরা অক্ষম।

সহজ জ্ঞান যেমন জড়তত্ত্বের মূল সত্য প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বেরও মূল সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি কার্য্য করিতেছি, কিন্তু 'আমি' যে এই সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি সহজ জ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি যে আমার কৃত কার্য্য 'আমি'ই করিতেছি। আমি নদীর তীরে বসিয়া সুন্দর দৃশ্যসমূহ দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি এবং জানিতেছি যে সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি; সহসা তথায় দুইটী বালক কলহে প্রবৃত্ত হইয়া একটী অপরটীকে ঠেলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল; বালকটী নদীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আমি প্রথম বালকের দুর্ব্বৃত্ত আচরণ দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম এবং দ্বিতীয় বালকের কষ্ট দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য নদীতে অবতরণ

(১) Dr. Martineau's Preface to "A study of Relgion." vol 1

করিলাম। এখানে সহজ জ্ঞান কেমন সুন্দর প্রকাশ করিতেছে যে, এই দেহ-পঞ্জরে আবদ্ধ একই ব্যক্তি (আত্মা) আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, কলহ দেখিয়াছে, একটী বালককে তাহার আচরণের জন্য শতবার ধিক্কার দিয়াছে, এবং অপর বালককে রক্ষা করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি সে নিজে জানিয়াছে যে সে এইগুলি কার্য্য করিয়াছে। এই আত্মা সর্ব্বপ্রকার চিন্তার, সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির ভিত্তিস্বরূপে অবস্থিত, সুতরাং ইহা একটী সদ্‌বস্তু (noumenon) অর্থাৎ ইহা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত বা তিরোহিত হয় না। আমাদের আত্মা যে সদ্‌বস্তু, তাহা আমরা সহজ জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু অজ্ঞেয়বাদীগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে আত্মবাদীদিগের কথিত আত্মার সদ্‌বস্তু হওয়া দূরে থাক, তাহার প্রকৃত অস্তিত্বই নাই, প্রকৃত-পক্ষে তাহা কতকগুলি চিন্তা ও অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিভাসের সমষ্টিমাত্র।

বাহ্যবস্তু যাহা কিছু আমাদের অন্তরে প্রতিভাসিত করে, তাহাই প্রতিভাস (Phenomenon) শব্দের বাচ্য। প্রতি-ভাস সদ্‌বস্তুর বিপরীত। সদ্‌বস্তু স্থায়ী পদার্থ এবং প্রতিভাস সকল ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র। অজ্ঞেয়বাদীগণ বলেন যে আত্মবাদীগণ অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতির সমষ্টির নামকরণ করেন 'আত্মা'। তাঁহাদের মতে আমাদের জ্ঞানকে বা চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি প্রতিভাসে পরিণত হয়। এই মুহূর্ত্তে আমার যে চৈতন্য হইতেছে, তাহা এই মুহূর্ত্তের ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা চিন্তার অতিরিক্ত অপর কিছুই নহে, সমস্ত জীবনে আমি যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা ঐ প্রকার ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা চিন্তার সমষ্টিমাত্র, সেই সকল প্রতিভাসের ভিতরে 'আমি' বলিয়া কোন পদার্থ লুক্কায়িত নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে আমি এক্ষণে অনুভূতিমাত্র হইতেছি, পরক্ষণে চিন্তামাত্র হইতেছি, একক্ষণে সুখানুভূতি হইতেছি, পরক্ষণে দুঃখানুভূতি হইতেছি, আর আমার সমস্ত জীবন সেই সকল প্রতিভাসের সমষ্টিমাত্র। এক কথায় আমাদের আত্মা নাই, ইহাই অজ্ঞেয়বাদীদিগের মত। পূর্ব্বে অনেক-স্থলে বলিয়াছি যে তাঁহারা স্পষ্ট কথায় বলেন না যে আত্মা নাই, তাঁহারা বলেন যে আমাদের যদি বা এক বা ততোধিক আত্মা বা কোন সদ্‌বস্তু থাকে, তাহা আমরা কিছুতেই জানিতে পারিব না, আমরা কেবল প্রতিভাস মাত্রই জানিতে পারি।

অজ্ঞেয়বাদীগণ যে সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন, এইবারে তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব। আমাদের সহজ জ্ঞান বলিয়া দেয় যে, বিষয় (১) থাকিলেই বিষয়ীকেও থাকিতে হইবে, নচেৎ বিষয় কাহার নিকট বিষয় হইবে এবং বিষয়ী কাহার সম্বন্ধে বিষয়ী হইবে? বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর সম্বন্ধবাক্য। আত্মতত্ত্বের সমা-লোচনাকালে অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদীগণ বিষয় ও বিষয়ীর এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেন

(১) বলা বাহুল্য, কথাগুলি দার্শনিকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষয়, object বিষয়ী—subject।

ভুলিয়া যান। অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি বিষয়মাত্র, ইহারা প্রতিভাসিত হয়। কিন্তু ইহারা কাহার নিকট প্রতিভাসিত হয়, ইহাদিগের বিষয়ী কে? জড়জগতের ঘটনা যতক্ষণ ঘটনামাত্র থাকে, ততক্ষণ বিষয় না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যৎক্ষণাৎ তাহা কাহারও নিকট প্রতিভাসিত হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা বিষয়ীভূত হইয়া প্রতিভাস শব্দের বাচ্য হইবে এবং যেই তাহা বিষয়ীভূত হইবে, তখনি তাহার এক বিষয়ী থাকিবেই। আমরা এরূপ কল্পনা করিতে পারি যে বিষয়ী কোন প্রাণী জগতে জীবিত নাই, তথাপি. সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের উদয়াস্ত হইতেছে. ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে, বায়ু বহিতেছে, ফুল ফুটিতেছে। এই সকল জড়জগতের ঘটনা হইল। কিন্তু ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে অনুভূতি আছে, চিন্তা আছে, প্রতিভাস আছে অথচ এই সকলের বিষয়ী নাই। মানসিক জগতের ঘটনামাত্রেই নিত্য দ্বিত্ববাচী। প্রতিভাস প্রকৃতই প্রতিভাস হইতে গেলে নিশ্চয়ই কোন বিষয়ীর নিকট প্রতিভাসিত হইতে হইবে, অনুভূতি কোন বিষয়ী কর্ত্তৃক অনুভূত না হইলে অনুভূতি হইতে পারে না, চিন্তার ভাবই এই যে এক বিষয়ী চিন্তা করিতেছে, তবে তাহা চিন্তা নামে অভিহিত হইতেছে। এইরূপে দেখিতেছি অন্তর্জ্জগতের ঘটনামাত্রেই অর্থাৎ প্রতিভাস মাত্রেই আপনাকে প্রকাশ করে এবং তৎসঙ্গে বিষয়ীকেও (চলিত কথায় আমরা যাহাকে আত্মা বলি) সূচিত না করিয়া থাকিতে পারে না। অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদী এই সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য না বুঝিয়া আত্মাকে প্রতিভাসের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্যতম গুরুকুলতিলক হার্ব্বার্ট স্পেন্সর এই সত্য বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন "How can consciousness be wholly resolved into impressions and ideas—that is, into sensations and thoughts—when an impression necessarily implies something impressed? Or again, how can the sceptic, who has decomposed his consciousness into impressions and ideas, explain the fact that he considers them as *his*? Or once more, if he admits (as he must) that he has an impression of his personal existence, what warrant can he show for rejecting this impressions as unreal, while he accepts all his other impressions as real? Unless he can give satisfactory answers to these questions, which he cannot, he must abandon his conclusions, and must, admit the reality of the indvidual mind." তিনি বলিতেছেন যে প্রতিভাস মাত্রেরই বিষয়ী থাকিবে। এই বিষয়ী না থাকিলে সংশয়বাদী তাহার অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিভাসকে তাহার বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না, আর সংশয়বাদী অন্যান্য প্রতিভাসের ন্যায় স্বীয় ব্যক্তিগত অস্তিত্বেরও (যাহাকে আমরা আত্মার অস্তিত্ব বলি) প্রতিভাস যখন প্রাপ্ত হয়েন,

তখন তিনি অন্যান্য প্রতিভাসের প্রকৃত সত্তা স্বীকার করিলেও স্বীয় ব্যক্তিগত অস্তিত্বে প্রতিভাসকে অস্বীকার করেন কেন—ভ্রান্ত বলেন কেন? তাঁহার মতে কোন সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী এই সকল গুরুতর আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। সুতরাং যখন দেখিতেছি যে বিষয়ী আত্মা না থাকিলে অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতি কোন কর্ম্মই চলিতে পারিত না, তখন আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইতেই পারে না। আত্মার অস্তিত্ব সংশয়বাদীদিগের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য বক্রপথে নাসিকা প্রদর্শনের ন্যায় যদিও এতটা বাক্যব্যয় করিতে হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যুক্তিতর্কের আবশ্যক নাই—ইহা সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য। এই বিষয়ী আত্মা বিষয়ের বিপরীত, প্রতিভাসের বিপরীত সদ্বস্তু।

অজ্ঞেয়বাদীদিগের অনেকে আত্মাকে অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিভাস সমূহের সমষ্টি বলিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন। এই সকল অতি অজ্ঞেয়বাদীদিগের কেহ কেহ সমস্ত শরীরকে না বলিয়া তাহার অংশ মস্তিষ্ককে আত্মা এবং অনুভূতি প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের পরমাণু সমূহের গতি প্রভৃতি ভৌতিক প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। এখানেও বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা সহজ জ্ঞানকে ছাড়িয়াই এত ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমাদের সহজ জ্ঞান বলিয়া দিতেছে এবং ইতিপূর্ব্বেই যুক্তিযুক্ত বিচারেও দেখিয়া আসিলাম যে আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অতীত সদ্বস্তু। আত্মাই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, মন্তা, বোদ্ধা। আত্মাই দেহরূপ উপায়ের দ্বারা দর্শনাদির ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। আত্মা যদি দেহ বা তাহার কোন অংশ হইত, তাহা হইলে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইতে পারিত না। আত্মা যদি সমগ্র শরীর হইত, তাহা হইলে শরীরের এক অংশ বিনষ্ট হইলেও আমিত্ব জ্ঞানের ক্ষতি হয় না কেন? প্রকৃতই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ আত্মার জ্ঞানলাভের বিভিন্ন দ্বারস্বরূপমাত্র। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায় বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতিও আত্মার জ্ঞানলাভের দ্বারমাত্র, কিন্তু সেই সকল যন্ত্রকে কে কবে আত্মা বা 'আমি'র সহিত এক বলিয়াছেন? এই সকল যন্ত্র ও শরীরের অঙ্গসমূহের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে শেষোক্তগুলি আমার অজ্ঞাত কারণে আমি না চাহিয়াও প্রাপ্ত হইয়াছি এবং প্রথমোক্তগুলি আমাকে আবশ্যকমত প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয় এবং আর একটু প্রভেদ এই যে যন্ত্রাদি অপেক্ষা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকতর নিখুঁতভাবে সৃষ্ট (১) এই শরীর আত্মার জ্ঞান দ্বারস্বরূপে এমনভাবে সৃষ্ট যে শরীরের এক অঙ্গ বিনষ্ট হইলে অপর অঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সেই নষ্ট অঙ্গের ক্ষতি পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

(১) সৃষ্ট শব্দ ব্যবহার করিলাম বলিয়া এখানে ঈশ্বরের সত্তার কথা স্বীকৃত হইতেছে না। উপযুক্ত কথার অভাবে ইহা ব্যবহার করিয়াছি। সংশয়বাদীগণ ইহার অর্থে বুঝিবেন—যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত এইরূপ তাৎপর্য্য।

আমার চক্ষু বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের একটী দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতি অপরাপর শক্তি বৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। বাহিরের কোন বস্তুকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া লইলে তাহার সহিত 'আমি' বা আত্মার যে সম্বন্ধ, শরীরেরও সহিত আত্মার সেই সম্বন্ধ। আর প্রকৃতই আমাদের এই দেহ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নূতন নূতন পরমাণু আসিয়া সংযুক্ত হইতেছে, পুরাতন পরমাণু বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষই দেখিতেছি যে আত্মা নূতন পদার্থকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া লইতেছে। যখন দেহের পরিবর্ত্তন হইলেও আমি জ্ঞান একই রহিতেছে, তখন আত্মাকে দেহের সহিত অভিন্ন বলা বাতুলতা ভিন্ন অধিক কিছুই নহে। যন্ত্রস্বরূপ শরীরের সহিত যন্ত্রী আত্মাকে বিভিন্ন বোধ করা, আর কর্ম্মকার ও তাহার লৌহযন্ত্র সকলকে অভিন্ন বোধ করা একই কথা। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সহজ জ্ঞানই বলিয়া দেয়, আত্মা ও শরীর এক নহে, এখন সেই সহজ জ্ঞান-সিদ্ধ সত্য পরীক্ষিত হইয়া সংসিদ্ধ হইল।

অনেক স্থলেই আমরা অজ্ঞেয়বাদী-দিগকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে তাঁহারা নাস্তিক নামেরই উপযুক্ত; তাঁহারা আপনাদিগকে যদিও নাস্তিক বলিতে ইচ্ছুক নহেন কিন্তু তাঁহাদের মত সকল সম্পূর্ণরূপে নাস্তিকতার পক্ষপাতী। তাঁহারা "ঈশ্বর নাই", আত্মা নাই" প্রভৃতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া আপনাদের অদার্শনিকতার পরিচয় দিতে চাহেন না মাত্র, নতুবা তাঁহাদের মনোগত অভি-প্রায় এই যে ঈশ্বর নাই এবং আত্মা নাই। আরও তাঁহাদের বিবৃত মত সকল এই নাস্তিকতা ভিত্তির উপরেই অনেকটা দাঁড়াইয়া আছে। অজ্ঞেয়বাদী-দিগের অগ্রণী স্পেন্‌সর এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন বটে যে আমরা আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হই, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে এই বিশ্বাস যুক্তি বিরুদ্ধ "Unavoidable as is this belief (in the existence of the individual soul), * * * it is yet a belief admitting of no justification by reason ; nay, it is a belief which reason, when pressed for a distinct answer rejects," স্পেন্‌সর স্বীয় ভ্রান্ত বিচার-প্রণালীর ফলে আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অগত্যা আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিয়া পরি-ত্যাগ করিলেন, কারণ একদিকে আমরা তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি, অপর দিকে তাঁহার অবলম্বিত বিচারে আমরা তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি ঈশ্বরকেও একদিকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন, অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরকে সেই "অজ্ঞেয়ের প্রকাশ" বলিতেছেন। এই-রূপে তাঁহার উক্তিসমূহে পরস্পর বিরোধী বাক্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, যদিও স্পেন্‌সর, সূক্ষ্মভাবে ধরিলে, নাস্তিক নহেন কিন্তু তাঁহার এই অজ্ঞেয়বাদ ভিত্তির উপরে গ্রথিত মত সকল প্রায়ই নাস্তিক আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার উদাহরণ

স্বরূপে তিনি আমাদের চিন্তা প্রভৃতিকে ভৌতিক জড়শক্তির রূপান্তরমাত্র বলিয়াছেন *। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে, স্পেন্সর কার্য্যত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে ব্রহ্মের অস্তিত্বও দাড়াইতে পারে না। এই সকল কারণে আমরা স্পেন্সর প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীদিগকে নাস্তিক বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছি না।

আর একটী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও অজ্ঞেয়বাদীর বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে অজ্ঞেয়বাদীদিগকে সাধারণভাবে নাস্তিক বলিবার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না; বরঞ্চ তাঁহাদের কেহ কেহ স্পষ্টই জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছেন। অধ্যাপক হক্সলি তাঁহার এক গ্রন্থে "পূর্ণ অজ্ঞেয়ের" সুন্দর এক স্তোত্র সন্নিবেশিত করিলেও আমরা তাঁহাকে নাস্তিক এবং এমন কি, জড়বাদীও বলিতে পারি। হক্সলি প্রাণপঙ্ক নামক এক প্রকার জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক শক্তিসমষ্টির ফলকেই আমাদের জীবন এবং সেই জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক পরিবর্ত্তনেরই বিকাশকে চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্য বলেন। তিনি আমাদের প্রতিভা, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক কার্য্য সকলকেও 'শরীরের বিশেষ অংশে সংঘটিত পারমাণবিক পরিবর্ত্তন মাত্র' বলেন। হক্সলি যদিও নিজে 'অজ্ঞেয়বাদী' (agnostic) কথা প্রস্তুত করিয়া আপনার নামের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, সেইরূপ জড়তত্ত্বও অজ্ঞেয়—আত্মা ও জড় আমাদের চেতনার অজ্ঞেয় ও কল্পিত কারণের নাম মাত্র—তথাপি তাঁহাকে নাস্তিক তো বলিবই, তাঁহাকে জড়বাদী (materialist) বলিতেও প্রস্তুত আছি। তিনি কার্য্যতঃ জড়বাদকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। হক্সলির ন্যায় জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণই অজ্ঞেয়বাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। হক্সলি সগর্ব্বে বলিয়াছেন "The Progress of sience in all ages, has meant the extension of the province of what we call matter and causation, and the concomitant gradual banishment, from all regions of human thought, of what we call spirit and spontaniety." অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে জড়তত্ত্ব ও কার্য্যকারণতত্ত্বের অধিকার বিস্তৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে মনুষ্যের চিন্তারাজ্য হইতে আত্মতত্ত্ব বিদায় গ্রহণ করিবে। জড়বাদের এই গর্ব্বিত উক্তি সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আত্মতত্ত্বের বিদায় গ্রহণ দূরে থাক, আত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির দ্বারা স্বীয় অধিকার দৃঢ়তর করিয়া লইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিলাম যে হক্সলি বলেন যে প্রাণপঙ্ক নামক বৈজ্ঞানিক পদার্থের ভৌতিক ক্রিয়াই আমাদের জীবনরূপে প্রতিভাত হয়। ইঁহার মতে এই প্রাণপঙ্ক আমাদের শরীরের সর্ব্বত্রই এবং মস্তিষ্কেও আছে। হক্সলি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করায় ক্রমে দেখি যে

* First Principles P. 217

কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে আত্মা দেহ হইতে বিভিন্ন নহে, কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে আত্মা দেহ হইতে অভিন্ন নহে এবং কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, আত্মা মস্তিষ্ক হইতে অভিন্ন। আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। আত্মা যখন দেহ হইতেই ভিন্ন হইল, তখন আত্মা যে মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? মস্তিষ্ক তো দেহেরই এক অঙ্গমাত্র, দেহ হইতে ভিন্ন নহে। আত্মা ও মস্তিষ্কের অভিন্নতার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে উপরোক্ত একটী আপত্তি ব্যতীত আরো অনেকগুলি আপত্তি দণ্ডায়মান আছে। মস্তিষ্কই যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে আমি যখন 'আমি'কে বা আত্মাকে জানিতে যাই, তখন আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা উচিত। কিন্তু আমি বরঞ্চ আমার অস্তিত্ব জানিতে পারি, মস্তিষ্কের বিষয় শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে না শুনিলে কিছুই জানিতে পারি না। শারীরতত্ত্ববেত্তারা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন চলিতেছে। আমি মস্তিষ্কমাত্র হইলে তাহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমার আমিত্বেরও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন অনুভব করিতাম। আমার ক্রমাগত এইরূপ অনুভব হইত যে পুরাতন 'আমি' চলিয়া গিয়া নূতন 'আমি' হইয়াছি। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে আমারও কোন পরিবর্ত্তনই আমি অনুভব করিতে পারি না, এমন কি, আমার নিজের মস্তিষ্ক যে আছে, তাহাও অনুভব করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কেহ এমনও বলিতে পারেন যে 'আমি'ই যখন নাই, তখন আমিত্বেরও অনুভব করিতে পারে না এবং এই কারণে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমিত্বেরও পরিবর্ত্তন অনুভব করি না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে 'আমি' বা আত্মা আছে এবং এখনও দেখিব যে আত্মার অস্তিত্ব আছেই। অজ্ঞেয়বাদী যদি বলেন যে, যে কারণেই হউক, আমিত্বের অনুভব হয় না, তবে তাহার ন্যায় ভ্রান্ত কথা আর কিছুই নাই। তাঁহারা এই আমিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই প্রতি পদক্ষেপ করিতেছেন। ইহাকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের জ্ঞানের ভিত্তিই থাকিতে পারে না। এই কারণে কি অজ্ঞেয়বাদী কি জড়বাদী সকলেই অন্ততঃ কতকাংশে আমিত্ব জ্ঞান স্বীকার করিয়া লয়েন। অজ্ঞেয়বাদীদিগের শিরোভূষণ হার্ব্বার্ট স্পেন্সর উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপে বলিতেছেন "The Personality of which each is conscious, and of which the existence is to each a fact beyond all others most certain." পূর্ব্বেও তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও তিনি আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদিগের (sceptic) সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহারাও আপনাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের (বা আত্মার অস্তিত্বের) অনুভব করেন। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মস্তিষ্ক আমি হইলে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমারও পরিবর্ত্তন অনুভব করিতাম, কিন্তু তাহা করি না। আরও এক গুরুতর কারণে মস্তিষ্ক 'আমি' হইতে পারে না

মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণুই জড় অচেতন পদার্থ, তাহারা আপনাদের পৃথকত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই প্রকার পরমাণু সমূহের সমষ্টি হইতে আপনার একত্বে অভিজ্ঞ পুরুষের উৎপত্তি অনুমান করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা আনয়ন করিতে পারি না। আমরা আমাদের প্রত্যেকের একত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতারও প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ কি আত্মবাদী, কি অজ্ঞেয়বাদী সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তাহা প্রত্যক্ষ জানিতেছে। অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ অজ্ঞেয়বাদী জনষ্টুয়ার্টমিল বলিতেছেন Consciousness of the mind's own feelings and operations cannot be disbelieved.' * সুতরাং আত্মা যেমন শরীর হইতে ভিন্ন দেখিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতেও যে ভিন্ন তাহা দেখিলাম। (ক্রমশঃ)

* Examinato os Hamilton's Philosophy 3d. Ed. P. 166. † Parlament of Religions.

অভাগিনীর আত্মকথা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি কোথায়?

দেখিতে দেখিতে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল কথাবার্ত্তায় অনেক সময় গেল। যত রাত্রি হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তবে সেই ঘরে একটা ঘড়ী ছিল, টং টং করিয়া তাহাতে দুইটা বাজিল। দিদি ভুবনমোহিনীকে আমি সেই দিন হইতে দিদি বলিয়া ভাবিতাম—দিদি বলিল "মনো! তুমি ঘুমাও, রাত অনেক হইয়াছে। কাল সমস্ত দিন কথা কহিব। আমিও যাই শুইগে।" বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল কিন্তু আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম "একি! তুমি কোথায় যাইবে? আমি একলা এঘরে থাকিতে পারিব না। তুমি আমার কাছে থাক।"

দিদি তখনই পাশে বসিয়া বলিল "সেকি! এমন ঘরে তোমার ভয় কি? আমি এই পাশের ঘরেই আছি,—ডাকিলেই সাড়া পাবে।"

আমি তাহার হাতটী আরও জোরে ধরিলাম—ধরিয়া বলিলাম "না আমি একলা থাকিতে পারিব না। তুমি আমার কাছে থাক, আর যদি নিতান্তই না থাকিতে পার, তুমি যে ঘরে থাকিবে, সেই ঘরে লইয়া চল, আমি তোমাকে ছাড়িব না।"

অগত্যা দিদি রহিল। দিদি বলিল "তবে এস এই গদিতে শুই" বলিয়া একখানি সুন্দর খাটের উপর আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি

তাহা হইতে উঠিয়া বলিলাম "দিদি আমি খাটে শোব না, আমাকে মেজের উপরে একখানি কম্বল দাও, তুমি ঐ খাটে শোও।"

দিদি বুঝিতে পারিল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হা পোড়া কপাল! হিন্দু বিধবার জন্ম কেন?—বলিয়া পাশের ঘর হইতে একখানি চাদর আনিয়া মেজের উপর পাতিয়া দিল। আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং তাহাতে শয়ন করিলাম, দিদিকে বলিলাম "তুমি খাটের উপর শোও, কম্বলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।" কিন্তু দিদি আমার পাশেই কম্বলের উপর শয়ন করিল। আহা সেই সুকোমল ফুটন্ত শতদল কঠিন ও কর্কশ কম্বলের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং আর দুই চারিটী কথার পরই ঘুমাইয়া পড়িলাম। দিদি ঘুমাইল কি না বলিতে পারি না। ঘুমের ঘোরে কত যে কুস্বপ্ন দেখিলাম তাহা আর কি বলিব। সকল কথা মনে নাই কিন্তু একটী হাড়ে হাড়ে গাঁথা রহিয়াছে, সেটির বিষয় কথনই ভুলিব না। দেখিলাম আমি যেন একখানি ছোট নৌকা করিয়া পদ্মা পার হইতেছিলাম। খানিক দূর গিয়াই নৌকা জলে ডুবিল। আমিও সেই সঙ্গে ডুবিলাম। মাঝিরা কে কোথায় পলাইল, দেখিতে পাইলাম না। যত ডুবিতে লাগিলাম, ততই অন্ধকার, ততই নানা বিকট শব্দ। ক্ষণেক পরে এক জলকুমারী আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিল, কিন্তু সে আমাকে তীরে না তুলিয়া একটা ভয়ানক হাঙ্গরের মুখে ফেলিয়া দিল। ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। যথন ঘুম ভাঙ্গিল ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম খড়খড়ীর পাখীর ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণরেখা দুই এক স্থানে খেলা করিতেছে। চারিদিকে চড়ুই ও কাকগুলি কলরব করিতেছে, বাড়ীর ভিতর দূরে দূরে লোকের অস্পষ্ট কথা-বার্ত্তা শুনা যাইতেছে। দেখিলাম দিদি আমার পাশে বসিয়া হাঁসিতেছে। তাহার হাঁসির কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না। দিদি বলিল "কি স্বপন দেখিতেছিলে?" আমি বলিলাম "কেন? তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

দিদি। তুমি যে কাঁদিতেছিলে। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। চোখ মুদিয়া স্বপ্নের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। শুনিয়া দিদি আরও হাঁসিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দিদি বলিল "চল মুখ ধোবে ত চল।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে চলিলাম। ঘরের বাহিরে আসিবামাত্র আমি সূর্য্য দেবকে দেখিতে পাইলাম। তখনই মনটা কেমন হইল। কাল প্রভাতে যে সূর্য্যকে দেখিয়াছি, আজ সেই সূর্য্যই জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বদিকে উঠিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ইহাতে কত প্রভেদ! একদিকে কত বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, জগতের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! যেন একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে।

একদিনের মধ্যে কত দেখিলাম, কত শুনিলাম,—কত শিখিলাম। মানুষ বুড় হয় কিসে? লোকে বলে বয়সে বুড় হয়, কিন্তু বয়সত নিমিত্ত মাত্র, অবস্থাই

মানুষের বয়োবৃদ্ধির প্রধান কারণ। এক রাত্রে যাহা ঘটিয়াছে, সমস্ত জীবনে অনেকের তাহা ঘটে না। অনেকে শত বৎসর অতিক্রম করিয়াও জীবনের প্রথম বয়সেই থাকে, কেহ বা একদিনেই বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়।

রাত্রি পোহাইল, কিন্তু কাল কি ছিলাম, আজ কি হইয়াছি! কাল প্রভাতে কত আশা ছিল, আজ প্রভাতে সকল আশা ভরসাই ফুরাইয়াছে। তাই বলিতেছি একদিনে এত পরিবর্ত্তন একমাত্র রাজচক্রবর্ত্তীর ও হিন্দু বিধবার ঘটিয়া থাকে। হায়! সে রাত্রি কেন পোহাইল? না পোহাইলে আমাকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা তত স্পষ্ট দেখিতে হইত না। রজনীর অন্ধকারে মিশিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতাম, কাহার মুখ দেখিতে অথবা কাহাকেও মুখ দেখাইতে হইত না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই কাপড় কাচা হইল। আমরা আবার ফিরিয়া আসিলাম। দিদি আমাকে একখানা নূতন কাপড় দিতে চাহিল, কিন্তু আমি বলিলাম "এক বসনেই থাকিব। যাহার এমন সর্ব্বনাশ, তাহার আর নূতন কাপড়ে কি হইবে?" দিদি জোর করিয়া আমার ভিজা কাপড় খুলিয়া লইল এবং একখানি শুক্ন কাপড় পরাইয়া দিয়া বলিল "তুমি বস, আমি কাপড় ছাড়িয়া আসিতেছি।" তাহার পরণে একখানি শান্তিপুরে কাপড় ছিল। সেখানি ছাড়িয়া একখানি ফরাসডাঙ্গার সাড়ী পরিয়া আসিল। ইহাতে প্রায় অল্পক্ষণই অতীত হইল, কিন্তু সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেক ভাবনা আমাকে কাতর করিল। কত কি ভাবিলাম, সকল কথা মনে নাই, কিন্তু প্রধান ভাবনা এই—আমি কোথায়?

সমস্ত রাত গেল, তাহার পর এতখানি বেলা হইল, কিন্তু সেই এক ভুবনমোহিনী ছাড়া সে বাড়ীতে আর কাহাকেও তখন দেখিতে পাইলাম না। তাই মনে হইল ভুবনমোহিনী কে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভুবনমোহিনী কে?

দিদি তখনই কাপড় ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিল, যেন একটা সৌন্দর্য্যের স্রোত ঘরের ভিতর ঢুকিল সেই মুখেরদিকে চাহিয়া ঘরের ছবিগুলির দিকে চাহিলাম,—যেন নিবিয়া গিয়াছে। এমন মাজা ঘষা, চাঁচা ছোলা,—যেন বিধাতা সৌন্দর্য্যরাশির মধ্য হইতে সযত্নে খুঁদিয়া তুলিয়াছেন—এমন রূপ লইয়া ভুবন এখানে কেন? মানস সরোবরের সোণার কমল কেমন করিয়া এখানে আসিল? এইরূপ অনেক চিন্তার পর ভুবনের মুখেরদিকে চাহিয়া আবার ভাবিলাম ভুবনমোহিনী কে? তখন আমি কোথায় এবং ভুবনমোহিনী কে? এই দুইটী চিন্তাই প্রবল হইল। এই দুইটীই এক,—একটী স্থির হইলে অপরটীতে আর সন্দেহ থাকিবে না। প্রথম কথাটী জিজ্ঞাসা করা সহজ, কিন্তু শেষটী তত

সহজ নহে। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার কোন সন্দেহ হইল না। দুইজনে ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলাম দেখিলাম সেটী দোতালা,—সম্মুখে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান,—গাছগুলি বেশ কেয়ারি করা। দুই জন উড়ে মালী গাছের গোড়ায় জল দিতেছিল। বাগানের ভিতর দুইটী বড় বড় ইন্দারা। ইন্দারার পাড় মার্ব্বেল পাথরে বাধান। বারান্দায় আসিয়া মনে করিলাম, একবার সমস্ত কথা সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করি। এক একবার খুব আগ্রহ হইতে লাগিল, বুক ধড় ফড় করিতে লাগিল, কিন্তু বেশি কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম আমি কোথায়?

দিদি আমার মুখেরদিকে চাহিয়া বলিল "কেন, তুমি কি ভয় পাইয়াছ?"

আমি কোন প্রত্যুত্তর করিলাম না। তখন দিদি বলিল "ভয় কি দিদি। তুমি নিজের বাড়ীতেই আছ।"

আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দিদি বলিতে লাগিল, এটী একটী আশ্রম অনাথ স্ত্রীপুরুষদিগের সাহায্যের জন্য ইহা স্থাপন করা হইয়াছে। যাহারা কোন সঙ্কটে পড়ে, তাহাদিগের উদ্ধার করিয়া এখানে আনিয়া রাখা হয়।"

আমার সন্দেহ হইল, বলিলাম আমি কি বিপদে পড়িয়াছিলাম যে আমাকে উদ্ধার করিয়া এখানে আনা হইল?"

দিদি—তোমার ন্যায় বিপদ অল্প লোকেরই ঘটিয়া থাকে। তোমাকে দস্যুরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমরা তোমাকে উদ্ধার করিয়া এখানে আনিয়াছি।

সন্দেহ ও বিস্ময় দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, বলিলাম, সেকি। আমিত ভাবিয়াছিলাম তোমরাই দস্যু। তবে কি তাহা মিথ্যা?"

দিদি। পরে বুঝিতে পারিবে।

আমি। তবে আমার বাবা কোথায়?

দিদি। তিনি এই বাড়ীতেই আছেন কিন্তু অন্য মহলে। শীঘ্র দেখা হইবে।

আমি। যদি তোমরা বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, তবে আনিবার সময় আমার চোখ বাঁধিয়া আনিলে কেন?

দিদি তাহার বিশেষ কারণ আছে পরে সবই বুঝিতে পারিবে। আমি যতক্ষণ আছি, তোমার কোন ভয় নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার কোন বিপদ হইবে না। তুমি বালিকা সেই জন্যই অধীর হইতেছ। ধৈর্য্য ধরিয়া কয়েকদিন থাকিলেই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে। আমি সর্ব্বক্ষণই তোমার কাছে থাকিব। যখন দিদি বলিয়াছ, তখন দিদিরই মত তোমাকে রক্ষা করিব।

দিদি যখন এই কয়েকটী কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। সেই মুখের সৌকুমার্য্যে যেন কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পাষাণ রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি হতজ্ঞান হইয়া সেই মুখ দেখিলাম, আর ভাবিলাম—"ভুবনমোহিনী কে?"

হিন্দুমহিলা।

(৪)

স্ত্রী ও পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মের পার্থক্য বিষয়ে বর্ত্তমানকালে পণ্ডিতবর ডারউইন যত অনুসন্ধান করিয়াছেন, তত আর কেহই নহে। স্বীয় তীক্ষ্ণ প্রতিভার সাহায্য তিনি মহাত্মা কপিলের ন্যায় প্রকৃতিকে মন্থন করিবার অনেকগুলি অজ্ঞানিত রত্ন আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথার এস্থলে সর্ব্ব প্রথম আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি বলেন :—

Amongst the half-human progenitors of man, and amongst savages, there have been strug gles between the males during many generations for the possession of the females. But mere bodily strength and size would do little for victory, unless associated with courage perseverance, and determined energy ... ... To avoid enemies or to attack them with success, to capture wild animals, and to fashion weapons, requires reason, invention, or imagination ······ There latter faculties as well as the former, will have been daveloped in man partly through sexual selection that is through the contest of rival males,—and partly through natural selection—that is, from success in the general struggle forlife ; and as in both cases the struggle will have been during maturity, the characters gained will have been transmitted more-fully to male than to the female offspring. ... ... Thus man has ultimately become superior to woman অর্থাৎ স্ত্রীজাতি লইয়া মানবের অর্দ্ধমানব পূর্ব্ব পুরুষ ও অসভ্যদিগের মধ্যে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়াছে। কেবল শারীরিক সামর্থ্য ও বিশালতার সাহায্যে জয়লাভ করিতে পারা যায় না ; ইহার সহিত সাহস, অধ্যবসায় ও কঠোর উদ্যম মিলিত থাকা আবশ্যক। শত্রুকে দূরে পরিহার তাহাদিগকে আক্রমণ ও পরাস্ত বন্য পশু শিকার এবং উপযুক্ত অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে হইলে যুক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, কিম্বা কল্পনার প্রয়োজন। যৌন নির্ব্বাচন—অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষবর্গের অবিরত দ্বন্দ্ব এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন—অর্থাৎ সাধারণ জীবন সংগ্রামের সাহায্যে —উভয়ই স্বীয় পরিমাণে ঐ সমস্ত বৃত্তি বা ধর্ম্মের মূর্ত্তিলাভে সহায়তা করিয়া থাকে। পরিণত অথবা প্রবীণ বয়সে এই সকল দ্বন্দ্ব ঘটিতে দেখা যায়, সুতরাং ইহার ফলাফল কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানদিগের স্বভাব চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রধানত এই সকল কারণেই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির উপর প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছে।

কথাটা বড়ই দুরূহ; নানা লোকে ইহার নানা অর্থ করিতে পারে, সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। প্রথমেই বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রী পুরুষ এই প্রকৃতির যত পার্থক্যের মূলেই স্ত্রী। অতএব যৌণ নির্ব্বাচন (Sexual selection) হইতেই আরম্ভ করিয়া ডাবউইন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনও ধরিতে হইবে। যৌণ নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষ এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অপ্রত্যক্ষ ভাবে এই ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছে। যৌণ নির্ব্বাচন পুরুষে পুরুষে; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পুরুষে পুরুষে অথবা পুরুষে স্ত্রীতে। যৌন নির্ব্বাচনে যে সময় পুরুষ জয়ী হইয়া দ্বন্দ্বের কারণ-ভূত স্ত্রীরত্ন লাভ করিল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জীবিকা নির্ব্বাহের অথবা স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত আবার দ্বন্দ্ব হইতে পারে। উভয় প্রকার নির্ব্বাচনেই স্ত্রীজাতি কখন নেতৃত্ব অধিকার করিতে পারে না; তাহাদিগকে পুরুষের বিলাস বাসনার অথবা ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতে হয়। কুকুর, ব্যাঘ্র অথবা সিংহাদি ইতর প্রাণী-বর্গের চেষ্টা চরিত্রের আলোচনা করিলে ইহার যাথার্থ্য সম্যক উপলব্ধ হইবে। সকল প্রাণীর মধ্যেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বলবত্তর। সিংহী সিংহ অপেক্ষা সহস্র-গুণে হিংসা অথবা ক্রোধপরায়ণ হইলেও কখন সিংহকে বলে পরাস্ত করিতে পারে না। বিধাতা সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই স্ত্রীকে পুরুষের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাদিগকে গর্ভ ধারণ ও সন্তান পোষণ করিতে হয়, তাহারা কখনই পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। যে সকল প্রাণীর সন্তানেরা অধিক দিন মাতার ক্রোড়স্থ হইয়া থাকে, সেই সকল প্রাণীর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা কৃত অধিক পুত্রবৎসল এবং যাহাদিগের পুত্রবাৎসল্য অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহারাই অপেক্ষাকৃত অধিক পরাধীন; কারণ সন্তানের প্রতি মায়া মমতা তাহার নিরাপদ রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে পুরুষের অধীন ও সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিয়া রাখে। পাছে সন্তানের কোন বিপদ হয়, এই ভয়ে তাহারা কোন কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সাহসী হয় না। পক্ষী ও শ্বাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। পণ্ডিতেরা বলেন মনুষ্য শিশু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন মাতার ক্রোড়স্থ থাকে, সেই জন্য মনুষ্য-মাতার সন্তান বাৎসল্য এত অধিক। কনিষ্ঠ সন্তানের উপর মাতার যে সমধিক স্নেহ, ইহাও তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। এই স্নেহ অর্থাৎ মায়াই স্ত্রী-জাতির প্রধান শৃঙ্খল। শতগুণ যোগ শিক্ষা করিলেও সহস্রগুণে আধ্যাত্মিক দর্শনে পণ্ডিত হইলেও জননী কখনই এই শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে পারেন না। দেবহূতির শাঙ্খ্য যোগ অথবা অক্ষমালার অধ্যাত্মতত্ত্ব চেষ্টা করিয়াও ইহা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই এই শৃঙ্খল রমণীর চরণে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উপর যৌণ নির্ব্বাচন এই শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিয়াছে। সুতরাং যৌণ নির্ব্বাচন ও শিশু পালন এই দুইটী ধর্ম্মই স্ত্রীজাতির পরাধীনতার প্রধান কারণ। যে যত পরাধীন, সে তত দুর্ব্বল; সামাজিক প্রভুতা হইতে সে তত দূরে স্থিত।

যখন সমাজবন্ধন সুদূর পরাহত, ধর্ম্মের ধারণা ছায়ামাত্রও যখন পাতিত হয় নাই, সেই আদিমকাল হইতেই পূর্ব্বোক্ত দুইটী ধর্ম্ম রমণীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কি যৌণ নির্ব্বাচন, কি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কোন ব্যাপারেই রমণী পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারিল না। তাহার পরাধীনতা পুরুষানুক্রমে যত বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে স্ত্রীজাতি পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িল। পিতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পুত্রে এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম কন্যায় সংক্রামিত হইয়া থাকে, এই কারণ পুরুষের বিক্রম ও সাহস পুত্রে এবং স্ত্রীর দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা কন্যায় দ্বিগুণিত হইয়া সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। একদিকে একটী চক্রবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতি থাকিল, অন্যদিকে অপরটী ভগ্নাংশের ন্যায় ক্রমাগতই কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি স্ত্রীজাতি একেবারে ধ্বংস পাইল?—পাইলে জগৎ অঙ্কুরেই দলিত হইত। কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইল। জগৎ সংসার তিনটী শক্তির কার্য্যফল। সেই তিনটী শক্তি অবিরত কার্য্য করিতেছে। ইহার মধ্যে দুইটী শক্তি পরস্পরের সম্পূর্ন বিরোধী;—তৃতীয়টী মধ্যবর্ত্তী। বিরোধী শক্তিদ্বয় পরস্পরের উদ্যম ব্যর্থ করিতে প্রবৃত্ত। উভয়েরই অবিরত আকর্ষণ ও বিকর্ষণে উভয়েরই উদ্যম যেমন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইতেছে, অমনি সেই তৃতীয় শক্তিটী উদ্ভূত হইতেছে। সুতরাং সেটী গৌণশক্তি। যতদিন মুখ্য শক্তিদ্বয় সমান থাকিবে, ততদিন গৌণ শক্তি সমভাবে উদ্ভূত হইতে থাকিবে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মুখ্য শক্তিদ্বয়ের মধ্যে একটী বলবত্তর হইবে, অমনি তাহার প্রকৃতি অনুসারে গৌণ শক্তির তারতম্য লক্ষিত হইবে। পুরাণে এই তিনটী শক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সত্ত্ব ও তমঃ মুখ্য এবং রজ গৌণ শক্তি বলা যাইতে পারে। সাত্ত্বিকী উৎপাদিকা, তামসী সংহারিকা, রাজসী, পালিকা। সাত্ত্বিকী শক্তির ক্ষয়ে তামসী শক্তির বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। শক্তিত্রয়ের এইরূপ অসামঞ্জস্যই বিপ্লব। পরিশেষে প্রতিক্রিয়া বলে রাজসীশক্তি সাত্ত্বিকীর স্থান অধিকার করিয়া বিপ্লবের নিরাকরণ পূর্ব্বক শক্তিত্রয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে *। যৌণ নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা জীবন সংগ্রাম সকলই এই শক্তিত্রয়ের অন্তর্গত। রমণীর অবস্থা নিতান্ত হীন হইতে না হইতেই এই রজোগুণ তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। যে পুরুষ তাহাদিগের অধঃপতনের মূল কারণ, সেই পুরুষ অবশেষে বৈষ্ণবী শক্তির অবতার রূপে রমণীর রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। যাঁহাকে লইয়া যৌণ নির্ব্বাচনের সৃষ্টি; যিনি বংশ বৃদ্ধির প্রধান সাধন; নশ্বর জগতে নিজের প্রতিবিম্ব পাতের পক্ষে যাহা দর্পণ স্বরূপ; মূল প্রকৃতিস্বরূপিণী সেই রমণীর রক্ষা একান্ত আবশ্যক, পুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া তাহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা প্রতিক্রিয়ার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। (ক্রমশঃ)

---

* বীরমালা ২০৭ পৃষ্ঠা।

আত্মা ও মন।

আত্মা।—

সহজ আমার কথা এসেছি বলিতে
আসিনি কারেও আমি ধরাতে ছলিতে
লইয়া সরল ভাব
এত আমার প্রভাব
সুখে থাকি ডুবে সেই অসীম ললিতে।

আন কেন কপটতা কাছে তুমি মন
অসাধু ভাবেরে তব না কর দমন
ল'য়ে অনর্থ ব্যসন
প'রে মলিন বসন
কর মনোরথে চড়ি বিপথে ভ্রমণ।

বড় ব্যথা পাই আমি তোমার কারণে
শোননা আদেশ তুমি মাননা বারণে
তাই এত কষ্ট পাও
সঙ্গে মোরেও জ্বালাও
জাগে বাধা উপাসিতে সংসার তারণে।

মন।—

আমি ভণ্ড পাপী তব কথা নাহি শুনি
দিবানিশি রাশি রাশি ক্ষুদ্রতায় গুণি
পিইয়া মোহ গরল
হ'য়ে গেছি অসরল
চারিধারে আপনার স্বার্থজাল বুনি।

তোমার সরল কথা শুনে উপকৃত
জানি বুঝি তবু আমি হ'য়ে থাকি মৃত
অন্তরে লইয়া দর্প
যেন সদা ক্রূর সর্প
মরণের গর্ত্তে ধাই না বু'ঝে অমৃত।

আত্মা —

কত গীত বাজে শুনি অসীম আকাশে
অসীমের বার্ত্তা তার ধীরে ভেসে আসে
লোকালয় কোলাহল
বিষয়ের হলাহল
প্রভাহীন সে বার্ত্তায় স্বর্গীয় প্রভাসে।

জীব আসে যায় শুধু গমনাগমন
নানা লীলাময় এই ভব উপবন
চতুর্দ্দিকে ভাঙাগড়া
অন্তহীন বোঝাপড়া
নিরাকার সাকারেতে চলিছে ভুবন।

চারিধারে দ্বন্দ্ব ছেদ দুঃখ রোগ শোক
মাঝে মোর প্রিয়তম অভয় অশোক
তাঁহার শরণাগত
হ'যে ভাবি ভাবীগত
বর্ত্তমান, সংসারের আঁধার আলোক।

কাহারো করিতে হানি চাহি না জগতে
জগতপতির আমি চলিতে অমতে
বলেন যা ভগবান
শুনে হই বলবান
আনন্দে প্রফুল্ল রহি না মিশি অসতে।

মন।—

প্রভু! যাহা ভাব তাহা উদার মহান
মোহে মেতে করি আমি সবাকার হান
এরে ধরি ওরে মারি
মরি ক'রে মারামারি
মারীভয় জেগে ওঠে মৃত্যু অবসান।

আত্মা।—
অনন্ত নিখিল মাঝে জাগে মম হর্ষ
সুধার ঝঙ্কারে যায় বিষাদ বিমর্ষ
বিশ্বের বিমল খেলা
খেলে কেটে যায় বেলা
অনন্তের করি ধ্যান লভি তাঁর স্পর্শ।

মন তুমি শোন যদি আমার বচন—
শ্রদ্ধাসহ মান যদি সৎ-প্রবচন
স্পর্শ মোর স্নেহময়
পাবে, ভবে হবে জয়
করিতে হবে না আর ক্রন্দন শোচন।

অভিমান।

এরা কত ব'লে যায়, কত ভুলে যায়,
না শুকাতে জল নয়নে,
মোরা কত অনুরাগে, নিশি নিশি জেগে
মালা গেঁথে ডাকি মরণে।
এরা শিরীষের মত পরশ কাতর,
(আসে) নিমেষের পূজা লইতে,
মোরা মাটীর প্রতিমা, মাটী হয়ে যাই,
শুভ যোগ নিশি প্রভাতে!
সখি! কত বেঁধে যায়, আয়ু না কুলায়
মরণেও থাকে পরিতাপ,
এরা আধেক জনমে, পীরিতি প্রণমে
শেষ আধে দেয় অভিশাপ!
যবে দিনান্তের প্রায়, লইত বিদায়
কেন মোরে বলে গেল না
এ যে নয়নের নেশা, প্রাণের কুয়াষা
প্রভাতের পরে থাকে না!
আমি আঁখি নীরে তিতে,আরাধি অতীতে,
মনে পড়ে যেতে যাবনা,
হেঁগা! হৃদয়েতে বাসা, হৃদয়ের আশা
(তার) চরণের তলে ঠেকে না!

আজ চ'ল গুরু ভার, বড় কায তার,
(নাহি) অবসর দিতে বারতা,
তবে জীবনের এই অতিথি শালায়
আমারি এতকি মমতা!
সখি! যমুনার জল, হয়েছে নিচল
নিরাশায় গেছে মরিয়া,
আজ রজত সিকতে, চাঁদের বাহুতে
ছড়ান মাথাটী রাখিয়া
আজ কুসুমিত বনে, কুয়াষার সনে,
বসন্ত হয়েছে বিবাদী,
আজ তরুমূলে মাথা, আধ মালা গাঁথা,
বনবালা ঘুমে বিষাদী!
আয় ভাল করে দেখি কেহ আসে নাকি
মথুরার এই পথেতে,
ওলো! মুখ চাহিবার, কেহ নাই যার,
(বড) বাধা তার মরিতে!
ওলো! আজিকার রাতে,দেখা তার সাথে,
আজিকে যেতেছি মরণে,
সই! সে নিশির মত এ নিশি হল না,
(আজ) মেঘ ঢাকে চাঁদ গগণে!

গুরু শিষ্য সংবাদ।

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা মাত্রেরই পিতৃগোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক সম্প্রদানের বিধি দিয়াছেন. এই প্রস্তাবে তাহা নিরসন পূর্ব্বক কেবল গোত্রান্তরিতা কন্যার পক্ষে পিতৃ গোত্রোল্লেখের বিধি প্রদত্ত হইল। বিধবা বিবাহের ১৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

শিষ্য। অদত্তা কন্যা বিধবা হইলে, তাহার সম্প্রদানকালে কোন্ গোত্রের উল্লেখ করিতে হইবে ?

গুরু। যদি সপ্তপদী গমন অথবা স্বামী সংসর্গ না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পিতৃগোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক সম্প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সপ্তপদী গমন অথবা সংসর্গ হইলে কন্যা পিতৃগোত্র ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহার আর যথাবিধি সম্প্রদান হইতে পারে না, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং পুনর্ভূ হইতে পারে মাত্র।

শিষ্য। সপ্তপদী গমন হইলে, কন্যা যে পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

গুরু। লঘু হারীতে আছে, যথা—

স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাঃ তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

সপ্তপদীগমনের পর স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়; পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া, তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে।

শিষ্য। হারীতের মত এই প্রকারই বটে, কিন্তু বৃহস্পতির মতে পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হইলেই গোত্রভ্রংশ হয়। যথা,—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥

পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা পিতৃগোত্র অপহৃত হয়, ভর্ত্তৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে। অতএব কোন্ মত অনুসারে চলিতে হইবে ?

গুরু। লঘু হারীতের সহিত বৃহস্পতি বচনের কোনও বিরোধ নাই। পাণিগ্রহণ গোত্রভ্রংশের প্রারম্ভ এবং সপ্তপদী গমনের পর তাহার সমাপ্তি; তাই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পাণিগ্রহণ হইলেও যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তথাপি পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতে হইবে। অতএব লঘুহারীতেও,—

"পাণিগ্রহণেন জায়াত্বং বৃত্ত হি জায়াপতিত্বং সপ্তমেপদে"।

পাণিগ্রহণ দ্বারা জায়াত্ব জন্মে এবং সপ্তপদী গমন দ্বারা জায়ার উপর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে।

এই বাক্যে বৃহস্পতির মতই সমর্থিত হইয়াছে।

শিষ্য। যদি এমতই হইল, তবে লিখিত সংহিতাতে যে,—

বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সাগতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রেচ সূতকে॥

বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে, স্ত্রী চতুর্থ দিবসে রাত্রিকালে স্বামীর সহিত পিণ্ড, গোত্র ও অশৌচে একত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই বচনে বিবাহের পর চতুর্থ দিনে বিহিত পতিগোত্র প্রাপ্তির কথা কি প্রকারে নির্ব্বিরোধ হইতে পারে ?

গুরু। উক্ত লিখিত বচনে সপ্তপদী গমন ব্যতীতও বিবাহের পর কেবল সম্ভোগ দ্বারাও যে স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাই বিহিত হইয়াছে। অতএব "চতুর্থেঽহনিরাত্রিষু" এই প্রকার উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইতেছে।

শিষ্য। লিখিত বচনে সম্ভোগ দ্বারা পতিগোত্র প্রাপ্তির কোনও কথা নাই, তবে চতুর্থ দিন রাত্রিকালে মাত্র পতিগোত্র প্রাপ্তি বিহিত হইয়াছে। কেবল ইহা দ্বারাই সম্ভোগ জন্য পতিগোত্র প্রাপ্তির বিধানকে মনে করিয়া বুঝা যাইতে পারে?

গুরু। বিবাহের পর চতুর্থ দিন অবধি সম্ভোগের কাল। অতএব স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন সংস্কার তত্ত্বে—

"তা বুভৌ ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহ শয়ীয়াতাম্"।

বিবাহের পর বর কন্যা অক্ষারলবণাশী হইয়া, তিন দিন মৈথুন বর্জ্জন পূর্ব্বক একত্র মৃত্তিকাতে শয়ন করিবে।

এই গৃহ্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিন দিন মৈথুনাদি নিষেধ পূর্ব্বক ব্যতিরেক মুখে চতুর্থাদি দিবস যে, সম্ভোগের কাল, তাহার বিধান করিয়াছেন। মহর্ষিও উক্ত গৃহ্যার্থের সহিত একবাক্য হইয়া সম্ভোগের প্রকৃতকাল চতুর্থ দিন রাত্রিতেই স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্তির বিধি দিতেছেন। (১)

স্মৃতী বিলোচন ধৃত ঋষ্যশৃঙ্গ বচন দৃষ্ট করিলে, সম্ভোগ দ্বারা পতিগোত্র প্রাপ্তি বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকে না। যথা,—

স্ত্রীণামাদাস্তু বৈভর্ত্তুর্যদ গোত্রং তেন নির্বপেৎ।
যদ্যক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পতিমন্যং সমাশ্রিতা।
তদ্গোত্রেণ তদা দেয় পিণ্ডং শ্রাদ্ধং তথোদকম্ ॥

স্ত্রীলোকের প্রথম পতির গোত্রোল্লেখ পূর্ব্বক পিণ্ডদানাদি করিবেক। যদি কন্যা অক্ষতযোনি থাকে অর্থাৎ সম্ভোগের পূর্ব্বেই অন্য পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় পতির গোত্রের উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে।

এই বচনে ক্ষতযোনির প্রথমপতির গোত্রোল্লেখ পূর্ব্বক এবং অক্ষতযোনির দ্বিতীয় পতির গোত্রোল্লেখ পূর্ব্বক পিণ্ডাদি দান বিহিত হইয়াছে, অতএব সম্ভোগই যে স্ত্রীর এতাদৃশ গোত্র পরিবর্ত্তের কারণ, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শিষ্য। লঘুহারীতের মতে সপ্তপদী গমনের পর স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্তি হইলেও লিখিতের মতে বিবাহের পর চতুর্থ দিন রাত্রিকালে পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে, একথা বলিবার আপত্তি কি?

গুরু। তাহা হইলে লিখিতের নিজের বচনেরই পরস্পর বিরোধ ঘটে। কারণ, তাঁহার মতেও সপ্তপদী গমনের পর স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়। যথা—

স্বগোত্রাদ ভ্রশ্যতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দান পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥

(১) যদ্যপি, "ঋতৌ নোপৈতি যোভার্য্যাম্ অনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি" ইত্যাদি বোধায়নীয় বচন অনুসারে ঋতুভিন্ন কালে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ, তথাপি বিবাহ মধ্যে যাহার ঋতু উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ তাদৃশী পত্নীর সম্বন্ধে এই নিয়ম। অতএব বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যে "বিবাহে বিততে তন্ত্রে" ইত্যুপক্রম্য "হুত্বাজ্যকেন লাজাংশ্চ ততস্তন্ত্রং প্রবর্ত্তয়েৎ" ইত্যন্তেন আজ্যাহুতি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান পূর্ব্বক রজঃস্বলার বিবাহ বিহিত হইয়াছে।

বিবাহে সপ্তপদী গমন হইলে, স্ত্রী পতিগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়; অতএব পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া, দান শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে।

কাযেই শাস্ত্রান্তরের সহিত এক-বাক্যতা রক্ষা পূর্ব্বক বিষয়ভেদে ব্যাখ্যা করিয়া, উভয় বচনের বিরোধ ভঞ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব ঋষ্যশৃঙ্গাদির মতের অনুসরণ করিয়া "বিবাহেচৈব নিবৃর্ত্তে" এই বচন সম্ভোগ জন্য গোত্রাপ-হার পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইল।

শিষ্য। "গোত্র শব্দের অর্থ বংশ। অমুক (ব্যক্তি) অমুক গোত্র বলিলে, অমুক (ব্যক্তি) অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে, অথবা অমুক মুনি অমুকের বংশের আদিপুরুষ, ইহাই প্রতীয়মান হয়।" অতএব "কাশ্যপ মুনির বংশো-দ্ভবা এক কন্যার শাণ্ডিল্য বংশোদ্ভব এক পুরুষের সহিত বিবাহ হইল, এই বিবাহ দ্বারা, সেই কন্যার কাশ্যপ গোত্রোদ্ভবত্ব লোপ কিরূপে হইতে পারে। যেমন, বিবাহ হইলে, পিতার পরিবর্ত্ত হয় না, পিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না; সেইরূপ, বংশের আদিপুরুষেরও পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। যদি তাহা না হইতে পারিল, তবে বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখ সময়ে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ না হইবে কেন?"

গুরু। তুমি গোত্র শব্দের যে প্রকার অর্থ প্রতিপাদন করিলে, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষেই অনেকাংশে সম্ভবিত, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্রের পক্ষে তাদৃশ সম্ভবিত নহে। কারণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ নহে। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির গোত্র দ্বারা সেই জাতির আদি-পুরুষ বুঝায় না। কিন্তু আদিপুরুষের পুরোহিত বুঝায়। অতএব রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে মিতাক্ষরা ধৃত আশ্বলায়নের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"এবঞ্চ যদ্যপি রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবস্তথাপি পুরোহিতগোত্র-প্রবরৌ বেদিতব্যৌ, তথা যজমানস্যার্ষেয়ান্ গোত্র প্রবরান্ প্রবৃণীতেত্যুক্তা পৌরহিত্যান্ রাজন্য-বিশাং প্রবৃণীতেত্যাশ্বলায়ন ইতি মিতাক্ষরা।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিজ নিজ গোত্র না থাকায়, তাহাদের প্রবরও নাই। তথাপি পুরো-হিতের গোত্রপ্রবর লইয়া, ক্ষত্রিয়াদির গোত্র প্রবর কল্পিত হইয়াছে ইত্যাদি। (২)

সুতরাং অমুক ব্যক্তি অমুক গোত্র বলিলে, অমুক ব্যক্তি অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে অথবা অমুক মুনি অমুক ব্যক্তির আদিপুরুষ, কেবল ইহাই বুঝা-ইবে, একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। আর বিবাহিতা কন্যার পিতা প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হয় না বলিয়া, তাহার গোত্রেরও পরিবর্ত্ত হয়

(২) সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষও ব্রাহ্মণ নহেন। অনেক ক্ষত্রিয় প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ হইয়া-ছেন; যথা বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশের ১৯শ অধ্যায়ে,—

"গর্গাচ্ছিনিঃ, ততোগার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ, ক্ষত্রো-পেতা দ্বিজাতয়ঃ"

গর্গের পুত্র শিনি, শিনি পুত্রগণ ক্ষত্রিয় হই-য়াও গার্গশৈন্য নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। "তস্য ত্রয্যারুণ পুষ্করিণৌ কপিলশ্চ পুত্রত্রয়ম্ অভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতাম্ উপ-জগাম"। ক্ষত্রিয় উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ ও কপিল; ইহাঁরা তিনজনেই পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইত্যাদি ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে শূদ্রেরও বিপ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ। বাহুল্য বোধে উপেক্ষিত হইল।

না, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ অনেকেই জানেন ; দত্তক পুত্র জনকের গোত্র প্রাপ্ত না হইয়া, গৃহীতারই গোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কোন দত্তক "আমি অমুক গোত্র" বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে সেই ব্যক্তি সেই গোত্র প্রবর্ত্তক মুনির বংশে জন্মিয়াছে, ইহা কখনই বুঝিতে হইবে না। উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দন বলিয়াছেন,—

গোত্ররিক্‌থে জনয়িতুর্ন হরেদ দত্রিমঃ সুতঃ।
গোত্ররিক্‌থানুগঃ পিণ্ডোব্যপৈতি দদতঃ স্বধা॥

ইতি মনূক্তেঃ * * * * জনকগোত্র রিকথ গ্রাহিত্বেন তৎপিণ্ডশ্রাদ্ধকর্তৃত্বেন চ প্রতিগ্রহীতুরেব গোত্রাদিভাগিত্বং দত্তকস্য প্রতীয়তে।

দত্তকপুত্র জনকের গোত্র ও বিষয় পাইবে না। যে গোত্র ও বিষয়ের অধিকারী হয়, সেই পিণ্ডদান করিয়া থাকে। ইত্যাদি

এই মনু বচন অনুসারে, যখন পিণ্ডাধিকারী হইলেই জনকের গোত্র ও বিষয়ে সত্ত্ব জন্মে, অন্যথা জন্মে না, তখন দত্তক, গৃহীতারই গোত্রাদি পাইবে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে,—

ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিক্‌থস্যভাগিনৌ।
দশাপরেতু ক্রমশো গোত্ররিক্‌থাংশ ভাগিনঃ॥

"ঔরস ও ক্ষেত্রজপুত্র পিতৃধনের অধিকারী। দত্তক প্রভৃতি আর দশবিধ পুত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে গোত্রভাগী ও ধনাংশভাগী হইবেক।" (৩)

এমন কি, গৃহীতার গোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক যদি দত্তকের চূড়াকরণাদি সংস্কার না হয়, তবে সে কখনই শাস্ত্রসম্মত দত্তক পদের বাচ্য হইতে পারে না। যথা কালিকাপুরাণে,—

পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে।
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতিচান্যতঃ॥
চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজগোত্রেণ বৈকৃতাঃ।
দত্তাদ্যাস্তনযাস্তেস্যুরন্যথা দাস উচ্যতে॥

হে রাজন্! যাহার চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার জনকের গোত্রের উল্লেখ করিয়া হইয়াছে, সে আর ভিন্ন গোত্রের পুত্র হইতে পারে না। চূড়াকরণাদি সংস্কার গৃহীতার নিজগোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেই দত্তকাদি পুত্র সিদ্ধ হয়, অন্যথা যাহাকে গ্রহণ করা যায়, সে দাস পদ বাচ্য হয়।

অতএব যদি দত্তকপুত্রের গোত্র পরিবর্ত্তন শাস্ত্র সম্মত হইল, তবে স্ত্রীরই গোত্র পরিবর্ত্তন না হইবে কেন? অর্থাৎ দত্তক যদি জনকের গোত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহীতার গোত্র পাইতে পারে, তবে স্ত্রীরই বা পতিগোত্র প্রাপ্তির বাধা কি? উভয়েরইত জনকগোত্র পরিহার পূর্ব্বক গোত্রান্তর প্রাপ্তি সমান। সুতরাং এতাবতা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, অমুক ব্যক্তি অমুক গোত্র বলিলে অমুক ব্যক্তি অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে, অথবা অমুক মুনি অমুক ব্যক্তির আদিপুরুষ, ইহা কখনই নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। অতএব কন্যার পুনঃ

(৩) বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মনুবচনের অনুবাদে দত্তকপুত্রের স্পষ্টতঃ গোত্র পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়াছেন, কোন কথাই কহেন নাই। কিন্তু স্ত্রীর গোত্র পরিবর্ত্তনের বেলায় একেবারে অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্প্রদানকালে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ শাস্ত্র বহির্ভূত ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি সপ্তপদী গমনের পর স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে, ইহা শাস্ত্র সম্মত হয়, তবে,—

সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রম্ ঊর্দ্ধং তু পতিপৈতৃকম্ ॥ ৪॥

বিবাহ সংস্কারের পর স্ত্রী সপিণ্ডী-করণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, সপিণ্ডী-করণের পর শ্বশুরের গোত্র প্রাপ্ত হয়।

কাত্যায়নের এতাদৃশী উক্তি কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

(৪) উদ্বাহতত্ত্বে "সংহিতায়াস্তু ভার্য্যায়াম্" এই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হইল, বিধবা বিবাহ প্রণেতা নিজ মতের অনুকূল বোধে "সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াম্" এই প্রকার পাঠ ধরিয়াছেন। আমিও কোন কথা না বলিয়া তাঁহারই অনুসরণ করিলাম।

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"।

কোন এক সময়ে একজন যুবক, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। তিনি তন্নিমিত্ত জীবতত্ত্ব প্রভৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের পর একে একে প্রকৃতি গ্রন্থেরও অনেকাংশ অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্তের শান্তি হইল না—তিনি কিছুতেই ঈশ্বরকে আপনার অনুমানের বিষয়ীভূত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে মনে মনে এই স্থির করিলেন যে, অনন্ত মহাসাগরের পর্য্যালোচনা করিব এবং তদ্দ্বারাই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন মহাসাগর ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। প্রতিচ্ছবির পর্য্যবেক্ষণে উহা যে বস্তুর আশ্রিত তাহারও পরিদর্শন হইতে পারিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ঐ দাম্ভিক পণ্ডিত একদিন সায়ংকালে এক মহাসাগরের বেলাভূমিতে উপনীত হইলেন। উপরে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র বিরাজিত সুবিমল নভোমণ্ডল। পদতলে নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম পরিশোভিত সুবিস্তীর্ণ ধরাতল। সম্মুখে অপার মহাসাগর। সকলই সেই বিরাট পুরুষের বিরাট অঙ্গের পরমাণু। পণ্ডিতবর প্রকৃতির সেই অচিন্ত্য অপরিমেয় ছবি—পরমেশ্বরের সেই মহীয়সী কীর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অকস্মাৎ চমকিত হইলেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই চমক আসিল বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না, ক্ষণস্থায়িনী চপলার ন্যায় নয়নকে ধাঁধাঁ দিয়া তখনই চলিয়া গেল। পণ্ডিতের গভীর হৃদয়কন্দর হইতে অজ্ঞান-তিমির অপসৃত হইল না—তাঁহার সেই মায়াঘোর ভাঙ্গিল না। তাঁহার অভ্রান্ত দম্ভ আসিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি নিজের জ্ঞান বাগুরা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রকৃতির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নভোমণ্ডল ধরাতল ও জলধিজলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া

পঞ্চভূতে—সূক্ষ্মতম পরমাণুতে পরিণত করিলেন। আবার ব্যুৎক্রমে উহাদিগকে পরস্পর মিশ্রিত—সংযুক্ত করিয়া এক বিরাট বপুর সৃষ্টি করিলেন। অন্তরে বাহিরে সম্মুখে, পার্শ্বে এক মহাকায় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন মেঘ সকল ঐ পুরুষের কেশদাম, পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থিসমূহ, নদী সকল তাঁহার নাড়ী, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বৃক্ষ সকল তাঁহার রোম। তাঁহার সহিত নিখিল জীব কালচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া একবার ঐ মহাপুরুষের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং ক্ষণকাল পরেই আবার বহির্গত হইতেছে। এই অত্যাশ্চর্য্য ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া পণ্ডিত প্রবরের বুদ্ধি স্তম্ভিত হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি সেই বেলাভূমিতেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্মুখে অপর এক ব্যক্তি একখানি শুক্তিকা লইয়া তদ্দ্বারা সমুদ্রের জল উত্তোলন পূর্ব্বক সম্মুখস্থ বালুকাবিবর মধ্যে ঐ জল নিক্ষেপ করিতেছেন—তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই। অত্যল্প বালুকাবিবর জলপতন মাত্রই পূর্ণ হইতেছে। তৎক্ষণাৎ শুকাইয়াও যাইতেছে। সমুদ্রের জলেরও হ্রাস নাই—বালুকা বিবরেরও পূর্ত্তি নাই, অধ্যবসায়ী দুরাশাপরায়ণ ব্যক্তির কার্য্যেরও বিরতি নাই। তদ্দর্শনে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দাম্ভিক পণ্ডিত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মহাশয়! আপনি অবিরত এ কি করিতেছেন? আপনার এই নিরর্থক পরিশ্রমের কারণ কি? পণ্ডিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন, আমি সমুদ্রের জল সেচন করিয়া সমুদ্রের তল দর্শন করিব বলিয়াই এইরূপ করিতেছি। তখন প্রথম পণ্ডিত নিজের ন্যায়-শাস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিলেন, তুমি বুঝি কখন ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই? এ তোমার অসম্ভবে সম্ভব কল্পনা; মনুষ্য চেষ্টায় কখন কি সমুদ্র শোষিত হইতে পারে অথবা এই সামান্য বালুকাময় ভূমি ঐ অপরিমেয় অম্বুরাশিকে ধারণ করিতে পারে? সমুদ্র পৃথিবী হইতে অনেকাংশে বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে সমুদ্রের জলের স্থানই হইতে পারে না। এই ত গেল এক কথা। তার পর অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া দেখ দেখি, তুমি এই ক্ষুদ্র শুক্তি দ্বারা যে পরিমাণে জল সেচন করিতেছ, তোমার সমগ্র জীবনে বা সমগ্র জীব সমাজের সমগ্র জীবনে ঐ সমুদ্রের জল শোষণ করা যায় কি না। অতএব এই দুরাশা পরিত্যাগ কর। আজ হইতে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, আর কখনই তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিবে না। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনি আজ আমার পরম উপকার করিলেন। আমি আজ হইতেই দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা হইলে আমাকে আর কখনই এরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না। কিন্তু মহাশয়! আপনার কথায় আমার আর একটী বিষম মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপনাকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ঐ মোহ অপনোদন করিতে হইবে। আপনার কথা বার্ত্তায় বোধ হইতেছে যে, আপনি একজন দার্শনিক।

আমার ঐ সন্দেহটীও দর্শনশাস্ত্র ঘটিত। বলুন দেখি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীবকৃত দর্শনশাস্ত্র, বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম পরাৎপর পরমেশ্বরকে অনুমান করিবার জন্য— সকলের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় কেন? তাহার সুক্ষুদ্র হৃদয় কন্দর যদি মহৎ হইতেও মহীয়ান্ পরমেশ্বরকে ধারণ করিবার জন্য নিরন্তর ধাবমান হইতে পারে, এবং ঐ প্রকার কার্য্যকারী ব্যক্তি যদি বিজ্ঞ দার্শনিক বলিয়া মানব সমাজে প্রথিত হইতে পারেন, তবে আমার এই কার্য্যই বা কেন অজ্ঞের কার্য্য বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবে? এই কথা বলিয়াই ঐ ব্যক্তি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। দাম্ভিক পণ্ডিত তখন অবাক হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

বলুন দেখি পাঠক ইহার তাৎপর্য্যার্থ ধারনা হইলে কিছু জ্ঞানের সঞ্চার হয় কি না!

আমাদিগের নূতন অনুষ্ঠান।

কলিকাতায় আপাততঃ সর্ব্বসমেত প্রকাশ্য রঙ্গালয় পাঁচটী। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের গুণে ও দোষে অনেক সময়ে সমাজ উপকৃত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে যথাযথরূপে সমাজ চরিত্র দেখানই নাট্যকারদিগের কার্য্য, প্রকাশ্যে জীবন্ত ছবি দেখিলে লোকের মনে স্বতঃই ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এরূপ একটী সমাজের সহিত জড়িত বিষয়ের আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে আমরা আগামীবার হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত, এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিব। আমাদের পত্রের কলেবর যদি ইহাতে কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না। এবারে বড়দিন ও নূতন বৎসর উপলক্ষে এই সকল থিয়েটারেই নানারূপ সং রং ঢং দেখা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ষ্টারে বাবু প্রহসন সামাজিক নক্সা, এমারেল্ডে আমাদিগের এই পত্রে প্রকাশিত ঋষিকবি ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত মাদক মঙ্গল ও আজবকারখানা, বেঙ্গলে "মুই হ্যাঁদু" সিটিতে বেহদ্দ বেহায়া ও মিনার্ভায় বেয়াকুবের একজাই এই রং ঢং সং এর অভিনয় হইয়াছে, সকলগুলিই যে খোসখৎ হইয়াছে তাহা বলি না, সমাজকে সুধরাইতে গিয়া অনেকে হয় তো সমাজের মুখে চুণকালিও দিয়াছেন, আগামীবারে নিরপেক্ষভাবে সকলগুলির বিশদরূপে সমালোচনা করিবার আমাদের বিশেষ ইচ্ছা রহিল।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

স্বাস্থ্যাদায়ুর্ব্বলং ভাগ্যং যশঃ শ্রীঃ প্রীতিরাদরঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পালাং স্বাস্থ্যমতোঽনিশম্॥
আহার নিদ্রা শ্রম বাসগেহং
পানীয় বিশ্রাম পরিচ্ছদাশ্চ।
সমীরণশ্চাপি ভবে হি সর্ব্বং
স্বাস্থ্যানুকূলং কথিতং সুধীভিঃ॥

জগতে স্বাস্থ্যই জীবনের সারবস্তু। স্বাস্থ্য রক্ষিত হইলে মানব অনায়াসে স্বীয় অভিলাষপূরণে সমর্থ হইতে পারেন। অধিক কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এবং আয়ুঃ, বল, যশঃ ও সৌভাগ্যাদি লাভে কৃতার্থ হইতে হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করা উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে গেলে জল, বায়ু, বাসস্থান, আহার, পরিচ্ছদ, শ্রম, বিশ্রাম ও নিদ্রা প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অতএব ইহাদের বিবরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

বাসগৃহ।

ভূমির্নিম্না চ যা যত্র গতির্নাস্তি সদাগতেঃ।
শ্মশাননিকটস্থং যৎ সমাধিক্ষেত্রসন্নিধৌ॥
স্থিতং সমাধিক্ষেত্রং বা পূর্ব্বমাসীচ্চ পল্বলম্।
প্রপূরিতঞ্চ যৎ স্থানং পূতিভিঃ সঙ্করাদিভিঃ॥
যত্র চর্ম্মাদিদুর্গন্ধদ্রব্যসংস্করণং ভবেৎ।
যদার্দ্রং নিয়তং বর্ষাজলং যত্রেত্য সঞ্চিতম্॥
পুনঃ শোষং সমায়াতি গিরিকূটস্থিতঞ্চ যৎ।
প্রত্যন্তাদ্রিপ্রদেশেষূপত্যকাসু চ যৎ স্থিতম্॥
সদার্দ্রঞ্চৈব সঙ্কীর্ণং যচ্চ পর্ব্বতবেষ্টিতম্।
লুপ্তপ্রায়াপগাতীরে তথানূপেষু নূতন-
সৈকতস্য সমীপে চ বালুকোপলসস্তৃতে।
বর্ষাসু প্লাবিতং যচ্চ বৃহদ্বিটপিনস্তলে॥
নির্জ্জনে গহনেঽরণ্যে নগরে জনসঙ্কুলে।
নিরালোকে সশল্যেঽন্ধকারে দুর্গন্ধসংযুতে॥
আকরস্য চ সান্নিধ্যে সদা ব্যাধিনিপীড়িতে।
ন চান্তেষু ন কোণেষু ন মধ্যে নাপি পার্শ্বয়োঃ।
স্থানেষ্বেতেষু মতিমান্ ভবনং নৈব কারয়েৎ॥

যেস্থান নিম্ন, যেখানে বায়ুচলাচলের সুবিধা নাই, যেস্থান শ্মশান ও সমাধি-ক্ষেত্রের সন্নিহিত অথবা পূর্ব্বে যেস্থানে সমাধিক্ষেত্র ছিল, যেস্থানে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল, পরে আবর্জ্জনাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে, যেস্থানে চর্ম্মাদি দুর্গন্ধ বস্তুর পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হয়, যেস্থান নিতান্ত আর্দ্র অথবা যেস্থানে বৃষ্টির জল চারিদিক্ হইতে আসিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে, পর্ব্বতের শিখরপ্রদেশ বা অত্যার্দ্র পাদদেশ, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত আর্দ্র উপত্যকাভূমি, জলাভূমি, শুষ্কপ্রায় নদীর তীরে, নবোত্থিত চড়ার উপরে বা নিকটে, নিরবচ্ছিন্ন কঙ্কর ও বালুকাপূর্ণ স্থানে, যেস্থান বর্ষে বর্ষে বর্ষাকালে অত্যন্ত প্লাবিত হয়, প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে, অথবা নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে, জনাকীর্ণ নগরের মধ্যদেশে, সূর্য্যালোকবিহীন, অন্ধকারময় ও পূতিগন্ধপূর্ণ স্থানে, আকরের নিকটে, অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ ব্যাধিপীড়িত এবং সশল্য স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না।

আলোকানিলসম্পূর্ণং দক্ষিণাস্যং যথাপি বা।
পশ্চিমাস্যং গৃহং ধীমান্ যত্নতঃ প্রতিপাদয়েৎ॥
ভবনস্য তলং সমাঞ্চোর্চ্চভাব্যং চ নীরসম্।
দৃঢ়াবরণসংছন্নং অধো বাষ্প নিবৃত্তয়ে॥
দ্বারৈশ্চৈব গবাক্ষৈশ্চ সম্মুখীনৈঃ সুসংযতৈঃ।
সুপ্রশস্তৈর্যুতং কার্য্যং মালোকানিললব্ধয়ে।
ছদির্ধারণকাষ্ঠানাং পার্শ্বয়োঃ স্থাপয়েদ্ বিলম্॥

প্রচুরপরিমাণে বায়ুসঞ্চালন ও আলোক লাভের জন্য দক্ষিণাস্য বা পশ্চিমাস্য

করিয়াই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। গৃহের তলদেশ উচ্চ ও সর্ব্বদা শুষ্ক এবং কঠিন আবরণে সাধ্যমত দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত করা আবশ্যক। কারণ তাহাতে নিম্নস্থ দূষিত জলীয় বাষ্প উপরে উঠিতে পারে না। যাহাতে গৃহমধ্যে প্রচুর বায়ু ও আলোক আসিতে পারে, এরূপ সম্মুখীন সুপ্রশস্ত দ্বার ও গবাক্ষ অর্থাৎ জানালার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাদের নিম্নে দেয়ালের গাত্রে প্রশ্বাস পরিত্যক্ত দূষিত বায়ু বহির্গমনের গবাক্ষ রাখিবে। ইষ্টক রচিত গৃহের প্রত্যেক কড়ির উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিলেই চলিতে পারে। তৃণপর্ণাচ্ছাদিত গৃহের চাল ও দেওয়াল উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকাতে সেই উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে।

গোময়েনাথবা পূতিগন্ধনাশক বস্তুনা।
প্রত্যহং প্রাঙ্গণং গেহতলং লিম্পেচ্চ মার্জ্জয়েৎ॥
গৃহস্য সর্ব্বতঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং সুপরিষ্কৃতম্।
পরিতঃ প্লবনং চৈব যেন বর্ষাসু নিঃসবেৎ॥
দূরে বাসগৃহাদ্ স্থাপ্যং স্থানঞ্চ স্নানমৈত্রয়োঃ।
জলনির্গমনার্থঞ্চ গৃহসংশোষণায় চ॥
খাতং বাস্তোশ্চতুর্দ্দিক্ষু যত্নতঃ পরিকল্পয়েৎ।
কল্পয়েদ্বাসভবনং যদি নিম্নার্দ্রভূমিষু।
তদা ব্যামত্রিশঃ কুর্য্যাৎ খাতং সর্ব্বত্র বাস্তুনঃ॥
আনুপেষু চ দেশেষু প্রণালী ক্রিয়তে যদি॥
তদা তে শোষমায়ান্তি বাসযোগ্যা ভবন্তি চ।

গোময় বা অন্য কোন দুর্গন্ধনাশক বস্তু জলমিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ গৃহমধ্য ও প্রাঙ্গণ লেপন বা সেচন করা উচিত। বাসভবন সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে। বাসগৃহের পার্শ্বে কখন পূতি-গন্ধময় দ্রব্যাদি বা জঞ্জাল সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। গৃহের চতুর্দ্দিক্ এরূপ ঢালু রাখিতে হইবে, যাহাতে বৃষ্টির জল ভদ্রাসন হইতে শীঘ্রই অপসারিত হইতে পারে। মলত্যাগের স্থান অর্থাৎ পাই-খানা ও স্নানাগার বাসগৃহ হইতে দূরে স্থাপন করিবে। বাটীর চতুর্দ্দিকে গভীর জলপ্রণালী রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ তদ্দ্বারা বাস্তুদেশের বর্ষার জল নিঃশেষরূপে নির্গত হইয়া যায়। তাহাতে গৃহ সম্যক্‌রূপে শুষ্ক থাকে অর্থাৎ ভূমি তলের নিম্নস্থ সঞ্চরণশীল জলরাশি ঐ খাতের অভিমুখীন হইয়া গৃহতল ও চত্বরভাগকে বিশুষ্ক রাখে। নিতান্ত আর্দ্রভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রতি ১০।১৫ হাত অন্তর এক একটী গভীর প্রণালী অর্থাৎ নর্দ্দামা কাটিয়া দিলে আর্দ্রতা হইতে একপ্রকার অব্যাহতি পাওয়া যায়। জলাভূমির মধ্যদিয়া খত অর্থাৎ খানা কাটাইয়া দিলে সে ভূমিও ক্রমে শুষ্ক ও বাসযোগ্য হইয়া থাকে।

লোকালয়স্যাতিদূরে শ্মশানং পরিকল্পয়েৎ॥
তত্র সংস্থাপয়েৎ বৃক্ষং বহুপত্রং সুবর্দ্ধিতম্॥
ভবনস্য বটঃ পূর্ব্বে যাম্যে চোডুম্বরস্তথা।
বারুণে পিপ্পলঃ প্লক্ষশ্চোত্তরে শুভদঃ স্মৃতঃ॥
নিগুণ্ডী নিম্বপুন্নাগদাড়িমাশোক কেশরাঃ।
নিম্বাশ্চ শুভদাস্তেষাং বায়ুঃ স্বাস্থ্যকরঃ পরম্॥
ক্ষীরিণং রক্তপুষ্পঞ্চ কণ্টকারিঞ্চ শাল্মলিম্।
তিন্তীড়িকং গৃহপ্রান্তে স্বাস্থ্যলিপ্সুর্ন রোপয়েৎ॥
অত্যুন্নতং বিটপিনং বাসস্থানে ন কল্পয়েৎ॥

লোকালয়ের বহুদূরে সমাধিস্থান বা শ্মশান নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। বহুপত্রবিশিষ্ট আশু বৃদ্ধিশীল বৃক্ষ সেখানে রোপণ করিবে। বাস্তুদেশের পূর্ব্বভাগে বট, দক্ষিণে যজ্ঞডুমুর, পশ্চিমে অশ্বত্থ ও উত্তরে পাকুড় বৃক্ষ শুভকর। নিম্ব, নিসিন্দা, পুন্নাগ, দাড়িম, অশোক, বকুল ও বিল্ব-বৃক্ষ বাস্তুভবনে রোপণ করিবে। কারণ উক্ত বৃক্ষের বায়ু স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে।

তেঁতুল, কুল ও শিমুলবৃক্ষ বাসস্থানের নিকট রোপণ করিবে না।

সূর্য্যাবিদ্ধং গৃহঞ্চৈব প্রাঙ্গণং সর্ব্বথা ত্যজেৎ।
বাস্তাবুচ্চৈর্দ্রুমং রক্ষেন্ন বজ্রাঘাতশঙ্কয়া॥
ভাবয়েদ্ ভবনং ধীমান্ এতদালোচ্য যত্নতঃ।
এতদ্বিপর্য্যয়ে স্বাস্থ্য হানিরেব ন সংশয়ঃ॥

সূর্য্যবিদ্ধ ভবন নির্ম্মাণ ও প্রাঙ্গণ রাখা কদাপি বিধেয় নহে। বজ্রপতনের আশঙ্কায় প্রকাণ্ড অত্যুন্নত বৃক্ষ বাসগৃহের নিকটে রাখিবে না। কারণ উহাতে গৃহস্থের সর্ব্বদাই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে মানবের স্বাস্থ্যের হানি হয় না।

জল।

পানীয়ং ভ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহম্
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিনাশনং বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্।
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমনং নিত্যং হিতং শীতলম্
লঘ্বচ্ছং রসকারণং নিগদিতং পীযূষবজ্জীবনম্॥
পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমমিতি দ্বিধা।
দিব্যং চতুর্ব্বিধং জ্ঞেয়ং ধারাজং করকাভবম্॥
তৌষারঞ্চ তথা হৈমং তেষু ধারং গুণাধিকম্।
ভৌমং তু ত্রিবিধং প্রোক্তমানূপং জাঙ্গলং তথা॥
সাধারণঞ্চ বিজ্ঞেয়ং তেষু সাধারণং হিতম্॥
স্নানায় পানায় চ পাককৃত্যৈ
প্রক্ষালনার্থং করপাদয়োশ্চ।
গৃহাদি সংশোধনতস্তথাস্ত-
কৃত্যৈ প্রযুঞ্জীত পয়ঃ সদৈব॥
জীবনীয়গণস্যাচ্চ জীবনং জীবনং স্মৃতম্॥

জল অতি তরল পদার্থ। ইহা দ্বারা ভ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, পিপাসা ও তন্দ্রা বিনষ্ট হয়। শীতল জল বলকর, নিদ্রাহর, তৃপ্তিজনক ও অজীর্ণনাশক। স্বচ্ছ সুশীতল বিশুদ্ধ জল অমৃত তুল্য। জল দুই প্রকার। দিব্য ও ভৌম। দিব্য বারি চতুর্বিধ। ধারাজ, করকাভব, তৌষার ও হৈম। ইহাদিগের মধ্যে ধারাজলই অধিক উপকারী। ভৌম জল তিন প্রকার। আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ। ইহাদের মধ্যে সাধারণ জলই হিতকর। স্নান, পান, পাককার্য্য, হস্তপাদ প্রক্ষালন, গৃহাদি সংমার্জ্জন এবং অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যের সাধনার্থ জল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবনীয়গণ মধ্যে উল্লিখিত এবং প্রাণীগণের জীবনের অনুকূল বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে জীবন শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

বর্ণাস্বাদগন্ধহীনং নির্ম্মলং বারি শোভনম্।
সদাবিল সলিলস্য পানাদ্ব্যাধিঃ প্রজায়তে॥
উষ্ণপ্রধানদেশেষু জলং শীতলদেশতঃ।
দ্বিগুণং বা সার্দ্ধগুণং ভবেদ্ব্যবহৃতং ক্বচিৎ॥
ঔদ্ভিদৈর্জান্তবৈর্বাপি মিশ্রিতৈর্ভূমিমধ্যগৈঃ।
স্বল্পৈরপ্যুদকৈর্মিশ্রং সলিলং নগরেষু চ॥
অগভীরস্য কূপস্য দূষিতং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অগাধহ্রদসম্ভূতং তথা কাসারসম্ভবম্।
নাদেয়ং চাথবা বারি ন তথা দূষিতং ভবেৎ॥

বর্ণ, আস্বাদ ও গন্ধহীন নির্ম্মল জলই হিতকর। অশুদ্ধ ও আবিল সলিল সেবনে সর্ব্বদাই পীড়া জন্মে। উষ্ণপ্রধান দেশে শীতপ্রধান দেশাপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ বা দ্বিগুণ জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন নগরাদিতে অগভীর কূপসকলের জল একে অল্প, তাহাতে আবার ভূমধ্যস্থ ঔদ্ভিদবিকার বা জান্তব দূষিত পদার্থে মিশ্রিত হওয়াতে উহা কদাপি সেবন করা উচিত নহে। অগাধ হ্রদ, নদ, নদী ও সরোবরে জল প্রচুর পরিমাণে থাকে, সুতরাং ভূমধ্যস্থ অত্যল্পমাত্র উদ্ভিদ বিকারাদিতে উহাকে দূষিত করিতে পারে না।

পাশ্চাত্যদেশেষু চ কূপজাতং
হৃদ্যং পয়ঃ পুষ্টিকরং শুভঞ্চ।
সুনির্ম্মলং বহ্নিকরঞ্চ বল্যং
আয়ুষ্করং ব্যাধিবিনাশবীজম্॥
তত্র তত্র চ ভূগর্ভমৃৎস্ন বা বঙ্গদেশবৎ।
সচ্ছিদ্রা বালুকা ন স্যাত্তত্র মৃৎ কঠিনা ভবেৎ॥
বৃষ্টেরল্পতয়া তত্র নোদ্ভিদো জায়তেঽধিকঃ।
তত্র ভূগর্ভস্থপয়োবেগো মন্দঃ স্বভাবতঃ॥
অতস্তত্রাধতঃ কূপে পঞ্চাশদাপি ষষ্টি বা।
করাণাং নাপি বার্য্যেতি বঙ্গে তদ্বিপরীতকম্।
তত্র ব্যামদ্বয়কূপে পযঃ সম্যক সমুৎপতেৎ॥
অব্ধিতীরস্থকূপস্য জলং সলবণং ভবেৎ।
অতো ন তৎ স্বাস্থ্যকরং বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নতঃ॥

পাশ্চাত্য প্রদেশের কূপ সকল অতি গভীর। সুতরাং তত্রত্য কূপসম্ভূত জল পুষ্টিকর, অগ্নিকারক, ব্যাধিনাশক ও আয়ুর্বৃদ্ধিকর। কারণ, পশ্চিমাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা অতি কঠিন ও বঙ্গদেশীয় মৃত্তিকার ন্যায় সচ্ছিদ্র বালুকাপরিপ্লুত নহে। বিশেষতঃ ঐ অঞ্চলে বারিবর্ষণ অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। তাহাতে অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মায় না। ঐ স্থানের ভূমধ্যস্থ জলের বেগ স্বাভাবিক মন্দ। এইহেতু সেখানে প্রায় ৫০।৬০ হাত মৃত্তিকা খনন না করিলে অধোদেশ হইতে বারি উত্থিত হয় না, কিন্তু বঙ্গদেশে ৭।৮ হাত খনন করিবামাত্র সলিলস্রোত বেগে উত্থিত হইয়া থাকে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কূপের জল প্রায়ই লবণাম্বু। অতএব উহা ব্যবহার্য্য নহে। কারণ উহা ব্যবহারে পীড়া হইয়া থাকে।

আপগোভয়কূলস্থং সলিলং নগরেষু চ।
রাজধানীষু জন্তুদৈর্দ্রব্যৈর্দুষ্টং ভবেৎ সদা॥
তথা বর্ষাজলস্রোতো দূষিতং জান্তবাদিভিঃ।
জলাশয়ান্ সমুৎপ্রাপ্য তজ্জলং দূষয়েৎ সদা॥
প্রাচুর্য্যেণোদ্ভিদাধিক্যাৎ তত্রস্থং ন পয়ঃ শুভম্।
জলং প্রস্রবণোত্থং তু ভবেৎ শুদ্ধং শুভপ্রদম্॥
কিন্তু যেষু বহেৎ তেষাং গুণদোষবিভেদতঃ।
সগুণং বিগুণং বাপি ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥
ধাতুভির্মিশ্রিতং কৈশ্চিজ্জলং শুভকরং ভবেৎ।
কৈশ্চিদ্বাশুভদং জ্ঞেয়ং গুণদোষবিভেদতঃ॥

রাজধানী ও মহানগরীর পার্শ্বদেশস্থ নদ বা নদীর উভয় উপকূলবর্ত্তী জলরাশি নাগরিক দূষিত পদার্থে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রায়ই দূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহা সেবন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে জলস্রোত বহুবিধ জান্তব ও ঔদ্ভিদ পদার্থে সংলগ্ন হওয়াতে অতিশয় দূষিত হয় এবং সমীপবর্ত্তী পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া উহাদের জলকে দূষিত করে। অতএব ঐ জল অব্যবহার্য্য। আবশ্যক হইলে বিশেষরূপে শোধিত করিয়া সেবন করা উচিত। জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মে বলিয়া তত্রস্থ জলরাশি সর্ব্বদাই দূষিত। উহা কদাপি সেবনার্হ নহে। প্রস্রবণের জল অতি বিশুদ্ধ ও হিতকারী, কিন্তু যে দেশ দিয়া ঐ জল প্রবাহিত হয়, তত্তদ্দেশের সগুণ ও সদোষ মৃত্তিকা সংস্পর্শে হিতকর ও অহিতকর হইয়া থাকে। কোন কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইলে পবিত্র জলও বিষময় হইয়া থাকে এবং কলুষিত জল কোন কোন ধাতু স্পর্শেও পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়।

ধারাজলং শুভকরং সর্ব্বাময়হরং পরম্॥
ধারাভিঃ পতিতং তোয়ং গৃহীতং স্ফীতবাসসা॥
সৌবর্ণে রাজতে রঙ্গে স্ফাটিকে কাচনির্ম্মিতে।
ভাজনে মৃণ্ময়ে চাপি স্থাপিতং শুভদং ভবেৎ॥
আকাশতো ধৃতং বাপি বায়ুদোষেণ দূষিতম্।
ন শুভং সলিলং তচ্চ তথাধারস্য দোষতঃ॥
বিশুদ্ধমপি পানীয়ং হ্যশুদ্ধং পাত্রভেদতঃ।
অতস্তচ্ছুদ্ধপাত্রস্থং পেয়মেব প্রযত্নতঃ॥
মারীভয়েষু বর্ষাসু শৃতশীতং শুভপ্রদম্।

জলশোধনযন্ত্রেণাথবা সম্যক্ বিশোধিতম্।
হেমন্তে শিশিরে পাদহীনং পাদস্থিতং মধৌ।
অর্দ্ধাবশেষিতং গ্রীষ্মে তথা শরদি শোভনম্।
সলিলং পুষ্টিকৃদ্বল্যং বর্ষাস্বষ্টাবশেষিতম্।
দিবাসিদ্ধং জলং রাত্রৌ রাত্রিসিদ্ধং দিবা গুরু।

ধারাজল অর্থাৎ বৃষ্টির জল শুভকর ও সর্ব্বব্যাধিনাশক। বর্ষাকালে ধারাপতিত জল শূন্যদেশে স্থূলবস্ত্রে ধারণ করিয়া সৌবর্ণ, রাজত, রঙ্গ, কাচ বা স্ফটিকময় ও মৃণ্ময় পাত্রে সাবধানে রক্ষিত হইলে এবং কোনরূপে ধূলী প্রভৃতি দূষিত পদার্থ সংলগ্ন না হইলে তাহাকে ধারাজল বলে। ঐ জল বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু উহা আধারের দোষে দূষিত হইয়া থাকে। জল পবিত্র পাত্রে রক্ষা করিবে এবং পবিত্র পাত্রে লইয়া পান করিবে। অপবিত্র পাত্র সংলগ্নে পবিত্র জলও অত্যন্ত দূষিত হইয়া থাকে। মারীভয়ে এবং বিশেষতঃ বর্ষাকালে জল অগ্নিসন্তাপে সুসিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে কর্পূরাদি সুবাসিত করিয়া পান করিবে। অথবা জলশোধনযন্ত্র সহকারে সম্যক্‌রূপে শোধিত জল সেবন করিবে। অন্যথা পীড়া উপস্থিত হইবে। ঋতুভেদে কথিত জলের পরিমাণের তারতম্যতা আছে। হেমন্তে ও শীতকালে পাদহীন, বসন্তে পাদস্থিত, গ্রীষ্মে ও শরৎকালে অর্দ্ধাবশেষিত এবং বর্ষাকালে অষ্টাবশেষিত জল পানকরা বিধেয়। দিবাভাগের সিদ্ধ জল রাত্রিতে গুরুপাক এবং রাত্রিসিদ্ধ জল দিবাতে গুরুপাক হইয়া থাকে। অতএব রাত্রি সিদ্ধজল দিবাভাগে এবং দিবাসিদ্ধ জল রাত্রিকালে সেবন করিবে না।

অঙ্গারসিকতাশ্মানঃ সমাহৃত্য ত্রিভিঃ স্তরৈঃ।
উষ্ণং জলং তদুপরি পাত্রমধ্যে বিধাপয়েৎ।
তন্নিম্নে স্থাপয়েদেকং কলসং সুপরিষ্কৃতম্।
জলং তৎপতিতং পেয়ং নির্ম্মলং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
সমাধিস্থানসান্নিধ্যস্থিতকূপাদিসম্ভবম্।
তত্তবাং দূরতো বারি সদা পথ্যমিহেচ্ছতা।
কূপমধ্যে মৈত্রকর্ম্ম ন কদাপি সমাচরেৎ।
যত্রাস্তি তাদৃশং কূপং ক্রিমিকীটাদি সংযুতাঃ।
দূষিতাপঃপ্রণাল্যশ্চ তত্রৈবিষ্টং পয়ো বিষম্।
তদ্গর্ভদূষিতো রেণুঃ সূক্ষ্মো বা কীটসন্ততিঃ।
রসাতলগজলস্রোতঃসম্ভবৈঃ পরিমিশ্রিতঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরং জনয়েদ্বা বিসূচিকাম্।
উদ্ধৃতং যন্ত্রযোগেন বাষ্পং সামুদ্রসম্ভবম্।
দূষিতাম্ভোভবং চাপি শীতলং শুভকৃদ্ভবেৎ।

জলশোধন যন্ত্র যথা, ৫টী কলসী উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া অঙ্গার, বালুকা ও প্রস্তরখণ্ড এই তিনটী দ্রব্য তিনটী স্তরে যথাক্রমে রাখিয়া সর্ব্বোপরিভাগের সচ্ছিদ্র কলসে উষ্ণ জল ঢালিয়া দিবে, ক্রমে ঐ জল তিনটী স্তরে পতিত হইয়া যখন সর্ব্বনিম্নস্থ কলসে পতিত হইবে, তখন উহা বিশুদ্ধ হইল। ঐ জল অতি উপকারী। সমাধিস্থানের বা শ্মশানের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের জল পান এবং ব্যবহার করা উচিত নহে। যে প্রদেশে কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিবার প্রথা আছে, অথবা যেস্থলে পূতি ক্লিন্ন কৃমিকীটাদি সংযুক্ত দূষিত জলপূর্ণ গভীর নর্দ্দমা আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী কূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল প্রায়ই দূষিত হইয়া থাকে। কারণ তত্রত্য রসাতলসঞ্চারী জলস্রোত, উক্ত কূপাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃমিকীটাদি ও দূষিত জলসম্পর্কে এতাদৃশ বিষময় হইয়া উঠে যে, উহা সেবনে তত্রত্য মানবগণ সাংঘাতিক অভিন্যাস এবং বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল অথবা অন্য কোন দূষিত জল, যন্ত্রযোগে বাষ্পরূপে পরিণত হইলে, উহাতে যে জল জন্মে, তাহা অতি হিতকর।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

আপো নারায়ণমিত্তি তত্র মৈত্র্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন তত্র ক্ষালয়েদ্ বস্ত্রং তথা সংক্রমরোগিণঃ॥
আবিলং সলিলং পেয়ং কতকৈর্বিমলীকৃতম্।
পেয় প্রসংশিতং বারি হ্যপ্রশস্তং বিবর্জ্জয়েৎ॥
পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণশৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গ ং ন হিতং জলম্॥
নিন্দিতং চাপি পানীয়ং কথিতং সূর্যাতাপিতম্।
সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্।
ভৃশং সংতাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূরজাতিপুন্নাগ পাটলাদিসুবাসিতম্।
শুচিসান্দ্রপটস্রাবৈঃ ক্ষুদজন্তুবিবর্জ্জিতম্।
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্দোষবর্জ্জিতম্॥
দেশকালবিভেদেন সলিলং বিমলং পিবেৎ।
এতদ্বিপর্যায়ে ব্যাধিঃ সততং নাত্র সংশয়ঃ॥

জলকে নারায়ণের আশ্রয় জ্ঞানে তাহাতে মলমূত্র বা দূষিত দ্রব্য ত্যাগ বা সংক্রামকরোগীর বস্ত্রাদি ধৌত করিবে না। সচরাচর কলুষিত জল নির্ম্মল করিবার জন্য তাহাতে নির্ম্মলি প্রভৃতি প্রক্ষেপ করিয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে দূষিত জল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং নির্ম্মল জল সেবন করা উচিত। পিচ্ছিল, ক্রিমিযুক্ত, পঙ্কিল, পত্র ও শৈবালাদি-যুক্ত, বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ জল একেবারে ত্যাজ্য। অপবিত্র জল অগ্নিসন্তাপে কথিত, রৌদ্রসন্তপ্ত, অথবা প্রতপ্ত স্বর্ণ, রজত, লৌহ, পাষাণখণ্ড, মৃৎপিণ্ড বা বালুকা জল মধ্যে সাতবার প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক শোধিত করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত, শুক্ল ঘনবস্ত্রপূত, ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিত, স্বচ্ছ ও কনকমুক্তাদিপরিশোধিত জল সর্ব্বদা সেবন করিবে। ইহার বৈপরীত্যে নিশ্চয়ই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

বায়ুঃ।

পবনঃ পাবনো লোকে বিশুদ্ধো জীবনপ্রদঃ।
প্রাণাদিপঞ্চভির্জুষ্টো জীবঃ প্রাণীতি কথ্যতে॥
বিশুদ্ধঃ পবনো যেষু ভবনেষু বহেৎ সদা।
তেষু তেষু চ গেহেষু জীবলিপ্সুর্নরো বসেৎ॥
বিশুদ্ধানিলসম্পর্কাচ্ছোণিতঃ শুদ্ধিতামিয়াৎ।
গৃহমধ্যস্থভূভাগঃ সত্বরং শুষ্কতাং ব্রজেৎ॥
অপরিষ্কৃতদেশেষু দূষিতানিলসেবনাৎ।
দেহে কান্তিবিহীনে তু প্রবর্ত্তন্তে জ্বরাদয়ঃ॥
ভোজনে শয়নে পানে বিহারে চাপি সর্ব্বদা।
রুচির্ন জায়তে কাপি সদাশান্তিঃ প্রজায়তে॥
জনাকীর্ণজনস্থানাদ্ গ্রামেষ্বধিকতঃ শুভঃ।
বায়ুর্বহতি নিত্যং ৺ব বিশুদ্ধো জীবনপ্রদঃ॥
মানবা ব্যাধিনির্ম্মুক্তা জলবায়োর্বিবর্ত্তনাৎ।
কেবলং নৌষধাদ্যৈরেব দৃশ্যতে বহুশো তথা॥

বিশুদ্ধ বায়ু জীবের প্রাণদায়ক। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু দ্বারা জীবের দেহ রক্ষিত হয় বলিয়া জীবকে প্রাণী বলে। যে গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা সঞ্চালিত হয়, সেই গৃহে বাস করা উচিত। তাহাতে কোন ব্যাধি জন্মে না। বিশুদ্ধ বায়ু সংসর্গে দেহের শোণিত বিশুদ্ধ হয়। গৃহের মধ্যস্থিত ভূভাগ আর্দ্র থাকিলে শুষ্ক হইয়া যায়। অপবিচ্ছন্ন স্থানের বায়ু দূষিত। তথায় বাস করাতে দূষিত বায়ু-সম্পর্কে শরীরে সর্ব্বদা ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কি শয়ন, কি ভোজন, কি পান, কি বিহার, কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হয় না। জনাকীর্ণ নগরাদি অপেক্ষা পল্লীগ্রামে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কারণে নগ-রাদি অপেক্ষা কখন কখন গ্রামবাসী মান-বের পীড়া অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ঔষধ সেবন না করিয়া কেবলমাত্র জল ও বায়ুর পরিবর্ত্তনেই মানবের ব্যাধি নষ্ট হইতে দেখা যায়।

সামুদ্রঃ পবনঃ স্বাস্থ্যকরো রোগপ্রণাশনঃ।
মধুরস্বরকারী চ জীবাতুর্বলবর্দ্ধনঃ॥
শ্বাসপ্রশ্বাসযোগেন রোগিণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মলমূত্রাদিসম্পর্কাৎ মলমূত্রাদিধূমতঃ॥

গলিতাজ্জীবদেহাচ্চ তথোদ্ভিদবিকারতঃ।
চর্ম্মসংস্কারভবনাত্তথা ক্ষারাদিযন্ত্রতঃ॥
বঙ্গসীসকধাতূনাং ধূমযোগাদ্বিশেষতঃ।
প্রান্তরানূপসম্ভূত দুষ্টবাষ্পস্য যোগতঃ॥
বায়ুঃ সংদূষিতো নৃণাং প্রাণনাশায় কল্পতে।
দিবা বৃক্ষতলে শ্রেয়ং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ॥
রাত্রৌ বৃক্ষপলাশেভ্যো বিষবায়ুর্বিনিঃসৃতঃ।
নাশয়েৎ জীববিষয়ং তত্তলস্থং ন স শয়ঃ॥
একস্মিন ভবনে রাত্রৌ জনপূর্ণে ন সংবিশেৎ।
কদাচিত্তাদৃশে গেহে স্থিতিশ্চেদ্দৈবযোগতঃ॥
তদ্দ্বারমুচ্য কবাটাংশ্চ জালমার্গান্ বিশেষতঃ।
স্থাতব্যং ভবনে তস্মিন্ নোচেজ্জীবনসংশয়ঃ॥
বিশুদ্ধবায়ুসম্পর্কো যুক্তো বাল্যাচ্চ যৌবনে।
তথা বিলাসিনো লোকাচ্ছ্রমশীলস্য বৈ স্মৃতঃ॥
বিশুদ্ধবায়ুসম্পর্কঃ প্রাণদঃ সর্ব্বজন্মিনাম্।
মসূরিকাদিরোগেষু বিকারে ভীষণে তথা॥
মারীভয়ে তথা ঘোরে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করে।
ঔষধাদপ্যধি জ্ঞেয়ং শুদ্ধবায়ুনিষেবনম্॥
যেন বাসগৃহাণাঞ্চ প্রকোষ্ঠেষু সদাগতিঃ।
সদা সম্যক বহেৎ তদ্বৎ সাধনং সাধয়েন্নরঃ॥
যস্মিন বায়ুর্বহেৎ সম্যক্ হায়নে চায়নে তথা।
কল্পয়েদ্বাসভবনং তন্মুখীনং সুধীর্নরঃ॥
অকস্মাচ্ছীতলস্থানাত্তথা চোষ্ণপ্রদেশতঃ।
ন ব্রজেন্মতিমান্ কশ্চিদ্বিপরীতং জিজীবিষুঃ॥
গন্তব্যং যদি বা স্থানং শীতলং মনুজৈস্তদা।
শীতবস্ত্রাবৃতীভূয় গমনে নাশুভং ভবেৎ॥
নাত্যুষ্ণস্থানতো বিদ্বান্ ব্রজেৎ স্থানং সুশীতলম্।
নাত্যুষ্ণং নাতিশীতঞ্চ শুভং হানিরতোঽন্যথা॥
তথাচাতিপরিশ্রান্তো বর্জ্জয়েচ্ছীতলং জলম্।
স্থানং সুশীতলং বাপি পবনং চ তথাবিধম্॥
এতন্নিয়মশীলাং স্বাস্থ্যং সংরক্ষিতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে ভবেদ্ধানী রোগশ্চ প্রাণসংশয়ঃ॥

সামুদ্রিক বায়ু স্বাস্থ্যকর ও রোগনাশক এবং মধুর-স্বরকারী। বহু লোকের বিশেষতঃ রোগীদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসে, মল মূত্রাদি সম্পর্কে, মল মূত্রাদি দূষিত দ্রব্যের ধূমে, গলিত জীবদেহ হইতে, উদ্ভিদ-বিকার, চর্ম্ম সংস্কারক ও সাবান প্রস্তুত যন্ত্র হইতে, বঙ্গ ও সীসক প্রভৃতি ধাতুর ধূমযোগে ও জলাভূমিস্থ দূষিত দ্রব্যের বাষ্পে বায়ু দূষিত হইয়া জীবের প্রাণনাশক হইয়া উঠে। দিবাভাগে বৃক্ষের তলে বাস করা ভাল, কিন্তু রাত্রিতে সেস্থানে অবস্থান কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ রাত্রিকালে বৃক্ষ হইতে দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া তত্তলস্থ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। রাত্রিকালে বহুজনাকীর্ণ গৃহে শয়ন করা কদাপি উচিত নহে। যদি দৈবযোগে কখন তাদৃশ গৃহে থাকিতে হয়, তবে দ্বার ও জানালা উন্মুক্ত করিয়া নিদ্রা যাইবে। বাল্য-কালাপেক্ষা যৌবনে এবং বিলাসী ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রমশীল লোকের অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন আবশ্যক।

মসূরিকা রোগে, বিকারাদি ভীষণ পীড়ায় ও মারীভয়ে ঔষধ সেবনাপেক্ষা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন অত্যন্ত আবশ্যক ও হিতকর। যাহাতে গৃহের সমস্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সম্যক্‌রূপে সঞ্চালিত হয়, তাদৃশ উপায়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণায়নে বায়ু যে মুখে বাহিত হয়, গৃহ তদভিমুখীন নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। অকস্মাৎ শীতল স্থান হইতে উষ্ণপ্রধান স্থানে অথবা উষ্ণ প্রধান স্থান হইতে শীত-প্রধান স্থানে হঠাৎ গমন করা কদাপি বিহিত নহে। যদি কোন কার্য্যবশতঃ বিপরীত স্থলে গমন করিতে হয়, তবে তদনুরূপ বস্ত্রাদি আবৃত বা রিক্তগাত্রে গমন করাই উচিত। অতিশয় পরিশ্রম করিয়া বা অতি রৌদ্র সেবন করিয়া হঠাৎ শীতল প্রদেশ আশ্রয় বা শীতল জল পান এবং সুশীতল সমীরণ সেবন কদাপি বিধেয় নহে।

আয়ুর্ব্বেদ।

দোষ ও ষড়্‌বিধ রস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বাদুরম্লোঽথ লবণঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।
কষায়শ্চেতি ষট্‌কোঽয়ং রসানাং সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।

রস ষড়্‌বিধ, যথা স্বাদু, অম্ল লবণ, কটুক, তিক্ত ও কষায়। ইহার মধ্যে তিন তিনটী রস এক একটী দোষের উৎপাদন অর্থাৎ বৃদ্ধি করে ও তিন তিনটী রস এক একটী দোষের শমতা বিধান করে।

দোষমেকৈকং ত্রয়স্ত্রয়ো রসা জনয়ন্তি ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপশময়ন্তি, তদ্‌যথা কটুতিক্তকষায়া বাতং জনয়ন্তি, মধুরাম্ললবণাস্ত্বেনং শময়ন্তি। কটুকাম্ললবণাঃ পিত্তং জনয়ন্তি, মধুরতিক্ত কষায়াস্ত্বেতচ্ছময়ন্তি। মধুরাম্ললবণাঃ শ্লেষ্মাণং জনয়ন্তি কটুতিক্ত কষায়াস্ত্বেনং শময়ন্তি।

কটু, তিক্ত ও কষায় রস সেবনে বায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং মধুর, অম্ল ও লবণ রস সেবনে বায়ু প্রশমিত হয়। কটু, অম্ল ও লবণ রস সেবনে পিত্ত প্রবৃদ্ধ হয় এবং মধুর, তিক্ত ও কষায় রস সেবনে পিত্ত প্রশমিত হয়। মধুর, অম্ল ও লবণ রস সেবনে শ্লেষ্ম পরিবর্দ্ধিত হয় এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস সেবনে প্রশমিত হয়। দোষ (বায়ু পিত্ত কফ) এবং রস (স্বাদু, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) সংসর্গ ও বিকল্পভেদে অপরিসংখ্যেয় হইলেও কেহ কেহ সংক্ষেপে দোষকে তিনভাগে ও রসকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রস যে সেবনে যে দোষ বর্দ্ধিত ও শমতা প্রাপ্ত হয় তাহা উল্লিখিত হইল। সাধারণতঃ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে রস যে দোষের সমানগুণ বা সমানগুণ বহুল, সেই রস সেবনে সেই দোষের বৃদ্ধি হয় এবং যে রস যে দোষের বিপরীতধর্ম্মী বা বিপরীতধর্ম্মভূয়িষ্ঠ, সেই রস সেবনে সেই দোষের শমতা হইয়া থাকে, যেমন তৈল বাত প্রশমক, ঘৃত পিত্ত প্রশমক এবং মধু শ্লেষ্ম প্রশমক।

তৈলং স্নেহৌষ্ণ্য গৌরবোপপন্নত্বাদ্বাতং জয়তি সততমভ্যস্যমানম্। বাতোহি রৌক্ষ্য শৈত্য লাঘবোপপন্নো বিরুদ্ধগুণো ভবতি। বিরুদ্ধগুণসন্নিপাতে হি ভূয়সাল্পমবজীয়তে তস্মাত্তৈলং বাতং জয়তি সততমভ্যস্যমানম্।

তৈল স্নেহ, ঔষ্ণ্য ও গৌরব গুণবিশিষ্ট। বায়ু রৌক্ষ্য, শৈত্য ও লাঘব গুণসম্পন্ন সুতরাং বিপরীত ধর্ম্মী।

বিরুদ্ধ গুণ সন্নিপাতে যাহার গুণাধিক্য হয়, তৎকর্ত্তৃক অল্পগুণশালী পদার্থ বিজীত হইয়া থাকে, সুতরাং সতত অভ্যস্যমান তৈল বাত প্রকোপ প্রশান্তি করে। ঐরূপ মাধুর্য্য, শৈত্য ও মান্দ্য গুণ বিশিষ্ট ঘৃত, অমধুর, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ পিত্তকে প্রশমিত করে এবং মধু তৈক্ষ্ণ্য, রৌক্ষ্য ও কষায়তা গুণ বাহুল্যে স্নেহ, মান্দ্য ও মাধুর্য্যগুণশালি শ্লেষ্মকে প্রশমিত করে। এইরূপ অপর যে বস্তু যে দোষের বিপরীতধর্ম্মী, সেই দ্রব্য সেবনে ঐ দোষের শান্তি হইয়া থাকে।

দোষত্রয়ের হীনতা, শমতা ও প্রকোপ নিশ্চয় করিতে হইলে, কতগুলি লক্ষণ অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তন্মধ্যে রোগীর তাৎকালিক কতিপয় বাহ্য লক্ষণ এবং নাড়ীর গতি অনুসারেই প্রায়শঃ রোগ নির্ণয় হয়। দোষ নির্ণয় এবং রোগ নির্ণয় একই পদার্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দোষ বৈষম্যই রোগ। বাহ্যিক লক্ষণ সমুদায় তত্তৎ রোগ বিজ্ঞানে প্রদর্শিত হইবে। এস্থলে নাড়ী বিজ্ঞানের (নাড়ী পরীক্ষা) কতিপয় সহজ উপায় প্রদর্শন করাই অভীপ্সিত ও প্রয়োজন।

নাড়ীবিজ্ঞান।

নাড়ী পরীক্ষা আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অঙ্গ ও গৌরবের ধন। এরূপ প্রণালীর রোগ নির্ণয় অদ্যাবধি কোন চিকিৎসা প্রণালীতে লক্ষিত হয় না, অধুনা যাহা লক্ষিত হয়, তাহাও আয়ুর্ব্বেদ হইতে সংগৃহীত বলিয়াই প্রতীত হয়। আয়ুর্ব্বেদের এক একটী মাহাত্ম্য চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয় ও মহর্ষি-গণকে ধন্যবাদ না দিয়া নিরস্ত থাকা যায় না। পাশ্চাত্য চিকিৎসার ন্যায় তাপমান প্রভৃতি যন্ত্রের কিছুমাত্র সাহায্য লইতে হয় না। একমাত্র নাড়ীর গতি অনুসারেই দুর্জ্ঞেয় রোগ পর্য্যন্ত সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। এমন কি, ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্বেও নাড়ীর গতি দ্বারা মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে এবং ২।৪ সপ্তাহ পূর্ব্বের কুপথ্যসেবনাদি রোগের নিদানও অবধারিত হইয়াছে, শুনা যায় এরূপ অনেক মহাত্মা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা কিন্তু ঐ মহীয়সী শক্তির অনেক হ্রাস হইয়াছে। তথাপি যাহা আছে তাহাও অন্যান্য প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। আমরা দিন দিন সব হারাইতেছি, আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজানুগ্রহ নাই, রাজ পুরস্কার পাই না, উৎসাহ পর্য্যন্ত দিবারও লোক নাই, এ সমুদায় কথা তুলিয়া কেবল হৃদয়ের আবেগ বৃদ্ধি করা বই কিছুমাত্র ফল নাই। না বলিলে চলে না তাই বলিতে হইতেছে, আমাদের এই অগাধ আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকরে কোন্ বস্তুর অভাব আছে? কিন্তু থাকিলে কি হইবে মন্থন করিবার লোক কই? সুগভীর আয়ুর্ব্বেদ সাগরে প্রবেশ করিবার লোক কই? তদুপযোগী উপকরণই বা কই? আমরা বলহীন, সঙ্গতিহীন, সুতরাং জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছি। কোন কিছু ইচ্ছা করিলেও সহায়তাভাবে ও অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত হয় না। জল বুদ্‌বুদের ন্যায় হৃদয়ের অভিলাষ হৃদয়েই লীন হইয়া যায়। অনেকে বলেন আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্র চিকিৎসা নাই। কি দুঃখের বিষয়! আমরা এরূপ কুলাঙ্গার, এরূপ কাপুরুষ যে, আমাদিগের দ্বারা আর্য্যমহর্ষিগণের যত্নসঞ্চিত নির্ম্মল রত্নেও আজ কলঙ্করেখা অঙ্কিত হইতেছে। সুশ্রুতের শল্যতন্ত্রে যে অস্ত্র চিকিৎসা রহিয়াছে। তাহা দেখিলে আর ঐ ভ্রম থাকে না, সকল সংশয়ই অপনোদন হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা উহা পুস্তকে বই কার্য্যে কিছুই দেখাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি আজ আমাদের কিছুই নাই, বল নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, অর্থ নাই,

শক্তি নাই, কিছুই নাই। "কিছুই নাই" এই কথাটী সহস্রবার সহস্রমুখে বলিলেও অকাতরে অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সহ্য করিব, কিন্তু "ছিল না" এ কথাটী বলিলে হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগে, কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারি না। পাঠক মহাশয়গণ! অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা বলা হইল, হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই বলিয়াছি ক্ষমা করিবেন। বিষহীন বিষধরের ন্যায় বিফল তর্জ্জন গর্জ্জনে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। আজ যে সংকল্পে ব্রতী হইয়াছি, যে পবিত্র সংকল্পে জগতের অসামান্য মঙ্গল সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় পাঠক এবং গ্রাহক মহোদয়গণের উৎসাহে ও সাহায্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়, অতএব তদ্বিষয়ে যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

নাড়ী পরীক্ষা অতীব দুরূহ ব্যাপার। বলিয়া বা দেখাইয়া দিবার বিষয় নহে। উপদেশানুসারে স্বীয় অনুভব শক্তির বলে, নাড়ীর গতির তারতম্য লইয়াই রোগ নির্ণয় করিতে হয়, অতএব ঐ সময়ে বিশেষরূপ অবহিত হওয়াই উচিত। প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত সময়, কারণ ঐ সময়েই চিত্ত সুস্থির থাকে এবং নাড়ীর স্পন্দন ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে, প্রায়শঃই কোন বৈষম্য অবলম্বন করে না, সুতরাং উহার স্বরূপজ্ঞানে কোন বিঘ্ন ঘটে না। পরীক্ষক স্বয়ং শুচি ও সুবেশ (ইহাতে মনঃপ্রফুল্ল থাকে) হইয়া রোগীকে সরলভাবে উপবেশন করাইয়া কিম্বা উঠিতে অক্ষম হইলে শয়নাবস্থায় স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা রোগীর দক্ষিণহস্তের কফোণি (কণুই) ধারণ করিয়া স্বীয় দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি সারি সারি রোগীর অঙ্গুষ্ঠ মূলের অধোভাগস্থ দোষবিকাশিনী শিরার উপরিভাগে মৃদুভাবে বিন্যস্ত করিবেন। নাড়ী পরীক্ষা কার্য্যে রোগী ও পরীক্ষক উভয়েরই সুস্থচিত্ততা অতীব প্রয়োজনীয়।

বায়ুর প্রকোপে তর্জ্জনীতলে, পিত্তের প্রকোপে মধ্যমাঙ্গুলীতে এবং কফের আধিক্যে অনামিকা অর্থাৎ বিন্যস্ত অঙ্গুলীর তৃতীয় অঙ্গুলীতে আধিক্যভাবে নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হয়। ঐরূপ বাত পিত্ত প্রকোপে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীতে, বাতশ্লেষ্ম প্রকোপে অনামিনকা ও তর্জ্জনীতে এবং পিত্তশ্লেষ্ম প্রকোপে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীতে নাড়ীর স্পন্দনাধিক্য প্রতীতি হয়। দোষত্রয়ের প্রকোপে অর্থাৎ সন্নিপাতে তিন অঙ্গুলীতেই স্পন্দনাধিক্য অনুভূত হয়।

ভূলতা ভুজগপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যময়ী শিরা।
প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে প্যুষ্ণতান্বিতা॥
সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা।

সুস্থ ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি মহীলতা (কেঁচো) ও সর্পের ন্যায় বক্রগতি-বিশিষ্ট, পুষ্ট এবং জড়তারহিত থাকে। নাড়ী স্বভাবতঃ প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, সায়ংকালে বেগবতী ও রাত্রিতে বেগবর্জ্জিত অর্থাৎ মন্দবেগসম্পন্ন হয়।

সামান্যতঃ বায়ু দ্বারা নাড়ী বক্রগতি, পিত্ত দ্বারা চঞ্চল ও কফ দ্বারা মন্দগতি হয়। কোন দুই দোষের বা দোষত্রয়ের প্রকোপে উল্লিখিত লক্ষণদ্বয় ও লক্ষণত্রয়াক্রান্ত হয়।

বায়ু দ্বারা নাড়ী সর্প ও জলৌকা প্রভৃতির ন্যায় বক্রগতি, পিত্ত দ্বারা কাক, লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফমানা গতি হয়। কফাক্রান্ত নাড়ী রাজহংস, ময়ুর, পারাবত ও কুক্কুটাদির ন্যায় দোলায়মান ও মন্দগতি হয়।

নাড়ীতে একবার সর্পের ন্যায় বক্রগতি ও একবার ভেকের ন্যায় লম্ফমান গতি লক্ষিত হইলে বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপ জানিতে হইবে। যদি নাড়ীতে একবার সর্পাদির ন্যায় বক্রগতি ও একবার রাজহংস প্রভৃতির ন্যায় দোলায়মান গতি অনুভূত হয়, তবে বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ নিশ্চয় করিতে হইবে এবং যদি একবার ভেকাদির ন্যায় লম্ফমান গতি ও ময়ূরাদির ন্যায় দোলায়মান গতি প্রকাশ পায়, তবে পিত্ত এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ স্থির করিতে হইবে।

সান্নিপাতিক রোগে—নাড়ী কখন মন্দ মন্দ ও কখন চঞ্চল ভাবে গমন করে। যে নাড়ী কখন হংসাদির ন্যায় মন্দ মন্দ, কখন স্খলিতভাবে ও কখন চঞ্চলের ন্যায় গমন করে, যাহা থাকিয়া থাকিয়া অর্থাৎ কিছুক্ষণ স্পন্দিত হইয়া নিস্পন্দ ভাবে থাকে এবং পুনরায় চলিতে থাকে, যাহার স্পন্দন অনুভূত হয় না, যে নাড়ী সূক্ষ্মতাহেতু স্পন্দিত হইতেছে কি না, অনুভূত হয় না, যে নাড়ী নিত্যস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঐ স্থানে স্পন্দিত না হইয়া কিছু অন্তরে (কফোণির দিকে) স্পন্দিত হইতে থাকে ও কিছুক্ষণ পরে পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া স্পন্দিত হয় এবং এইরূপ অপরাপর বিকৃতিসম্পন্ন নাড়ী সান্নিপাতিক ও আসন্ন মৃত্যুর জ্ঞাপক।

জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অঙ্গবেদনাদি অবস্থায় নাড়ী মন্থরভাবে বহিতে থাকে। জ্বর প্রকাশ হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হয়। স্বাভাবিক বায়ুদ্বারা নাড়ী কোমল, সূক্ষ্ম, স্থির ও মন্দবেগ সম্পন্ন হয় এবং তীব্র বায়ু দ্বারা উহা স্থূল, কঠিন ও দ্রুতগামিনী হয়। পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুতগামিনী, সরল ও দীর্ঘ হইয়া কাঠিন্যের সহিত শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হইতে থাকে। শ্লেষ্মার প্রকোপে নাড়ী তন্তুবৎ সূক্ষ্ম, মন্দবেগ ও শীতল হয়।

ধমনীর অভ্যন্তরে রক্তের উৎপ্লবন ক্রিয়া বশতঃ ধমনী সকল স্পন্দিত হয়। রক্ত হৃদয় হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ উৎপ্লুত হইয়া ধমনী রন্ধ্র দিয়া বেগে ধাবিত হইতেছে, একারণ ধমনী সকলও স্পন্দিত হয়। এই উৎপ্লবন ক্রিয়ার প্রকৃতিভেদে ধমনী স্পন্দনেরও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। রক্তের স্বভাব অনুসারেই ধমনী সকলের স্থূলতা, সূক্ষ্মতা ও কাঠিন্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়ার হেতু বায়ু। বায়ুবেগেই ধমনীমার্গে রক্ত পরিচালিত হয় এবং বায়ুবেগেই পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে।

হৃদয়স্থ রক্তাধার ধমনী সমূহের আশ্রয়স্থান। ঐ রক্তাধার হইতে একটী মাংসনলী কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে, ঐ মাংসনলী সমুদায় ধমনীর মূলভাগ। উহা হইতে নানা শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঐ সমস্ত সূক্ষ্মনলাকৃতি মাংসনলীর নাম ধমনী। হৃদয়সঞ্চিত রক্ত মাংসনলী দিয়া উঠিয়া ধমনী সমূহ দ্বারা সমস্ত দেহে ভ্রমণ করিয়া দেহ পোষণ করে। হৃদয়যন্ত্র সর্ব্বদাই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত

হইতেছে। যেমন জলপূর্ণ সচ্ছিদ্র ভিস্তীর উপর চাপিলে ঐ ছিদ্র দিয়া অভ্যন্তরস্থ জল বেগে নির্গত হয়, সেইরূপ আকুঞ্চন-কালে হৃদয়স্থ রক্তের কিয়দংশ উৎপ্লুত হইয়া তৎসংলগ্ন স্থূল ধমনী দ্বারা ধমনী সমূহে প্রবেশ করে। ঐ আকুঞ্চন কার্য্য এত বেগে সম্পন্ন হয় যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ উৎপ্লুত রক্ত সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ করিয়া প্রসারণকালে পুনরায় হৃদয়ে প্রবেশ করে, জীবদেহে প্রতিনিয়তই ঐরূপ ক্রিয়া সাধিত হইতেছে।

রোগ বিজ্ঞানোপায়।

নিদান, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ ও উপশয় এই পাঁচটী ব্যাধি পরিজ্ঞানের উপায়।

যদ্ভবেন্ন বিনা যেন তস্য তন্নিদানং মতম্।

যাহা বিনা যাহা হয় না অর্থাৎ যে কারণ ব্যতিরেকে যে রোগ জন্মে না, তাহাকেই ঐ রোগের নিদান বলা যায়। হেতু, নিমিত্ত, উত্থান, প্রত্যয়, কারণ, বীজ ও আয়তন এই কয়েকটী নিদানের পর্য্যায় বাচক শব্দ। ইহার যে কোনটীর উল্লেখেই নিদান বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিদান তিন ভাগে বিভক্ত অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। নিতান্ত প্রয়োজনীতা বোধে আজ প্রজ্ঞাপরাধের বিষয় কিছু বলা যাইবে। যথাসাধ্য—বারান্তরে সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, রূপ ও উপশয় প্রভৃতি বিষয়-গুলির বিবরণ প্রদর্শিত হইবে।

ধীধৃতিস্মৃতি-বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্।

বুদ্ধি, ধৃতি (চিত্ত সংযমিনী শক্তি) ও স্মৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে সমুদায় অশুভ কর্ম্ম করা যায়, ঐ সর্ব্বদোষ (বাত, পিত্ত, শ্লেষ্ম,) প্রকোপন কর্ম্মকে প্রজ্ঞাপরাধ বলে।

ধীধৃতি স্মৃতি বিভ্রংশঃ সম্প্রাপ্তিঃ কালকর্ম্মণাম্। অসাত্ম্যাগমনঞ্চেতি জ্ঞাতব্যা দুঃখহেতবঃ॥

ধী, ধৃতি ও স্মৃতি বিভ্রংশ, কাল ও কর্ম্মের সংপ্রাপ্তি এবং অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, এই কয়েকটী দুঃখের হেতু। দেখিতে গেলে উল্লিখিত দুঃখ হেতু কয়েকটীই আমাদের বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তজ্জন্যই আমরা এত কষ্ট পাইতেছি।

জ্বর বিজ্ঞান।

রোগ সমূহের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বপ্রধান অতএব সর্ব্বাগ্রে জ্বরের বিষয় বিবৃত করাই যুক্তিসঙ্গত।

ইহতু জ্বর এবাদৌ বিকারাণা মুপদিশ্যতে তৎ-প্রথমত্বাৎ শারীরাণাম্—চরকঃ।

শারীর ও মানস রোগ সমূহের মধ্যে জ্বরই সর্ব্ব প্রধান অর্থাৎ সমধিক সন্তাপ-জনক। অথবা ব্যাধি সমুদায়ের মধ্যে জ্বরই প্রথমে জীবকে আক্রমণ করে।

জন্মাদৌ নিধনেচৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনঃ।

জন্ম ও মৃত্যু সময়ে জীবগণ জ্বর কর্ত্তৃক প্রায়ই আক্রান্ত হয়। জ্বর যে সকলরোগের মধ্যে প্রধান ও ক্লেশকর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই, দেখিতে গেলে একমাত্র জ্বরই আমাদিগের সর্ব্ব-নাশের মূল কারণ। এই কৃতান্তসম ভীষণ রোগের করাল কবলে কত শত নগর, উপনগর ও মহানগর কবলিত হইয়াছে

ও হইতেছে, সমৃদ্ধিশালী সুশোভিত শত সহস্র স্থান এককালে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ঘোর অরণ্য ও শ্মশানসদৃশ ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে। লোক সমুদায় এই জ্বরের অত্যাচারে ক্রমশঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে। হয়ত কেহ কেহ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও স্নেহময়ী জননীকে অকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া অকালে কাল সমীপে নীত হইতেছে। জ্বরের এই দুর্দম্য প্রভাবে সকলেই অহরহঃ জর্জ্জরিত। এমন লোক দেখা যায় না, যিনি কখন জ্বরের উপদ্রবে উপদ্রুত হন নাই। অন্যান্য পীড়ায় লোক কষ্ট পাইতেছে না, এমন নহে, কিন্তু অন্যান্য পীড়া জ্বরের ন্যায় বহুল নহে, আর তাহাদের অধিকাংশই জ্বরের আনুষঙ্গিক ও জ্বরাবস্থায় অবৈধ, আহার, বিহার ও ঔষধ সেবন হইতে উৎপন্ন। জ্বরের অত্যাচারে লোক সমুদায় ক্রমশঃ হীনবল ও দুর্ব্বলাগ্নি হইয়া যাহা কিছু আহার করে, ভালরূপ পরিপাক হয় না, সুতরাং একমাত্র অগ্নিদৌর্ব্বল্য হইতেই নানাবিধ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতে হয়, এ সমস্তই আমাদের প্রজ্ঞাপরাধ অর্থাৎ বুদ্ধিদোষ।

আমাদের আর পূর্ব্বতন লোকের ন্যায় ধৈর্য্য নাই, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা নাই, অপেক্ষা করিবার অবকাশও নাই। আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি, ২।১ দিনের জ্বরেই লোকে কুইনাইন সেবন করিয়া আফিসের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কি করিবে? দরিদ্র ভারতবাসী অর্থের জন্য পরিবার প্রতিপালনের জন্য স্বীয় জীবনকে অতি সামান্য জ্ঞান করেন। রাজনীতিও দিন দিন কঠোর হইয়া পড়িতেছে। ২।১ দিন আফিসে উপস্থিত হইতে না পারিলেই মান্য গণ্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হইবে, শুদ্ধ উহাতেই অব্যাহতি নাই, ঐ সার্টিফিকেট আবার কলেজের অধ্যাপক দিগের অনুমোদিত হওয়া চাই, নচেৎ বেতন পাইবে না, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এমন অধিক বেতন অনেকেই পান না, যাহা তাহাদের সমস্ত ব্যয় সংকুলান হইয়া অবশিষ্ট থাকে, এদিকে নিয়মিত অর্থ হইতে ডাক্তার কবিরাজকে দিতে হইল, তাহার উপর যদি বেতন কাটা যায় তবেই ত বিপদের উপর বিপদ হইয়া দাড়াইল, সুতরাং কুইনাইন কেন তদপেক্ষা ঘোর অনিষ্টকর পদার্থ সেবনেও যদি অফিসের কার্য্য চলে, তাহাও স্বীকার। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে যে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ" অর্থাৎ ভোজনের পর কিছুক্ষণ পরিশ্রম না করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিবে।

এদিকে আমাদিগকে করিতে হইতেছে কি না, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই ৯টার মধ্যে স্নান আহার সমাপন করিয়া ১০ টার মধ্যে আফিসে উপস্থিত হইতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একটু বিশ্রাম বা পান খাইতেও সময় থাকে না এবং ২।৩।৪ মাইল পর্য্যন্তও পদব্রজে গমন করিতে হয়, এইরূপ লোকই অধিকাংশ। হইতে পা[illegible]লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কার্য্য করা সুবিধাজনক। তা বলিয়া কিন্তু আমাদিগের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুবিধাজনক বা স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। রাজপুরুষগণের আহার ব্যবহার যেরূপ, আমাদিগের আহার বিহারাদি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সুতরাং

তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যানুকূল হইলেও আহার করিয়া পরিশ্রম করা আমাদিগের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ প্রতিকূল! অপরন্তু অনুকরণ প্রিয়তাও আমাদিগের একটী সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

অনুকরণ করিতে গিয়া দিন দিন আমরা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি, বুদ্ধিবিবেক হারাইয়াছি একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি না যে,আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। কেবল ভারতের উন্নতি করিব, ভারত বাসীনী অবলাগণের কষ্ট দূর করিব, মাতৃ দোষেই ভারতবাসী দুর্ব্বল ও ভীরু হইতেছে, ইত্যাদি বৃথা বাগাড়ম্বরে অম্বর প্রতিধ্বনিত করিতেছি, কার্য্যতঃ কিন্তু কিছুই নহে। যদি একবারও বুঝিতাম যে পাশ্চাত্য রীতি নীতিই আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, কুহকে ভুলাইয়া অবনতির পথে লইয়া যাইতেছে, তবে আর এরূপ ক্লেশ পাইতে হইত না, এরূপ বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না, অবশ্যই একদিন না একদিন উন্নতির পথে, সুখের সোপানে আরোহণ করিতাম, সন্দেহ নাই। আমাদিগের রাজপুরুষগণের দেশ ভিন্ন, জল বায়ু ভিন্ন, স্থানীয় স্বভাব বিভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, ধর্ম্ম ভিন্ন, কর্ম্ম ভিন্ন, আকৃতি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, আহার বিহারাদিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সুতরাং ভারতবাসীর তদনুকরণ কেন হিতকর হইবে? কেন আমাদিগের স্বাস্থ্যোপযোগী হইবে? ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়, পৌষমাসের প্রখর শীতে যাহা আহার করিয়া সহ্য করা যায়, যেরূপ বিহার ক্লেশকর হয় না, যেরূপ পরিশ্রম গুরুতর হয় না, যেরূপ পরিচ্ছদ সুখকর হয়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড নিদাঘসন্তাপে তাদৃশ আহার সুজর হয় না, তাদৃশ বিহার ক্লেশকর হইয়া উঠে, সেরূপ পরিশ্রম দুষ্কর হয় এবং তাদৃশ পরিচ্ছদ অসহনীয় হইয়া উঠে, কিন্তু আমরা তাহা চিন্তা করিব না, দেখিব না, বলিলেও শুনিব না, পরন্তু যাহারা বলিবে, তাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া গালি দিব, অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিব এবং উপহাসে উড়াইয়া দিব।

আমরা যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া থাকি, যাহাদিগকে পশু বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদেরও ঋতুচর্য্যা বোধ আছে। নেপালবাসীরা মৃগনাভি প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য শীত কালে এদেশে আসিয়া থাকে, গ্রীষ্মের সূত্রপাত মাত্রই শশব্যস্তে স্বদেশে প্রস্থান করে। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি চমরী (বনগরু) প্রভৃতি পশু লইয়া শীতকালে এদেশে আসিয়া থাকে, গ্রীষ্ম প্রারম্ভেই কিন্তু আবার প্রস্থান করে, কারণ ঐ বন্যপশুও চিরসেবিত শীত বই গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারে না। আমাদিগেরই কি সহ্য হয়? আমাদিগের কি কষ্ট হয় না? অবশ্যই হয়, কিন্তু আমরা সভ্যতার স্রোতে গা ভাসাইয়াছি, সভ্য শ্রেণীতে নাম লেখাইতে চেষ্টা করিতেছি, কষ্ট হইলেও সুখ মনে করিতেছি ও নীরবে সহ্য করিতেছি। ইহাকেই বলে প্রজ্ঞাপরাধ।

আমরা দেখিয়াছি, সর্ব্বদা যাহারা উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত রাখেন, সর্ব্বদা উষ্ণ বস্তু আহার করিতে ভাল বাসেন, উষ্ণ স্থানে বাস করেন এবং শীতল জল স্পর্শও করেন না, যদি তাহাদিগের কোন ক্রমে নিয়মচ্যুতি হয় কিম্বা হিম সেবন ঘটে, তবে অমনিই সর্দ্দি আসিয়া তাহাদিগকে

আক্রমণ করে, ১৫।২০ দিন বা একমাসেও তাহা যায় না। আবার যাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে অবগাহন স্নান ও সেই হিমাতপে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া করেন, তাহাদের কিন্তু একদিনের জন্যও ওরূপ সর্দ্দি দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি কোন একটী প্রত্যহ প্রাতঃ স্নানকারী ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি, তিনি উপনীত হইয়া অবধি কখনও সর্দ্দি বা জ্বরে কষ্ট পান নাই। এবং একটী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাশয় একদিন কথায় কথায় বলিলেন যে, তিনি সর্দ্দির জন্য কিছুদিন স্নান বন্ধ করিয়াছিলেন, কখনও বা উষ্ণ জলে স্নান করিতেন কিন্তু কিছুতেই তাহার সর্দ্দি নিঃশেষ আরোগ্য হইল না, অনন্তর যখন তিনি গঙ্গা স্নান আরম্ভ করিলেন তখন ক্রমশঃ তাঁহার সর্দ্দি প্রতিকার হইল ও তাঁহার মধ্যে মধ্যে যে সর্দ্দি হইত, তাহা আর হইল না। বলা বাহুল্য যে কলের জলে স্নান করাতেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার সর্দ্দি হইত। তাই বলিতেছি প্রজ্ঞাপরাধই আমাদের কষ্টের কারণ।

পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, যেরূপ আহার বিহার তাঁহাদের অভ্যস্ত ছিল, সেইরূপ করিলেই আমারা ভাল থাকি। এরূপ ম্যালেরিয়া বা অপরাপর রোগের অসহ্য যন্ত্রণা বারম্বার ভোগ করিতে হয় না অর্থাৎ অনুকরণ করিতে না গেলেই অনেক সুস্থ থাকিতে পারি।

* মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ। বহি র্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুঃ রসানুগাঃ।

মিথ্যা অর্থাৎ অনিয়মিত আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ু পিত্ত কিম্বা কফ কুপিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশ করতঃ ভুক্ত বস্তুজাত রসকে দূষিত করে এবং কোষ্ঠগত অগ্নিকে বহির্গত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। তাপ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই ত্বক্ উষ্ণ হয়।

জ্বরস্ত্বেক এব সন্তাপলক্ষণ স্তমেবাভিপ্রায় বিশেষাদ্ বিবিধ মাচক্ষতে।

দৈহিক সন্তাপ বৃদ্ধিরূপ একমাত্র জ্বর অভিপ্রায় বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকল দেশীয় সকল চিকিৎসকগণই দেহের সন্তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর বলিয়া থাকেন।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা, যুগপদ্ যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে।

স্বেদাববোধ, (ঘর্ম্ম না হওয়া) দেহ ইন্দ্রিয় মনের সন্তাপ, (দেহের উষ্ণতা, ইন্দ্রিয়ের বিকৃততা, মানসিক অরতি ও গ্লানি) এবং সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ (সর্ব্বাঙ্গ বেদনা) এই তিনটী লক্ষণ একদা যে রোগে উপস্থিত হয়, তাহাকেই জ্বর বলে ও ইহাই জ্বরের অসাধারণ লক্ষণ। জ্বরিত ব্যক্তির জলীয় ধাতু রুদ্ধ হইয়া যায়, একারণ ঘর্ম্ম নির্গত হয় না ও দৈহিক তাপ বৃদ্ধি হয়।

রুণদ্ধি চাপাপাং ধাতুন্ যস্মাত্তস্মাজ্জ্বরাতুরঃ। ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ স্বিদ্যতে নচ সর্ব্বশঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ।

---

* মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং অবৈধাহার চেষ্টাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং। দোষাঃ বাত পিত্ত কফাঃ। আমাশয়াশ্রয়াঃ, আমাশয়ং গতাঃ। রসানুগাঃ, রসদূষকাঃ। কোষ্ঠাগ্নিং কোষ্ঠাগ্নেরুষ্মাণং নতু সমস্তমগ্নিং তর্হি দোষ পাকাসম্ভবঃ স্যাৎ। বহি র্নিরস্য বহিঃ প্রক্ষিপ্য, জ্বরদাঃ স্যুঃ জ্বর কারিণো ভবেয়ুঃ।

জ্বরের পূর্ব্বে পরিশ্রম ব্যতীত শ্রান্তি-বোধ, মনের অসুস্থতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, অশ্রুজন্য নেত্রের আকুলতা, শীতল বস্তু, বায়ু ও আতপ সেবনে কখন ইচ্ছা, কখনও বা দ্বেষ, হাই উঠা, অঙ্গবেদনা, শরীরের গুরুতা ও রোমাঞ্চ, অন্নাদিতে অরুচি, অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, হর্ষাভাব ও শীত-বোধ প্রভৃতি সামান্যতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বায়ুপ্রকোপে বার-ম্বার হাই উঠিতে থাকে, পিত্তপ্রকোপে নেত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং শ্লেষ্মপ্রকোপে আহারে অরুচি জন্মিয়া থাকে। নাড়ীর গতি অনুসারে যেরূপ দোষের হ্রাস বৃদ্ধি স্থির হয়, সেইরূপ উল্লিখিত ও বক্ষ্যমাণ লক্ষণ দ্বারাও রোগ নির্ণয় করা হইয়া থাকে, অতএব নাড়ীর গতি এই সমুদায় লক্ষণের সহিত মিলাইয়া রোগ নিশ্চয় করিলে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। চিকিৎসকগণের এই সকল লক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

কতকগুলি জ্বর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপ-স্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ ভোগ করিয়া পরিত্যাগ হয়। আর কতকগুলি জ্বর অবিচ্ছিন্নভাবে ২।৪।৫।৭।১০ দিনও ভোগ করে কিন্তু ঐ জ্বর বিচ্ছেদ হইলে প্রায়শঃই আর হয় না, কাহারও অল্প পরিমাণে হইতে দেখা যায়। জ্বর আসিবার সময় ও বিচ্ছেদ হইবার সময় কতকগুলি আনুষঙ্গিক লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সমুদায় উপসর্গ জ্বর ত্যাগ হইলে প্রায়শঃই থাকে না। দোষভেদে ঐ সকল লক্ষণ ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সকল জ্বরে সমান উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

বাতিকজ্বরে শরীরের কম্প, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অনিদ্রা, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, শিরোবেদনা, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা, শূল (পেটব্যথা) ও উদরাধ্মান, (পেট ফাঁপিয়া উঠা) প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। কোন সময়ে জ্বর অধিক বোধ হয়, কোন সময়ে বা অল্প পরিমাণ বোধ হয়। শরীর রুক্ষ, হাঁচি না হওয়া এবং অত্যন্ত হাই উঠা প্রভৃতিও বাতিক জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজন্য জ্বরে—অতিশয় তীক্ষ্ণবেগ, তরল মলভেদ, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকার পাক, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, প্রলাপবাক্য বলা, মুখে তিক্তা-স্বাদ বোধ করা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্তত্তা, তৃষ্ণা, মল, মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা এবং ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ সংঘটিত হয়।

শ্লেষ্মজন্য জ্বরে—জলার্দ্র বস্ত্রে শরীর আবৃত করিলে যেরূপ বোধ হয় সেইরূপ বোধ, অল্প জ্বরবেগ, আলস্য, মুখে মধুরা-স্বাদ, মূত্র ও পুরীষের শুক্লবর্ণতা, শরীরের জড়তা, আহার না করিয়াও তৃপ্তিবোধ করা, গাত্রভার, শীতবোধ, বমনোদ্রেক, রোমাঞ্চ, নিদ্রাধিক্য, মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব, অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুক্লবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

১ম খণ্ড। } সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। { ৫ম সংখ্যা।

হিন্দুমহিলা।

(৫)

সকল দেশেরই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়; ইভের পাতক যেন সমস্ত মহিলাগণের চরিত্রে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আমরা

"অথার্দ্ধো বৈ এষাত্মনো যৎ পত্নী"

প্রভৃতি শ্লোক দেখিতে পাই; কিন্তু সেই সংহিতায় আবার অন্যরূপ দৃষ্ট হয়ঃ—

"স সোমো নাতিষ্ঠত স্ত্রীভ্যো গৃহ্যমাণঃ"
"তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়াঃ—"

অর্থাৎ রমণীগণ সোম গ্রহণ করাতে তাহা আর থাকিল না। সেই জন্য স্ত্রীগণের কোন ক্ষমতাই নাই এবং সেই জন্যই তাহারা কোন অংশই পায় না। ইহা দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে? স্ত্রীজাতি অপবিত্র; স্বয়ং সোম তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহাদের কিছুতেই অধিকার নাই, কোন ক্ষমতাই নাই। নিদান সূত্রকার বলিতেছেন

"উচ্চাবচাচরণাঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তিঃ"

স্ত্রীলোকের স্বভাব চরিত্র বড়ই বিষম। স্ত্রীচরিত্রে তিনি এতদূর সন্দিহান হইয়াছিলেন যে, আপনাকে মানুষের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। শতপথব্রাহ্মণ বলিয়াছেন,

"রক্ষাংসি যোষিতং অনুসরন্তে
তদুত রক্ষাংস্যেব রেত আদধাতি।"

অর্থাৎ রাক্ষসগণ রমণীকুলের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগেরই শরীরে শুক্রনিষেক করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্রের আর অধিকতর জঘন্য চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুগণ এক সময়ে স্ত্রীজাতিকে যে, অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণাদি হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রকটিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই সকল শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক ওয়েবার প্রমুখ হিন্দুবিদ্বেষিগণ হিন্দুমহিলাগণের সম্বন্ধে অতীব ভয়াবহ মন্তব্য

প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল হীনজনোচিত বিদ্বেষপ্রণোদিত মতের খণ্ডন করা আমার অভিপ্রেত নহে।

সে যাহা হউক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় সেই স্ত্রীবিদ্রোহী শ্লোক হইতে নীতিশাস্ত্রের "বিশ্বাসো নহি কর্ত্তব্য স্ত্রিষু" এবং নিধু বাবুর সেই নিন্দিত সঙ্গীত পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যললনাদিগের বিরুদ্ধে একটা ধারাবাহিক যুদ্ধ চলিয়াছে। সেই যুদ্ধের আবিল শোণিত তরঙ্গের মধ্যে স্থানে স্থানে আমরা মনু প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অনুকূল মতের ন্যায়স্বচ্ছপূত রেখা দেখিতে পাই। কিন্তু তখনই এই মত-বিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ি। প্রাচীন গ্রীক ও রোমের শাস্ত্রগ্রন্থে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে প্রায় এইরূপই বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে গ্রীস ও রোম সভ্যতার চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, তখনও স্ত্রীজাতির কোন বিশেষ উচ্চ অধিকার দেখা যায় না, তখনও রমণী সমাজ নিতান্ত নগণ্য। ইহার কারণ কি? ইতিপূর্ব্বে আমরা স্ত্রীজাতির হীনতা সম্বন্ধে যে সকল কারণ প্রকটিত করিয়াছি, এস্থলে তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই সমস্ত কারণ অনেক পরিমাণে বাহ্য,—যৌন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে স্ত্রীজাতি পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ এ সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মস্তিষ্ক ওজনে পাঁচ ঔন্স কম। মস্তিষ্কই বুদ্ধিবৃত্তির আকর, মস্তিষ্কের অভাবে বুদ্ধির অভাব হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের এইরূপ তারতম্য সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যতই আমরা অসভ্যের দিকে অগ্রসর হই, এই তারতম্য আজন্ম,—এমন কি, ভ্রূণ অবস্থাতেও দেখিতে পাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—আদি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টির সময়ে উভয়ের মস্তিষ্ক সমান ছিল কি না? ইহার প্রত্যুত্তর দানে কেহই সক্ষম নহে; কারণ জগতের কোন গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। একটী উপায় আছে, কিন্তু তদ্দ্বারাও কোন বিশেষ ফললাভের আশা নাই। উপায়টী এই,—কার্য্য দ্বারা কারণের নির্ণয়। যেমন রোগ দেখিয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া কারণও সম্পূর্ণরূপে না হউক—কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় করিতে পারা যায়। কিন্তু কতকগুলি কারণের প্রায় একইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে,—যেমন শঙ্খ বিষ সেবনে বিসূচিকা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়েও অনেকস্থলে একরূপ কারণ হইতে প্রায়ই সমান প্রকার কার্য্যের ঘটনা হইতে দেখা যায়। ইহার উপর আবার পুরুষ ও স্ত্রীর তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। তাহার উপর আবার প্রাচীনকালের যে সকল গ্রন্থোক্ত প্রমাণাদি আজি আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রায় সমস্তই পুরুষের রচিত। আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা ও লোপামুদ্রা প্রভৃতি বৈদিক বিদুষীগণের নামোল্লেখ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর অথবা সমান বুদ্ধিমতী ছিলেন,

তাহার কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না। তথাপি ভারতের আদিম বৈদিক গগনে আমরা যে দুই চারিটী রমণীরত্নকে জীবন্ত গ্রহের ন্যায় উদিত দেখি, জগতের অন্যত্র কোথাও তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইনা। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যখন হিন্দুদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যার আদর্শ দেবতা সরস্বতী স্ত্রী হইলেন, তখন প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্য মহিলা যে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমতী ছিলেন না, তাহা কে বলিতে পারে? এই সময়ে যদি আবার প্রসিদ্ধ নীতি প্রণেতার মত উদ্ধৃত করি, তাহা হইলে আবার প্রমাদ ঘটে :—

"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।"

এখানে স্পষ্টই স্বীকৃত হইতেছে যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী চতুর্গুণ বুদ্ধিমতী। এই মতটী অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলে সকলই উল্টাইয়া যায়; তাহা হইলে পুরুষের অপেক্ষা রমণীর মস্তিষ্ক পাঁচ ঔন্স কম না হইয়া চারি গুণ বেশি হইয়া পড়ে। এই ভীষণ মতবিপ্লবে য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ আর থাই পান না! কিন্তু যে নীতিশাস্ত্রে স্ত্রী চতুর্গুণ বুদ্ধিমতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই আবার

"স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"
"স্ত্রিয়োনাস্তি স্বতন্ত্রতা"

প্রভৃতি বিধান দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা কি বুঝিব?

"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥"

আমাদিগের নীতিকর্ত্তার এই বিচিত্র শ্লোকটী পুরুষদিগের অস্থিমজ্জার সহিত যেন গ্রথিত। স্ত্রীজাতির বর্ণনা করিতে হইলেই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বসেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় গ্রন্থে মহিলাগণের বিরুদ্ধে এইরূপ একটা ধারাবাহিক বিদ্বেষের স্রোত অন্তঃসলিলে বহমান দেখা যায়। আমরা যাঁহাদিগকে সংসারের নিদানভূতা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া শ্লাঘা করি, তাঁহাদিগকেই আবার কোন্ প্রাণে পূর্ব্বোক্ত জঘন্য অপবাদে কলঙ্কিত করিতে পারি? ইহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, হিন্দুমহিলা লিখিতে বসিয়া অগ্রে তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে *।

এক্ষণে আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি, ইহা যৌন নির্ব্বাচনের একটী প্রধান অঙ্গ। পুরুষ প্রকৃতি লইয়াই সৃষ্টি, যতক্ষণ পুরুষ প্রকৃতি চণক দ্বিদলের ন্যায় অবিভাজ্যরূপে জড়িত থাকে, ততক্ষণ সৃষ্টি। চণকের দ্বিদল বিভিন্ন হইলে যেমন তাহার অঙ্কুরোদ্গমের আর সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতি পরস্পরে অন্তরিত হইলে সৃষ্টি স্থগিত থাকে। সামান্য তৃণ গুল্ম হইতে অসামান্য মানব পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আলোচনা করিলে এই নিগূঢ় সত্য বুঝিতে পারা যাইবে। পুরুষ নিজের সারাংশ ব্যক্তরূপে প্রকৃতির গর্ভে আহিত করিলেন, প্রকৃতি তাহা নিজ শোণিত দিয়া পোষণ করিতে লাগিলেন। ইহাই

* এ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে কি না জানি না। যদি হইয়া থাকে এবং যদি কেহ তাহা জানেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। সং

সৃষ্টি। এই সৃষ্টি কোটি কোটি জগতের কোটি কোটি স্থলে প্রতিক্ষণ চলিতেছে। সৃষ্টি করাই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু এই সৃষ্টিব্যাপারে কাহার অধিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়?

আমরা প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেখিব। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটী উদ্ধৃত হইল।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনু বীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততোঽহং নামাভবত্তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্রে উক্ত্বা অথান্যং নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎপূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ওষতি ।১। সোঽবিভেৎ তস্মাৎ একাকী বিভেতি সহায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং ভবতি ।২। স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হস্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ।৩। সো হেয়মীক্ষাং চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোহসানীতি সা গৌরভবৎ ঋষভ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বে তরাভবদশ্ব বৃষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবত্ততোঽজাবয়ো ঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমা পিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত ।৪।

অর্থাৎ আদিকালে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল আত্মায় আচ্ছন্ন ছিল, তিনি পুরুষ। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু আত্ম (আপনাকে) ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রথমে বাক্য উচ্চারণ করিলেন; বলিলেন, সোঽহমস্মীতি "আমিই ইহা"। ইহাতেই অহং সৃষ্টি। এই জন্যই আজিও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রথমে "আমি" এবং তাহার পর নিজের নাম বলে। তিনিই পুরুষ, কারণ পূর্ব্বে তিনি সকল পাপের উষণ অর্থাৎ দাহ করিয়াছিলেন। পুরুষ ভীত হইলেন, এই জন্য একাকী ব্যক্তিমাত্রই ভয় পায়। এইরূপ হওয়াতে তিনি ভাবিলেন, "যখন আমি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, তখন ভয় কিসের জন্য? তখন তাঁহার ভয় দূর হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে লোকে ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু তখন দ্বিতীয় কিছুই ছিল না, তবে তিনি কেন ভীত হইবেন? কিন্তু তিনি আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না, এইজন্য একাকী থাকিয়া কেহই আনন্দ লাভ করিতে পাবেন না। তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিলেন। এতদিন তিনি একাঙ্গে সংসক্ত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় ছিলেন; এক্ষণে আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে পুরুষ ও স্ত্রী হইল *। এইজন্য যজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, পুরুষ ও স্ত্রী চণক দ্বিদলবৎ; একাকী হইলে দ্বিধা বিভক্ত চণকের অর্দ্ধ দলের ন্যায়। স্ত্রী এই অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। এইজন্য তিনি সেই স্ত্রীতে সঙ্গত হইলেন; তাহাতে মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিল।

* আনন্দগিরি বলেন, "তথাভূতঃ সংসক্তজায়াপুংপরিমাণোঽভূদিতি যাবৎ। ন কেবলং মনুঃ শতরূপেত্যনয়োরেব দম্পত্যোরিদং নির্ব্বচনং।"
পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৯৮ পৃষ্ঠা।

অতঃপর সেই স্ত্রী ভাবিলেন, "একি! ইনি আত্মা হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া আমাতেই সঙ্গত হইলেন! যাহা হউক, এক্ষণে আমি অন্তর্দ্ধান করি। তখনই তিনি গাভী হইলেন, পুরুষ তখনই বৃষ হইয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের হইতে গোগণ জন্মিল। স্ত্রী বড়বা হইলেন, পুরুষ অশ্বের মূর্ত্তিধারণ করিলেন; স্ত্রী গর্দ্দভী এবং পুরুষ গর্দ্দভ হইয়া সঙ্গত হইলেন। এইরূপে অবিভক্ত ক্ষুরযুক্ত প্রাণীগণ জন্মগ্রহণ করিল। তাহার পর একজন ছাগী অপর ছাগ, একজন অবি অপর মেষ হইলেন; এইরূপে অজ ও মেষগণ জন্মিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ সৃষ্ট হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই চারিটী শ্লোকে সমগ্র সৃষ্টিকাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্ব বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, আমরা তাহাতে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নহি। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের পর সৃষ্টির মূল তত্ত্ব আমরা সর্ব্বপ্রথম ইহাতেই স্ফুটিত দেখিতে পাই। কিন্তু এই চারিটী শ্লোকে সৃষ্টি বিষয়ে কাহার অধিক আগ্রহ দেখা যায়?—পুরুষের বা স্ত্রীর? এখানে পুরুষ একাকী বলিয়া ভীত দুঃখিত, সহচরীর জন্য অতিশয় ব্যগ্র। তিনি সেই সহচরীতে বলপূর্ব্বক সঙ্গত, কিন্তু সহচরী তাহাতে লজ্জিতা, তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগে চেষ্টিতা,—অবশেষে আত্মগোপনে প্রবৃত্তা। পুরুষ তাহাতেও নিরস্ত হইলেন না, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত সমগ্র প্রাণীজগতের সৃষ্টি হইল। অতএব ইহাতে পুরুষেরই অধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই অমূল্য ঋষি বচনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, আমরা ইহার সহজ ব্যাখ্যায় ডারউইনের যৌন নির্ব্বাচনের বীজ দেখিতে পাই। ডারউইনের মতাবলম্বী কোন প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন ঃ—

As a rule, the male is modified more than the female. Why this is we may not be able to decide; but it is probably owing to his stronger passions. It is the rule in all nature, to which there are few exceptions that the male pursues the female. This great eagerness on his part develop in him characters which in her are wanting. The female, on the other hand, being obliged to nourish the embryo and guard her offspring, can not afford to ex pend so moch energy in contests, in song, or gaining possession of a mate; and it is this contest which the males have with their own sex for the female, which is, after all, the most remarkable and interesting feature of the reproductive nature, for there can be little doubt but among the males of most animals there is a constantly recurring struggle for the possession of the females. This contest is not always one of

brute strength ; indeed it is often one of skill and cunning, a higher gift of song, a greater beauty, a love of display." *

ইহার মর্ম্ম অল্প কথায় এই হইতে পারে যে, স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী। স্ত্রী কচিৎ পুরুষকে খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু প্রায় সকল পুরুষকেই স্ত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কিসে স্ত্রীর মনোরঞ্জন হয়, পুরুষের ইহাই প্রধান চিন্তা। এই জন্য পুরুষ নানা উপায়ে স্ত্রীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। সুন্দর পরিপাটী বেশবিন্যাস, মনোমোহন সঙ্গীতালাপ, প্রভৃতি উপায় সকল পুরুষ অবলম্বন করিয়া থাকে। অনুশীলন দ্বারা এই সকল উপায় মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হয়। সকল প্রাণীরই পুরুষ জাতির মধ্যে এই সকল বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের নিমিত্ত পুরুষদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। শুদ্ধ পাশববলের সাহায্যে সকল সময়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, এই জন্য শোভা-সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা বৃদ্ধির প্রতি পুরুষের বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়।

সমগ্র প্রাণীজগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে এই সকল যুক্তির সারত্ব সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। শীলতা ও ভদ্রতার অনুরোধে আধুনিক সভ্য মানব আদিম মানব হইতে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আদিম অবস্থাতে মানবের প্রাকৃতিক ধর্ম্মের পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা শ্বেতকেতুর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাঁহার পরে তাহার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন, আমরা সেই পরিবর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা দেখিতেছি। তথাপি সভ্য সমাজের প্রত্যেক স্তর পরীক্ষা করিলে সেই আদিম প্রাকৃতিক ধর্ম্মের কতকটা নিদর্শন দেখা যায়। মানুষের মধ্যেত এইরূপ দেখা যায়, পরন্তু ইতর প্রাণিগণের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য তাহা পরে দেখা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

* Sexual physiology and Hygiene. p. p. 54 55.



এনি-বেসাণ্ট।

বিবি বেসাণ্ট বিদেশিনী। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে আসিয়া ভারতের ধর্ম্ম কথা শুনাইয়া গিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত দেশী বিদেশী অর্থ ব্যয়ে বিবির মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

বিবি যে হিন্দুর নিকট তাহাদের ধর্ম্মের কিছু নূতন তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে হিন্দুর প্রাণের কথা কোন বিদেশিনী এরূপভাবে প্রকাশ করে নাই। হিন্দুর বর্ণাশ্রম আচার অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য প্রকাশ ও পোষকতা করিয়া তিনি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হন নাই—আপনাকে হিন্দু বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন।

বিবি আপনাকে হিন্দু বলিতে গৌরবান্বিত বোধ করিলেও আমাদের তাহাতে সুখ দুঃখের বিশেষ কিছু নাই। ঘরের ছেলে ইহা বুঝে না বলিয়াই দুঃখ। তবে বিবি একজন অসামান্যা রমণী, তেজোময়ী বিশৃঙ্খলতার সমুজ্জ্বল ছবি, বিলাতি সমাজ-স্রোতের মহত্ত্ব বিকাশ।

ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ১লা অক্টোবর লণ্ডন নগরে এনির জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা একজন রোমান ক্যাথলিক পাদরি। পাদরি বটে কিন্তু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, বাইবেলে বীতশ্রদ্ধ। ধর্ম্মযাজক, ঈশ্বরে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইয়া যে পাদরি সম্মান উপভোগ করিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে কিন্তু বিলাতি সমাজে ইহাতে আশ্চর্য্য বা অবজ্ঞার কিছু নাই। কেননা পাদরিগিরি তাঁহাদের পক্ষে সাময়িক ব্যবসা। যাজক বা তাঁহার পুত্র নাবিক, কর্ম্মকার বা চর্ম্মকার হইলেও বিশেষ কিছু বলিবার নাই। বৃত্তি, জাতি নহে—ব্যবসায় কর্ত্তব্য নহে—কর্ম্ম ধর্ম্ম নহে।

এনির মাতা বিদুষী না হইলেও লেখা-পড়ায় তাঁহার জ্ঞান ছিল; আর স্বভাব চরিত্র পবিত্র বলিয়া একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল। সৎস্বভাবা রমণীর হস্তে বালক বালিকার সহজে সুশিক্ষা লাভ হয় বলিয়া বিলাতে অনেকে এইরূপ রমণীর হস্তে পুত্র কন্যার শিক্ষাভার অর্পণ করে। এনির মাতার এইরূপ অনেকগুলি ছাত্র ছিল। সেই আয়ে তিনি আপনার পুত্র কন্যা লালন পালন করিতেন।

এনি এই বিভিন্ন প্রকৃতির পিতা মাতার কন্যা। বাল্য হইতেই পিতা মাতার দোষগুণ ইহাঁর চরিত্রে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। প্রাক্তন বা অদৃষ্টের কথা বুঝিবার ও ভাবিবার ইচ্ছা বা অবসর না থাকিলেও অন্ততঃ এই কথাটীতে সন্দেহের কিছুই নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও একথা অস্বীকার করে না। লুকাস্ ও ডার-উইনের ন্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন, "In one part of the system the mother, in another the father predominates. Certain organ and faculties are derived fron the mother, others from the father and in others the parental influence may be equal." অর্থাৎ শরীরের এক অংশে মাতার অপরাংশে পিতৃশক্তি প্রবলা। সন্তানের কোন কোন ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি মাতার অনুরূপ, কোনটি বা পিতার অনুরূপ, কোন কোন স্থলে পিতৃমাতৃ শক্তির সমতা লক্ষিত হয়।

বালিকা শৈশবে পিতার নিকটই সর্ব্বদা থাকিত, পিতারই অধিক প্রিয় ছিল। প্যারাডাইজলষ্টের সয়তানের কথা-গুলি অভ্যাস করিয়া, সয়তান সাজিতে ভালবাসিত। ইহা প্রচ্ছন্ন পিতৃগুণের উন্মেষ বলিতে পারা যায়। পিতা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন—কন্যা ঈশ্বরের প্রতি-পক্ষে দুটা কথা বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

নিতান্ত বালিকা অবস্থাতেই এনির পিতৃবিয়োগ হইল। এনি মাতার নিকটই শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মাতৃস্বভাব ধীরে ধীরে তাহার সেই নিতান্ত চঞ্চল চরিত্র পরিবর্ত্তনে কতকটা সাহায্য করিল। একদিন মেরিয়ট নাম্নী একটী সদাশয়া রমণী এনির মাতার সংসার নির্ব্বাহের ক্লেশ দেখিয়া সাগ্রহে বালিকা এনির লালন পালন ভার গ্রহণ করিলেন; এনিকে আপনার বাটীতে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই রমণীর খ্রীষ্টধর্ম্মে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। বালি-কার কোমল হৃদয়ে তাঁহার সৎশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইল; ধর্ম্মালোচনায় বালিকার আস্থা জন্মিল; ধর্ম্মপিপাসা প্রবল

হইল। কিন্তু শিক্ষা সংঘর্ষে সংস্কার বশে ধর্ম্মমত মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মালোচনা চলিতেছে মাত্র, কিছুই স্থির নিশ্চয় হয় নাই; কেবল একটী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, আলোচনা চলিয়াছে, অশান্তি রহিয়াছে।

এইরূপে কিছুকাল চলিল। ঊন-বিংশতি বৎসর বয়সে ফ্রাঙ্ক বেসাণ্ট নামে একজন ধর্ম্মযাজকের সহিত এনির বিবাহ হইল। পুত্র কন্যা জন্মিল। কন্যাটির অতি শৈশবেই কঠিন পীড়ায় প্রাণ সঙ্কট হইল। বিবি বেসাণ্ট কন্যার কাতরতায় হয়ত ভগবানের নাম লইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সেই ননীর পুতলীর অসহ্য যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। পরমেশ্বরের করুণায় তাঁহার অবিশ্বাস হইল। জগতের একজন করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষ যে এই অক্ষম শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণা চক্ষে দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, বিবি বেসাণ্টের তাহা কোন মতেই বিশ্বাস হইল না। বিবি বেসাণ্ট নাস্তিক হইলেন, নাস্তিকতা প্রচার করিলেন। ভগবানের নামে আস্থা বল, অবিশ্বাস বল, অনুরাগ বল, সকলই মানবজীবনের অনন্ত সাধন পথের এক একটী স্তর। একটী হইতে অপরটীতে উঠিতে পড়িতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসও নাস্তিকতার কারণ হয় আবার নাস্তিকতাও এইরূপ ঈশ্বর প্রেমের সোপান হইয়া উঠে; বিবি বেসাণ্ট নাস্তিক হইলেন। ঘরে বাহিরে নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্বোপার্জ্জিত দম্পতী প্রেমে আঘাত লাগিল, মোকদ্দমা বাধিল। ধর্ম্মাধিকরণের সমাজসম্মত বিচারে পতিপত্নী সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। পতিপত্নীর জীবনে মরণে প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ এ শিক্ষা কিছু বিলাতি নহে। সেখানকার বিবাহ উভয়ের একটা সুবিধা, একটী পিপাসার নিবৃত্তি।

বিবি বেসাণ্ট নিজের সুখের জন্য স্বামীত্যাগিনী নহেন। জীবনের সুখময় বসন্ত ভোগবিলাসে কাটাইয়া জীবন সার্থক করিব, বিবির মনে একথা উঠে নাই। সংসারে অতৃপ্তি, শূন্য-প্রাণের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার জীবন বিষম অশান্তিময় হইয়াছিল। তখন তাঁহার ঈশ্বরে একেবারেই বিশ্বাস নাই, খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রন্থ প্রলাপোক্তি বলিয়া বিশ্বাস। তিনি স্বামীসোহাগেও সোহাগিনী নহেন; অধিক অর্থ থাকিলে লোকে যে একরূপ মাতিয়া থাকে, সে মায়াতেও তিনি মোহিত নহেন।

বিবির শূন্য প্রায় নিরাশ্রয় প্রাণ অবলম্বন খুঁজিতেছিল। দরিদ্র হৃদয় দরিদ্রের দুঃখে আকৃষ্ট হইল, ক্ষুধিত-মণ্ডলীর মধ্যে পাদরীর শুষ্ক প্রেমধর্ম্ম প্রচার তাঁহার ভাল লাগিল না। বিলাতের বিষম বিলাস বিভবের মধ্যে শ্রমজীবীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁহার চক্ষুশূল হইল। ঘটনাচক্রে তাঁহার লক্ষ্যহীন জীবন এক নূতন পথ দেখাইল—সম্মুখে বিস্তীর্ণ কার্য্য ক্ষেত্র। ক্ষুধিতের অন্ন সংস্থান, দরিদ্রের সাহায্য, শ্রমজীবীর সুবিধা সম্পাদন তাঁহার লক্ষ্য হইল। দেখিলেন, লোকের প্রকৃত অভাব দূর করায় মহাসুখ—দরিদ্রের অশ্রুধারা মুছাইলে অপার আনন্দ। যদি ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে, ধর্ম্ম যদি সুখের হয়—তবে এই পরোপকার—দরিদ্র আতুরের অভাব দূর, সমাজ সেবাই ধর্ম্ম। এইরূপ একটী ধর্ম্ম

প্রবৃত্তির ঈষৎ স্ফুরণ ও রসাস্বাদ করিয়াই এনি তাহাকে সমগ্র ধর্ম্ম স্থির করিলেন। একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া যথাসাধ্য পরিশ্রমে কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইলেন। ব্রত ধারণ করিলে সুধু কথায় বা চিন্তায় ব্রত পালন হয় না। যেথানেই ব্রত পালন—সেইখানেই কায়মনোবাক্যে আচার অনুষ্ঠান। দরিদ্র নিবাসে, পাপীপুরে, শ্রমজীবীর শ্রমশালায় তাঁহার কার্য্য স্থান। দেশের প্রত্যেক স্থানে তাঁহার অন্তরের আবেগের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস। প্রাণের উচ্ছ্বাসে অনেকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মহামতি ব্রাডলার সহচারিনী হইয়া ইনি শ্রমজীবীদিগের সুবিধার জন্য দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। পার্লেমেণ্ট সভা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না। শ্রমজীবী আইনের কঠোর ধারাগুলি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইল।

এইরূপে রমণীর হৃদয়ে পুরুষের কার্য্য-প্রিয়তা যোগদিল। বিবির অসাধারণ বাগ্মিতা, প্রতিভা, পরিশ্রমপটুতা সাধারণের হৃদয় অধিকার করিল। তখন কর্ম্ম যে ধর্ম্ম নহে, এ কথা মুখে অস্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকে অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইত। সে যাহা হউক, তিনি তখন শ্রমজীবীদিগের সহায়তায় দরিদ্রেরপক্ষ অবলম্বনে প্রভূত শক্তিশালিনী। কিন্তু জন্মান্তরের কথা, কর্ম্মফল অনুসারে জীবের সুখ দুঃখের কথা, তখনও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কেবল চেষ্টা করিয়াই সংসারের দুঃখ দূর করিব, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। সংসারের সকল দুঃখ দূর করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইলেও, সাধারণে যদি তাঁহার মতানুসরণ করে, তাহা হইলেও অনেক দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইতে পারে মনে করিয়া বিবি এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, যাহাতে স্ত্রী পুরুষ একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সহবাস করে, পুস্তকে তাহাই প্রচার করিলেন। সেই পুস্তকে এমন কথা ছিল, যাহার জন্য বিবিকে কারাবাস করিতে হয়। যথাকালে কারাবাস ফুরাইল কিন্তু অশান্তি জাগিয়া রহিল। ধর্ম্মের আংশিক সেবায় তাঁহার কিছুদিন মত্ততা জন্মিয়াছিল মাত্র ; প্রাণের পিপাসা তাহাতে মিটিবে কেন? তাঁহার সাম্যবাদ ও সমাজ সেবার আলোচনায় বিলাতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণও বিমোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি নাস্তিক ; আপনার বিদ্যা বুদ্ধিবলে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসিনী, ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন।

এই সময়ে দেশ বিদেশে ভারতের যোগ ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যার কিঞ্চিৎ আভাস ইংরাজী ছাঁচে গঠিত হইয়া থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হইতেছিল। কর্ণেল অলকট তাঁহাদের নেতা, ব্লাভাটস্কী নামে একজন রুষরমণী এই সম্প্রদায়ের প্রধানা। থিয়সফি ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রচারের জন্য ইনি কয়েক খানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে Secret Doctrine নামে পুস্তক খানি সমালোচনার জন্য বিখ্যাত "রিভিউ অব রিভিউস" পত্রিকার সম্পাদক ষ্টেড সাহেবের হস্তগত হয়। বিবি বেসাণ্টকেই তিনি এই পুস্তক সমালোচনার ভারার্পণ করেন। বিবি সমালোচনার জন্য পুস্তক পাঠ করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে

লাগিল। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির মহীয়সী মহিমায় তাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইল। তিনি থিয়সফি ধর্ম্মের পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন; পড়িয়া বিমোহিতা হইলেন। সে আলোকে নাস্তিকতা কোথায় পলাইল।

থিয়সফি ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে বিদুষী বেসাণ্ট আরও দেখিলেন, হিন্দু ধর্ম্মের অনেক কথা ইহাতে আছে। ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অসীম অনুরাগ জন্মিল। হিন্দুর আচার ব্যবহার সমাজনীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বুঝিলেন, আরও বুঝিলেন, অমানুষ শক্তিসম্পন্ন ঋষি মুনি মহাত্মাগণ ইহার প্রবর্ত্তক। হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতার সাধন নহে, উপহাসের ধর্ম্ম নহে;—ইহাতে যাহা নাই তাহা অন্য ধর্ম্মে নাই। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমত, ইহা হইতেই গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে; ভবিষ্যতে ভারতেই তাহার পুনর্ব্বিকাশ হইবে। বিবি উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগে আরও বলিয়াছেন, "জন্মান্তরের কর্ম্মফলে আমি ম্লেচ্ছদেশে জন্মিয়াছি। আর হিন্দু সন্তান—জগতের মাতৃস্বরূপিণী পবিত্র ভূমির অধঃপতিত সন্তান—পূর্ব্বপুরুষদিগের পবিত্র কাহিনী ভুলিও না—বিলাসবিষে সর্ব্বনাশ সাধন করিও না—কাতরপ্রাণে করুণাময়ী জগজ্জননীর উপাসনা কর—মহাত্মাদিগের পথানুসরণ কর—তাঁহাদের পবিত্র-স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া বিষম আঁধারে সুপথ চিনিয়া লও।"

সমীরণ ! ধীরে ধীরে বও !

সমীরণ ! ধীরে ধীরে বও !
বিজন ফুলের বাস যতনে বিলাও !
মৃদুল মৃদুল গতি,
জীবন প্রবাহে মতি,
মৃদুল হিল্লোলে ধীরে পরাণ মাতাও !
তুমি বন ফুল বঁধু,
লুটিয়ে সুমিষ্ট মধু,
সযতনে পিয়াসীরে সে সুধা পিয়াও !
মধুর মধুর গানে,
মধুর মধুর তানে,
ধীরে এসে, প্রাণে পসে সে গান শুনাও !
শিশিরে আবরি কায়,
বিচর নিখিল গায়,
স্নিগ্ধ সমীরণ সম চিরদিন রও !
চির-রম্য-উষা সনে,
চির পুলকিত প্রাণে,
চির সুশীতলরূপে জীবন জুড়াও !
সুধীর কোমল কায়,
ধীর ধীর গতি তায়,
ধীরে ধীরে চলে যাও হয়োনা উধাও !
ছিঁড়োনা, যোগীর জটা,
গগণের ঘন ঘটা,
ফেলনা রাজার তাজ ধীরে চলে যাও !
চির-রম্য-উষা সনে,
চির পুলকিত প্রাণে,
চির সুশীতলরূপে জীবন জুড়াও !

শ্রীমত্যা ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। *

১। ধর্ম্মেই হিন্দুজাতির গৌরব।

ভারতের সুখসূর্য্য আজ ডুবিয়া গিয়াছে। আজ অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ বিদেশীয় জাতির দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছে। কত জাতি ভারতের প্রভু হইল, কত জাতি প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইল; ভারতের স্বাধীনতা আর ফিরিয়া আসিল না। এখন পরাধীনতাই ভারতের স্বাভাবিক অবস্থা—প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন রোগী যেমন গা-মোড়া দিতেও পরিশ্রম বোধ করে, সেইরূপ ভারতবর্ষ আজ কঠোর পরাধীনতার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া এক পা উঠাইতেও যেন কষ্ট অনুভব করে।

কিন্তু ভারতবর্ষ এত যে পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আজিও ইহার জীবনীশক্তি বিনষ্ট হয় নাই। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে হিন্দু-ভারতের কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য কত-না প্রয়াস পাইয়াছিল; কত হিন্দু অকারণে মূর্ত্তিপূজার অপরাধে ভগবৎ পদ স্মরণ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল। ক্রমে মুসলমান সাম্রাজ্য কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং সুদূরস্থিত ইংলণ্ডদ্বীপনিবাসী প্রবলপরাক্রম ইংরাজ জাতির রাজত্ব আসিল। এই সুসভ্য খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার কত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এদিকে আবার গবর্ণমেণ্টের নানাপ্রকার সাহায্যে পরিপুষ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। এত কষ্ট, এত নির্যাতন, এত বিপদের মধ্যে থাকিয়াও ভারতীয় আর্য্যবংশ আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। অবস্থা অনুকূল হইলে কে জানে যে, আর্য্য হিন্দুদিগকে পুনরায় পূর্ব্বমহিমায় জাগ্রত দেখিতে পাইব না? আর্য্যভারতের পবিত্র আর্য্যভাব কখনও সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই এবং কখনও সম্পূর্ণ চলিয়া যাইবেও না। যতদিন বেদ উপনিষৎ থাকিবে, যতদিন রামায়ণ মহাভারত থাকিবে, ততদিন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যত্ব কখনই চলিয়া যাইতে পারিবে না। এই আর্য্যত্ব রক্ষা হেতু হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

এইরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হওয়াতে হিন্দুজাতির একটী বিশেষত্ব দাঁড়াইয়াছে। যেমন কোন বংশ বংশপরম্পরায় একটী ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সেই ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপ একটী জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইলে সেই

* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন, বঙ্গদেশে গীতার বহুল প্রচার হইলেও আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি এখানি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে। এই অভিনব সংস্করণ সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত অনুবাদক মহাশয় বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ অনুবাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদক। এই প্রবন্ধটী উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।—সং

জাতির সহজাত বিশেষ ভাব পরিস্ফুট হওয়াও স্বাভাবিক। কাশ্মীরের শালের কথা কে বা না জানে আর হিন্দুজাতির ধর্ম্মপ্রাণতার কথাই বা কে না জানে? এইরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পৃথিবীর মধ্যে অপর কোন জাতিই সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন রোমকগণ এখন কোথায়? কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পার্ব্বতীয় জাতি সহসা আসিয়া রোমরাজ্য অধিকার করিল; ক্রমে রোমকজাতি আপনাদিগের বিশেষত্ব হারাইয়া কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। প্রাচীন গ্রীকজাতি, তাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের আচার ব্যবহার এখন কোথায়? প্রাচীন পারসীকগণ, তাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের আচার ব্যবহার এখন কোথায়? সে সকলই আজ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের এরূপ ঘোরতর বৈষম্য ঘটিবার কারণ কি? উহার উত্তর একটী কথায় দেওয়া যাইতে পারে—ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মও ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন,। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" এই মহাবাক্য কখনও মিথ্যা হয় নাই এবং হইবে না। রোমক প্রভৃতি অন্যান্য জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা পার্থিব বিষয় লালসাতেই হৃদয় পরিপূর্ণ রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মকে লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিষয়সাধনা করিয়া আইন, পদার্থ বিজ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি লাভ করিলেন। ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ মুনিঋষিগণ বিষয়লালসা সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া, গিরিকন্দর, নদীতীর গভীর অরণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির সুরচিত নির্জ্জনতম প্রদেশে আত্মসংগোপন করিয়া অননামনে ব্রহ্মসাধন করিয়া অনুপম ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মই এই সুবৃহৎ হিন্দুজাতিকে জীবিত রাখিতে পারিয়াছে। আমি ইহা বলিতে চাহি না যে, আমাদের পদার্থবিজ্ঞান বা শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি ছিল না। এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন্ দেশে সংখ্যাগণনার সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল? এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন্ দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবির্ভাব ও উন্নতি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল? কিন্তু এই সকল পার্থিব বিদ্যাকে ঋষিরা নিম্ন পদবী দিয়া একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

এই ধর্ম্মরক্ষা করিবার প্রাণগত চেষ্টা থাকাতেই হিন্দুজাতির যশঃসৌরভ দেশ বিদেশে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে ১। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার জন্য হিন্দুজাতিকে প্রশংসা করেন। তাঁহারা কেবলমাত্র হিন্দুজাতিকেই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; যে সকল শাস্ত্রের কল্যাণে হিন্দুজাতি ধর্ম্মভাবকে এইরূপ পরিপুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই সকল হিন্দুশাস্ত্রকেও তাহারা কণ্ঠের ভূষণ,

১। এই ধর্ম্মরক্ষার ভাব থাকাতে হিন্দু কয়েদীদিগেরও মুখে অন্য জাতীয় কয়েদীগণের অপেক্ষা শ্রী ও সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চার্লস্ ডার্ব্বিনও ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি পোর্টলুই সহরে (আণ্ডামান দ্বীপে) হিন্দু কয়েদীগণের শ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহারা "Were such noble-looking persons," তিনি আরও লিখিয়াছেন "These men are generally quiet and well-conducted;

শান্তি-বারি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত জর্ম্মনি দেশীয় দার্শনিক সোপেনহোর (Schopenhauer) বলেন যে, উপনিষদ্ সমূহ তাঁহার ইহজীবনে শান্তিদান করিয়াছে এবং পরকালেও শান্তিদান করিবে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানকালে হিন্দুজাতি এমনই আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া বসিয়াছেন যে, যতক্ষণ না পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের অমূল্য শাস্ত্র সকলকে ভাল বলিবেন, ততক্ষণ তাঁহারা তাঁহাদিগের শাস্ত্রের প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও যেন লজ্জা বোধ করেন; পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কথা পাইলে, তবে তাঁহারা শাস্ত্রের ভিতরে অন্ততঃ একবার চক্ষু বুলাইলেও বুলাইতে পারেন! আমাদিগের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু কোন কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের উপর বীতরাগ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি একবার ইংলণ্ডে গিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর তাঁহাকে বলিলেন 'তোমরা আমাদিগকে ইংরাজীতে কি শিখাইবে? যদি কিছু শিখাইতে পার, তাহা একমাত্র উপনিষদাদির ব্রহ্মজ্ঞান'। তাহার পরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া কোন বিশেষ অবসরে বলিলেন "জর্ম্মনি, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি যে দেশে গিয়া তুমি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে, অমনি তাহারা তোমাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিবে। এ নমস্কার তোমাকে নয়, হিন্দু বলিয়া তোমার জাতীয় ধর্ম্মকে।" প্রকৃতই ঋষিদিগের সাধনফলে, আজি পর্য্যন্ত এই হিন্দুজাতির শাস্ত্রগ্রন্থ সকল কেবল হিন্দুজাতিকে নহে, সমুদয় সভ্য জগতকে ধর্ম্মের সুবিমল আলোক প্রদান করিয়া মোক্ষপথের পথিক করিতেছে।

২। ভগবদ্গীতার প্রভাব।

হিন্দুজাতির হৃদয়ে ধর্ম্মভাব যে আলেয়ার ন্যায় এক ক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং পরক্ষণে নিভিয়া গিয়াছিল, তাহা নহে। এই ধর্ম্মভাব বেদরূপ গোমুখী হইতে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিয়া হিন্দুহৃদয় শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাভারতান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থরূপ উৎস হইতে শাখানদী সকল প্রবাহিত হইয়া এই গঙ্গাস্রোতকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র হইতে একই প্রতিধ্বনি দিবানিশি উত্থিত হইতেছে "যেনাহং নাহমৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা অমৃত স্বরূপের সহবাস লাভ করিয়া অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এই উদাস-উদার গান হিন্দুর হৃদয়তন্ত্রীতে আবহমান কাল ঝঙ্কার দিয়া আসিতেছে। এখন আয়ুর স্বল্পতা প্রযুক্তই হউক, অথবা বুঝিবার কষ্টতা প্রযুক্তই হউক, বেদাদি শাস্ত্রের সমগ্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারত হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। তথাপি ব্যাসদেবের ন্যায় ঋষিদিগের কৃপায় হিন্দুর হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হইতে পারে

---

from their outward conduct, their cleanliness and faithful observance of their strange religious rites, it is impossible to look at them with the same eyes as on our wretched convicts in New South Wales." (A Naturalist's Voyage Round the World, P. 484.)

নাই। ফলত মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে একমাত্র ভগবদ্গীতাই প্রায় তিন চারি হাজার বৎসর ভারতে সমগ্র হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষ-ভাবে পবিত্র ধর্ম্মস্রোত অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। আনন্দের বিষয় যে, আজিও অধিকাংশ হিন্দুগৃহে গীতাপাঠ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৩। গীতার আরম্ভ।

ভগবদ্গীতা মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। বৃহৎ হীরকখণ্ড যেমন শুভ্র মুক্তামালার শোভাবর্দ্ধন করে, সেইরূপ ভগবদ্গীতা মহাভারতের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। গীতাকার যেমন দার্শনিক তেমনি সুকবিও ছিলেন। কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি গীতোক্ত উপদেশ দিবার অতি সুন্দর অব-সর বাহির করিয়াছে। এইরূপ অবসর বাহির করাই আমরা কবিত্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। কি অবসরে এই গীতোক্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা গীতার প্রথমাধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের দিন সমুপস্থিত। অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু হস্তে করিয়া রথে আরোহণ করিলেন—কৃষ্ণ তাঁহার সারথি হইলেন। কিছুদূরে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে। কৌরব সেনাগণ ভীষ্মের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন "আমাকে ঐ সেনাদলের মধ্যে লইয়া চল—আমি দেখিতে ইচ্ছা করি যে কাহাদিগের সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবকে উপস্থিত দেখিয়া নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যলাভ করিলে কি তিনি সুখী হইতে পারি-বেন—কখনই না। তখন তিনি অতি কাতরভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে কৃষ্ণ! স্বজনকে বধ করিয়া আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব? আমরা রাজ্য সুখের লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; যদি আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া কৌরবগণ শস্ত্রদ্বারা বধও করে, তাহাও আমি মঙ্গল-জনক বিবেচনা করি।" এইরূপ কাতর বাক্য সকল বলিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। এই উপ-যুক্ত অবসরে কৃষ্ণ তাঁহার অতুলনীয় উপ-দেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

গীতার ন্যায় গভীর উপদেশ দিবার অবসর জীবনমরণের এই ভীষণ সন্ধিস্থল ব্যতীত আর কখন্ হইবে? এই উপ-দেশের পরে অষ্টাদশ দিবসে ভারতের বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়বীর ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরশয্যায় শয়ন করিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় লোহিতবর্ণে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। গীতাব এই প্রারম্ভ-ভাগে কবি অর্জ্জুনের বিষাদকথা, মর্ম্ম-ব্যথা এরূপ সরল ভাষায় ও অল্প কথায় এত সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আজ তিন চারি হাজার বৎসর পরেও যখনই তাহা পাঠ করি, তখনই সেই মহাযুদ্ধের ভীষণভাব হৃদয়ঙ্গম করি এবং তখনই অর্জ্জুনের সুগভীর সকরুণভাব আমাদের মর্ম্মদেশকে স্পর্শ করে।

মাথুর।

বৃন্দাবন বিপিন মাঝে,
শ্যামল তমাল শাথে,
আমি শিথায়েছি শ্যাম বিহগেরে বঁধু!
যেন "হরি" "হরি" বলে ডাকে!
(ঐ নাম বঁধুত পার না নিতে)
যাও যাও বঁধু! সুখ মধুপুরী
বিষাদে কেন বা হেথা,
এত ভালবাসা না বুঝিলে যদি
শুনাব না হৃদিব্যথা!
(তোমার সুখের মুখ আঁধার হবে)
ঐ ফুল্ল নলিন নয়ন দুটী,
মলিন কি সহে প্রাণে,
স'ব আর উপহাস, আর শত জ্বালা
তবু দিব না কাঁদিতে প্রাণে!
{ এই সবটুকু প্রাণ তোমার তরে
{ ঐ ননদিনী বাদ সাধুক হে!
নিঝুম যামে দিবস নিশীথে,
নিরালা তমাল ছায়ে,
ঐ পদচীনা ধরি, লুটায়ে কাঁদিব,
উড়িবে চিকুর বায়ে!
(বঁধু যবে চলে যাবে হে)
তোমার নয়নের মত নলিন বলিয়া,
আনিব তাহারে তুলি,
তারে কোলেতে করিব, হৃদয়ে ধরিব
শুনিব আকুল অলি!
{ গুণ গুণ করে তোমার গুণ গাবেহে!
{ বঁধু! গুণ গুণ স্বরে প্রেমের গুণ গাবেহে!
দেখবো সব দেহ দিয়া, ও নয়ন ছায়া,
প্রাণ ভরিয়ে নলিনে,
(বঁধু শুধু চোখের দেখায় সাধ মিটে না)
ও রূপ দেখিতে দেখিতে ডুবিতে থাকিব,
মোহন পীরিত স্বপনে!
{ বঁধু প্রেমের কুল কে পেয়েছে?
{ ঐ ভালবেসে কার সাধ মিটেছে?
অমনি তমালের ডালে,
হরি হরি হরি বলে,
ডাকবে সাধের শ্যামা পাখী,
ও নাম গাহিব শুনিব, তোমাময় হব
বিরহবেদন মাথি!
(বঁধু না কেঁদে কে পায় হে তোমা)
তোমারে না হেরি, নিরাশ হৃদয়ে,
ফিরিয়ে সারাটি কাননে,
তোমার নাম লেখা বনলতা,
ঘুমাব মোহন মরণে!
(আমার সাধের মরণ দেখে যেও হে!

ফুলরা।

৩য় অধ্যায়।

১

প্রবাল কপোলা ঊষা, হাসে রাগ ভরে,
মিহির মুকুটা নিজ ছবি বিলোকনে;
নিরমল মুকুরে তুষারে গিরিপরে,
জাগিল সুষুপ্ত জীবগণে।

২

শিখাইতে নগরের ধনীসুত গণে,
চিত্র বিদ্যালয় আছে, শ্রীপুর বাজার
পুরস্কার পাবে তথা কৃত বিদ্য জনে,
আজ তার দিন পরীক্ষার।

৩

অট্টালিকা বিশাল জনতা অতি তায়;
গুরু ছাত্র সমাগত দর্শক সকল,
প্রবেশিল সে আগার প্রাচীরে যথায়
লম্বিত চিত্রিত পটদল।

৪

চিত্র করিয়াছে কেহ ক্ষীরোদ মন্থন
বাসুকীর বজ্রদণ্ড মন্দর শিখর,
নীর ভেদি উঠিতেছে নীরদ বরণ
ঐরাবত চতুর্দ্দন্ত ধর।

৫

চিত্রিয়াছে কেহবা বরাহ অবতার;
একার্ণব মাঝে ভীম কায় বিভাসিত
ধবল রদনে শ্যাম শরীর ধরার
অকলঙ্ক শশাঙ্ক অঙ্কিত।

৬

কোন পটে জটায়ু রাবণে শূন্যে রণ,
রণোপরে নিপতিতা সীতা মূর্চ্ছাভরে;
বিহগের ভয়ঙ্কর ব্যাদিতা বদন;
ভীম অগ্নি নিশাচর শরে।

৭

শ্রীরাধার অভিসার, কালীয় দমন;
দুষ্ট কংস নাশন, দ্রৌপদী স্বয়ম্বর,
সত্যভামার দর্প চূর্ণ, সুভদ্রা হরণ
কত পট চিত্রিত সুন্দর।

৮

নগর, কানন, বন, ভূধর, সাগর,
দিবা, নিশা, ঊষা, সন্ধ্যা ঋতুর বর্ত্তন
পৃথক পৃথক্ পটে লক্ষিত সুন্দর
প্রকৃতির পৃথক্ লক্ষণ।

৯

প্রতি পটে দোষ গুণ উল্লেখ করিয়া,
একে একে নিরখিয়া যায় গুণিগণে;
হেরিল কামিনী এক প্রান্তভাগে গিয়া
সমাসীনা পটের আসনে;

১০

সহাস সে মৌনাননে মৌনাননে চায়;
চিত্র পটতলে সবে চিত্রিতের প্রায়,
কথা কবে ভেবে কেহ আঁখি না ফিরায়
সবে ভাবে আমাপানে চায়;

১১

ফুল অঙ্গে ফুল অলঙ্কার শোভা পায়,
মধু হাসি ঝরে কিবা ফুল্ল ফুল মুখে,
কপোলে অলকা দুটী দুলে অলিকায়
প্রাণে ক্ষোভ প্রাণ নাহি সুখে।

১২

বলিবে কি দোষ গুণ ভাবিয়া না পায়,
এক মতে গুণিগণে ব্যাখ্যে বারম্বার,
কাহার এ পট লেখা সকলে সুধায়;
মনিরাজ কহিল "আমার"।

১৩

পুরস্কার পায় যুবা মুকুতার হার
সহ ছাত্রগণে সবে ঈর্ষাভাবে চায় ;
কিন্তু নয় ফুল্ল মুখ যুবার পিতার;
ফুলরা ! কি চিনেছ তোমায় ?

১৪

ভাবে হেন নারী যেন দেখেছে কোথায়,
দেখিবে বণিক পতি বাধা কিবা তায় ;
কেবা না দেখেছে ফুল-বাজারে যে যায়
ফুল্ল ফুলকান্তি ফুলবার।

১৫

সন্ধান বণিক পতি সন্দিহানে লয়,
জানিল পুত্রের গুপ্ত প্রেমের স্বভাব ;
ভাল, কেন পুত্রে না দিলাম পরিণয়,
ডুবাইল সম্ভ্রম আমার।

১৬

পরিণয়ে হতো যদি প্রেম নিবারিত
কত দুখ কত সুখ হারাতো সংসার ;
হাতে হাত বেন্ধে যেন দিল পুরোহিত
মনে মন বাঁধে সাধ্য কার !

১৭

প্রজাপতি প্রজা চায়; প্রেম চায় মন,
একত্রে উভয়ে হয় কদাচ মিলিত ;
সংসার স্থিতিতে প্রজাপতির যতন
স্বর্গসুখে প্রেম লালায়িত।

১৮

যদ্যপি মিলন হয় কখন দোঁহার
কোন ভাগ্যধরের পূর্ব্বের পুণ্যফলে ;
তথাপি না ছাড়ে তারে কুটীল সংসার
পত্নি প্রেমে স্ত্রৈণ তারে বলে।

১৯

মনিরাজ ! ব্যক্ত হলো গুপ্ত বিবরণ,
শীত পক্ষে যেমন শশীর বৃদ্ধি হয় ;
প্রেমের প্রকাশ হলে জানিবে তখন,
কৃষ্ণপক্ষ হ্রাসের সময়।

২০

সুরম্য হীরক রয় খনি আবরণে,
রম্য মুক্তা গুপ্ত সিন্ধুতলে সন্নিহিত,
রম্য ফুলকুল জন্মে গোপনে কাননে,
রম্য প্রেমে কেন বিপরীত ?

২১

বাড়ে হীরকের ভাতি নরের শীলনে ;
মুকুতা মুকুর বিভা আরো বাড়ে তায়,
বৃদ্ধি পায় ফুল-কুল উদ্যানে যতনে
মরে প্রেম নরের চর্চ্চায়।

২২

চতুর বণিক পতি ভাবিয়া না পায়,
সুতের কুমতি কিসে করে নিবারণ,
প্রকাশ বারণে মাত্র বাসনা বাড়ায়
সেতু বোধে, প্রবাহ যেমন।

২৩

এক দিন পুত্রে বলে মধুর বচন,
"উচিত শিখিতে বাপু নিজ ব্যবসায়,
দক্ষিণ দেশেতে আমি বাণিজ্য কারণে
বাঞ্ছা করি পাঠাতে তোমায়।

২৪

মম পুত্র পরিচয়ে তোমার তথায়
প্রধান প্রধান লোকে করিবে আদর,
অনুরোধ পত্র আমি লিখি দিব তায়,
বর্ষেকে আসবে পুন ঘর"।

২৫

মনিবাজ শিরোপরে খসিল আকাশ,
বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রাণ যেন সবে পলায়িত,
স্তম্ভিত শোণিত, না নাশায় পায় শ্বাস
কহে "যেতে হবে কি ত্বরিত" ?

২৬

"মদন উৎসব তথা চৈত্র মাসে হয়"
চাহি পুত্রে ম্লান মুখে ক'হল উত্তরে
"ক্রয় বিক্রয়ের সেই উত্তম সময়
তাই কহি যাইতে সত্বরে।

২৭

আগামী পরশ্ব প্রাতে সময় যাত্রার
স্থির করিয়াছি আমি পঞ্জিকা দেখিয়া,
পণ্য দ্রব্য গৃহে আছে প্রস্তুত আমার,
যাও তব মনোমত নিয়া”

২৮

রাষ্ট্র হবে জনকে করিলে অস্বীকার,
স্বীকার করিলে প্রাণ বাঁচিবে কি আর ?
চির ক্ষোভ চিরসঙ্গ না পাইয়া যার
এ চির বিরহ প্রেমে তার।

২৯

জ্ঞানী রোগী যাতনায় দেখে প্রতিক্ষণে
যাতনা ঘুচাতে মৃত্যু অগ্রসর তার ;
প্রতিক্ষণে দেখে প্রেমী প্রবাস গমনে,
অগ্রসর মৃত্যু যাতনার

৩০

যার সনে মিলনে হৃদির হার হায়
প্রতিবোধ বোধে হ'ত করিতে মোচন
তার মাঝে ব্যবধান বিরহ দশায়
গিরী, নদ, পর্ব্বত—কানন।

৩১

যে ঠেকেছে সে বুঝেছে, বিচ্ছেদ কেমন,
কি ক্লেশ জনতা মাঝে একা অবস্থান,
লোকলজ্জা ভয়ে হয় হাসাতে বদন,
কাঁটাবন সংসার উদ্যান।

৩২

এক রবি শশী এক আকাশের তলে,
পূর্ব্বমত আছি বেঁচে দুজন এখন ;
এক রবি শশী দেখে ভেবে প্রাণ জ্বলে
দেখা নাই দুজনে দুজন !

৩৩

নিদ্রা জাগরণে সম যাতনা কেবল,
আঁখি বর্ষে হৃদি তবু দহে অনিবার,
প্রণয় ! যদিও তুমি কাঞ্চন শৃঙ্খল,
তবু দুখ বন্ধনে তোমার।

৩৪

বিরক্তি-প্রণয়ী শোক কর পরিহার,
প্রবোধ উপায় তব রয়েছে রচিত
মণি মানি শিরে পদ্ম পরে কাঁটা তার
সুখ শশী মসি-বিলেপিত।

৩৫

চিরকাল বসন্ত না রয় এ ধরায়,
আলোকের যোগ সদা ছায়ার সহিত,
সুখ মৃগ স্থির হেথা থাকিতে না পায়,
বিষাদ নিষাদ বিতাড়িত।

৩৬

জানা কথা ধরণী আপনি স্থির নয়,
অভ্যাসের স্থান মাত্র নয় পূর্ণতার,
যতনে অভ্যাস কর শিক্ষার সময়,
পাবে পরে প্রেম পুরস্কার।

৩৭

পাত্র বুঝে প্রেম যদি করিতে পারিতে,
বিরহ যন্ত্রনা তবে ঘটিত না আর,
পর্ব্বত, কানন, সিন্ধু যেখানে থাকিতে
প্রিয়মুখ দেখিতে তোমার।

৩৮

রূপ চাও, সেরূপ বা রূপ আছে কার ?
অতুলনা রূপ আমি বুঝাব কেমনে ?
ত্রুটী চাই প্রেমে তার এই দোষ তার
প্রেমতার আছে সব জনে।

৩৯

ত্রুটীহীন প্রভাকর সম্ভ্রম ভাজন,
কলঙ্কে ত্রুটীর শশী প্রেমের আধার,
ত্রুটীহীন পিতা পূজ্য ত্রুটীর কারণ,
প্রিয়পুত্রে চুম্বি বারবার।

৪০

আশায় অসুর কার্য্যে কীটের সমান,
অতি দীর্ঘ দরশন অতি ক্ষুদ্র কর,
ধরা ভিন্ন তোমার না থাকে যদি স্থান,
অতি দুখী জীব তুমি, নর !

৪১

বিনগ বুভুক্ষু প্রাণী অশন বসন,
বিনা শ্রমে প্রকৃতি না দিতে চায় যার।
সদা সুখী হতে সদা চায় তার মন,
জটিল করুণা বিধাতার।

৪২

তৃণাঙ্কুর খায় মৃগ কাননে বিহরে,
খেচর চরিয়া নীড়ে সুখে নিদ্রা যায়।
দৈবে সুখী হলেও না সুখী হয় নরে,
বিকল রে ভাবী ভাবনায়

৪৩

মৃগ পাখী খায়, পিয়ে, বিনা সাবধানে ?
প্রকৃতি জননী কেন পক্ষপাতী নরে ?
রাখিলে আপন অঙ্কে সকল সন্তানে
তারে দিলে ধী ধাত্রীর করে !

৪৪

যদি সে আয়াসে পায় কখন আহার,
ধাত্রী কি আহার দেয় মাতৃ মমতায় ?
কুটিল কৌতুকী এক "কাল" নাম তার
হাত হতে কেড়ে নিয়ে যায়।

৪৫

ঘর বান্ধা বউ বিয়া ছেলে খেলা আর,
বৈরি হয় সে আসিয়া যা খেলিতে যাই
ধী ধাত্রী কিছুই না করিতে পারে তার,
কেঁদে মাত্র যাতনা জুড়াই।

৪৬

ডরে তারে আমা হ'তে বড় শিশু দলে,
করে দণ্ড ধরে যারা শক্তি দেখাইতে ;
পীড়ন যেখানে তার নাই সেই স্থলে
তাই আমি চাই পলাইতে

(ক্রমশঃ)

মহারাজ রণজিৎ সিংহ।

প্রথম অধ্যায়।

রাজ্যলাভ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কতিপয় ব্যক্তি, তাঁহাদিগের অসাধারণ কার্য্য কলাপে নিম্নতর শ্রেণী হইতে বীরবন্দ্য সমাজের বরণীয় হইয়াছেন, অশিক্ষিত হইয়াও রাজনৈতিকদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যখন মোগলের গৌরবনাশ ঘটিয়াছে, রাজপুতের আশা ভরসা ফুরাইয়াছে, মহারাষ্ট্রের মহাপতন হইয়াছে, একে একে সকলেই ব্রিটিশসিংহের শরণাগত হইতেছে ; যখন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্র লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল, সেই সময় রণজিৎসিংহের আবির্ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে শিখজাতিরও অভ্যুত্থান হয়।

এই অভ্যুত্থান, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠা, একদিনে হয় নাই ; হইতেও পারে না। প্রায় সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর নগরের অদূরে নানক সাহেব আবির্ভাব হয়। ইহাঁর আবির্ভাবে পঞ্চনদ প্লাবিত দেশে ধর্ম্মের প্রবল স্রোত বহিতে থাকে ; ইহার পরিণাম নিরীহ-শিখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

কিন্তু বীরলীলা-ভূমি পঞ্চনদক্ষেত্রে এই শান্ত নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ শিখসম্প্রদায়

সমররঙ্গে মাতিল। মুসলমানদিগের অত্যাচারে স্থানীয় প্রকৃতিবশে নানকের শিষ্যমণ্ডলী ক্রমে একটী বীরজাতি হইয়া উঠিল। তখন দারুণ অত্যাচারের প্রতিকার সাধন, ধর্ম্মের একটী নূতন পথ দেখাইয়া দিল। সেই নূতন পথে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই নবসংগঠিত জাতি নবীন উৎসাহে গাহিল,

"হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি,
হাতে লয়ে'জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া,
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!"

শিখ সম্প্রদায়ের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে গুরুগোবিন্দ সিংহের আবির্ভাব হয়। গুরুগোবিন্দ সিংহ সেই বিশৃঙ্খল শিখ জাতিকে সংযত করিয়া গুরুমাতা নামে এক সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুপূজা নানকধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। গুরুগোবিন্দ সিংহ নানকের পরবর্ত্তী দশম গুরু। তাঁহার প্রতিভা ও যত্নে শিখজাতি সকলেই এই সভার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল। কিন্তু একটী সভা হইতে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না বুঝিতে পারিয়া গুরুগোবিন্দ সিংহ বারটি শাখ সভা স্থাপন করিলেন। এই এক একটী সভা, এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণ তন্ত্র, এক একটী মিসিল। এই মিসিলের সর্দ্দারগণ সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। ক্রমশঃ ইহা কুলক্রমাগত হইয়া পড়িল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ একটি মিসিলের সর্দ্দার ছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে পঞ্চনদের গুজরওয়ালা নামক এক স্থানে রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়, তাঁহার জনক মহাসিংহ অসমসাহসী ও রণকুশলী সর্দ্দার এবং জননী সম্ভ্রান্ত ঝিন্দবংশীয় ললনা ছিলেন। যখন রণজিৎ সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন, পঞ্চনদ তখন আত্মনিগ্রহে জর্জ্জরিত। কতিপয় পরাক্রমশালী সর্দ্দার, ক্ষীণ আফগানরাজের অধিকার বিরুদ্ধে পঞ্চনদ শাসন করিতেছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে কলহ ও বিবাদে, প্রজা সাধারণের শান্তি সুখ বিপন্ন করিয়া আপনাপন অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছিলেন। এই সর্দ্দারগণের মধ্যে ছত্রসিংহই বিশেষ ক্ষমতাশালী। ইনি রণজিতের পিতামহ। ছত্রসিংহ ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মহাসিংহ নামক একমাত্র শিশু সন্তান রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে মহাসিংহ এক অতি সুদক্ষ ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। আত্মনিগ্রহে প্রপীড়িত পঞ্চনদ ধৌত প্রদেশগুলির শোচনীয় অবস্থা, মহাসিংহের ন্যায় কার্য্যক্ষম ও সাহসী ব্যক্তির উন্নতি ও খ্যাতির পথ বিলক্ষণ প্রশস্ত করিয়াছিল। তাঁহার দীক্ষা ও বিপুল বীর্য্যবত্তার মহিমায় অনেকানেক সর্দ্দার তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। অন্যান্য সর্দ্দারগণ মহাসিংহের বিক্রমে কম্পিত হইলেন। তাঁহারা তখন বুঝিলেন, আত্মনিগ্রহের কি বিষম পরিণাম! কিন্তু সেই অধীনতার আশঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মহাসিংহ অকালে সপ্তবিংশতি মাত্র বয়ঃক্রমে রণজিৎ সিংহ নামক এক দ্বাদশ বর্ষের বালক রাখিয়া ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সর্দ্দারগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, মহাসিংহের মৃত্যুর পর

তাঁহার নাবালক পুত্রের শাসনকালে তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কিন্তু মহাসিংহের উপযুক্ত পুত্রের বর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রভাব দূরে থাকুক, তাঁহাদের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত ঘোরতররূপে বিপন্ন হইল। রণজিতের নাবালকত্বকালীন তাঁহার পিতার দেওয়ান লখপৎ সিংহ, তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যের অভিভাবক হইলেন। রণজিৎ অতি অল্প বয়সেই অসাধারণ বুদ্ধি ও অতিমাত্র সাহসের পরিচয় প্রদান করিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, মহাসিংহ এই বালকের বিদ্যানুশীলনে আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। এই অশেষ গুণসম্পন্ন বালকের বাল্যকাল যদি বিদ্যাভ্যাসে অতিবাহিত হইত, তাহা হইলে বয়ঃকালে তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা যে অধিকতর অলঙ্কৃত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রণজিৎ সিংহের বাল্যকাল কেবল ব্যায়াম, শিকার ও সামরিক ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়। ভবিষ্যতে তাঁহার চরিত্র গঠনের উপায় সম্বন্ধে কোন সুশিক্ষা বালককে দেওয়া হয় নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ইতিহাস বক্ষে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে; সংযম ও সচ্চরিত্রতার উজ্জ্বল আদর্শ কখন রণজিতের জীবনীতে পরিলক্ষিত হয় নাই।

সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া রণজিৎ সিংহ স্বয়ং জনকের ভূসম্পত্তিতে পূর্ণাধিকার ও সামন্তগণের শাসনাভিলাষে তাঁহার অভিভাবক লখপৎ সিংহকে স্থানান্তরিত করিলেন। ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ অল্প বয়স্ক হইলেও রণজিৎ যে, পৈত্রিক রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ সক্ষম, ইহা শীঘ্রই প্রতীয়মান হইল। বীর যুবক রণজিতের প্রভাবে পঞ্চনদের অপরাপর প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের প্রতাপ ও ক্ষমতা হ্রাস হইল। এমন সময়ে পঞ্চনদ সহসা জমনসাহের সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল; কিন্তু আফগান নৃপতি, শিখ জাতির দমনে অকৃতকার্য্য হইলেন। রণজিৎ ও অপরাপর সর্দ্দারগণ, পাঠানগণের বিজয় পথের বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। জমন এইরূপ বিফল মনোরথ হইয়া, কি করিবেন, তদ্বিষয় স্থির করিতে পারিলেন না। যে পঞ্চনদ অধিকার করিবার অপরাধে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দুরন্ত আহমদসাহ আবদালী মহারাষ্ট্রগণকে পানিপথের ভীষণ সমরে হীনবীর্য্য করেন, সেই পঞ্চনদ এক্ষণে আবার কতিপয় হিন্দু সন্তান কর্ত্তৃক অনায়াসে অধিকৃত হইল, অথচ তিনি তাহাদের শাস্তি বিধানে অক্ষম হইলেন, ইহা জমনের নিতান্ত ক্লেশকর হইল। সেই সময় আর এক ঘটনায় জমনসাহকে পঞ্চনদ পরিত্যাগ করিয়া আফগানরাজ্যে দ্রুত প্রত্যাগমনে বাধ্য হইতে হইল। জমন সাহ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। এইরূপে আফগানরাজ্যে দ্রুত প্রত্যাগমন কালীন ঝিলাম নদীতে তাঁহার বহুসংখ্যক কামান পতিত হয়। সেগুলির উদ্ধার অতি দুরূহ, অথচ অতীব প্রয়োজনীয়। এই নিতান্ত আবশ্যক ব্যাপার সম্পাদনে, যুবা রণজিৎ সিংহকে শিখসর্দ্দারগণ মধ্যে কার্য্যক্ষম ও সাহসী দেখিয়া, জমনসাহ তাঁহাকেই এই কঠিন ব্যাপার সম্পাদনে অনুনয় করিলেন এবং আরও

বলিলেন যে, এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে তিনি পুরস্কৃত হইবেন। রণজিৎ সিংহ আগ্রহে আফগান নৃপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যদিও রণজিৎ সিংহ বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে, পঞ্চনদে আফগান নৃপতির অধিকার ও সত্ত্ব বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চনদের অধিকার সত্ত্ব পাইলে, অপরাপর সর্দ্দারগণের বিরুদ্ধে ইহা বলবৎ প্রমাণ হইবে, এই রাজনৈতিক বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া রণজিৎ সিংহ আফগান নৃপতির কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন ও অল্প সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে কামানগুলির উদ্ধার করিলে, জমনসাহ সন্তুষ্ট হইয়া রণজিৎকে পঞ্চনদের রাজধানী লাহোর প্রদান করিলেন। রণজিতের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহার আবহমান আন্তরিক বাসনা ছিল যে রাজেন্দ্র কিরীটে তাঁহার মস্তক সমলঙ্কৃত করিবেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল।

এইরূপে নরপতি পদে সমারূঢ় হইয়া রণজিৎ পঞ্চনদের স্বাধীন সর্দ্দারগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাইতে যত্নশীল হইলেন। ইহার নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রাম আবশ্যক। রণজিৎ রণরঙ্গে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। এ দিকে সর্দ্দারগণ লাহোরে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্যলাভ দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া একসূত্রে রণজিতের বিরোধী হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র সমাবেশ দর্শনে সুচতুর রণজিৎ সত্বর এই শত্রু সমাবেশ ইতস্ততঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরেই সর্দ্দারগণের এই সমাবেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রণজিৎ জম্বু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথাকার গিরিসঙ্কটের বহু সংখ্যক দুর্গ এইবার তাঁহার করায়ত্ত হইল; পরিশেষে শিয়ালকোটের দুর্গ অধিকার করিয়া, ১৮০০ খৃঃ অব্দে রণজিৎ লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন।

এই বৎসর রণজিতের প্রথম পুত্র খড়্গা সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজও এই সময়ে রাজসম্মান সূচক উপঢৌকন প্রেরণে রণজিৎ সিংহকে যথোচিত সম্মানিত করিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিকে সাদর অভ্যর্থনা এবং উপহারাদি দানে পরিতুষ্ট করা হইল। রাজধানীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া রণজিৎ সুবিখ্যাত গোবিন্দপুরের দুর্গাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন। সেই প্রবল দুর্গ অধিকারে অসমর্থ হইয়া, রণজিৎ তত্রত্য চতুর্পার্শ্বস্থ ভূমি সমুদয় ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়া, ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য কতিপয় সামান্য যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া রণজিৎ মুলতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুচতুর মুলতান পতি আপনাকে রণজিতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সম্পূর্ণরূপ অসমর্থ জানিয়া, রণজিতের অধীনতা স্বীকার করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। এইরূপে বিজয়লাভে সম্মানিত হইয়া রণজিৎ লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত যশোবন্ত রাও হোলকার এবং আমির খাঁ লর্ডলেক্ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রণজিতের শরণার্থী হইলেন। এই পলাতকগণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ইংরাজ সেনানীর সহিত যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া, যাহাতে ইহঁাদের সহিত বৃটিস গভর্ণমেণ্টের মিটমাট হইয়া যায়, তন্নিমিত্ত তিনি মধ্যস্থতা করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায়

উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইলেন। পর বৎসর মহারাজ রণজিৎ অতি ক্লেশে লুদিয়ানা এবং কসুরের দুর্গ অধিকার করিয়া, পাতিয়ালা রাজ ও তাঁহার মহিষীর কলহে মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। পাতিয়ালার রাণী স্বামীর অকর্ম্মণ্যতা ও অযোগ্যতা দর্শনে, স্বামীর নিকট স্বীয় শিশু সন্তানের নিমিত্ত যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাতে পতি সম্মত না হওয়ায়, তিনি রণজিৎ সিংহকে এবিষয়ের মীমাংসা করিতে বলিলেন। রণজিৎ সিংহ তদনুযায়ী রাণীর পক্ষ হইয়া এই আদেশ করিলেন যে, পাতিয়ালা রাজকে রাণীর সন্তানের নিমিত্ত বাৎসরিক পঞ্চ সহস্র টাকা দিতে হইবে। পাতিয়ালারাজকে অনিচ্ছায় এই বিচারানুযায়ী কার্য্য করিতে হইল। পাতিয়ালায় আপনার প্রভুত্ব ও ক্ষমতা দেখাইয়া রণজিৎ পঞ্চনদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন।

রণজিতের এইরূপ বিজয় লাভ ও রাজ্যপরিবর্দ্ধন দর্শনে শতদ্রু তীরবর্ত্তী শিখ সর্দ্দারগণ নিরতিশয় বিচলিত হইলেন। অন্যোনাপায় হইয়া তাঁহারা ইংরাজের শরণার্থী হইতে মানস করিলেন। এই নিমিত্ত ঝিন্দের রাজা ভগসিং খিলালের লালসিং এবং পাতিয়ালার দেওয়ান চেনসিং দূত স্বরূপ দিল্লিতে প্রেরিত হইলেন। ইহাঁদের নিমিত্ত পঞ্চনদ সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ইংরাজ তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানের কোন প্রকার প্রকাশ্য আশ্বাস দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে উৎসাহদানে ত্রুটি করা হইল না *।

শতদ্রু পুলিনস্থ সর্দ্দারগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, আপনাদের কুশলার্থী হইয়া রণজিতেরই সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে অগ্রসর হইলেন; এদিকে মহারাজ রণজিৎ সিংহও দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে বলিলেন। এমন সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ন ভারত আক্রমণ করিবার অভিলাষ করিলে ইংরাজগণ ভয়ে কম্পমান হইলেন †।

* Treaties Engagements and Sunnuds by C. U. Aitchison, Revised edition 1876, Vol. vi. p 15.

† Thiers' History of the Consulate and Empire Vol viii. p. 239, 255.

(ক্রমশঃ)

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

আত্মা ও আত্মজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যে সকল অতি অজ্ঞেয়বাদী বা জড়বাদী, আত্মাকে মস্তিষ্কের সহিত অভিন্ন বলেন, তাঁহারা যে অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াকে মস্তিষ্কের পরমাণু সমূহের গতি পরিবর্ত্তনাদি ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন করিয়া বলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সকল কথা বলেন এবং আমাদের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণ একদিকে এই সকল মনোরঞ্জক বিষয় পাঠ করেন, অপরদিকে তাঁহারা কি গৃহে পিতামাতার নিকট, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের নিকট, কোথায়ও ধর্ম্মবিষয়ে হৃদয়গ্রাহী সত্য উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন না; এই সকল কারণে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের নাস্তিক্যপক্ষপাতী কথা সকল নির্ব্বিচারে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন এবং পরিণামে তাহার বিষময় ফলভোগ করেন। এই পুণ্যস্থান ভারতবর্ষ, সত্যধর্ম্মের, অধ্যাত্মধর্ম্মের, আদিজননী এবং এই কারণে ইহঁার যশোগীত সমস্ত সুসভ্য জগতে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে দিন সিকাগো (Chicago) সহরের ধর্ম্মমণ্ডলেও * এই কথা একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! ভাবিলে মর্ম্মভেদী অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় যে, আজি সেই ভারতের সন্তানগণ কথায় কথায় ধর্ম্মকে উপহাস করেন, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন এবং নাস্তিক্যবাদের গুরু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথাকে অভ্রান্ত বেদবাক্য ও তাঁহাদিগকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই কারণে আমাদিগকে তাঁহাদিগের প্রতিবাদরূপ কষ্টকর কর্ম্মে অবতরণ করিতে হইয়াছে। আমরা অনেকবার ঘুরাইয়া নাসিকা প্রদর্শনের ন্যায়, তাঁহাদিগকে বক্রপথের দ্বারা গন্তব্যস্থান, সহজজ্ঞান সিদ্ধ সত্যে উপনীত করাইয়াছি, আরও কয়েকবার তাহা করিতে হইবে।

অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতি যে আমাদের মানসিক কার্য্য, ইহা একটী সহজজ্ঞান সিদ্ধ সত্য। এই সকলকে মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত একীভূত করা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি যে আত্মা মস্তিষ্কের সহিত অভিন্ন হইলে আত্মাকে জানিবার কালে মস্তিষ্ককেও জানিতে পারিতাম; সেইরূপ এখানেও অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক কার্য্য সকল জানিবার কালে, যদি মানসিক কার্য্য মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন হয় তাহা হইলে, মস্তিষ্ক প্রক্রিয়াও জানিতে পারিতাম। সুস্থ অবস্থায় একপ্রকার অনুভূতি, অসুস্থ অবস্থায় অন্য প্রকার অনুভূতি অনুভব করি। অসুস্থ অবস্থায় অন্য প্রকার অনুভূতি অনুভব করি বলিয়াই বুঝিতে পারি যে অসুস্থ হইয়াছি, কিন্তু

* Parliament of Religions.

তৎকালেও মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া তো কিছুই অনুভব করিতে পারি না। মানসিক কার্য্য ও পরমাণু পরিবর্ত্তনাদি মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ; পূর্ব্বে ইহাও সবিস্তার বলিয়াছি যে পরমাণু পরিবর্ত্তনাদি ভৌতিক কার্য্য আমাদিগের অবর্ত্তমানেও চলিতে পারে, তাহারা জড়জগতের ঘটনা মাত্র এবং আমাদিগের সম্বন্ধে একত্ব-বাচী; কিন্তু মানসিক কার্য্য আমাদিগের অবর্ত্তমানে চলিতেই পারে না, তাহারা নিত্য দ্বিত্ব-বাচী। আমাদের মৃত্যুর পরও মস্তিষ্কের পরমাণু পরিবর্ত্তনাদি ভৌতিক কার্য্য চলিতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যদিয়া যে সকল মানসিক কার্য্যের উৎপত্তি হইত, তাহা আর হইবে না, কারণ দেহ আবরণ হইতে মানসিক কার্য্যের বিষয়ী আত্মা চলিয়া গিয়াছে। স্পেন্সার যে বলিয়াছেন, আমাদের চিন্তা প্রভৃতি ব্যয়িত জড়শক্তির রূপান্তরমাত্র, তাহা যে আদতেই ঠিক নহে, ইহা বলা অতিরিক্ত মাত্র। একটা মজুর অনেক শক্তি ব্যয় করিলেও তাহা হইতে আমরা কোনও চিন্তা প্রাপ্ত হইব না কিন্তু একজন ভাস্করাচার্য্য কিছু মাত্র শারীরিক শক্তি ব্যয় না করিলেও অনায়াসে জ্যামিতির দুরূহ সমস্যা মনে মনে মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া ও মানসিক কার্য্য এত ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত যে যদিও আমরা জানি যে তাহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু কিরূপে, কি কার্য্য কারণ সূত্রে তাহারা আবদ্ধ হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্যতম আচার্য্য ও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল (Tyndall) তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে "বিজ্ঞান যতই কেন উন্নত হউক না, সে কিছুতেই বলিতে পারিবে না যে মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত মানসিক কার্য্য সকল কি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।" "The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable"

এইবারে আমরা আত্মার একটী প্রধান স্বরূপের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব—আত্মার অনশ্বরত্ব। বিষয়টী বুঝিতে গেলে আমাদিগকে মূলে যাইয়া ধরিতে হইবে। আমরা এতদুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইটুকু পাইয়াছি যে, আমাদিগের সহজজ্ঞানে আত্মার স্বরূপ-বিষয়ক যে জ্ঞান পাইয়া থাকি, তাহা ভ্রান্ত নহে, তাহা সম্পূর্ণই ঠিক। আত্মা সমস্ত প্রতিভাসের অন্তর্নিহিত সদ্বস্তু এবং আত্মা কি প্রতিভাসের সহিত, কি দেহের সহিত, কি মস্তিষ্কের সহিত, কাহারও সহিত অভিন্ন নহে—সকল হইতে পৃথক্ সদ্বস্তু। অনেক আলোচনার পর আমরা এই সহজজ্ঞান সিদ্ধ ও যুক্তিপরীক্ষিত সত্যগুলি লাভ করিয়াছি। এখন আমাদিগকে আত্মার অনশ্বরত্বের দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আত্মার অনশ্বরত্বের অর্থ এই যে এক সময়ে যে আত্মা ইহলোকে দেহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছিল, দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হইবে না। আত্মার একত্ব থাকিবে। মৃত্যুর পরে আত্মার একত্ব থাকিবে কি না বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদের জীবিতাবস্থায় আত্মার একত্ব থাকে কি না বিচার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে একস্থানে আমরা আত্মার একত্ব-

জ্ঞান সহজজ্ঞান সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে অজ্ঞেয়বাদীগণও তাহা স্বীকার করিয়া লয়েন। কিন্তু এখনও ইহা যুক্তিবিচারে পরীক্ষিত হয় নাই, এইবারে আমরা তাহাকে পরীক্ষিত করিয়া দেখিব, কারণ ইহলোকে আত্মার একত্বই আত্মার অনশ্বরত্বের এক প্রধান ভিত্তি।

ইহলোকে আত্মার একত্ব স্থির করিবার বিষয়ে আমাদিগের অন্তরস্থিত স্মৃতি ও প্রতীক্ষারভাব যথেষ্ঠ সাহায্য করিবে। স্মৃতিশক্তির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা যেমন আত্মার একত্ব বুঝিতে পারিব, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও একটী দৃঢ়তর প্রমাণ প্রাপ্ত হইব। যেমন ঐন্দ্রিয়ক অনুভব মাত্রেই অনুভূতি ও অনুভূতির বিষয়ী আত্মা এই দুইটী বস্তু অবলম্বিত হইয়া আছে, স্মৃতিমাত্রেও সেইরূপ স্মৃত বস্তু স্মৃতির বিষয়ী স্মর্ত্তা আত্মা এই দুই বস্তু অবলম্বিত রহিয়াছে। ইহার উপর প্রত্যেক স্মৃতিতে আর একটী বস্তু অবলম্বিত থাকে—তাহা আত্মার একত্ব জ্ঞান। প্রত্যেক স্মৃতিকার্য্যে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, প্রতি প্রতিভাসের অন্তর্নিহিত ভিত্তিস্বরূপ এক এক স্বতন্ত্র আত্মা নাই কিন্তু আমাদের জীবনব্যাপী সমস্ত প্রতিভাসের মূলে এক স্থায়ী সদ্বস্তু আত্মা অবস্থিতি করিতেছে। আমি স্মরণ করিলাম যে বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি কাশীদর্শন করিয়াছিলাম। এই একটীমাত্র স্মৃতি হইতে আমরা তিনটী বিষয় জানিতে পারিতেছি (১) স্মৃতির বিষয় বা কাশীদর্শন; (২) স্মৃতির বিষয়ী বা আত্মা, যে স্মরণ করিতেছে এবং (৩) ব্যক্তিগত একত্বজ্ঞান অর্থাৎ আজ যে স্মরণ করিতেছে এবং পূর্ব্বে যাহার কাশীদর্শন ঘটিয়াছিল, এই উভয় আত্মার একত্বজ্ঞান; এক কথায় 'আমি' আজ স্মরণ করিতেছি এবং পূর্ব্বে 'আমারই' কাশীদর্শন ঘটিয়াছিল—উভয়েতেই একই 'আমি' বা আত্মরূপ স্থায়ী সদ্বস্তু বর্ত্তমান। এই একত্বজ্ঞান শারীরিক একত্ব জন্য হইতে পারে না, বিশবৎসরে আমার শরীরের দুইবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে (১)। এই একত্বজ্ঞান প্রাতিভাসিক একত্ব জন্যও হইতে পারে না, কারণ, একটী প্রতিভাস ও সেই প্রতিভাসের স্মৃতি এই দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, প্রতিভাস ও তাহার স্মৃতি, দুই এক পদার্থ হইতেই পারে না। আত্মার একত্ব জন্যই এই একত্বজ্ঞান। আমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতেছি যে আমি এখন আমার কাশীদর্শনের বিষয় স্মরণ করিতেছি, কিন্তু এক সময়ে আমার সেই কাশীদর্শন ঘটিয়াছিল। কাশীদর্শন ও বিশবৎসর পরে তাহার স্মৃতি এই উভয় ঘটনার মধ্যে আমার আরও কত জ্ঞান লাভ হইয়াছে, কত অনুভূতি হইয়াছে, কত চিন্তা গিয়াছে, অতীত বিষয়ের কত স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে এবং আত্মা এই সকল বিষয়কে ধীরে ধীরে আপনার জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, তথাপি এই সকল অতিক্রম করিয়াও আত্মা জানিতেছে যে, সে সেই কাশী দর্শনকালেও বিদ্যমান ছিল এবং বিশ বৎসর পরে

(১) বৈজ্ঞানিকদিগের মত এই যে প্রতি শত বৎসরে আমাদের শরীরের প্রত্যেক পুরাতন পরমাণু চলিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন পরমাণু আসিয়া শরীর সংগঠন করে।

তাহার স্মৃতিকালেও বিদ্যমান আছে। এক আত্মা না থাকিলে স্মৃতি থাকিতে পারিত না এবং স্মৃতি না থাকিলে আত্মার একত্বজ্ঞানও অনুভব করিতে পারিতাম না, আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান বা একত্বজ্ঞানই প্রত্যেক স্মৃতিতে অন্তর্নিহিত থাকে। জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন "The notion of a self is, I apprehend, a consequence of memory There is no meaning in the word Ego or I, unless the I of to-day is also the I of yesterday" *

স্মৃতি হইতে আমরা যেমন আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি, সেই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও দৃঢ়তর প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, তাহাই স্মৃতিশক্তি দ্বারা পুনরুদ্রিক্ত করিতে পারি; কিন্তু যাহা কখনও আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই, স্মৃতিশক্তি দ্বারা তাহার পুনরুদ্রেক করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যখন স্মৃতিশক্তি দ্বারা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাসের অতীত চিরস্থায়ী সত্বস্থ আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান পাইতেছি, তখন ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রত্যেক প্রতিভাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অস্তিত্বজ্ঞানও পাইয়া থাকি, কারণ স্থায়িত্বজ্ঞান চির-অস্তিত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতিভাস মাত্রেরই সঙ্গে তাহার পত্তনভূমি আত্মারও অস্তিত্বজ্ঞান লাভ না করিলে আমরা প্রতিভাস সমষ্টির পত্তনভূমি আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান বা চির অস্তিত্বজ্ঞান কিছুতেই পাইতে পারিতাম না।

স্মৃতি হইতে আমরা আত্মার যে স্থায়িত্বজ্ঞান পাইলাম, প্রতীক্ষার ভাব আলোচনা করিলেও সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরে আরও দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইবে। আমি দশবৎসর পরে ফললাভ করিব বলিয়া পরিশ্রম করিতেছি। যখনই সেই ফললাভ করিলাম, তখনই জ্ঞান হইল যে দশবৎসর ধরিয়া ইহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছিলাম। এখানে দেখিতেছি যে প্রতীক্ষা ভাবের মধ্যে স্মৃতির কার্য্য ও বিশেষ প্রকাশমান আছে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এইটুকু যে আমি পূর্ব্ব হইতেই বোধ করিতে পারি যে পূর্ব্বের 'আমি'ই পরেও থাকিব। ফললাভ করিলে এই ভাবটী পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হয়। যদি ফললাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিব যে 'আমি' সেই 'আমি'ই আছি কিন্তু আমি ইপ্সিত ফল পাইলাম না মাত্র।

এতক্ষণে আত্মার অনশ্বরত্ব বিচার করিবার ভিত্তি পাইয়াছি। দেখিয়া আসিলাম যে প্রত্যেকের আত্মা এক, দুই বা ততোধিক নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই আত্মা আমাদিগের মৃত্যুর পরে বর্ত্তমান থাকিবে কি না। এই প্রশ্নটী দুই দিক্ দিয়া দেখা যাইতে পারে—সত্ব ও নত্ব। নত্বদিক্ দিয়া দেখিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কি কি কারণে আমরা মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি এবং সত্বদিক্ দিয়া দেখিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কি কি কারণে আমরা মৃত্যুর পরেও আত্মার জীবন বা

* তাঁহার পিতা জেম্‌স্‌মিল প্রণীত "Analysis of the Phenomena of the Human mind 2d. Ed. I. 229.

অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে আত্মা, দেহ বা মস্তিষ্ক অথবা চিন্তা প্রভৃতি প্রতিভাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর সদ্বস্তু। আত্মা যদি দেহের ন্যায় বা মস্তিষ্কের ন্যায় কতকগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টিমাত্র হইত, তাহা হইলে সেই পরমাণু সমূহের বিশ্লেষণে আত্মাও বিশ্লেষিত ও বিনষ্ট হইতে পারিত; আত্মা যদি অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র হইত, তাহা হইলেও দেহের ও মস্তিষ্কের বিশ্লেষণেই আত্মা বিনষ্ট হইতে পারিত, কারণ দেহ ও মস্তিষ্কের উপরেই প্রতিভাস সমূহ, স্বীয় অস্তিত্বের জন্য নিতান্ত নির্ভর করে। কিন্তু যখন আত্মা, পরমাণু সমূহের সমষ্টি দেহ ও মস্তিষ্ক হইতে এবং তদবলম্বিত চিন্তা প্রভৃতি প্রতিভাস হইতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ, তখন আমরা ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেই পারি না যে শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বা প্রতিভাসের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সংসাধিত হইবে। নত্বদিক্ দিয়া দেখিলাম যে আমরা অনেকগুলি কারণে মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি।

এইবারে সত্বদিক্ দিয়া দেখিব। প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে আত্মার অনশ্বরত্ব আমাদের সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য। এই কারণেই সকল জাতীয় ধর্ম্মেই পরকাল সম্বন্ধীয় কথার উন্নত বা অনুন্নত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের ভৌতিক জীবনে যেরূপ জরা উপস্থিত হয় দেখি, মানসিক জীবনে সেরূপ দেখি না, মানসিক জীবনে উন্নতির নিয়মই রাজত্ব করিতেছে দেখিতে পাই। শরীর দুর্ব্বল হইলে মানসিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে বটে, কিন্তু তাহার উৎপত্তি শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, মানসিক দৌর্ব্বল্যে নহে। শরীর ব্যবচ্ছিন্ন হইলেও মনের বা আত্মার কার্য্য বলবৎ চলিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিস্তর দেখা গিয়াছে। মানসিক জীবনে কেবলই দেখি ঘটনা সমূহের প্রতিভাস প্রাপ্তি ও তজ্জনিত শিক্ষালাভ এই দুই নিয়ম ক্রমাগত কার্য্য করিতেছে। এই জ্ঞানলাভ একক্ষণে হইল আর পরক্ষণে চলিয়া গেল তাহা নহে, তাহার দ্বারা অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য আত্মাতে সেইগুলি সঞ্চিত থাকে। যখন উন্নতির দ্বার এইরূপ মুক্তভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন মৃত্যুর পরেও আত্মার বিনাশ অপেক্ষা আত্মার উন্নত জীবন থাকাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের অন্তরে যে ইচ্ছাশক্তি আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে আত্মার অনশ্বরত্বে বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইতে পারিবে। অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মার অস্তিত্ব লুপ্ত করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তি স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, যেটুকু ইচ্ছা করি তাহাও পরাধীন ভাবে। আমরা বলি পরাধীন ইচ্ছা নাই। ইচ্ছামাত্রই স্বাধীন। ইহা সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য। সহস্র শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইলেও আমার ইচ্ছা স্বাধীন থাকিবে। আমি ইচ্ছা করিলে সত্য কথা বলিতেও পারি, ইচ্ছা করিলে মিথ্যা কথাও বলিতে পারি। সত্য ও মিথ্যা এই উভয়ের একপক্ষ অবলম্বন করিবার

পক্ষে শিক্ষা, সঙ্গ, ভয় প্রভৃতি নানা কারণ সহায়তা করিতে পারে বটে কিন্তু যখন একপক্ষ অবলম্বন করি, তখন স্ব ইচ্ছায়ই তাহা অবলম্বন করি। সত্য বলিলে প্রাণদণ্ড হইবে এই যদি নিয়ম হয় তাহা হইলে আমি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা বলিলেও তাহা স্বাধীনভাবেই বলিলাম—প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সত্য বলিতে পারিতাম। স্বতরাং ইচ্ছামাত্রই স্বাধীন। অজ্ঞেয়বাদীগণ সহজে ইচ্ছা স্বীকার করিতে চাহেন না। ইচ্ছা স্বীকার করিলেই এক প্রকার আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়—ইচ্ছা আত্মারই বিশেষ ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম নহে, তাহা তাঁহারা বেশ জানেন। ইচ্ছাকে অস্বীকার করা তাঁহাদের প্রাণগত ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা তাহা পারেন না। এমন কি, জড়বাদী হক্সলিকেও বলিতে হইয়াছে "A human being, though a machine, is capable within certain limits, of self adjustment." আর একস্থানে "Our volition counts for something, as a condition of the course of events." তিনি একই মনুষ্যকে যন্ত্র এবং স্বীয় অবস্থা পরিচালক উভয়ই বলিতেছেন এবং একইমুখে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অস্বাধীনতা উভয়ই স্বীকার করিতেছেন। যন্ত্রের যখন পরিচালনা শক্তি নাই, তখন মনুষ্যকে স্বীয় অবস্থা-পরিচালক (পরিমাণ যতটুকু হউক না) বলাতেই বলা হইতেছে যে মনুষ্য যন্ত্র নহে; আমাদের ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণে ঘটনাস্রোতের গতি ফিরাইতে পারিবে, অন্ততঃ সেইটুকু পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন। তবেই দেখিতেছি যে অজ্ঞেয়বাদীদিগেরও মতে আমাদের ইচ্ছা—স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

এখন দেখা যাউক ইচ্ছা-পদার্থটী কি? ইচ্ছার বিশেষত্ব এই যে, অনুভূতি ভাব প্রভৃতির ন্যায় আমরা তাহা বাহির হইতে প্রাপ্ত হইনা, আমরা ইচ্ছাকে, বলিতে গেলে, সৃষ্টি করি। আমাদিগের আত্মা হইতে ইচ্ছা প্রসূত হয়। অনুভূতি প্রভৃতি যেমন আপনাপনি আমাদিগের বিনা অনুমতিতে উপস্থিত হয়, ইচ্ছা সেরূপ নহে। কোন কারণে এক ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ বশতঃ তাহাকে প্রহার করিবার কামনা সহসা অন্তরে উদয় হইল। কিন্তু আমি প্রথমেই প্রহার করিতে উদ্যত না হইয়া তাহার ঔচত্যানৌচিত্য বিষয়ে বিচার করিতে মনস্থ করিলাম এবং পরিশেষে তাহারি ফলে প্রহার করিতে নিরস্ত হইলাম। কামনার বল আমাকে প্রহার করাইবার দিকে লইয়া যাইতেছিল; আমি যদি শুধু সজ্ঞান যন্ত্র হইতাম, তাহা হইলে সেই কামনাবলের প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইত—কামনা স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে হইত। কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছার বলে কামনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কামনাকে নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। কামনা যে আমাদের শরীরে এক প্রবল শক্তির উদ্রেক করে, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সেই শক্তিকে যখন ইচ্ছা দ্বারা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলাম, তখন ইচ্ছাও এক প্রকার শক্তি; কারণ শক্তিকে, শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা বাধা দেওয়া অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির পুঞ্জীকরণ নিয়মটী নানা পরীক্ষা দ্বারা একেবারে নিঃসন্দেহরূপে সত্য

বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন—শক্তির বিনাশ নাই ইচ্ছাও যখন এক প্রকার শক্তি দেখিতেছি, তখন ইচ্ছা শক্তিরও বিনাশ নাই এবং সুতরাং, ইচ্ছা শক্তি যাহার স্বরূপ, সেই আত্মারও বিনাশ নাই, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। শক্তির বিনাশ নাই, এই সত্যটী যদিও ভৌতিক শক্তি অবলম্বনে পরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি যে বিনষ্ট হইবে এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ লক্ষিত হইতেছে না। বরঞ্চ, আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি যে, যেমন শরীরস্থ পরমাণু, প্রতিভাস প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হউক বা না হউক, তাহাদের ভিত্তি-স্বরূপে অবস্থিত আত্মা চির-বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ শরীরের অন্তরে বা বাহিরে ভৌতিক শক্তিসমূহ কার্য্য করুক বা নাই করুক, আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র ক্ষান্ত থাকিবে না। আর যখন দেখি যে, এক এক ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত সতেজ থাকে, তখন এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠে। আমাদের পূর্ব্বতন যোগিশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগাভ্যাস দ্বারা ইচ্ছা শক্তিকে পরিপুষ্ট করিতেন এবং অপরকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবেন, জড়তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বিষয় হইতে পারে না, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমরা আত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কত বিষয় জানিতে পারিলাম। টিণ্ডাল বৈজ্ঞানিক হইয়াও ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বেলফাস্ট্ নগরীয় আবোধনের (Belfast Address) উপসংহারে বলিয়া গিয়াছেন "The world embraces not only a Newton but a Shakespeare, not only a Boyle but a Rephael, not only a Kant but a Beethoven, not only a Darwin but a Carlyle. Not in each of these, but in all, is human nature whole. They are not opposed, but supplementary; not mutually exclusive but reconcilable."

এতক্ষণ আত্মার বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক জানিতে পারিয়াছি, আত্মা প্রতিভাস নহে, দেহস্থ জড় পরমাণু নহে কিন্তু সেই সকলের অন্তর্নিহিত ভিত্তিস্বরূপ এক সদ্বস্তু, আত্মাই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, ত্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা এবং মস্তিষ্ক প্রভৃতি জ্ঞানদ্বার মাত্র, আত্মা বিষয়ী, প্রতিভাস সকল বিষয়, প্রতিভাস, পরমাণু প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী, আত্মা চিরস্থায়ী, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাসও (ঐহিক) চলিয়া যায় কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা অনশ্বর। আত্মা সম্বন্ধে এতগুলি বিষয় জানিলাম এবং যদিও আত্মজ্ঞান এক সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য, তথাপি হার্ব্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীগণ বলেন যে আমরা আত্মার বিষয় একবারে কিছুই জানিতে পারিব না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় চাই। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয়, তবে জ্ঞেয় হইতে পারিবে না এবং যদি জ্ঞেয় হয়, তবে জ্ঞাতা হইতে পারিবে না। কিন্তু আত্মজ্ঞান বলিলেই আত্মাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই স্বীকার করিতে

হয়, যাহা (স্পেন্সরের মতে) হইতেই পারে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আত্মার অস্তিত্ব নাই। এইতো স্পেন্সরের যুক্তি। এই যুক্তির মূলসূত্র দুইটী (১) জ্ঞানমাত্রেরই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় চাই, (২) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইতে পারিবে না। তিনি মনে করিয়াছেন যে দুইটীই প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু তাহা নহে, একটী প্রকৃতির নিয়ম, অপরটী তাঁহারই কল্পিত নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়মটী তাঁহার কল্পিত এবং তাহা সত্য নহে। আত্মাকে যে আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ আত্মা যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হইতে পারে, ইহা একটী সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য। এই সত্যকে না বুঝিয়া তর্ক করিবার চেষ্টা করাতে স্পেন্সরকে পরস্পর বিরোধী বাক্যজালে জড়িত হইতে হইয়াছে। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণকালে তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই দেখি যে তাঁহার মতে ঘোর সংশয়বাদীও আত্মার অস্তিত্বে প্রত্যয় করিতে বাধ্য। তিনি অনেকস্থানে এইভাবে বলিয়াছেন যে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না '(Personality is the fact, beyond all others, the most certain.)' কোন্ বিষয়ে আমরা প্রত্যয় করিতে বাধ্য হই? কোন্ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না? যে বিষয় নিশ্চিতরূপে জানি, তাহাই প্রত্যয় করিতে বাধ্য। খ-পুষ্পকে কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে ("reality of the individual mind") যখন আমরা প্রত্যয় করিতে বাধ্য, তখন তাহার অর্থই এই যে আমরা তাহার বিষয়ে বিশেষরূপ জানি। এইখানে তিনি আত্মাকে জানিতে নিশ্চয়ই পারি, ইহা প্রকারান্তরে বলিতেছেন, আবার বলিতেছেন যে আমরা আত্মার সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানিতে পারি না। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাঁহার তর্কপ্রণালীতে ভ্রম আছে, আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইতে পারে কি না, ইহাই হইল প্রশ্ন, কিন্তু তিনি প্রারম্ভেই বলিয়া দিতেছেন যে তাহা হইতে পারে না—এইখানেই তর্কে (Petitis Principii) নামক দোষ হইতেছে। অতএব আত্মজ্ঞান যে হয়, ইহা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। বরঞ্চ অনাত্ম বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা আত্মজ্ঞানই আমাদের অন্তরে অধিকতর প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুভূতি সত্য না হইতে পারে, শুক্তিতে রজতভ্রম হইতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে একমাত্র আমিত্বজ্ঞানই অভ্রান্তভাবে বর্ত্তমান। আমার আত্মাকে কখনও অপরের আত্মা বলিয়া ভ্রম করি না। সূর্য্য যেমন অন্যকেও প্রকাশ করে এবং আপনাকে অধিকতর প্রকাশিত করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞান অন্য সকল জ্ঞানের মূলে থাকিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে এবং আত্মাকে অধিকতর পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করে। আমরা শরীরকেও ভালরূপে জানি না, তাহার কত পরমাণু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সেই সকল কিছুই ভালরূপে জানিতে পারি না, কিন্তু আত্মাকেই আমরা একমাত্র সর্ব্বাঙ্গীন জানিতে পারি, কারণ, তাহার চিন্তা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রতিভাস হয়, তাহা সমস্তই জানি—আমার নিকট

লুকাইয়া তাহার কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না, এক কথায়, আত্মাই আমি, আমিই আত্মা।

আমরা আত্মা ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখিলাম। অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তার ভিত্তি করেন। এই কারণে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাঁহাদের তর্ক করিবার ভিত্তি নিচূর্ণ করিয়া দিলাম। এখন আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিব যে সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞানে কিরূপে আরোহণ করিতে পারি। ১

১ বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেকগুলি উক্তি ইংরাজী ভাষায় কৃত হইয়াছে। ইহা পাঠকদের বিরক্তি-জনক, তাহা জানি। কিন্তু এই প্রবন্ধ পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদেরই আলোচনা করিবার জন্য অবতারিত, সুতরাং পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদীদিগের উক্তি উদ্ধৃত করা নিতান্ত আবশ্যক হওয়া পড়িয়াছে এবং পাছে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলে তাঁহাদের কথার ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় এই কারণে উহা তাহাদেরই কথিত ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তবে পাঠকগণ স্বীয় উদারতাগুণে মার্জ্জনা করিবেন। শ্রী লেখক—

ওঁ

জগতের কেন্দ্রোপরে জ্যোতির মণ্ডলে
বীজরূপী মহা আত্মা। দেও দরশন
লীন হ'ক মহাসৃষ্টি ওই আত্মাতলে
আত্মায় আত্মায় হ'ক মহা আলিঙ্গন।
কালমুক্ত মহাশূন্য করিয়ে পূরণ
প্রসার অনন্ত জ্যোতি অনন্ত আধারে
শব্দ শ্বাস শূন্য হ'ক মহা আয়তন
ভেদাভেদ নাহি থাক আলো অন্ধকারে।
সৎচিদানন্দ হ'ক সে শূন্য অপার
মিলাইয়ে থাক তথা তব করুণায়
আঁখি মেলি দেখ 'আমি' সে মূর্ত্তি তোমার
মুক্ত আত্মা মিশে যাই তব মহাকায়।
ঘুচে যাক দুঃখবাজী ঘুচে যাক্ ভ্রম্
গভীর গম্ভীর শূন্যে শুনি শুধু 'ওম্'।

প্রেম।

বিজলী কালিমা প্রেম সৌরভ শরীর
মলয় পীযূষ প্রেম—সুধা অশরীর।
কুসুম ক্রন্দন প্রেম—পাষাণের হাসি
শারদ চন্দ্রমালোক—সঙ্গীতের বাঁশি।
হুতাশের স্নেহ প্রেম মরু অশ্রুধার
আকাশের ফুল প্রেম নিশ্বাস তারার!
চলে প্রেম সুরে সুরে হাওয়ায় হাওয়ায়
জোছনার জালে বেঁধে লটোপুটি খায়!
এই আছে এই নাই একি চমৎকার
নিমেষের মাঝে প্রেম মরে শতবার!
মরণের ডোরে গেঁথে—শত প্রাণ ফুল
গলে প্রেম পরে হার—শোভায় অতুল!
কোন্ পথে চলে প্রেম—কবে কারে পায়।
জানিতে বাসনা কিন্তু—কে কারে শুধায়!

আয়ুর্ব্বেদ।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

খাদ্যম্।

সুপাচ্যং পুষ্টিকৃদ্‌বল্যং পানমন্নং শুভপ্রদম্।
শরীরপোষণং চৈব তথা ক্ষয়নিবারণম্॥
শারীরোষ্মকরং ক্ষুত্তৃড়্‌ব্যাধিশান্তিকরং পরম্।
বালানাং ভোজনং দুগ্ধং যূনাং চৈব বিশেষতঃ॥
বৃদ্ধানামন্নপানার্থং ভোজ্যমন্যচ্চ যুজ্যতে।
ভোজনং শ্রমশীলানামধিকং স্যাদ্বিলাসিনঃ॥
শীতপ্রধানদেশেষু নৃণাং ভোজ্যং ভবেদধি।
স্বল্পায়াসেন পাকায় পাককার্য্যং নিরূপিতম্॥
অন্যথা চামখাদ্যস্য জীর্ণতা ন কদাচন।
বহূপকরণৈঃ সাধ্যং খাদ্যং গুরুতরং ভবেৎ॥
অতঃ স্বল্পোপকরণৈর্যুক্তং খাদ্যং প্রযোজয়েৎ॥

সুপাচ্য, পুষ্টিকর, বলকারী, অন্ন ও পানীয় দ্রব্য সেবন করিবে। অন্নের দ্বারা শরীর পোষণ ও ক্ষীণতা নিবৃত্ত হয়। ভোজনের দ্বারা দেহে আবশ্যকমত শারীরিক উষ্মার উৎপত্তি ও ক্ষুধার শান্তি হয়। দুগ্ধই বালকদিগের প্রধান খাদ্য। যুবক ও বৃদ্ধগণের অপেক্ষা শ্রমজীবিগণের অন্নের পরিমাণ অধিক হওয়া আবশ্যক। শীতপ্রধান দেশে মানবের অন্ন অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। সত্বর পরিপাক হইবার জন্য প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যেরই পাককার্য্য ব্যবস্থা হইয়াছে। কাঁচা খাদ্য শীঘ্র পরিপাক হয় না। অধিক পরিমাণে মসলাযুক্ত ব্যঞ্জন গুরুপাক হয়, অতএব অল্প পরিমাণে অথবা পরিমিত মসলা দিয়া অন্ন প্রস্তুত করিবে।

আহারস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তঃ সাত্বিকাদিপ্রভেদতঃ।
সামিষো রাজসো জ্ঞেয়ঃ সাত্বিকস্তু নিরামিষঃ॥
মৎস্যমাংসপ্রধানস্তু কটূগ্রস্তামসঃ স্মৃতঃ।
বহুমূত্রাদিরোগেষু ক্ষীণে মাংসং সুধোপমঃ॥
অক্রোধনাস্তথা শান্তস্বভাবাঃ সাত্বিকাশিনঃ।
আয়াসকরকার্য্যেষু ন শ্রাম্যন্তি কদাচন॥
উগ্রপ্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে নিষ্ঠুরা রাজসপ্রিয়াঃ।
ক্রূরস্বভাবা দুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাস্তামসপ্রিয়াঃ॥
তথা চোদ্যমশীলাশ্চ সর্ব্বকার্য্যেষু নিত্যশঃ।
ম্লেচ্ছপ্রকৃতয়শ্চৈব যথাত্র যবনাদয়ঃ॥

আহারীয় দ্রব্য দুই প্রকার। সাত্বিক ও রাজসিক। সামিষ অন্ন রাজসিক ও নিরামিষান্ন সাত্বিক। বহুমূত্রাদি রোগে ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে মাংস অমৃততুল্য। সাত্বিকান্ন আহার করিলে লোকে ক্রোধহীন, শান্তচিত্ত হয় এবং আয়াসকর কার্য্যেও কখন শ্রান্ত বা বিমুখ হয় না। রাজস খাদ্য-ভোজীগণ উগ্রপ্রকৃতি, নিষ্ঠুরস্বভাব এবং সর্ব্বকার্য্যে উদ্যমশীল হইয়া থাকে। তামস খাদ্য ভোজন করিলে লোকে দুর্দ্দান্ত, ক্রূরস্বভাব ও কর্কশভাষী এবং যবনাদির ন্যায় ম্লেচ্ছপ্রকৃতি হয়।

মদ্যং নিষিদ্ধং ন কদাপি সেব্যং
প্রাণাত্যয়ে ব্যাধিষু চাল্পমাত্রম্।
তদৌষধং জ্ঞেয়মমোঘমাশু
প্রাণপ্রদং রোগবিঘাতকঞ্চ॥

অবসন্নং পাকযন্ত্রং তথৈব স্নায়ুমণ্ডলম্।
বিকলানীন্দ্রিয়াণ্যেব মাদকস্যাতিসেবনাৎ॥

মদ্যপান সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কদাপি পান করা উচিত নহে। যদি প্রাণান্ত ব্যাধি হয়, তাহা হইলে অল্প মাত্রায় মদ্য সেবন করিলে তত দোষ হয় না। কারণ ঔষধার্থে সুরাপানে পাতকগ্রস্ত হইতে হয় না। মদ্যপানে অনেক দোষ জন্মে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অতিমাত্র মদ্যপান করে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল, স্নায়ুমণ্ডল শিথিল ও পাকযন্ত্র অবসন্ন হইয়া থাকে। অতএব অতিরিক্ত মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ।

গুরু পর্য্যুষিতং চান্নং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ।
পয়ো ন পেয়ং হ্যদরাময়েষু
আহারকালেহথবা ততঃ পরম্।
মুহূর্ত্তকালং সমতীত্য যত্নতঃ
পেয়ং পয়ঃ প্রাণকরং হি মাত্রয়া॥
অষ্টাদশমুহূর্ত্তেষু জাগ্রতামশনং ত্রিধা।
মধ্যাহ্নে চ তথা নক্তং খাদেৎ সম্যক্ দ্বিধাশনম্।
পরাহ্নে চোপযুঞ্জীতাশনং স্বল্পং জিজীবিষুঃ॥
আয়ুঃক্ষয়করং রোগমূলমত্যশনং বিদুঃ।
তৈলাক্তং তাপজনকং খাদেত্তৎ স্বল্পমাত্রয়া॥
শ্বেতসারপদার্থশ্চামিষং শোণিতবৃদ্ধিকৃৎ।
রসবৃদ্ধিকরশ্চৈব যত্নাৎ সেবেত মাত্রয়া॥
অত্যুগ্রমতিরিক্তঞ্চ ভোজনং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ।
নাত্যুগ্রং প্রীতিজননং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥
সেবেত মাত্রয়া ধীরো দীর্ঘজীবনলিপ্সয়া॥

গুরুপাক ও পর্য্যুষিত অন্ন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। উদরাময়াদি রোগে অধিক পরিমাণে জলপান নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ আহারকালে জলপান অবিধেয়। আহারের মুহূর্ত্তকাল পরে পরিমিত জল পান করাতে কোন অপকার হয় না। দিবাতে ও রাত্রিতে ২বার অধিক পরিমাণে এবং একবার অল্প পরিমাণে ভোজন করা আবশ্যক। অতিরিক্ত ভোজনে রোগ জন্মে ও পরমায়ুঃক্ষয় হয়। বহু তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন অপকারক, অতএব উহা অল্পমাত্রায় ভোজন করিবে। অতি উগ্র বস্তু ভোজন করা উচিত নহে। অতএব স্নিগ্ধ প্রীতিকর, পুষ্টিজনক খাদ্য পরিমিতরূপে ভোজন করিবে।

দুষ্টোষ্মা।

(ম্যালেরিয়া)

আনূপেষু চ দেশেষু প্রত্যন্তপর্ব্বতাদিষু।
উপত্যকাসু ঘোরাসু নিবিড়েষু বনেষু চ॥
ভূমেরার্দ্রতয়া যেষু জায়ন্তে জন্তবৌদ্ভিদাঃ।
দূষিতাপ প্রণালীভির্যুক্তে স্থানে বিশেষতঃ॥
সংকীর্ণমার্গৈর্যুক্তে বিশালে নগরে তথা।
দূষিতোদকসম্পন্নে গ্রামেষু নগরেষু চ॥
দুষ্টবাষ্পসমুদ্ভূতো বিষবৎ প্রাণনাশকঃ।
জায়তে প্রবলো রোগো দুষ্টোষ্মা নামতঃ কচিৎ॥

জলাভূমি, পর্ব্বতের পাদদেশের আর্দ্র ভূমি, উপত্যকা, নিবিড় জঙ্গল, যেস্থলে ভূমির আদ্রতাপ্রযুক্ত নিরন্তর জন্তু ও উদ্ভিদবিকার জন্মিতেছে, দূষিত পয়ঃপ্রণালীযুক্ত স্থান, সংকীর্ণবর্ত্ম-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড নগর, দূষিত জলবিশিষ্ট গ্রাম ও নগর ইত্যাদিস্থলে নিরন্তর পীড়াজনক বিষের ন্যায় প্রাণনাশক দূষিত উষ্মা উত্থিত হইয়া থাকে। তাহা হইতেই দেশব্যাপী ও মারাত্মক দুষ্টোষ্মা (ম্যালেরিয়া) নামক ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

রোগস্যাস্য নিদানানি নিশ্চিতানি ন চেদিতঃ।
তথাপি মূলমস্যৈবং বিদ্বদ্ভিরনুমীয়তে॥
কোথক্লেদ সমুত্থাভিরুষ্মাভিশ্চ বিশেষতঃ।
রোগিণাং মলমূত্রাদ্যৈঃ শ্বাসবায়ুভিরেব চ।
বাষ্পৈঃ সংদূষিতো বায়ুং তত্রত্যাং সরসাং পয়ঃ॥
দূষয়েত্তৎস্থলং সম্যক্ তস্মাদ্ব্যাধিঃ প্রজায়তে।
মহদ্বৈ বৈশসং ঘোরমকস্মাত্তত্র জায়তে॥

এই রোগের নিদান যদ্যপি অদ্যাবধি সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হয় নাই, তথাপি পণ্ডিতগণ ইহার এইরূপ নিদান স্থির করিয়া থাকেন যে, মারাত্মক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মল, মূত্র ও শ্বাসবায়ু দ্বারা তত্তৎপ্রদেশস্থ বাষ্প দূষিত হইয়া সলিলরাশি ও বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে। সেই দূষিত জলপান ও বায়ু সেবনমাত্রেই মানবদেহে বিষময় বাষ্প ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রবলবেগে প্রবেশ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলে। এই ভীষণ রোগ সময়ে সময় কত দেশ ছারখার হইয়া যায়।

ব্যাধয়স্তে তু সপ্তাহাংস্ত্রীংস্তথা চতুরোঽহপরা।
আক্রম্য লোকান তত্রত্যান মহসা ভূয়সা তথা॥
তান্‌ প্রাপয়িত্বা নিধনং নিবর্ত্তন্তে স্বয়ং শনৈঃ।
তাদৃগভীষণরোগস্য জন্তূনাং মলমূত্রকম্‌॥
ন ক্ষিপেৎ সলিলে ভূমিসাৎকুর্য্যাত্তৎ প্রযত্নতঃ।
বসনং বহ্নিসাৎকুর্য্যাৎ গন্ধধূমং গৃহেঽর্পয়েৎ॥
মারীভয়েষু যস্মিন্‌ গেহে প্রবিষ্টোঽস্মিন্‌ ন চাময়ঃ।
তত্তদ্‌গৃহগতং ত্ববামপসার্য্য বিদূষিতম্‌॥
জ্বালয়েৎ সম্মুখে বহ্নিং ধূপসর্জ্জরসাদিভিঃ।
সর্ব্বদা পরিচ্ছন্নং রক্ষিতব্যং হিতেচ্ছয়া॥
গোময়েন বিলিম্পেচ্চ গৃহং পূতিনিবৃত্তয়ে॥

এই ব্যাধি ৩।৪ সপ্তাহকাল প্রবল বেগে জনসমাজকে আক্রমণ করিয়া লোকক্ষয়ান্তে স্বয়ংই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল রোগীর মল মূত্রাদি জলে বা অন্য কোনস্থলে নিক্ষেপ না করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করাই কর্ত্তব্য। রোগীর বস্ত্রাদি বহ্নি সহযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। রোগীর গৃহমধ্যে ধূপ, ধূনা ও গুগ্‌গুলাদি জ্বালাইবে। যে গৃহে এই রোগ প্রবেশ করে নাই, মারীভয়ে তত্তৎ গৃহস্থ আবর্জ্জনারাশি বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়া গৃহের সম্মুখে অগ্নি জ্বালাইবে। গৃহ সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য গোময় বা অন্য কোন চূর্ণাদি লিপ্ত করিবে।

সংক্রামক রোগ।

নিঃশ্বাসাদ্‌গাত্রসম্পর্কাৎ সহ শয্যাসনাশনাৎ।
রাজযক্ষ্মা প্রমেহাশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ॥
কুষ্ঠোপদংশো রোমান্তী মসূরী চ বিসূচিকা।
এতে চান্যে গদা যস্মাৎ সংক্রামন্তি নরান্নরম্‌।
তস্মাৎ সংক্রামকা জ্ঞেয়াশ্চান্তিমে তু বিশেষতঃ॥
গোবীজং মানুষাদ্বীজাচ্ছুভকৃন্নাত্র সংশয়ঃ।
বাল্যে বীজনিধানং তু রোমান্তীরোগনাশনম্‌॥
রোমান্তিকায়াশ্চ বিসূচিকায়াঃ
ন স্যাচ্চিকিৎসেতি বদন্তি ধীরাঃ।
সংক্রামরোগেণ মৃতস্য জন্তোঃ
দেহস্য সদ্যুক্ষণমেব ভব্যম্‌॥
সমাহিতস্যাস্য ফলং বিষাক্তং
অতো ন তং ভূমিতলে নিখন্যাৎ।
বিসূচিকারোগমৃতস্য জন্তোঃ
ক্ষুণ্ণং বপুর্ভূমিসমাহিতস্য॥
কালাত্যয়ে প্যাগমবিদ্ভিরেবং
দৃষ্টং সদেহং ন বিষং প্রণষ্টম্‌॥
পঞ্চহস্তভূমিতলে যত্নতঃ প্রোথয়েৎ শবম্‌॥

রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, নেত্রাভিষ্যন্দ, কুষ্ঠ, উপদংশ, বসন্ত, হাম ও বিসূচিকা প্রভৃতি এই কয়েকটী রোগ নিঃশ্বাস বায়ু, একশয্যায় শয়ন, বাস ও ভোজনাদি বশতঃ একদেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে সংক্রামক রোগ বলে। ইহাদের মধ্যে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগই অতিশয় গুরুতর। কিন্তু বাল্যকালে টীকা দিলে বসন্তরোগের ভীষণ পীড়ন হইতে একপ্রকার নিস্তার পাওয়া যায়। গোবীজ ও মানববীজ এই দুইপ্রকার বীজ হইতে টীকা দেওয়া হয়। মানববীজ অপেক্ষা গোবীজ উপকারক। কারণ

তাহাতে তত অপকারের আশঙ্কা নাই। বিসূচিকা (ওলাউঠা) অতিশয় ভীষণ ও মারাত্মক। ইহা যখন যে দেশে আবির্ভূত হয়, তখন সেই দেশকেই একেবারে নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলে। কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকা রোগের ঔষধই নাই। বোধ হয় তাহা অলীক নহে। কারণ, উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রায় রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যাইতেছে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও পূতিগন্ধ নিবারণ করিলে কখন কখন উপকার হইয়া থাকে। সংক্রামক রোগে মৃত মানবের দেহ ভূমিতে প্রোথিত করা অপেক্ষা ভস্মসাৎ করাই ভাল। কারণ বহুকাল পরে সমাধিস্থান ভেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে রোগজনক বিষ তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অতএব প্রোথিত করিতে হইলে মৃতদেহ অন্তত পাঁচ হস্ত নিম্নেই প্রোথিত করা উচিত।

জ্বরবিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যোগবাহঃ পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃৎ তেজসাযুক্তঃ শীতকৃৎ সোম সংশ্রয়াৎ॥

বায়ু যোগবাহ অর্থাৎ যখন যাহার সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম অনুসরণ করে। তেজঃ স্বরূপ পিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া দাহ প্রভৃতি পৈত্তিক উষ্ণ লক্ষণ উপস্থিত করে এবং শৈত্য গুণসক্ত শ্লেষ্মার সহিত যুক্ত হইয়া শীত প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক লক্ষণ উৎপাদন করে।

বায়ু ও পিত্তপ্রকোপ জন্য জ্বরে—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিরোবেদনা, (মাথাধরা) কণ্ঠ ও মুখের শোষ, (শুকাইয়া যাওয়া, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা ও হাই উঠা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে শরীরে আর্দ্রবস্ত্রাবরণবৎ বোধ হওয়া, সন্ধিস্থল সমুদায়ে ভঙ্গবৎ বেদনা, অতিশয় নিদ্রা, শিরোবেদনা, মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, কাস, অধিক ঘর্ম্ম নির্গম শরীরে সন্তাপ এবং জ্বরের মধ্যম বেগ এই লক্ষণগুলি লক্ষিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে—মুখ কফ দ্বারা লিপ্ত ও তিক্ত, নিদ্রার আবেশ, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা এবং কোন সময়ে দাহ ও কোন সময়ে শীত এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষ জন্য জ্বরে—কোন সময়ে দাহ, কোন সময়ে শীত, সন্ধিস্থল ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুস্রাব যুক্ত, আবিল (অপরিষ্কার, ঘোলাটে) ও বক্র, কর্ণে বেদনা ও নানাবিধ শব্দ শ্রবণ, কণ্ঠদেশে ধান্য শূকাদি বিদ্ধ হইলে যেরূপ বোধ হয় সেইরূপ বোধ করা, নিদ্রার আবেশ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা দগ্ধবৎ ও খরস্পর্শ, অঙ্গের শৈথিল্য, কফমিশ্রিত রক্ত ও

পিত্ত নিষ্ঠীবন, ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে বেদনা, দীর্ঘ কালান্তে অল্প পরিমাণ ঘর্ম্ম নির্গম ও মল মূত্রের প্রবৃত্তি শরীরের অনতিশয় কৃশতা, কণ্ঠ হইতে নিরন্তর শব্দ বিশেষের নির্গমন, শরীরে শ্যাব (ধূম্র) বা রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, বাক্‌রোধ, মুখ নাসিকাদি স্রোতঃ পথের পাক, উদর ভার ও দীর্ঘকালে দোষের পরিপাক এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

যে যে জ্বরের যে সমস্ত লক্ষণ লিখিত হইল, সর্ব্বত্র ইহার সমস্ত লক্ষণ একেবারে উপস্থিত হয় না। যদি কোন জ্বরে সমস্ত লক্ষণ সমভাবে উদিত হয়, তবে রোগ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। সমস্ত রোগই সাধ্য, অসাধ্য ও কষ্টসাধ্য এই তিনপ্রকার। নির্দ্দিষ্ট উপসর্গ বা লক্ষণের কতিপয় হীনবল লক্ষণাক্রান্ত রোগ সহজসাধ্য, কতিপয় প্রবল লক্ষণাক্রান্ত রোগ কষ্টসাধ্য এবং প্রবল সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত রোগ অসাধ্য। অসাধ্য রোগে শীঘ্রই জীবন বিনাশের সম্ভাবনা। কতকগুলি রোগ ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, যাপ্য হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ঐ যাপ্য রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ঔষধ সেবনে অথবা সময় বিশেষে অল্পতা প্রাপ্ত হইয়া শরীরে যাপন করে, এজন্য উহাকে যাপ্য বলে।

চিকিৎসকের সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত লক্ষণ দ্বারা রোগের সাধ্যাসাধ্য স্থির করা আবশ্যক। চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ। কারণ উহাতে চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয়। তাহা বলিয়া কিন্তু নিরস্ত থাকা আমরা সঙ্গত মনে করি না, তবে রোগীর আত্মীয়দিগকে গোপনে জানাইয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে আর পরিণামে অপযশের সম্ভাবনা থাকে না। আমরা দেখিয়াছি প্রথমতঃ যাহাকে অসাধ্য মনে করা গিয়াছে এরূপ দুই একটী রোগী কালক্রমে সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে। কখন কখন যাহাকে সহজসাধ্য মনে করা যায়, তাদৃশ রোগও ক্রমশঃ প্রবল হইয়া মৃত্যু আনয়ন করিয়া থাকে। রোগ সহজসাধ্য বা কষ্টসাধ্যই হউক, কোনস্থলেই ঔদাসীন্য অবলম্বন শ্রেয়স্কর নহে। সময়ে সময়ে সাধ্য অসাধ্য নির্ণয়ে ভ্রান্তিও হইতে পারে অতএব সকল রোগেরই চিকিৎসা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতিঃ॥

কোন চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া চিকিৎসকের আরও কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে অধিকাংশ রোগ দেশীয় গাছ গাছড়া দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবার সময় সাবধান না হইলে শত শত ঔষধ প্রয়োগেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, পরন্তু উপকার না হইয়া অপকারই সংঘটিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা উল্লেখ না করিয়া নিবস্ত থাকিতে পারিলাম না। একটী জ্বরাক্রান্ত রোগীকে বিরেচনের (জোলাপ) জন্য দ্রাক্ষাদিপাচন ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও অনেক সময় অতীত হইয়া গেল তথাপি উদ্দেশ্য সফল হইল না, পরন্তু শরীরে একরূপ

যন্ত্রণা আনিয়া উপস্থিত হইল। চিন্তা করিয়া কেন যে বিরেচন হইল না, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যখন ব্যবস্থা করা হয় তখন উহাতে শোনালুর আটা ও কট্‌কীর ভাগ কিছু বেশীও দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হইলাম। যে মহৌষধের গুণে বহুতর-স্থলে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি, যাহাতে আমার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ছিল, আজ সেই সুধাসদৃশ বস্তুতে শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে লাগিল কিন্তু অচিরেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল।

দেখিলাম যে স্থলে ঔষধ (পাঁচন) প্রস্তুত হইয়াছিল, কতকগুলি শোনালু ফল তথায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং ঐ গুলি অতিশয় পুরাতন এবং কীটে জরজর ও বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তখন নিকটে গিয়া যেটী ভাঙ্গিতে লাগিলাম, দেখি সেই টীই সারশূন্য। কীটে ঐ গুলিকে এরূপ জরজর করিয়াছে যে তাহাতে কিছু মাত্র সারবত্তা লক্ষিত হইল না। আমার অন্তঃকরণে তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সন্দেহ হওয়ায় এক ব্যক্তিকে ঐ পাঁচনের অবশিষ্ট দ্রব্য আনিতে বলিলাম, ঐ ব্যক্তি সেই সমুদায় দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন দেখিলাম উহার মধ্যে কএকটী দ্রব্য ব্যতীত সমস্তই সারশূন্য বিশেষতঃ শোনালুর আটা এবং কট্‌কা এই দুইটী বস্তু এরূপ অসার ও কীটে জর্জ্জরীভূত যে কোন ক্রমেই উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। সেই সময়ে আমার সকল সংশয় দূর হইল এবং বুঝিলাম ভাগ্য দোষে এইরূপ অজ্ঞাত কারণে আজ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, অনবধানতা দোষে সমুজ্জ্বল আয়ুর্ব্বেদ রত্নে আজ আমরা স্বহস্তে কালিমা রেখা অঙ্কিত করিতেছি। বন হইতে সামান্য গাছ গাছড়া তুলিয়া আনিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, সেই কার্য্যে আমাদের যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমরা এরূপ ভ্রমান্ধ ও অলস হইয়া পড়িয়াছি যে, ঐ অনর্থক অর্থব্যয়কেও সুবিধা মনে করিয়া থাকি। অনেক সময়ে অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাই যে, ডাক্তারি ঔষধে কোনই ঝঞ্ঝাট নাই। ঢাল আর খাও। আর—বাঙ্গালা ঔষধের অনুপান যোগাড় করিতেই প্রাণান্ত, তার পর মধু চাই, খল চাই, নোড়া চাই, আবার পাঁচনের ব্যবস্থা হইলেই সর্ব্বনাশ। হায়! হায়! আমরা এতই অলস হইয়াছি, এতই অক্ষম হইয়াছি ও এতই বাবু হইয়াছি যে, দুই আনা মূল্যের এক খান খল ও সামান্য বন্য তৃণ সংগ্রহ করিতেও অক্ষম। পক্ষান্তরে প্রচুর মূল্যে বিবিধরূপ ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের গ্লাস কিনিয়া গৃহ সুসজ্জিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। ফলতঃ সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়াই আমরা মজিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনুকরণ প্রিয়তাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।

অনেকেই বলিয়া থাকেন ও মনে করেন, আমরা সভ্য হইয়াছি, চতুর হইয়াছি, এবং আমাদের বুদ্ধি বাড়িয়াছে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় লোক সমুদায়ের শারীরিক বলের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলের ও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বাড়িয়াছে কেবল প্রতারণা প্রবঞ্চনা। পরকে ঠকাইতে পারিলেই বুদ্ধি কৌশল মনে করি; ও তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না। এই প্রতারণাই

আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির অন্যতম কারণ। আমি বেণে দোকানে ইন্দ্রজব চাহিলাম, তাহার দোকানে হয়ত ইন্দ্রজব নাই, ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না, অগত্যা সে আমায় তাদৃশ অপর একটী বস্তু দিয়া বিদায় করিল। বোধ হয় সকলেই জানেন, বেণে দোকানে আকাশ কুসুম, শশশৃঙ্গ, প্রভৃতি যাহা কিছু চাহা যায়, কোন বস্তুরই অভাব হয় না। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি দ্রব্য বেদের নিকটেও লইতে হয় তাহাতেও ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। অপামার্গের শিকড় চাহিলে হয়ত, তদভাবে সে আমাকে কালকাশন্দার শিকড় দিয়া বিদায় করিল।

আমাদেব দেশের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে, তার উপর আবার আমরা উদ্ভিদ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। নাগরিক লোকেরা পল্লীবাসিদিগকে সকল বিষয়েই ঘৃণা করেন, কিন্তু বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি রাজ্যে সামান্য কীট ও সম্পূর্ণ ঘৃণার পাত্র নহে। দেখিতে গেলে আপেক্ষিক উৎকর্ষ অপকর্ষ সকল পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনিতে পাই যাঁহারা সর্ব্বদা কলিকাতায় বাস করেন, অন্য স্থান দেখেন নাই, সময়ে সময়ে তাঁহারা ধানের গাছে চড়িতে চান। ঐরূপ নারিকেল শূন্য উত্তর পশ্চিম বাসীগণ নারিকেলকে পূর্ব্বদেশজাত লতাবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কারণ তাহারা কখন ধানের গাছ বা নারিকেল বৃক্ষ দেখেন নাই। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা নগরবাসীদের উদ্ভিদ্ সম্বন্ধ সহজেই অনুমান করা যায়, সুতরাং উক্তরূপে প্রতারিত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদের উপস্থিত ক্ষেত্রে নাগরিক অপেক্ষা পল্লীবাসী অনেক উৎকৃষ্ট, কারণ গাছ গাছড়ার বিষয়ে তাহারা অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ।

আজ কাল আবার দেশের শিক্ষা প্রণালী যেরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাতে চিকিৎসকদিগেরও উদ্ভিদ্ বিষয়ক কোন জ্ঞান জন্মে না, কারণ অধুনা কলিকাতাই ভারতবর্ষের প্রধান স্থান, শিক্ষার ও প্রধান স্থান। কলিকাতায় যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ অতি বিরল। যদি কলিকাতা বা তাহার নিকটে একটী উদ্যান থাকিত এবং তাহাতে আমাদের দেশীয় চিকিৎসোপযোগী উদ্ভিদ্ সমুদায় রোপিত হইত, তাহা হইলে শিক্ষার্থীদিগের যে বিশেষ শিক্ষালাভ হইত, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অনেকবার বলিয়াছি, আমরা সহায়হীন, অর্থহীন। আমাবা রাজকৃপায় বঞ্চিত, রাজপ্রতিনিধিগণের কৃপায় বঞ্চিত, ভাগ্যদোষে দেশীয় রাজা মহারাজাদিগের কৃপায়ও বঞ্চিত। আন্তরিক ইচ্ছাসত্ত্বেও কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই কলিকাতা রাজধানীতে একটী স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসালয় (জেনানা হস্‌পিট্যাল) প্রতিষ্ঠিত হইল। কত অর্থ ব্যয় হইল, কত সভা সমিতি হইল, কত ধুম ধাম আড়ম্বর হইল। ঐ অর্থ কোথা হইতে আসিল? ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছে কি? বোধ হয় না, বিশেষ জানি না যদিও আসিয়া থাকে, তবে অত্যল্প। এই ভারতবর্ষ হইতে, এই ভারতের রাজা, মহারাজা জমিদারগণই সমস্ত অর্থ আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রদান করিয়াছেন; ভালই

হইয়াছে, দেশের একটী মহদুপকার সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উচিত কথা বলিতে হয়, তাই বলি, প্রকৃত অভাব যাঁহাদের, যে সমস্ত দরিদ্র ভদ্র সন্তান অর্থ ব্যয় করিয়া পরিবারদিগের সুচিকিৎসা করাইতে অক্ষম, তাঁহাদের উপকার হইয়াছে কি? বোধ হয় না। ভদ্র মহিলাগণ অদ্যাপিও ততদূর শিক্ষা বা উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই, যাহাতে চিরদিনের বিনয়, নম্রতা লজ্জা, মান পরিত্যাগ করিয়া ঐস্থানের চিকিৎসা দ্বারা উপকার লাভ করেন। অনেকদিন হইতে চলিল ঐ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ভদ্র মহিলা তথায় গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। যাহাদের উপকার হইতেছে, ইতিপূর্ব্বেও তাহাদের সুবিধা ছিল, কারণ তাহারা মেডিকেল কালেজ, ক্যাম্বেল হস্পিট্যাল ও মেওহস্পিটাল প্রভৃতি স্থানে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। হইতে পারে তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, ফলতঃ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। আর যদি নাম কেনাই উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্যই সফল হইয়াছে।

কিছুদিন হইল একটী আতুরাশ্রমের জন্য কলিকাতার মান্যগণ্য কবিরাজমণ্ডলী সমবেত হইয়া সভা সমিতি করিলেন, কর্ত্তব্য স্থির হইল, রাজানুমতি প্রার্থনা করা হইল, দেশীয় ধনবানদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইল, পত্রিকা সম্পাদকগণ ঐ বিষয় কিছুদিন লেখালেখি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অরণ্যে রোদনের ন্যায় সমস্তই বিফল হইয়া গেল। এস্থলে বলা উচিত যে, উত্তরপাড়া নিবাসী কতিপয় মহোদয় আশাতীত অর্থপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদিগকে পরম পুলকিত করিয়াছেন এবং যথার্থ পরোপকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। ঐরূপ একটী কার্য্য যদি সম্পন্ন হইত, তবে কি দেশের উপকার হইত না? চিরদিনের অভাব দূর হইত না? যাহা হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর উপকার হইত না? জাতীয় উন্নতি সাধিত হইত না? অবশ্যই হইত। কিন্তু হইলে কি হইবে তাহাতে নাম নাই, উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই, কেন হইবে? তাই বলিতেছি দোষ কাহারও নয়, দোষ আমাদের অদৃষ্টের।

জ্বরচিকিৎসা।

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥

যে সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা শরীরে ধাতু সমুদায় সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই চিকিৎসা এবং উহাই চিকিৎসকের কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ধাতু সকলের বৈষম্যই বিকার অর্থাৎ রোগ এবং ঐ সকলের সমতাই আরোগ্য। যে সমুদায় কারণে শরীরে দোষ দূষ্যাদি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদায় নিদান পরিত্যাগে কতকগুলি রোগ প্রতীকার হয়, আর কতগুলি রোগে উপস্থিত কার্য্য অর্থাৎ বর্ত্তমান পীড়ার প্রতীকারে চেষ্টা করিতে হয়। কোন কোন স্থলে কার্য্য ও কারণ উভয়েরই প্রতিকারে চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়। শীত সবাজন্য কফজ্বরে শুণ্ঠ্যাদি উষ্ণ বস্তু দ্বারা শৈত্যরূপ কারণের বিনাশ হইলেই পীড়া

প্রতিকার হইয়া থাকে, ইহাকেই হেতু-বিপরীত চিকিৎসা বলে, যথা—

শীতে নোষ্ণকৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্‌বিদঃ।
যেচ শীতকৃতা রোগা স্তেষামুষ্ণং ভিষগ্ জিতম্॥

উষ্ণ কারণ জনিত রোগ শৈত্যসেবা দ্বারা প্রতিকৃত হয় এবং শৈত্যসেবা জনিত রোগ উষ্ণসেবাতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে জ্বরাদি ব্যাধিনাশক দ্রব্য সমুদায়ই জ্বরাদি ব্যাধি-জনক দোষ সমুদায়েরও বিরোধী এবং বিনাশক, কিন্তু দোষ বিরোধী বস্তুমাত্রই যে ব্যাধিনাশক তাহা নহে, সুতরাং ব্যাধি বিপরীত চিকিৎসা দ্বারা সত্বর কৃতকার্য্য হওয়া যায়। বাস্তবিক যদি ব্যাধি বিপরীত কার্য্যই হেতুরও বিপরীত হয়, তবে কেবলমাত্র ব্যাধি বিপরীত পদার্থ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। পুনশ্চ যদি দোষ সমুদায়কে নিমিত্ত কারণ স্বীকার করা যায়, তবে দোষের উচ্ছেদে ব্যাধির উচ্ছেদ সাধন হইতে পারে না, কারণ ঘটাদির জনক কুম্ভকার বা দণ্ডাদির বিনাশে কখনই ঘটের বিনাশ হয় না। মীমাংসা স্থলে বলিতে হইবে যে, যেখানে কার্য্য নিমিত্তকারণাশ্রয়ি হয়, সে স্থলে ঐ কারণের নাশে কার্য্যেরও নাশ হয়। যেরূপ তৈলও বর্ত্তিনাশে প্রদীপের বিনাশ হয়, তদ্রূপ প্রায়শঃই ব্যাধিরূপ কার্য্য দোষস্বরূপ নিমিত্ত কারণাশ্রয়ি, সুতরাং নিমিত্ত কারণ দোষের বিনাশে তদাশ্রয়ি ব্যাধিরূপ কার্য্যের অবশ্যই বিনাশ হইয়া থাকে। ব্যাধি বিপরীত যথা, অতিসার রোগে মল-স্তম্ভন পাঠাদি কাথ এবং কুষ্ঠরোগে খদিরাদি। এইরূপ চিকিৎসা স্বীয় প্রভাবে রোগের বিনাশ করে, রোগারম্ভক দোষ ক্রিয়ান্তর কিম্বা আপনা হইতেই শমতা প্রাপ্ত হয়। হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত চিকিৎসা যথা, বাতজনিত শোথে বাতহর এবং শোথহর দশমূল কাথাদি।

দেখিতে গেলে ইদানীন্তনী চিকিৎসা সমুদায়ের মধ্যে উল্লিখিত (হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত ও হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত) তিন প্রকার চিকিৎসাই সমধিকভাবে প্রচলিত, যেহেতু উক্তরূপ চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ। অপর ত্রিবিধ (হেতুবিপরীত ব্যাধিবিপরীত ও হেতু ব্যাধি উভয়ের বিপরীত না হইয়াও বিপরীত কার্য্যকরী) চিকিৎসা দুরূহ এবং অতীব জ্ঞান ও বিবেচনা সাধ্য ও রোগ বিশেষোপযোগিনী। আধুনিক কোন চিকিৎসা ঐরূপ হেতু সদৃশ প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং নূতন বলিয়া উহার প্রবর্ত্তককে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে কি হাকিমী, কি এলোপ্যাথি, কি হোমিওপ্যাথি কিছুতেই নূতনত্ব পাই না। হইতে পারে বহু প্রয়াসে ও অর্থব্যয়ে ক্রমশঃ সংস্কৃত ও সাধারণে প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু নূতন বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়। যাহারা কখনও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মহিমা অবলোকন করেন নাই, যাহারা সেই অমূল্য রত্ন প্রত্যক্ষ করেন নাই, যাহারা সেই সর্ব্বসঞ্জীবনী সুধা পান করেন নাই, তাহারাই বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েন, না দেখিয়া না জানিয়া অনর্থক

আর্য্য চিকিৎসায় দোষারোপ করেন। প্রকৃত সদ্‌যুক্তি সদুপদেশ কিছুই তাহাদের আর ভাল বলিয়া বিবেচনা হয় না।

পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি,
তিক্তায়তে হংস কুলাবতংস।

মহাকবি শ্রীহর্ষ একস্থলে লিখিয়াছেন—পিত্ত দ্বারা রসনা পীড়িত (তিক্ত) হইলে সিত শর্করাও তিক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও তাই ঘটিয়াছে। বিকৃত আস্বাদে বিকৃত উপদেশেও বিকৃত শিক্ষায় সমস্তই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, দেশীয় সদস্ত সদুপদেশ এবং সৎশিক্ষা আর সৎ বলিয়া মনে ধারণা হয় না। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমুদায়ই একটী অক্ষুণ্ণ অবিনাশি সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নচেৎ দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচারে আজ ইহার নাম পর্য্যন্তও শুনিতে পাওয়া যাইত না। ইহার মূলে যদি সত্য না থাকিত তবে আজ কোটি কোটি কুঠারাঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া বালুকাকণার ন্যায় কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহার কোনই নিশ্চয়তা থাকিত না। এই সুবিশাল বিশ্বে যত জাতি উন্নত হইয়াছেন, সকলেই হিন্দু জাতির মস্তকে পদ নিক্ষেপ করিয়া, হিন্দু স্কন্ধে দাড়াইয়াই আজ সকলে উন্নত ও উচ্চ ফল লাভ করিতেছেন।

আমরা এখন অসার বৃক্ষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যেরূপ বৃক্ষের ফল আহৃত হয় এবং বৃক্ষ স্বীয় ফলের আস্বাদন কিছুই উপভোগ করিতে পারে না, আমরাও ঠিক সেইরূপ। আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াই বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা প্রভৃতি সুফল সমস্ত অপর লোকের হস্তগত হইতেছে, অথচ আমরা তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত। আমরা ক্ষমতা হীন, অশক্ত সমস্ত নিগ্রহ, সমস্ত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু নূতন, আমাদের ছিল না, একূপ অন্যায় সমালোচনা অবশ্যই অসহনীয়। যাহা হউক এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নহে, নূতন বা পুরাতন, ভবিষ্যতে সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব, অর্থাৎ আমাদের কি ছিল না, কি নূতন হইয়াছে সমস্তই দেখাইব। এবারে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সমস্ত রোগেরই চিকিৎসা করিতে হইলে দোষ দূষ্য সমুদায়ের অংশাংশ কল্পনা অর্থাৎ দোষ দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিতে হয়। এতাদশী চিকিৎসাই সমধিক আশু ফল-প্রদায়িনী। পরন্তু যে স্থলে অংশাংশ কল্পনা সুকঠিন, সেস্থলে সাধারণ বিধিবিহিত চিকিৎসাই করা হইয়া থাকে।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্যতে।
ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥

যেস্থলে বাত, পিত্ত ও কফের অংশাংশ অর্থাৎ কোন দোষের প্রাবল্য, কোন্ দোষের অল্পতা, বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় না, সেখানে সাধারণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে।

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ॥

সাধারণতঃ জ্বরিতব্যক্তি নির্ব্বাত গৃহে স্থূল ও উষ্ণ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া অবস্থান করিবে। আবশ্যক হইলে ব্যজনানিল সেবন করিবে। তালবৃন্ত সঞ্চালিত অনিল তৃষ্ণা ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা ও

শ্রান্তি দূর করে। পিপাসা হইলে সকল সময়েই ত্রিপাদ বা অর্দ্ধাবশিষ্ট শৃত-শীতল (উষ্ণ করিয়া ঠাণ্ডা করা) জল পান করিবে। অনেক অজ্ঞলোক তৃষ্ণায় রোগী ছটফট্ করিতে থাকিলেও জল দিতে স্বীকৃত নহেন, বাস্তবিক উহা অতীব গর্হিত কার্য্য।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষাৰ্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥

গুরুতর তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রোগীর প্রাণ বিনাশ করিতে পারে, অতএব তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে অবশ্যই পূর্ব্বোক্তরূপ জল পান করিতে দেওয়া উচিত। তন্মধ্যে অধিক পরিমাণে না দিয়া প্রাণ রক্ষোপযোগী অল্প পরিমাণে দেওয়াই সঙ্গত।

জ্বররোগে স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, চন্দনাদি লেপন, ঘৃতাদি স্নেহপান, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতল জল পান, ক্রোধ প্রকাশ, মুক্তবায় সেবন, ও গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এই সমুদায় সেবনে শোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্যায়াম দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি, মৈথুনে স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা, স্নেহ পানাদি দ্বারা অরুচি, মত্ততা, বমি, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। গুরু-দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা দ্বারা ভুক্ত-দ্রব্যের স্তব্ধতা, দোষের অধিকতর প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য এবং দৈহিকস্রোতঃ সমস্তের খরতা ও অতিসারাদি সংঘটিত হইয়া থাকে।

আমেন ভস্মনেবাগ্নৌ ছন্নেহন্নং ন বিপচ্যতে।
তস্মাদামদোষপচনাজ্জ্বরিতামুপবাসয়েৎ॥

অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইলে যেরূপ স্থালীস্থ তণ্ডুলের পচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, সেইরূপ আম-দোষান্বিত বাতাদি দোষ দ্বারা জঠরাগ্নি আবৃত হইলে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয় না, অতএব যে পর্য্যন্ত আম দোষের পরিপাক না হয়, তাবৎকাল জ্বরিত ব্যক্তির লঙ্ঘন অতীব প্রয়োজন।

ননু অন্নং বৈ প্রাণিনাং প্রাণা ইতি শ্রুতিঃ—
তদন্নং বিনা প্রাণিভিঃ কথং স্থাতব্যম্।
দোষাণা মেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
নাহ দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনং মহৎ॥
কফ পিত্তে দ্রবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং বহু।
আমক্ষয়াদৃদ্ধমপি বায়ু র্ন সহতে ক্ষণম্॥

অগ্নিই প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ, এরূপ স্থলে অন্ন ব্যতীত কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে।

রোগীর লঙ্ঘনে যে সহিষ্ণুতা সেই-টাই দোষের শক্তি, দোষের ক্ষয় হইলে কেহই মহৎ লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না। কফ এবং পিত্ত দ্রব ধাতু অর্থাৎ তরল পদার্থ, একারণ পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বরে রোগী অধিক লঙ্ঘন সহ্য করিতে সক্ষম হয়। বাতজ্বরী আমদোষের পরিপাক হইলে ক্ষণকালও আর লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

দোষ আমরসের সহিত মিলিত হইয়া দৈহিক স্রোতঃ পথকে রুদ্ধ করে এবং জ্বর উৎপাদন করে, অতএব জ্বরকালীন অনাহারে উপকার ব্যতীত অপকার কিছুই হয় না। সামান্যতঃ জ্বর মাত্রেই লঙ্ঘন বিধেয়। যদি পীড়া অল্প দোষ হয়, তবে কেবল লঙ্ঘন দ্বারাই শমতা হইয়া থাকে, যদি দোষের কিছু প্রাবল্য থাকে, তবে লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ দ্বারা শমতা

সাধন করিতে হয়। পাচন শব্দে কেহ যেন মনে না করেন যে দাস্তাদি বা ভার্গ্যাদি পাচন। এস্থলে পাচন শব্দের প্রকৃত অর্থ, যে ঔষধ দোষের পরিপাক করে। পাচয়তি দোষান্ পরিপাকেন শোধয়তীতি পাচনং অর্থাৎ যাহাতে দোষের ও আম রসের পরিপাক হয়।

ন কষায়ং প্রশংসন্তি নরাণাং তরুণে জ্বরে।
কষায়েনাকুলীভূতা দোষা জেতুং সুদুষ্করাঃ॥

তরুণজ্বরে কষায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কারণ কষায় দ্বারা দোষ সমুদায় স্ব স্ব মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ গমনশীল হইয়া উঠে। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, তরুণজ্বরে স্বরস প্রভৃতি কিরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে? ফলতঃ স্বরসাদির নিষেধ নহে।

পাদশিষ্টঃ কষায়ঃ স্যাৎ যঃ ষোড়শগুণাম্ভসা।
কথিতোঽতঃ ষড়ঙ্গাদি র্ন নিষিদ্ধো নবজ্বরে॥

ষোড়শ গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ চতুর্ভাগাবশিষ্ট যে ক্বাথ তাহাই নিষিদ্ধ, ষড়ঙ্গ পানীয় প্রভৃতি নিষিদ্ধ নহে। ষড়ঙ্গ পানীয়াদি ক্রমশঃ লিখিত হইবে।

অন্যচ্চ—
দোষাবৃদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিতা স্তরুণজ্বরে।
স্তভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরম্॥

কষায় সমুদায় স্তম্ভন, শীত রূক্ষ ও পিত্তকফাপহ। অতএব তরুণ জ্বরে অজ্ঞানবশতঃ কষায় ঔষধ প্রযুক্ত হইলে দোষ সমুদায় বিবৃদ্ধ ও স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয় সুতরাং পরিপাক হইতে পারে না, পরন্তু বিষমজ্বর আনয়ন করে।

এতাবতা স্থির করিতে হইবে যে, যতদিন জ্বরের আম অবস্থা অর্থাৎ অপক্ব লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল মুখ্য ঔষধ প্রয়োগ অতীব অহিতজনক।

পাচকাগ্নির লাঘববশতঃ ভুক্তবস্তুজাত রস পরিপাক না হইয়া দেহে সঞ্চিত থাকে, উহাকেই আমরস বলে। কেহ কেহ সঞ্চিত মলকে, কেহ কেহ অন্ন রসকে, কেহ কেহ বা দোষের প্রথম দুষ্টিকে আম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। দোষ দূষ্য ঐ আমরসের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে ঐ ব্যাধিকে "সাম" বলা যায়। ফলতঃ যৎকাল পর্য্যন্ত জ্বরারম্ভক প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য শরীরে বিদ্যমান থাকে, ততদিনই ব্যাধির সামতা স্থির করিতে হইবে। ঐ অবস্থায়ই মুখ্য ভেষজ নিষিদ্ধ।

আসপ্তরাত্রাত্তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ।
দ্বাদশাহ মতিব্যাপ্য মধ্য জীর্ণং ততঃ পরম্॥

প্রথম হইতে সপ্তম দিন পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণাবস্থা, দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থা এবং তদনন্তর জীর্ণাবস্থা। এই জন্যই বলিয়াছেন—

পাচয়েদাতুরং সামমৌষধং সপ্তমে দিনে।
শমনেনাথবা দৃষ্টা নিরামং তমুপাচরেৎ॥

আমাবস্থাপন্ন রোগীকে সপ্তম দিবসে ঔষধ সেবন করাইবে অর্থাৎ কেহ কেহ ছয়দিন পর্য্যন্ত জ্বরের আমাবস্থা ও তৎপরে নিরামাবস্থা ব্যাখ্যা করেন।

যদি ঐ সপ্তম দিবসের মধ্যেও জ্বরের নিরামাবস্থা দৃষ্ট হয়, তবে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। কেহ কেহ ষড়হ গত হইলে কেহ কেহ সপ্তাহ গত হইলে জ্বরের নিরামাবস্থা স্থির করিয়াছেন।

মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজানীয়া জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্ ॥
অন্যচ্চ—ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবং।
দোষপ্রবৃত্তিরুৎসাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্ ॥

জ্বরের মৃদুতা দেহের লঘুতা এবং বাতপিত্ত কফ ও মল মূত্রাদির যথোচিত মার্গে গতি হইলে দোষ পক্ক অর্থাৎ দোষের পরিপাক হইয়াছে জানিতে হইবে ঐ সময়ে ঔষধ প্রদান করা উচিত।

অপর—ক্ষুধা, শরীরের ক্ষীণতা জ্বরের মৃদুতা দোষ সমুদায়ের স্ব স্ব পথে সঞ্চার ও মনের উৎসাহ এই সমস্ত নিরাম জ্বরলক্ষণ।

যিনি ষড়হের পর এই সমুদায় লক্ষণ দেখিয়াছেন, তিনি ষড়হের পর, যিনি বহুলভাবে সপ্তাহের পর উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি সপ্তাহের পর জ্বরের নিরামাবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে কেহ কেহ দশম বা দ্বাদশাহের পরও জ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিরামাবস্থা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং পরস্পর মতভেদ দেখা যায়।

আমাদের জ্ঞান ও বিবেচনায় সপ্তাহ বা দশাহ বিবেচনা না করিয়া দোষ দূষ্যের লক্ষণ দেখিয়া জ্বরের সাম ও নিরামাবস্থা নির্ণয় করাই বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। অনেক সময় ৭ দিনেই জ্বরের নিরামাবস্থা দেখা যায়, আবার ৮।৯ দিনেও নিরাম লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদিচ প্রায়শঃই সপ্তম দিবসে জ্বর নিরাম হয়, তথাপি দোষ দূষ্য ও উক্ত লক্ষণ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলেই সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

ত্রিরাত্রাৎ পর মেতস্য ব্যর্থমৌষধ কল্পনম্ ॥

বৈদারিক জ্বরে তিন দিবসের পর ঔষধ প্রদান করিলে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ তিনদিনের মধ্যে উপযুক্ত ঔষধ প্রদান না করিলে নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে বৈদারিক জ্বর উৎপত্তিমাত্রেই ঔষধ প্রদান করিবে। অন্যান্য প্রকার জ্বরেও ঐরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণং।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রস চিকিৎসিতে ॥

তন্ত্রোক্ত রস চিকিৎসায় দোষ, রোগ, রোগী, দেশ ও কাল কোন বিষয়েরই পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ রস চিকিৎসা সকল পীড়ার সকল অবস্থাতেই হইতে পারে। ফলতঃ অষ্টাহ অতীত না হইলে ঔষধ প্রয়োগ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মিকা।

প্রবল জ্বরকালে অগ্নিকুমার, হিঙ্গুলেশ্বর, লক্ষ্মীবিলাস, মৃত্যুঞ্জয় ও স্বচ্ছন্দভৈরব প্রভৃতি অণুবটিকা সকল অনুপান বিশেষের সহিত প্রদান করিলে ক্রমশঃ দোষের পরিপাক ও জ্বরের লাঘব হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমার রস প্রস্তুত প্রণালী।

মরিচোগ্রা কুষ্ঠমুস্তৈঃ সর্ব্বৈরেব সমং বিষম্।
পিষ্ট্বা চার্দ্ররসেনৈব বটিকা রক্তিকা মিতা ॥
আমজ্বরে প্রথমতঃ শুণ্ঠ্যাচ মধুপিষ্টয়া।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি নির্গুণ্ড্যাশ্চ কফজ্বরে ॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আর্দ্রকস্যচ বারিণা।
অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গেন শোথে সদশমূলকঃ।
গ্রহণ্যাং সহ শুণ্ঠ্যা চ মুস্তকেনাতিসারকে।
সামে চ ধান্যশুণ্ঠীভ্যাং পক্বে চ কুটজং মধু ॥

সন্নিপাত জ্বরারম্ভে পিপ্পল্যার্দ্রকরাম্বিণা।
কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈল-গুড়ান্বিতম্॥
পীত্বা বটীদ্বয়ং রোগী স্বাস্থ্যং সমুপগচ্ছতি।
সর্ব্বেষা মেব রোগাণা মামদোষ প্রশান্তয়ে।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো নাম্না বিখ্যাতোঽগ্নিকুমারকঃ॥

মরিচ ।০ আনা, বচ ।০ আনা, কুড় ।০ আনা, মুতা ।০ আনা ও শোধিত বিষ ১ তোলা একত্র আদার রসে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। জ্বরের আম অর্থাৎ অপক্কাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধুসহ একএকটী সেবনে অত্যাশ্চর্য্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতি অবস্থায় ইহার ন্যায় আশু ফলপ্রদ মহৌষধ দেখা যায় না। জ্বরে শ্লেষ্মার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইলে আদা কিম্বা নিশিন্দা পত্রের রস সহ সেবনে শীঘ্রই উপকার হইতে দেখা যায়। পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে আদার রস, অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গ চূর্ণ ও মধু, শোথে দশমূলের কাথ, গ্রহণী রোগে শুণ্ঠী চূর্ণ, অতিসারে মুতার রস, আমাতিসারে ধন্যা ও শুণ্ঠীর কাথ, পক্কাতিসারে কুটজ কাথ ও মধু, সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় পিঁপুলচূর্ণ ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস (শুষ্ক হইলে কাথ) এবং শ্বাসে সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড় সহ প্রাতে একটী ও সন্ধ্যায় একটী সেবন করিবে। ইহা দ্বারা পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্নিকুমার।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, উক্ত ঔষধের যে সমুদায় গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহার একটীও অতিশয়োক্তি নহে। আমরা বহু স্থলে বহু রোগকে অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ফলতঃ যে কোন পীড়ার আমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী ক্রমশঃ দেওয়া যাইবে।

জ্বরে তৃষ্ণা প্রবল থাকিলে—মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ প্রত্যেক ।৵১০ আনা পরিমাণে লইয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রস্তর বা কাঁচ পাত্রে রাখিবে। শীতল হইলে মধ্যে মধ্যে এই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিতে দিলে জ্বর ও আশু তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহার নাম ষড়ঙ্গ পানীয়।

যদিও জ্বরে বমন বিরেচন নিষিদ্ধ, তথাপি আবশ্যক হইলে অবস্থা বিশেষে বমন বিরেচন দ্বারা অতি সত্বর উপকার হইয়া থাকে।

(নিষিদ্ধ মপি সংশোধনং অবস্থা বিশেষে দেয়ম্)
সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্ভটঃ॥

ভোজনের পরক্ষণে কিম্বা সন্তর্পণজন্য জ্বরে বমন সহ ব্যক্তির বমন প্রশস্ত ও হিতকর। (যে ক্রিয়া দ্বারা শরীরে রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি হয় তাহাকে সন্তর্পণ বলে) বৃদ্ধ, কৃশ ও গর্ভিণীকে কখনই বমন করান উচিত নহে। লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল সমধিকরূপে পান করাইয়া বমন করান অতি সহজ। ইহাতে শরীরে বমন জন্য বিশেষ কোন গ্লানি উপস্থিত হয় না।

বমিতং লঙ্ঘয়েৎ প্রাজ্ঞো লঙ্ঘিতং নতু বাময়েৎ॥

বমিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করাইবে, কিন্তু লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে কদাচ বমন করান বিধি সঙ্গত নহে।

বাতিক জ্বরে—ষড়হঃ বা সপ্তাহের পর পূর্ব্বোক্ত আমদোষের পরিপাক লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীকে লঘু পথ্য প্রদান করিবে। লঘু পথ্য শব্দে আধুনিক নিয়মানুসারে সাগু বার্লি বা এরারুট বুঝিতে হইবে। এরূপ লঘু পথ্য এখন সপ্তাহের পূর্ব্বেও প্রদান করা হইয়া থাকে, আধুনিক রোগিদিগের পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, সহিষ্ণুতা নাই, সুতরাং ঐরূপ সাগু বার্লি কিম্বা এরারুট নাদিলে চলে না। অনন্তর নিম্ন লিখিত কোন একটী পাঁচন নিয়মিত রূপে সেবন করিলে আর শরীরের কোন গ্লানি থাকে না, পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয়, সুতরাং শরীর সত্বর বলিষ্ঠ হয়।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ক্বাথ অর্থাৎ পাচন চিকিৎসার মহীয়সী শক্তি বোধ হয় সর্ব্বসাধারণেরই জানা আছে। এইরূপ চিকিৎসায় যেমন নির্দ্দোষ রূপে পীড়া আরোগ্য হয়, এরূপ আর কিছুতেই দেখা যায় না। মহর্ষি চরকমুনি সকল চিকিৎসা অপেক্ষা ইহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন।

অথ দশমূলাদি ক্বাথঃ।

শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা কাসমর্দ্দশ্চ শোণকঃ।
তর্কারী গোক্ষুরঃ কৃষ্ণা বৃহতী কণ্টকারিকা॥
রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাততকঃ।
মুস্তা বলামৃতাবাল দ্রাক্ষাগাসঃ শতাহ্বিকা॥
এবাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরম।
সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥

বেলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারীছাল, জয়ন্তীছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপানি, রাস্না, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, বেড়েলা, বালা, কিস্‌মিস্, দুরালভা ও শতমূলী প্রত্যেক এক আনা দুই রতি সমষ্টিতে ২ তোলা, কিঞ্চিৎ কুট্টিত (থেঁতো) করিয়া মৃৎপাত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে ৩২ তোলা অর্থাৎ ৬৪ তোলা সেরের অর্দ্ধসের জল দিয়া জ্বাল দিবে এবং অর্দ্ধ পোয়া (৮ তোলা) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রস্তর বা কাঁচপাত্রে ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে পান করিবে। পাচন মাত্রেই সমভাগে মিলিত ২ তোলা দ্রব্য লইতে হয় এবং ৩২ তোলা জলে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান করিতে হয়। ইহাই পূর্ণমাত্রা। আমাদের মতে ক্বাথ্য দ্রব্যের মাত্রা না কমাইয়া বালকদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে যুক্তিপূর্ব্বক ঐ অর্দ্ধ পোয়ার অর্দ্ধ বা সিকি পরিমাণ পান করিতে প্রদান করা উচিত। পাঁচন প্রয়োগের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। বাতিকজ্বর ও তাহার উপদ্রব নষ্ট করিতে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে দশমূল ও অপর কয়েকটী দ্রব্য আছে এজন্য ইহাকে দশমূলাদ ক্বাথ বলা হইয়া থাকে।

পঞ্চমূলী কষায়স্তু পাচনং বাতিকে জ্বরে। সুশ্রুতঃ-
শ্রীপর্ণী তর্কারী শ্রীফল টুণ্টুক পাটলামূলৈঃ।
পাচনমুচিতং মারুতজনিতজ্বরহারিবারিণা কথিতৈঃ।

সুশ্রুত বলিয়াছেন পঞ্চমূল পাঁচনে বাতিক জ্বরের দোষ পরিপাক করে। এস্থলে পঞ্চমূল অর্থে বৃহৎ পঞ্চমূল বুঝিতে হইবে। গাম্ভারীছাল, গণিয়ারীছাল, বেলছাল, শোণাছাল ও পারুলছাল প্রত্যেক ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে পূর্ব্বোক্তরূপে ছাঁকিয়া শীতল হইলে পান করিবে। ক্রমশঃ—

বোবামেয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মদনমোহন।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র যেন অপটু জ্যোৎস্নায় অন্ধকার দূর করতে পারলেন না বলেই, মনোদুঃখে পশ্চিম আকাশের শেষ সীমায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁহার ক্ষীণ আলোকে উচ্চতর প্রাসাদ শিখরগুলি যেন কেমন এক প্রকার ম্লান ভাব ধারণ করলে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ; ভারত রাজধানী কলিকাতা যেন সমস্ত দিবসের অপরিমিত পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে অঘোর নিদ্রায় অচেতন। দিবসের কোলাহলময় জনপূর্ণ রাজপথগুলি নির্জ্জন নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার নিষ্কর্ম্মা কুক্কুরগণের চীৎকার শব্দ, পাহারাওয়ালাদের গীতধ্বনি ও বহু দূরস্থ দুই একখানি গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ প্রাসাদে প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে অসীম আকাশে বিলীন হয়ে যাচ্চে। এই সময় মাণিকতলার বড় রাস্তায় একজন যুবা পুরুষ দক্ষিণাভিমুখে চলেছেন। পথে জনমানবের সঞ্চার নাই, পাহারাওয়ালারা পথ পার্শ্বস্থ বাটীর দরজায় উপবিষ্ট হয়ে তন্দ্রাবেশে ঢুলচে। পথিক একবার চকিতভাবে উভয়পার্শ্বে চেয়ে দেখলেন, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কুটীর; সকলগুলিরই দ্বাররুদ্ধ; বামে বিস্তীর্ণ কবরভূমি ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গেছে। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে মৃদুস্বরে বল্লেন "হায় এ রাত্রিতে সকলেই নিদ্রিত, সকলেই বিশ্রাম সুখ অনুভব কচ্চে, কেবল আমারই নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল পথে পথে—নিরাশ্রয়; যুবক এই কথা বলেই একটী আলোক স্তম্ভের নিকট থমকে দাঁড়ালেন। যুবকের বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর; রূপ নিতান্ত মনোহর না হউক, একান্ত শ্রীহীনও নহে। শরীর নাতিস্থূল নাতিকৃশ, বেস পরিমিত দীর্ঘাকার, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখখানি যত দীর্ঘ হইলে সুশ্রী দেখায়, তাহার অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ—গম্ভীর, নাসিকা দীর্ঘ শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র, নয়নদ্বয় টানাল, ললাট সুপ্রশস্ত—ফলে দেখলেই প্রতীতি জন্মে, যে তিনি কোন মহৎবংশ সম্ভূত। যুবকের পরিধানে একখানি সাদাধূতি, গায়ে একটী ক্ষুদ্র পিরাণ ও একখানি মোটা চাদর। যুবক একবার পশ্চাৎদিকে ফিরে দেখলেন, সম্মুখেও যেরূপ পশ্চাতেও সেইরূপ কেবল শ্রেণীবদ্ধ আলোকমালা। পুনরায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হল; মর্ম্মান্তিক যাতনায় বলিলেন; সকলেই সুখী, সকলেই এ নিশীথ সময়ে বিশ্রাম সুখ অনুভব কচ্চে—যাহারা এই বিস্তৃত কবরক্ষেত্রে শয়ান আছে তাহারাও বিশ্রাম কচ্চে, কেবল হতভাগা মদনমোহনেরই বিশ্রাম নাই।" যুবকের নাম মদনমোহন। মদনমোহন আপনা আপনি এই কয়েকটী কথা বলেই পিরাণের জেব হইতে একটী নস্যদানি বাহির করে উপর্য্যুপরি দুই টীপ নস্য গ্রহণ কল্লেন। সহসা একটা ঝট্‌কা

উঠে রাস্তার ধূলায় যুবকের সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করে দিলে, তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"আঃ এমন বিপদেও লোকে পড়ে থাকে? বাড়ীওয়ালাটা কি পাষণ্ড! না হয় চার মাসের ভাড়ার টাকাই বাকি আছে, রাত্রে একটা সামান্য জীব জন্তু ঘরে আশ্রয় নিলে লোকে তাড়ায় না, আমাকে কি না এই রাত্রেই তাড়িয়ে দিয়ে অনায়াসে বাসায় চাবি দিলে! এখন আমি আশ্রয় নি কোথা?—যদি একটু বিশ্রাম কর্‌বার জন্যে কোন বাড়ীর দরজায় বসি, তা হলেই পাহারাওয়ালা দূর করে দেবে।" মদনমোহন একটু নিস্তব্ধ হয়ে পুনরায় আপনা আপনি বল্লেন—"দোষইবা দি কার—সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! না হলে আমার এত দুর্দ্দশা হবে কেন! সকল কার্য্যই ত কিছু কিছু পারি, সকল প্রকারই ত এক আধটুকু জানা আছে, তবে আমার অন্ন যোড়ে না কেন? ইস্কুল পণ্ডিতি কর্‌লাম, ছেলে পড়ান ভাল লাগল না ছেড়ে দিতে হলো, হাউসওয়ালার বাড়ীতে কেরাণীগিরি কর্‌লাম—বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন কর্‌লাম, দুদিনেই ফিরিঙ্গির ধমকানি অসহ্য হলো, ছেড়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে আরম্ভ কর্‌লাম, বড়-মানুষের ছেলেও একটা যুটে গেল, কিছুই পড়াতে হত না কেবল দুই একটা মজাদার গল্প করেই সমস্ত দিন কেটে যেতো কিন্তু কেমন অভিরুচি, তা'ও ভাল লাগল না। এইরূপে কখন বিশ কখন পঁচিশ কখনও বা পঞ্চাশ টাকাও উপার্জ্জন করেছি, কিন্তু কখন ত আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নি, কখন ত অপেক্ষাকৃত উন্নতিলাভ কর্‌তে পারিনি! উপার্জ্জন কর্‌লে কি হবে, আমার যে মহৎ দোষ—প্রেমারাতেইত আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে, প্রেমারাই আমার চিরশত্রু, দূর হক্! প্রেমারা আজ হতে ত্যাগ কর্‌লাম, প্রতিজ্ঞা কচ্চি প্রাণ গেলেও আর কখন প্রেমারা খেলব না।" যুবক আপনা আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেই মনের আবেগে হন হন করে চল্লেন। কোথায় যাচ্চেন, কি জন্য যাচ্চেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কতকদূর গিয়াই সহসা চমকা ভেঙ্গে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে বল্লেন "তাইত কোথায় যাচ্চি? এত রাত্রে যাই বা কোথায়? সুরেশের বাড়ীতে যাব? এত রাত্রে তারত দেখা পাব না। বিশেষ সুরেশের পিতা আমার উপর যেরূপ চটা ডাকাডাকি কর্‌লেত আর রক্ষা থাক্‌বে না,—তবে এখন কি করি, কোথায় যাই?" গাঢ় চিন্তায় মন নিমগ্ন হয়ে গেল, যুবক অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন কিন্তু রাত্রি যাপনের জন্য আর কোন স্থান স্থির করতে পাল্লেন না। মনে মনে বল্লেন "না, আর অন্য উপায় নাই, কোন কৌশলে সুরেশের সঙ্গেই সাক্ষাৎ কর্‌তে হল। এই কথা বলেই ফিরলেন—উর্দ্ধমুখে দ্রুতপদে মাণিক-তলার পথ অতিক্রম করে চল্লেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই মদনমোহন, বাগবাজারের একটী বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। মাণিকতলার পথ যেরূপ নির্জ্জন এস্থানটী সেরূপ নির্জ্জন নয়। বাটীর সম্মুখে প্রায় বিশ ত্রিশ খানি গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোচ ম্যানেরা সঙ্কীর্ণ কোচবাক্সের উপর অতি কষ্টে শয়ন করে নিদ্রা যাচ্চে। সহিস-গাড়ির ছাদের উপর নিজ নিজ বস্ত্রে

সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে শয়ান রয়েছে। গাড়ীর ঘোড়াগুলি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকায় বিরক্ত হয়ে বার বার চাঞ্চল্য প্রকাশ কচ্চে। প্রাসাদের অভ্যন্তরটী আলোকময়। পরিচারকগণ পরিস্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক করে বেড়াচ্চে। মধ্যে মধ্যে বাটীর মধ্য হতে মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুতি-গোচর হচ্চে। মদনমোহন একবার প্রাসাদটীর দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন, "ওঃ আজ শনিবার, আজ যে সুরেশদের বাড়ীতে থিয়েটর, ভালই হয়েছে।—এখন সুরেশকে বাহিরে ডাকিয়া আন্‌বার উপায় চিন্তা কর্‌তে লাগলেন। চাকরেরা যদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে আসে, সেই আশয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌লেন, কিন্তু কাহাকেও দেখতে পেলেন না। পথের দিকে গৃহের জানালা একটী খোলা ছিল, যদি সেই গৃহের মধ্যে কাহাকেও দেখতে পান, এই মনে করে আস্তে আস্তে পার্শ্বস্থ একখানি গাড়ীর পশ্চাৎভাগে উঠে দাঁড়ালেন।

গৃহের মধ্যে একটী সেজ জল্‌চে, সেজের নিকটে চার পাঁচ জন লোক উপবিষ্ট, প্রেমারা চলেচে। মদনমোহন বাতায়ন হ'তে তাদের খেলা দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতেই এক পক্ষের পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন—এইমাত্র যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাহা একবারেই ভুলে গেলেন। জুয়ারীরা আপনার মনে খেলে যাচ্চে দৈবযোগে মদনমোহন যাহার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তাহার হাতে কাতুর হল। মদনমোহন সহসা আত্মবিস্মৃত হয়ে "হাস্‌সাবাস্!" বলে চেঁচিয়া উঠলেন। খেলুড়িরা সেই অপরিচিত স্বর শুনে চম্‌কে গেল। এ আবার কি? পথ হতে খেলা দেখে কে? জুয়াবীদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি হস্তস্থিত তাসগুলি রেখে দিয়ে বাতায়নের নিকট এসে দাঁড়াল। পাছে জুয়ারীরা দেখতে পায়, সেই ভয়ে মদনমোহন গাড়ীর পশ্চাৎভাগ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। গাড়িখানি নড়ে উঠলো। কোচম্যান নিদ্রিত ছিল, মনে কর্‌লে বুঝি প্রভু গাড়ীতে এসে বসলেন, অমনি তাড়াতাড়ি উঠে লাগাম হাতে করে "গাড়ি বাড়াও গাড়ি বাড়াও" বলে চীৎকার করতে লাগল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। শকট চাল-কেরা, তামাসা ভেঙ্গে গেছে মনে করে, সর্ব্বাগ্রে নিজ নিজ শকট দ্বারের সম্মুখে নিয়ে যাবার জন্যে হুড়াহুড়ি কর্‌তে লাগল। কোচম্যানে কোচম্যানে প্রথমে বকাবকি ক্রমে গালাগালি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। মদনমোহন এইরূপ গোলযোগ দেখে নিজ অদৃষ্টকে নিন্দা কর্‌তে কর্‌তে একটু তফাতে সরে দাঁড়ালেন।

প্রায় একদণ্ডকালের পর বাটীর মধ্য হতে একটী ভৃত্য বহির্গত হল। মদন-মোহন তাহার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কেও সাধু?" সাধুচরণ সুরে-শের নিজের খানসামা সুতরাং সে মদন-মোহনকে বেশ চিন্‌তো—তাঁরদিকে চেয়ে দেখেই বল্লে "আজ্ঞা, আপনি এখানে? চলুন, উপরে চলুন। যুবক তাহার সে কথায় কোন উত্তর না দিয়েই পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, "তোর বাবু কোথায়?

"আজ্ঞে, তিনি উপরেই আছেন—চলুন উপরে চলুন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এখন।"

"না, আমি আর এ বেশে সেখানে যাব না।"

"তবে কি তাঁকে ডেকে দেব।"

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করে বল্লেন থাক্ তায় আর প্রয়োজন নাই। চল তোমার বাবুর বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করা যাক্, থিয়েটর শেষ হলেই সাক্ষাৎ হবে এখন।"

ভৃত্য মদনমোহনকে বাটীর মধ্যে একটী সুসজ্জিত গৃহে লয়ে গেল। গৃহটীর মধ্যে একটী মনোহর মেহগ্নি-কাষ্ঠের মেজ, মেজের চতুর্দ্দিকে চেয়ার সাজান রয়েছে। মদনমোহন তার মধ্য হতে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন কর্‌লেন। সাধুচরণ মেজের আলোকটী উজ্জ্বল করে দিয়ে চলে গেল। যুবক মেজের উপর থেকে এক খানি পুস্তক লয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। মহূর্ত্ত মধ্যে সাধুচরণ একটী বাঁধান হুঁকায় তামাক সেজে এনে দিলেন। মদনমোহন তামাক টান্‌তে লাগলেন। সাধু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, বাবুকে কি খবর দেব?' মদনমোহন বল্লেন, "না তায় আর প্রয়োজন নাই—তুমি এখন নিজের কার্য্যে যেতে পার। পরিচারক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে চলে গেল। মদনমোহন ধূম পান করে হুঁকাটী রেখে চেয়ারে ঠেশ দিয়ে উপবেশন কর্‌লেন। নিদ্রাবশে নয়নদ্বয় মুদ্রিত হয়ে এল।

ইন্দ্র।

ইন্দ্র দেবরাজ। দেবলোকে ইহাঁর রাজ্য। শচীদেবী অমরার রাণী। রাজধানী অমরাবতী; নন্দন কানন বিনোদ উপবন; তথায় নিত্য পারিজাত ফুল ফুটে, সৌরভ ছুটায়, অমর আত্মার প্রীতি সাধন করে। রাজ প্রাসাদ মন্দাকিনী তীরে বৈজয়ন্ত ধামে। তথায় দেবদেবীগলে সেই অম্লান কুসুম মালা দোলে। ইন্দ্র এই সুখবিলাসধামের অধীশ্বর হইয়াও নিশ্চিন্ত নির্ভয় নহেন। অসুরের উপদ্রবে তাঁহাকে বিমানবথে ইন্দ্রধনু হস্তে লইয়া মাতলি সারথির সহিত সদলে যুদ্ধে ছুটিতে হয়; সুধাপানে অমর হইয়াও অসুর যুদ্ধে মধ্যে মধ্যে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়। তখন স্বর্গহারা ইন্দ্রকে তপস্যা বা স্বর্গযুদ্ধের আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে হয়। কেবল অবয়বী কল্পনা, বা উপন্যাস উপাখ্যান বলিলে ইহার কিছুই বলা হয় না; বলিতে, বুঝিতে, বুঝাইতে বিস্তর বাকি থাকে।

ইন্দ্রত্বে আবও আশঙ্কা আছে। এই মর্ত্তধামেই শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে সেই ব্যক্তিও ইন্দ্রত্ব লাভ করে। এই পদলোপের ভয়ে দেবরাজ নানা অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন, ইন্দ্র হইলেও স্থায়ী আধিপত্য নাই; স্বর্গ অধিপতিরও পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বা নিশ্চিন্ত ভোগ ভাগ্যাতীত। প্রত্যেক মন্বন্তরে আবার ইন্দ্রের পরিবর্ত্তন নির্ব্বাচন আছে। প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে ইন্দ্র শতবর্ষকাল ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করিয়া কৈবল্য লাভ করেন।

প্রত্যেক মন্বন্তরের ইন্দ্র পৃথক্।

"ইন্দ্রশ্চ বিশ্বভুগ্‌ জ্ঞেয়ো বিপশ্চিত্তদনন্তরং।
বিভুঃ প্রভুঃ শিখিশ্চৈব তথৈব চ মনোজবং।

তেজস্বী সাম্প্রতমিন্দ্রো বলির্ভাবাস্ত্বনন্তরং।
অদ্ভুতস্ত্রিদিবশ্চৈব দশমস্ত্রিস্ত্র উচ্যতে ॥
সুশান্তিশ্চ সুকীর্ত্তিশ্চ ঋত ধাতা দিবস্পতিঃ।
ইতি ভূতা ভবিষ্যাশ্চ ইন্দ্রাজ্জেয়াশ্চতুর্দ্দশঃ ॥

এই তো গেল, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের কথা। আমাদের মহত্তেরও সংখ্যার বাড়াবাড়ি! মনু চতুর্দ্দশ! ব্যাস অষ্টাবিংশ! ধর্ম্মশাস্ত্রকার অসংখ্য! দেবতা তেত্রিশ কোটি! সকলই যদি কল্পনাও হয়, কল্পনার অসাধারণত্ব আছে!

সাধারণশিক্ষা পুরাণ কাহিনী ছাড়িয়া অন্যান্য আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র ইন্দ্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখা যাক্। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ন্যায় দেবতারও যখন উপাসনা বা মাহাত্ম্য প্রচার হয় নাই, সেই স্মরণাতীত কাল হইতে ইন্দ্র দেবতা। ইঁহার জন্ম কর্ম্ম সকলই অদ্ভুত রহস্যময়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বিশেষ গৌরব থাকিলেও তিনি অনাদি পুরুষ নহেন; তাঁহার জন্ম আছে, জনক আছেন, জননী আছেন। "তাঁহার মাতা তাঁহাকে সহস্র মাস ও বহুবর্ষ গর্ভে ধারণ করেন। তৎপরে তিনি বীর্য্যে পূর্ণ হইয়া স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময় ইন্দ্রের মাতা প্রমত্তা হইয়া উঠেন।" ঋক ৪। ১৮। ৪-৮। আর এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, সোম হইতে ইন্দ্রের উৎপত্তি। (ঋক্ ৯। ৯৬। ৫) আবার আর এক স্থলে

নিষ্টিগ্রঃ পুত্রমা চ্যাবযোতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ। (ঋক্ ১০। ২০১। ১২)। ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর পুত্র।

সামবেদে ইন্দ্রের পিতা মাতা অদিতি।

অথর্ব্ব সংহিতায় আছে,

একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা,
জজান গর্ভম্মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা অসহন্ত শত্রূন্
হন্তা দস্যূনামভবৎ শচীপতিঃ ॥
অথর্ব্ব ৩। ১০। ১২

ইন্দ্রের মাতার নাম একাষ্টকা। তিনি তপস্যা করিয়া মহিমাময় ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া ছিলেন। একাষ্টকা প্রজাপতির কন্যা

ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ভিন্ন মত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে প্রজাপতি ইন্দ্রের জনক। শতপথ ব্রাহ্মণেও তাহাই; কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কিছু বিশেষত্ব আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে

"প্রজাপতি দেবাসুরানসৃজত, স ইন্দ্র মপি ন অসৃজত। তং দেবা অব্রুবন্নিন্দ্রং নো জনয় ইতি সোঽব্রবীদ্যথা হহং যুষ্মাংস্তপসাঽসৃক্ষি এবমিন্দ্রং জনয়ধ্বমিতি। তে তপোঽতপ্যন্ত, তে আত্মনীন্দ্রমপশ্যন। তমব্রুবন্ জায়স্ব ইতি।"

প্রজাপতি দেবাসুরদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি ইন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন না। দেবতাগণ তাঁহাকে বলিল, আমাদিগের ইন্দ্র উৎপাদন করুন। তিনি বলিলেন, আমি যেমন তোমাদিগকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরাও সেই প্রকারে ইন্দ্র উৎপাদন কর। তাঁহারা তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে ইন্দ্র দেখিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জন্ম গ্রহণ কর। আবার তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, ইনি অদিতির গর্ভ সম্ভূত। পুরুষ সূক্তে আছে, ইন্দ্র অগ্নির সহিত পুরুষের মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুরাণে ইন্দ্রের পিতা মাতার গোল মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্যপ তাঁহার পিতা হইয়াছেন, মাতা অদিতি। বেদে ইন্দ্রকে পিতৃঘাতীও বলা হইয়াছে। "ইন্দ্র আপনার পিতার পাদদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন।" ঋক্ ৪। ১৮। ১৬।

সে যাহা হউক, এই তো গেল ইন্দ্রের জন্ম কথা। যাঁহার জন্মকথা এরূপ বিচিত্র, অনৈসর্গিক তাঁহার কর্ম্ম কাণ্ড যে আরও অদ্ভুত ও রহস্যময় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বেদের ইন্দ্র মহাবলী, যজ্ঞপ্রিয় অসুর নাশন, সোমপ্রিয়, শত চক্ষু। তাঁহার দুই বাহু আছে, বাহুতে বল আছে, বিষম বজ্র আছে। স্বর্গ বিঘ্নকারী বৃত্র, নমুচি, শুষ্ণ, পিপ্রু, কুথব, কৃষ্ণ প্রভৃতি অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; তাহাদিগের গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ধনধান্যদাতা দস্যুদমন। দ্যাবা পৃথিবী তাঁহার বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার নিয়মে চলিতেছেন, নদীসমূহ তাঁহার নিয়ম অনুসারে বহিয়া যায়। তিনি অশ্বসমূহের অধিপতি, তিনি-গোপসমূহের অধিপতি, তিনি স্বাধীন, তিনি স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া সকল কর্ম্মেই স্থির, তিনি অভিষবরহিত দুর্দ্দর্ষ দস্যুদিগেরও হন্তা। তিনি গমনশীল ও নিঃশ্বাসযুক্ত সকল জীবের অধিপতি এবং গো সকলের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি অশ্বের স্ত্রীকে গোর মাতা করিয়াছেন। ভক্ত তাঁহাকে বলিয়াছে, "তোমাকে আমি মনের সহিত জানি। হে ইন্দ্র! তুমি বহু লোক দ্বারা আহূত, তুমি আমাদিগকে অন্ন ও পানীয় দান কর। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বধ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগের প্রিয় আহার উপভোগাদি কাড়িয়া লইও না। হে মঘবন্ শক্র! গর্ভস্থিত আমাদিগের অপত্য নষ্ট করিও না, যাহারা জানু দ্বারা চলে, এরূপ গমনাসমর্থ অপত্যদিগকে নষ্ট করিও না।" আর সোমপানের কথা ত পদে পদে। কথার অনুবাদে ইন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাঁহাকে পিতৃঘাতী, সোমপায়ী, দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুমর্ষণ, যজ্ঞপ্রিয় বলিয়া বুঝা যায়।

নানাভাষাবিদ্ দেশীয় বেদ পাঠকগণ বিদেশীয় আলোক সাহায্যে প্রচার করিতেছেন, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য আর্য্য বা কৃষকগণ প্রবল ঝড় বহিতে দেখিয়া ভীত হইয়া বায়ুকে মহাশক্তিমান বোধে স্তবস্তুতি করিয়াছেন; বজ্রনাদ ও ঝড় বৃষ্টিতে আশ্রয়হীন অজ্ঞান আর্য্যশিশু দিশাহারা হইয়া ভীতচিত্তে সকাতর প্রার্থনা করিযাছিল। বৃষ্টিপাতে বিচরণ ভূমি শস্যশ্যামলা হওয়ায় বৃষ্টিদাতার দেবত্ব স্থির করিল; আর মস্তকোপরি অসীম শূন্যে তারকা তপন দেখিয়া জ্যোতিঃস্থান শূন্যকে দ্যুঃ নামে অভিহিত করিয়াছিল। এইরূপে সভ্যতার শৈশবযুগে অজ্ঞান সরল মানবহৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে একদল যজ্ঞপ্রিয় হইয়া উঠিল; তাহারা অযাজ্ঞিক ও যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের সহিত নিয়তই যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিত এবং এই সকল স্বভাবশক্তির নিকট আপনাদের অভাব আকাঙ্ক্ষা জানাইত। বেদ ইহাদেরই উল্লাস সঙ্গীত। ইহাতে অনেক রূপক কথাও আছে। এই রূপক স্মরণ রাখিয়াই ইন্দ্রের নামকরণ হইয়াছিল। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে—ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা আকাশ। আকাশ দেবের প্রধান নাম দ্যুঃ। এই দ্যুঃ গ্রীকদিগের জিয়স্ এংলো স্যাকসনদিগের "টিউ" (Tiu) জর্ম্মনদিগের জিয়ো (Zio)। ইন্দ্র ও জিয়সে অনেক সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্র দেবরাজ জিয়সও

তাহাই। ইন্দ্র বজ্রাস্ত্রে অসুর নাশ করিয়াছিলেন, জিয়সও এক অবার্থ অস্ত্র টাইটানকুল সংহার করেন। বৃষ্টি উভয়েরই অধীন। আবার পারসিকদিগের বেরেথ্র ও বেরেথ্রঘ্ন—বৃত্র ও বৃত্রঘ্ন। জেন্দ আবেস্তায় বেরেথ্রঘ্নের বিস্তর স্তবস্তুতি আছে। কিন্তু তাহাতে বৃত্রাসুর মধ্য এসিয়ার কোন নগরীর সমস্ত আর্য্যভূমি জনশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। বৃত্রঘ্ন আকাশ নহেন, শরীরী; অসুর যুদ্ধে ভীত হইয়াছেন, পলাইয়াছেন, জিতিয়াছেন।

বেদের অনুবাদ ও এই বেদবক্তাদিগের কথা ছাড়িয়া শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্র আবশ্যকমত অন্যান্য দেবদেবীর নিকট পরামর্শ করেন। একবার নমুচি অসুরবধ করিতে তাঁহাকে বিষম ভাবনায় পড়িতে হইয়াছিল। তিনি নমুচির নিকট সত্য করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে দিবায় অথবা রাত্রিতে, যষ্টি অথবা ধনুকে, হাতের তালু কিম্বা মুষ্টিতে, শুষ্ক অথবা আর্দ্রস্থানে হনন করিব না। এদিকে নমুচি ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরাসহ অপহরণ করে। ইন্দ্রিয় সুরাপাত্র প্রভৃতি অপহৃত হওয়ায় ইন্দ্র উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হৃত শক্তিসম্পত্তি কিরূপে উদ্ধার করিব? তোমরা কি উদ্ধার করিয়া দিবে? উদ্ধার করিলে তাহা আমাদিগের সকলেরই হইবে, আহরণ কর। এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া "অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দ্বারা বাজ্রের সিঞ্চন করিয়া বলিলেন, ইহা শুষ্ক ও আর্দ্র নহে। ইন্দ্র তখন বজ্র দ্বারা নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন তখন রাত্রি অবসান হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ও হয় নাই। তাঁহার মস্তক ছেদনকালে সোম রক্ত মিশ্রিত ছিল। ইঁহারা প্রথমে তাহা অবজ্ঞা করিলেন কিন্তু পরিশেষে পানও করিলেন।" এইরূপে নমুচি নিধন হইল; অরাতিনাশে দেবতার শোণিত মিশ্র সোমপান সম্পাদিত হইল। গল্পটির মূলাংশও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া আসুরো নমুচি রহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপাধাবৎ। শেপানোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেন ন আর্দ্রেন অথ মে ইদমহার্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽব্রুবনস্তু নো হত্রাপ্য আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্বিনৌ চ সরস্বতী চ অপাম্ফেনং বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্কো আর্দ্র ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরাসুরস্য ব্যুষ্টায়াং রাত্রে অনুদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ। তস্য শীর্ষং ছিন্নে লোহিত মিশ্রঃ সোমো অতিষ্ঠৎ। শতপথ ব্রাহ্মণ (১২।৭।৩।১)

তাহার পর আমাদের পুরাণের ইন্দ্র। এখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মহিমা প্রচলিত হইয়া ইন্দ্রের গৌরব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। মহাশক্তির মাহাত্ম্যের নিকট তিনি হীনপ্রভ। কিন্তু সুখ সম্পদের সুন্দর সমাবেশে, অমরাবতীর অপূর্ব্ব আনন্দের অধিপতি হইয়া রাজগৌরবে তিনি সুরেশ্বর। ভরাকুলিত ভোগের, শত্রু দমন শৌর্য্যের অমর আত্মার অনুশোচনার তিনি অধিপতি। অমরগৌরবে ও অমানুষিক চরিত্র হীনতায় তিনি অদ্বিতীয়। সহস্রলোচন তাঁহার একটি বিরাট কলঙ্ক নিদর্শন।

পুরাণে মহাভারতের পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়ে এক অদ্ভুত উপাখ্যানে ইন্দ্রের প্রথম

পরিচয়। বেদ নামে এক ব্রাহ্মণের উতঙ্ক নামে এক শিষ্য ছিল। উপাধ্যায় উতঙ্কের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইলেন; তোমার সকল মনোরথ সফল হউক বলিয়া তাঁহাকে গৃহ গমনে অনুমতি দিলেন। উতঙ্ক গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় লইতে চাহিলেন। গুরুদেব প্রথমে বলিলেন, আমি অবসর ক্রমে আদেশ করিব। কিন্তু শিষ্যের পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অবশেষে বলিলেন, গুরুদক্ষিণার কথা তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল; তাঁহার অভিরুচি মত প্রদান করিও। উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট গিয়া ঋণমুক্ত হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। উপাধ্যায়ানী পৌষ্য রাজার মহিষীর কর্ণকুণ্ডলদ্বয় চারি দিবসের মধ্যে আনিয়া দিতে হইবে বলিয়া বসিলেন। উতঙ্কও আদেশ পালনে বাহির হইলেন। পথে বৃষের পুরীষ খাইয়া নানা বিঘ্ন বাধায় বহু ক্লেশে যদিও অভীষ্টলাভ ঘটিল, পথিমধ্যে ছদ্মবেশী তক্ষক তাহা অপহরণ করিল। তিনি তখন তক্ষকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের সহায় হইলেন। বজ্র সহায়ে তাঁহাকে তক্ষক নিবাস রসাতলে লইয়া চলিলেন। উতঙ্ক নাগলোকে প্রবেশ করিয়া প্রথমে নাগগণকে স্তবস্তুতি করিলেন। কিন্তু তাহাতে কুণ্ডললাভ হইল না। তখন নিতান্ত চিন্তিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, দুইটী স্ত্রীলোক বাপদণ্ডযুক্ত (বুনিবার যন্ত্র) তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিলেন দ্বাদশ অরযুক্ত একখানি চক্র দুইটি শিশু কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর একজন পুরুষ ও অতি মনোহর একটী অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন।

"সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে তিনশতষষ্টি তন্তু সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয় জন কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপ দুই যুবতী শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এই তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। এই দুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। নিখিল ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, বৃত্রাসুর ও নমুচির হন্তা, বজ্রধর ইন্দ্র যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া ত্রিলোকে সত্যমিথ্যা উভয়ই বিচার করেন। সেই ত্রিলোকীনাথ পুরন্দরকে নমস্কার করি।" (কালীসিংহ—মহা—আদি) অকস্মাৎ শেষের কয়েকটী কথায় ইন্দ্রের একেবারে কতকগুলি গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। মূলে আছে :—

> বজ্রস্য ভর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা
> বৃত্রস্য হন্তা নমুচের্নিহন্তা।
> কৃষ্ণে বসানো বসনে মহাত্মা
> সত্যানৃতে যো বিবিনক্তি লোকে॥
> যো বাজিনং গর্ভমপাং পুরাণম্।
> বৈশ্বানরং বাহনমভ্যুপৈতি।
> নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায়
> লোকত্রয়েশায় পুরন্দরায়॥"

স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই অশ্বারোহী পুরুষ উতঙ্কের উপকার করিতে চাহিলেন। নাগলোক যাহাতে তাঁহার বশীভূত হয়, উতঙ্ক সেই প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই পুরুষ বলিলেন, "এই অশ্বের অপান দেশে ফুৎকার দাও।" আদেশ

পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অশ্বের শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল; নাগলোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিলে তক্ষক কুণ্ডলদ্বয় লইয়া অগত্যা অর্পণ করিল। উতঙ্ক বহুদূরে রসাতলে আসিলেও সেই পুরুষের পরামর্শানুসারে সেই আশ্চর্য্য অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে একেবারে গুরু গৃহে উপস্থিত! উপাধ্যায়ানী তখন বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইতে চলিল দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন। এমন সময় উতঙ্ক তাঁহার পদপ্রান্তে কুণ্ডল যুগল আনিয়া উপস্থিত করিল এবং বিদায় লইয়া গুরু দেবের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া, অবশেষে বৃষ পুরীষ অশ্ব প্রভৃতির রহস্য কি জানিতে চাহিল। আচার্য্য বলিলেন, "তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অর সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছে, উহা সম্বৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিবা রাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু; পুরুষটি পর্জ্জন্য আর অশ্ব অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ অবলোকন করিয়াছিলে তিনি নাগরাজ ঐরাবত। আর ঐ অশ্বে সে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত; তাই নাগলোকে বাঁচিয়াছ; ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এই প্রথম পরিচয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্র মহিমাময় মহাপুরুষ। তিনি মহাবল, দেবরাজ, দস্যুদমন, দুর্ব্বল সাধুর সহায়। মর্ত্ত্যের সাধুজনের সহিত তাঁহার সখ্য আছে।

তক্ষকের এই কুণ্ডল অপহরণ ব্যাপারে তিনি প্রকারান্তরে উহার বিপক্ষতা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু উতঙ্কের পরামর্শে সর্পসত্র আরম্ভ হইলে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। ইন্দ্র তাহাকে আশ্রয় দিলেন। ঋত্বিক্‌গণ জানিলেন, তক্ষক ইন্দ্রের আশ্রয় লইয়াছে। রাজা জনমেজয় হোতাকে ইন্দ্রের আরাধনা করিতে বলিলেন। ইন্দ্রকে আসিতে হইল। তক্ষক দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, "যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর।" ইন্দ্র ব্যাপার দেখিয়া অগত্যা তক্ষককে পরিত্যাগ করিলেন। এখানেও ইন্দ্র শরণাগত পালক বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মন্ত্রতেজে তিনি হীনপ্রভ। এইরূপে ক্রমশঃ পরবর্ত্তী বর্ণনা পাঠকালে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণে বৈদিক ইন্দ্রের মহামহিমা পরিম্লান হইয়াছে। তিনি কখনও অসুর, এমন কি নর বিক্রমেও পরাজিত বা স্বর্গতাড়িত হইয়াছেন, স্বর্গযুদ্ধে মানবের সহায়প্রার্থী হইয়াছেন, ঋষিশাপে ত্রিদশেশ্বর হইয়াও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, সাধুর অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, বিমাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ শিশু খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন, চরিত্র হীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছেন। ফলতঃ দেবরাজ হইয়াও তিনি মানবের ন্যায় অদৃষ্টের অধীন, অভাব আকাঙ্ক্ষা, আশা নিরাশা, মান অভিমানের তীব্র আবেগে পরিচালিত,—

হিংসা দ্বেষ দুষ্প্রবৃত্তির নিতান্ত অধীন। ইন্দ্রের এইরূপ অসংখ্য দোষ লিপিবদ্ধ থাকিলেও মানব মন তাঁহাকে চির-নির্বাসন দিতে পারে নাই। এখনও তাহাদের পবিত্র হৃদয়ে প্রীতি প্রভুত্বময় দেবরাজের আবির্ভাব হয়; তাঁহার কলঙ্ক কাহিনী সকলেইত বুঝিতে পারে কিন্তু কি গুণে হিন্দু হৃদয়ে অমরাবতীতে তাঁহার অবিচল প্রতিষ্ঠা, ভাবিবার অবসর আছে কি?

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

গুরু। বিবাহের পর, যে কন্যার সপ্তপদীগমন প্রভৃতি গোত্রভ্রংশকর কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেবল তাহার সম্বন্ধেই সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে অবস্থান, কাত্যায়নের অভিমত; অন্যথা গোত্রান্তর প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়াই যে তিনি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত বিবাহিতার পিতৃগোত্রে অবস্থানের বিধি দিয়াছেন, ইহা কথনই বিচারসিদ্ধ নহে। কারণ, যদি গোত্রান্তর প্রাপ্তি একেবারে অসম্ভব হয়, তবে কাত্যায়নই আবার কেমন করিয়া, সপিণ্ডীকরণে স্ত্রীর শ্বশুর গোত্র প্রাপ্তির বিধান করিলেন? যদি সপিণ্ডীকরণের পর গোত্রান্তর প্রাপ্তি অসম্ভব না হয়, তবে সপ্তপদীগমন প্রভৃতির পরই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন? ফলতঃ গোত্রান্তর প্রাপ্তি সর্ব্বসম্মত, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

শিষ্য। স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইলেও কোন ক্ষতি নাই; কারণ, তাহাকে পুনঃ সম্প্রদান করিতে হইলে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়াই সম্প্রদান করিতে হইবে। যথা বৃহদ্ বশিষ্ট সংহিতা;—

অমুষ্যপৌত্রীকামুষ্য পুত্রীকামুষ্য গোত্রজাম্।
ইমাং কন্যাং বরায়াস্মৈ বয়ং তদ্ বিবৃণীমহে।
শৃণুধ্বম্ ইতি বৈ ব্রূয়াদ সৌ কন্যা প্রদায়কঃ॥ (১)

"সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে কন্যাদাতা ইহা কহিবেক যে, আপনারা শ্রবণ করুন, অমুকের পৌত্রী অমুকের পুত্রী, অমুকের গোত্রোদ্ভবা এই কন্যাকে আমরা এই বরে দান করিতেছি"

এস্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, আমরা অমুক গোত্রোদ্ভবা কন্যাদান করিতেছি; সুতরাং কন্যা যে গোত্রে জন্মিয়াছে, বিবাহ কালে সেই গোত্রের উল্লেখ করাই বিচার সিদ্ধ হইতেছে।

গুরু। এই বশিষ্ট বচনকে সম্প্রদানের বিধি বলিয়া কোনও ক্রমেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ তুমি যে প্রকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলে, উহার অর্থ আদৌ সে প্রকার নহে। উক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ এই,—

(১) 'বিবৃণীমহে" এই পদে ভবিষ্যৎকালে লট্ হইয়াছে। সূত্র যথা,—"বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্‌বা" পাণিনি, ৩, ৩, ১৩১। কন্যাপ্রদায়কো ব্রূয়াৎ" কন্যাং প্রদাতুং ব্রূয়াৎ, ভবিষ্যকালে নিমিত্তার্থে তুমুন্; সূত্র যথা,—
তুমুন্ ণ্বুলৌক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্" ৩, ৩, ১০ পাণিনি।

যে ব্যক্তি কন্যাদান করিবে, সে বলিবে, আপনারা শ্রবণ করুন। এই বরে সম্প্রদানের নিমিত্ত, অমুকের পৌত্রী, অমুকের পুত্রী, অমুক গোত্রোদ্ভবা এই কন্যাকে আমরা বরণ করিতেছি।

এই বচনের তাৎপর্য্যানুধাবন করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত নিয়ম অনুসারে কন্যাদাতা বরণের পূর্ব্বে সমাগতজনগণ সমক্ষে কন্যার প্রকৃত পরিচয় দিয়া, বরের নাম মাত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক কন্যাবরণের অঙ্গীকার করিবেন। অতএব সংহিতাকার কন্যারই গোত্রাদির উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন, বরের সম্বন্ধে তাদৃশ কিছু বলেন নাই। বিশেষতঃ বচনে স্পষ্টত "বৃ" (বৃঞ্) ধাতুর প্রয়োগ আছে; "বৃ" ধাতুর অর্থ বরণ, দান নহে। যদি বল, বৃ ধাতুর পূর্ব্বে "বি" উপসর্গ আছে, উপসর্গ দ্বারা ধাতুর অন্য অর্থ হইতে পারে; তবে এখানে "দান" না বুঝাইবে কেন? তাহার উত্তর এই যে সোপসর্গ "বৃ" ধাতুরও দানার্থ অপ্রসিদ্ধ। আর "বৃ" ধাতুর দানার্থ স্বীকার করিলেও উহাকে সম্প্রদানের বিধি বলা যাইতে পারা যায় না। কারণ, সম্প্রদানকালে "বৃ" ধাতুর প্রয়োগ হয় না, "দা" (ডুদাঞ্) ধাতুর প্রয়োগই শাস্ত্রসিদ্ধ ও শিষ্টাচারানুমত। যথা ব্যাস,—

নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পরিতুষ্টেন ভাবেন "তুভ্যং সম্প্রদদে" ইতি॥

নাম ও গোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে "তুভ্যং সম্প্রদদে" এই বলিয়া দান করিবে।

বশিষ্ঠ বচনে "বরম্" এই পদ আছে; কিন্তু সম্প্রদানকালে "বরম্" পদের প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত নহে; "অহম্ পদই অবশ্য প্রযোজ্য।" যথা উদ্বাহতত্ত্বে,—

অহম্ শব্দ প্রয়োগস্তু, "অহমস্মৈদদানীতি এবম্ আভাষ্যদীয়তে" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে তথা দর্শনাৎ॥ (৮)

সম্প্রদানকালে "অহম্" শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়; "অহম্ অস্মৈ দদানি" এই বলিয়া দান করিবে। এই বিধি ছন্দোগ পরিশিষ্টে আছে।

উক্ত বচনে কেবল কন্যার পিতামহ প্রভৃতির উল্লেখের বিধি আছে; কিন্তু সম্প্রদান করিতে হইলে, বর কন্যা উভয়েরই প্রপিতামহ প্রভৃতির নমোল্লেখ শাস্ত্রবিহিত। যথা ধনঞ্জয়কৃত সম্বন্ধ বিবেকে,—

নান্দীমুখে বিবাহেচ প্রপিতামহ পূর্ব্বকম্।
বাক্যম্ উচ্চারয়েদ্ বিদ্বান্ অন্যত্র পিতৃপূর্ব্বকম্॥
এতদেব ত্রিরুচ্চার্য্য কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।
বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ
বাক্যং ত্রৈপুরুষং কার্য্যং ত্রিরাবৃত্তিবিবর্জ্জিতে॥

প্রাজ্ঞব্যক্তি নান্দীমুখ ও বিবাহে অগ্রে প্রপিতামহের নাম বলিয়া, ক্রমে পিতামহ, পিতা প্রভৃতির নাম বলিবেন। অন্যত্র প্রথমে পিতার নাম বলিয়া নিজ নামাদি বলিবেন। কন্যাদানকালে, প্রপিতামহ পিতামহ প্রভৃতির নাম তিন বার বলিয়া দান করিতে হইবে। বিবাহের যে বিধি বলিলাম, বরণেও সেই

(৮) অগামিকলে "তুভ্যং সম্প্রদদে" ইতি পরগামিকলেত "অহমস্মৈদদানীতি এবমাভাষ্যদীয়তে" ইতি ছন্দোগ পরিশিষ্টদর্শনাদ্ বাচাম্ ইত্যাদি সংস্কারতত্ত্বে।

দানের ফল দাতা পাইলে, "সম্প্রদদে" ও অপরে পাইলে "দদানি" এই প্রকার প্রয়োগ করিতে হয়।

বিধি। অর্থাৎ প্রপিতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষের নাম বলিতে হইবে, তবে তিন-বার বলিতে হইবে না, এইমাত্র বিশেষ।

অতএব বশিষ্ঠ বচন সম্প্রদান বিধায়ক নহে। আর বরণ করিতে হইলেও প্রপিতামহ প্রভৃতির নামোল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য, কাযেই "বিবৃণীমহে" এই প্রকার প্রয়োগ সত্ত্বেও উক্ত বচনকে বরণের বিধি বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ "শৃণুধ্বম্" অর্থাৎ আপনারা শ্রবণ করুন, এই প্রকার উক্তি কন্যাদানকালে, অথবা বরণকালে কুত্রাপি শ্রুত হওয়া যায় না, কোন শাস্ত্রেও এতাদৃশ বিধি নাই। সেই হেতু, ইহা যে কন্যাদাতার অঙ্গী-কার বাক্যের বিধানমাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (৯)

শিষ্য। আপনি যে হারীত, বৃহ-স্পতি ও লিখিতের বচন বলিলেন, তাহাতে পতিগোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণাদি মাত্র বিহিত হইয়াছে; অতএব পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া বিধবা প্রভৃতির বিবাহ দেওয়ায় ক্ষতি কি?

গুরু। হারীত বলিয়াছেন,—

স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥

বিবাহের পর সপ্তপদী গমন হইলে, স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়; পতি-গোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে।

এই বচনে যদি পতিগোত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ তর্পণমাত্র বিধানই উদ্দেশ্য হইত, তবে বচনের শেষার্দ্ধ অর্থাৎ "পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া" এতা-বন্মাত্র বলিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইত; পূর্ব্বার্দ্ধে পৃথক্‌গোত্র ভ্রংশ বিধানের আর প্রয়ো-জন থাকিত না।

(৯) অদ্যাপি পাত্রকন্যা বরণের পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তা সমাগত সভ্যগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন বিদায় লইয়াছেন। নবলাট এলগিন তৎপদে বসিয়াছেন। টাউনহলে পুরাতন বড় লাটের বিদায় অভিনন্দনের কথা উঠিলে সহরবাসীর পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কিন্তু অভিনন্দনের পক্ষ প্রবল হওয়ায় তাঁহাদিগেরই জয়লাভ হইয়াছে।

ট্যাক্স দেওয়ার ন্যায় অভিনন্দন দেওয়াও যদি একটা রাজনিয়ম হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি কিরূপ প্রজাপালন করিয়া গেলেন, প্রজাগণ প্রাণের আবেগে তাঁহাকে কিরূপে বিদায় দিল, জানাইবার জন্যই যদি এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধারণে এই বিদায়ে কেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিবে বুঝিতে পারি না।

আবার ভক্তমণ্ডলী ল্যান্সডাউনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু হায়রে দেশ! ইহাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের এই বিপুল আয়োজন! লর্ড রিপনকে প্রজামণ্ডলী যে চোখের জলে বিদায় দিয়া ছিল! তিনি যে ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া এখনও তথায় রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের আগে কি অসাধারণ গুণে লর্ড ল্যান্সডাউনের জন্য এই অনুষ্ঠান!

বড় লোকের অর্থ আছে, আর সাধারণের স্বধু হৃদয় আছে। যার যাহা আছে সে তাহাই দিবে। কিন্তু বড় লোক রাজা মহারাজে মিলিয়া শ্বেতপুরুষের সহযোগে—তাঁহারাও ত এক এক রাজাধিরাজ—এই যে একটা অসাধারণ অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, ইহার কারণ কি? অসাধারণ গুণ দেখিয়া প্রজাপালনে পারদর্শী বুঝিয়া? দয়াময়ী ভারতেশ্বরীর প্রকৃত প্রতিনিধি হইয়া আসিয়া ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া যাইলেন বলিয়া! না বড়লোকের যেমন একটা খেয়াল থাকে, সেইরূপ খেয়াল বশে অথবা রাজা মহারাজের যেরূপ নানা দিকে নানা খরচ থাকে, বিলাস ভবন রাজোদ্যান, পশুশালা—ইহাও তাহার মধ্যে একটী!

যাহা হউক, ভক্তমণ্ডলী লর্ড ল্যান্সডাউনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার আয়োজন করিতেছেন। তত্ত্ব কাহার বা থাকে? কিন্তু এরূপ স্মৃতিচিহ্ন না থাকিলেই ভাল হইত। কেন না আমাদের মহামান্যা ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি ভারতবাসীর ধনপ্রাণের অধীশ্বর হইয়া কিরূপ ধারাবাহিক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকে সহজে ভুলিতে পারিত।

স্মৃতিচিহ্ন জাগাইয়া তুলিবে—এই পাঁচ বৎসরের অতীত কথা;—সেই মণিপুরের সর্ব্বনাশ—রাজবংশধরদিগের প্রাণদণ্ড ও চিরনির্ব্বাসনের কথা—সেই রাজ পরিবারদিগের পথের ভিক্ষারিণীর বেশ। আর সেই কাশ্মীরকীর্ত্তি—হতভাগ্য কাশ্মীররাজের শোচনীয় পরিণাম! সহস্র সহস্র সীমান্তবাসীর অজস্র শোণিতপাত ও গৃহদাহ! রাজা মহারাজের সুখদুঃখের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভুলিতে পারিবে কি, সেই সম্মতি আইনের সৃষ্টি! হিন্দুসমাজ পশুরও অধম জানিয়া তাহাদের চক্ষে একটী অপ্রয়োজনীয় অপ্রীতিকর শক্তিশেল নিক্ষেপ! কীর্ত্তি কি একটী! এ যে পাঁচবৎসরের কীর্ত্তি! উচ্চশিক্ষা পথে প্রতিকূলতা, স্বায়ত্তশাসনাধিকার সঙ্কোচ, জুরী প্রথা তিরোধানে সহায়তা ও সাধ্যমত উহার পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রতিকূলতা, মুদ্রাবিধির অপ্রীতিকর ব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপের প্রয়াস! কীর্ত্তি অসংখ্য—অসাধারণ।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে অহিফেন কমিসন বসিয়াছে। কমিসন কেন বসিল, এখনও সাধারণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। সাদা, কালো, মিশালি

নানাজনে নানা সাক্ষ্য দিল। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য কি, আজিও সাধারণে তাহা স্পষ্ট জানিল না; ফল যে জানিবে তাহাও বোধ হয় না।

তবে কমিসন যে কিছুই নহে, তাহাও বলিতে পারি না; কেননা কমিসন বসিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া বড় বড় লোক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে, ঢাক ঢোল বাজাইয়া দেশ বিদেশ হইতে সাক্ষীর আমদানি রপ্তানি চলিয়াছে, বক্তৃতাও যথেষ্ট, প্রহসনও দেখিয়াছি, মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতনও হইতেছে। অহিফেনের আশীর্ব্বাদে এখনও অনেক দৃশ্য দেখিতে হইবে।

কিরূপ প্রস্তাবনা হইতে ইহার অভিনয় এতদূর জমিয়া উঠিয়াছে, জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি সাধু খ্রীষ্টিয়ান অহিফেনে আমাদিগের অধঃপতন ও গবর্ণমেণ্টের নৈতিক মহাপতনের বিচিত্র ছবি আঁকিয়া একটা কলরব তুলিয়া বলেন, সভ্যতা ও সাধুতা বিস্তারের জন্যই ইংরাজজাতি। সেই পরম কল্যাণ সাধনের জন্যই খ্রীষ্টের উপাসক মহাপুরুষ তোমরা বিদেশীয় সংস্রবে আসিয়াছ। কিন্তু অহিফেনে চীনের সর্ব্বনাশ করিতেছ, ভারতে এই বিষের একচেটিয়া ব্যবসা চালাইয়া মহাপাপে মজিতেছ।

পার্লেমেণ্ট মহাসভা ইহাদের আন্দোলনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্যর জোসেফপীজের প্রস্তাব আলোচিত হইতে লাগিল। কেন্ সাহেবও অনেক কাহিনী গাহিলেন। দূর সসাগর পারে ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শুনান হইল, কিছু কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে।

এদিকে রাজকোষের অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নহে, সুতরাং কিছুকাল ধরিয়া লেখালেখি চলিতে লাগিল।

কিন্তু কথাটা লইয়া বড় গোল বাধিল। পীজের প্রস্তাব একেবারে চাপা দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। একটা সালিসী বসাইবার কথা হইল।

অহিফেন ব্যবসা নিবারণী দল আরও প্রস্তাব করিলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ব্যবসা তুলিয়া দিতে পারেন কি না? এই জন্য আয় কমিয়া গেলে ভারতে নূতন কর সংস্থাপন না করিয়া তাহার প্রতীকার হইতে পারে কি না, অনুসন্ধানের জন্য কর কমিসন বসুক। কমিসন দেখিবে, ভারতে কোনরূপ ব্যয় সংক্ষেপ করিলে এই ক্ষতি পূরণে যথেষ্ট সহায়তা হয় কি না। গরিব কেরাণীর দুবেলায় দুমুটা অন্নগ্রাস না কমাইয়া সেনা সামরিক ও শাসন বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ করা যাইতে পারে

কি না? যে ভারতের জন্য বিলাতের অগণ্য লোক প্রতিপালিত হইয়াছে কিছু দিন সেই বিলাতি রাজকোষ ভারতের কল্যাণের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে কি না। ভারতের কৃষি বাণিজ্য উন্নতির সাধনে চেষ্টা করিলে অবিলম্বে হয়ত তাহাতেও ক্ষতিপূরণে সক্ষম হইবে।

ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ এইরূপ কমিসন চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস ইহারই প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু এই কাজের কমিসন বসিবে কেন?

লাহোরের নবম জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চনদ সাধিত দেশে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন প্রধান সেনাপতি সর্দ্দার লেনাসিংহের বংশধর সর্দ্দার দেয়ানসিংহ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, নৌরজী বিলাত হইতে কেবল স্বদেশ পূজার জন্যই কয়েক দিবসের জন্য আসিয়াছিলেন, আলোচনা যাহা হইয়াছিল তাহা ধীর সংযত ও কার্য্যকরী।

কিন্তু কুৎসা করিয়াই যাহার সুখ, সে কি তাহা ছাড়িতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমান পারসি খ্রীষ্টান—বাঙ্গালা, বিহার, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কংগ্রেসে যোগদান করিলেও এতকাল কেহ কেহ কলরব করিতেছিলেন, কংগ্রেস কিছুই নহে উহা বাঙ্গালীর হুজুগ বাক্যবীর বাঙ্গালীর বক্তৃতার প্রদর্শনী।

বলিবার একটা কথা ছিল। পঞ্চনদের বীরজাতিগণ তখন কংগ্রেসে যোগ দান করে নাই। কিন্তু আনন্দ উচ্ছলিত পঞ্চনদ হৃদয়ে, প্রীতিপূর্ণ পঞ্চনদ প্লাবিত দেশে শত শত মাতৃসেবক মণ্ডলী মধ্যে চারিশত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পঞ্জাবী—প্রতিনিধি। এখনও কি বলিতে চাও, কংগ্রেস কিছুই নহে বক্তৃতার বিলাসক্ষেত্র।

কংগ্রেসে মধ্যে মধ্যে সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হয় বলিয়া অনেক স্বধর্ম্মনিষ্ট ব্যক্তি আশঙ্কিত হন। গত দুই-বারের অধিবেশনে সে আশঙ্কাও অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে।

আর একটী কথা হিন্দুর দেশে স্বধর্ম্ম নিষ্ট ব্যক্তিগণ কংগ্রেসে অধিক যোগদান করিলে এ আশঙ্কাও সহজেই তিরোহিত হইতে পারে।

অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদে যথোচিত আস্থা নাই, কেননা গবর্ণমেণ্টের ইহাতে কৃপা-দৃষ্টির অভাব। গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে এই-রূপ অনুযোগের বোঝা চাপাইয়া আমরা একরূপ নিশ্চিন্ত আছি। আমাদেব যেন কিছুই করিবার নাই। তাহা নহিলে কেবল অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব কেন? সকলই কি রাজা করিয়া দিবে?

একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার উন্নতি করিতে হইতেছে না, সম্যক্ জ্ঞান লাভ করাই এখন যথেষ্ট। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা এবং বণিকের উপর নির্ভর না করিয়া যথাশাস্ত্র ভেষজ সংগ্রহের উপরই ইহা নির্ভর করে। ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা ও শাস্ত্র প্রচার একরূপ হইতেছে কিন্তু যথাশাস্ত্র ভেষজ সংগ্রহের ব্যবস্থা কি? একেত তাহা দুষ্প্রাপ্য—তাহাতে ত্বক্ মূল পত্র চেনাও সহজ নহে; আবার একই বৃক্ষমূলাদি সরস থাকিলে যে গুণ, নীরসে তাহা নহে, শীতে যেরূপ ফলপ্রদ, গ্রীষ্মে সেরূপ নহে, প্রাতে যেরূপ অপরাহ্নে সেরূপ নহে, পার্ব্বত্য ভূমিতে যেরূপ, নিম্ন বা জলাভূমিতে সেরূপ নহে।

এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইচ্ছা করিলেই ব্যয় করিয়াও যে, যে কোন ভেষজ দ্রব্য পাওয়া যাইবে, সে উপায় নাই। চিকিৎসার্থীইবা শিখিবে কিরূপে আর রোগীগণের আশানুরূপ ফল পাইবার আশা কোথায়?

কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয় সম্প্রতি যথাসাধ্য এই গুরুতর অভাব দূরীকরণের জন্য নিলুয়া ষ্টেশনের নিকট "আদি-আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্য উদ্যান" নামে এক উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। দেশ দেশান্তর হইতে নানাবিধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বৃক্ষ লতা গুল্মাদি এই স্থানে সংরক্ষিত হইবে। কেহ কোনরূপ দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া এই উদ্যানে সংরক্ষিত করিতে চাহিলে যথোচিতব্যয়েও তাহা গ্রহণ করা হইবে। ব্যাপার মহান্ গুরুতর ও বহু ব্যয় সাপেক্ষ।

বিনোদ বাবু আয়ুর্ব্বেদ প্রচারে একজন অগ্রগণ্য, নানাবিধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়া অনেকের নষ্টপ্রায় জীবনদানে সহায় হইয়াছেন, আর আজ এই ভৈষজ্য উদ্যান বা আরোগ্যাশ্রম তাঁহারই যত্নে ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার মহাপুণ্যের কথা হিন্দুর নিকট নূতন কথা নহে—আর এই ভৈষজ্য উদ্যান প্রতিষ্ঠা—লক্ষ লক্ষ আর্ত্তুরের আরোগ্যাশ্রম মহাকীর্ত্তি! অপূর্ব্ব পুণ্যানুষ্ঠান!

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান
এবং
সমীরণ।

১ম খণ্ড। | সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

সরস্বতী পূজা।

হিন্দুজাতি শক্তিসেবক। শাক্ত বল, বৈষ্ণব বল, জৈন বল, গাণপত্য বল, শৈব বল সকলেই শক্তিসেবক। সকলেই শক্তির কোন না কোন মূর্ত্তিকে, কোন না কোনরূপ বিকাশকে সেবা করেন। আমরা যেখানে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, সেইখানেই সেই মহাশক্তির আবির্ভাব অনুভব করিয়া তাহার উদ্দেশে পূজা করি। যে শক্তির প্রভাবে জগৎ শূন্যমার্গে প্রতিনিয়ত অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে, যে শক্তির প্রভাবে বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে যাইতেছে, যে শক্তির প্রভাবে ঋতুর পর ঋতু, মাসের পর মাস আসিতেছে যাইতেছে, আমরা সেই শক্তির সেবা করি। সকলই সেই মহাশক্তির আংশিক বিকাশ। সেই শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে আমরা সাময়িক দুই একটী সামান্য ভাব প্রকটিত করিব।

আর আমাদের এখন জামুভানু কৃষাণুর সাহায্যে জড়সড় হইয়া কাল কাটাইতে হইতেছে না। শীতকাল আমাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক গরমে থাকিয়া অভ্যাস, শীতটা তাহার বিপর্য্যয়, সুতরাং কষ্টকর, সে কষ্ট শেষ হইল। দক্ষিণা বায়ু একটু একটু করিয়া দেখা দিল, কবির মলয় মারুত বহিতে লাগিল, গাছে নূতন নূতন লাল লাল সবুজ সবুজ কত রঙ্গের কত প্রকার ফুল ও পাতা দেখা দিল, তাহার চমৎকার সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। আকাশে সূর্য্যরশ্মীর তেজ বাড়িয়া দশদিক বিভাষিত হইল। কোকিল মধুমক্ষিকাদির নানাবিধ সুমিষ্ট স্বরে জগৎ ভরপুর হইল। এ হেন সুস্নিগ্ধ সমীরণময়, সুমিষ্ট সুগন্ধময়, সুন্দর সুবর্ণময় সুসময়ে আমরা কি যে শক্তিপ্রভাবে এই সৌন্দর্য্য পাইলাম তাহাকে পূজা না করিয়া কি থাকিতে পারি—তাই আমরা আজ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সেই বাসন্তিকী শক্তির আরাধনা করি। এ শান্তিময়ী সৃষ্টির মূর্ত্তি সরস্বতী প্রতিমা ভিন্ন অপর মূর্ত্তি কিরূপে দেখান

যায় ? এ দারুণ দুরন্ত দানবদলনী করাল-বদনা কালীমূর্ত্তিতে হইবে না, অসুরকুল সংহারিণী দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে সম্ভবে না। হিন্দু-ভক্ত সময় বুঝেন, কাল বুঝেন, তাই আজ বসন্ত পঞ্চমীতে সেই মহাশক্তির বাসন্তিক আবির্ভাবকে সরস্বতী মূর্ত্তিতে পূজা করেন। এ পূজার উপকরণ দেখুন, চাই বনফুল, চাই আম্র-মুকুল, নবীন নানাবর্ণ সুরঞ্জিত নব কিশলয়, কুঙ্কুম আদি সুন্দর পদার্থ, সুগন্ধময় দীপ ধুপাদি। আর বাদ্যের কথা! যিনি সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী, সাহিত্যের জনয়িত্রী তাঁহাকে সংগীত ভিন্ন আর কি দিয়া পূজা করিব। তাঁহাকে আমরা "বীনা পুস্তক রঞ্জিত" ভাবিয়া পূজা কবি। যাহাব যাহা প্রীতিকর তিনি তাহা দিয়াই তাঁহাকে পূজা করেন। আমি অলঙ্কার-প্রিয় অলঙ্কার দিয়া তাঁহাকে সুশোভিত করি, তুমি ব্যবহারজীবী তোমার ব্যবস্থার্ণব দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত কব। আবার কেহ তাঁহাকে বীণা দিতেছেন, কেহ বেহালা দিতেছেন, কেহ এস্রাজ দিতেছেন, যিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝেন, তিনি তাহাই তাঁব চবণে অর্পণ করিয়া মন প্রাণ সন্তুষ্ট করিতেছেন। আর আমার মত সাহিত্য সংগীত বিহিন পশুর পক্ষে তাঁহাকে দিবার কি আছে ? আমি বলি মা তোমারই সমস্ত তোমারই আছে, আমরা তাহাতে কেবল সুখ-ভোগ করিতেছি, তৃপ্তিলাভ করিতেছি মাত্র। তোমার রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ সমস্তই, তুমি আমাদের ভোগের সামগ্রী করিয়াছ আমরা উপভোগ করিতেছি, কিন্তু ইহা তোমার, এইটুকু যেন মনে করিয়া ভোগ কবি, আর এই উপভোগ যেন কেবল শরীরগত না হইয়া মন পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, আত্মার উপভোগ্য হইয়া অনন্তকালের সুখভোগের উপায় হয়।

আমি যেকথা বলিব বলিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ কবিলাম তাহা এপর্য্যন্ত বলা হইল না। সমালোচ্য বিষয়—সরস্বতী পূজাটী কি ? এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে ইহা সেই মহাশক্তির আংশিক, বাসন্তিক বিকাশের আরাধনা। সরস্বতী সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী। আমরা সকলেই জানি একটী কথা রকম ফের করিয়া বলিলে মিষ্টও লাগে কটুও লাগে, কেহ সন্তুষ্ট হয় কেহ বা রুষ্ট হয়। আবার একাধিক কথার বিশেষ বিশেষ সন্নিপাতে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল দৃষ্ট হয়। আমি মন্ত্রেব মাহাত্ম্যেব কথা বলিতেছি না। আমি যাহা বলিতেছি সেটা বড় মোটা কথা। সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দো প্রণালী কি আশ্চর্য্য। হ্রস্বদীর্ঘ স্বর ব্যঞ্জন সন্নিবেশেব পারিপাট্যে যোতিঃ আদির ঠিক কবিয়া কি আশ্চর্য্য মনোমুগ্ধকব শ্লোক রচনা হয়। যাহারা সে শ্লোক বুঝেন তাঁহারা মুগ্ধ, আবাব যাহারা অর্থ না বুঝে, তাহারাও মুগ্ধ হয়। কেন মুগ্ধ হয়, তাহার কারণ বিজ্ঞান কিছু বলিতে পারেন কি না জানি না, আমরা বুঝি, ইহা একটী শক্তি প্রভাবে ঘটে, সেই শক্তি আমাদের আরাধনীয় শক্তি, সেটী সরস্বতী শক্তি। উপরে শব্দ বিন্যাসের যে কথা লেখা হইল তৎসম্বন্ধে আর এক কথা। সংস্কৃত ভাষার ছন্দে কি নাই, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি নিরস বিষয় ছন্দে লিখিত হইয়া কি সুপাঠ্য ও সহজ গ্রাহ্য হইয়াছে, কবিরাজী গ্রন্থে রোগের লক্ষণ, গাছ গাছড়ার নাম কেবল শব্দ

বিন্যাসের তারতম্যে এমনি মধুর হইয়াছে যে তাহা সহজে অভ্যাস হয়, এই শেষোক্ত গ্রন্থ নিচয়ের রচয়িতাগণ "কবিরাজ" উপাধি পাইয়াছেন। তার পর শব্দবিন্যাসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গীত। সঙ্গীত বুঝিতে কেবল শব্দের সন্নিবেশ বশত কি মোহিনী শক্তির আবির্ভাব বুঝা যায়। তুমি গানের ভাব বুঝিলে, সুরতালের ভাবভঙ্গি বুঝিলে তুমি ত মুগ্ধ হইলেই। আর আমি কিছু বুঝিলাম না, আমি আরও মুগ্ধ হইলাম, আমি কেন আমার ছয় মাসের শিশুটী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইবে, জীবজন্তুও মুগ্ধ হইবে। এরূপ মুগ্ধ হইতে হয় কেন? তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? আছে বৈ কি? কিন্তু বিজ্ঞান এক স্থানে গিয়া আট্‌কাইবে, বিজ্ঞান বলিবে ইহাতে এইরূপ হয়। কেন হয়? বিজ্ঞান বলিতে পারিবেন না। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিব ইহার এই শক্তি। এই শক্তি সেই মহাশক্তির আংশিক বিকাশ, ইহা আমাদের ভক্তির জিনিস্, পূজার জিনিস্। তাই আমরা সঙ্গীত সাহিত্যের মোহিনী শক্তিকে, শান্তিময়ী সরস্বতী প্রতিমায়, এই সুখময় বসন্ত সমাগমে স্বভাবের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের সুকোমল সামগ্রী দিয়া প্রীতি ও ভক্তির সহিত পূজা করি। এমন সহজ ধর্ম্ম, সহজ কর্ম্ম, সহজ পূজাপদ্ধতি, সহজ ভক্তি আর কোথায় পাইব। তাই আজ আমরা মনের আনন্দে, উৎসাহে, ভক্তিভরে জোড়করে বাসন্তিক পুষ্প কিশলয়াদি, অঞ্জলি লইয়া মাকে বলি "সকল বিভব সিদ্ধৈঃ পাতুবাক্ দেবতা নঃ!"

ফুলরা।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

তিমির চিকুরচয় পিঠে গুটাইল,
প্রকৃতি ললাটে রবি সিন্দুর ফুটিল।
কুহরে কোকিল, বন আন্দোলিত বায়,
ডালি করে ফুলরা তুলিছে ফুল তায়।
নাই আর ফুলরার প্রফুল্ল বদন,
কপোলে প্রকাশ এবে সঘন চুম্বন,
প্রণয় আময় হৃদে অনুক্ষণ যার
কি আশ্চর্য্য যদি গণ্ড পাণ্ডু হয় তার;
অদৃষ্ট অলক্ষ্য ক্ষীণ নরের জীবন,
ত্রাসিত সতত প্রেমী সুকোমল মন।
কখন কি সুস্থ থাকে সেজন অন্তরে
শিহরে যে মলয় বা ভৃঙ্গ পিক স্বরে!
যথায় প্রণয়, শঙ্কা সদা সঙ্গী তার,
আলোকের সনে যথা সংযোগ ছায়ার।
তোলে ফুল চারিদিকে চায় সচকিতে,
দেখিতে না পায়, চায় যাহারে দেখিতে।
হেন কালে মণিরাজ বনে উপনীত
কি দাসত্ব রাজত্ব প্রণয়ে বিজড়িত!
কহিল ফুলরা "কেন বিলম্ব এমন
কোথা বুঝি হয়েছিল নিশি জাগরণ?"
কহি হাসি মুখে বালা চায় মুখ পানে
বিরস বিষাদ দেখে বসিয়া বয়ানে
"পীড়া হয়েছে কি কিছু" সভয়ে সুধায়,
দেখিল ভাসিছে গণ্ড নয়ন ধারায়।

ডালি ফেলি ধেয়ে, আঁখি মুছায় বসনে,
নাহি পারে সম্বরিতে আপন নয়নে ;
কেঁদে যুবা কণ্ঠে ধরি কহে ফুলরার,
"প্রণয়িনী, কাল দেখা হইবে না আর।
ফুলরা কহিল" কেন বল সমুদয়,
আর না সহিতে পারি বিষম সংশয়।"
"বাণিজ্যে যাইতে হ'বে আদেশে পিতার"
পড়িল অলক্ষ্য বজ্র শিরে ফুলরার
পাষাণ পুত্তলি মত নির্নিমেষে চায়,
বহুক্ষণে দীর্ঘশ্বাস উঠিল নাসায়,
বহিল প্রবল শ্বাস হৃদি বিদারিয়া
সঙ্গে প্রাণ অমুগুঞ্জ নিল উড়াইয়া,
কহিল "যাইবে তুমি বাণিজ্য কারণে"
বিনা মূলে বেচে গেলে আমায় শমনে।
গলে গলে করে বনে উভয়ে রোদন
কে কারে প্রবোধে, শোকে তুল্য দুই জন।
সম্বরিয়া কহে যুবা আশ্বাস বচনে,
"কি করিবে প্রণয়িণী ধৈর্য্য ধর মনে ;
ত্বরিত আসিতে আমি করিব যতন,
বিধি কষ্ট দিলে বল কে করে বারণ ?
উচ্চৈঃস্বরে ফুলরার সঘন রোদন
আশ্বাস প্রবোধ বাক্যে কি হবে তখন।
আপনি করেন ধাতা যে হৃদে আঘাত
বেদনা কি হরে নরে বুলাইলে হাত ?
বহুক্ষণে খুলে বালা নয়ন কমল,
আঁখি বরিষণে হৃদি কিঞ্চিত শীতল।
হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে অনল যখন
বাঁচিত কি না পেলে নয়ন বরিষণ ?
কহিল ফুলরা "দুখী দৈবে সুখ পায়,
দৈবের সে বিড়ম্বনা বুঝিলাম হায়।"
বনে তুলিতাম ফুল বাজারে বেচিতে,
সুখ শেলে স্থান কেন দিলাম হৃদিতে ?
যাপিতাম যামিনী কি সুখের নিদ্রায়
কখন না জানিতাম দুঃস্বপন দায় ;
যার সনে দেখা হ'তো হাস্য আলাপনে
সময় কাটিত যেন সুখের স্বপনে ;
ছিল খ্যাত চির ফুল্ল মুখ ফুলরার,
কি জানি কি হেতু রাগ তাহে বিধাতার ;
সরল লালসা রাগ জানি না কেমন,
কুভাবে না চাহিয়াছি কাহার বদন ;
প্রেমের নিগড় সাধে পরিলাম পায়
জন্ম শোধ হারালেম হে প্রেম তোমায় ;
দিবা নিশি দীর্ঘ শ্বাস হৃদয় কম্পন,
উচ্চে কেহ ডাকিলে উথলে উঠে মন ;
পরিহাসে হাস্য হীন ভয় হয় প্রাণে,
জেনেছে কি প্রেম কেহ গোপন সন্ধানে ?
অদশনে রুচি হীন ভূষণে আহারে,
এই সুখে সুখী নাথ করেছ আমারে ;
বারেক তোমার মুখ দর্শন আশায়
ফুলরা সহিত তবু এ সব জ্বালায়।
যাও সুখে নাথ থাক যথায় তথায়,
সুখে থাক, এই মাত্র চাই বিধাতায় ;
এ শ্রবণে অমঙ্গল সংবাদ তোমার
কভু না শুনিতে যেন হয় ফুলরার।
বাণিজ্যের পরে ঘরে আসিবে যখন,
অগ্রে তার কৃপা মোরে করিও শমন।
বেঁচে যেন না হয় করিতে দরশন
আমায় দেখিয়া নাথ ফিরাবে বদন,
পিক কাকে চির দিন না রয় মিলন,
তোমায় আমায় প্রেম বুঝেছি তেমন ;
কাহিনীতে শুনি প্রেমে নারী মারা যায়
সত্য তাই হয় কি না দেখি পরীক্ষায়।
যুবা কহে ছি ছি একি বচন তোমার,
প্রণয়িনী ! আমি চির কিঙ্কর তোমার ;
অনল না জ্বলে, যদি ভানু নিভে যায়
মণিরাজ তথাপি কি ভুলিবে তোমায় ;
দুখানলে হৃদি জ্বলে তুমি প্রিয়া তায়,
বাক্য হবি দিয়া ভাল দহিলে আমায় ;
পিক কাক মিল নয় তোমায় আমায়,
জানিবে এ প্রেম প্রিয়া নীর ক্ষীর প্রায় ;

পূর্ব্বে কহিয়াছি শঙ্কা নাহি করি আর,
প্রণয়িনী! পুত্র চির অধীন পিতার।
বর্ষ না ফিরিতে আমি আলয়ে ফিরিব,
হৃদে হৃদে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইব;
অতএব প্রণয়িনী ধৈর্য্য ধর মনে
আমায় বিদায় দেহ প্রফুল্ল বদনে;
প্রবাস বিরহ বল নাহি ঘটে কার,
বাটী ছেড়ে যেতে হয় বিদেশে রাজার।
এত বলি হৃদে যুবা ফুলরায় লয়
শুকাইল চোখে জল জুড়াল হৃদয়।
প্রেমের জীবন যাত্রা রীতি বরিষার
ক্ষণে আলো বরিষণ ক্ষণেক আঁবার।
কহিল ফুলরা "নাথ শপথ আমার
বর্ষ না ফিরিতে বাসে আসিবে আবার"।
কপোলে চুম্বিয়া যুবা কহে ফুলরায়
কোন্ প্রিয় দ্রব্য প্রিয়ে আনিব তোমায়।
ফুলরা কহিল "আমি কিছু নাহি চাই
এই ভাবে এইখানে দেখা যেন পাই";
কখন নয়ন পূর্ণ জল ঢল ঢল,
যুবা কহে "বিদায়ে রোদন অমঙ্গল"
হেন মতে বিদায় লইল দুই জন
কেমনে, কি মনে জানে ঠেকেছে যে জন।
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মানি যদি মন
প্রবাসেতে যেতে প্রেমি বিদ্রোহী চরণ;
পদে পদে করে পদ অন্তর তাহারে
তিলেক ছাড়িতে মন নাহি চায় যারে;
পথ অশ্রু বিচ্ছিন্ন না বাধা মানে তায়.
দেহ পাশে বেঁধে প্রাণে টেনে নিয়ে যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

১

কিছুই ছিল না, ছিল তব অবস্থান,
রবে, কিছু রহিবে না আর;
তুমি কাল বলবান
কোন অসাধ্য, অসাধ্য তোমার?

২

অশনি পতনে প্রাণ পায় যেই জন,
কুশাঘাতে ক্ষয় কর তারে;
সিন্ধুতল মগ্ন জনে বাঁচাও জীবন
সন্তরিতে, বধ নিয়া পারে।

৩

রবি শশী কাটি দুটি ঘুরাইয়া করে
কি কৌতুক কর প্রদর্শন।
সোনা রূপা কর ধূলা পরশের ভরে
ইন্দ্রজালী কে আর এমন?

৪

কর্ম্মসূত্র মানব পুত্তলি বাঁধি তায়,
কত নাট্য হয় অভিনীত!
তুমি আছ নেপথ্যে যে জানিতে না পায়
সে ভাবে পুত্তলি ক্রিয়ান্বিত।

৫

হাসাইলে হাসে, কাঁদে, কাঁদাও যখন,
উঠে, পড়ে চাতুরীতে তব।
সাজে সাজে রাজা প্রজা বীর ধীরগণ
সাজ বিনে সমতুল সব।

৬

বিলোল লহরী ছিল সাগর যথায়,
এবে যেন লহরী স্তম্ভিত;
ক্রমে সোপানিত তথা হিমালয় কায়,
তিমি রাজ্যে দন্তী বিরাজিত।

৭

গলাও ভূধর, সিন্ধু জমাও গিরীতে,
ব্যাঘ্র চরে পূর্ব্বের নদীতে।
সব পার কাল, তুমি পার কি মুছিতে
প্রেম স্মৃতি প্রেমির হৃদিতে ?

৮

অভ্যাসে ভূপাল ভোগ পারে ভুলিবারে,
ভুলে ভিক্ষু ঝুলি আপনার,
অকপটে ভালবেসে ভুলিতে কি পারে,
প্রেমি কভু প্রিয় মুখ তার !

৯

রস আর্দ্র হৃদি পত্র প্রেম গ্রন্থ তায়
আলিঙ্গন নির্ভরে মুদ্রিত,
যাবৎ কৃতান্ত কীটে না কাটিয়া খায়,
ভাব কভু নয় অন্তরিত।

১০

বিরহিনী, মুগ্ধ সুখী ফুলরা এখন,
অতি দূরে অতি প্রিয় জন,
বহু দিন গত তবু নয় পুরাতন
নবীনার বিয়োগ বদন।

১১

একা যায় সে বনে, সে বন এবে বন,
কাঁদে বসি তমালের তলে ;
পাণ্ডুর কপোল আরো পাণ্ডুর বরণ,
আভা ধৌত অশ্রু জলে।

১২

না হাসে না আলাপে না রুচি সনে খায়,
কালী ফুলকায় ফুলরার ;
কোমলা কামিনী কি বাঁচিত এ দশায়,
আশা ! বিনা আশ্বাসে তোমার ?

১৩

পট বৈদ্য কি তুমি বিদীর্ণ হৃদয়ের !
কি শীতল তব প্রলেপন !
দুঃখ সুখ বিচারিয়া দেখি সংসারের,
সুধু তব বিয়োগ মিলন।

১৪

রাজ্যে রাজা অতি দুখী অভাবে তোমার,
মুকুট-সে নিগড় মাথার
দুঃখি কৃষি, সুখের রাজত্ব কিবা তার
থাক তুমি কুটিরেতে যার ;

১৫

অশ্রু লবণাম্বু গিরী মাঝে অবস্থান,
শোধে নর অমিয় বঞ্চন
মতির মন্দার বাঞ্ছা বাসুকী প্রমাণ
আশা সুধা প্রকাশ মন্থন ;

১৬

প্রাসাদ, কুটীরে তব ভ্রমণ ভিক্ষায়
তবু ঝুলি পূরে না কখন,
হে সিদ্ধ ভিক্ষুক ! কিন্তু তোমার ঝোলায়
পেতে পারে, যার—যায় মন।

১৭

জীবনে সে মরে, ঘরে তুমি নাই যার,
মরে বাঁচে কৃপায় তোমার,
দেখাও মুদ্রিত নরে সে সুখ সংসার
কুসুমেতে কীট নাই যার ;

১৮

ভিক্ষুক কথায় সাধে অভ্যাস আপন
সিংহাসনে বসিবে যেমনে,
সুললিত গীত শিখে রাখে মূকজন
গাবে কণ্ঠ ফুটিবে যখনে।

১৯

কি মোহিনী মায়া ! কিছু বুঝি না তোমার,
হাসি মুখে দেখি তব হাসি,
জানি মনে, বলিয়াছ মিথ্যা কতবার,
তবু তব মিথ্যায় বিশ্বাসী ;

২০

বিষাদ বিঘোর মন অশ্রু বরিষণ,
উচ্চ পুঁচ্ছ শত্রু শিখী যত,
যত শীরে আশঙ্কার অশনি গর্জ্জন
তোমার বিজলী জ্বলে তত।

২১
এক দুই তিন ক্রমে যত দিন যায়,
ফুলরার কায় তত ক্ষীণ,
আশা বাড়ে মনিরাজ আসিবে ত্বরায়,
গত হ'য়ে গেল এত দিন।

২২
সে বনে দুজনে হবে মিলন আবার,
বসে হেন আশা কল্পনায়;
ক্ষণে ক্ষণে বিরহের দশা আপনার,
সরলা সকলে ভুলে যায়;

২৩
হেন ভাবে কাটে দিন, নিশায় স্বপন
সন্তাপিতে লয় অঙ্কোপর,
তনু যার ইন্দ্র-ধনু অনুর গঠন
সুরম্য ভঙ্গুর রূপধর

২৪
স্বপন অলীক, খ্যাতি অলীক তোমার
আছে তব পৃথক সংসার,
নাহি সেই, হবে ছায়া, তাহা কি ইহার?
অথবা এ ছায়া বুঝি তার?

২৫
নয়ন খুলিলে টুটে সংসাব তোমার,
সে যদি অলীক সে কারণ,
কিসে সত্য জাগ্রত স্বপ্নের সংসার
নাহি থাকে মুদিলে নয়ন!

২৬
কি বিচিত্র মালা গাঁথ সূত্রে কল্পনার,
মূলা ফুলে মালতি মিলিত;
আছে ফুল জানা শুনা, আছে নামে যার,
আছে জান', কভু পরিক্ষিত।

২৭
দেহ ভিন্ন আছে অন্য জীব নাম তার
বিনা দেহে সুখ দুখ পায়,
স্বপন! যে চিন্তিয়াছে রহস্য তোমার
তার না সংশয় রয় তায়;

২৮
দেখিয়াছি স্বপ্ন থেকে জরায়ু শয়নে,
দেখিতেছি, সংসার স্বপন,
দেখাবে স্বপন পুন যামিনী মরণে
কবে তবে লভিবে চেতন?

২৯
অজ্ঞান আঁধার রাত্রে শরীর শয্যায়
থেকে জায়া মায়া আলিঙ্গনে,
বিবেক নয়ন মুদে মোহের নিদ্রায়
ভব স্বপ্নে আছি অচেতনে;

৩০
হায় যে জেনেছে, সেকি জাগাবে আমায়?
দেখিব কি জ্ঞানারুণোদয়,
শুনিব শ্রুতিতে পাখী তত্ত্ব মসি গায়,
পাব শান্তি মধুর মলয়?

৩১
ভব স্বপ্ন হতে স্বপ্ন, তোমার স্বপন
ভাল মানি বিচারিয়া মনে,
ভব স্বপ্নে মিলে না যা করি প্রাণপণ,
তোমায় তা পাই অচেতনে;

৩২
পোতে শুয়ে নাবিক নিবাস নিজ পায়,
প্রবাসি প্রেয়সী হৃদে ধরে,
লোকান্তর হতে পুত্র নিদ্রিতা মাতায়
ডাকে আসি পরিচিত স্বরে;

৩৩
রাজাত্মজ আত্ম দোষে কামনা কান্তার
প্রাপ্ত দৈন্য নরত্ব এখন;
অপূর্ণ সংসারে না বিলাস মিটে তার,
স্বপ্ন, পূর্ব্ব সম্পদ স্মরণ।

৩৪
সংসার রেখেছে দূরে সংসারের সার,
ফুলরা কি বাঁচিত জীবনে?
যদি নিশামনি মুখ মণিরাজ তার
নিশায় না দেখাত স্বপনে!

৩৫
আঁখি খুলে বৃথা যার করে অন্বেষণ,
আঁখি মুদে দেখা পায় তার,
দিবায় আশার ধ্যান, নিশায় স্বপন
হেন কাল কাটে ফুলরার।

৩৬
কেহ কাল কাটে, কারু কালে কাটে হায়,
কালের শকট দ্রুত ধায় ;
গৌরব গর্জ্জনে কেহ আরোহিয়া যায়,
দীন কেহ চাপা পড়ে তায়।

৩৭
তৃতীয় প্রহর বেলা অবসান প্রায়,
ফুলরা বসিয়া নিকেতনে
কতগুলি ফুল তুলি গাঁথিছে সুতায়
বিরলে, বিষাদে, মৌন মনে ;

৩৮
অন্ধ মাতা বসি তার কুটীর আগারে,
কভু কিছু জিজ্ঞাসে কন্যায়,
ফুলরা বিমর্ষ কেন বুঝিতে না পারে,
কেহ তার নাহি আর হায় !

৩৯
হেনকালে প্রতিবাসী বালা এক জন
স্বজাতীয়া আইল তথায়,
ফুলরার সম বয় অসিত নয়না
কহিল চাহিয়া ফুলরায়—

৪০
"মালা গাঁথা হয় নাই ফুলরা তোমার,
যাবে তবে নগরে কখন ?
সময় হয়েছে বর ঘরে ফিরিবার,
এস যদি যেতে হয় মন"।

৪১
"কাহার বিবাহ হলো" ফুলরা সুধায়
"নাম নাই আমার স্মরণ"
প্রতিবাসী বলে "বিয়া এমন ঘটায়
কভু না দেখেছে কোন জন ;

৪২
এস যাই, ফুল হার দিব উপহার,
পাইব বিস্তর পুরস্কার ;
শুন নাই তুমি এ বিয়ার সমাচার,
নগরে কি-যাও নাই আর" ?

৪৩
ফুলরা কহিল "ছিল অসুখ শরীরে,
বহু দিন না যাই নগরে,
তুমি যাও, যাইব না" কহে ধীরে ধীরে,
সে কহে "কি হবে বসে ঘরে" ?

৪৪
ফুলরা ভাবিল যাই নগর ভ্রমিয়া
দেখি যদি জুড়াই অন্তর,
সন্ধান লইব তথা সুযোগ বুঝিয়া
মণি মম এসেছে কি ঘর !

৪৫
হেন ভাবি সঙ্গে করি ফুলের মালায়,
ডালিপবে তুলে সযতনে ;
অন্ধ জননীর কাছে লইয়া বিদায়,
চলে বালা সঙ্গিনীর সনে।

৪৬
"থাক মাতা, দীপ জ্বালিব আসিয়া"
হেন মতে বলে বালা যায়,
পায় পায় বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া
অন্ধ মায় মমতায় চায় ;

৪৭
উত্তরিল দুই জন নগরে যখন
সমারোহে বর চলে ঘর,
সত্য বটে পরিণয় উৎসব এমন
কেহ নাহি দেখেছে সত্বর।

৪৮
চান্দনী ছায়ায় এক পথ সন্নিধানে
বিশ্রামিছে বরযাত্রগণ,
মাঝে সুশোভিত চতুর্দ্দোলা যানে
বসে বর কন্যা দুই জন।

৪৯

বিপুল জনতা, গর্জ্জে হয়, হস্তিচয়,
কত মত বাজিছে বাদন ;
বিভূষিত বরযাত্রী কোলাহলময়,
করে পথে গোলাপ সিঞ্চন ;

৫০

জনতায় ফুলরা না দেখা পেলে আর,
কোথা গেল সঙ্গিনী তাহার,
ধীরে ধীরে চলে বালা কাছে শিবিকার,
দিতে বরে হার উপহার।

৫১

রক্ত পট্ট বাসে চারু শিবিকা রচনে
রক্ত বাস পরা দাসগণে ;
রক্ত গণ্ড বর কন্যা আরক্ত বসনে
রক্ত রবি পশ্চিম গগণে।

৫২

বর গলে হার বালা যতনে অর্পিয়া
মুখ তুলে মুখ পানে চায়,
পাযাণ প্রতিমা হেন ক্ষণেক থাকিয়া
আর্ত্ত স্বরে পড়িল ধরায় ;

৫৩

ত্রাস তরে ধরে তুলে কিঙ্করের দল,
নাশায় না বহে আর শ্বাস,
কোলাহলে কেহ বা বদনে দেয় জল,
কেহ অঙ্গে করিছে বাতাস।

৫৪

বারেক চাহিয়া বর বালার বদনে
সঘনে কাঁপিছে শিবিকায় ;
দুই ভুজ প্রসারিয়া যেন আলিঙ্গনে
অতি বেগে পড়িল ধরায়।

৫৫

মাথার রতন চূড়া পড়িল অন্তরে,
ছিঁড়িল কণ্ঠের মতিহার,
কুঙ্কুমিত কায় লুটে ধরা ধূলিপরে,
উঠিল বিশাল হাহাকার।

৫৬

বিফল ব্যজন, বৃথা গোলাপ সিঞ্চন,
মুদিত নয়ন দুই জন ;
মসি মাখা দুই মুখ মধুর গঠন,
সুন্দর দুতনু অচেতন।

৫৭

হেমরাজ বণিক-প্রধান খ্যাতি যার
দেখে পুত্র মিলে না নয়ন,
ক্ষণেক নীরব রহি পাষান প্রকার,
সেও হ'লো ধরায় পতন।

৫৮

ফুলরার প্রেম হ'তে ভুলাইতে মন,
ত্বরা পুত্রে আনি নিকেতন
করেছিলে বিবাহের যত আয়োজন,
বিফল তোমার সে যতন।

৫৯

মণিরাজ পাইল না অবসর আর,
বারেক দেখিতে ফুলরায় ;
বিবাহ স্বীকার করি শাসনে পিতার
পিতাসনে প্রাণে মারা যায়।

৬০

আসিয়া ভীষকগণ দেখে তিন জনে
প্রাণ তন্ত্র কম্পন রহিত ;
মদন উৎসব সুখী বিবাহ প্রাঙ্গণে
দণ্ডপানি যম বিরাজিত।

৬১

মণিরাজ-জননী শুনিল সমাচার,
কোন কথা শুনিল না আর—
প্রস্থান করিল যথা আগে গেছে তার
প্রিয় পতি, প্রাণের কুমার।

৬২

হা নবোঢ়া বিধবারে! জীবন তোমার
ভাল ছিল, গেলে এই ক্ষণে ;
কত ভাল জানিলে না অসির প্রহার,
বড় ব্যথা করাত কর্ত্তনে।

৬৩

দিন রাত্র পরস্পরে করে আকর্ষণ
কালের করাত শিরোপরে,
ঘন দণ্ড গতায়াতে কর্ত্তন সঘন
অনু রূপে অশ্রুচয় ঝরে।

৬৪

প্রদীপ জ্বালিবে কন্যা আসি নিকেতন,
অন্ধ মাতা ঘরে আছে তার,
বাঁচিবে কি যখন সে করিবে শ্রবণ—
নিভেছে ফুলরা দীপ তার?

৬৫

কে ফুল তুলিবে ভৃঙ্গ গুঞ্জ গীত স্বরে
ফুলের কাননে ফুলবার,
ছিঁড়িল অতুল কলি কাল-মালিকরে
সংসার এ উদ্যান তাহার

৬৬

ফুলবা মালিনী তার প্রেম গাঁথা হার
ছিঁড়ে গেল গাঁথিতে গাথিতে,
ধীমান পাঠক! দোষ নয় সে আমার
হ'লো আয়ু স্ত্রের ত্রুটীতে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

৪। গীতার প্রক্ষিপ্ততা-বিচার করি কেন?

এক্ষণে আমাদিগের সম্মুখে এক গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে—গীতাকাব প্রকৃতই মহাভাবতপ্রণেতা ব্যাসদেব কি না? বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে একটী কুসংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে যে, ভগবদ্গীতা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে, অর্থাৎ গীতা অন্য কর্ত্তৃক রচিত হইয়া মহাভাবতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কুসংস্কারটী আপনাআপনি প্রাপ্ত হন নাই। মনিয়র বিলিয়ম্‌স্ (Monier Williams) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশের মত এই যে, গীতা অন্য কোন কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ও উক্ত মত প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতাকে মহাভাবতের প্রক্ষিপ্তাংশ বলিলেও আমাদের তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশীয় ব্যক্তিও উক্ত মত সমর্থন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন দুই চারিটী যাহা বলিবার কথা আছে, তাহা না বলিয়াই বা কি প্রকারে নীরব থাকিতে পারি?

বঙ্কিম বাবু তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ "কৃষ্ণচরিত্রে" মহাভারতের প্রকৃত সত্য বাহি্‌ করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা যথার্থই প্রীতিলাভ করিয়াছি—মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছি যে, বঙ্গদেশে এরূপ পুস্তকের লেখক আছেন এবং এরূপ পুস্তকের পাঠকও আছেন। কিন্তু আমরা

তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি দু এক স্থলে মতের যথেষ্ট স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভগবদ্গীতাকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলা তাহার এক দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি। সাহেবেরা ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন বলিয়াই যে, তিনিও তাঁহাদিগের মত প্রত্যক্ষ অনুসরণ করিয়া ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন, তাহা নহে। আমার এইটুকু মনে হয় যে, সাহেবদিগের মতের পরোক্ষপ্রভাবে তিনি গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গিয়াছেন।

৫। দার্শনিকতা গীতার প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নহে।

বঙ্কিম বাবু মহাভারতকে তিন স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথম স্তরের মহাভারত প্রকৃত মহাভারত। দ্বিতীয় স্তর "পারমার্থিক দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত" এবং এই স্তর অন্য কর্ত্তৃক পরে রচিত হইয়া প্রথম স্তরের উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে। শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনিক পর্ব্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় ইত্যাদি এই তৃতীয় স্তর সঞ্চারকালে রচিত বলিয়া বোধ হয় ১।

বঙ্কিম বাবু ভগবদ্গীতাকে তৃতীয় স্তরের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সবিশেষ কারণ প্রদর্শন করেন নাই। গীতা "পারমার্থিক দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত," সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, বঙ্কিম বাবুর মতে গীতা তৃতীয় স্তরের না হউক, অন্ততঃ দ্বিতীয় স্তরের প্রক্ষিপ্ত তো বটেই। আমাদিগের এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, মহাভারতের কোনও অংশে দার্শনিক ভাব থাকিলেই তাহাকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে পারি কি না। মহাভারতের পূর্ব্বেও খুব সম্ভবতঃ, বিধিবদ্ধ ষড়্দর্শন না হউক, দার্শনিক আলোচনা ছিল। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সাংখ্য দর্শনই অধিক প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের দুই তিন স্থলে, ভগবদ্গীতার একস্থলে এবং এমন কি রামায়ণেরও একস্থলে সাংখ্যদর্শনের সর্ব্বপ্রথম সঙ্কলয়িতা কপিল মুনির নামোল্লেখ দেখা যায়। যে সকল শ্লোকে কপিলমুনির নামোল্লেখ আছে, সেগুলি যদি প্রক্ষিপ্ত হয়—হউক্। কিন্তু এবিষয়ে একটী কথা আছে। যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন অবশ্য তাঁহাদের স্বরচিত শ্লোকগুলি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, যাহাতে সাধারণ লোকে সেই শ্লোকগুলি মূলগ্রন্থের পরবর্ত্তী বলিয়া না মনে করিতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত ধরিয়া বুঝা যাউক্। গীতার বিভূতি যোগাধ্যায়ে (১০ম অধ্যায়ে) "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এই একটী কথা আছে। যদি কোনও ব্যক্তি মহাভারতের উপর এইটুকু প্রক্ষিপ্ত

---

১ কৃষ্ণচরিত্রের একাদশ পরিচ্ছেদ দেখ।

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মূলগ্রন্থের বিশ্বাসাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, যাহাতে লোকে ইহাকে পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া মনে করিতে না পারে। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি, এই কথাটুকু আছে। এই কথাটুকু হইতে আমরা ইহা বুঝিতেছি যে, মহাভারতের সময়ে কপিলমুনি সিদ্ধ পুরুষদিগের আদি ও অগ্রণী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। কারণ যদি এই শ্লোকাংশ প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তো কোনও কথাই নাই; আর যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলেও নিঃসন্দেহ প্রক্ষেপক জানিতেন যে মহাভারতের সময়ে কপিল মুনিকে সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইত এবং তাহারই সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তিনিও কপিলমুনিকে সিদ্ধপুরুষদিগের প্রধান-স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুসারে, কপিলমুনির নামোল্লেখবিশিষ্ট শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রক্ষিপ্ত হউক, সেই সকল শ্লোক হইতে আমরা ইহা বুঝিতেছি যে, রামায়ণ ও মহাভারতের, অন্ততঃ মহাভারতের পূর্ব্বে, কপিল সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃত দর্শনেরও নিশ্চয়ই বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সুকবি মহাভারতকার ব্যাসদেবের ন্যায় ঋষি তাহা যে জানিতেন না কিম্বা জানিয়া যে স্বরচিত ইতিহাসের মধ্যে তৎসম্বন্ধীয় কোনও কথা প্রবেশ করান নাই, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। বরঞ্চ প্রসিদ্ধিই আছে যে, ব্যাসদেব বেদ সকল বিভাগ করিয়াছেন, বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন; সুতরাং তিনি যে একজন আর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবকৃত মহাভারতে দার্শনিক ভাব থাকিতে পারে না, একথা বলিবার পূর্ব্বে প্রমাণ করা আবশ্যক যে, ব্রহ্মসূত্রকর্ত্তা, বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব ও মহাভারতকার ব্যাসদেব এক নহে। তাহা প্রমাণ করা বড়ই দুরূহ। সুতরাং মহাভারতে দার্শনিক কথা থাকিলেই যে, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ভগবদ্গীতা দার্শনিক কথাতে পরিপূর্ণ, তাই বলিয়া যে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেই হইবে, আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বসিতে পারি না। খুব সম্ভবতঃ দার্শনিক কথা থাকিলেও ভগবদ্গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নহে।

৬। যুদ্ধারম্ভে গীতাসম্বাদ সম্ভব কি না?

প্রক্ষিপ্তবাদীদিগের কেহ কেহ গীতাকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিবার অপর একটী হেতু প্রদর্শন করেন। তাঁহাদিগের মতে যুদ্ধারম্ভে গীতার ন্যায় একটা সুদীর্ঘ দার্শনিক বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব নহে ১। মহাভারতকে কাব্য হিসাবে ধরিলেও, তাঁহারা বলেন যে, ব্যাসদেবের ন্যায় সুকবি তাঁহার মহাভারতে যুদ্ধকালে এরূপ সুদীর্ঘ দার্শনিক উপদেশ বলিয়া অসঙ্গতিদোষ আনিতে পারেন না।

১। প্রসিদ্ধ ইংরাজ পুরাবৃত্ত লেখক ডাক্তার রবার্টসন বলেন যে, দুই সৈন্যদল যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এরূপ সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে অষ্টাদশ দীর্ঘ উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে।

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমরা এই বলি, এমন কোনও কথাই নাই যে, উপদেশ দিবার কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশের গীতোক্ত প্রত্যেক শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন ধরিয়া লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবের কথা বলিয়াছিলেন, ব্যাসদেব হয় তো সেই-গুলি সাজাইয়া লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই উপদেশ শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি হউক বা ব্যাসদেবেরই লেখা হউক, যুদ্ধারম্ভে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল বলাতে আমরা কোনও রূপেই অসঙ্গতি দোষ দেখিতে পাইতেছি না। যে সময়ে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বলা হইয়াছে, সেই সময়ে এই গীতা অপেক্ষাও সুদীর্ঘ উপদেশ দেওয়া যাইত সন্দেহ নাই। গীতার প্রথম অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে গীতাসম্বাদ যখন আরম্ভ হইয়াছিল, তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধের আরম্ভ হয নাই— তখন শঙ্খধ্বনি, বীরোচিত আস্ফালন, ব্যূহরচনা, যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত পরামর্শ প্রভৃতি চলিতেছিল। সুতরাং এরূপ সময়ে গীতাসম্বাদে অসঙ্গতি দোষ আদতেই আসিতে পারে না। এই সময়ে সংগ্রাম যদি প্রকৃতই আরম্ভ হইত, তাহা হইলে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব সেনাপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের খাতিরে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি অজস্র তীর নিক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না।

মূল মহাভারতেও দেখিতে পাই যে, এই কৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদের পরেও যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনের নিকট যুদ্ধ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে গেলেন। অনুমতি গ্রহণরূপ শিষ্টাচার সম্পন্ন হইয়া গেলে যুধিষ্ঠির স্বসৈন্য মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতে যে তাঁহার দলে আসিবে তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিবেন। এই ঘোষণানুসারে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু তাঁহার দলে আসিয়া যোগদান করিলেন। এতগুলি কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তবে প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে, মহাভারতের গীতাসম্বাদে কোনও রূপেই অসঙ্গতিদোষ আসিতে পারে না।

ইহার উপর আরও একটু কথা এই যে, কৃষ্ণার্জ্জুনের কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে দার্শনিক বিচার নহে; ইহা কেবল অর্জ্জুনের মনবিষাদ দূর করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আনয়ন করিবার জন্য ধর্ম্মকথা মাত্র। আমরাও যখন বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই, তখন বন্ধুগণ কত দার্শনিক ভাবযুক্ত ধর্ম্মকথা বলিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। অর্জ্জুনেরও কার্য্যকালে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা তাঁহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র। এই সকল দেখিয়া আমরা ভগবদ্গীতাকে অসঙ্গতিদোষের উল্লেখ করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে পারি না।

রণজিৎসিংহ।

বীরকীর্ত্তি।

যে দুর্দ্দান্ত মহাবীরকে, সভ্যজগতের বিপুল সেনা দমনে অসমর্থ হইয়া পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াছে, সেই মহাবীরের ভারতাক্রমণের অভিলাষ ব্যক্ত হইলে, ইংরাজ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কাযেই ইংরাজরাজ রণজিৎ এবং আফগানগণের সহিত মৈত্রিভাব স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই নিমিত্ত ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন আফগান রাজ্যে এবং মিঃ মেট্‌কাফ লাহোরে দূত স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। রণজিৎ বৃটিস দূতকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ফরাসীগণের ভারত আক্রমণ কিরূপে তাঁহার পক্ষে অনিষ্টদায়ক হইবে বুঝিতে পারিলেন না। *

সে যাহা হউক মেট্‌কাফের লাহোরে অবস্থানকালে রণজিৎ পুনরায় শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া, ফরিদকোট ও অম্বালা অধিকার, মালর কোটাল ও থানেশ্বরে কর গ্রহণ এবং পাতিয়ালারাজকে তাঁহার আশ্রয়াধীন হইতে বাধ্য করিলেন। এমন সময়ে ইউরোপ হইতে সংবাদ পৌঁছিল যে, মহাবীর নেপোলিয়ন সমুদয় ইউরোপের সহিত লোকত্রাস সংগ্রামে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার ভারত আক্রমণের আর সময় নাই। ইংরাজগণ সুস্থির হইলেন। এক্ষণে নিরাপদে তাঁহাদের ভারতীয় রাজনীতি পর্য্যালোচনার অবসর হইল। রণবীর-রণজিতের রাজ্য এবং সুবিস্তৃত সীমান্ত বর্ত্তী প্রদেশে, কতকগুলি মিত্ররাজ্য সংস্থাপন মঙ্গলজনক মনে করিয়া ইংরাজগণ এক্ষণে শতদ্রু পুলিনস্থ সর্দ্দারগণকে আশ্রয় দানে অগ্রসর হইলেন এবং মেটকাফকে অতি সন্তর্পণে ও সসম্ভ্রমে জানাইতে বলিলেন যে অতঃপর রণজিৎসিংহকে শতদ্রু নদীর দক্ষিণপার্শ্ব অবধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বামপার্শ্বের নরপতিগণ এক্ষণে ইংরাজের শরণাগত হইয়াছে। ইংরাজ-দূতকে রণজিতের সম্মুখে অতি সন্তর্পণে সুযোগ বুঝিয়া এই প্রস্তাব করিতে হইয়াছিল। একদিন সায়ংকালে মেটকাফ রণজিতের সহিত, প্রাসাদের ছাদে সন্ধ্যা সমীরণ সেবন কবিতে করিতে অতি নম্রভাবে এই প্রস্তাব করিলে, রণজিৎ সিংহ কিছু মাত্র উত্তর না দিয়া ছাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এক অশ্বে আরোহণ করিয়া সম্মুখস্থ ময়দানে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে প্রত্যাগমন করিয়া বৃটিস দূতকে বলিলেন যে, ইংরাজের অবিমৃশ্যকারিতায় তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন প্রথমতঃ এই স্বাধীন সর্দ্দারগণ ইংরাজের আশ্রয়াধীন থাকিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজেরা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। এক্ষণে যেমন তিনি ভূরি ভূরি অর্থ ও অজস্র শোণিতপাতে ঐ সর্দ্দারগণের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইলেন,

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849 (First edition) p. 146.

অমনি ইংরাজেরা অতি শান্তভাবে ঐ সর্দ্দারগণকে ইংরাজের শাসনাধীনে অর্পণ করিতে বলিতেছেন। তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, ইহা কিরূপ মিত্রতার পরিচয়! মেটকাফ মহারাজের যুক্তি নীতিবিরুদ্ধ বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি শিখ নৃপতিকে বলিলেন যে, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ইংরাজেরা তাঁহার অবিচলিত চিরমিত্র থাকিবেন। তিনিও অন্যত্র তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া প্রভূত রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন। *

সূক্ষ্মদর্শী সুচতুর শিখনৃপতি বৃটিস-দূতের বাক্যের সদ্‌যুক্তি বুঝিতে পারিলেন। পঞ্চনদে তখনও সুদৃঢ় শিখরাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। তখনও পঞ্চনদের যে সমুদয় স্বাধীন সর্দ্দার ছিলেন, তাঁহারা ইংরাজের শরণাগত হইলে পঞ্চনদ বিজয়ের পথ দুর্গম হইতে পারে, এই আশঙ্কায় রণজিৎ ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মেটকাফকে এই সদুপদেশের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ২৫এ এপ্রেল উভয় পক্ষে এই সন্ধি হইল যে, এপর্য্যন্ত শতদ্রু পুলিনস্থ যে সমুদয় রাজ্য রণজিৎ অধিকার করিয়াছিলেন, ইংরাজ তৎসমুদয়ে তাঁহার অধিকারস্বত্ব স্বীকার করিবেন। এই সমুদয়ের শাসন নিমিত্ত যত সৈন্য স্থাপন আবশ্যক হইবে, কেবল তিনি সেই পরিমিত সৈন্য শতদ্রুর বামপুলিনে রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার সন্নিকটবর্ত্তী রাজগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার অধিকার থাকিবে না। শতদ্রুর উত্তরে পঞ্চনদ ধৌতপ্রদেশে, ইংরাজ লাহোর-রাজের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। *

এইরূপে লাহোররাজের বিজয়েচ্ছা শতদ্রুর উত্তরে সীমাবদ্ধ করিতে হইল। রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা ও প্রতাপ এসময়ে এত দূর বিস্তারিত হইয়াছিল যে, সুবিখ্যাত কাঙ্গাড়া দুর্গাধিকারী সন্‌সর চাঁদ, রণকুশলী মহারাষ্ট্র সৈন্য তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিলে, পঞ্চনদ সিংহের সহায়তা প্রার্থী হইয়া, তাঁহার পুত্রকে লাহোর দরবারে প্রতিভূ স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। রণজিৎ কালবিলম্ব না করিয়া কাঙ্গাড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ঘোরতর সমরে মহারাষ্ট্র সৈন্যের পরাজয় সাধন করিয়া কাঙ্গাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুজরাটে যাইয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন। গুজরাট অধিকার করিয়া রণজিৎ মুলতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তত্রত্য আফগান নৃপতির প্রতিনিধি মুজাফর খাঁ রণজিতের বিরুদ্ধে অধিককাল দুর্গ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া, তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং দণ্ডস্বরূপ ১,৮০,০০০ টাকা দানে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে মুলতানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রণজিৎ লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। †

১৮১০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে মহাসমারোহে রণজিতের প্রথম পুত্র খড়্গসিংহের বিবাহ উৎসব সম্পাদিত হইল। এই সময় বৃটিস দূত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহার

* Adventures of an Officer in the Punjaub by H. M. Lawrence Vol 1. P. 252 uote (2)

* Aitchisons Treatise Revised edition, Vol. vi. pp. 15, 22.

† M. Gregory's History of the Sikhs Vol I. pp. 196-7.

কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের শাসক লর্ড মিণ্টো রণজিৎকে এক সুন্দর বিলাতী শকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। রণজিৎ এই অপূর্ব্ব অশ্বযান পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হয়েন ও ইংরাজ শাসককে উপযুক্ত উপহার প্রেরণ করেন। *

রণজিৎ সিংহকে এই সময়েই সাহ সুজার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সাহসুজা আফগানস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করতঃ কাশ্মীরের তত্রত্য শাসক আটা মহম্মদ কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। এই সময়ে সাহসুজা ও জমনসাহের পরিবার মণ্ডলী রণজিৎরাজধানীতে পঞ্চনদ সিংহের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। তিনিও সাদরে আপনার রাজধানীতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কাবুলের মন্ত্রী ফতেখাঁ কাশ্মীর অধিকার ও আটা মহম্মদকে সমুচিত দণ্ড দিবার মানসে, রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। রণজিৎ সিংহ তদনুসারে সাহসী ও সুদক্ষ সেনাপতি মাখন চাঁদের অধীনে বহুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সাহসুজার পত্নী অকুবেগম, রণজিৎ সিংহকে বলেন যে, তাঁহার স্বামীকে কাশ্মীর হইতে কারামুক্ত করিয়া আনিলে তাঁহাকে কোহিনুর প্রদান করিবেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অধিকৃত ও আটা মহম্মদ বিদূরিত হইল। মাথনচাঁদ এই বিজয়ের পর সাহসুজাকে কারামুক্ত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন। সাহসুজা লাহোরে আনীত হইলে, রণজিৎ সিংহ দেওয়ান মতিরাম, ফকির আজিজ উদ্দিন প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণকে অকুবেগমের নিকট কোহিনুর প্রার্থনায় পাঠাইলেন। সাহসুজা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, কোহিনুর দানে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের হস্তে পীতবর্ণের এক বৃহৎ পুথরাজ মণি দিয়া বলিলেন, ইহাই কোহিনুর। তাঁহারা সেই মণি রণজিৎ সিংহের নিকট আনয়ন করিলে রণজিৎ সিংহ তাহা প্রকৃত কোহিনুর নহে জ্ঞাত হইয়া, সাহসুজার আচরণে অতিশয় কুপিত হইলেন। যদিও সাহসুজা তখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তগত ছিলেন, তথাপি তিনি প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুর আচরণের অনুষ্ঠান করিলেন না। প্রাসাদ মধ্যে কেবলমাত্র প্রহরী রক্ষিত এক কক্ষ সাহসুজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। পরিশেষে মহারাজ স্বয়ং সাহসুজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহসুজা আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এই মৈত্রি বন্ধন চিহ্নস্বরূপ উভয়ে উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়া সাহসুজা রণজিতের হস্তে কোহিনুর অর্পণ করিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে রণজিৎ সিংহ সাহসুজার ভরণপোষণার্থ পঞ্জাবে তাঁহাকে বাৎসরিক প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা আয়ের এক জায়গীর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিমিত্ত কাবুল অধিকার করিতে সহায়তা করিবেন, আশ্বাস দিলেন।" *

রণজিৎ সিংহ এই মহারত্নের প্রকৃত মূল্য কি, অকুবেগমকে জিজ্ঞাসা করিলে,

* Henry T. Prinsep's Political life of Moharajah Runjit singh P. 84.

* (শিখযুদ্ধের ইতিহাস ও মহারাজ দলিপ সিংহ ২৭৮, ২৮২ পৃষ্ঠা দেখ)।

উক্ত রমণী তাহার যে সুদৃঢ় উত্তর দেন তাহা হইতেই রণজিৎ সিংহের ধারণা হইয়াছিল যে কোহিনুরের প্রকৃত মূল্য "পাঁচজুতি"।

রণজিতের বিজয়াকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ পঞ্চনদ বহির্ভূত রাজ্যে প্রসারিত হইল। বীরবিক্রম ক্ষীণ বন্ধনের সঙ্কীর্ণ সীমায় কবে আবদ্ধ থাকিয়াছে? ১৮১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যস্থলে রণজিৎ কাশ্মীর অধিকারে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তৎকালীন দুর্গম গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া শিখ সৈন্য একে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিল; তাহার উপর আবার বরফ ও বৃষ্টিপাতে এবং প্রবল বাত্যায় তাঁহার পরিশ্রান্ত সেনা নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। এদিকে কাশ্মীর শাসক মহম্মদ আজিম-খাঁর অধীনস্থ আফগানগণ, উপরিভাগ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, অশ্বারোহী সেনা লইয়া শিখসেনাকে আক্রমণ করিল; শিখসেনা পরাজিত হইল। রণজিৎ সিংহ বহু কষ্টে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই পরাজয় তাঁহার বিজয় বাসনা আরও জাগাইয়া তুলিল এবং অনন্যচিত্তে তিনি সৈন্য সংস্করণে মনোনিবেশ করিলেন।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে রণজিৎ আর একবার মূলতান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য আফগানশাসক মুজাঃফর খাঁ স্বীয় স্বাধীনতা প্রচার করিলে রণজিৎ মূলতান দুর্গ অবরোধ করেন। তিন মাসকাল অবরোধ এবং ঘোরতর যুদ্ধে আফগান সৈন্য শিখসৈন্যের নিকট পরাজিত হইলে, মূলতান রণজিতের করায়ত্ত হয়। মূলতান অধিকার করিয়া, রণজিৎ দুর্গম আফগানিস্থানে স্বীয় বীর্য্য প্রসারিত করিবার মানসে সেই বৎসরেই পেষোয়ারে সৈন্য চালনা করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে অসাধারণ বীরত্বে আফগান সৈন্যের পরাজয় সাধন করিয়া পেসোয়ার অধিকার এবং তাঁহার মিত্র এবং অনুগত জোয়ান দাদ খাঁকে সেই স্থানের শাসক পদে নিযুক্ত করেন। কেবল মাত্র তথায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া মহারাজ ১৪টি তোপ লইয়া পেসোয়ার পরিত্যাগ করিলেন। শিখ সৈন্য পেসোয়ার পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই, আজিম মহম্মদ খাঁ অনায়াসে শিখনৃপতি স্থাপিত অকর্ম্মণ্য জোয়ানদাদ্‌কে বিতাড়িত করিয়া, পেসোয়ার অধিকারে সক্ষম হয়েন। *

রণজিৎ এই সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীরে পূর্ব্ব অবমাননার প্রতিশোধ লইতে উৎসুক হওয়ায়, তিনি পেসোয়ার ব্যাপার এক প্রকার ভুলিয়া গেলেন। এই উদ্দেশে তিনি ১৮১৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে কাশ্মীরে গমন করেন এবং ঘোরতর যুদ্ধে, দুরন্ত ও মহাবল আফগানগণের সম্পূর্ণরূপ পরাজয় সাধন করিয়া, জুন মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে কাশ্মীর অধিকারে সক্ষম হয়েন। এইরূপে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়া, তিনি পেসোয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন।

১৮২৩ খৃঃ অব্দে শিখ নরপতি সসৈন্যে পুনরায় আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজিম মহম্মদ, তাঁহার ভ্রাতা

* Moonshee Mohon Lal's life of Dost Mahamud PP 77, 104

সুবিখ্যাত দোস্ত মহম্মদ, ইয়ার মহম্মদ ও জর্ব্বর খাঁর সহিত ২০,০০০ নির্ব্বাচিত দুর্জ্জয় আফগান সৈন্য, নোসিরার পর্ব্বত শিখরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণের সহিত সাহসী ও রণবিৎ শিখসৈন্যের এই মহা সমর ইতিহাসে নোসিরার যুদ্ধ বলিয়া প্রখ্যাত। মার্চ্চ মাসের ১৪ই তারিখে এই লোমহর্ষণ ভয়াবহ সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হয়। একদিকে মহাবল হিন্দুদ্বেষী ভীমকায় আফগানগণ, অপর দিকে মহারাজ পরিচালিত সুনিপুণ শিখবাহিনী; পরস্পরে স্বীয় বীর্য্যবত্তা প্রদর্শনাভিলাষে রণসজ্জায় কৃপাণহস্তে সেনানীগণের আদেশোন্মুখ হইয়া বীরবিশ্বাসে দণ্ডায়মান। অচিরাৎ রণভেরীর নিনাদে শিখ পদাতি উচ্চে উপরিভাগে অবস্থিত আফগান সৈন্যের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। দুর্গমস্থান, এ দুর্গমস্থানে শিখপদাদি আফগানগণের বেগধারণ করিতে সমর্থ হইল না। আফগান সৈন্য শত্রুর দুরবস্থা দেখিয়া, সাহ্লাদে ঘোর হুঙ্কারে আক্রমণ করিয়া শত্রু সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল পদাতি বিভাগে এই বিপদ দেখিয়া মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। বিস্ময়কর বীরত্বে পদাতি বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন, সেই সময় তাঁহার দুর্জ্জয় অশ্বারোহী সেনা মহাবেগে শত্রু সেনার উপর আপতিত হইল। এই ভীষণ আক্রমণে পরাভূত হইয়া, আফগান সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। শিখ অশ্বারোহীর ভীম প্রহরণে ১০,০০০, দশ সহস্র আফগান সৈন্য চির স্মরণীয় নোসিরার ক্ষেত্রে বিলুষ্ঠিত রহিল। এই জয়লাভের পর মহারাজ পেসোয়ার ও খাইবার পাস্ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহার প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। বিজিত সেনানী ইয়ার মহম্মদ অনন্যোপায় হইয়া, মহারাজের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইল। আফগানগণ বিলক্ষণ শিক্ষা পাইল যে, মহারাজের সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কি ধৃষ্টতার কার্য্য। সূক্ষ্মদর্শী মহারাজ রণজিৎ আফগানগণের নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও তাহাদের বিদ্বেষ ভাব দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, বিজিত আফগান ভূমি তাঁহার অধিকারে রাখা অনায়াসসাধ্য নহে; এজন্য তিনি ইয়ার মহম্মদকে অধীনতা স্বীকার করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন পরে পেসোয়ার লাহোর রাজ্যের অধীন রাজ্য করিয়া, লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন।

এইরূপে অসাধারণ ক্ষমতা, বিস্ময়জনক রণনৈপুণ্য ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ অল্পকাল মধ্যে পঞ্চনদ ধৌত রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়েন। আফগানগণ, মূলতান, কাশ্মীর ও পেসোয়ারে মহারাজের আধিপত্য স্বীকার করিল। পঞ্চনদ ধৌত বিস্তৃত রাজ্যের এখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দী শাসক। দুরন্ত ও অবাধ্য শিখ সর্দ্দারগণ মহারাজের সদয় ও ক্ষমতাপন্ন রাজশাসনে, শান্তভাব ধারণ করিল। বীর বিক্রমের সহিত সদয় ব্যবহার ও রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলতায় তিনি সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া লোকরঞ্জক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রিয় ও ভক্তিভাজন ছিলেন; কারণ তিনি কখনও প্রজাগণের উপর অত্যাচার বা বল প্রকাশ করিতেন না। রাজ্যে দস্যু ও

অসৎ লোকের উপদ্রব, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অচিরাৎ শাসিত হইল। শিখ অধিবাসীর নিকট সামান্য কর লাভেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। যদি কোন রাজকর্ম্মচারী কর সংগ্রহের নিমিত্ত প্রজাগণকে উৎপীড়ন ও তাহাদের সহিত বিবাদ করিত, তাহা হইলে, রণজিৎ সিংহ প্রজাগণকে শাসন করিবার পরিবর্ত্তে, প্রায় কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তন করিতেন। রণজিৎ সিংহ অত্যাচারী শাসকের ক্ষমতা পরিচালনে সতত ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মভীরু নৃপতি ইহা সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতেন যে তাঁহার সমুদয় কার্য্য ও বিজয় লাভ ঈশ্বর অনুগ্রহে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি আপনাকে ও প্রজাবৃন্দকে গোবিন্দের সাধারণ তন্ত্রের পবিত্র সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ইহা হইতেই খালসা বাক্যের উৎপত্তি হয়। দান শীলতা ও অপরিসীম সাহস সদ্‌গুণাবলীর জন্য শিখ অধিবাসী তাহাদের নৃপতির নিমিত্ত গর্ব্বিত ছিল ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে সতত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত কারণ ইহা তাহাদের ধ্রুব ধারণা ছিল যে, মহারাজ যাহা করিতেছেন, তাহা তাহাদেরই মঙ্গল ও গৌরবের জন্য। *

মহারাজ শাসন সম্বন্ধে এইরূপ সংস্করণ ও উন্নতি করিয়া, শিখ সৈন্য সংস্করণে মনোনিবেশ করেন। ইউরোপীয় সৈন্যগণের সমুদয় শিক্ষা ও রীতি পদ্ধতি প্রথমেই তাঁহার মনোহরণ করে।

* Cuningham's History of the Sikhs 1849, PP. 179. 180. also Lawrence's Adventures of an Officer in the Punjab vol. T. P. 52.

এই শিক্ষা ও এই নিয়মে তাঁহার সৈন্যগণকেও শিক্ষিত দীক্ষিত করিলে, তাহারা অধিকতর সুনিপুণ ও রণকুশলী হইবে বলিয়া, মহারাজ আলার্ড, ভেনচুরা, কোর্ট, আভিটেবল, প্রভৃতি ইউরোপীয় সেনানীগণকে নিযুক্ত করিলেন। এই সেনানীগণ অল্পকাল মধ্যেই, অনায়াসে সেই শিক্ষিত বাহিনীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নিয়মে অলঙ্কৃত করিলেন। মহারাজের সুন্দর শিক্ষা ও নিয়মে দীক্ষিত সৈন্য পাইয়াছিলেন বলিয়া, এই সেনানীগণ শিখ সৈন্যকে অল্পকাল মধ্যে পাশ্চাত্য নিয়মে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাজের শিক্ষা ও ইউরোপীয় শিক্ষা মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না বলিয়াই, ইহা তাঁহাদের অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল। রণনিপুণ শিখ সৈন্য যে, তাঁহাদের সৃষ্টি, ইহা তাঁহারা কখনই বলিতেন না; কারণ তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহারাজই এই দুর্জ্জয় বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা কেবল ইহার কিছু সংশোধন করিয়াছেন মাত্র। *

মহারাজ রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা ও সুযশ দিগদিগন্তে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনে ভিন্ন ভিন্ন নরপতিগণ উৎসুক হইলেন। এমন কি রণজিৎ প্রবল পরাক্রান্ত রুষ সম্রাটেরও সহিত পত্রাদি প্রেরণ করিতেন। ভারতের নৃপতিগণ তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আফগান নৃপতিকে রণজিৎ সিংহ মিত্রতা সূচক উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। গোয়া-

* Cunningham's history of the Sikhs 184 9. P. 100.

লিয়রের সুবিখ্যাত বাইজাবাই তাঁহাকে পুত্রের পরিণয় কার্য্যে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রণজিৎ সিংহ ইংলণ্ডেশ্বরকে এক বহু মূল্য সালের পটমণ্ডপ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর ইহার পরিবর্ত্তে ১৮৩১ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের ১৭ই তারিখে ৫টি সুন্দর অশ্ব ও মিত্রতা সূচক একখানি পত্র লেফটেনেণ্ট বার্ণসের হস্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। *

ইহার প্রায় ৩ মাস পরে অক্টোবর মাসের বিংশতি দিবসে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল লর্ডউইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও রণজিৎ সিংহ মহা সমারোহে মিলিত হইলেন। মহারাজ, এই সময়ে গভর্ণর জেনারলকে, ইংরাজের তোপ ও সৈন্য সম্বন্ধে বহুল প্রশ্ন করিযাছিলেন, এবং শিখ ও ইংরাজ সৈন্যের সামরিক ক্রীড়ায় মহারাজ স্বয়ং সাহ্লাদে তাহাদের সহিত যোগ দান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। মহারাজের সন্তোষ বদ্ধনের নিমিত্ত, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতা, ঢাকা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের সুবিখ্যাত বিবিধ রেসমি পরিচ্ছদ, বহুমূল্য ও সুন্দর মণিমাণিক্যাদি, নির্ব্বাচিত অশ্ব সমূহ ও একটি হস্তী, উপহার দিলেন। এতদ্ব্যতীত পঞ্চনদের যুবরাজ খড়্গসিংহকেও সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার দেওয়া হইল। শিখ মহারাজও ইংরাজকে ইহার উপযোগী উপহার দিয়াছিলেন। অক্টোবর মাসের ৩১ এ এই মহতী সম্মিলন-সভার ভঙ্গ হইল। সেই দিবস উভয় সৈন্যের তোপ চালনা, বেণ্টিঙ্ক ও রণজিতের নিরতিশয় প্রীতিদায়ক হয়। এই সামরিক ক্রীড়া সমাপিত হইলে ইংরাজ শাসক পঞ্চনদ রাজকে সজ্জা ও অশ্ব সমেত দুইটি বৃটিস তোপ উপহার দিলেন। সেই দিবস সায়ংকালে এই মর্ম্মে এক অঙ্গিকার পত্র প্রদান করা হয় যে বৃটিস শাসক, পঞ্চনদ মহারাজের সহিত ইংরাজের মিত্রতা চিরকাল অবিচলিত রাখিবেন। *

ইহার কিছুকাল পরে মহারাজকে পেসোয়ার সম্বন্ধে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপার সম্পাদনের ভার তিনি তাঁহার উপযুক্ত পৌত্র নওনিয়াল সিংহের উপর অর্পণ করেন। নওনিয়াল সিংহের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। "রণজিৎ সিংহ এই বালকের রণনৈপুণ্য ও সুতীক্ষ্ণ রাজ্যশাসন বুদ্ধিতে এতদূর আকৃষ্ট হয়েন যে, তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর শিখগণ এই বালককেই পঞ্চনদ সিংহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দেখিবে"। সূক্ষ্মদর্শী রাজ শাসনবিৎ মহারাজের এই বালক সম্বন্ধে অভিমতি, কোন অংশে অতিরঞ্জিত হয় নাই। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দের মে মাসের ৬ই তারিখে নওনিহাল সিংহ পেসোয়ারের দুর্গ অধিকার করিলেন। পর বৎসর দোস্ত মহম্মদ পেসোয়ার উদ্ধার করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে, রণজিৎ সিংহ স্বয়ং পেসোয়ারে যাইলেন। দোস্ত মহম্মদ মহারাজের সহিত সমরে অনিচ্ছুক হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। দ্রুত পলায়ন কালীন তাঁহার রসদ ও দুইটি তোপ শত্রুর করায়ত্ত হয়।

* Narrative of a Voyage on the Indies by Lieutenant Burns.

* Aitchisons Treatise. Revised Edition Vol vi P. 13.

এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য দোস্ত মহম্মদ ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহার বীর পুত্র আকবর খাঁর অধীনে এক মহতী সেনা দিয়া বলিলেন, শিখগণ খাইবার-পাসের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে তথা হইতে বিদূরিত কর। শিখসৈন্য তাহাদের সুবিখ্যাত সেনানী হরিসিংহের অধীনে জামরুদে দণ্ডায়মান হইল। ৩০শে এপ্রিল শত্রুসেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ আকবর খাঁর সৈন্য বহুল ক্ষতির সহিত পরাজিত ও বিদূরিত হইল। তাহাদের দুইটি তোপ বিজয়ী শিখগণের করায়ত্ত হইল। এমন সময়ে আমিরের জনৈক কুটুম্ব সমসুদ্দিন খাঁ বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে, শিখগণকে আক্রমণ করিল। এককালে এই বিপুল সেনাদ্বয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সাহসী শিখসৈন্য তাহাদের মহাবীর সেনানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যে স্থানে জ্বলন্ত আগ্নেয় অস্ত্র অজস্র ধারায় পতিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে মৃত্যু বিকীরণ করিতেছিল, হরিসিংহ তরবারি হস্তে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন সময়ে হরিসিংহ সাংঘাতিক রূপ আহত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। সেনাপতির বিনাশে শিখগণ বিচলিত হইল। নেতৃহীন হইয়া অসংখ্য অরি সেনার সহিত সমর সাধ্যাতীত, বিবেচনায় শিখগণ রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি অধিক হয় নাই। কেবল দুইটি তোপ আফগানগণ অধিকার করিয়াছিল মাত্র। তাহারা পরে জম্রুদ ও পেসোয়ার অধিকারে অক্ষম হইল। কিন্তু শিখগণের সুবিখ্যাত সেনানী হরিসিংহকে তাহারা বিনাশ করিয়াছে, ইহা শিখগণের পক্ষে নিরতিশয় ক্ষতি জনক, এই অশুভ বার্ত্তা অবিলম্বেই রাজধানীতে প্রেরিত হইল।

হরিসিংহের বিনাশ সংবাদ পাইয়া মহারাজ অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হরিসিংহ মহারাজের অতি প্রিয় সেনানী। তাঁহার সমর শিক্ষায় সেই সেনানী যুদ্ধ বিশারদ হইয়াছিলেন। হরিসিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে মহাবাজ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। আফগান সৈন্য পুনরায় মিলিত ও বদ্ধিত শিখসৈন্যের সহিত সমর সংঘর্ষ মঙ্গল জনক বিবেচনা করিল না। শিখসৈন্য বিজয়ী হইল।

এইরূপে জমরূদের যুদ্ধের অবসান হয়। ইহাতে আফগান সৈন্য বহুসংখ্যক হইলেও, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হইল। জমরূদ ও পেসোয়ার শত্রু-সেনার অধিকৃত রহিল। শিখগণ ইহাতেও ক্ষান্ত রহিল না, তাহারা জমরূদে এক দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া, স্বীয় ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিল।

আফগানগণ অতঃপর তাহাদের রাজ্য হ্রাসের প্রতিশোধ লইতে যত্নপর হইল। কৃপাণবলে শিখ নৃপতির নিকট, বিজিত আফগান রাজ্যের পুনরুদ্ধার নিতান্ত দুরূহ ও এক প্রকার অসম্ভব জানিয়া, সুচতুর আফগান নৃপতি দোস্তমহম্মদ বিদেশীয় সাহায্য প্রার্থী হইলেন। এজন্য রুষিয়ার সম্রাট ও পারস্যরাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইল। এবং ইংরাজগণকেও ইহা বলা হইল, তাঁহারা যেন রণজিৎসিংহকে পেষোয়ার প্রত্যর্পণ করিতে বলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট

আফগান নৃপতির এই ধৃষ্টতা ও রুষিয়ার সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হইয়া, আফগান রাজ্যে এক মিত্ররাজ সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহাদের আশ্রয়াধীন সাহসুজাকে আফগানস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলে সকল সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু এ দুরূহ ব্যাপারে একাকী হস্তক্ষেপ করা মঙ্গলজনক নহে দেখিয়া ইংরাজ রণজিতের সহযোগী হইলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসের ষড়বিংশ দিবসে ইংরাজ রাজ, রণজিতসিংহ এবং সাহসুজা এই তিন জনের মধ্যে এক ত্রয়ী সন্ধি হইল। তদ্দ্বারা স্থির হইল যে, লর্ড অকলাণ্ড, সাহসুজার সাহায্যে নিযুক্ত হইবেন এবং রণজিৎ সাহসুজাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনে সহায়তা করিবেন।

সাহসুজাকে আফগানগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আফগানস্থানে পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত, ইংরাজ ১৮৩৮ খৃঃঅব্দের অক্টোবর মাসের ১লা তারিখে সমর ঘোষণা করিলেন। অপক্ষপাতী লডলো লিখিয়াছেন "যে নরপতি দুইবার আফগানস্থান হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত বিগত ত্রিংশৎবৎসর আমরা কোন প্রকার প্রয়াস করি নাই, সেই নৃপতিকে এক্ষণে বলপূর্ব্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আফগানি-স্থানে গমন, এক বিদেশীয় অপর রাজ্য আক্রমণ করা মাত্র। ইহা অপেক্ষা পর জাতীয় বিধির উপর অধিকতর দৌরাত্ম্য কখন সংঘটিত হয় নাই"।

বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে এই অন্যায় সমর বিঘোষণ অনুমোদিত হইল না। সে যাহা হউক, শিখ ও ইংরাজ সৈন্য খাইবার পাস ভেদ করিয়া আফগানিস্থানে চলিল। যে দুরন্ত আফগানগণ পঞ্চনদ ও ভারতবর্ষ লুণ্ঠনে দিগ-দিগন্তে আপনাদের দুরন্ত বিক্রম দেখাইয়াছিল, আজ তাহাদের জন্মভূমি, ভারতীয় সন্তান কর্ত্তৃক বিদলিত হইল, এই শুভ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই রণজিৎ সিংহ মানব লীলা সংবরণ করিলেন।

ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে।

কাঁদ বঙ্গ মাতা সহিল না তব,
দরিদ্র কপালে অমূল্য মণি
দেখ মা কি হ'ল, শম্ভু যে চলিল,
আঁধার করিয়া হৃদয় খণি।

কত আশা মাগো পুষেছিলে হৃদে,
ফলবতী সব হইল কই ?
কুসুম শুকাল, সুরভি লুকাল,
স্মৃতি চিহ্ন মাত্র রহিল অই !

গেছে প্রাণনাথ, দ্বারিক, কেশব,
গেছে কৃষ্ণদাস, অকালে ফেলে
একি মর্ম্মভেদী জ্বালা মা আবার
নিভান অনল দিল যে জ্বেলে।

তরঙ্গের পাছে তরঙ্গ যেমতি
কত শোক মাগো সহিলে চিতে !
যে যায় সে ফিরে আসে না মা আর,
ব্যথিত হৃদয়ে অমৃত দিতে।

অষ্ট কোটী পুত্র ধরিলে উদরে,
দেখিতে শুনিতে বলিতে সুখ,
সুপুত্র জননি, বাঁচে কই তোর,
উজলিবে যারা তোমার মুখ ?

রাজনীতি শিক্ষা কে শিখাবে আর ?
আত্ম শাসনের কে গাবে গুণ ?
সমালোচনায় দীপ্ত প্রতিভায়,
কাহার লেখনী এত নিপুণ ?

হিন্দু মুসলমানে মিত্রতা বর্দ্ধনে,
কে আর যতন করিবে তত ?
যে গৃহ বিচ্ছেদে পুড়িছে ভারত,
চির শান্তি ভূমে অশান্তি কত !

লিখিতে, পড়িতে, বলিতে, বুঝিতে,
শম্ভুচন্দ্র, তব তুলনা নাই।
নতুবা সকলে কেন বা কাঁদিবে,
স্বদেশী বিদেশী যেখানে যাই ?

জীবন মরণ বিধাতার হাত,
অনুসূচনায় নাহিক ফল ;
জানি তবু মন মানেনা প্রবোধ,
থাকেনা নয়নে নয়ন জল।

যাও শম্ভুচন্দ্র ! সুখময় ধামে,
রোগ শোক তথা কিছুই নাই।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহার ইচ্ছায়,
তাঁহার চরণে লভ হে ঠাঁই।

পেঁড়োর মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শক ১২৮০। ফেরোজ সাহ, আজ সাত আট বৎসর অতীত হইল, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ পুর্ব্বে দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ হইলেও ফেরোজ সাহের পিতার মৃত্যুর সময় নানা গোলযোগের মধ্যে পাণ্ডুরাজার নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। ফেরোজ সাহ সিংহাসনে উঠিতে না উঠিতেই বঙ্গদেশ জয় করিতে সংকল্প করিলেন এবং মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পাণ্ডুরাজার প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির পর আজ প্রায় সাত আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আজিও তিনি বঙ্গদেশের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে। একদিন মধুর সন্ধ্যাবেলায় সম্রাট্ পারিষদ্ ও মন্ত্রীবর্গের সহিত বঙ্গদেশ জয় করিবার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে প্রাসাদের বারাণ্ডায় আসিয়া মলয়সমীরণ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্। মন্ত্রিবর! বাঙ্গালা মুলুক হইতে আজিও কোন সংবাদ আমার নিকট পৌছে নাই। ইহার কি কোন কারণ বুঝিতে পারিয়াছ?

ম। এমন বিশেষ কোন কারণ বুঝিতেছি না, তবে অনুমান করি—

১ম পারিষদ্। জাঁহাপনা! আমি অনুমান করি যে চরেরা ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে সয়তানের অনুচরেরা (আল্লা! আল্লা!) অতি সুন্দরী পরীর বেশ ধারণ করিয়া পথিকদিগকে ভেড়া করিয়া রাখে।

ম। তবে অনুমান করি যে চরেরা ধৃত হইয়া বন্দী হইয়া রহিয়াছে।

স। পাণ্ডুরাজার বন্দী হইয়া কারাগারে বাস করিতেছে অথবা কোন সুন্দরী রমণীর নয়নের বন্দী হইয়া এদেশ ভুলিয়া তথায় বসবাস করিতেছে? যাই হউক্, এখন এবিষয়ে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য বোধ হয়।

মন্ত্রী ভাবিলেন যে ইহাঁর পিতা নানা প্রকারে ধনাগার শূন্য করিয়া গিয়াছেন; আবার ইনিও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিলে ধনাগার নামে মাত্র ধনাগার থাকিবে; এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া সম্রাটকে বলিলেন "এতদিন যখন অপেক্ষা করা গিয়াছে, তখন আর একটু অপেক্ষা করিয়া দেখা ভাল; আর আমারও মনে হইতেছে যে শীঘ্রই বঙ্গদেশ হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইব।" সম্রাটও তাহাতে সায় দিলেন। মন্ত্রী এত অল্প কথায় সম্রাটকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়া বড়ই আনন্দ বোধ করিলেন এবং মনে মনে নিজের বাগ্মিতা ও বুদ্ধিকৌশলের বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের এইরূপে নানা প্রকার কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে এক দ্বাররক্ষক গৃহ প্রবেশপথে, মধ্যপথে ও সিংহাসনতলে দফে দফে সেলাম করিতে

করিতে আসিয়া সম্রাটের নিকট নিবেদন করিল যে, একব্যক্তি ধূলিধূসরিত দেহ লইয়া এবং বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অবিরলধারে অশ্রুপাত করিতেছে। সম্রাট্ কিছু দয়ালু ছিলেন, তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্মুখে শীঘ্র আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন। দ্বাররক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে পারিষদ্গণও আদেশ পালন করিতে ছুটিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই সেই চীরবস্ত্রধারী ব্যক্তিকে সম্রাটের সম্মুখে হাজির করিলেন।

তাহার নাম সেখ গফুর। গফুর কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে সম্রাটের চরণপ্রান্তে পড়িয়া বলিল "জাঁহাপনা! আমি আপনার অধীনস্থ এক প্রজা; বঙ্গদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচরভাবে তথায় প্রেরিত হইয়াছিলাম।" মন্ত্রী তো এই কথা শুনিয়াই অবাক্। মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন যে কি আশ্চর্য্য, তিনি সম্রাট্কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য একটা আন্দাজী কথা বলিলেন, আর তাহাই সত্য হইল। সম্রাট্ গফুরের ক্রন্দনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন "উঠ; আমাকে শীঘ্র বল কে আমার প্রজাকে এইরূপে কষ্ট দিয়া আমার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিতে সাহস করিয়াছে; বল, শীঘ্রই তাহার প্রতিবিধান করিব।"

মন্ত্রী। আমি হুজুরকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, বঙ্গদেশের শীঘ্রই সংবাদ পাইব বলিয়া মনে হইতেছিল।

সম্রাট্। আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম; এই মাত্র তুমি ঐ কথা বলিলে, আর দেখ, বঙ্গদেশের সংবাদ লইয়া চর আসিয়া উপস্থিত।

ম। এত শীঘ্র যে আমার বাক্য সফল হইবে, তাহা ভাবি নাই। এখন বুঝিতেছি যে, আমাদের মনের মধ্যে ভাব আসিবার ও কথা কহিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। যেমন বিদ্যুৎ পূর্ব্বেই আসিয়া ভাবী বজ্রাঘাতের সংবাদ দেয়, সেইরূপ আমার বোধ হয়, ভাবী ঘটনা সকল ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহাদের ছায়াকে দূতস্বরূপে প্রেরণ করে—তবে আমরা সকল সময়ে সেই ছায়া সকলের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, এই যা।

স। যাই হৌক্, এখন উহার নিকটে পাণ্ডুরাজার সমস্ত বিবরণ শোনা যাউক।

সম্রাটের এই কথায় মন্ত্রী গফুরকে বঙ্গদেশের সমুদয় বিবরণ বলিতে আদেশ করিল, গফুর উৎসাহান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল "জাঁহাপনা! বঙ্গদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচরভাবে তথায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমার নাম শেখ গফুর। আমি উড়িষ্যার গজপতিবংশের রাজসভার অসীম ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়াছি। আমি বাঙ্গালা মুলুকেরও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—তথাকার বিষ্ণুপুর, বদ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বীরভূম প্রভৃতি নানা স্থানে ছদ্মবেশে বাস করিয়া অনেক বিষয়ের তথ্য জানিয়াছি। এই সকল স্থানের রাজগণকে দেখিলে দৈত্যদানবের বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা ক্ষমতায় অদ্বিতীয়, যুদ্ধে ভীষণমূর্ত্তি এবং তাঁহারা প্রতিবেশীদিগের পক্ষে ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু জাঁহাপনা রাজাধিরাজের সহিত তুলনা করিলে তাঁহারা মূষিকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন। হাজার হৌক, তাঁহারা মনুষ্য—এপর্য্যন্ত কোন্ মনুষ্য খোদার লোকের প্রভুত্বের

গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে? বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান রাজার নাম পাণ্ডুরাজা। তিনি পাণ্ডুয়া নামক গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে তিনি একটী উচ্চচূড়াবিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর একখানি সোনার ময়ূর স্থাপন করিয়াছেন। শুনিলাম যে এই ময়ূর পাণ্ডুরাজাকে সকলপ্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করে। তাই শুনিয়া আমি পাণ্ডুয়ায় ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া রাজা প্রজা সকলেরই সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিলাম, এমন কি, রাজার পত্রলেখকরূপে নিযুক্ত হইলাম। সেখানে থাকিতে থাকিতে আমি সেখানকার একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলাম।" মন্ত্রী নিজের ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিবার জন্য চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"নরাধম! তুই কাফেরের মেয়েকে বিবাহ কর্‌লি?" গফুর সম্রাটের নিকট আশাবাণী পাইয়াছে, এই কারণে মন্ত্রীর অবজ্ঞাসূচক বাক্যে যেন কর্ণপাত না করিয়াই সম্রাটের দিকে চাহিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল "আমার স্ত্রী বিধর্ম্মী কাফের ছিল, কিন্তু পরে সে আপনার ভ্রম বুঝিয়া মহম্মদের প্রচারিত সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তবে আমাকে বিবাহ করিয়াছে। এইরূপে সস্ত্রীক হইয়া সেখানে সুখে সাত বৎসর পূর্ণ করিলাম এবং সেই ময়ূরের বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; সাত বৎসরেও বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলাম না। অবশেষে একটী ঘটনায় সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গফুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে করিতে সম্রাট্ এই বর্ণনাতে কতদূর উৎসুকচিত্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সম্রাট্‌ও চরকে নীরব হইতে দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন "এই ঘটনাটী কি? শীঘ্র বল—আমার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে বড়ই আগ্রহ হইয়াছে, আশ্চর্য্য! একটী সুবর্ণের ময়ূর পাণ্ডু রাজাকে রক্ষা করে? আমরা যখন কোরাণ লইয়া যাইব, তখন নিশ্চয়ই তাহার কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। যাই হউক শীঘ্র ঘটনাটী শেষ পর্য্যন্ত বল।"

তখন সেখ গফুর সম্রাটের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আরও উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল "অবশেষে একটী ঘটনায় সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সাত বৎসরের মধ্যে আমাদের ছেলে পিলে কিছুই হয় নাই; আমার স্ত্রী ছেলের মুখ দেখিবার জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে কত বুঝাইলাম যে, ঈশ্বর যদি আমাদিগকে সন্তানাদি না দেন, তাহাতে কি—আমাদেরই ভাল হইবে বলিয়া তিনি দিতেছেন না। ছেলে হইবার জন্য তাঁহার নিকট বা পীরপেয়গম্বর মহম্মদের নিকট (আল্লার নামের জয় হউক) মানত করা ভাল মনে করি না, তাহাতে তাঁহারা, আমরা তাঁহাদিগকে লোভ দেখাইতেছি মনে করিয়া, আমাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। আমার স্ত্রী কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। অবশেষে আমি মহম্মদের কাছে মানত করিলাম যে, আমার একটী ছেলে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টকায় গাভী তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিব।

সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মানত করা সার্থক হইল—আমার একটি পুত্র সন্তান ইহল এবং অগত্যা আমি

অতি গোপনে মহম্মদের উদ্দেশে একটি পুষ্টকায় গাভী বলিদান করিলাম। আমরা প্রতদিন সেখানে বেশ সুখে ছিলাম, এমন কি, সেখানকার হিন্দু লোকেরা ক্রমে আমাদিগকে মুসলমান বলিয়া জানিতে পারিলেও আমাদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই গোবলির পর হইতে আমাদের যত কষ্ট আরম্ভ হইল। গোবলি দিতে না দিতে মন্দিরের চূড়া হইতে সেই সোনার ময়ূর অবিশ্রাম চীৎকার করিতে লাগিল। আমরা প্রথমে সেই চীৎকার হইতে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। তবে হিন্দুমাত্রেরই মুখে ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম; আর, যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে কি হইয়াছে, তাহারই মুখে শুনি যে রাজ্যের মধ্যে কোন বিপদ্ বা অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে। তখন আমি আপনার মনে বুঝিলাম যে, আমার গোহত্যার জন্যই ময়ূর এইরূপ চীৎকার করিতেছে। রাজকর্ম্মচারীগণ সকলেই এই চীৎকারের কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্তু সাত দিন চলিয়া গেল তথাপি কোনই ফললাভ হইল না। সেই ময়ূর সেই সাত দিন দিবানিশি অবিশ্রাম চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার শব্দে কাহারও নিদ্রা যাইবার উপায় রহিল না। দেব দেবীর মন্দিরে অসংখ্য ছাগবলি পড়িতে লাগিল; প্রতি গ্রামে হিন্দুরা ভয়ে তটস্থ হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল; প্রতি মন্দিরে পুরোহিতেরা মন্ত্রের দ্বারা দেবতাদের স্তব করিতে লাগিল; প্রতি দিন প্রভাতে রাজা সপরিবারে গলদেশে কুঠার ঝুলাইয়া দেবদর্শনে আসিতে লাগিলেন। আহা! রাজার সেই সময়ে কাতর মুর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছিল. কিন্তু আমি মনে মনে বলিলাম যে, তোমাদের দেবতারা আমাদের মহম্মদের কাছে কিছুই নয়—তাহাদের সাধ্য কি যে বিপদের কারণ খুজিয়া বাহির করে। আমি হিন্দুদের অন্বেষণ নিষ্ফল দেখিয়া কিছু নির্ভয় হইলাম। কিন্তু—অষ্টম দিনে—”
এই বলিয়া গফুর আর থাকিতে পারিল না, একেবারে সম্রাটের সম্মুখেই ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সম্রাটেরও হৃদয় তাহার এই ঘটনাতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার ক্রন্দন শুনিয়া কিছু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বর্ণনা শেষ করিতে বলিলেন; কারণ, অবস্থা বুঝিয়া যুদ্ধাদির আয়োজন করিতে হইবে। আসল কথা এই যে, তাঁহার গল্পটী শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

সেখ গফুর চোখের জল মুছিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—“অবশেষে অষ্টম দিনে অতি প্রত্যূষে শত শত লোক একেবারে দরজা ভাঙ্গিয়া আমার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং আমাদিগকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া একটা সুবৃহৎ শিবমন্দিরে উপস্থিত করিল। সেখানে আমার স্ত্রী ছেলেটীকে কোলে করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু সয়তান পাণ্ডুরাজার দুর্দ্দান্ত লোকেরা তাহাতে একটুও দুঃখিত না হইয়া অনায়াসে ছেলেটীকে মায়ের কোল থেকে ছিনাইয়া লইয়া আমাদের সম্মুখেই তাহাকে হাড়কাঠে

বাঁধিয়া, আহা! ছাগলের মত বলিদান করিল। জাঁহাপনা! বলিব কি, সেই হইতে ময়ূর চীৎকার করিতে বিরত হইল। পরদিন রাজা আমাদের উপর তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিবার আদেশজারী করিলেন। সেই আদেশ অমান্য করা নিষ্ফল বিবেচনায় যখন তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজ্যের বহির্দ্দেশে পদার্পণ করিলাম, তখন তাহাদের মুখে শুনিলাম যে গোহত্যার জন্যই আমাদিগের প্রতি এই গুরুতর দণ্ড হইয়াছে। এবং কিছুদিন পরে আমার স্ত্রীও পাগল হইয়া উঠিল, একদিন এক পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালাযন্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভ করিল। আমি সেই অবধি এক বিকট প্রতিশোধপিপাসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বেড়াইতেছি। এই কারণে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও আত্মহত্যা করিলাম না। অবশেষে আজ এই সন্ধ্যাবেলায় এই নগরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে স্মরণ হইল যে ইহা আমার প্রভুর রাজধানী। তাই জাঁহাপনার নিকট সমুদয় বিবরণ বলিতে মনস্থ করিয়া দেখা করিতে আসিলাম। আমার যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, সকলই বলিলাম। এখন প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে যে নির্দোষ শিশুর রক্ত প্রতিশোধ প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিব কি না? কাফেরদের দেবমূর্ত্তি সকল মুসলমানের পীরপেয়গম্বরের পরাজয় দেখিয়া উপহাস করিতে থাকিবে কি না? আর রাজাধিরাজ জাঁহাপনার প্রজাকে এক সামান্য জমীদার অন্যায় দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইবে কি না? আমি দয়াবতার ও ন্যায়াবতার হুজুরের সিংহাসনতলে পড়িয়া রহিলাম। প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ চাই! প্রভু! নচেৎ এই দেহ জীবিত অবস্থায় আপনার চরণতল পরিত্যাগ করিবে না। সমস্ত ঘটনাটী শুনিয়া সম্রাট্ পাণ্ডুরাজার প্রতি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন্ "আল্লা তোমার বিপদ্ দূর করুন; উঠ, তোমার প্রতি অন্যায় দণ্ডের প্রতিশোধ লওয়া হইবে।" সেখ গফুর সম্রাটের এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলে পর সম্রাট্ মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন বিলম্ব না করিয়া রাজ্যের মধ্যে এই কথা প্রচার করেন যে, 'যে বীরপুরুষ পাণ্ডুরাজাকে পরাজিত করিতে পারিবেন ও তাঁহার দুর্গকে ভূমিসাৎ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা সেলিমার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন; পাণ্ডুরাজার রাজ্য তাঁহার রন্ধনগৃহের জন্য যৌতুক প্রদত্ত হইবে এবং সেই কাফেরের রমণীগণ তাঁহার অন্তঃপুরের দাসীরূপে নিযুক্ত হইবেক। সেখ গফুরের পুত্র বলির প্রতিশোধ তুলিতে সাহসী বীরপুরুষেরা সত্বর অগ্রসর হউন।'

মন্ত্রী দেখিলেন যে এইযুদ্ধ নিবারণ অসম্ভব। বিবেচনা করিয়া সম্রাটের আদেশের সহিত নিজের সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য বলিলেন, "জাঁহাপনা! আমার বিশ্বাস যে এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইবে।"

স। কেন, কিপ্রকারে জানিলে?

ম। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে আমরা যখন বঙ্গদেশ জয় করিবার পরামর্শ করিতেছিলাম এবং

বঙ্গদেশ হইতে কোন সংবাদ পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়েই এই চর আসিয়া উপস্থিত হইল, এই কারণে আমার অত্যন্ত বিশ্বাস হইতেছে যে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইবে। কিন্তু প্রভুর অনুমতি লইয়া ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, আমার মনে হইতেছে যে এই যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও প্রথমে আমাদিগকে বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হইবে। এই চরকে চীরবস্ত্রে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমার মনে এই ভাব উদয় হইতেছে। কেন যে হইতেছে তাহা জানি না।

স। তুমি বহুদর্শী মন্ত্রী। তোমার কথায় আমারও বিশ্বাস হইতেছে যে এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইবে। তবে তুমি যে বলিলে প্রথমে কিছু কষ্ট পাইতে হইবে—সকল কার্য্যেরই প্রথমে কিছু কষ্ট পাইতে হয়; আয়েশ করিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এখন তুমি যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।

মন্ত্রী প্রভুর আদেশ পাইয়া প্রভুকে উপযুক্ত অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি সম্রাটকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য যে কষ্টের কথা বলিলেন, তাহাতে সম্রাট কর্ণপাত করিলেন না, কিন্তু সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কথা বলিলেন সম্রাট অমনি তাহা কোরাণের কথার মতন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। যাহাই হউক, এই যুদ্ধ যখন সংঘটিত হইবেই, তখন যাহাতে জয়লাভ হয়, তাহাই করা আবশ্যক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই সম্রাটের আদেশ ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেখ গফুরও সেই সংবাদ পাইয়া অভিযানে সঙ্গী হইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৎপরদিবস দরবার বসিয়াছে। সৈন্যগণ সদর দরজা হইতে দরজার গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে। অনেক সম্ভ্রান্ত বীর পুরুষ আপনার আপনার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং এক কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দিতে লাগিল। যখন সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন, তখন সংবাদ পাইয়া সম্রাট্, কন্যাকে দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া উপবেশন করিলে পর তাঁহারাও বসিলেন।

তখন সম্রাট্ তাঁহাদিগকে বলিলেন বীরগণ! তোমরা সকলেই বীরপুরুষ। সকলেই অনেক যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তোমাদের প্রত্যেকে অনায়াসে এক একটী যুদ্ধের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পার। তোমরা সকলেই শুনিয়াছ যে বঙ্গদেশের এক বিদ্রোহী কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। তোমাদের কাহকেও অপরের অপেক্ষা ন্যূনাধিক বলিয়া আমি বিবেচনা করি না, এই কারণে আমি কাহার উপর এই যুদ্ধের নেতৃত্বভার প্রদান করিব, তাহাই ভাবিয়া

গতকল্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে স্থির করিয়াছি যে আমি নির্ব্বাচন করিব না, আমার কন্যার উপরে নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করিব—তিনি যাঁহাকে এই যুদ্ধের নেতা হইবার আদেশ করিবেন, তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। এই সকল ভাবিয়া আমি আমার কন্যাকে সঙ্গেই লইয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—স্ত্রীলোক যতই কেন সুন্দরী হউক না, যত বড় সম্রাটেরই কন্যা হউক না, তাঁহাদিগের বিবেচনায় স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলেও অপমান, না হইলে ততোধিক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সম্রাট্‌কন্যা সেলিমা সম্রাটের আদেশে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া তাঁহাদের সেই অসন্তোষের ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রত্যেকেই আপনার আপনার বীরত্ব স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে সম্রাট্‌দুহিতা তাঁহাকেই নেতৃত্বপদে বরণ করিবেন এবং সকলেই ভাবিলেন যে, নেতৃপদ পাইলেইতো আর সেলিমার হস্ত পাওয়া যাইবে না—যে পাণ্ডুকে পরাজয় করিয়া তাঁহার দুর্গ ভূমিসাৎ করিতে পারিবে, তাঁহাকেই সেলিমা বিবাহ করিতে বাধ্য হইবেন, কারণ সম্রাটের ইহাই আদেশ। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন যে সুন্দরী সেলিমা ভবিষ্যতে তাঁহারই হইবে। এইরূপ ভাবিয়া সকলেই একটু নীরবভাব ধারণ করিলেন।

সেলিমার দৃষ্টি সকলকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সাহ সুফিউদ্দীনের দিকে ধাবিত হইল। সেলিমা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "সাহ সুফিউদ্দীন! তোমাকে আমি পাণ্ডুরাজার রাজ্য জয় করিবার জন্য এই যুদ্ধের নেতৃত্ব পদে নিয়োগ করিতেছি, তোমার হাত যদি তাহার মৃত শরীরকে শকুনিদিগের আহারীয় করিতে পারে, তবে আমার এই হাত তোমার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবে।" অন্যান্য বীরগণ ঈর্ষাজর্জ্জরিত হইয়া সুফিউদ্দীনের উপর এই অপমানের প্রতিশোধ তুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

সুফিউদ্দীন সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি শৈশবকাল হইতেই অতিশয় সুরূপ ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি স্বভাবতই কিছু গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন এবং কোরানের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কোরাণে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তিনি তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। এই সকল কারণে সম্রাট-পরিবারের সকলেই তাঁহাকে সম্প্রীতি করিতেন এবং সর্ব্বসাধারণেই তাঁহাকে কিছু ভয় ভক্তি করিত। তিনি অনেক যুদ্ধে অসীম সাহস, অসাধারণ আত্মসংযম এবং সাময়িক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে নেতৃত্ব ভার গ্রহণের জন্য নির্ব্বাচন করা সেলিমার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল এই একমাত্র কারণেই যে সেলিমা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিলেন, তাহা নহে। সেলিমা শৈশব হইতেই সুফিউদ্দীনের প্রতি কিছু অনুরক্ত ছিলেন। এখন তিনি ভাবিলেন যে তিনি সম্রাটের একমাত্র

সন্তান। সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনিই দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন। সুফিউদ্দীনকে বিবাহ করিলে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা উভয়ে রাজ্য সুখ উপভোগ করিবেন—এবং তাহা হইলে তাঁহাদের সুখের আর অবশেষ থাকিবে না। এই সকল ভাবিয়া তিনি সুউফিদ্দীনকে পাণ্ডুরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অধিনায়করূপে নির্ব্বাচন করিলেন। এই নির্ব্বাচনের জন্য অন্যান্য পারিষদ্ যে ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিয়াও তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করিলেন না।

অবশেষে সুফিউদ্দীন সম্রাটের আদেশে অধিনায়ক হইয়া পাণ্ডুরাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে, সুফিউদ্দীন তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত থাকেন কি না জানিবার জন্য সেলিমা গোপনে এক ক্রীতদাসকে তাঁর সহিত যাইতে অনুরোধ করিলেন। ক্রীতদাসের নাম হমদম। তিনি হমদমকে উপদেশ দিলেন যে সে যেন সুফিউদ্দীনের প্রিয়পাত্ররূপে থাকিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখে এবং তাঁহাকে যেন মধ্যে মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করে। তিনি তাহাকে আরও বুঝাইয়া বলিলেন "হমদম, তুমি আমার অতি প্রিয়পাত্র, আর তুমি জান যে ভবিষ্যতে আমিই ভারতের অধিশ্বরী হইব; আমার অনুরোধ-মত কায করিলে তোমাকে খুব উচ্চপদ প্রদান করিব। আর এই দুটী আংটী লও—একটীতে হীরা বসান, অপরটীতে চুণি বসান; যদি সুফি আমার ভিন্ন অন্যের প্রেম প্রার্থনা না করেন, তবে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তুমি সুবিধামত আমার কাছে হীরকের আংটী পাঠাইয়া দিও, আর যদি তিনি আমার প্রতি অনুরক্ত না থাকেন, তবে চুণির আংটী পাঠাইও। কিন্তু দেখিও, খুব সাবধান, যেন এক পাঠাইতে ভুলক্রমে অপরটী পাঠাইওনা—খুব সাবধান! খুব সাবধান!

হমদমের জন্মস্থান আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসীনিয়া প্রদেশ। ক্রীতদাসেরা সহস্র অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলেও প্রায়ই প্রভুর বিশ্বাসী থাকিত। হমদমের প্রভু সেলিমা তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন; সুতরাং সেলিমার অবাধ্য হওয়া কৃতঘ্নতা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে স্বীকৃত হইল। সুফিউদ্দীনের সঙ্গে চররূপে থাকিবার জন্য পরদিন সে সুফিউদ্দীনের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইল। সুফিউদ্দীন নগর হইতে বহির্গত হইয়া কতকদূর আসিয়া যমুনার পরপারে শিবির ফেলিয়াছিলেন। হমদম দেখিতে নিতান্ত কুশ্রী নহে; তাহার উপর সে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুফিউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে সফর খাঁ নামে পরিচিত করিল। সে অনেক যুদ্ধ করিয়াছে এবং জীবনের শেষভাগে এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ দিবার ইচ্ছা হওয়াতে তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, এই ভাবে হমদম আপনার পরিচয় প্রদান করিল। সুফিউদ্দীন তাহাকে সৈন্যদলভুক্ত করিলেন এবং ক্রমে সে তাঁহার এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল যে সুফি তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতে কষ্ট বোধ করিতেন।

আধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

৪। ব্রহ্মজ্ঞান।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রথমবার বিলাত গমন করিয়া যখন অধ্যাপক টিণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন টিণ্ডাল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এককালে পূর্ব্বদিক্ হইতেই সত্যধর্ম্ম উদিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্বদিক্ হইতেই সত্যধর্ম্ম পুনরায় উদিত হইবে "Trne religion once came from the east, and from the east it shall come again." *

সত্যধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম এই পুণ্যশ্লোক ভারতীয় ঋষিদিগের কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবার প্রধান কারণ এই যে ভারতের ঋষিগণ আত্মার সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করিয়া, প্রত্যুত তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সহজজ্ঞান তাঁহাদিগকে বলিল যে আত্মা আছে, আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে পারে; তাঁহারাও সেই সহজজ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া আত্মার স্বরূপ জানিতে কৃতকার্য্য হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। সহজ জ্ঞান তাঁহাদিগকে বলিয়া দিল যে ভূমা ঈশ্বর আছেন; তাঁহারাও তাহা অবিশ্বাস না করিয়া, অস্বীকার না করিয়া সেই সহজ জ্ঞানেরই অবলম্বনে তাঁহার স্বরূপ জানিতে গিয়া যে সকল সহজজ্ঞানসিদ্ধ অমূল্য সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আজিও সেই সত্য সকল মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের যশোকীর্ত্তন করিতেছে। পরে যখন আর্য্যেরা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথের বিপরীতে চলিয়া, সহজজ্ঞানকে যে পরিমাণে ত্যাগ করিতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে ভ্রান্তমত, উপধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচার হইতে লাগিল। আমাদিগের আশা আছে যে আমরা আবার বৈদিক ঋষি প্রদিষ্ট পথ সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় জগতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিব এবং টিণ্ডালের ন্যায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নিকট হইতেও এই আশার প্রতিধ্বনি পাইতেছি।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে একমাত্র সহজ জ্ঞানই আত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে আত্মা ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল কথা সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিযুক্ত বিচার প্রণালীর দ্বারা সে সকল সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা দেখিব যে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও সহজজ্ঞান যে সকল কথা বলিয়া দিবে, সে সকলও সত্য—কেবলি কল্পনা নহে।

আত্মজ্ঞান বা আপনাকে জানিতে পারা যেমন একটী সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য,

* **The Interpreter. Edited by P. C. Mozoomder. November 1893. p. 74.**

ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ সহজ জ্ঞানসিদ্ধ একটী সুমহান্ সত্য। সহজ জ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বাপেক্ষা সত্য এবং মহত্তম সত্য। সুতরাং আমাদের ইহা বলিবার বিশেষ অধিকার আছে যে ব্রহ্মের যদি প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে, এবং যদি তিনি সকল সত্যের মূল পরম সত্য হয়েন, তাহা হইলে আমরা কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার কোন না কোনও প্রকার পরিচয় পাইবই। ভৌতিক জগতের একটী সত্যকে দৃষ্টান্ত ধরা যাউক্। মাধ্যাকর্ষণ (যে শক্তিবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পরমাণু পরস্পরকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আকর্ষণ করিতেছে) ভৌতিক জগতের একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। যখন এই সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন ইহা সত্য বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ইহা এইরূপ একটী মতমাত্র ছিল যে পরমাণু সকলের মধ্যে, তাহারা জ্বলন্ত আকারে সূর্য্যের মধ্যেই থাক্, গ্রহগণের মধ্যে থাকিয়া ঘুরিতে থাক্, বায়ুতে ভাসমান থাক্ বা প্রাণীগণের দেহযন্ত্রেই থাক্, একটী নিয়মিত আকর্ষণশক্তি আছে। ক্রমে পরীক্ষিত হইল যে এই সত্যের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম সত্য বলিয়া তাহার পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া গেল। গ্রহদিগের পরিভ্রমণে, উপগ্রহদিগের পরিভ্রমণে, পৃথিবীতে বস্তু সকলের পতনে, বিষুব বৃত্ত ও কেন্দ্রবর্ত্তী স্থানে ভারের তারতম্যে সমুদ্রগর্ভে চাপের আধিক্যে এইরূপ নানা ঘটনায় মাধ্যাকর্ষণরূপ সত্যনিয়মের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণের মতটি আমরা, যে কোন উপায়েই হউক্, পাইয়াছিলাম, তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে সত্য বলিয়া স্থির করিলাম। সেইরূপ আমরা জানিতেছি অথবা আমাদের ধারণা হইতেছে (সহজজ্ঞান অবলম্বনেই হউক্ বা অন্য কোন উপায়ে হউক্, তাহা দেখিবার এখন প্রয়োজন নাই) যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই সকল সত্যের মূলাধার; তিনি সত্যের প্রস্রবণ, পরম সত্য। আমাদিগের এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে এই ধারণা কি কেবলই কল্পনা অথবা ইহা সত্য। আমরা যে সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি, সেই সকলেতে দেখিতে হইবে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় কি না। ঈশ্বরকে যখন সকল সত্যের মূল বলিতেছি, তখন আমাদিগের জ্ঞানের একটী অঙ্গ ধরিয়া দেখিলে চলিবে না—জ্ঞানের সকল অঙ্গের মধ্যেই তাঁহার পরিচয় লইতে হইবে।

এইস্থানে একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না অথবা তিনি যে সকল নিয়মে জগতকে নিয়মিত করিতেছেন, তাহার সকল গুলি জানিতে পারি না বলিয়াই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিব, তাহা হইতেই পারে না—তাহা নিতান্তই বাতুলতা। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম জগতে কার্য্য করিতেছে দেখিতেছি এবং এই কারণেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই নিয়ম যে কেন এইরূপ কার্য্য করিতেছে, কি প্রণালীবলে এই নিয়ম রক্ষিত হইতেছে, আর এই শক্তিই বা কি, এই সকল বিষয় ...নীর রহস্যময়; এক গ্রহের পরমাণু

অপর গ্রহের পরমাণু হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে থাকিলেও কোন প্রকার জড়ীয় অবলম্বন ব্যতীত যে আকর্ষণ করে কিরূপে, তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। তথাপি এই শক্তিকে কার্য্য করিতে দেখিয়া, জড়জগতে তাহার পরিচয় পাইয়া, স্বীকার করিতেছি যে এই শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেইরূপ ঈশ্বর কি শক্তিবলে এই জগতকে নিয়মিত করিতেছেন, বা তাঁহার স্বরূপ কি, এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে না পারিলেও যদি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাই, তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে পরমাত্মা নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি সকল সত্যের মূলাধার পরম সত্য। আমাদের বুদ্ধি তাঁহাকে ধারণা করিতে গিয়া নিরস্ত হউক্, তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া" সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত নাই হউক্; কিন্তু তথাপি কনককিরণরঞ্জিত প্রভাতগগন তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না, গভীর নিশীথে ব্যাকুলচিত্ত সাধকের নিকট অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতে বিরত থাকিবে না এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর আত্মা হইতে চিরকালই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে আত্মার জ্ঞানের যত প্রকার অঙ্গ আছে, সকল অঙ্গের মধ্যেই ঈশ্বরের পরিচয় লইতে হইবে। সুতরাং আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রথমেই আমাদিগের দেখিতে হইবে যে আমাদের জ্ঞানের কয় প্রকার অঙ্গ আছে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের জ্ঞানের স্থূলতঃ চারি প্রকার বিভাগ দেখিতে পাই। (১) ইচ্ছাশক্তি; আমরা জানি যে আমরাই ইচ্ছা করি এবং সেই ইচ্ছানুসারে কার্য্যও করি। আমরা ইচ্ছানুসারী যত্ন ও চেষ্টাকে কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি, যে হেতু কার্য্যপরম্পরাকে সেই কারণের অনুসরণ করিতে দেখি; এইরূপে বুঝিতে পারি যে আমাদের কৃত কার্য্যের প্রকৃত কারণ আমাদের ইচ্ছা। (২) প্রজ্ঞা; আমরা এই জ্ঞানের বলে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি। ইহারই বলে আমরা একটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে যত্ন করি; বস্তু সকলের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুভব করিতে পারি; এক কথায়, সচরাচর যে সকল কার্য্যকে জ্ঞানের কার্য্য বলে, তাহা এই প্রজ্ঞাবলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের এক প্রজ্ঞাবল আছে, যাহা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখে, উদ্দেশ্য স্থির করে ইত্যাদি। (৩) নীতিজ্ঞান; আমরা জানি যে আমাদের অন্তরে ন্যায় ও অন্যায়ের ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। যাহা কর্ত্তব্য, কে যেন বলিয়া দেয় যে, তাহা করিতেই হইবে এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে যে আত্মপ্রসাদ হয় এবং অন্যায় কর্ম্ম করিলে যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। আমরা যতক্ষণ আপনাদিগকে মনুষ্য নামে অভিহিত করিব, ততক্ষণ মনুষ্য পদের দায়িত্বও

পরিত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা সৎকর্ম্মের প্রশংসাও যেমন না করিয়াও থাকিতে পারিনা সেইরূপ অসৎ কর্ম্মকেও ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না। এই-রূপে আমরা জানি যে আমরা সদসৎ বিবেচনা রহিত, দায়িত্বহীন জীব নহি, প্রত্যুত আমরা নীতি জ্ঞানবিশিষ্ট দায়িত্ব-বিশিষ্ট মনুষ্য (৪) আধ্যাত্মিকতা বা শ্রদ্ধার ভাব, আমরা জানি যে আমাদের আত্মাতে আধ্যাত্মিক ভাব আছে। এই ভাব থাকাতেই আমরা সীমাবদ্ধ পার্থিব কোন বস্তুতে, কোন ভাবে, কোন জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হইয়া সকলের আশ্রয়স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, পরিপূর্ণ পরম পিতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে উদ্যুক্ত হই। এই আধ্যাত্মিকতাই মানবাত্মার উন্নততম অধিকার। ইহাই শিক্ষা দেয় যে আমরাও সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের সন্তান এবং এই ভাব থাকাতেই আত্মাতে ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই ভাব থাকাতেই আমরা জানিতেছি যে আমরা কেবলই পৃথিবীর জীব নহে; আমরা লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া, উন্নতি হইতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা অধিকতর উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিতে পারিব।

এইরূপে দেখিতেছি মানবাত্মার জ্ঞান চারি ভাগে বিভক্ত। এই চারি অঙ্গ সকল মনুষ্যেই যে সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নহে; উন্নত সুসভ্য সাধু ব্যক্তির হৃদয়ে এই চারি অঙ্গ যেরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তবাসী অসভ্য মনুষ্যের হৃদয়ে কখনই সেরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু সকল মনুষ্যেরই হৃদয়ে জ্ঞানের এই চারি অঙ্গের বীজ প্রোথিত থাকিবেই। আদিম মানবের হৃদয়েও এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের বীজ প্রোথিত ছিল *; কিন্তু তাহাদের নিকট এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের পূর্ণাবয়ব অন্বেষণ করিতে যাওয়া বৃথা। সুবৃহৎ বটবৃক্ষের গুণাবলী জানিতে বট-বাজের নিকটে যাইলে নৈরাশ্য মাত্র লাভ হয়।

মানবাত্মা আপনার জ্ঞানের চারি অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মাকে প্রধানতঃ চারিভাবে উপলব্ধি করে। (১) আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছা-ময় পুরুষ বলিয়া জানি। তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়া এবং নিয়মিত করিয়া স্বীয় মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেছেন। জগতের স্রষ্টা ও পাতারূপে ঈশ্বর স্বীকার করাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কারণবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(২) আমরা যখন বিশ্ব-শিল্পের অন্ত-রালে বুদ্ধির দ্বারা অনুসন্ধানের কৌশল পরম্পরাকে কার্য্য করিতে দেখি, তখন স্বভাবতঃই আমরা সেই বিশ্ব-রচয়িতাকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি। তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে তিনি "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" তিনি সকল ঘটনা, সকল বিষয় সাধারণ ভাবেও জানেন এবং বিশেষ ভাবেও জানেন; তিনিই সকল প্রকার জ্ঞানের চরম সীমা। তিনিই উপ-যুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যেকের যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন "যাথাতথ্য-তোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

* ইহার বহুল প্রমাণ আছে; কিন্তু সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করা অবথা হয়, কারণ এই কথা-গুলি এই প্রসঙ্গের পক্ষে অবান্তর কথা মাত্র।

এইরূপে জগতের মধ্যে কৌশল দেখিয়া ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করাই পাশ্চাত্যদিগের প্রজ্ঞাবাদ (Argument from Design)

(৩) আমরা যখন পবিত্র থাকিবার, সুপথে চলিবার উপদেশ সর্ব্বদাই আত্মাতে অনুভব করি, তখন সেই উপদেশদাতা পরমগুরুকেও পবিত্রস্বরূপ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি। তখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারি তিনি পরিপূর্ণ ন্যায়স্বরূপ—তাঁহার এই স্বরূপ হইতে কদাপি বিচ্যুতি নাই। এইরূপে আমাদের পবিত্র ভাব হইতে পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করাকে আমরা নীতিবাদ বলিয়া অভিহিত করিব।

(৪) আমরা যখন আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া জানিতে পারি তখন তাঁহাকেও আমাদের পিতা বলিয়া জানিতে পারি। তখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া, করুণাময়ী মাতা বলিয়া, প্রেমময় সখা বলিয়া ডাকিতে থাকি। তখন তাঁহাকে অনন্ত প্রেমের পরিপূর্ণ উৎস বলিয়া অনুভব করিতে পারি। এই অবস্থাই মানবাত্মার উন্নততম অবস্থা। এই অবস্থাই অধ্যাত্মধর্ম্মের সুপ্রশস্ত পত্তনভূমি এই অবস্থা ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হইলেই আত্মা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিল—তাহার অধ্যাত্মযোগ সংসিদ্ধ হইল। এইরূপে আমাদের আধ্যাত্মিকভাব হইতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করাই অধ্যাত্মবাদ বা শ্রদ্ধাবাদ।

এখন দেখিলাম যে আত্মা স্বীয় জ্ঞানের চারি ভাগকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে চারি প্রকারে উপলব্ধি করে। কেহ কেহ এই প্রকার ঈশ্বর উপলব্ধি করাকে মানবীকরণ বলিয়া উপহাস করিবেন। আমরা কিন্তু ইহাকে মানবীকরণ বলিতে পারিব না। বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে আমাদের যে চতুর্ব্বিধ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের সহিত মিলিত মনুষ্যভাবকে বৃহৎ বা ভূমারূপে কল্পনা করিয়া সেই বৃহৎ মনুষ্যের নাম দিই ঈশ্বর। আমরা বলিতেছি যে ঈশ্বরকে আমরা বৃহৎ মনুষ্যরূপে কল্পনা করি না কিন্তু ইহা জানি যে আমাদের আত্মায় যে সকল শক্তি আছে, সেই সকল শক্তি ঈশ্বরেতে অনন্তগুণ অধিকরূপে বর্ত্তমান আছে। এমনও হইতে পারে যে আমাদের আত্মার শক্তি হইতে ঈশ্বরের আরও অনেক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি আছে কিন্তু সেই সকল শক্তির বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারিব না। আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিব না। দেবলোকে গিয়া আমরা যদি কোন অতিরিক্ত শক্তি লাভ করি, তখন আবার সেই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আর এক নূতন ভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাইব। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য জানিতে পারি বলিয়াই অন্যান্য ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয় কার্য্য উন্নত হউক বা অনুন্নত হউক, জানিতে পারি। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিকে আমাদের অপেক্ষা কোন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। আমাদের যে সকল ভাব আছে, জ্ঞান আছে বৃত্তি আছে কোন জীবে সেই সকল বৃত্তি অধিক বা অল্প পরিমাণে আছে, ইহা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু আমাদের জ্ঞানবৃত্তি

হইতে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানবৃত্তিবিশিষ্ট জীব কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। ইহার কারণ এই যে জ্ঞান, যতই কেন উচ্চ সীমাতে আরোহণ করুক না, তাহার নিজের অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোথাও হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই কারণেই আমরা বলিতেছি যে মানবাত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে জানিলেই তাহা মানবীকরণ হইল না। আমরা জানি যে ঈশ্বরের যে সকল শক্তি আছে, তন্মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি তিনি মানবাত্মার অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন সুতরাং মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার অন্ততঃ কতকাংশে বস্তুগত সাদৃশ্য আছে। আর যখন ভূমাস্বরূপের প্রতি মানবাত্মার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই, এবং যখন দেখি জগতে তৃষ্ণা ক্ষুধা প্রভৃতি নানা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির উপায় রহিয়াছে তখন সেই আকাঙ্ক্ষারই কি একমাত্র তৃপ্তির উপায় থাকিবে না? বরঞ্চ এই আকাঙ্ক্ষা সেই ভূমাপুরুষের অস্তিত্বের পক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম যে আত্মা স্বকীয় চারি প্রকার শক্তি বা জ্ঞান বিভাগকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে চারি প্রকারে উপলব্ধি করে অর্থাৎ আত্মা স্বীয় চতুর্ব্বিধ জ্ঞানবিভাগেই ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। আত্মবাদীগণ যদিও এই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কেবল মাত্র বলিলেই হইবে না যে তাঁহারা নিজে পরিচয় পাইয়াছেন; তাঁহাদিগের বিপথগামী কোন অজ্ঞেয়বাদী ভ্রাতা ঈশ্বরের সহস্র পরিচয় পাইয়াও অস্বীকার করিলে তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে যে ঈশ্বরের পরিচয় তিনি কিছুতেই যুক্তিমতে অস্বীকার করিতে পারেন না। এই প্রকারে অপরকে বুঝাইতে গেলেই আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে জ্ঞানের উক্ত চারি অঙ্গের মধ্য দিয়া ঈশ্বর যে স্বপ্রকাশ হয়েন অন্যের নিকটে তাহার কি সাক্ষ্য প্রদান করিব— কি প্রমাণ দিব? সুতরাং এই প্রমাণের বিষয় বুঝিতে গেলে আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কারণবাদ, প্রজ্ঞাবাদ, নীতিবাদ এবং শ্রদ্ধাবাদ এই চারিটী বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ আমরা কারণবাদ লইয়া আলোচনা করিব। এই কারণবাদের আলোচনা কালেও সহজ জ্ঞানকে ছাড়িলে চলিবে না। আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অজ্ঞেয়বাদীগণ সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন আত্মস্বরূপ নির্ণয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেইরূপ সহজ জ্ঞানকে ছাড়িয়া ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়েও অক্ষম হইয়াছেন। আমরা দেখিব যে ঈশ্বর আত্মার সহজ জ্ঞানেই কি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন এবং সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড এই বিষয়ে কেমন একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করে।

আমরা দেখিয়াছি যে আমাদিগের বহির্জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিম্বা নিজের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কঠোর প্রামাণিক তর্কসিদ্ধ নহে। এই সকল আমরা সহজ জ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি অর্থাৎ ইহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না, এই কারণেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। সেইরূপ কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিলে তাহার কারণ অনুমান করাও সহজ জ্ঞানসিদ্ধ বিশ্বাস। আমি জানি যে আমি যদি একটী বৃক্ষ

রোপণ করি, তবে তাহার কারণ হইবে আমার ইচ্ছা। সেইরূপ যদি দেখি যে আর একটী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, যাহা আমি রোপণ করি নাই, তখন বুঝিব যে অপর এক ব্যক্তির ইচ্ছাই বৃক্ষ রোপণ করিবার পক্ষে কারণ। এই অপর ব্যক্তির ইচ্ছার কারণত্বে বিশ্বাস আমরা তর্ক-শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া প্রাপ্ত হই নাই—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তখনই এমন কোন কার্য্য দেখি, যাহা আমাদিগের কৃত-কার্য্যের অনুরূপ অথচ আমাদিগের কর্তৃক কৃত নহে, তৎক্ষণাৎ আমরা স্থির করি যে ইহা আমাদিগেরই ন্যায় কোন মনুষ্যের রচিত। কিন্তু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক পদার্থ দেখিতে পাই, যাহা নিশ্চয়ই মানবের হস্তরচিত নহে এবং যাহাতে মানবের বুদ্ধির অগম্য কৌশল-পরম্পরা কার্য্য করিতেছে; এই সকল দেখিয়া আমরা সহজেই বিশ্বাস করি যে এই গুলি ঈশ্বরেরই ইচ্ছাপ্রসূত। অন্য ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বে যেমন সহজে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরেরও অস্তিত্বে সেইরূপ সহজে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস যে সহজেই আত্মাতে স্থান পায়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন, ফরাসি বিপ্লবের ঘোর নাস্তিক যুগের কতকগুলি ফরাসি নাস্তিক যুবক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সম্মুখে যে রাত্রিতে ঘৃণিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে নেপো-লিয়ন নক্ষত্র খচিত মুক্ত আকাশের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া সহসা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু এই সকল কে সৃষ্টি করিলেন?"

আমরা দেখিলাম যে কার্য্যের কারণ অনুমান করা আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যে সকল 'কার্য্য' পদার্থ আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট বলিতেছি, সেই সকল পদার্থের কারণ লইয়াই আত্মবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীর বিবাদ। আত্মবাদী বলেন যে সেই সকল পদার্থের স্রষ্টা ও কারণ ঈশ্বর এবং অজ্ঞেয়বাদী হয়তো সেই সকল পদার্থের কোন ভৌতিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। অজ্ঞেয়বাদী এইখানে সহজ-জ্ঞানের বিপরীতে জড়পদার্থকে কারণ বলিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন। জড়পদার্থ কখন প্রকৃত কারণ হইতে পারে না। বাষ্প হইতে মেঘ হইল, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইল। এখানে বাষ্প মেঘের কারণ নহে এবং মেঘও বৃষ্টির কারণ নহে; কিন্তু বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি এই তিনটী 'কার্য্য' পদার্থ ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হইয়াছিল। বাষ্প মেঘের এবং মেঘ বৃষ্টির ভৌতিক কারণ উক্ত হয় বটে অর্থাৎ প্রকৃত কারণ নহে; আমরা কেবল সুবিধার জন্য অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র। কিন্তু মানবাত্মার স্বভাবই এরূপ গঠিত যে সে ভৌতিক কারণে তৃপ্ত থাকিতে চাহে না—প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করে। আমি যষ্টি দ্বারা এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলাম; এখন বিচারক কাহাকে দোষী করিবেন? ব্যক্তিকে প্রহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভৌতিক কারণ যষ্টিখানি। কিন্তু এই যষ্টি প্রকৃতপক্ষে কারণ নহে বলিয়া বিচারক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন না এবং শাস্তিও প্রদান করেন না। ক্রমে বিচারক দেখিলেন যে অঙ্গুলিও কারণ নহে, আর শরীরও কারণ নহে—যে হেতু ইহারা জড় পদার্থ মাত্র। অবশেষে যখন তিনি অন্বেষণ

করিলেন যে কে এই সকল জড় পদার্থকে প্রহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল, তখন তিনি জানিলেন যে আমার ইচ্ছাই এই-রূপ নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তিনি তাহা-কেই প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত করিলেন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা স্পষ্টই জানি-তেছি যে মানবাত্মা যেমন ভৌতিক কারণে তৃপ্ত না হইয়া প্রকৃত কারণ জানিতে চাহে, সেইরূপ তাহার সহজ-জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাকে বা ইচ্ছাময় পুরুষকেই (ইচ্ছা কখন শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না) প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হয়। আমাদের ইচ্ছারূপ কারণই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য সকল প্রসব করে। আমাদের কৃত সকল কার্য্যের একমাত্র ইচ্ছাই প্রকৃত কারণ বলিয়া আমাদের দায়িত্ব আছে এই দায়িত্ব জ্ঞানই ইচ্ছার কারণত্বের এক প্রধান প্রমাণ।

ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে সকল কার্য্যের কারণ এই সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এখন আমরা জগৎ-কার্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব। এই জগতে নানা জটিল কৌশল বিশিষ্ট ভৌতিক কার্য্য সমূহ ঘটিতে দেখি। আমাদিগের স্বভাবতই কারণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করি যে এই সকল কার্য্য কে করাইতেছে। বিজ্ঞান প্রতিকার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী কার্য্যকে কারণ, আবার তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী কার্য্যকে তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে থাকেন। এইরূপে বিজ্ঞান কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে গিয়া অবশেষে সৃষ্টিবাষ্পে (Cosmic vapour) অবতরণ করিয়া বলেন যে এই বাষ্পই সৃষ্টির মূল কারণ। বিজ্ঞান আজি পর্য্যন্ত এই সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই—এই বাষ্পের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান নীরব। আমরা ইহাতে তৃপ্ত নহি; আমাদের এখনও এই জিজ্ঞাসা রহিয়াছে যে এই সৃষ্টি বাষ্প আসিল কোথা হইতে। তখন আমাদের সহজ বুদ্ধি দুইটী অনুমান সম্মুখে উপস্থিত করে—(১) হয় এই বাষ্প অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল অথবা (২) ইহারও কখনও আদি কারণ ছিল। যদি এই বাষ্প অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাও না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, যে এই বাষ্প অপর শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত নিত্যকাল বাষ্পাকারেই থাকিত; কারণ ইহার উপর দিয়া যখন অনাদি অতীত কাল চলিয়া গিয়াও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিল না, তখন অনন্ত ভবিষ্যৎকালও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না; পরিবর্ত্তনের যত কিছু শক্তি ছিল তাহারা অনাদি কাল হইতেও কার্য্য করিয়া যখন কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না, তখন তাহারা অনন্তকালেই বা কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে এই বাষ্প পরিবর্ত্তিত হইয়া এক সময়ে এই সুন্দর বিশ্বরাজ্যে পরিণত হইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন স্পষ্টই বুঝি-তেছি যে ইহাও একটী "কার্য্য" মাত্র সুতরাং অনাদি হইতে পারে না, যে হেতু তাহারও কারণ স্বীকার করিতেই হইতেছে। তবেই দেখিতেছি যে সৃষ্টি-বাষ্পেরও কারণ আছে। এখন প্রশ্ন এই

যে, এই কারণটী কি? ইহা ভৌতিক কারণ হইতে পারে না, তাহা হইলে বিজ্ঞান তাহা প্রদর্শন করিত; আর যদি বা বিজ্ঞান তাহা প্রদর্শন করে, তথাপি আমাদিগের প্রশ্ন হইবে যে সেই ভৌতিক কারণের আবার কারণ কি? আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে আমাদিগের সহজ-জ্ঞান ভৌতিক কারণকে প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করে না। যাহাই হউক, যখন সৃষ্টিবাষ্পের কোন ভৌতিক কারণ নাই, অথচ দেখিতেছি যে তাহার নিশ্চয়ই কারণ আছে, তখন এই কারণ কি? পূর্ব্বে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি আমরা সহজ জ্ঞানে ইচ্ছাকেই প্রকৃত কারণ বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হই। সুতরাং এখানেও সহজ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া স্থির করিতে বাধ্য হইতেছি যে সৃষ্টি-বাষ্পের মূল কারণ এক মহতী ইচ্ছা। ইচ্ছা মানিলেই ইচ্ছাময় পুরুষও স্বীকার করিতে হইবে এবং এই ইচ্ছাময় পুরুষ—যাঁহার ইচ্ছায় জগত সৃষ্ট হইয়া শোভন-সাজে সজ্জিত হইয়াছে—সেই ইচ্ছাময় পুরুষকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া জানি এবং তাঁহাকেই ভক্তি ভরে নমস্কার করি।

আমরা এত কথা যে বলিয়া আসিলাম, তাহার মধ্যে আমরা জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে জড়জগতের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা কেবল আমাদের অনুভূতি মাত্র এবং এই কারণে আমরা জড়-পদার্থের গুণেরই বর্ণনা করিয়া তাহার পরিচয় দিই। এই কাগজটী কেমন—উত্তরে আমরা বলি যে ইহা কঠিন, ইহা ভারী, ইহা মসৃণ ইত্যাদি। এই কাঠিন্য, ভার, মসৃণতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণই আমাদিগের অনুভূতি বা মানসিক ভাব মাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে জড়পদার্থ সকল অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। গুণের আধার জড়পদার্থের বাস্তব সত্তা আছে কি না, আমরা এখন সে বিষয়ে তর্ক করিতে যাইব না। তাঁহাদের কথা স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না। এই যে বৃক্ষটী দেখিতেছি, ইহা আমার অনুভূতি বা জ্ঞানের একাংশ মাত্র। আমার জ্ঞান না থাকিলে আমার পক্ষে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু ইহা জানি যে অমুক ব্যক্তি যখন জীবিত ছিল, তখন তাহার পক্ষে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব ছিল এবং আজ সে ব্যক্তি পরলোকগত, আজও সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে, যদিও তাহার পক্ষে নাই বটে। আবার ইহাও জানিতেছি যে আমার পক্ষে এখন এই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে এবং আমি পর-লোকগত হইলেও এই বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকিবে। আমি যতক্ষণ সেই বৃক্ষকে দেখিতেছি, ততক্ষণ আমি কতকগুলি অনুভূতি লাভ করিতেছি এবং জানি-তেছি যে অন্ততঃ আমার পক্ষে সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে এবং যখন সেই বৃক্ষ হইতে দূরে গমন করিয়া তাহাকে না দেখি, তখনও জানি যে যদিও আমি অনুভূতি পাইতেছি না, তথাপি তাহার অস্তিত্ব আছে। এখন, যদি অনুভূতি ব্যতীত জড়পদার্থের সত্তা না থাকে, এবং যখন জানিতেছি যে আমার জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে এই জড়জগত আবির্ভূত ও তিরোহিত হইবে না, তখন আমাদিগের এক জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার

করিতেই হইবে, যাহার সত্তাতেই আমাদের জ্ঞানগত সত্তার অতিরিক্ত জড়-জগতের সত্তা বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ অপর মানবাত্মাকে যতটুকু পরিমাণে জানিতে পারি, ততটুকু পরিমাণে ইহা জানি যে আমার জীবন মৃত্যুর উপর অপর মানবাত্মার জীবনমৃত্যু নির্ভর করিতেছে না ; সুতরাং এখানেও মানবাত্মা মাত্রেরই অস্তিত্বের জন্য এক সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। এক কথায়, প্রত্যেক সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা আত্মা অনন্তজ্ঞান পরমাত্মাকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞানময় পুরুষকেই আমরা সনাতন ব্রহ্মনামে ডাকিয়া প্রাণকে শীতল করি।

এই থানে আমাদিগকে অজ্ঞেয়বাদীদিগের কুলভূষণ স্পেন্সরের ব্রহ্মজ্ঞান বিরোধী দুইটী মত বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ, তিনি আদিকারণকে যে ভৌতিক শক্তির সহিত অভিন্ন করিয়া বলেন, তাহাই দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে দেখিয়া আসিয়াছি যে অজ্ঞেয়বাদীগণ সহজজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নাস্তিকতার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া থাকেন। স্পেন্সারের এই মত তাহার অন্যতম প্রমাণ। জগতের আদিকারণকে ভৌতিক শক্তির রূপান্তরমাত্র বলিলে তাঁহাকে তো জড় অচেতন বলা হইল। সেই অচেতন শক্তির উপরে আমরা সচেতন হইয়া কেমন করিয়া নির্ভর করিব? আর আমরা দেখিয়াও আসিলাম ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকৃত কারণ হইতে পারে না ; বিজ্ঞান যাহা কিছু ভৌতিক কারণ দেখাইবে, তাহা জড়পদার্থই হউক, বা অন্য কোন কিছু হউক, তাহা প্রকৃত কারণ হইতে পাবে না, তাহা প্রকৃত পক্ষে 'কার্য্য'। এই কার্য্যেরও কারণ অন্বেষণ কবিলে যে আমাদিগকে সেই জ্ঞানময় ইচ্ছাময় পুরুষে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। সুতরাং স্পেন্সারের এই মতকে অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

তাঁহার দ্বিতীয় কথা এই যে আত্মবাদীগণ ঈশ্বরকে নিরবলম্ব বা সম্বন্ধ রহিত বলেন এবং পুনরায় তাঁহাকেই জগতের কারণ বা কার্য্য জগতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত। আমরা বলি যে স্পেন্সার আত্মবাদীদিগের কথা ঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই। আত্মবাদীগণ যে বলেন ঈশ্বর নিরবলম্ব তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের নিরবলম্বত্ব শক্তিগত অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই নিরবলম্ব হইয়া থাকিতে পারেন। তাই বলিয়া যে তিনি নিরবলম্ব অর্থাৎ জগতের সহিত সম্বন্ধ বিহীন হইয়া আছেন, তাহা তাঁহারা বলেন না। স্পেন্সরের দুইটী উক্তিরই অযৌক্তিকতা দেখিয়া লইলাম ; এখন প্রজ্ঞাবাদ লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

প্রশ্নোত্তর রহস্য।

প্র। পূর্ব্বে কোন দেশে বিড়ালদিগের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল ?
উ। মৎস্যদেশে।
প্র। ভারতবর্ষীয় রেলপথে সাহেবরা কোথায় বাস করে ?
উ। বাংলায়।
প্র। পৃথিবীর কোন স্থানে সকলে আপন আপন চেষ্টায় বিব্রত ?
উ। চেষ্টার-ফিল্ডে।
প্র। কোন ডিঙ্গিতে মানুষ ডুবিয়া মরে ?
উ। উল্টাডিঙ্গিতে।
প্র। পৃথিবীর মধ্যে কোন গোলাটি ঈশ্বরের নামে খোলা হইয়াছে ?
উ। ভগবানগোলা।
প্র। যোদ্ধারা বাস করেন কোথায় ?
উ। যোধপুরে।
প্র। কোন পুষ্করিণীর জলে দেবসেবা হয় ?
উ। ঠাকুরপুকুরের।
প্র। কোন নদীর বেগে মস্তক ভাঙ্গিয়া যায় ?
উ। মাতাভাঙ্গার।
প্র। বাঙ্গালা দেশে পারস্যের সম্রাট কোথায় বাস করেন ?
উ। সাপুরে।
প্র। কোন নদিতে জল নাই কেবল মধু ?
উ। মধুমতিতে।
প্র। কোন স্থানটী সমুদ্র মন্থন করিয়া উত্থিত হইয়াছে ?
উ। বৈদ্যনাথ।
প্র। চন্দ্রলোকের অধিপতি পৃথিবীতে আসিয়া কোথায় বাস করিতেন ?
উ। সোমনাথ মন্দিরে।
প্র। জয়পুরে পবন দেবের বাস কোথায় ?
উ। হাওয়া মহলে।
প্র। কাশীতে ছাত্রেরা পড়িতে যায় কোথায় ?
উ। গুরুধামে।
প্র। গো-খাদকহস্ত হইতে গরু রক্ষা পায় কোথায় ?
উ। গোরক্ষপুরে।
প্র। কোন স্থানে কীটাদির উপদ্রব থাকিতে পারে না ?
উ। কর্পূর তলায়।
প্র। কোথায় গেলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ?
উ। ধারে।
প্র। ইরাবতী নদীতীরে কোন স্থানে জরা মৃত্যু নাই ?
উ। অমরপুরে।
প্র। সিন্ধু নদীতীরে কোন স্থানে যাইলে আর কোথাও যাইবার ক্ষমতা থাকে না ?
উ। আটকে।
প্র। সমুদ্রের জল নীলবর্ণ কিন্তু কোন সমুদ্রের জল সাদা ?
উ। হোয়াইট্‌সির।
প্র। কোন দ্বীপে মুসলমানদিগের আহারাদির বেশ সুবিধা আছে ?
উ। আণ্ডামান দ্বীপে।
প্র। আসাম প্রদেশে কোন জেলাটী জলাকীর্ণ ?
উ। শিবসাগর।
প্র। কোন হাটটী মন্দ চলে না ?
উ। জোরহাট।

প্র। কোন হ্রদে জল নাই কেবল বালি?
উ। মরুহ্রদে।
প্র। কলা সচরাচর পাকে কোথায়?
উ। কাঁদিতে।
প্র। কোন পর্ব্বতে সকল প্রকার রত্ন পাওয়া যায়?
উ। রত্নগিরিতে।
প্র। কোন বাগানের গাছপালা সমস্তই লোহিত বর্ণ?
উ। লালবাগের।
প্র। কোন স্থানে দুইটী বাগান একত্র দেখিতে পাওয়া যায়?
উ। জোড়াবাগান পল্লীতে।
প্র। ২৪ পরগণার মধ্যে ৺ বিশ্বেশ্বর কোথায় বাস করেন?
উ। কাশিপুরে।
প্র। অযোধ্যায় তুরস্কের অধিপতি কোথায় বাস করেন?
উ। সুলতানপুরে।
প্র। ত্রিপুরার কোন স্থানে গেলে প্রসাদ পাওয়া যায়?
উ। ব্রাহ্মণবাড়ীতে।
প্র। কোন চরে মাটি নাই কেবল বালি?
উ। বালুচরে।
প্র। বাখরগঞ্জে কোন গ্রামটীতে বসতি নাই?
উ। খালিগ্রামে।
প্র। চাটিগাঁর কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে পায়ে লোহিত রঙ্গ লাগে?
উ। রাঙ্গামাটিতে।

রাসমালা।

আর্য্যবীরত্বের প্রদীপ্ত বিস্ফুরণকালে সমগ্র ভারতভূমি একদা একটি প্রকাণ্ড অনলকুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। তখন ভারতীয় আর্য্যবীরগণের বীরত্ব, মহত্ব ও তেজস্বিতা হিমালয়ের অত্যুচ্চ পাষাণ-প্রাকার ভেদ করিয়া জ্বলন্ত স্রোতে সুদূর শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই দিন আর্য্যবীরত্ব ও গৌরবের সুবর্ণ যুগ। ভারতের সেই সুবর্ণযুগে—ভারতীয় মহা-পুরুষগণের প্রচণ্ড বীর্য্যবহ্নির সেই দিগ্দাহী প্রজ্জ্বলনকালে যে সমস্ত রাজপুতজাতি অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতের নানা প্রদেশে আপতিত হইয়াছিলেন, গুর্জ্জর তাহাদিগের অন্যতম। আধুনিক "গুজ-রাট" সেই গুর্জ্জরদিগের গৌরবগরিমার একমাত্র ক্ষীণ নিদর্শন। এই গুজরাট শব্দ 'গুর্জ্জররাষ্ট্র' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র; কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা কেবল গুর্জ্জর নামেই অভিহিত হইয়াছে। গুর্জ্জর ভারতের পশ্চিম ভাগে স্থাপিত। হিন্দু ভৌগলিকগণ নর্ম্মদা নদীকে ইহার দক্ষিণ সীমা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই পবিত্রসলিলা নর্ম্মদার উত্তরতীর স্পর্শ করিয়া সুদূর আরাবল্লি পর্য্যন্ত যে বিশাল শৈলমালা বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা গুর্জ্জ-রের পূর্ব্ব বন্ধনী; এই গিরিশ্রেণী দ্বারা গুজরাট প্রাচীন মালব, মিবার ও মারবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মারবারের দক্ষিণস্থিত বিশাল মরুভূমি এবং রণ নামধেয় সাগরাংশ ও কচ্ছ উপসাগর দ্বারা গুর্জ্জর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে, এবং আরবসাগর ও কাম্বে উপসাগর দ্বারা

দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতির প্রসাদে গুর্জ্জর রাজ্যের প্রায় চতুঃসীমাই দুর্গম ও দুষ্প্রবেশ্য বন্ধনী দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ; কেবল ইহার উত্তরাংশই এক প্রকার অরক্ষিত। এই উন্মুক্ত পথেই ভিন্ন ভিন্ন আক্রমকগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে সুসমৃদ্ধ গুর্জ্জররাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছে।

গুর্জ্জররাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাকৃত গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র বা কাত্তিবাড়। সৌরাষ্ট্র একটি বিশাল প্রায়দ্বীপ; অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা এক কালে প্রকৃত দ্বীপরূপে গুর্জ্জর হইতে বিভিন্ন ছিল।

গুর্জ্জর রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার ও মনোহর। ইহার এক একটি স্থল শান্ত ও রৌদ্র রসের আধার,—এক এক প্রদেশ কেবল প্রকৃতির হাস্যরসে বিভাসিত। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ড পাদপরাজি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া রাজ্যের রক্ষকরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও বিশাল উদ্যানমালা পঞ্চবটীর পেশল হাস্যে, আশ্রমমৃগকুলের স্বাধীন সরল কৌতুকে, বিহঙ্গমগণের বিলাসলীলায় এবং কমলশোভিত ও বিহঙ্গসেবিত সরোবর সমূহের প্রশান্ত সলিলহিল্লোলে প্রকৃত তপোবনের রমণীয়তা প্রকাশ করিতেছে, কোথাও বা উচ্চ শৈলশ্রেণী ধূম্র পাষাণগাত্রে ক্ষীণ তরঙ্গরেখা ধারণ করিয়া নীরবে যোগমগ্ন রহিয়াছে। স্থানে স্থানে নবীন শস্যক্ষেত্র সমূহ বিশাল প্রান্তরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া মনোহর হরিৎহিল্লোলে অবিরত তরঙ্গায়িত হইতেছে। তরঙ্গিণীর কল-কলনাদ, বন-বিহঙ্গগণের উদাস কলরব, রোমন্থ মৃগগণের বিরল আনন্দোচ্ছ্বাস এবং কচিৎ নদী পুলিনস্থ আশ্রম সমূহে সাধুগণের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি একত্রে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব ঐক্যতান বাদ্যের সংযোজনা করিতেছে। এই সকল রমণীয় দৃশ্য পৌরাণিক গুর্জ্জরের সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ কাম্বে উপসাগরের পশ্চিমতটে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একটি অনত্যুচ্চ শৈলমালা বর্ত্তমান ভাওনগরের উত্তরভাগ হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমোত্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে। সমতল বিশাল প্রান্তরের বক্ষে ঐ অসম গিরিশ্রেণী সাগর হৃদয়স্থ দ্বীপমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রাচীন চামাদ্রি ঐ পর্ব্বতমালার পাদদেশে স্থাপিত। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে চামাদ্রি এখন সামান্য পল্লিগ্রামে অবনত; তথাপি বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চামাদ্রির পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চামাদ্রি গিরিশ্রেণী অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার গৌরবময় অতীতকালের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজ্যের উপর রাজ্য উত্থিত হইয়াছে, আবার নিষ্ঠুর আক্রমক ও পাষাণহৃদয় শত্রুদিগের ভীষণ অত্যাচারে ভগ্ন ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে মিশাইয়া গিয়াছে,—তাহাদের উপকরণ-নিচয় তাহাদের ভগ্নাবশেষের উপরিভাগে ভারতসন্তানের উত্তপ্ত শোণিতে দেশবৈরী-কুলের জয়স্তম্ভ উদ্যত হইয়াছে, আবার কালের কঠোর হস্তের প্রচণ্ড প্রহারে তাহাও বিভগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু সেই চামাদ্রি সেইরূপ অটলভাবে, সেই বিরাট মূর্ত্তিতে, সেই

কাল্পনিক বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোথায় যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-পুরী? কোথায় যশোমতীর শোকাশ্রু-সিক্ত পবিত্র প্রভাসতীর্থ? কোথায় বীর-জননী বল্লভী? কোথায় বা শোলাঙ্কি কুলের গৌরবস্তম্ভ গর্ব্বিত আনহলবারা; কোথায় দেবপত্তন সোমনাথ? সকলই গিয়াছে, সমস্তই কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে, গুর্জ্জরের প্রাচীন গৌরবগরিমা আজি সপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে! যে বল্লভী পশ্চিমভারতের রাজধানী ছিল, রাজকীয় ঐশ্বর্য্যগৌরবে,—কমলার সুকোমল হাস্য-হিল্লোলে—বীণাপাণির শ্রবণমোহন তন্ত্রী-রবে—এককালে যাহা আশিয়া-জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, চামাদ্রির উচ্চতম শিখরদেশে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বোত্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সেই বল্লভীর ভগ্নাবশেষ রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। যে তরঙ্গিণী একদা সেই পৌরাণিক নগরের পাদতল বিধৌত করিয়া সগর্ব্বে বাহিত হইত, মহারাজ কনকসেন ও তাঁহার বংশধরগণের বিশাল বাণিজ্যতরি বক্ষে ধরিয়া যাহার উন্মত্ত তরঙ্গমালা সাগররাজ্যে উপনীত হইত, প্রত্যহ প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে বীরবর শীলাদিত্যের সমরবাদ্যের সহিত তালে তালে নৃত্য করিয়া যাহা সূর্য্যকুলের গৌরবগরিমা দেশদেশান্তে বহন করিত, আজি ক্ষীণকলেবরে, বিশ্রান্তগতিতে, শোক সঙ্গীত গান করিতে করিতে তাহা সমুদ্রে যাইয়া বিলীন হইতেছে।

আর্য্যগৌরবের লীলাস্থল প্রাচীন গুর্জ্জ-রের ভগ্নাবশেষরাশির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চিমদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার পুরাতন ঐশ্বর্য্যের দুই একটী জীবন্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় শৈলবলয়িত প্রাচীন সিংহপুর (সিহোর) এবং তৎপশ্চিমে জৈন ধর্ম্মের প্রাচীন ও দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ পবিত্র শত্রুঞ্জয় গিরি। এই পূত শৈলকূটের শিখরদেশে প্রথম জিনদেব ভগবান্ আদিনাথের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইহার গৌরব ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত,—ইহার ঐশ্বর্য্য ও পবিত্রতা জৈন জগতে অদ্বিতীয়। শত্রুঞ্জয় গিরি সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় সার্দ্ধেক সহস্র হস্ত উচ্চ। ইহা দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গে বিভক্ত; সেই দুইটী সামান্য শৈলকূটের শিরোদেশেই ভগবান্ আদিনাথের মন্দিরমালা স্থাপিত। শৃঙ্গ-দ্বয়ের মধ্যস্থলে যে বৃহৎ গহ্বর ছিল, তাহা সম্পূর্ণ পরিপূরিত হইয়াছে; এখন উভয়কে একটী বলিয়া ভ্রম হয়। মন্দির সমূহের চারিদিকে উচ্চ পাষাণপ্রাকার—তাহা বিবিধ দুর্গাকারে দৃঢ় বদ্ধ,—মধ্যে মধ্যে কামান রাখিবার ছিদ্র প্রস্তুত। শত্রুঞ্জয় জৈনদিগের একটী প্রাচীন ও পবিত্রতম তীর্থস্থান। সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন নগরই নাই, এককালে যাহা শত্রুঞ্জয়ের সমৃদ্ধি ও শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত ষোড়শোপচারে পূজাসামগ্রী অর্পণ না করিয়াছে, একদিন না একদিন যাহার ধর্ম্মপরায়ণ অধিবাসীগণ ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যদর্শনে অতুল আনন্দে উৎফুল্ল হই-য়াছে। ইহার মন্দিরসমূহ উৎকৃষ্ট মর্ম্মর-শিলায় গঠিত;—অত্যুচ্চ—অমল ধবল—অতুল শোভায় শোভান্বিত। অর্দ্ধপ্রাসাদ-বৎ,—অর্দ্ধ দুর্গবৎ,—প্রস্ফুট কমলসন্নিভ চূড়া কলসমালায় সজ্জিত হইয়া,—বিস্তৃত চত্বর,—বিশাল নাটমন্দির,—মসৃণ ও স্বচ্ছ সোপানমঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া সেই

শৈলকূটস্থিত সমস্ত সুন্দর মন্দিররাজি আকাশস্থিত কোন ঐন্দ্রজালিক জগতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক মন্দিরেই অস্পষ্ট দীপালোকশোভিত অনুজ্জ্বল প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে মর্ম্মরবেদিকার উপরিভাগে আদিনাথের, অজিতের বা অপর কোন তীর্থঙ্করের একটী বা তদধিক শুভ্র প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। সম্মুখে রজতপ্রদীপে আলো জ্বলিতেছে, ধূপ গুগ্‌গুলাদি গন্ধদ্রব্য মন্দ মন্দ গন্ধ বিতরণ করিতেছে; শান্তিপ্রতিম সন্ন্যাসিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরপদসঞ্চারে অস্পষ্ট, গম্ভীর ও মধুরকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবপ্রতিমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এইরূপ নানাবিধ সুন্দর দৃশ্যে শত্রুঞ্জয় মন্দির সমূহ সমলঙ্কৃত। জৈনগণ ইহাকে সর্ব্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠ ও সারভূত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; যাঁহারা এই তীর্থের মসৃণ মর্ম্মর প্রাঙ্গণতলে একবার পদক্ষেপ করেন, তাঁহাদিগকে আর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অন্তে দেহত্যাগে তাঁহারা অমরলোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ মহাতীর্থ মহাপ্রলয়েও ধ্বংস পাইবে না।" কত শত হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী ভগবান আদিনাথের এই পবিত্র আবাসনিলয়ে অনাহারে, অনিদ্রায় সুদীর্ঘকাল কঠোরতম তপশ্চরণ করিয়া অসীম পাপভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং জীবন মুক্ত হইয়া অনন্ত স্বর্গীয় সুখে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগের সকলের বিবরণ এস্থলে বর্ণন করা অসম্ভব! তবে প্রয়োজন বোধে তন্মধ্যে একটী বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইল।

ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ তনয় ভরত অযোধ্যা নগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। একদা তিনি শত্রুঞ্জয়ের উপরিভাগস্থ কোন মহা প্রতাপান্বিত ম্লেচ্ছ রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রথম যুদ্ধে ভরত পরাজিত হয়েন, কিন্তু পরিশেষে জয়লাভ করেন। ম্লেচ্ছ রাজা তাঁহার হস্তে পরাস্ত হইয়া সিন্ধুনদের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল।

বিজয়ী হিন্দুনরপতি পলায়মান ম্লেচ্ছের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু বর্ষার ধারাপতনে পথ ঘাট দুর্গম হওয়াতে অভীষ্ট সাধনে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অনন্তর প্রাবৃট অতীত হইলে তদীয় মন্ত্রী সুখেন শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সিন্ধুনদের উত্তরতটস্থ কোন একটী বিশাল দুর্গ হস্তগত করিয়া লয়েন। মহারাজ ভরতের বাহুবলী নামে একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; বাহুবলীর পুত্রের নাম সময়ুষ। রাজকুমার সময়ুষ ঋষভদেবের মন্দির স্থাপন করেন এবং মহারাজ ভরত সেই পবিত্র দেবায়তনের পালনার্থ সৌরাষ্ট্রের সমস্ত রাজস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে সেই পবিত্র দেশ দেবদেশ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ভারতের অন্যতম কুটুম্ব শক্তিসিংহের হস্তে সৌরাষ্ট্রের শাসনভার সমর্পিত ছিল। তিনি সচিববর সুখেন সমভিব্যাহারে এক বিশাল সেনাদল লইয়া গির্ণার নামক প্রদেশ হইতে দৈত্যদিগকে দূর করিয়া দেন এবং মেরুসন্নিভ অত্যুচ্চ মন্দিরমালা স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে ভগবান্ আদিনাথ ও অরিষ্টনেমির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে শত্রুঞ্জয়ের মন্দির সমূহ ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে সেই পবিত্র পর্ব্বতশৃঙ্গ দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হইয়া রহিল।

যৎকালে হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য জন্মভূমির দুর্দ্দশা দূর করিবার নিমিত্ত ভীষণ বলে অভ্যুত্থিত হয়েন, তৎকালে প্রসিদ্ধ কাম্পিল্যনগরে ভাবুদ নামে জনৈক দীন জৈন শ্রাবক বাস করিত। ভাবুদের স্ত্রীর নাম ভাবুনা। ইহারা স্ত্রী পুরুষেই অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ। একদা দুইটী ব্রাহ্মণকে পরম ভক্তিসহকারে সেবা করাতে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে তাহারা একটী অদ্ভুত ঘোটকী প্রাপ্ত হয়। সেইদিন ভাবুদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল; সেইদিন হইতে সেই দরিদ্র জৈন পুরোহিত সৌরাষ্ট্রের প্রধান অশ্বোৎপাদকরূপে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপালিত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অশ্বশালা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল; তাহাতে তিনি তাহাকে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত মধুমাবতী নামে একটী নগরী অর্পণ করেন। তথায় জাবুদ নামে তাহার একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হয়। জাবুদ পরম বিদ্বান্ ও গুণবাণ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বৃহস্পতির ন্যায় পরম বুদ্ধিসহকারে নগর শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য অচিরে অস্তগত হইল; তাঁহার দুর্দ্দিন শীঘ্র সন্নিহিত হইয়া আসিল। অতি কুক্ষণে একটী বিশাল মুদ্গল সেনা উদ্বেল সাগরবৎ প্রচণ্ড বিক্রমে রাজ্যমধ্যে আপতিত হইয়া সৌরাষ্ট্র, লাট কচ্ছ ও অপর অপর প্রদেশ হইতে বিস্তর ধনরত্ন, গো মেষ পশ্বাদি ও নরনারী হরণ করিয়া লইয়া যায়। জাবুদও তৎসঙ্গে বন্দীভাবে মুদ্গলদেশে নীত হয়েন। কিন্তু সেই দূর শত্রুপুরীতেও তিনি পিতৃলোকের পবিত্র ধর্ম্ম সংরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং স্বীয় ব্যবসায় পরিচালন করিয়া বিপুল অর্থ অর্জ্জন করেন। অল্প দিনের মধ্যে তথায় তিনি একটী জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই জৈনমন্দির দেখিবার নিমিত্ত ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে ধার্ম্মিক পরিব্রাজকগণ আগমন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই জাবুদের আভ্যর্থনায় পরম প্রীত হইয়া পতিত শত্রুঞ্জয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "জৈনধর্ম্মের পবিত্রতম মন্দির শত্রুঞ্জয় ম্লেচ্ছহস্তে পতিত হইয়াছে; ভগবান্ ঋষভদেবের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যে তীর্থ এককালে অহিংসা ও শান্তির লীলাস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, আজি তাহা অশান্তি ও হত্যার অন্ধকূপে পরিণত হইয়াছে; শত্রুঞ্জয়ের অপদেবগণ প্রাণঘাতী, মাংসাসী ও সুরাপায়ী হইয়া উঠিয়াছেন; তাহার উপর কুমুদ নামে জাত্যন্তরিত জনৈক যক্ষ দেশের সমস্ত জৈনদিগকে পশুবৎ সংহার করিতেছে; তাহার ঘোরতর অত্যাচারে দেশ উৎসেদ দশা পাইবার উপক্রম হইয়াছে; আর কেহ প্রাণভয়ে ভগবানের পূজা করিতে যাইতে পারে না; দেশ অরক্ষিত,—মন্দির জনশূন্য—শত্রুঞ্জয় পাপে পরিপূর্ণ! এক্ষণে তাহার উদ্ধার তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে; তুমি ভিন্ন আর কেহই শত্রুঞ্জয় উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

অতঃপর সেই জৈনদিগের পরামর্শানুসারে জাবুদ ভগবতী চক্রেশ্বরীর প্রসাদ লাভ কবিয়া অপদেবতাদিগকে বিবিধ বলি অর্পণ করিলেন এবং ছদ্মবেশে সেই শত্রুপুরী হইতে বহির্গত হইয়া স্বদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি সেই

পরিব্রাজকদিগের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, রাজা জগৎমলের শাসনাধীন তক্ষশিলা নামক নগরে ভগবান্ ঋষভদেবের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সংগুপ্ত আছে। তদনুসারে জাবুদ সেই নরপতির রাজ্যে গমন করিলেন এবং অনেক যত্নে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। রাজা জগৎমল তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। জাবুদ তাঁহার সাহায্যে একটী সার্থদল সজ্জিত করিলেন এবং সমস্ত দেববিগ্রহ লইয়া কতিপয় সজাতি সমভিব্যাহারে শক্রুঞ্জয়ের শৈলকুটের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া জাবুদ অবশেষে মধুমাবতী নগরে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন যে বাণিজ্যার্থে যে সমস্ত তরণী চীন ও ভোটদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, বিপুল সুবর্ণ ও নানাবিধ বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়া তাহারা তীরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সেই সময়ে মহর্ষি শ্রীবায়ু স্বামী ও কুবুধ যক্ষকে লইয়া জাবুদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুবুধ ইতিপূর্ব্বে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা স্বামী তাহাকে আবার পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। জাবুদ অবিলম্বে বায়ুস্বামী ও কুবুধ যক্ষের সহিত শক্রঞ্জয়ে উপস্থিত হইলেন। সেই পবিত্র তীর্থের হৃদয়বিদারক বীভৎস দৃশ্য দর্শনে তাঁহাদিগের শোকের সীমা রহিল না। তাঁহারা দেখিলেন, পর্ব্বতের অর্দ্ধস্থল শোণিতাক্ত ছিন্ন ভিন্ন অগণ্য শবদেহে পরিব্যাপ্ত; শৃগাল, কুকুর, শকুনি গৃধিনী সেই বীভৎস দৃশ্যের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করিয়া বিকট চীৎকার সহকারে এক মৃতদেহ হইতে অপর মৃতদেহে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; সমস্ত গিরিকুট একটী ভীষণ শ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অচিরে শৈলচূড়া পরিস্কৃত হইল। অনন্তর সেই ধর্ম্মপ্রিয় জৈনসম্প্রদায় শুভদিনে শুভক্ষণে বিবিধ বাদ্য ও উৎসব সহকারে দেববিগ্রহগুলিকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া সগর্ব্বে পর্ব্বতোপরি উত্থিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্যম সফল হইল না। দুর্দ্ধর্ষ দানবগণ কিছুতেই তাঁহাদিগকে শক্রুঞ্জয় অধিকার করিতে দিল না। জাবুদ বার বার চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের সাধ মনেই রহিল। দারুণ ক্ষোভ ও অপমানে তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল। তিনি সম্বৎ ১০৮ অব্দে দেহ ত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

জাবুদের মৃত্যুর বহু দিবস পরে সৌরাষ্ট্রে বৌদ্ধদিগের প্রতাপ বাড়িয়া উঠিল; তাহারা তত্রত্য নরপতিদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল এবং শক্রুঞ্জয় ও অপর তীর্থগুলিকে অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু তাহাদিগের প্রভাব সমান রহিল না। অবশেষে ধনেশ্বর সূরী অভ্যুত্থিত হইয়া বল্লভীরাজ শিলাদিত্যকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে সৌরাষ্ট্র হইতে দূর করিয়া দিয়া সমস্ত পুণ্যতীর্থ অধিকার করিয়া লইলেন। দেশের নানাস্থানে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে জৈনগণ মহাত্মা ধনেশ্বরকে আপনাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"মাহাত্ম্য" নামধেয় জৈনগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সম্বৎ ৪৭৭ (খৃঃ ৩২১) অব্দে মহাত্মা ধনেশ্বর সূরী মহারাজ শিলাদিত্যকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদুক্ত কালকেই সম্ভাব্য মনে করিয়া অপর অপর জৈন রাসা অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা শিলাদিত্যের জৈনধর্ম্মাবলম্বন এবং তাঁহার ও তদীয় রাজ্যের ধ্বংসবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গুর্জ্জরদেশের অন্তর্গত কৈরা নামক মহানগরে দেবাদিত্য নামে জনৈক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সুভগা নাম্নী একটী দুহিতা ছিলেন। সুভগা বালবিধবা; তিনি পরম ধার্ম্মিকা। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা তিনি সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দান করিতেন। তরুণ বিধবার অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবান দিবাকর একদা মানবের রূপে তাঁহাতে উপাগত হইলেন। অচিরে সুভগার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাঁহার পিতা মাতা তৎপ্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। সুভগা জনৈক পরম বিশ্বস্ত দাস সমভিব্যাহারে বল্লভীনগরে পলায়ন করিলেন। তথায় যথাকালে তাঁর যমজ সন্তান প্রসূত হইল। দেখিতে দেখিতে আট বৎসর অতীত হইয়া গেল; সুভগার পুত্র কন্যা শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শিক্ষকগণের পদতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার পুত্র বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহার মনোমধ্যে একটী কঠোর চিন্তা স্থান পাওয়াতে বালক অচিরে নিতান্ত অমনস্ক ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; তাহার সহাধ্যায়ী বালকগণ তাহাকে "পিতৃহীন" বলিয়া নিত্য নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিত। তাহাদের তীক্ষ্ণ শ্লেষশরে কাতর হইয়া সে প্রত্যহই তাহার জননীকে বলিত,—"কেন, মা, আমার কি পিতা নাই যে উহারা আমাকে ঐরূপ বিদ্রূপ করে?" পুত্রের এই বিষাদময় প্রশ্নে সুভগার মুখ ম্লান হইত; তাঁহার নয়ন ছল ছল করিয়া আসিত; তিনি কিছুই বলিতেন না। একদা পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে নিতান্ত কাতর হইয়া তিনি বলিলেন, "আমি জানি না; কেন তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে কষ্ট দাও?" সেই দিন বালকের মন বিষম দুঃখে আলোড়িত হইল। সে জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল এবং বিষ বা অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এই সময়ে একদা সূর্য্যদেব স্বয়ং তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার কিছু ভয় নাই; আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিব। এই শিলাগুলি লও; ইহাদের সাহায্যে তুমি শত্রুদিগকে সংহার করিতে পারিবে। আমি তোমার সহায় রহিলাম।" কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড দিয়া তিনি অচিরে অন্তর্হিত হইলেন। সেই সকল শিলার সাহায্যেই সেই অপরিচিত বালক অবশেষে শিলাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বল্লভীর কোন অধিবাসী শিলাদিত্যের হস্তে নিহত হওয়াতে রাজা তাঁহাকে শাস্তি বিধান করিতে উদ্যত হয়েন; তাহাতে শিলাদিত্য সেই বিচিত্র শস্ত্রসাহায্যে তাঁহাকেও সংহার করিয়া বল্লভীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

সূর্য্যদেব তাঁহাকে একটী দেবতুরঙ্গও অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই অজেয় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দেশের শত্রুকুল বিনাশ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য পরমসুখে স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

শিলাদিত্যের শাসনকালে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ জৈন ও বৌদ্ধদিগের বিবাদ বিসম্বাদে নিরন্তর আলোড়িত হইত। একদা বিদ্যাভিমানী বৌদ্ধ পুরোহিতগণ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সগর্ব্বে বলিল,—"মহারাজ! এই শ্বেতাম্বরগণ যদি আমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে উহারা দেশে থাকুক, নতুবা উহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিউন" তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা চতুর্বিধানে একটা সভা আহ্বান করিলেন এবং স্বয়ং তাহার আধিপত্যে অধিরূঢ় হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন "যে দল পরাস্ত হইবে, তাহারা বল্লভীরাজ্য হইতে দূরীকৃত হইবে।" অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে বৌদ্ধগণই জয়ী হইল এবং শ্বেতাম্বরদল অবনতমুখে বল্লভীরাজ্য ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। অতঃপর রাজা শিলাদত্য বিজয়ী বৌদ্ধদিগকে পূজা করিলেন; কিন্তু শত্রুঞ্জয়ের ঋষভদেবকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে লাগিলেন।

শিলাদিত্য স্বীয় ভগিনীকে ভৃগুপুরের (বরোজ) রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী দেবোপম পুত্র সন্তান প্রসব করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পতিহীনা হওয়াতে শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্রও তাঁহার ন্যায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিল এবং জননীর সহিত বিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে জৈন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। একদা মল্ল ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাতঃ! আমাদের জৈন ধর্ম্মের কি এইরূপই দুর্দ্দশা?" এই প্রশ্নে সাধ্বীর নয়নদ্বয় জলে আপ্লুত হইল তিনি কাতরভাবে বলিলেন,—"বৎস! আমার ন্যায় পাতকী কেমন করিয়া উত্তর দিবে? মহিমান্বিত শ্বেতাম্বরগণ পূর্ব্বে গুর্জ্জরের প্রত্যেক নগরেই বাস করিতেন; কিন্তু প্রসিদ্ধ গুরু বীরসুরেন্দ্র পৃথিবী পরিত্যাগ করাতে আমাদের বিপক্ষগণ তোমার মাতুল শিলাদিত্যকে পৃথিবীর আধিপত্যে অভিষেক করিয়াছে। শ্বেতাম্বরগণ দেশ হইতে বহির্ভূত; তাঁহাদের অভাবে মোক্ষপ্রদ শত্রুঞ্জয়তীর্থ আজি ভূতসদৃশ বৌদ্ধগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। হায়! শ্বেতাম্বরগণ নিতান্ত দীনবেশে বিদেশে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের গৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।" মল্ল ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বধর্ম্মের নিদারুণ অপমান তাঁহার হৃদয়ে শেলসদৃশ বিদ্ধ হইতে লাগিল, শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক ভগবতী বীণাপাণির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বাগ্‌দেবী তৎসমীপে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত "ন্যায়চক্র" নামে এক খানি পুস্তক অর্পণ করিলেন। এই অপূর্ব্ব অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মল্ল সদর্পে মহারাজ শিলাদিত্যের সম্মুখে উপস্থিত

হইলেন এবং সদম্ভে বলিলেন,—"হে রাজন! বৌদ্ধগণ অকারণে জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের অধঃপতন সন্নিকট; আমি আপনার ভাগিনেয় তাহাদের কালস্বরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার হস্তেই তাহারা পরাস্ত হইবে।"

অনন্তর রাজা পূর্ব্ববৎ একটী বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগের তর্ক-বিতর্ক শুনিতে লাগিলেন। উভয় দলে ঘোরতর বিতণ্ডা হইল। বীণাপাণির বরপুত্র বালক মল্লের অপূর্ব্ব বাক্‌চাতুর্য্য ও তেজস্বীতা দর্শনে বৌদ্ধগণ বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিল যে, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; তথাপি বালকের হস্তে সর্ব্বসমক্ষে পরাস্ত ও অবমানিত হওয়া অপেক্ষা তাহারা দেশত্যাগ করিতে অভিলাষী হইল এবং অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "জন্মভূমির ধ্বংস, স্বজাতির উচ্ছেদ, স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ এবং বন্ধুর অবমাননা যাহার নয়নপথে পতিত না হয় সেই ধন্য।" হতভাগ্য বৌদ্ধগণ এইরূপে রাজাজ্ঞায় সৌরাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত হইল এবং বিজয়ী জৈনগণ আপনাদের পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ সহকারে বিজয়ী মল্লকে স্থরী উপাধি অর্পণ করিল। অনন্তর মল্ল স্বীয় মাতুল শিলাদিত্যের সাহায্যে পুণ্যতীর্থ শত্রুঞ্জয়পুরী শত্রুদিগের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে শ্রীমল্লস্থরী সুধিগণের শ্রেষ্ঠাসনে স্থান লাভ করিয়া দেশীয় জৈনগুরুগণের সম্মতিক্রমে স্তম্ভতীর্থের (ক্যাম্বে) অধ্যক্ষতায় অভিসিঞ্চিত হইলেন।

সেই সময়ে কাকু নামে জনৈক মারবারী বণিক স্বীয় জন্মভূমি পালীনগর পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে বল্লভীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং নগর তোরণের বহির্ভাগস্থ কতকগুলি মেষপালকের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিল। আত্যন্তিক দারিদ্র নিবন্ধন কাকু তথায় রঙ্ক নামে অভিহিত হইল। অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে কাকুর দুর্ভাগ্যতিমির তিরোহিত হইল; ঘটনাক্রমে সে কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক পদার্থ হস্তগত করিয়া স্বীয় পর্ণ কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিল এবং নগরের অভ্যন্তরে অন্যতম তোরণের সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। তাহার ধনসম্পত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শত—সহস্র—ক্রমে লক্ষ—ক্রমে কোটী—কাকু আর গণিয়া শেষ করিতে পারে না। অর্থের সহিত তাহার অর্থগৃধ্নুতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। সৎকার্য্যে—পুণ্যানুষ্ঠানে—ঋষি তপস্বীর পরিচর্য্যায়—কপর্দ্দকমাত্রও ব্যয় না করিয়া সে কেবল কুসীদসংগ্রহেই ব্যস্ত রহিল। একদা রঙ্কের দুহিতা একখানি স্বুবর্ণ খচিত মস্তকাভরণ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। তাহার হৈম অলঙ্কারের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে রাজকুমারীর লালসা উদ্দীপিত হয়। তিনি স্বীয় জনকের নিকট সেইরূপ অলঙ্কার প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে শিলাদিত্য রঙ্কের নিকট তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু রঙ্ক তৎপ্রদানে অসম্মত হওয়াতে রাজা বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইলেন। কাকুর বিষাদের সীমা রহিল না। যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইলেন; যাঁহার হস্তে জীবন মরণ, সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে,

তিনিই নিষ্ঠুরের ন্যায় অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—নিঃসহায় প্রজাকুলকে তবে কে রক্ষা করিবে? দারুণ ক্ষোভ, অভিমান ও জিঘাংসায় উত্তেজিত হইয়া হতভাগ্য বণিক কোন একটি ম্লেচ্ছ রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তাহার হস্তে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা অর্পণ করিয়া বলিল "আপনি বল্লভীপুরী ধ্বংস করুন, এই আপনার পুরস্কার।" ম্লেচ্ছ নৃপতি অবিলম্বে সদলে ভযাবহ যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন। কিন্তু রঙ্ক রাজছত্র-ধারীকে কিছুমাত্র পারিতোষিক না দেও-য়াতে সে ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। একদা ম্লেচ্ছরাজা রজনীযোগে স্বীয় পটগৃহের অভ্যন্তরে শয়ন করিয়া আছেন; নিদ্রার আবেশে নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে ছত্রধারী তাঁহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "আমাদের রাজার মন্ত্রিসভায় জনমাত্রও জ্ঞানীলোক নাই, নতুবা একজন অজ্ঞাতকুলশীল অর্ব্বাচীন বণিকের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি সূর্য্যতনয় মহারাজ শিলাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন?

এই বাক্য দৈববাণীবৎ রাজার কর্ণ-কুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। রঙ্ক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ছত্রধরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিল। তাহাতে সেই রাজানুচর পরদিন প্রাতে রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিল "ঘটনাক্রমে রাজার এইরূপ অভি-লাষ জন্মিয়াছে, বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, সিংহবিক্রান্ত নরপতি এই কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন ইহা হইতে প্রতিগমন করা কখনই তাঁহার যোগ্য নহে। সামান্য কৌতুক-চ্ছলে সিংহ যখন গজরাজকে বিনাশ করে, তখন মৃগরাজ কিম্বা মৃগাদন নামে কেন অভিহিত হইবে? এই দুইটী উপাধিতেই তাহার কিছুই গৌরব নাই। আমাদের নরপতির অনন্ত অবদান; কাহার সাধ্য যে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়?" ম্লেচ্ছ-রাজা স্বীয় ছত্রধরের এই বাক্যে সাতি-শয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিকট জয়নাদ ও রণঢক্কার প্রচণ্ডরোলে গগনমার্গ আলো-ড়িত করিয়া ভীষণ উৎসাহের সহিত সৌরাষ্ট্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ক্রমশঃ—

গুরু শিষ্য সংবাদ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আবার অনূঢাবস্থায় পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে, বিবাহের পর যদি পতি-গোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক সেই সকল ক্রিয়াই বিধেয় হইত, তবে বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে যে পিতৃগোত্র ভ্রংশের বিধান আছে, তাহা দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধি হইত, শেষার্দ্ধে পৃথক্ করিয়া পতিগোত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধানের আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্তু যখন সংহিতাকার পিতৃ-গোত্রের ভ্রংশ বিধান পূর্ব্বক পতিগোত্র দ্বারা কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণ মাত্রের বিধান করিয়াছেন, তখন কি পিতৃগোত্র, কি পতিগোত্র, কোন গোত্র দ্বারাই পুনঃ সম্প্রদান তাহার অনুমত নহে। অর্থাৎ বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে পিতৃগোত্রভ্রংশ বিধান দ্বারা পিতৃগোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক সম্প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং শেষার্দ্ধে পতি-গোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ মাত্র বিহিত হওয়ায় পতিগোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বকও সম্প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং গোত্রান্তরিতা কন্যার যথাবিধি সম্প্রদানই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৃহস্পতি ও লিখিতের বচনেরও ঠিক্ এই প্রকার তাৎপর্য্য, অতএব ইহাঁদের মতেও গোত্রান্তরিতা কন্যার বিধিমত সম্প্রদান হইতে পারে না।

শিষ্য। যদি গোত্রান্তরিতা কন্যার সম্প্রদান শাস্ত্রসম্মত না হয়, তবে ;—

সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা।
ঊঢাপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাবরণভূষণা॥

যদি বর অন্য জাতীয, পতিত, ক্লীব আচারভ্রষ্ট, সগোত্র, দাস অথবা চির-রোগী হয, তবে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অন্য পাত্রে দান করিবে।

এই কাত্যাযন বচনে বিবাহিতার সম্প্রদান বিধান কেমন করিয়া বিচার সিদ্ধ হইতে পারে?

গুরু। এই বচনে কেবল গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে বিবাহিতার সম্প্রদান বিহিত হইযাছে, বলিলেও কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ, এই সকল বিবাহে মন্ত্র সংস্কার প্রভৃতি গোত্রভ্রংশের কোন ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয় না, কেবল অগ্নি সাক্ষী করিয়া পতি পত্নীভাবে বর কন্যার পরস্পর প্রতিজ্ঞা বন্ধনমাত্র সম্পাদিত হয়। যথা দেবল,—

গান্ধর্ব্বাদি বিবাহেষু বিধির্বৈবাহিকো মতঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ ত্রিভির্বর্ণৈঃ সময়েনাগ্নি সাক্ষিকঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহে অগ্নি সাক্ষী করিয়া, "তুমি আমার পতি" "তুমি আমার পত্নী" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা বন্ধনরূপ অভিমত বিবাহ বিধি নিষ্পাদন করিবেক।

শিষ্য। গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহে যে মন্ত্র সংস্কার নাই, তাহাত দেবল বচন দ্বারা বুঝা গেল না।

গুরু। আচ্ছা যাহাতে বুঝিতে পার সেই প্রকার প্রমাণই দিতেছি; যথা পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের বাক্য;—

ত্বয়াদ্য রহসিভদ্রে মামনাভাষ্য যঃ কৃতঃ।
পুংসাসহ সমাযোগো নাসৌ ধর্ম্মোপঘাতকঃ॥
ক্ষত্রিয়স্যহি গান্ধর্ব্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সকামায়াঃ সকামস্য নির্ম্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ॥

তুমি আমাকে না বলিয়া, গোপনে যে পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছ, তোমার ধর্ম্মহানি হয় নাই; কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। নির্জনে সকামা কামিনীর সহিত সকাম পুরুষের মন্ত্র রহিত যে সংসর্গ, তাহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের বচনে "নির্ম্মন্ত্রঃ" এই বিশেষণ দ্বারা গান্ধর্ব্ব বিবাহে মন্ত্র সংস্কারের স্পষ্টতঃ অভাব জ্ঞাপিত হইয়াছে। অতএব দেবল বচনে গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহে অগ্নি সাক্ষি পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা বন্ধনের বিধি আছে, তাহা যে নির্মন্ত্র, ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতএব "সতু যত্নজাতীয়ঃ" ইত্যাদি কাত্যায়ন বচনে গান্ধার্ব্বাদি বিবাহত্রয়ে বিবাহিতার পুনর্বিবাহ বিহিত হইয়াছে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে, কোনও দোষ হইতে পারে না।

আর তোমার ইহাও জানা উচিত যে ঊঢ়া বিবাহিতা প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ থাকিলেই কন্যার পাণিগ্রহণ মন্ত্র সংস্কার অথবা সপ্তপদীগমন হইয়াছে, ইহা কখনই বুঝিতে হইবে না; কারণ, পাণিগ্রহণ মন্ত্র সংস্কারের পূর্ব্বেই উদ্বাহ বা বিবাহ সংস্কার নিষ্পন্ন হয়। যথা উদ্বাহতত্ত্বে,—

বিবাহস্তু পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বংবৃত্ত এবেতি সুব্যক্তং হরিবংশীয় ত্রিশঙ্কু উপাখ্যানে,—

বিবাহ, পাণি গ্রহণের পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হয়, হরিবংশীয় ত্রিশঙ্কু রাজার উপাখ্যানে, ইহা স্পষ্ট উক্তি হইয়াছে,—

পাণি গ্রহণ মন্ত্রণাং বিঘ্নং চক্রে সদুর্ম্মতিঃ।
যেন ভার্য্যাহৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহাঃ পরস্য বৈ॥

সেই দুর্ম্মতি অন্যের কৃতোদ্বাহা অর্থাৎ বিবাহিতা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া পাণিগ্রহণ মন্ত্রের বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

এই বচনে "পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে কৃতোদ্বাহা ভার্য্যাকে অপহরণ করিল." এই প্রকার উক্তি দ্বারা বিবাহ যে পাণিগ্রহণের পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উক্ত কাত্যায়ন বচনে "ঊঢ়া" পদে আসুর বিবাহে বিবাহিতাকেও বুঝাইতে পারে। কারণ, "গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমাদিষুচত্রিষু" এই নারদ বচন অনুসারে আসুরাদি বিবাহে অসকৃৎ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার কন্যাদান দোষাবহ নহে। অতএব বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

অদ্ভির্বাচাচ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথোবরোযদী।
নচ মন্ত্রো পণীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥
পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সা চ ত্বক্ষত যোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

জল স্পর্শপূর্ব্বক দান, অথবা বাগদান নিষ্পন্ন হইলে, যদি বরের মৃত্যু হয়, আর যদি মন্ত্র সংস্কার না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পিতার কুমারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ পিতৃসম্বন্ধবতী বলিয়াই জানিবে।

যদি কন্যা আহুতামাত্র হইয়া থাকে, ও মন্ত্র সংস্কার না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে অন্য পাত্রে যথাবিধি দান করিতে পারা যায়। কারণ কন্যাতে ও তাহাতে কোনও বিশেষ নাই।

পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হইলে যদি বরের মৃত্যু হয়, আর কেবল মন্ত্র সংস্কার মাত্র হইয়া থাকে, সেই কন্যা যদি অক্ষত যোনি হয়, তবে তাহার পুনঃ সংস্কার হইতে পারে।

বোবামেয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিনী।

সুরেশ কোথায়? উপরের বৈটক-খানায় নাটকাভিনয় হচ্চে, উপরিস্থিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে গৃহটি পূর্ণ। অভি-নেতাদের যেমন অভিনয়-কৌশল, নাটক খানির যেমন রচনা-নৈপুণ্য—দর্শক সেই-রূপ মধ্যে মধ্যে হাস্‌চেন, কাঁদ্‌চেন, কখন বা গম্ভীরভাব ধারণ কচ্চেন। মধ্যে মধ্যে একতান বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমোদের স্রোত প্রবাহিত হচ্চে। গৃহ মধ্যে বাটীর প্রায় সকলেই আছেন, কিন্তু সুরেশ সেখানে নাই—তবে সুরেশ কোথায়?—যৌবনের যে অবস্থায় যুবকের নয়নে সমস্ত জগৎ এক প্রকার নূতন রূপ দেখায়, যে অবস্থায় প্রণয়ের কবি-বর্ণিত অলীক রূপমাধুরী নয়নের সম্মুখে নৃত্য কর্‌তে থাকে, যে অবস্থায় যুবকের হৃদয়ে সুখ-মিশ্রিত একপ্রকার দুঃখ-রসের উদয় হইতে থাকে, যে অবস্থায় মন কেবল নির্জ্জনে নিজের কল্পিত স্বপ্ন দেখ্‌তে মগ্ন হয়,—সুরেশের এখন যৌবনের সেই অবস্থা। এখন তাঁর মন সাধারণের মত নয়—সে আর এক রূপ। তিনি একাকী নির্জ্জন ছাতে বসে আছেন। অষ্টমীর শশধর অস্তমিত হচ্চেন, তাই তিনি দেখ্‌-চেন—মনে মনে কত ভাবেরই উদয় হচ্চে—কতরূপ ভাবনারই তরঙ্গ উঠ্‌ছে, কখন বা অস্তোন্মুখ চন্দ্রের সঙ্গে মনুষ্য জীবনের তুলনা কচ্চেন; কখন বা নিজের অবস্থার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখ্‌চেন; কখন বা ঈষৎ হাস্‌চেন কখন বা মুখখানি ম্লান—গম্ভীর-ভাব ধারণ কচ্চে। সুরেস এইরূপে আপনার মনে একাকী বসে আছেন, সহসা পাশের বাড়ীর ছাদের উপর যেন মলের শব্দ হল। তিনি শুন্‌লেন যেন বামাস্বরে "মোহিনী" এই কথাটী উচ্চারিত হল—অমনি হৃদয়টা কেমন চম্‌ করে উঠলো, তিনি অমনি নিঃশব্দে সেই ছাদের দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুন্‌লেন দুটী রমণী পরস্পর কি বলাবলি কচ্চে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামও দু-একবার উচ্চারিত হচ্ছে। স্বর দুটীর একটী বেস্ পরিচিত। বুঝ্‌তে পাল্লেন, কে কথা কচ্চে,—সমস্ত শোনবার জন্যে কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে সেইখানে উপবেশন কল্লেন।

স্বর দুটী কাদের?—অপরিচিত স্বরটী কার তা বল্‌তে পারি না, পরিচিত স্বরটী

'মোহিনীর। মোহিনী পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী গঙ্গাহরি মল্লিকের স্ত্রী। গঙ্গাহরি মল্লিকের বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর কিন্তু তাঁর স্ত্রী মোহিনীর বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হবে না। মল্লিক মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে একজন অল্প-বয়স্কা বিধবা ভগিনী, যুবতী স্ত্রী মোহিনী, একটী উপযুক্ত পুত্র, আর পুত্রবধূ। পুত্রের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। গঙ্গাহরির প্রথম পক্ষের স্ত্রী, সন্তানটীর অতি শৈশবাবস্থাতেই, পরলোকে যান। তিনি সেই অবধি আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই,—পরে পুত্রের বিবাহের জন্যে মোহিনীকে দেখ্‌তে গিয়ে স্বয়ং মোহিত হয়ে পড়েন। টাকার অসাধ্য কিছুই নাই—গঙ্গাহরি বেশ সম্পত্তিশালী লোক সুতরাং তিনি পুত্রের পরিবর্ত্তে নিজেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করে ফিরে এলেন। বৃদ্ধবয়সে যুবতী ভার্য্যা—গঙ্গাহরি মোহিনীকে বড় ভাল বাসেন; কিন্তু সে যে পিতামহের সমবয়স্ক পতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করে তা আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই।

গঙ্গাহরি মোহিনীকে বড় ভাল বাসেন, মোহিনীর অমতে কখন কোন কার্য্যই করেন না—মোহিনী উঠিতে বল্লে ওঠেন—বসিতে বল্লে বসেন; কিন্তু তা হলে কি হয়? মোহিনীর কিন্তু কিছুতেই মন উঠে না।' মোহিনী সুশিক্ষিতা নয়—বাল্যকালে কখন একটীমাত্র উপদেশও পায় নাই তাহাতে আবার এই অবস্থা সুতরাং তার স্বভাব যে কলুষিত, তা আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই। সে স্বামী ও উপযুক্ত পুত্রের ভয়ে কার্য্যতঃ কিছু করতে পারুক আর না পারুক, মনে মনে তার সকল প্রকারই খেলা করে। সুরূপ যুবক দেখ্‌লে মোহিনী ভ্রূভঙ্গি কর্‌তে, কি ইঙ্গিত কর্‌তে ভুলে না—সুবিধা পেলে সময়ে সময়ে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে দুই একটী পাঁচালীর গান তুলে দিয়ে পত্রটা আস্‌টা লেখাও আছে। সুরেশ বেস্ সুপুরুষ যুবক, সুতরাং মোহিনী তার সঙ্গেও নানারূপ চাতুরী কর্‌ত। পূর্ব্বেই বলেছি সুরেশ অপরিণামদর্শী যুবক, তিনি পৃথিবীর কিছুই দেখেন নাই—কিছুই জানেন না—সমস্তই তাঁর নয়নে একপ্রকার নূতন অমৃতময়; সুতরাং তিনি তার মায়াজালকেই বিশুদ্ধ প্রণয় মনে করে মোহিত হয়েছিলেন। ক্রমে মোহিনী তাঁর ধ্যান, মোহিনী তাঁর একমাত্র নির্জ্জন-চিন্তার বিষয় হয়েছিল।

যদিও বয়োদোষে সুরেশের মন নিতান্ত তরল, বুদ্ধি একান্ত অপরিপক্ক,—অনভিজ্ঞতাদোষে যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে স্খলিত হন, তথাপি তিনি সাধারণ যুবকদের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জানেন মোহিনী তাঁকে ভাল বাসে, অকপট স্নেহ করে—তিনিও তাঁকে ভাল বাসেন। তাঁর প্রণয় নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ প্রণয়—অন্য কথায় বন্ধুত্ব। সুরেশ মোহিনীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসেন, কিন্তু কখন মিলনের ইচ্ছা করেন না। মোহিনী অপরের পরিণীতা—সে যদি অবিবাহিতা কুমারী হত, তা হলে কি কর্‌তেন বল্‌তে পারি না। যাহা হউক সুরেশের এ প্রণয় নির্দ্দোষ—তবে দোষের মধ্যে এই, যে অদূরদর্শী যুবক দুশ্চরিত্রার কপট প্রেম বুঝ্‌তে পারেন না।

সুরেশ ছাদের পার্শ্বে প্রাচীরের আড়ালে বসে তাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌তে লাগ্‌লেন। অপরিচিতা স্ত্রীলোকটী বল্লে

"যাহোক ভাই, তোমার্ যে, রকম খানা কি, তা আমি এনাগাদ বুঝ্তে পার্লাম না।"

মোহিনী বল্লে "কেন ভাই, আমার রকমটা কি এত অন্যায় দেখ্লে?"

"ন্যায় অন্যায়ের কথা বল্‌চিনে তবে গতিক্‌টে কিছু বুঝ্তে পারিনে,—আজ তুমি বোসেদের ছেলেটার সঙ্গে কি রঙ্গ খানাই না কর্‌লে!"

মোহিনী ঈষৎ হেসে বল্লে, "আ কপাল! সেই কথা,—তা ভাই, কি অন্যায় কাজই করেচি? এক জন ভদ্রলোক প্রত্যহ আমাকে দেখে ইযারা করে, প্রত্যহ হাসে—ইচ্ছাটা একবার আমার সঙ্গে আলাপটা কুশলটা করে; আমি না হয় তাকে হতাশ না করে, আশা দিয়েচি তা ভাই দুজন পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে আলাপ প্রণয় রাখাটা কি ভাল নয়?"

"হাঁ তা বটে কিন্তু তুমি যে কার সঙ্গেই না আলাপ কর, কাকেই বা না আশা দাও, তাত আমি জানিনে।"

"আবার আর কাকে দেখ্‌লে?"

"কেন এই সুরেশ।"

মোহিনী খল্ খল্ করে একগাল হেসে বল্লে "আ পোড়া কপাল, সুরেশ আবার লোক, তার আবার কথা—সেত নাবালক, ছেলেমানুষ—তার সঙ্গে আবার পীরিত।—ছেলেরা যেমন কাঠের বানর নিয়ে নাচায়, আমিও তাকে তেম্‌নি সময়ে সময়ে নাচিয়ে থাকি। সেত আমার কাঠের বানর, সেত আমার কাঠের খেল্‌না। সে যেমন নাচে ভাল. আমিও তেম্নি নাচাই তাকে। তবে কি তা জান, সুরেশ বড়মানুষের ছেলে, এদিকেও বেস্ বোকা বোকা—ভাল মানুষ ভাল মানুষ; তেমন তেমন দরকার পড়ে একটা না একটা উপকারে লেগে যাবে—"

সুরেশের এত দিনের দিবাস্বপ্ন সহসা ভেঙ্গে গেল, এত দিনের ভ্রম দূর হল; যাহা শুন্‌লেন তাহাই যথেষ্ট—তাহাতেই তাঁহার শিরা সমূহে রক্তস্রোত বিদ্যুদ্বেগে প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল, ললাটের মধ্যস্থলে শিরাদ্বয় প্রকাশিত হল, সর্ব্ব শরীর ঘন ঘন কম্পিত হতে লাগ্‌ল। আর শুন্‌বার প্রযোজন নাই,—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে, ছাদ হতে নেমে চল্লেন। পথে দুই তিনবার আঘাত লাগ্‌ল, কিন্তু তাঁর মন ভয়ানক উদ্বেগে উদ্বিগ্ন—মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ কর্‌লেন না; বরাবর নেমে এসে নিজ বৈটকখানার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সবলে দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দে মদনমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হল, তিনি উভয় হস্তে নয়ন মার্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন্। সুরেশ মনের আবেগে আপনা আপনি বল্লেন "উঃ, কি ভয়ানক! সমস্ত পৃথিবীই মরুভূমি, জগৎ মরুময়!" মদন মোহনের তখনও উত্তমরূপে নিদ্রার জড়তা যায় নাই—নয়নে বেস্ নিদ্রাবেশ ছিল; সুরেশের কথার বিশেষ মর্ম্মগ্রহ কর্‌তে পার্‌লেন না, কিন্তু নয়নমার্জ্জন করতে করতে বল্লেন "বিশেষ কল্‌কাতার সহর!"

"বিশেষ কল্‌কাতার সহর, যথার্থ!" সুরেশ এই কথা বলেই একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়্‌লেন। যুবকের হৃদয় দারুণ উদ্বেগে পূর্ণ, আর তিলার্দ্ধ মাত্রও স্থান নাই, সুতরাং যদিও তিনি

মদনমোহনের কথায় যন্ত্রপরিচালিতের ন্যায় সায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেখেও দেখ্‌তে পেলেন না, শুনেও শুন্‌তে পেলেন না—গৃহমধ্যে যে কেহ আছে, তাহা আর তাঁহার একবারও হৃদয়ে উদয় হল না। মদনমোহন ক্ষণ-কাল নিস্তব্ধ থেকে বল্লেন "সুরেশ! তুমি সহসা এরূপ করে এসে বস্‌লে যে, ব্যাপার কি?"

এতক্ষণের পর সুরেশের চম্‌কা ভেঙ্গে গেল; তিনি মদনমোহনের দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করে বল্লেন "একি মদন যে, কতক্ষণ?"

"আমি অনেকক্ষণ এসেছি—এখন ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

"ব্যাপার?" সুরেশ এই কথা বলেই মনে মনে বিবেচনা কর্‌তে লাগ্‌লেন মদনমোহনকে নূতন ঘটনাটী বল্‌বেন কিনা? মদনমোহন তাঁর সেইরূপ বিলম্ব দেখে পুনরায় বল্লেন "কোন বিশেষ গোপনীয় কথা নাকি?"

সুরেশ আর গোপন করে রাখ্‌তে পার্‌লেন না—লজ্জার খাতিরে সমস্তই বলে ফেল্লেন। মদনমোহন শ্রবণ করে গম্ভীর ভাবে বল্লেন "সুরেশ! তুমি এখনও পৃথিবীর কিছুই দেখ নাই—এখনও তুমি জগতের প্রকৃত রূপ জ্ঞাত হও নাই। যত দেখ্‌বে—যত জান্‌বে, তত টের পাবে সকলি এইরূপ। এখন এই সামান্য বিষয়েই এত উদ্বিগ্ন হয়েচ, তখন এ অপেক্ষা গুরুতর বিষয়েও মন বিচলিত হবে না।"

সুরেশ মদনের সে কথাগুলির কিছুই শুন্‌লেন না,—আপনার মনে "নাঃ, যা বল্লে তাই যথার্থ,—পৃথিবীর মধ্যে যেটা যত বড় নগর, সেটা তত বড় মরুভূমি" এই কথা বলেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে পুনরায় বল্লেন "দেখ ভাই মদন, যথার্থ—আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েচি—আর তিলার্দ্ধ মাত্রও এ মরুভূমিতে থাক্‌তে ইচ্ছা নাই—"

মদনের একবার ইচ্ছা হল, বলেন "পৃথিবীর সকল স্থানই প্রায় এইরূপ" কিন্তু তাহায় তাঁর স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা আছে, সুতরাং একটু চিন্তা করে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বল্লেন "নাঃ, আমিও বিরক্ত হয়েছি—আমারও আর এখানে থাক্‌তে তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই।"

সুরেশ সঙ্গীর সেই কথায় একটু আনন্দিত হয়ে বল্লেন "বেস্, ভালই হয়েছে; সঙ্গী পেলাম। চল আমরা দুজনেই যাই, সরল-হৃদয় পল্লীগ্রাম বাসা-দের মধ্যে সুখশান্তি—সহানুভূতি অন্বে-ষণ করি।"

"তোমার পিতা আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবেন কেন?"

"সে ভার আমার উপর, যাতে দুজ-নের একত্র যাওয়া হয়, তা আমি করব।"

"তবে কি যথার্থ ই একবার দেশভ্রমণ কর্‌বে?"

সুরেশ ঈষৎ হেসে বল্লেন "যথার্থ নয় ত কি এত কথা মিথ্যা বল্লাম?—কল্যই পিতার নিকট অনুমতি নিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করব।"

"তবে যেন ভাই, হতভাগ্য মদনকে ভুল না।—আমি কাল একবার এসে কি হয় দেখে যাব, এখন চল্লাম" মদন-মোহন এই কথা বলেই দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হলেন। আবার যেন কি মনে পড়্‌ল, ফিরে এসে—অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে

বল্লেন "ভাই স্থরেশ, আজ যদি দুটী টাকা ধার দিতে পার, তাহলে বড় উপকার হয়—বাড়ীওয়ালা টাকার জন্য বড় উৎপীড়ন কচ্চে—বাসায় চাবি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েচে। বড় কষ্টে পড়েচি, বিশেষ কোন উপায়ও দেখ্‌তে পাচ্চিনা।"

স্থরেশ একটু হেসে বাক্সের মধ্য হতে দুইটী টাকা মদনের হস্তে প্রদান করে বল্লেন "মদন, তুমি এত কথা বল্‌বে তবে আমি দেব ?"

মদন ইংরাজী প্রথানুসারে ধন্যবাদ প্রদান করে বিদায় গ্রহণ কর্‌লেন—"গুড্ নাইট—"

"গুড্ বায়—"

স্থরেশের পিতা যে তাঁহাকে পুত্রের সঙ্গে যেতে দেবেন সে আশা নাই,—তথাপি যদি কোন উপায় হয়, সেই চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে মদনমোহন প্রস্থান কর্‌লেন। স্থরেশও নিজ শয্যায় শয়ন করে নিদ্রাশূন্য ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রে।

রায় রামহরি রায়বাহাদুরের বিশ্রাম-গৃহ; ঢালাও বিছানার উপর একটী উচ্চ গদি, গদির উপর রামহরি বাবু তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে উপবিষ্ট আছেন। এক পার্শ্বে একটী রৌপ্যময় ঢাকাই বাটায় তাম্বুল ও নানাবিধ মশলা রয়েছে, অপর পার্শ্বে একটী মূল্যবান আল্‌বোলা। রায়বাহাদুর এক একবার তামাকু সেবন কচ্চেন, আর মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ে কি চিন্তা কচ্চেন। সম্মুখে এক জন খানসামা উপবিষ্ট হয়ে পদসেবা কচ্চে। গৃহে অপর কেহই নাই—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

রামহরি বাবু বনিয়াদী বড়মানুষ নহেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ যদিও নিতান্ত নিঃস্ব না হউন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অপেক্ষা কিছু অধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন না। এখন তিনি যে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, সে সমস্তই তাঁর স্বোপার্জ্জিত। রায়বাহাদুর লেখাপড়া কাজকর্ম্মে বিশেষ উপযুক্ত লোক,—এ পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় কার্য্য করেছেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইংরাজদের যথাসাধ্য অনেক উপকার করেছিলেন। সেই উপকারই তাঁর সম্মানসূচক রায়বাহাদুর পদবী ও এই সমস্ত প্রভূত সম্পত্তি লাভের প্রথম সূত্রস্বরূপ।

রায়বাহাদুর নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান কচ্চেন, সহসা একজন পরিচারক গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর হস্তে একখানি পত্র দিলে। তিনি বাম হস্তে পত্রখানি খুলে পাঠ করে ঈষৎ হেসে বল্লেন, "সুরীবাবুকে একবার এইখানে ডেকে দাও দেখি।" পরিচারক চলে গেল; পরেই স্থরেশ গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। রামহরি বাবু তাঁকে দেখেই ঈসৎ হেসে বল্লেন "তুমি একি লিখেচ ? আমিত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না,—পড় দেখি।"

সুরেশ রামহরি বাবুর একমাত্র পুত্র; বিশেষ তাঁর অতি অল্প বয়সেই মাতৃ-বিয়োগ হয়, সুতরাং তিনি পিতার বড় আদরের ধন। রামহরি বাবু কখন তাঁকে ক্রুদ্ধস্বরে আহ্বান করেন নাই—কখন সাদর উপদেশ প্রদান ভিন্ন ভর্ৎসনা করেন নাই, তথাপি কেমন রাশভারি, কেমন গম্ভীর মূর্ত্তি,—সুরেশ কখন তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে সাহসী হতেন না। পিতার সেই কথা শুনেই কুণ্ঠিত—জড়সড় হয়ে অধোমুখে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন। রামহরি বাবু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে বল্লেন "ব্যাপার কি?—অকস্মাৎ এরূপ দেশবিদেশ দেখ্‌বার জন্য ইচ্ছা হল কেন?—যাহক্ তোমার নির্দ্দোষ অভিলাষে আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি না—তবে কি না, কিছু দিন পরে একেবারে আমার সঙ্গে গেলেই ভাল হয় না?"

সুরেশ অতি অস্পষ্ট স্বরে বল্লেন "আপনার সঙ্গে—"আর অধিক বাক্য-স্ফূর্ত্তি হল না, অধিকাংশ একপ্রকার জড়িত হয়ে মিলিয়ে গেল। রামহরি বাবু বুঝ্‌লেন তাঁর সহিত যাওয়া সুরেশের তত মনোমত নয়, বল্লেন "আমার সঙ্গে যাওয়া তোমার ইচ্ছা নয়?—তুমি তত দিন বিলম্ব করতে পার্‌বে না?—অবশ্য—তোমাদের বয়সে কোন বিষয়ে ঔৎসুক্য হলে এইরূপ অধীরতাই হয় বটে, কিন্তু তুমি বালক, কখন গঙ্গার পারেও যাও নাই—"

সুরেশ পিতার সেই শেষ কথা-গুলিতে কিঞ্চিৎ সাহসী হয়ে বল্লেন কখন কোথাও যাই নাই, বলেই আমার অধিক ইচ্ছা হচ্চে—"

"তা আমি বুঝেছি—কিন্তু তুমি বিদেশ ভ্রমণের ক্লেশ জান না—অতএব যখন আমি যাব, সেই সময় আমার সঙ্গে গেলেই ভাল হয় না?" রামহরি বাবু উত্তর অপেক্ষায় পুত্রের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর পেলেন না। সুরেশেব মুখখানি ক্রমে ম্লান হয়ে এল; রামহরি বাবু বুঝ্‌লেন পুত্রকে সে অভিলাষ হতে প্রতিনিবৃত্ত করা দুরূহ;—অনেক বোঝালেন; কিন্তু সুরেশ কিছুতেই বুঝ্‌লেন না। অবশেষে বল্লেন "ভাল, তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছা কর?"

সুরেশ মৃদুস্বরে বল্লেন "আপনি যেখানে অনুমতি কর্‌বেন—সেখানে পল্লী-গ্রামের প্রকৃত শোভা দেখ্‌তে পাব।"

রায়বাহাদুর ক্ষণকাল চিন্তা করে বল্লেন "তুমি যদি জাহানাবাদের জমীদা-রীতে যেতে ইচ্ছা কর, তাহলে তোমাকে পাঠাতে পারি। কারণ সেখানে আমা-দের অনেক লোক জন আছে, অধিক ক্লেশ হবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাবে কার সঙ্গে?"

সুরেশ ব্যগ্রভাবে বল্লেন "মদন-মোহনের—"

মদনমোহনের নাম শুনেই রামহরি বাবু একেবারে জ্বলে উঠ্‌লেন, বল্লেন "না তবে তোমাকে যেতে দিতে পারি পারি না—মদন যেদিকে যাবে, আমি তোমাকে সেদিক দিয়ে যেতে দেব না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে যেতে চাও বরং দিতে পারি।" তিনি এই কথা বলেই নিস্তব্ধ হয়ে আলবোলা টান্‌তে লাগ্‌লেন। সুরেশের আর দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না; তিনি ক্ষণকাল

নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে গৃহ'হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ক্ষণকাল পরেই বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গৃহমধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সুরেশের শিক্ষক। রামহরি বাবু সুরেশকে প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার্থ হিন্দু কালেজে প্রদান করেন; পরে তাঁর প্রথম যৌবন উপস্থিত হতেই, পাছে পাঁচ জন দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত মেশেন সেই ভয়ে, বিদ্যালয় হতে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বাটীতে শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেই অবধি সুরেশ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ও অপর এক জনের নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। অধ্যপক মহাশয় গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর্‌তেই রায়বাহাদুর একটী প্রণাম করে বল্লেন "কি পণ্ডিত মহাশয়, খবর কি?"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করে, জিজ্ঞাসা কল্লেন "মহাশয় কি আমাকে ডেকেচেন?"

"আমি আপনাকে ডেকেচি?"

"এই মাত্র সুরেশ বাবুর খানসামা আমার বাসায় গিয়াছিল।"

"আঃ, এ দেখ্‌চি ছাড়্‌লে না, নিতান্তই যাবে" রামহরি বাবু এই কথা বলেই, উঠে সোজা হয়ে বসে বল্লেন "বসুন, আছে বটে কিছু পরামর্শ।" .

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উপবেশন কর্‌লেন। রায়বাহাদুর সুরেশের পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করে বল্লেন "এই দেখুন, সুরী মহা হাঙ্গামা তুলেচে—কোন মতেই শুন্‌বে না—"

পণ্ডিত মহাশয় পত্রখানি দেখে ক্ষণকাল চিন্তা করে বল্লেন "তা, মহাশয় কি রূপ বিবেচনা করেন?"

"আমি আর কি বিবেচনা কর্‌ব—তবে যেরূপ জিদ কচ্চে, তাতে ত নিতান্ত অসম্মত হওয়া উচিত বোধ হচ্চে না।"

ন্যায়ই হউক আর অন্যাই হউক, বড় লোকের কথায় প্রতিবাদ করা পণ্ডিত মহাশয়ের স্বভাব নয়। তিনি কখনই রায়বাহাদুরের কথায় সম্মতি ভিন্ন অসম্মতি প্রকাশ করেন না; সুতরাং বল্লেন "আজ্ঞা, আপনি যা বিবেচনা কর্‌বেন তা যে অতি উত্তম হবে, তাতে আর বিকল্প কি? আমিত বলি প্রবল স্রোতের মুখে বাধা দেওয়ায় কেবল অনিষ্টই উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিশেষ সুরেশ কিছু মন্দ ইচ্ছা করে নাই,—দেশ বিদেশ না দেখ্‌লে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও অনেক কথা বল্‌তেন কিন্তু খান্‌সামা ব্রাহ্মণের হুঁকোয় তামাকু প্রস্তুত করে এনে দিলে, কাজে কাজেই মুখ যোড়া হয়ে গেল।

রায়বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয় যথার্থ বলেচেন, আজকাল্‌কার ছেলেদের ইচ্ছা নদীর স্রোতই বটে। আর সুরেশকে যে কেবল দেশভ্রমণের জন্যই পাঠাচ্চি তাহাও নয়। তাহাকে জাহানাবাদের জমীদারীতে পাঠাবার অভিলাষ করেছি,—অবশ্য সেখানে স্বচক্ষে সমস্ত দেখ্‌তে পেলে, বিষয় কার্য্যও কিছু শিখে আস্‌তে পারে।"

"আজ্ঞা তার আর সন্দেহ কি?—সুরেশ অতি বুদ্ধিমান্ সুচতুর যুবা; বিশেষতঃ ভবিষ্যতে যখন সকল ভারই তাঁহার উপরে পড়্‌বে, তখন না শিখ্‌লেই বা চল্‌বে কেন?—অতি উত্তম বিবেচনা করেছেন।"

"তা, এখন মহাশয়কে সুরীর সঙ্গে যেতে হবে; কারণ সে বালক, এখনও তার সদসৎবিবেচনা হয় নাই—" রামহরি বাবু এই কথা বলেই উত্তর প্রতীক্ষায় বিদ্যাবাগীশের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিবাস রাজপুর, তিনি এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্যে রাজপুর আর কলিকাতা মাত্র চেনেন; কখন ভ্রমেও গঙ্গার পবপারে যাননাই,—জাহানাবাদে যেতে হবে শুনেই একেবারে চমকে গেলেন—সবলে উপর্য্যুপরি তামাকের ধূম আকর্ষণ করলেন তার পরই হুঁকোর গড়্‌গড়্ শব্দ সহসা থেমে গেল। আপনা আপনি মনে মনে বল্লেন "হা অদৃষ্ট! এত ভূমিকা কি আমার জন্যই হচ্ছিল?"

বাহাদুর পুনরায় জিজ্ঞাসা কব্‌লেন "কেমন মহাশয় কি বলেন?

বিদ্যাবাগীশ দুই তিন বার ঢোকগিলে বল্লেন "আজ্ঞা তা—তা—একবার কি বাড়ীতে বলে করে আসব না?"

"যাত্রার উদ্যোগ কব্‌তে অন্ততঃ দুই তিন দিন বিলম্ব হবে, ইতিমধ্যে আপনি সমস্ত সেরে নিতে পার্‌বেন।" রায়বাহাদুর এই কথা বলেই একজন পরিচারিকাকে বল্লেন "সুরীকে একবার এখানে ডাক দেখি।"

সুরেশ পিতার সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের কিরূপ কথাবার্ত্তা হয় শুন্‌বার জন্য দ্বারের নিকটেই উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। রায়-বাহাদুর বল্লেন "তুমি নিতান্তই বিদেশভ্রমণে উৎসুক হয়েছ, অতএব আমি আর তোমার ঔৎসুক্যে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তুমি এখন সমস্ত আয়োজন স্থির হলে, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে জাঁহানাবাদে যাত্রা কোরো—পথে বড় বড় স্থানে স্বেচ্ছামত অবস্থান করে দেখো শুনো—তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

সুরেশ পিতার সেই কথা শুনেই নিজের বৈঠকখানায় ফিরে গেলেন। মদনমোহন এতক্ষণ তাঁর অপেক্ষায় একাকী বসে ছিলেন; সুরেশ গৃহমধ্যে প্রবেশ কব্‌তেই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কি হে, কি হল? সমাচার কি?"

সুরেশ বল্লেন "সমাচার বড় ভাল নয়।"

"কেন, তোমাব পিতা কি তোমাকে বিদেশে যেতে দিতে সম্মত হলেন না?"

"না, তিনি তাতে অসম্মত হন নাই, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে চান না,—পণ্ডিত মহাশয় সঙ্গে যাবেন।

"হা অদৃষ্ট—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধানভান্‌বে?—তা যাহোক, এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তোমাব নিজেব ইচ্ছা আছে কি?"

"আমাব ইচ্ছা?—সে কথা আবার জিজ্ঞাসা কব্‌তে হয়?"

"তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যুট্‌চি।"

সুরেশ মদনের সেই কথায় একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন "যুট্‌বে কিরূপে?"

"সে দেখ্‌বে তখন—তার জন্য তোমাকে চিন্তিত হতে হবে না" মদন মোহন এই কথা বলেই কিঞ্চিৎ চিন্তা করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "তোমার পণ্ডিত মহাশয় লোক কেমন?"

সুরেশ বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয় লোক মন্দ নহেন, অতি নিরীহ সাদা সিদে—বিশেষ কিছু অচতুর—"

"ভাল আমারত সেইরূপই প্রয়োজন।"

"বিদ্বান্ আর বড় লোকের প্রতিই তাঁর অনুরাগটা কিছু অধিক—"

"বস্, ভালইত—সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দি, পার্সি, উড়ে যা চান, সেই ভাষাতেই কথা কহা যাবে—তিনি নিজে যে ভাষা জানেন না তারত আর কথাই নাই।"

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত লোক স্বভাবতই কিছু ভীত।"

"আরও ভাল, আরও সুবিধা—সুরেশ, আর চিন্তা নাই আমি নিশ্চয়ই যুট্‌ব; তবে এখন কিছু টাকা পেলে, আর কবে কোন্ সময়ে—কি উপায়ে যাওয়া হবে সেটী নিশ্চয় জান্‌তে পার্‌লেই হয়।" ক্রমশঃ—

কামন্দকীয় নীতিসার।

যাঁহার প্রভাবে ত্রিভুবন নিত্যমার্গে নিরন্তর অবস্থিতি করে, সেই পরাৎপর দণ্ডধারী পরমেশ্বর জয়যুক্ত হউন। অথবা যাঁহার প্রতাপে ভূমণ্ডল নিরন্তর ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই প্রবল প্রতাপান্বিত মহীপতি সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন। ১।

যিনি অপ্রতিগ্রহশীল বিশালকুলসম্ভূত মহর্ষিদিগের ন্যায় প্রসিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, যিনি ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ব এই চারিটী বেদ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি বজ্রাগ্নির ন্যায় তেজস্বী, যাঁহার মন্ত্রাভিচাররূপ বজ্রপ্রহারে স্বপর্ব্ববিশিষ্ট শ্রীমান্ নন্দবংশরূপ পর্ব্বত সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, যিনি পরাক্রমে সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, যিনি একাকী মন্ত্ররূপ শক্তিপ্রভাবে চন্দ্রগুপ্তমহীপতিকে সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র হইতে নীতিশাস্ত্র রূপ অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা সেই অসীমগুণ সম্পন্ন বিষ্ণুগুপ্তকে (চাণক্য) প্রণাম করি। ৩। ৪। ৫। ৬।

আম্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সুনির্ম্মল জ্ঞানশালী সেই গুরু বিষ্ণুগুপ্ত মহাশয় প্রণীত শাস্ত্রানুশীলন করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তদনুসারে রাজনীতিপ্রিয়ত্বহেতু সংক্ষেপে এই নীতি গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতেছি। রাজ্যলাভ ও রাজ্যপ্রতিপালন সম্বন্ধে নৃপতিগণের যেরূপ উপায় সকল অবলম্বন করা উচিত, তাহাই ইহাতে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। ৮।

ইহ জগতে রাজাই উন্নতির একমাত্র হেতু, ইহা বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। চন্দ্র যেমন সমুদ্রের আহ্লাদজনক সেইরূপ যদি রাজ্যে প্রজাগণের নয়নরঞ্জনকারী সম্যক্‌নেতা রাজা না থাকেন, তাহা হইলে সমুদ্রমধ্যে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় প্রজাগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে। ১০।

ধর্ম্মানুসারে সম্যক্‌রূপে পক্ষপাতশূন্য হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনতৎপর, শত্রুনাশক রাজাকে প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে সম্মান করিয়া থাকে। ১১।

রাজা দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ডবিধান ও অদণ্ডার্হ ব্যক্তির সম্মানপূর্ব্বক প্রজাগণকে সম্যক্‌রূপে শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া পালন করেন, প্রজাগণও ধান্য ও ধনাদি দ্বারা নিরন্তর প্রাণপণে নরপতির সম্পৎ পরিবর্দ্ধিত করে। বর্দ্ধন ও পালন এই উভয়ের মধ্যে পালনই শ্রেয়স্কর। কারণ পালন অর্থাৎ শত্রুগণের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা না করিলে নৃপতির মঙ্গল হয় না। ১২।

ন্যায়পরতন্ত্র নৃপতি ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ দ্বারা আত্মাকে এবং প্রজাগণকে রক্ষা করেন। অন্যথা অর্থাৎ বিপরীতাচরণে সকলই বিনষ্ট হয়। ১৩।

যবন রাজা ধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টকে বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। অধর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া রাজা নহুষ রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। ১৪।

অতএব রাজা ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন ও কোষাগার অর্থ-পূর্ণ করিবেন। কারণ ধর্ম্মদ্বারা রাজ্যবৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফল রাজলক্ষ্মী। অর্থাৎ যে রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজ্য রক্ষা করেন, রাজলক্ষ্মী তাঁহারই প্রতি অনুরাগিণী হন। ১৫।

স্বামী অর্থাৎ অমাত্যাদি সমস্ত রাজ্যাঙ্গের অধিপতি, অমাত্য অর্থাৎ মন্ত্রী, রাষ্ট্র অর্থাৎ রাজ্য জনপদাদি, দুর্গ অর্থাৎ পর্ব্বত পরিখাদি বেষ্টিত অনায়াসে শত্রুগণের অগম্য স্থান (গড়), কোষ অর্থাৎ ধনাগার, বল অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনা, সুহৃৎ অর্থাৎ মিত্র ইত্যাদি সকলগুলিকে রাজ্য বলে। সত্ত্ব অর্থাৎ পরাক্রম এবং বুদ্ধি অর্থাৎ সুশ্রূষাদি অষ্ট গুণযুক্তা প্রজ্ঞাই যাহার প্রধান আলম্বন অর্থাৎ সাধন তাহাকে রাজা বলে। ১৬।

বলবান্ ব্যক্তির পরাক্রম করিয়া অবলম্বন বুদ্ধি দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী উপায় সকল নির্ণয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা উদ্যমান্বিত রাজা সপ্তাঙ্গ রাজ্যের লাভার্থ যত্ন করিবেন। ১৭।

ন্যায়ানুসারে অলব্ধ অর্থের উপার্জ্জন, ধন পরিরক্ষণ, অর্থ সকলের পরিবর্জ্জন এবং সৎপাত্রে প্রতিপাদন এই চারিটী রাজার অনুষ্ঠেয়। পাত্র তিন প্রকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপাত্র, মন্ত্রি প্রভৃতি অর্থপাত্র এবং মনোহারিণী স্ত্রীজাতিই কামপাত্র। ধর্ম্মানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক পাত্রে দান বিধেয়। ১৮।

নয় অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র পরিজ্ঞান এবং বিক্রম অর্থাৎ শৌর্য্য এই উভয় সম্পন্ন এবং সাধন অর্থাৎ পুরুষ, দ্রব্য, সম্পৎ, আপৎ-প্রতীকার, অনুকূল দেশ কাল ও কার্য্যাদি নির্ণয়পূর্ব্বক সুন্দররূপে উদ্যোগশীল নৃপতি রাজ্যলক্ষ্মী উপার্জ্জনার্থ চিন্তা করিবেন। বিনয় অর্থাৎ স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গণের জয়ই নয় অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র পরিজ্ঞানের মূল। ১৯।

ইন্দ্রিয় জয়কেই বিনয় কহে, বিনয়ী ব্যক্তিই শাস্ত্রজ্ঞানে সমর্থ, শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিরই শাস্ত্রার্থ সকল সুপ্রসন্ন হয়। ২০

শাস্ত্র, প্রজ্ঞা, ধৃতি, দক্ষতা, প্রগল্‌ভতা-ধারয়িষ্ণুতা, উৎসাহ, বাক্‌পটুতা, দার্ঢ্য, আপৎকালে ক্লেশসহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও মন্ত্রজ প্রভাব, শুচিতা, মৈত্রী, ত্যাগ, সত্য, কৃতজ্ঞতা, কুল, শীল ও দম এই কয়টী গুণ সম্পত্তির হেতুভূত। ২১।২২।

রাজা প্রথমতঃ আত্মাকে বিনয় দ্বারা উপপন্ন করিবেন। তৎপরে অমাত্যবর্গ,

তৎপরে ভৃত্যবর্গ, তৎপশ্চাৎ পুত্রগণকে এবং তদনন্তর প্রজাগণকে বিনীত করিবেন। ২৩।

সর্ব্বদা প্রজার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন, প্রজাপালনতৎপর, বিনীতাত্মা নৃপতি প্রচুর পরিমাণে রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিতে পারিবেন। ২৪।

নৃপতি সুবিস্তীর্ণ বিষয়রূপ বিপিনে ইতস্তত ধাবমান উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়রূপ হস্তীকে জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা বশীভূত করিবেন। ২৫।

আত্মা যত্নসহকারে বিষয় বাসনার্থ মনকে আক্রমণ করে। আত্মা ও মনের সংযোগ হেতু প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়।২৬

মন বিষয়রূপ আমিষলোভে ইন্দ্রিয়গণকে বারংবার প্রেরণ করে, অতএব মনকে যত্নসহকারে বশীভূত করা উচিত। কারণ মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারা যায়। ২৭।

বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া মনকে বিজ্ঞান, অন্তর্হিতত্বহেতু হৃদয়, চেতনার আধার বলিয়া চিত্ত, মননহেতু মন, বোধের আধার বলিয়া বুদ্ধি এই পাঁচটী সমার্থ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই মনের সাহায্যে আত্মা শরীরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। ২৮।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, জ্ঞান ও সংস্কার এইগুলি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন। ২৯।

চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থে সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু আত্মার সমকালে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভিন্নকালে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহার নাম মনের লিঙ্গ। অর্থাৎ মন নামে ষষ্ঠ বুদ্ধীন্দ্রিয় আছে, তদভাবে যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। নানাবিধ বিষয়ের সঙ্কল্পই তাহার অর্থাৎ মনের কার্য্য। ৩০।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ ও বাক্য এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, অতএব সমুদয়ে ইন্দ্রিয় দশটী। ৩১।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং উৎসর্গ আনন্দ, আদান, গতি ও আলাপ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য। ৩২।

আত্মা ও মনকে পণ্ডিতেরা অন্তঃকরণ বলেন। ইহাদের উভয়ের প্রযত্নাতিশয়ে সঙ্কল্পের আবির্ভাব হয়। ৩৩।

আত্মা, বুদ্ধীন্দ্রিয়, রূপরসাদিকে বহিস্করণ কহে, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা বহিষ্করণ বৃত্তির কার্য্য সিদ্ধি হয়। ৩৪।

এই উভয় করণ অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণ প্রযত্নাধীন। অতএব প্রবৃত্তির অর্থাৎ উভয়বিধ প্রযত্নের সংরোধ করিলে নির্ম্মনস্কতা প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ যাবৎ প্রযত্ন নিরুদ্ধ থাকে তাবৎ আত্মা মনের সহিত যুক্ত হয় না। তাহাতে দেহে মন থাকিলেও নাই বলিতে হয়, কারণ তাহার কোন কার্য্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। অন্তঃকরণের বিশ্লেষে প্রবৃত্তি জন্মে না। ক্রমে অন্তঃকরণের অভাবে বহিষ্করণেরও অভাব এবং তদভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের সহিত সম্পর্কই থাকে না। ৩৫।

এইরূপে উভয় করণেরই সংরোধ বশতঃ নিরুদ্ধচেষ্ট আত্মাকে আপনিই সংযত করিয়া নীতিশাস্ত্র ও অনীতিশাস্ত্রবিৎ রাজা নিজ হিতকর নীতিরই অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৬।

যে নরপতি একমাত্র সহায় হীন মনকেই সংযত করিতে না পারেন, তিনি

কিরূপে বহুসৈন্যসাধ্য নানা সহায়ে রক্ষিত সসাগরা পৃথিবী জয় করিবেন। ৩৭।

যে নৃপতি, আপাতরম্য অথচ পরিণামে বিষবৎ রূপাদি বিষয়ের দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হন, তিনি উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় গ্রহ অর্থাৎ বন্ধন (বিপৎ) প্রাপ্ত হন। ৩৮।

বিষয় দ্বারা শাস্ত্রময় ও ধর্ম্মময় এই উভয়বিধ লোচন অন্ধীভূত হইলে নরপতি পরস্ত্রীগমনাদি নানাবিধ অকার্য্যে অত্যাসক্ত হইয়া স্বয়ংই ভীষণ ভয়দায়িনী আপৎ রাশি লাভ করেন। ৩৯।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীর মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিনাশ সাধনে অসমর্থ। ৪০।

কারণ পবিত্র শস্পাঙ্কুরমাত্র আহারশীল, অতিদূর ও উচ্চস্থানে গমনাগমনে সক্ষম মৃগগণ, ব্যাধের গীতে মুগ্ধচিত্ত হইয়া অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪১।

পর্ব্বতেন্দ্রের শিখর তুল্য বৃহদাকার অবলীলাক্রমে বৃহৎ বৃহৎ শাল তালাদি বৃক্ষ উৎপাটনে সমর্থ, বারণও করিণীর স্পর্শে বিমোহিত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ৪২।

স্নিগ্ধ দীপ শিখার আলোকে বিলুব্ধ—দৃষ্টি পতঙ্গগণ দীপালোকে পতিত হইয়া নিঃসন্দেহ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে।৪৩।

মনুষ্য দৃষ্টির অগোচর, অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে বহুদূরে সঞ্চরণশীল মৎস্যও আমিষ লোভে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ লৌহনির্ম্মিত বড়িশ গ্রাস করে। ৪৪।

গন্ধলুব্ধ মধুকর, দানাসব পিপাসায় ভীষণ অসুখসঞ্চার গজকর্ণের ঝনঝনাঘাত লাভ করিয়া অকালে কালগ্রস্ত হয়। ৪৫।

বিষময় বিষয়ের মধ্যে এক একটীই ভীষণ মৃত্যুপ্রবণ, যে ব্যক্তি ইহাদের পাঁচটীকে এককাল সেবন করেন, তিনি কিরূপে সুখী হইবেন? অর্থাৎ অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সুখ কদাপি নাই। ৪৬।

ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া বিষয়ে আসক্ত না হইয়া যথাকালে ধর্ম্মানুসারে বিষয় ভোগ করা উচিত। সুখই অর্থের ফল। অতএব যে অর্থে সুখ নাই কেবল বিপৎরাশি আবির্ভূত হয়, তাদৃশ সম্পৎ বৃথা।৪৭।

যাহারা কান্তামুখাবলোকনে ও তৎসঙ্গমার্থে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তাহাদের সম্পৎ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভ্রষ্ট হয়। অর্থাৎ অত্যন্ত কামুকদিগের ধন ও যৌবন সত্বর নষ্ট হয়। ৪৮।

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে সুখফলের উদয় হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া কেবল মাত্র অধর্ম্ম পরতন্ত্র হইয়া কামাদির বশবর্ত্তী হয়, তাহার জগতে কদাপি শুভ হয়না। সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪৯।

'স্ত্রী' এই আনন্দকর নামটী শ্রবণমাত্রই যখন মনকে একেবারে উদাস করে, তখন কুঞ্চিত ভ্রূযুগলবিশিষ্ট সেই বিলাসবতী নারীর দর্শনে যে কি ঘটে তাহা বলা যায় না। ৫০।

রহঃপ্রচারকুশলা অর্থাৎ চুম্বন আলিঙ্গনাদি কার্য্যকুশলা, মৃদু গদ্গদভাষিণী, রক্তাক্তনয়না রমণী কোন্ দেহধারী অনুরক্ত পুরুষকে প্রীত না করে। অর্থাৎ স্ত্রীজাতির কটাক্ষবাণে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। ৫১।

যেমন সন্ধ্যা সুনির্ম্মল কান্তিজনক চন্দ্রমণ্ডলকে রঞ্জিত করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি মুনিগণেরও সুপ্রসন্ন সরল মনকে বলপূর্ব্বক বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে। ৫২।

যেমন জলস্রোতে প্রকাণ্ড পর্ব্বত সমূলে উন্মূলিত হয়, তদ্রূপ মনের প্রহ্লাদনকারিণী, মদয়ন্তী রমণীগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বতের ন্যায় ধৈর্য্যশীল মহাত্মাদিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ পণ্ডিতেরাও নারীকটাক্ষে মোহিত হইয়া ঘোর নরকে পতিত হয়েন। ৫৩।

মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপান এই কয়টী ভূপতিগণের নিন্দার বিষয়। মৃগয়াতে আসক্ত হইয়া পাণ্ডুরাজা, দ্যূতক্রীড়াসক্ত হইয়া নলরাজা ও পানাসক্ত যদুবংশীয়গণ ঘোরতর বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেখা গিয়াছে। ৫৪।

কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান ও মদ এই ছয়টীকে ষড়্‌বর্গ বলে। ইহাদিগকে ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই সুখ লাভে সমর্থ। ৫৫।

ক্রমশঃ—

দেবদৃষ্টি।

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজ দলে সুমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে
কোথায় বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দুখানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশ নাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গ-ভূমি শুনলো ইন্দ্রানি।
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদু গতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দে কি হেতু জন্মিলা ?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে শুন ত্রিদিব ঈশ্বরি
"বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে"
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

হিন্দুমহিলা।

(৬)

মানব সমাজে স্ত্রীচরিত্র কিরূপে ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইল, প্রকৃতি কি পরিমাণে তাহাতে সহায়তা করিল এবং পুরুষ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে গিয়া কি প্রকারে তাহার অনুকূল হইয়া পড়িল, ইতিপূর্ব্বে অল্পে অল্পে তাহার আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃতির অনন্ত লীলাক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি যতদূর চলে এবং আমরা যতদূর তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে আমরা স্ত্রীকে পুরুষের ছায়া ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। যৌন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুষই জয়ী হইল এবং স্ত্রীকে আপনার বিলাসের কন্দুক করিয়া লইল। ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাবশতঃই হউক রমণী পুরুষের নিদেশেই চলিতে লাগিল। তাহারা স্বভাবতঃ অশক্ত; তাহাদিগকে গর্ভবহন ও সন্তানদিগের লালন পালন করিতে হয়, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না; অথবা স্বয়ং এক পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অপর পুরুষকে গ্রহণ করিতে পারে না। এই শেষোক্ত কার্য্যে অপর পুরুষের সহায়তা আবশ্যক। যতক্ষণ সেই পুরুষ আসিয়া বলে অথবা কৌশলে তাহাকে হস্তগত না করিতেছে, ততক্ষণ রমণীর ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না। আবার সেই পুরুষকে যখন অপর বলবত্তর পুরুষ পরাস্ত করিয়া রমণীকে হস্তগত করিল এবং তাহাকে অপরে, পুনশ্চ তাহাকে অধিকতর বলবান্ পুরুষে পরাজিত করিল, রমণী তখন সামান্য তৈজস পত্রের ন্যায় এক প্রভুর অধিকার হইতে অপরের অধিকৃত হইতে লাগিল; এইরূপে রমণীর শান্তি কোথায়? এই বিষয়ে বসুন্ধরার সহিত রমণীর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তুলনা হইতে পারে। বসুন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা; সেইরূপ রমণীও সেইকালে বীরভোগ্যা ছিল। যে বীর, সেই তদানীন্তন সুন্দরীদিগকে ভোগ করিত, যে দুর্ব্বল তাহাকে কুৎসিত জঞ্জাল লইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু রূপ যৌবন চিরস্থায়ী নহে; যখন সৌন্দর্য্যের কুহকজাল ছিন্ন ভিন্ন হইল, বিলাসের উল্লাসকারিণী জ্যোৎস্না বিলীয়মান হইয়া আসিতে লাগিল, তখন পুরুষ সেই রমণীকে ত্যাগ করিয়া অপর সুন্দরীর সোহাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই ক্ষীণযৌবনা ধর্ষিতরূপা ললনার দশা কি হইল? সে তখন বাণের জলে কুটার মত ভাসিয়া বেড়ায়; যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া তুলিয়া আশ্রয় দিল, তবেই রক্ষা, নতুবা কুটিল ভাগ্যস্রোতে ভাসিয়া চলিল। শেষে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল।

সমাজের এই বিকৃত ও বিপ্লুত চিত্রের আলোচনা করিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। তখন রাজশাসন কল্পনায় পর্য্যবসিত, সমাজ-শাসন ছায়ামাত্র কল্পিত, সুতরাং কে সেই ব্যভিচারী স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী পুরুষদিগকে দমিত করিয়া নিপীড়িতা স্বার্থবঞ্চিতা পরিত্যক্তা রমণী-

দিগকে রক্ষা করিবে? এইরূপে পুরুষের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এইরূপে কতশত সুন্দ উপসুন্দ পরস্পরের অস্থি মজ্জা চর্ব্বণ করিতে লাগিল; এইরূপে কত তিলোত্তমা বিনামূল্যে সৌন্দর্য্যের বাজার বিক্রয় করিয়া শ্মশানের বীভৎস দৃশ্যে আপনার হৃদয়-শ্মশান মিশাইতে লাগিল। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। রমণীগণ তখন নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল;—বুঝিল যে তাহাদিগকে চিরকালই পুরুষের বিলাসপুত্তলি হইয়া থাকিতে হইবে। পুরুষ তাহাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, যখন তখন ইচ্ছা সোহাগ করিবে, যখন ইচ্ছা ত্যাগ করিবে। সুতরাং তাহাদের ভাগ্য অনির্দ্দিষ্ট, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, যতদিন রূপ যৌবন, ততদিন পুরুষের যত্ন ও ভালবাসা; তাহার পর কেহই মুখের দিকে একবার চাহিবে না; কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিবে না। ইহার উপর আর এক বিপদ এই যে তাহারা যে সন্তান প্রসব করিত, পুত্র হইলে তাহা ঔরষ পিতার থাকিত, কন্যা হইলে সম্ভবতঃ মাতার স্কন্ধে পড়িত। যত দিন সমাজে কন্যার অভাব ছিল, ততদিন কন্যার আদর ছিল, কিন্তু যে সময়ে কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, অথবা কন্যার আর আদর রহিল না।

"তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি উৎ-পুমাংসং হরন্তি। *

সেই জন্য কন্যা জন্মিলে ত্যাগ করে এবং পুত্র জন্মিলে তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবামাত্র রমণীগণ আপনাদের পক্ষ দৃঢ় করিতে লাগিল। তখন তাহারা স্বেচ্ছানুসারে মনোমত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল; এইরূপে যৌন নির্ব্বাচনের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইল, পুরুষ তখন কৃপাভিখারী হইয়া সুন্দরীর চরণতলে অবনত হইল। ঋগ্বেদোক্ত পুরুরবা ও উর্ব্বশীর উপন্যাস পাঠ করিলে এই সমস্ত বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। সেই উপাখ্যান যদিও রূপকালঙ্কারে আচ্ছন্ন, তথাপি যে প্রথার অবলম্বনে তাহা রচিত হইয়াছে, তাহা যে অতি প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। "পুরুরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন, উর্ব্বশী এক্ষণে পুরুরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন †।"

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর উপাখ্যান যে, রূপক, নিম্নলিখিত ঋক্‌টী পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইবে।

উর্ব্বশী বলিতেছেন, "পুরুরবা যখন জন্ম গ্রহণ করিলেন, দেব মহিলারা দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই নদীরা পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধন করিল; হে পুরুরবা! দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন (৩)।"

* তৈত্তিরীয় সংহিতা।

† শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদিত ঋগ্বেদ, ১৫৮৩ পৃষ্ঠা ১ টীকা।

(৩) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন। পুরুরবার সূর্য্যের সহিত একতা এইঋক্ দ্বারা কতক পরিমাণে সূচিত হইতেছে।

That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant, * * endued with much light; for though raba generally used of sound, yet the

১১। উর্ব্বশী।—"হে পুরুরবা! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, সর্ব্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলে, আমি তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না; এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ।"

১২। পুরুরবা।—"তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে? আর যদি আমার নিকটে আসে তাহা হইলে সে কি রোদন করিবে না? অশ্রুপাত করিবে না? পরস্পর প্রীতি-যুক্ত স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, (অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য)।"

১৩। উর্ব্বশী।—"আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেছি, পুত্র তোমার নিকট যাইয়া অশ্রু াত বা ক্রন্দন করিবে না। আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্ব্বোধ! গৃহে ফিরিয়া যাও। আমাকে আর পাইবে না।"

১৪। পুরুরবা।—"তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর কখন যেন উত্থিত না হয়, সে যেন বহুদূরে দূর হইয়া যাউক। সে যেন নিয়তির অঙ্কে শায়িত হউক, বলবান্ বৃকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক।"

১৫। উর্ব্বশী।—"হে পুরুরবা! এরূপ মৃত্যু কামনা করিও না; উচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দ্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার।" *

পুরুরবা ও উর্ব্বশীর কথোপকথন-চ্ছলে যে রূপক অঙ্কিত হইয়াছে, ইহার অভ্যন্তর হইতে অনেকটা সামাজিক তত্ত্ব উদ্ধৃত হইতে পারে। অবশ্য এক ব্যক্তির চরিত্র বা অনুষ্ঠান লইয়া একটা বিশাল সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিতে পারা যায় না, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে তৎকালে বিবাহ-প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি উদ্দালক-পুত্র মহাত্মা শ্বেতকেতুই এই মঙ্গলময় নিয়ম ভারতে স্থাপিত করেন; তাঁহার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। তিনি বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম ও পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণ জৈবলির সম-সাময়িক। এদিকে পুরুরবা জনকেরও পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনক বিদেহ-বংশে উদ্ভূত। এই বিদেহ-বংশ সূর্য্যবংশেরই প্রধান শাখা। মহারাজ নিমি ইহার গোত্রপতি। নিমি, ভগবান্ বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অন্যতম তনয়। ইনিই বিদেহ বংশের প্রথম রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁরই পুত্র মিথি; মিথি কর্ত্তৃক বিদেহ

root *ru* which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour *i. e.* red * * (sanscrit Ravi, sun).—"

"I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru * *. As to pervade, and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki".

Max Muller's *Selected Essays.* Vol. I pp. 405-408.

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ।

রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিথিই প্রথম জনক। জনক সূর্য্যবংশে এবং পুরুরবা চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি বুধের পুত্র। বুধ বৈবস্বত মনুর দুহিতা ইলার গর্ভে পুরুরবাকে উৎপাদন করেন; সুতরাং পুরুরবা মনুর দৌহিত্র। এদিকে দেখা গেল যে, জনক মনুর প্রপৌত্র। সুতরাং পুরুরবা জনকের এক পুরুষ উর্দ্ধতন। শ্বেতকেতু জনকের সমসাময়িক, অতএব পুরুরবার এক পুরুষ অধস্তন। শ্বেতকেতুই এই মর্য্যাদা স্থাপিত করেন; তাঁহার পূর্ব্বে অর্থাৎ পুরুরবার সময়ে ঐ মঙ্গলকর নিয়ম তদানীন্তন হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তখন রমণীগণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিণী ছিল; তাহারা যে কোন পুরুষেই আসক্ত হইত। সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ সেই রমণীর রক্ষক পুরুষের নিকট হইতে তাহাকে অনায়াসে লইয়া যাইত; রক্ষক তাহার কিছুই করিতে পারিত না; অবশ্য ক্ষমতা থাকিলে তাহাতে বাধা দিত কিনা, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। তবে সহজ বুদ্ধিতেই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যে বলবান, তাহার নিকট হইতে রমণী কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য।

এই স্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, যদি বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না, তবে সন্তান সন্ততি কাহার অধিকারে আসিত? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রকৃত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও এক প্রকার চুক্তি বিবাহ তৎকালে প্রচলিত ছিল। সেই নিয়মানুসারে যে রমণী যে পুরুষের সহিত একত্রে বাস করিত, তাহার গর্ভজাত পুত্র সেই পুরুষেরই পুত্ররূপে পরিগণিত হইত। রমণী অপর পুরুষে সঙ্গত হইলেও অনেক স্থলে পূর্ব্ব রক্ষককে একবারে ত্যাগ করিত না; নিজের অথবা সেই পুরুষের পাশবী প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া রক্ষকের নিকট প্রত্যাগত হইত। অন্ততঃ শ্বেতকেতুর কিছুকাল পূর্ব্বে ও তাঁহার সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, নতুবা শ্বেতকেতুকে আমরা অরুণি উদ্দালকের পুত্র কেমন করিয়া বলি? যখন সমাজে এইরূপ অনর্থকর নিয়ম প্রচলিত ছিল, জাতিভেদ তখন সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। জাতিভেদের সঙ্গে বিবাহ প্রথার কতকটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বলিয়া দুইটীই যে, এক সঙ্গে সমানরূপে ও সমপরিমাণে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। জাতিভেদ-প্রথা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া অবাধে প্রচলিত হইবার পরেও অনেক সময়ে বিবাহ সংক্রান্ত অনিয়ম ঘটিয়াছিল।

উদ্দালকের সময়ে বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণকুমারগণ গুরুর প্রীতি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অনেকে গোচারণ প্রভৃতি বৈশ্যোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন বটে, কিন্তু সে সময়ে জাতিভেদ যে, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল, প্রবাহণ জৈবলির সহিত গৌতমাদি ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই সকল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। আমাদের এস্থলে তাহার আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, জাতিভেদ যেমন একটী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এবং যেমন তাহা ধীরে ধীরে

ক্রমে ক্রমে সমাজের স্তরে স্তরে স্ফুরিত হইয়া অবশেষে একটী প্রকাণ্ড সামাজিক নিয়মে পরিণত হইয়াছিল, বিবাহ-প্রথাও সেইরূপ। বহুকালব্যাপী যথেচ্ছাচারের আবিল তরঙ্গে ভাসমান থাকিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ এরূপ একটা সুব্যবস্থার অভাব অনুভব করিতেছিলেন,—যাহাতে গৃহে শান্তি বিরাজ করে, যাহার সহবাসে জীবনের উল্লাস ও উৎসাহময় যৌবন কাল অতিবাহিত হয়, যাহার সংস্পর্শে শরীরের শিরায় শিরায় অমৃতের কণা সিঞ্চিত হয়, তাহাকে আপনার করিয়া চিরকালই রাখিয়া দিতে পারে,—এরূপ ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন, শান্তির বিলাস-ক্ষেত্রে বাস করিয়া শান্তরসোপেত আহার দ্রব্যে ও উপাসনায় কাল যাপন করিয়া শান্তিপ্রিয় ভারতীয় আর্য্যগণ যে, এরূপ অশান্তির কণ্টক-শয্যায় সুখলাভ করিতেন, তাহা বলা যায় না। সুতরাং সকলের ঐকান্তিক অভিলাষ ও আগ্রহে মঙ্গলময় বিবাহ সংস্কার মুখরিত হইয়া রহিল, কালজ্ঞ মহাত্মা শ্বেতকেতু একটী মাত্র উদ্যমেই তাহাকে ফুটাইয়া তুলিলেন। স্ত্রীপুরুষ সকলেই আনন্দে বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দ-বিহ্বল ভাবে গাহিলেনঃ—

ইহৈবস্তং মা বিযৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীলন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বেগৃহে॥ *

"হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর।"

সেই অনন্ত আবেশময় মুহূর্ত্তে মঙ্গলময় অনন্তের অনন্ত ক্রোড় হইতে প্রজাপতির অনন্ত হাস্যময় পুষ্পমালা তুলিয়া লইয়া প্রেমগদ্‌গদভাবে নবোঢ়া পত্নীর শিরীষ সুকুমার কম্পমান করপল্লব ধারণ করিয়া নবীন বর বলিলেনঃ—

গৃভ্ণামিতে সৌভগত্বায় হস্তং
ময়া পত্যা জর দৃষ্টিযথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধি
র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥

"তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমারি হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও; এই প্রার্থনা করি; ভগ ও অর্য্যমা ও অতিবদান্য সবিতা এই সকল দেবতা আমার সহিত গৃহকার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।"

নববধূর পিতা মাতা বিদায়কালে আনন্দাশ্রুসিক্ত বদনে কন্যার উৎফুল্ল গণ্ড চুম্বন করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেনঃ—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূাং ভব।
ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব
সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥

"তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।" *

* ঋগ্বেদ, ১০ম ৮৫ সূ।

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত হইল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাহার কারণ।

ভার, তাপ।

(১) চতুর্দ্দিকে স্বভাবের যে সকল ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং যে সকল কারণ হইতে সেই সকল ঘটনা উৎপন্ন হয়, তাহার শিক্ষা দানই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, যাহা সামান্যতঃ সকল বস্তরই উপর কার্য্য করে ইহা কেবল সেই সকল সাধারণ কাবণ লইযাই থাকে এবং তাহাদিগের বস্তুগত বা দ্রব্যগত ভাব পরিবর্ত্তন না কবিয়াও অবস্থান্তর প্রাপিত করে।

এই সকল কারণ অল্পসংখ্যক মাত্র; ইহাদিগকে নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে; যথা ভার, তাপ, আণবিক ক্রিয়া, চুম্বক, তড়িৎ, তড়িৎ-চুম্বক, শব্দ এবং আলোক। আবার এই এক এক নামে এক এক বড় বড় বিজ্ঞান বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

এখন এই সমস্ত বিভাগকে কতক কতক দৃষ্টান্তের দ্বারা সংক্ষেপে একে একে বিবৃত করিতে চেষ্টা করি; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কত কত ঘটনা-শ্রেণী ইহার এক এক বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

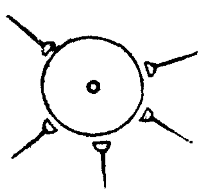
(২) ভার। যাহা সকল দ্রব্যকেই পৃথ্বীতলে নিক্ষেপ করে, সেই বলকে ভার বলে। সকল বস্তুই ভূমিতে পড়ে, যদি তাহারা বিধৃত না হয় (যদি তাহাদিগকে কেহ ধরিয়া না রাখে)। এই ঘটনাটী এমনি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী যে কেহ ভাবেও না যে ইহা কেন হয়—কেহ আপনার নিকট হইতে ইহার হিসাব চাহে না। কিন্তু যখন পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে পড়ে, যখন বৃষ্টি, তুষার শিলা মেঘের ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপতিত হয়—তাহারা কি নিজের স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা আপনাদিগকে স্থানান্তরে চালায় না। তাহারা প্রাণীও না, উদ্ভিদও না, কিন্তু অন্যান্য নিরিন্দ্রিয় পদার্থের ন্যায় জড়ত্বগুণোপেত জড়পদার্থ মাত্র; অর্থাৎ না তাহারা আপনাকে আপনি গতি দিতে পারে, না অন্যের নিকট হইতে যে গতি পায়, তাহাকে কোনরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে—না তাহাকে কমাইতে পারে, না তাহাকে বাড়াইতে [illegible]। অতএব অন্য কোন কারণ বা বল অছে, যাহার ক্রিয়াযোগে তাহারা চালিত ও পতিত হয়। জড়পদার্থমাত্র এই বলের অধীন—ইহাকে ভাব বলে। "বলেন বৈ পৃথিবীতিষ্ঠতি বলেনান্তরীক্ষং।"

যে সকল দ্রব্য বিধৃত হয়, তাহারা পড়ে না কিন্তু পতনোন্মুখ থাকে; যখন আমরা কোন বোঝা লই তখন তাহা আমরা পরীক্ষাতেই জানিতে পারি, কেননা আমরা জানিতে পারি যে নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা ঐ বোঝা বিধৃত হইতেছে।

ওলন যন্ত্রে সূতার আগায় যখন সীসক-খণ্ড ঝুলান যায়, তাহা সদাই পতনাবনত থাকে, এই জন্য তাহা সূত্রকে টানিয়া রাখে এবং সূতা যদি অশক্ত বা কমজোর হয় বা সীসা যদি অধিক ভারী হয়, তাহা হইলে সূত্র ছিঁড়িবার আশঙ্কা থাকে। ওলন যে মুখে লক্ষ্য করে ভারের মুখও সেইদিকে, কেননা ঐ ওলন যন্ত্র ততক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, যতক্ষণ না সেই বল, যাহা ওলনকে টানিতেছে, ঠিক্ সূতার লম্বতানুসারে না পড়ে, লম্বতার দিকে না উপলক্ষিত হয়। ওলনের এইরূপ অভিমুখতাকে লোকে ঐ স্থানের সম্বন্ধে সোজা বা খাড়া হইয়া উঠা কহে। স্থির জলের সম্বন্ধে উহা সর্ব্বদাই খাড়া এবং ঐজল নিজে উহার সম্বন্ধে সমঢালবর্ত্তী বা চক্রবাড়্ দিগ্‌বর্ত্তী।

পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কি উচ্চতম পর্ব্বত শিখরে, কি নিম্নতম খনির গভীরে, জলে কি স্থলে, গ্রীষ্ম প্রদেশে কি মেরুসন্নিহিত স্থানে, পৃথ্বীমণ্ডলের সকল দিকেই এই ভারক্রিয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

পৃথিবীর গোলত্বশতঃ, উহার বিভিন্ন স্থানস্থিত ওলন আপন আপন স্থানের প্রতি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেই তাহারা সকলেই পৃথিবীর মধ্যবিন্দুর প্রতি অবলোকন করে। জলের সমঢালই স্থলে প্রসারিত হইয়া পৃথিবী সমগোলঢালে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ওলন সকল যখন বিভিন্ন স্থানের প্রতি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, তাহারা পর-



স্পরের সম্বন্ধে সমান্তরাল রেখায় দাঁড়াইতে পারে না কিন্তু হেলিয়া হেলিয়া দাঁড়ায়।

যখন কোন দ্রব্য সমঢালের উপর থাকে, তখন সেই দ্রব্য তাহার আধারের প্রতি সোজা ভর দেয়, যেমন ওলনের শীসা যে সূতার উপর ঝোলে তাহাকে সোজা টানে; যখন কোনো দ্রব্য ঢালুর উপর থাকে, যেমন পর্ব্বতের গড়ান প্রদেশে, তখনও সেই ঢালুস্থানের প্রতি তাহার চাপ সোজা রূপে পড়ে। এই জন্য কোন ঠেকা বা ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিরোধিত না হইলে উহারা গড়াইতে গড়াইতে বা সরিতে সরিতে নীচে পড়িয়া যায়। এইরূপে প্রস্তর খণ্ড সকল গড়াইতে গড়াইতে উপত্যকায় পড়ে, পর্ব্বতের চেক্‌ণা মাটি যখন বৃষ্টিতে ভিজিয়া নরম হয় এবং তাহার ঘর্ষণের শক্তি কম হয় তখন তদুপরিস্থ স্তরের উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা রাশি খসিয়া পড়ে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারচাপ পর্ব্বতের উপর প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পড়িতে যে বেগ ধারণ করে সেই বেগ দ্বারা, বাড়ী গাছ পালা সাম্‌নে যাহা কিছু পড়ে, সব একেবারে চূরমার করিয়া চলিয়া যায়।

জল যখন স্রোত বহিয়া যায় তাহারও ঐ কারণ। যখন বৃহদায়তন নদী সকল আর আর নদ নদী ও বেগবান্ প্রবাহ উৎসাদি প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর স্রোতে তাহাদিগের জলকে সমুদ্রাভিমুখে বহন করিতে থাকে, তখন তাহারা ভারের আদেশকেই শিরোধার্য্য করে; এই বলই তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করে, সঞ্জীবিত করে ইহাই তাহাদিগের উপর সওয়ার হইয়া চাপিতে থাকে, কখনও বা অত্যন্ত গড়ান প্রদেশে দ্রুতবেগে, কখনও বা অল্প

গড়ান দেশে ধীরে ধীরে চালাইয়া লইয়া যায়। কি ভূমিতলে, কি বৃহদায়তন সমুদ্রমাঝারে . এমন এক ফোঁটা জল দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা এক মিনিটের জন্যও ভারের আয়ত্ত অতিক্রম করিতে পারে। এমন একটী পরমাণু নাই যাহাকে এ পরিত্যাগ করে, ইহা নিরাশ্রয় দেখিলে উহাকে পড়িতে আহ্বান করে আব যদি কিছুতে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলেও উহাকে চাপিতে থাকে।

ক্ষুদ্রের কথা দূরে থাক, পর্ব্বতেবাও নিজে পতনোন্মুখ। ভীষণ ভূমিকম্পনে আগ্নেয় গিরির প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে, পৃথিবীর যগান্তর পরিবর্ত্তনে যে সকল ক্ষণিক বলক্রিয়া পৃথিবীকে কম্পিত, চালিত ও বিদাবিত করিযা ভূমধ্য হইতে ভূধর ও কঠিন প্রস্তররাশি উর্দ্ধে আকাশমুখে প্রক্ষেপ করে, ভার চিরস্থায়ী বলরূপে অটলভাবে কার্য্য করিয়া ঐ সকল ক্ষণিক বলের উপর অবশেষে জয়লাভ করে; যেই উহাদিগের ক্ষণিক ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া গেল, ভার, যে এতক্ষণ উৎক্ষিপ্ত পদার্থের কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই, এখন অবসর পাইয়া প্রকাশ্যরূপে ও একমাত্র অধিপতি রূপে ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়মানুসারে তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এক নূতন সমতা বিধান করে।

(৩) তাপ। নানা ঘটনা দ্বারা তাপ আপনাকে প্রকাশিত করে। এক যে উষ্ণতা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য হয়; দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যের মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটায়, এই উভয়ের দ্বারাই আমরা তাপের পরিচয় পাই।

আমরা নিজেই পদার্থ বিশেষে বিভিন্ন পরিমাণে উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকি। আমরা বলি যে, এই বস্তুটী ঠাণ্ডা বা গরম, বড় ঠাণ্ডা বা বড় গরম, ঈষৎ ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম। আবার ইহাও আমরা জানি যে ঐ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধের যে কারণ, তাহা সেই দ্রব্য হইতে ভিন্ন, কেননা আমরা সহজেই সেই একই দ্রব্যকে ঐ সকল অবস্থায় লইয়া যাইতে পারি।

অতএব তাপ দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র; উহা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং জমাট হইতে পারে, তখনি ইহা গরম বা অত্যন্ত গরম বা আগুণের মতন গরম বলিয়া ব্যাখাত হয়। আবার উহা ইহা হইতে বহির্গত হইতে পারে, তখন আমরা ইহাকে কম গরম কুসুম গরম, ঠাণ্ডা, অত্যন্ত ঠাণ্ডা বিপর্য্যয় ঠাণ্ডা বলি।

বায়ুই যে কেবল এইরূপ তাপ আহরণ ও বিসর্জ্জন করিতে পারে, কখনও বা উষ্ণ কখনও বা শীতল হয়, তাহা নহে; জল বা জলীয় পদার্থেরই যে কেবল এইরূপ ভাব তাহাও নহে; যে সকল পদার্থ অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিঘাতকারী এবং বিপর্য্যয় নিরেট, যেমন লৌহ, ইস্পাৎ হীরক, ইহারাও পুনঃ পুনঃ গরম ও শীতল হয়। তাপ তাহাদিগের মধ্যে গভীর প্রবিষ্ট হয়; তাহাদিগের মধ্যবিন্দু পর্য্যন্ত তাহাদিগের উপকরণের মধ্যে ক্রমে ঘণীভূত হইতে থাকে, অবশেষে তাহা হইতে ক্রমে অপসৃত হয় এবং বাহিরে অল্পে অল্পে প্রসৃত হইয়া আবার সন্নিহিত পদার্থ সকলকে তাহাদের পালায় গরম করিয়া তোলে।

অতএব বলা যাইতে পারে যে তাপ এক প্রকার তরল পদার্থ, যখন কোন বস্তু গরম হয়, তাহাতে অনুপ্রবেশ করে এবং যখন ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইতে পলায়ন করে; আরো ইহা ভারজনক পদার্থ নয়, কারণ যখন ইহা কোনও পদার্থের মধ্যে খুব জমে, ইহা দ্বারা তাহার ভারের কোন বেশীকম তারতম্য হয় না। এই তরল (১) বস্তুকে তাপপদার্থ কহে।

তাপ হইতে নানান্ পরিমাণ ভাপ্ বাহির হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে উত্তাপ কহে। যে বস্তু যত গরম, তাহার উত্তাপ সেই পরিমাণে উষ্ণ বা অধিক; যে বস্তু যত শীতল, তাহার উত্তাপ সেই পরিমাণে কম বা নীচু।

(১) বৈজ্ঞানিকগণ তাপের বর্ণনা করিবারকালে অন্য কোন ভাল উপায় না পাইয়া ইহাকে তরল পদার্থরূপ বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে তাপ তরল পদার্থের ন্যায় গমন করে। কিন্তু তাই বলিয়া তাপকে কেহ যেন কোন জলীয় পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থ বলিয়া না ভাবেন। লেখকের তাহা উদ্দেশ্য নহে।

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা উত্তাপ পরিমাণ একরূপ মোটামুটি বুঝিতে পারি কিন্তু কতকটা পরিমাণের ইতরবিশেষ হয়; অতএব সেই ভ্রম নিরাকরণ করিয়া উত্তাপাংশ ঠিক করিয়া নিরূপণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার তাপমান যন্ত্র (১) প্রস্তুত হইয়াছে।

যে তাপমান যন্ত্র অগ্নির বা অগ্নিশিখার কি হল্কার অথবা সাধারণ্যে কোন জ্বলন্ত পদার্থের উত্তাপ পরিমাণ করে, তাহাকে তাপমান যন্ত্র না বলিয়া বহ্নিমান যন্ত্র (২) বলে। *

ক্রমশঃ—

(১) Thermometer.

(২) Pyrometer.

* একে বিজ্ঞান জিনিসটাই কঠিন, তাহার উপর আবার বঙ্গভাষায় পাঠকদিগের প্রীতিকরভাবে রচিত একখানিও বিজ্ঞান পুস্তক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক, সরল ভাষায় লিখিলে পাঠকদের কিছু প্রীতিকর হইতে পারে বিবেচনা করিয়া আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। সং

সমালোচনা।

আধুনিক বাঙ্গালা নাটক—জনা।

সাহিত্যের মধ্যে নাটক একটি প্রধান অঙ্গ। নাটকের উন্নতিতে সাহিত্যের উন্নতি। নাটকাভিনয়ে একত্র সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতির উন্নতি হয়। এই সকল কারণে নাটকের আলোচনা করা সাহিত্য-সেবীর একটী কর্ত্তব্য।

'আধুনিক নাট্য সাহিত্য' বলিতে আমরা ৺দীনবন্ধু মাইকেলের পরবর্ত্তী-কালের রচিত নাটকাদিই বুঝি; আমাদের মতে ৺ নাটুকে রামনারায়ণ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের লিখিত নাটকাদিই বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের প্রথম যুগের নাটকাদি; তৎপরে ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৺রায় দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীমনোমোহন বসু, শ্রীহরলাল রায়, ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাটক মধ্যযুগের; আর তৎপরবর্ত্তী যত গুলি নাটক হইয়াছে, সকল গুলি আধুনিক বা বর্ত্তমান যুগের নাটক। এই যুগের নাটককারগণের মধ্যে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ৺রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীঅমৃতলাল বসুই পরিচিত। ইহার মধ্যে আবার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষই নাটক-কার বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি এখনও লেখনীহস্ত; তাঁহার নাটকাদিই এখন বাঙ্গালার রঙ্গালয়গুলির প্রধান অবলম্বন বলা যায়। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নূতন নাটক 'জনা' এখনও মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে, সাহিত্য সেবীদিগেরও হাতে আসিতেছে এখনও প্রত্যহ শত শত দর্শক ইহার অভিনয় দেখিতে যাইতেছে; অতএব আমরা এই খানিই প্রথম আলোচ্য বলিয়া স্থির করিয়াছি।

নাটক খানির নাম হইয়াছে 'জনা'। 'জনা' পৌরাণিক ভিত্তির উপর গঠিত। জৈমিনি ভারতে ইহার ভিত্তিভাগ দৃষ্ট হয়। ব্যাসের মহাভারতে জনার কথা কিছুই নাই; সুতরাং বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদে, কি কালীসিংহের অনুবাদেও জনার কথা নাই। ৺ কাশীরাম দাস জৈমিনি ভারতের গল্পগুলি সমস্ত নিজ কাব্যের অশ্বমেধপর্ব্বে স্থান দিয়াছেন; সুতরাং কাশীদাসি মহাভারত কাব্যে জনার গল্প আছে; কিন্তু কাশীদাস সম্ভবতঃ জৈমিনি ভারত দেখিয়া গল্পগুলি সংগ্রহ করেন নাই; এজন্য তাঁহার জনা উপাখ্যানের সহিত জৈমিনির গল্পের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। গিরিশ বাবু যে ভাবে গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আবার কাশীদাসের সহিতও মিলে না। তিনটি গল্প একত্র পড়িলে বোধ হয়, গিরিশ বাবু কেবল পৌরাণিক নাম কয়টি লইয়া নূতন একটি গল্প রচনা করিয়াছেন।

গিরিশ বাবুর গল্পটি এইরূপ;—রাজা নীলধ্বজ মাহিষ্মতীর রাজা, জনা তাঁহার মহিষী; প্রবীর ও স্বাহা তাঁহাদের পুত্র কন্যা। জনা নিজে গঙ্গার বরপুত্রী এবং তিনি গঙ্গার বরে প্রবীরকে পুত্ররূপে

পাইয়াছেন। প্রবীর আবার শাপভ্রষ্ট শিবানুচর। প্রবীর অতি মাতৃভক্ত; সে মাতৃদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা জানে না, প্রতিদিন সর্ব্বাগ্রে মাতাকে প্রণাম করে, তৎপরে অন্য কর্ম্মে লিপ্ত হয়। প্রবীর হয় ত একদিন খাদ্য গ্রহণ ভুলিতে পারে কিন্তু মাতৃনাম স্মরণ করিতে ও মাতৃপূজা করিতে ভুলিতে পারে না। তাহার বিশ্বাস যে, সে মাতৃ পদধূলি লইয়া রণে নামিলে দেবতাও তাহার নিকট পরাস্ত হন। এ হেন প্রবীর পথে বেড়াইতেছিলেন, সর্ব্ব-সুলক্ষণ ঘোড়া দেখিয়া তাঁহার পত্নীর কথা মনে পড়িল, তিনি ঘোড়া ধরিতে গেলেন; ঘোড়া ধরিলেন। দেখিলেন, তাহা পাণ্ডবদের ঘোড়া। স্ত্রী মদনমুঞ্জরী ঘোড়ার বিবরণ শুনিয়া পাণ্ডবকে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। প্রবীর বীরত্ব করিয়া ঘোড়া ধরিয়াছেন, কাজেই ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন না। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল, রাজা জামাতারূপী অগ্নির পরামর্শে ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। প্রবীর পিতৃ বাক্য অমান্য করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু ঘোড়া ফিরাইয়া দিয়া অপমান সহ্য করিতেও অনিচ্ছুক সুতরাং অভিমানে জনাকে বলিলেন, ঘোড়া দিয়া আমি বনে যাইব। জনা বুঝাইলেন, শেষে পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে নিষেধ করিলেন ও যুদ্ধ করাই স্থির হইল। রাজা যুদ্ধে রাজী নহেন। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিও ভয় পাইলেন। জনা রাজাকে যুদ্ধ করিবার জন্য জেদ করিল। বলিল, তোমার "এক গোটা পদাতিক" আমি চাহিনা, শুধু "আজ্ঞা দেহ, তনয়ে করিব রথী, সারথী হইব, নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ রণে।" রাণীর জেদে যুদ্ধ হইল, কিন্তু মাতৃভক্ত প্রবীরকে মারিবার জন্য হরি হরে যুক্তি কৌশল হইল, ভগবতীর নায়িকা, শিবের ত্রিশূল, মদন ও রতি সকলে মিলিয়া হীন উপায়ে নির্দ্দোষ মাতৃভক্ত মহাবীর প্রবীর বধার্থ প্রেরিত হইল, ব্রতকাণ্ডে প্রবীর মরিল। পতি বিয়োগে মদনমুঞ্জরী দুচারিটা ছড়া কাটা-ইয়া মারা মড়িল জনা পাগলিনী হইয়া বনে বনে "প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা" বলিয়া বৃথা ঘুরিল, রাজা বাধা দিলেন না। জনার ভ্রাতা উলুক বনে ভগ্নীকে বুঝাইল কিন্তু জনা প্রতিহিংসা ভিন্ন কিছু বুঝিল না,—শেষে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। গঙ্গা বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জ্জুনের মৃত্যু হইবে বলিয়া শাপ দিলেন। প্রবীর ও তৎপত্নী মরিয়া কৈলাসে গেলেন এবং জনা গঙ্গার সহচরী হইলেন।

কাশীদাসের গল্পটির সহিত গিরিশ বাবুর প্রভেদ এই;—প্রবীর শাপভ্রষ্ট শিবানুচর বা ওরূপ দৃঢ় মাতৃভক্ত নহে বরং

"প্রবীর নামে তার প্রধান তনয়"
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম্মভয়।"

কিন্তু বীর, বীরোচিত কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ নহে। জনাও গঙ্গার বরপুত্রী নহে। জনা প্রবীরের জন্য যুদ্ধ করিতে রাজার সহিত তর্ক করে নাই। রাজা প্রথম হইতে যুদ্ধে বিরত নহেন; অগ্নিও প্রথমে যুদ্ধক্ষান্তিরূপ অক্ষত্রিয়োচিত উপ-দেশ দেন নাই। প্রবীর মরিলে জনা রাজাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে। যখন রাজা শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করেন, তখন জনাকে তিরস্কার করেন। জনা তিরস্কারে ও পুত্রশোকে পীড়িতা হইয়া

াঙ্গায় মরিতে কৃতসংকল্প হয়। স্বামী অর্জ্জুনের সহিত প্রস্থান করিলে জনা াঙ্গার উদ্দেশে গমন করে, পথে ভ্রাতৃ-সাহায্যে অর্জ্জুনকে নষ্ট করিয়া পুত্রহত্যা ও পতির পরাজয়ের শোধ দিবে বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করে। উলুক অসম্মত হইয়া তাহাকে পতিগৃহ ত্যাগের জন্ম বহু তিরস্কার করে। জনা ক্ষোভে অভি-মানে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়, 'প্রতিহিংসা' প্রতিহিংসা' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বনে বনে ঘুরে নাই। প্রবীর সম্মুখযুদ্ধে প্রথম দিনেই মরে। তাহার মরিবার জন্য উপায় স্থির করিতে কৃষ্ণকে আসিতে হয় নাই—শিব, নন্দী, মদন, রতি, নায়িকা প্রভৃতিকে বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হইতে হয় নাই।

জৈমিনি ভারতের গল্পটি সম্পূর্ণ নূতন। তাহাতে জনা নাম নাই, তাহাতে নীলধ্বজ মহিষীর নাম জ্বালা। তাহাতেও প্রবীরের মৃত্যু কাশীরাম দাসের বর্ণনার অনুরূপ। জ্বালা যুদ্ধ আরম্ভ করিতে চাহে নাই, পাগল হয় নাই, বনে বেড়ায় নাই, সে নীলধ্বজকে পুত্রহন্তার প্রাণ নাশার্থ ক্ষত্রিয়া রমণীর ন্যায় সদ্‌যুক্তি দিয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল। শেষে নীলধ্বজ প্রতিবারই হারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া জ্বালাকে অপরিণামদর্শিনী ও স্বজন নাশিনী বলিয়া তিরস্কার করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। জ্বালা অভিমানে ভ্রাতৃগৃহে গমন করিয়া স্বামীর অবমান-নাকারী ও স্বজনঘাতী অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য ভ্রাতাকে উত্তেজিত করিল কিন্তু তাহার ভ্রাতা উল্মুক (কাশীদাস বা গিরীশ বাবুর কথিত উলুক বা উলূক নহে) তাহাতে স্বীকার না করায় সে স্বরাজ্যে ফিরিল। পথে গঙ্গা পার হইবার সময় গঙ্গাকে পুত্রঘাতিনী জানিয়া আপনাকে গঙ্গাস্পর্শে অপবিত্র জ্ঞান করিল ও গঙ্গা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল তুমি স্বহস্তে ভীষ্মের সাতটি অগ্রজকে বিনাশ করিয়াছ আর অর্জ্জুন ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে; সুতরাং তোমার এই জল স্পর্শ করিয়া আমিও পাপিনী হইলাম। গঙ্গা ভীষ্মহন্তাকে শাপ দিলেন। জ্বালা তখন হৃষ্টা হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিয়া বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে প্রবেশ করিল। *

গল্পের পার্থক্য এই। তারপর নাটকের কথা। গিরিশ বাবু নাটকখানিতে প্রথম দৃশ্যে অগ্নিকে কল্পতরুরূপ দাঁড় করাইয়া নীলধ্বজ পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিকে অভীষ্ট বর দেওয়াইয়াছেন।

রাজা বর চাহিলেন—

"যেন নটবর নবঘনকায়
বাঁশরী বয়ান, ত্রিভঙ্গিম ঠাম
নররূপী নারায়ণে পাই দরশন।"

জনা বর চাহিল,—

"যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে ত্যজি প্রাণবায়ু
ভাগীরথী পদে মতি রহে চির দিন।"
অগ্নি তাহাই দিলেন।

প্রবীর চাহিল,—

"বর যদি দিবে বৈশ্বানর
ভুবন বিজয়ী দেহ মোরে অরি,

* জৈমিনি লিখিত জ্বালা নাম হইতে কাশীদাস বোধ হয় জনা নাম কল্পিত করিয়া লন নাই। তিনি জ্বালাই রাখিয়াছিলেন; শেষে লিপিকর প্রসাদে জ্বালা' স্থানে জালা, জনা, জনা হইয়া পড়িয়াছে। আরও এক কথা, অনেকে লিখিবার সময় "ন'এর নিম্নে বিন্দু দিয়া 'ল' লেখেন। যে কেহ হয়ত সেই বিন্দুটির অনুলিপি করিতে ভুলিয়া গিয়া এতটা অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন।

মরি কিম্বা মারি
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর।"

অগ্নিও বলিলেন—

"শীঘ্র তব পুরিবে কামনা।"

এই স্থানে আমরা একটি কথা বলিব দেবতা বা বীরের মুখ দিয়া বর প্রার্থনা, বর দান, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি করাইতে হইলে গ্রন্থকারকে অতি সতর্কতার সহিত শব্দ চয়ন করিতে হয়; দেববাক্য বা বীরের প্রতিজ্ঞা কখন মিথ্যা হইবার নহে। যদি গ্রন্থকারের অসাবধানতায় দেববাক্য বা বীর প্রতিজ্ঞার কোন অংশ পরিপূরণে ব্যাঘাত জন্মে, তাহা হইলে বড়ই অন্যায় হয়, হিন্দু নীতি বিগর্হিত কার্য্য হইয়া পড়ে। প্রবীরের প্রার্থনার প্রত্যেক কথা অগ্নির বরে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত; ইতঃপর আমরা দেখিব যে, অগ্নি প্রবীরকে ও জনাকে যে বর দিলেন, তাহার অধিকাংশ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; গিরিশ বাবুর অসতর্কতায় দেবতা অগ্নি মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িলেন। রাজার ভাগ্যেও সেই নটবর ত্রিভঙ্গিম ঠাম বাশরী বয়ান নররূপী নারায়ণ দর্শন পুস্তকে নাই। অথচ এই গুলিই নাটকের মূলসূত্র।

তার পর স্বাহা প্রার্থনা করিলেন—

"তব পদ বিনা প্রভু নাহি অন্য সাধ
পতি মাত্র গতি অবলার
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।"

স্বাহার বর প্রার্থনায় অগ্নি যে কথাগুলি বলিয়া বর দিলেন, তাহার মধ্যে 'তথাস্তু' বোধক কথা একটুও নাই। লক্ষ্মীশাপে পৃথিবী কেন শাপভ্রষ্টা হইয়া স্বাহারূপে জন্মিয়াছেন," কেবল তাহারই ব্যাখ্যা আছে। বরার্থী মণ্ডলীর মধ্যে কল্পতরু স্বামীর সহিত এইরূপ একটা 'হ য ব র ল' দেওয়া নেওয়া হইয়া গেল।

তার পর অগ্নি অন্যান্য লোককে বর দিবার ভার নারায়ণের উপর দিয়া সঙ্গোপনে ধ্যানে রহিবেন বলিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। সকলে চলিয়া গেলেন; রহিলেন কেবল বিদূষক। এই বিদূষকটি গিরিশ বাবুর কল্পনাপ্রসূত জীব। তাহার বিশ্বাস যে, জীব যদি সারা জীবনের মধ্যে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করে, তবেই সে মুক্ত হয়। আর যদি কেহ বার বার হরিনাম করে তবে হরি দেখা দেন এবং সে দর্শন মাত্রই চতুর্ভূজ হইয়া বৈকুণ্ঠে যায়। এই বিশ্বাসে সে তাহার প্রিয়জনকে বিশেষতঃ রাজাকে বারবার হরিনাম করিতে দিতে নারাজ। যাহাতে রাজার হরিনাম কীর্ত্তনস্পৃহা শান্ত থাকে, তজ্জন্য সে প্রকারান্তরে হরির দোষোদ্ঘোষণ করে, সে প্রতি কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, "যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘসে।"—লোকটা মুখে ও ভাবে হরিদ্বেষ প্রচার করে বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে দৃঢ় কৃষ্ণভক্ত ও রাজাকে রাজ্যে কিছু অধিক দিন প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সে ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। মনোভাব গোপন করিয়া বিদূষককে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে হয় বলিয়া গিরীশ বাবু তাহার মুখে ব্যজস্তুতিবৎ এক প্রকার আলঙ্কারিক ভাষা দিয়াছেন। এইরূপ ভাষা নির্ব্বাচন করায় বাস্তবিক তাঁহার গুণপণা বুঝা যায়; কিন্তু তিনি এই ভাষাটি এক প্রকার মিত্রাক্ষর পদ্য ছন্দে গাঁথিয়াছেন তাহাতে বড় সুবিধা হয় নাই।

রাজরাণী, রাজকুমার, রাজকুমারী চলিয়া গেলে অগ্নি বিদূষককে বলিলেন, "কি হে তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে ?

বিদূ। তোমার ভাব বুঝ্‌চি।

অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না ?

বিদূ। আজ দেখ্‌ছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরিনিয়ে ছড়াছড়ি, তাই হচ্চে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে পদাশ্রয়, সেখানে সর্ব্বনাশ হয়, একথা নিশ্চয়।

অগ্নি। দূর মূর্খ।

বিদূ। আর কাজ কি দেব্‌তা—তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সট্‌কাচ্ছ।"

এই ভাবের তর্ক,—বিদূষকের বর প্রার্থনা করা আর ঘটিল না। শেষে অগ্নি বলিলেন, আরে ছি ছি তুই কৃষ্ণ নিন্দা কচ্ছিস্‌।"

বিদূষক আরও কতকটা নিন্দা করিবার পর বলিল—"আমায় যদি বর দাও তো শোন, যদি সট্‌কাতে চাওতো সট্‌কাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও ; যদি হরিগুণ গাও, তোমার গায়ে জল ঢেলে দেব। ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে আর রাজ্যটা ছারেখারে দেবে!"

বিদূষক কি চাহে তাহা বুঝি না ?—অগ্নিকে বলিল, যদি যেতে চাওতো যাও আর স্বাহাকে নিয়ে যাও ইহার অর্থ কি ? পূর্ব্বে বিদূষক ভাবে বুঝিযাছে, অগ্নি এবার মাহিষ্মতী পুরী ত্যাগ করিবেন, অতএব তাহার প্রার্থনীয় কি হইতে পারে ?—আমাদের অনুমান যে, বিদূষক বলিতে চাহিয়াছে যে 'যদি যেতে হয় তবে আর বিলম্ব কেন ? শীঘ্র শীঘ্র 'দুর্গা শ্রীহরি' বলে প্রস্থান কর।' যাহা হউক বিদূষকের যেমন প্রার্থনা, অগ্নিও তেমনি উত্তর দিলেন—"তুমি জ্ঞানী তোমার মুখে একথা সাজে না।" এ উত্তর পড়িলে বোধ হয়, অগ্নি দেবের ভয় হইয়াছে, পাছে বিদূষক সত্য সত্য গায়ে জল ঢালিয়া দেয়! নতুবা যাহাকে পলকমাত্র পূর্ব্বে অপভাষায় সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণনিন্দুক বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহাকেই আবার পলকপরে 'তুমি', 'জ্ঞানী' ইত্যাদি বাক্য বলিলেন কি জন্য ? উক্ত কথাটিতে বিদূষকের জ্ঞানের পরিচয় কি পাইলেন ? আর এই জল ঢালিয়া দিবার কথাটা কি একটা রসিকতা হইয়াছে না কি ?—এ বিকট রসিকতা কেন ?

বিদূষকের আর এক স্থানে একটি কথা আছে—

"তোমার দেবলোক উদ্ধার হয়ে যাক্‌! হুতাশন নির্ব্বাণ হয়ে পরম শান্তি লাভ কর।" এই চরণটি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর ভাবপূর্ণ! ইহাতে 'উদ্ধার' কথাটির সহিত 'নির্ব্বাণ' কথাটির বড় সুন্দর ভাবগত মিল আছে।

ইহার পর বিদূষক বলিল—"রাজার প্রতি তোমার বড় মমতা ও আমার অন্নদাতা বাপ্‌! কৃষ্ণভক্তি দিতে হয় শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না। তা নইলে তোমায় সাফ্‌ বল্‌চি, আমি বামুনের ছেলে হোম করতে তোমার আবাহন করে ঘির বদলে জল ঢেলে দেব।"—ইহাকে বরং বর প্রার্থনা বলা যায় কিন্তু অগ্নি 'তথাস্তু' বলিতে পারিলেন না ; কারণ রাজাকে ইতিপূর্ব্বে অচিরে হরিদর্শনের বর দিয়া চুকিয়াছেন। জল ঢালিব বলিয়া সেই পুরাণ রসিকতা আর কেন ?

তার পর বিদূষক কথার ছলে তাহার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলায় অগ্নি ইংরাজী হিসাবে Thanks দিয়া বলিলেন—

"ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম।
হরি ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে।
এক নামে মুক্তি পায় নরে
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে
এ ভব সাগর সামান্য গোষ্পদ তার।"

"এক নামে মুক্তি পায় নরে"—গিরিশ বাবু ইহা দ্বারাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে,—'সারা' জীবনের মধ্যে একদিন একবারমাত্র 'হরি' এই নামটি উচ্চারণ করিলেই নরে মুক্তি পায়; কিন্তু ভাষার নিয়মানুসারে কিরূপে সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝি না।

তাহার পর বিদূষক বলাইয়া লইল—"তুমি নিশ্চিন্ত হও রাজার কোন ভয় নাই।" অথচ প্রবীর পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা ঘটিল, প্রবীর মারা পড়িল, পত্নী উন্মাদিনী হইল। রাজা যুদ্ধে মরিল না বলিয়াই যদি অগ্নির কথা বজায় রাখিতে হয়, রাজার কোন ভয় নাই, আমরা নাচার। তাহার পর উভয়ে চলিয়া গেল প্রথম দৃশ্য শেষ হইল।

বিদূষকের ভাষা এই দৃশ্যে যেরূপ বরাবর মিত্রাক্ষর পদ্যচ্ছন্দে লিখিত, আর কোন দৃশ্যে সেরূপ নাই; দুই চারিটা কথা কোথাও কোথাও আছে বটে।

তাহার পর দ্বিতীয় দৃশ্য—উদ্যানে মদনমুঞ্জরী ও সখীগণ। প্রবীর অনেকক্ষণ কাছছাড়া; কাজেই বীরপত্নী প্রেমিকা মদনমুঞ্জরী বিরহে ছট্‌ফট্ করিতেছেন, সখিরা নাচিতেছে গাহিতেছে:—

"প্রাণ কেমন কেমন করে সজনি!
কেন এল না গুণমণি।

এত নাচ গানের মধ্যে প্রাণ কেমন কেমন করিতেছে ন্যকারের উদ্রেক বোধে জ্বর না কোন অব্যক্ত পীড়া?

যাহা হউক, গানটা শুনিয়া মদনমুঞ্জরী কিছুই বলিল না সেদিকে কানও দিল না; কেবল বলিল আজ আমার কিছু ভাল লাগছে না * * * তিনি কেন এখনও এলেন না?" তার পর বসন্তকুমারী নামে এক সখি পরকীয়া প্রেমে বঁধু অপর স্থানে আবদ্ধ, এইভাবে রসাভাষ আরম্ভ করিলে বিরহিণীর বিরহ মাথায় চড়িয়া গেল; তখন স্বামীর অদর্শনজনিত কষ্ট ভুলিয়া বলিল,—

"সই!
পরিহাস কর পরিহার।
কে জানে লো, কেন কাঁদে প্রাণ,
যেন হৃদাগার শূন্য মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি।
কেন লো নাজানি, গুণমণি এখনো এলোনা
নহে সখি প্রেমের প্রলাপ,
ছার প্রেম, ক্ষার দিই তায়,
প্রাণ নাথ থাকুন কুশলে
নাহি চাই ভালবাসা মিষ্ট সম্ভাষণ
নাহি চাই দরশন তাঁর।
প্রাণপতি আছেন কুশলে
যদি কেহ বলে
যাই চলে নিবিড় অরণ্য মাঝে।
সই নহি আর প্রয়াসী তাঁহার
কেন হৃদিপদ্মে উঠে হাহাকার!
যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে
সিন্দুর মলিন যেন শিরে।"

অবশ্য আমরা জানি প্রবীর পত্নী পতিব্রতা হিন্দু রমণী; কিন্তু এই আক্ষেপের মধ্যে সতী হিন্দু রমণী কি বলেন দেখ—

১। "ছার" প্রেম, ক্ষার দিই তায়।"

পতিপ্রেমে সতী রমণী ক্ষার দিতেছেন।

২। "নাহি চাই দরশন তাঁর—

*   *   *   *

যাই চলে নিবিড় অরণ্য মাঝে।"

সতী রমণী পতির ভালবাসা, মিষ্ট সম্ভাষণ, এমন কি পতি দর্শনটি পর্য্যন্ত চাহেন না; কেন না, তাহাতে যদিই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় তা হলে লোকে বলিবে যে, মদনমুঞ্জরীর স্বামীভক্তি স্বার্থে ভরা—কাজেই প্রবীর পত্নী সে শিক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে তিনি পতির কুশল সংবাদ শ্রবণাভিলাষিণী; কিন্তু সে সংবাদ শুনিয়া তিনি গৃহে থাকিতে প্রস্তুত নহেন, নিবিড় অরণ্য মাঝে চলিয়া যাইবেন। সতী স্ত্রীর এসুন্দর ছবি দেখিতে বাঙ্গালী কাব্যামোদী বোধ হয়, কেহ চাহেন না।

৩। "সই, নহি আর প্রয়াসী তাঁহার।" এইখানে চিত্রটির প্রস্ফূরণ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সতী স্ত্রী আর স্বামী প্রয়াসী নহেন! গিরিশ বাবু কিরূপে এই সকল বিসদৃশ পংক্তি গুলি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

আর যদি কেহ গিরিশ বাবুকে সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ বলেন যে, মদনমুঞ্জরী পতিপ্রেমে ক্ষার দিতে চাহে নাই, যে প্রেমে প্রলাপ উঠে, সেই প্রেমে ক্ষার দিতে চাহিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা হিন্দু স্ত্রীর পতিপ্রেমটুকু কিরূপ তাহা বুঝিয়া দেখিতে বলি। হিন্দু স্ত্রী বলে, "তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি হে" সুতরাং সে একমাত্র সর্ব্বস্বের জন্য কি আকুল হইবে না? তাহার কথা, তাহার প্রেমের কথা, না ভাবিলে না কহিলে তাহার অবলম্বন কি? নিঃস্বার্থ প্রেমিকা প্রতিদান আশা করে না বটে, কিন্তু সে প্রেমশূন্যা হইতে পারে না! প্রেমের প্রলাপ অর্থ কি? প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার আকুলতা প্রকাশ! এই "প্রেমিকের জন্য" কি? প্রেমিককে দেখিবার, পাইবার বা তদ্রূপ কোন তৃপ্তিকর কার্য্যের জন্য ত? তাহা হইলে প্রেমের প্রলাপ প্রেমিক প্রেমিকার সহজ গুণ; ইহা বাদ দিলে প্রেমের ভাব কি যে বর্ত্তমান থাকে জানি না? তার পর যদি কেহ বলেন, মদনমুঞ্জরীর যেরূপ নিস্বার্থ ভালবাসা, তাহাতে নাথের কুশল শুনিলেই সে তৃপ্তা হইতে পারে; পতিপ্রেম, পতিসম্ভাষণ, পতি দর্শন এবং পতি পর্য্যন্ত তাহার আবশ্যক নাই, সে কেবল পতির কুশল সংবাদের ভিখারিণী, সে সেইটুকু পাইলেই সমস্ত স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারে, কিন্তু কথা হইতেছে যে মদনমুঞ্জরী এরূপ সন্ন্যাসিনী প্রেমিকা কি না? বঙ্কিম বাবুর প্রফুল্লও এই প্রেম অভ্যাস করিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। একটা আকাঙ্ক্ষা তাহা হইতে আর পাঁচটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে কাজেই প্রফুল্ল বজরায় ব্রজেশ্বরের নিকট দেখা করিতে গিয়াছিল, তাই ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু নিশির কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না, তাহার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একজন তাই সে এইরূপ প্রেমে আজীবন ডুবিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। আমাদের মতে যে সহধর্ম্মিণী, পতিব্রতা পত্নী, সে পতিদর্শন আশা পতির আশা কোন মতে ত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারে না। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা ও কলহান্তরিতা নায়িকা মুখে ঐরূপ

ভাব প্রকাশ করে বটে কিন্তু হৃদয়ে তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান থাকে। এতদ্ভিন্ন মদনমুঞ্জরী এই স্থানের প্রথমে এবং প্রতিবার কথোপকথনের মধ্যে "প্রাণনাথ এখন এলনা, বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন; ইহা দ্বারা কি প্রকাশ পায় না যে, পতি দর্শনাশা তাঁহাব শিবায় শিবায় গ্রথিত? পূর্ব্বোক্ত তর্ককারীরা হয়ত বলিবেন যে, অনেকক্ষণ কুশল সংবাদ না পাওয়াতেই মদনমুঞ্জরী ভাবিতেছেন যে যদি প্রাণনাথ ভাল থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আসিতেন কারণ এতক্ষণ দূরে থাকা তাঁর স্বভাব নহে, বোধ হয় কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাই তিনি আসিতেছেন না। অতএব কেন তিনি এখন আসিতেছেন না ইহা জানিবার আগ্রহ বশতঃ ঐ কথাগুলি তাঁহাব মুখে বাহির হইয়াছে। ইহা হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসার নিয়মই এই যে, যাহাব সম্বন্ধে অমঙ্গল আশঙ্কা হয় তাহাকে যতক্ষণ স্বচক্ষে না দেখা যায় ততক্ষণ কোন মতে শান্তিলাভ করা যায় না ইহা মানসিক ধর্ম্ম, চিন্তার ধর্ম্ম, ভাবগত-ধর্ম্ম, ইহা ত্যাগের উপায় নাই। যে মায়া ত্যাগী তাহার কথা স্বতন্ত্র, নতুবা মাতার হৃদয়ে পুত্রের জন্য ও পত্নীর হৃদয়ে স্বামীর জন্য এ ভাব হইবেই হইবে এই ভাব দমনের উপায় নাই, এই ভাব দমন করিতে হইলে মায়া মমতা ভালবাসা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং মদনমুঞ্জরী মুখে যতই বলুন যে আমি স্বামীর মুখ দেখিতে চাহি না, তিনি যখন স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদিতেছেন তখন তাঁহার স্বামী দর্শন স্পৃহা অতি বলবতী ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার পর "যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে" "যেন শিরে সিন্দুব মলিন"—ইহার অর্থ কি? ভবিষ্যতে যদি বাস্তবিক অশুভ ঘটে, তবে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ বাস্তবিকই কতকগুলি দুর্লক্ষণ দেখা যায়। আপনার মাথার সিন্দুর যেন মলিন দেখা অপূর্ব্ব বর্ণনা! তার পর 'হৃদিপদ্ম' কথা হয় না হৃৎপদ্ম হইবে। আর পদ্মে হাহাকার উঠে কিরূপ তাহা জানি না। হৃদয়ের সহিত পদ্মের উপমা রহিল কিন্তু হাহাকারের সহিত পদ্ম মধ্যস্থ কিসের উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহা কিছুই প্রকাশিত নাই।

তার পর প্রবীর আসিলেন। পত্নী জিজ্ঞাসা কবিল।

"তুমি পাশে, তবু কেন হতাশে পরাণ কাঁদে,
বল বল কি হল আমাব।"

প্রবীর উত্তব দিলেন,—

"বিলম্ব কি হেতু মম শুনলো প্রেয়সী।"

"ধান ভানিতে শিবের গীত" বোধ হয় ইহাকেই বলে। যাহা হউক প্রবীর বিলম্বের কারণ বলিল,—

বাজ পথে কবিতে ভ্রমণ
সর্ব্ব সুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে।
তখনি অমনি তোমাবে পড়িল মনে।
মনোহব বাজী,
নেচে চলে ফুল হারে সাজি।"
সাধ হ'লো ধরে, আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে
হাওয়ায় হারায় বলবান হয়,
ছুটিলাম পাছে পাছে তার
শ্রম জল ঝরে অনিবার
তবু পাছে ধাই তার
পাছে করি বহু বনরাজী
ধরিলাম বাজী
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

প্রবীর গঙ্গার বরপুত্র, প্রবীর শাপভ্রষ্ট শিবানুচর, প্রবীর মাতৃভক্ত সুতরাং কর্ত্তব্য জ্ঞানবিশিষ্ট, শেষ কথা প্রবীর ধীর রাজপুত্র ;—এহেন প্রবীর পথে বেড়াইতে বেড়াইতে ঘোড়াটা দেখিল দেখিয়া লোভ পরতন্ত্র হইল, স্ত্রীকে দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চাহিল, অমনি নিজের পদমর্য্যাদা ভুলিল, কর্ত্তব্য জ্ঞান ভুলিল, ঘোড়া ধরিতে ছুটিল ; ঘোড়াও ছুটে, প্রবীরও ছুটে, শেষে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিতে ছুটিতে অনেকগুলা বন জঙ্গল পার হইয়া ঘোড়াটাকে ধরিয়া একবারে স্ত্রীর কাছে উপস্থিত !—প্রবীরের ও চিত্র বড় বিসদৃশ লাগিল। রাজপুত্র যখন পথে বেড়াইতেছে, তখন তাহার সঙ্গে অনুচর কি কেহ ছিল না, যে তাহাকে ঘোড়া ধরিতে আদেশ দিতে পারে? তার পর ঘোড়াও ছুটিতেছে আর গলদ্‌ঘর্ম্ম রাজপুত্রও ছুটিতেছে। এই বা কি কথা? তারপর "বাজী" শব্দের সহিত পদ্যের চরণ মিলাইবার জন্য প্রবীরকে "বনরাজী" অতিক্রম করিতে হইয়াছে নতুবা রাজধানীর নিকট বনরাজী কোথা পাইল?

কাশীদাস এই স্থানে কি করিয়াছেন দেখা যাউক ;—

"প্রবীর নামেতে তাঁর প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম্ম ভয়॥
যুবতী লইয়া সেই কেলী করে জলে।
নানা রঙ্গ ভঙ্গি ক্রীড়া করে কুতুহলে॥
হেনকালে পার্থ অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীর বনিতা তাহা পাইল দেখিতে॥
মদন মুঞ্জরী নামে প্রধানাবনিতা।
যোড় হাতে স্বামী আগে কহে কথা॥
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন॥
সোণার নূপুর বাজে অশ্বের চরণে।
ভুলিল আমার মন অশ্ব দরশনে॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর।
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ॥

কাশীদাস নিজ প্রবীরকে ধর্ম্ম-ভয়-হীন রমণীপ্রিয় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রবীর, পত্নীর মৃত্যুপণ শুনিয়া বিবেচনা-শূন্য হইয়া যে ঘোড়া ধরিলেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। তারপর ঘোড়াকে কেলিকাননে প্রবেশ করাইয়া কাশীদাস রাজপুত্রকে ভৃত্য-বর্গকে অশ্বধারণে আদেশ দান, বহু বনবাজী এড়াইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড়ান হইতে কেমন কৌশলে বাঁচাইয়াছেন। তারপর কাশীদাসের রমণীপ্রিয় প্রবীর ধর্ম্মভয় হীন হইলেও গিরীশ বাবুর প্রবীরের ন্যায় স্ত্রীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী নহেন। কাশীদাসের ধর্ম্মভয় হীন প্রবীর প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী বুদ্ধিতে পড়িয়া মৃত্যুপণ শুনিয়া ঘোড়া ধরিলেন আর গিরীশ বাবুর ধর্ম্মরত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মাতৃভক্ত প্রবীর নিজের অদম্যলোভ ও স্ত্রীর প্রীতিলাভ লোভে পড়িয়া ঘোড়া ধরিলেন! এই সকল দেখিয়া আমরা গিরীশ বাবুর চরিত্র চিত্রণের বিসদৃশতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে গিরীশ বাবু প্রবীর চিত্রে ইচ্ছা করিয়াই রাশীকৃত কলঙ্ক মাখাইয়া দিয়াছেন।

তারপর মদন মুঞ্জরী প্রবীরকে পাণ্ডবের সহিত বিবাদ করিতে নানামতে নিষেধ করিলেন কিন্তু প্রবীর কিছুতেই শুনিল না, বলিল :—

"হেন হেয় পতি সাধ কিরে তোর?
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া
প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে!
সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি
নাহি ডরি নারায়ণে।"

এই কয়টি কথা বীর প্রবীরের উপযুক্ত! এই আদর্শে যদি প্রবীর গোড়া হইতে চিত্রিত হইত তাহা হইলে প্রবীর শতগুণ ফুটিয়া উঠিত।

তাহার পর প্রবীরের কথা কয়টি অতি সুন্দর।

"নিজ কর্ম্ম করিলে সাধন
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু তিনি হন অবতার
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর;
*　　*　　*
পিতৃ সন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচার।

এই কয় চরণ ভক্ত, বিশ্বাসী, ধীর, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রবীরের উপযুক্ত হইয়াছে! এগুলি দেখিয়া বোধ হয় গিরীশ বাবু ক্ষমতাসত্ত্বে অবহেলা করিয়া তাঁহার প্রবীর চিত্র ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

তারপর তৃতীয় দৃশ্য—অর্জ্জুন শিবির। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় ছিলেন,

"শূলী সম বলী রথী,
সমরে তাহার নাহিক নিস্তার কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞ বিঘ্ন হয়!"

কাযেই, অর্জ্জুন শিবিরে দেখা দিলেন। অর্জ্জুণ চমকিত, জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিলেন। অর্জ্জুনের যে ঘোড়া চুরী গিয়াছে তাহার সংবাদ তিনি এখনও পান নাই শ্রীকৃষ্ণই প্রথম সংবাদ দিলেন যথা,—

"শুন সখা, যে হেতু এসেছি হেথা আজ,
নীলধ্বজ রাজার তনয়
ধরেছে যজ্ঞের বাজী"

অর্জ্জুন কলিকাতার পাহারাওয়ালার ন্যায় সার্ষপনিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন নাকি? অর্জ্জুন শেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্ম নিবেদন করিয়া সকল ভার তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহার সহিত কলের পুতুলের মত শিবালয়ে চলিলেন। শিবালয়ে যাইবার কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

শিব বরে বলী বীর প্রবীর কুমার
শিব পূজা বিনা কার্য্য না হবে উদ্ধার।

তারপর চতুর্থ দৃশ্য—জনার কক্ষ। জনার নিকট প্রবীর জানাইতেছেন যে তিনি রাজাকে অশ্ব বৃত্তান্ত বলায় রাজা অশ্ব ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছেন। প্রবীর পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না অথচ বীরদর্পে পরাজয় মানিতেও প্রস্তুত নহেন তাই মার নিকট বলিলেন,—

দাও মাগো সন্তানে বিদায়!
চলে যাই লোকালয় ত্যজি,
ক্ষত্রিয় সন্তান অপমান কেন সব?
*　　*　　*
বীরদন্তে অশ্বভালে করেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয় নন্দন
পরাজয় মানি লব?
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব?
কেন মাগো ধরেছিলে গর্ভে মোরে?

কথাগুলি অতি সুন্দর; কিন্তু যে প্রবীর এতটা মাতৃভক্ত সে প্রবীর সেই পরিমাণে পিতৃভক্ত নহে কেন? প্রবীরের এই ছবি গিরিশ বাবু যাহা দিয়াছেন তাহা কাশীদাসের প্রবীরের পক্ষেই প্রশস্ত; কারণ সে ধর্ম্মভয় হীন। এস্থানে প্রবীর

চিত্র পূর্ব্বের ন্যায় ততটা নিন্দনীয় নহে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু উজ্জ্বল। পুত্রের এই অন্যায় অভিমানে জনা প্রথমে পুত্রকে উপদেশ দিল। জনার উপদেশ গুলিও এখানে বেশ সুমিষ্ট, ধীর, সার-গর্ভ; কিন্তু শেষ জনার প্রতিজ্ঞা বাক্যটা বড় রূঢ় যেন হিন্দু রমণীর ন্যায় নহে।

প্রবীর বলিল—

"রণে যদি যেতে মোরে মানা
বন্দিয়া চরণ
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।"

জনা—

স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে
হয় হোক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে
রণ সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

উদ্ধত পুত্রের সান্ত্বনার জন্য কি পণ না করিলেই নয়? জনা যে জ্ঞানে প্রবীরকে উপদেশ দিয়াছিল, সে জ্ঞান লুপ্ত হইল কেন? উদ্ধত প্রবীর সদুপদেশ শুনিল না বলিয়া কি বীরমতি মহিষীরও বিবেচনা হারাইতে হইবে? মাতা পুত্রের এই সত্য করাকরি ব্যাপার পড়িলে বোধ হয় রাজা যেন জনার প্রতাপে পিষ্ট হইয়া আছেন, জনা যেন রাজার রাজা, ইচ্ছা করিলে রাজার নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইতে পারেন, তাই বলিলেন, রাজার ইচ্ছার জন্য কিছু আসে যায় না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমায় যুদ্ধে পাঠাইবই। জনা প্রতিজ্ঞার সময় ভুলিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাধীনা।

তারপর রাজা আর বিদূষক আসিলেন। রাজা আসিয়া রাণীকে বলিলেন,

"বাজী ফিরে দিতে পুত্রে বুঝাও মহিষী।"

জনা রাজার কথা শুনিয়া রাজাকে মন্ত্রীর ন্যায় যদি যুদ্ধের আবশ্যকতা বুঝাইয়া লওয়াইতেন তাহা হইলে, রাণীর চিত্র অতি উজ্জ্বল হইত; কিন্তু গিরিশ বাবু তাহা করাইতে পারেন নাই, তিনি বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যার ন্যায় জনাকে দিয়া বলাইয়াছেন, ওমা! তুমি বল কি? ছেলেত আর কিছু মন্দ কাজ কর্‌চে না?—যথা;—

"তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মহারাজ।
কিন্তু প্রভো! ক্ষত্রিয় জননী
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ?
চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন
মা হয়ে কি হেতু কহ করিব বারণ?

রাজা উত্তর দিলেন,—

"পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব সমরে।"

রাণী রাস কসিয়া বলিলেন—

"পাণ্ডবে পুজিতে সাধ নাহি হে রাজন্।
পাণ্ডবের কীর্ত্তিগান
শ্রবণে নাহিক সাধ মম

* * *

দেব বরে দেব সম জন্মেছে কুমার
ক্ষত্র ধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ
তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ?

রাণীর কথার অর্থ কি? তিনি কি প্রকারান্তরে বলিতে চান যে, তাঁহার নির্ব্বোধ পুত্র উদ্ধত স্বভাব বশে যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহা বারণ করিবার আবশ্যক নাই? অবোধ বুঝিল না বলিয়াই কি যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিবার সপক্ষে কি কোন সদ্যুক্তি নাই? জনা কি রাজাকে পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত যুদ্ধের অপর কোন কারণ দেখাইতে পারেন না?

তার পর রাজাই বা কি? রাজাই কি এই সামান্য কথা টা বুঝিতে পারেন না? তবে গিরিশ বাবু যেরূপে রাজাকে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে রাজা ঠিক

হইয়াছে, কারণ রাজা নিজে এ বন্দোবস্ত করেন নাই অগ্নির পরামর্শে করিয়াছেন, রাজা দেবতার কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

কাশীদাস এই স্থানে রাজাকে বড় বাঁচাইয়া গিয়াছেন। কাশীদাসের প্রবীর ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া একবারে সসৈন্যে অগ্রসর হইল, যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধে প্রবীর বিমুখ হইল, রাজা অগ্নিকে লইয়া স্বয়ং যুদ্ধে নামিলেন, অগ্নি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধ করিতে নামিলেন শেষে অগ্নি অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্ট হইয়া রণে পরাজিত হইলেন, রাজাও হারিলেন প্রবীর মারা পড়িল রাজা অগ্নির পরামর্শে সন্ধি করিলেন। গিরীশ বাবু প্রাচীন কবির অঙ্কিত চিত্রগুলিকে নূতন ধবণে চিত্রিত করিতে গিয়া তাহাদিগকে মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন আর নিজে যেন হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তার পর গিরীশ বাবুর রাজা বলিলেন,—

"রণ যদি অকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা
যাও রণে নন্দনে লইয়ে
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।

জনা অমনি বলিল—

দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব
তনয়ে করিব রথী সারথী হইব
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ রণে।

* * *

রণে যেতে পুত্রে আমি কভু না বারিব।"

জনা বড় চতুরা সে আবশ্যকমত বাক্যের ভাবার্থ বুঝিয়া কার্য্য করিতে চাহে না, বাক্যের শব্দার্থ ধরিয়া কার্য্য করে। রাজা ক্ষোভে ক্রোধে বলিলেন "যাও রণে" জনা অমনি রণে চলিতে প্রস্তুত হইল। আমরা চলিত কথায় যেমন বলি—"তবে খাও, খেয়ে মর" আর অমনি যদি কেহ সেই নিষিদ্ধ বস্তু খাইয়া মরে তাহা হইলে যেমন তাহার পক্ষে আজ্ঞা পালন করা হয়, জনার পক্ষেও এখানে পতি-আজ্ঞা পালন সেইরূপ। নিমে দত্ত যে জন্য বলিয়াছিল "জগন্নাথ দাদা বে-তরিবৎ নয়," আমরাও সেইরূপ কারণে বলিতে পারি, রাণী জনা স্বামী সম্বন্ধে বে-তরিবৎ নয়। বাস্তবিক এরূপ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বিনী হিন্দু রমণীর চিত্র আর কেহ অঙ্কিত করে নাই। জনা এখানে স্বামী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনা এ চিত্র হিন্দুনারীর নহে।

তার পর জনা গঙ্গা পূজায় গেল। রাজা আর একবার পুত্রকে যুদ্ধবাসনা ত্যাগ করিতে বলিলেন। পুত্র তাই স্বীকার করিল কেবল নিজের এক গুঁয়েমি ত্যাগ করিল না বাপকে বলিল, ঘোড়া দিয়ে আমি বনে যাব। রাজা কাজেই অগ্নির সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন।

তার পর ৫ম দৃশ্য।—কৈলাস। প্রমথগণ হরিনামের মহিমা বর্ণাইয়া একটা গান করিল, কেন করিল জানি না, উদ্দেশ্য হীন সামঞ্জস্যহীন গান গাহিলেই হইল, তাই গাহিল। শিব তার পর প্রমথগণকে, শিঙ্গাকে, ডমরুকে, গঙ্গাকে কৈলাসকে, বৃষকে এমন কি সর্পগুলাকে হরিনাম করিতে বলিলেন, কিন্তু কিছুঃখ কেহ কথা শুনিল না, এমন সময় কৃষ্ণার্জ্জুন আসিয়া পড়িলেন হরিহর মিলিল, অমনি প্রমথগণ ও যোগিনীগণ একটা হরিহরের অর্দ্ধাঙ্গমিলিত রূপ বর্ণন করিয়া একটা গান গাহিল।

শিবকে কিছু বলিতে হইল না, তিনি অন্তর্যামী কিনা! শিব আপনা হইতেই প্রবীরের পূর্ব্বকথা বলিলেন কিন্তু তাঁহার একজন অনুচর কেন জনা গর্ভে জন্মিল, তাহার কোন কারণ তিনি দিতে পারিলেন না কারণ গিরীশ বাবু কল্পনায় ততটা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। শেষে বলিয়াদিলেন,

মাতৃ পদধুলি লয়ে পশিলে সমরে
শুল নাহি স্পর্শিবে তাহারে।
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে
মাতৃ নাম যেই দিন না লবে প্রভাতে
সেই দিন নাশ তার।

*　　*　　*

প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ
পাঠাইব পার্ব্বতার প্রধানা নায়িকা।"

শিবানুচর মুক্ত হইয়া কৈলাসে আসিবে তাহার জন্য শিবকে কতই বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে! কামদেবকে দিয়া তাহাকে একদিন সকাল বেলা মাতৃনাম ভুলাইয়া দিতে হইবে!—প্রবীর প্রতিদিন "নমো জনায়ৈ" এই মন্ত্র জপ করিত নাকি?—নতুবা মাতৃনাম গ্রহণ অর্থ কি? তার পর যেদিন সকালে মাতৃনাম গ্রহণে বিস্মৃত হইবে সেই দিনই যদি তাহার বিনাশ ঘটে তবে আবার "কাল শক্তি হরণের জন্য ভগবতীর প্রধানা নায়িকাকে পাঠাইবার আবশ্যক কি?

আর একটী মজার কথা গিরীশ বাবু এই স্থানে লিখিয়াছেন। কৃষ্ণার্জ্জুন যাইবা মাত্র—অন্তর্যামী শিব সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যাও ধনঞ্জয়, সদয়া অভয়া তোর প্রতি।" এতক্ষণ কৃষ্ণ বা অর্জ্জুন কেহ কোন কথা কহেন নাই। তার পর শিব নায়িকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে পর কৃষ্ণ শিবনামমালা পাঠ করিয়া বলিলেন

"কিঙ্কর বিদায় মাগে।"

তার পর বলিলেন—

"প্রণমে পাণ্ডব, পদে রেখো ভূতনাথ।"

কেন? এ সাতকাণ্ড রামায়ণের পর সীতাকার ভার্য্যার ন্যায় অর্জ্জুনকে শিবের নিকট নূতন করিয়া পরিচিত করিয়া দেওয়া কেন হইল কৃষ্ণ এই অনুরোধটুকু না করিলে শিব তাঁহাকে পায়ে ঠেলিতেন নাকি?

তারপর আবার একটা হরিহর বর্ণনাত্মক গান হইয়া প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

তৎপর দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে জনার পূজা গৃহ। জনা পূজায় আসীনা। জনা সন্তানের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিলেন "মা হয়ে মা, মার প্রাণে ব্যথা দিও না" তৎপরে "আতঙ্ক ভঙ্গিনী স্তব" অবশেষে একটি গান ধরিলেন। জনা এইরূপে গদ্যে পদ্যে প্রার্থনা করিয়া অবশেষে পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির, কেঁদে আপনি প্রাণকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি ধিক্কার দিয়াছেন। আর অস্থিরতার জন্য স্বীয় জননীর অনুপযুক্ত বুঝিয়া আপনাকে চণ্ডালিনীর ন্যায় বুঝিয়াছেন। এই ধিক্কারে জনার গঙ্গার উপর অবিচলিত বিশ্বাস ছিল বলিয়া বলা যায় না; কেন না গঙ্গার উপর অটল বিশ্বাস থাকিলে গঙ্গাস্তবপাঠের পর জনা প্রাণে শান্তিলাভ করিতে পারিত, আর যদি কবির এরূপ উদ্দেশ্য হয় যে যখন এই আশঙ্কিত অত্যাহিত ঘটিবেই তখন প্রাণে যে কালের ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে তাহা কিছুতেই অপগত হইবে

না, তাহা হইলে জনার মনেও কোন না কোনরূপে অমঙ্গল ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা এরূপ একটা বিশ্বাস জন্মিবার কারণ সূচক পরিবর্ত্তন দেখান উচিত ছিল গিরিশ বাবু পরক্ষণেই জনাকে ক্ষত্রিয়-কুমারী বলিয়া পণ রক্ষার্থে স্পর্দ্ধা করাইয়া বলাইয়াছেন এখনি প্রাণ বাহির হ'ক ক্ষতি নাই কিন্তু পণ করেছি—রণ, রণ, রণ, স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না।" এই কি কথা! ক্ষত্রিয়ানী জনার গর্ব্বিতাজনার, উদ্ধতা জনার চিত্র হইয়াছে বটে কিন্তু গঙ্গার বরদাসীর গঙ্গার ভক্তিমতী পুত্রীর প্রবীরের স্নেহময়ী জননীর চিত্র হয় নাই।

তারপর ষোড়শী মদনমুঞ্জরী আসিয়া শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা করিল,

"রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।"

কারণ

"যম জয়ী রথি বৃন্দ সনে
একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে ?"

অতএব

"কর মানা রণে যেতে দিওনা দিওনা
দুখিনী নন্দিনী পদে পতি ভিক্ষা চায়।"

আরও

"রণে দেমা ক্ষমা
হাহাকার তুলনাগো রাজপুরে।"

মদনমুঞ্জরীর ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে মদনমুঞ্জরী আসিয়াছেন, শাশুড়ীকে পাণ্ডবের অজেয়তা বুঝাইয়া রণ বন্ধ করিবার জন্য; কিন্তু গিরিশ বাবুর হাতে পড়িয়া তাঁহাকে বলিতে হইল "রণে দেমা ক্ষমা, হাহাকার তুলনাগো রাজপুরে"—ইহা যেন বাঙ্গালীর ঘরের কলহ প্রিয়া দুর্দ্দমনীয়া বধূর কথা হইয়া পড়িয়াছে, সে যেন শাশুড়ীকে বলিতেছে "ডাইনী বুড়ী! তুইইতো তোর নিজের সংসারটা খেলি।" তারপর যে জনার নিকট রাজা নীলধ্বজ তাড়া খাইয়া মুখ নোয়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন, সেই জনার নিকট বালিকা বধূ কি সাহসে, কোন মুখে লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল,—"দুখিনী নন্দিনী পদে পতি ভিক্ষা চায়"

"বঞ্চনা কর না তায় নিদয়া হইয়ে।"

তারপর এই সকল কথা হইতে মনে হয় মদনমুঞ্জরী বুঝিয়াছে যে প্রবীরের আর দোষ কি? সেত তাহারই প্রীতি-বর্দ্ধনার্থ ঘোড়া ধরিয়াছিল! যত দুষ্ট শাশুড়ী মাগী, এই মাগীইতো রণ পণ করিয়া তাঁহার প্রাণনাথকে একা পাণ্ডব-সমরে পাঠাইতেছে। মাগীইতো যত নষ্টের গোড়া তাই দুটা আদর জানাইয়া স্বীয় কাতরতার ছলে শাশুড়ীকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন। গিরিশ বাবু যে এই অসাবধানতায় মদনমুঞ্জরীর পবিত্র এরূপে নষ্ট করিয়াছেন, তাহা নহে; বীরকুল বধূর ছবি গিরিশ বাবু ইহা অপেক্ষা ভাল আঁকিতে জানেন না, পারেন না। তাঁহার অভিমন্যু বধে উত্তরার চিত্র, সীতার বনবাসে সীতার চিত্র এইরূপে কলঙ্কিত হইয়াছে।

তারপর জনা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিবার জন্য উপদেশ দিল;—

"পতির কল্যাণ যদি চাহ গুণবতী
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।"
রাজকার্য্য পুরুষের ভার
অংশী তুমি কেন হও তার?"

কথায় বলে গুরু হইতে সকলেই চায় কিন্তু শিষ্য হওয়া বড় দায়" জনার শেষ উপদেশটুকুতে আমাদের তাহাই মনে পড়িল, জনা পুত্রবধূকে রাজকার্য্য

সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন নিজে স্বামীর নিকট আপনার জেদ বজায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহা ভুলিয়াছিলেন দেখিতেছি। সেস্থলে জনা যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহা কেবল স্বামীর প্রস্তাবে বাধা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য, সেখানে যদি তিনি রাজকার্য্যের সুবিধা অসুবিধা, রাজ্যের মানাপমান প্রভৃতি দুই চারিটা কথা তুলিয়া ঠিক্ মন্ত্রীর ন্যায় রাজার সহিত তর্ক করিতেন, তাহা হইলে জনাকে গিরিশ বাবু যে বীরত্ব মণ্ডিতা, প্রভাব সম্পন্না, বীরনারী করিয়া আঁকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই হইত। এ পর্য্যন্ত জনার চিত্র যাহা দেখিলাম বাঙ্গালীর ঘরের দাম্ভিকা স্বাধীনা, আত্মবুদ্ধি প্রতিপালিনী, প্রৌঢ়া গৃহিণী মাত্র।

তারপর জনার উপদেশের শেষাংশ বেশ হইয়াছে, রাজকার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তি দুটি যদি গিরিশ বাবু জনাকে দিয়া না বলাইতেন, তাহা হইলে জনার এই উপদেশটির মধ্যে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাইতাম না; কিন্তু তিনি কলস প্রমাণ দুগ্ধে বিন্দু-মাত্র গো-চোনা নিক্ষেপ করিয়া জনাকে মাটি করিয়াছেন তবে উহাতে প্রথমাঙ্কে জনাকে যেরূপ মাটী করিয়া উঠিয়াছেন এখানেও তাহাই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উন্নতা করিতে চেষ্টা করেন নাই, ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়, তৎপর মদনমুঞ্জরী অর্জ্জুনের কৃষ্ণসখীত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এবং দুর সমীরণে অমঙ্গল সূচক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণের কথা বলিয়া কাঁদিয়া আবার বলিলেন,—

"মা হয়ে মা অকূলে ফেল না দুহিতায়
আপন নন্দনে মাগো নাহি ঠেল পায়।"

কথায় বলে "মায়ের অপেক্ষা যার অধিক মায়া সে ডাকিনী, মদনমুঞ্জরী গিরিশ বাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে সেই ডাকিনী পদবী লাভ করিয়াছেন। এস্থলে আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। গিরিশ বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা যে জনা বীরনারী, বীরধাত্রীরূপে প্রতিফলিতা হউক, কিন্তু তিনি তাহার মুখে যে সকল কথা বসাইয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরে অপর নায়ক নায়িকার মুখে কথা বসাইবার সময় নিজেই সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি রাজার মুখে যে সকল কথা দিয়াছেন, তাহাতে রাজা যেন নির্ব্বোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, জনা যে কি সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ পণ করিতেছে তাহা রাজা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন "বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে" আর এখানে মদনমুঞ্জরী বুঝিয়াছেন যে তাঁহার শ্বশুরও যুদ্ধে সম্মত নহেন কেবল তাঁহার শাশুড়ী সামান্য জেদের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার স্বামীর ঘাড় ধরিয়া যুদ্ধে পাঠাইতে উদ্যতা হইয়াছেন, তাই তিনি শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া বার বার পতি ভিক্ষা চাহিতেছেন। শাশুড়ীর নিকট যুবতী বধূর পতি ভিক্ষা করাও অতি বিসদৃশ লাগিল; গিরিশ বাবু কি অন্য কথা দিয়া রণ শান্তির প্রস্তাব করাইতে পারিতেন না?

তার পর মদনমুঞ্জরীর কথায় জনার রাগ হইল,—জনা বাঙ্গালীর ঘরের গৃহিনী শাশুড়ী কিনা, তাই তাঁর রাগে মুখ দিয়া বাহির হইল,—"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হতে" (অর্থ "তবে রে ছোটলোকের মেয়ে!") বীরনারী, রাজরাণী, জনার

মুখে গিরিশ বাবু কোন বুদ্ধিতে এই অপভাষা ব্যবহার করাইলেন, তাহা আমরা জানি না।

তাহার পর ছয় পংক্তি বেশ কথা প্রবোধমূলক তিরস্কারের উপযুক্ত কথা বটে; কিন্তু তাহার পর আবার সেই গুরুগিরি—

"আরে হীন মতি
পতি ভক্তি এই কি তোমার?"

মদনমুঞ্জরী অর্জ্জুনের যুদ্ধে প্রবীরকে সমকক্ষ বার মনে না করিয়া পতিভক্তিতে যতটুকু হীনতা দেখাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা জনা যে স্থলে রাজার নিকট হাত মুখ নাড়িয়া কেশরাশী ফুলাইয়া স্বরের পরিধি বাড়াইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে স্বামীর কথা অবহেলা করিয়া যুদ্ধপণ করিতেছেন সেস্থলে জনার পতিভক্তি কিরূপে অক্ষুণ্ণভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি না। গিরিশ বাবু যদি বলেন, মদ্যপেও মদ্যপান নিষেধ করিয়া থাকে বলিয়া উপদেশটির গুণ বা মূল্য নষ্ট হয় নাই সুতরাং এখানে জনার মুখে উক্ত উপদেশ থাকায় বিশেষ অন্যায় কিছু হয় নাই বরং মনুষ্যের সহজ জ্ঞান পরিস্ফুটরূপে প্রতিভাত করা হইয়াছে। স্বীকার করি তাহা হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জনার চিত্র কি সেইরূপ হওয়া উচিত? জনাকে পতিভক্তি হীনা না করিলে তাঁহার ইচ্ছামত জনা আঁকিতে পারা যাইত না কি? অথবা গিরীশ বাবু ততটা সামঞ্জস্য রাখিয়া আঁকিতে পারেন না, তাঁহার সে ক্ষমতা নাই? যদি তাহাই হয় তবে তিনি জৈমিনিভারত দেখিয়া লয়েন নাই কেন? পৌরানিক বিষয় লিখিতে হইলে কোন পুরাণে তাহার মূল আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য অথবা যে কাশীদাস হইতে তিনি বিষয়টি লইয়াছেন, তাহাকেই প্রতিকথার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা এইরূপে নিজের অক্ষমতা, অদূরদর্শিতা দোষে সাধারণের নিকট মূঢ় হইয়া থাকিতে হয়।

তার পর জনা চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, "যুদ্ধপণ কভু, মম হবেনা লঙ্ঘন।" মদনমুঞ্জরী শুনিয়া ননদিনী স্বাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন,—

"কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি যাচি প্রাণপতি।
বল গিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে
কার শক্তি কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবে জিনিতে?"

জনার উপদেশ কিছুমাত্র মদনমুঞ্জরীর মনে তলায় নাই জনা কত বলিয়াছেন,—

"কেবা সে অর্জ্জুন কেবা নারায়ণ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে।
ভাব তুমি শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়,
হীন মম প্রবীর তনয়?"

কিন্তু তাহাতে কি? মদনমুঞ্জরী সে কথা কানেও তুলিল না, সে বুঝিল না যে তাহার শাশুড়া কি সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধপণ কোন মতে লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছেন না। সে বুঝিয়াছিল যে তাহার শাশুড়ী রাক্ষসী, তাই সে কাহার কোন কথা না শুনিয়া তাহার স্বামীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক যমের মুখে ফেলিয়া দিতেছে। গিরীশ বাবু একবৎসরের পরিশ্রমে শাশুড়ীবধূর চিত্র যাহা আঁকিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণতা এই খানে নাকি?

স্বাহা ভ্রাতৃজায়ার কথায় অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল,—

"মাতার বদন ভাব করি নিরীক্ষণ
বাক্য নাহি সরিল আমার।

শুনেছ ত ঠেলেছেন পিতার বচন।
বাধা দিলে, দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,
ভাল মতে জানি জননীরে।"

স্বাহা লক্ষ্মী মেয়ে, তাহার প্রাণে খলকপট নাই, সে এতক্ষণ মার ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া ছিল এখন ভ্রাতৃজায়ার অনুরোধে বলিল,—"মাপ কর ভাই' মার মুখের ভাব দেখিলে ত? উনি যার বাবার কথাই ঠেলেছেন, তখন আমার কথা কাণে কর্‌বেন কি?" শুদ্ধ তাহাই নহে, জনা যে যুক্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া কাজ করে না, বা সে যাহা একবার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা ব্রহ্মাবিষ্ণুর অনুরোধে ত্যাগ করিতে পারেন না তাহাও বলিয়াদিল যে "বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ।" যে রাজমহিষী, যে নীলধ্বজ-পরিবারে কর্ত্রী, যে সন্তানের জননী তাহাকে গিরীশ বাবু ইচ্ছা করিয়া এরূপ একগুঁয়ে করিয়া চিত্রিত করিলেন কেন?

তার পর মদনমুঞ্জরী হতাশ হইয়া বলিল,—তবে উপায়। স্বাহা পরামর্শ দিল,—

"চল সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে।
কৃষ্ণগুণগানে তুষ্ট করি ফাল্গুনীরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।"

"মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল"—অর্থ কি? অর্জ্জুনের রোষানলে যেন মাহিষ্মতী রাজ্য উৎসন্নে না যায়!—এই কি? অথবা রাজ্যের যুবরাজ যদি কুশলে থাকেন, তবেই রাজ্যের মঙ্গল, অতএব অশ্বহারী রাজপুত্র প্রবীর যেন অর্জ্জুনের কোপানলে ভস্মীভূত না হন!—এই কি? শেষোক্ত অর্থ কোন মতে অনুমান করিয়া যুটাইতে হয়। তার পর "যদি তিনি দানেন অভয়"—অর্থ কি? প্রবীরকে অর্জ্জুন কিছু বলিবেন না? স্বাহা যদি এতটা আশা করেন, তবে ঘোড়া ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন না কেন?

তার পর দুই জনে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—একটি প্রান্তর মধ্যস্থ বটবৃক্ষতলে দুই জন গঙ্গারক্ষক দাঁড়াইয়া আছে। বিদূষকের ন্যায় এই গঙ্গারক্ষকেরাও গিরিশ বাবুর বিকৃত কল্পনা প্রসূত জীব। ইহারা শিবানুচর প্রমথগণের ন্যায় একদল অপূর্ব্ব দেবযোনি। ইহারা গঙ্গার কিঙ্কর, গঙ্গাকে পাপীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত। ইহারা গঙ্গাকে কিরূপে রক্ষা করে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

১ম। "সেদিন বড় মজা হয়ে ছিল, সেদিন একজন ছাপাকাটা তুলসীর মালা আঁটা, গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মর্‌তে * * * খাটে চড়ে গলা টিপে বেটার দফা সারলুম, তেশূন্যে মলো, গোভাগাড়ে আমগাছে ভূত হয়ে আছে।

২য়। আমিও কাল খুব মজা করেছি। দিনের বেলা যোগী সেজে থাক্‌তেন * * * * ঝড় তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্তি হয়ে আছে।

গিরীশ বাবুর গঙ্গারক্ষক এইরূপ কিন্তু পুরাণে একরূপ গঙ্গারক্ষক আছে, তাহাদের কার্য্য অন্যরূপ। পুরাণে গঙ্গারক্ষক নাম নাই, "গঙ্গাভৈরব" নাম আছে। গঙ্গাভৈরবেরা প্রমথগণের ন্যায় গণদেবতা কাশীখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে ২৭ অধ্যায়ে দশহরা স্তোত্র মধ্যে শিববাক্যে উক্ত গঙ্গাভৈরবের কার্য্য সম্বন্ধে এই মাত্র আছে:—

"ষষ্টির্গণসহস্রাণি গঙ্গাং রক্ষতি সর্ব্বদা।
অভক্তানাঞ্চ পাপানাং বাসে বিঘ্নং প্রকুর্ব্বতে॥ ৮১
কাম ক্রোধ মোহা মোহাদিলোভাদি নিশিতৈঃ শরৈঃ
ঘ্নন্তি তেষাং মনস্তত্ব স্থিতিঞ্চাপনয়ন্তি চ॥ ৮২"

কাশীধাম হইতে কাশীখণ্ডের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই দুই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ আছে,—"ষষ্ঠি সহস্রগণ সর্ব্বদা গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে এবং ভক্তিহীন ও পাপী ব্যক্তিগণের গঙ্গাবাসে বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহারা কামক্রোধলোভমোহাদি শাণিত শরদ্বারা পাপিগণের মনকে বিদ্ধ করিয়া গঙ্গাতীরস্থিতির অপনয়ন করে।"

পাঠকগণ! এই মূল অনুবাদ হইতে দেখিবেন যে গঙ্গাভৈরবেরা ভক্তিহীন ও পাপীগণের গঙ্গাবাসে বিঘ্ন করে, তাহাদের মুমূর্ষু অবস্থায় (অর্থাৎ যে সময়ে তাহাদের পক্ষে, গঙ্গা নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, গঙ্গাজল স্পর্শন প্রভৃতি ভিন্ন পাপ মুক্তির সুলভ উপায় আর নাই সেই অবস্থায় গলা টিপিয়া মারে না পগারে ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে মারে না বা মুমূর্ষুকে লইয়া গিয়া ব্যাসকাশীতে মারে না। তারপর গঙ্গাবাসে পাপীদিগের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য গঙ্গাভৈরবেরা (গিরিশ বাবুর সৃষ্ট গঙ্গারক্ষকেরা নহে) আছে কেন, তাহা যদি গিরিশ বাবু জানিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা দুঃসাহস দেখাইয়া এরূপ বিকট জীব সৃষ্টি করিয়া পুরাণের উদ্দেশ্য নষ্ট করিতে পারিতেন না পাপীরা যদি ভক্তিসহকারে গঙ্গাবাস করিতে না প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে গঙ্গাতীরে তাহাদিগ দ্বারা পাপানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে না, আর যদি যথার্থই তাহারা গঙ্গাতীরে কোন পাপানুষ্ঠান করে তাহা হইলে সেই পাপ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার চিরনরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় সুতরাং মঙ্গলময় হরি পাপীগণের প্রতি করুণা পরবশ হইয়াই এই গঙ্গাভৈরবগণকে উক্ত কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়াছেন আর গিরিশ বাবু পুরাণ জ্ঞান হীন বলিয়া 'গঙ্গারক্ষক' সৃষ্টি করিয়া পাপীর পাপ হ্রাসের সহায়তা করা দূরে থাক তাহার মুক্তিপথ রুদ্ধ করিয়াছেন। এই গঙ্গারক্ষক সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে তাহা অন্য এক উপযুক্তস্থলে বলা যাইবে।

তৎপরে বিদূষক গঙ্গারক্ষকগণের নিকট উপস্থিত হইল। গঙ্গা জনার স্তবে বোধ হয় তুষ্ট হইয়া প্রবীরের রক্ষার্থ গঙ্গারক্ষকদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে তোমরা অশ্বশালা হইতে যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া অর্জ্জুন নিকটে দিয়া আসিবে আর বিদূষকও রাজবাটীতে হরির উদয় বন্ধ করিবার জন্য রাত্রে ঘোড়া চুরি করিতে বাহির হইয়াছে। উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য এক হওয়ায় বিদূষক গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের সাহায্যে ঘোড়া চুরি করিবে বলিয়া চলিয়া গেল। এই দৃশ্যে বিদূষকের রসিকতাগুলি অতি নীরস্, তবে চিত্রটি একটু ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে।

তৎপরে তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—দুর্গাভ্যন্তরে মন্ত্রী সেনাপতি ও সেনানায়কেরা মন্ত্রণা করিতেছেন যুদ্ধে যাওয়া উচিত কি না? মন্ত্রী ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন—

"মাহিষ্মতী পুরী হায় মজে এত দিনে।
কৃষ্ণ দ্বেষী হল নরবর,
উপদেষ্টা বালক রমণী।
হয় বুঝি বংশ নাশ মহিষীর দোষে।

কাজেই তিনি বলিলেন

কহ সেনাপতি! উপায় সঙ্কটে।

মন্ত্রী কি রাজার মনোগত ভাব জানিতেন না? মহিষীর দোষে বংশ নাশ কেন হইবে তাহা বুঝিলাম না? মহিষীই যেন যুক্তি দিয়া বুঝাইতে পারেন নাই যে এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যের মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই;—কিন্তু যিনি মন্ত্রী, তিনিও কি ইহা বুঝেন না? আর যদি মহিষীর দোষ তিনি বুঝিয়া থাকেন তবে সে কথা রাজাকে না বুঝাইয়া এ গুপ্ত পরামর্শ করিতে আসিলেন কেন? গৃহে দেবতা অগ্নি উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে সমস্ত বলিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন না কেন? এই পরামর্শ সভায় অগ্নিই বা অনুপস্থিত কেন?

তাহার পর কৃষ্ণার্জ্জুনের পরাক্রম শুনিয়া যে সেনাপতি কম্পিত তিনি আর কি সুপরামর্শ দিবেন? তিনি কতকটা কৃষ্ণার্জ্জুনের বীরত্ব প্রশংসা করিয়া স্থির করিলেন "মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয়।"

তারপর মন্ত্রী দেখিলেন, তর্কে সময় যায় অতএব বলিলেন

"মম মত কহিব পশ্চাৎ।
যুক্তি স্থির কর ত্বরা,
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে
প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে।
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার
রাম নয় রাবণ মারিবে।"

ইহা উৎসাহ দান না রাজ্যের রক্ষণার্থ মন্ত্রণা না অত্যাচারী রাজপুত্রের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? যুদ্ধে যাওয়া যে আবশ্যক বা ক্ষত্রিয়ের রণভীতি অন্যায় এ সকল মন্ত্রী বুঝাইয়া দিতে পারেন না; তিনি যুদ্ধে যাইবার কারণ দেখাইতেছেন যে "মারীচের দশা মো সবার, রাম নয় রাবণ মারিবে"—কাযেই আর কি করিবে বল যুদ্ধে যেতে হবে "প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে।"—বেশমন্ত্রী!

সেনাপতি বলিলেন

"বিপক্ষ পাণ্ডব, রণ অসম্ভব
প্রভাত নিকট, উপায় সত্বর কর।"

মন্ত্রণা বসিয়াছে এত গভীর রাত্রে যে "প্রভাত নিকট"। সারাদিনে কি কিছুই হইল না? সন্ধ্যারাত্রেও কিছু হইল না? যাক্, অন্য একজন সেনানায়ক বলিলেন

"প্রাণ বড় ধন"
"অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।"

অকারণ কেন? রাজ্য রক্ষা, গৌরব রক্ষা, কর্ত্তব্য পালন, রাজপুত্রের সহায়তা না হয় রাজার বা রাজপুত্রের আদেশ পালনার্থ যুদ্ধ ঘটিবে!—তাহার কোনটাই কি কারণ নহে? আর যে প্রাণভয়ে ভীত, যুদ্ধে ভীত সে সেনাপতি কেন? সেনাপতি বলিলেন;—

"চামুণ্ডারূপিনী রাজ্ঞী রুধির প্রয়াসী
বহুরূপী পুত্র গর্ভে ধরে
মজাইল নীলধ্বজ রাজে।"

সেনাপতির রাজভক্তি বেশ! রাজা রাণীকে যাহা মুখে আসিতেছে তাহা বলিয়াই গাল দেওয়া হইতেছে কেন? বলি এতই যদি প্রাণের মায়া, তবে সেনাপতিগিরি করিতে আসিয়াছিলেন কেন? তারপর "রুধির প্রয়াসী" কোন লিঙ্গ?—"রাজ্ঞী" শব্দ অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ, তাহার বিশেষণ পদও স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত, তাহা হইলে "রুধির প্রয়াসীণী" হইবে। তারপর প্রস্তাব হইল যে সকলে রাজাকে ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবের আশ্রয় লওয়া যাউক।

সেনাপতি বলিলেন,—

"ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।"

সেনানায়ক অমনি বলিলেন—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম?"

আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।"

এ বাতুলতার কথা সেনানীর মুখে দিয়া কি লাভ হইল?

তার পর জনা আসিলেন, তিনি উপদেশ দিতে আসিয়াছেন।

জনা বলিলেন;—

"ধিক্ মন্ত্রিবর, শতধিক্ সেনাপতি।
প্রায় নিশা অবসান।"

এতটা সময় কিসে গেল?

তারপর জনার শেষ কথা:—

"কুমার সমান শক্তি ধর
আগুয়ান তার রণে কেবা হবে সংগ্রামে?
আজ রণে কে আছ কোথায়,
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে,
চল চল গৃহ দ্বারে অরি।"

ইহার পরই মন্ত্রী প্রভৃতি উৎসাহান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল

"জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ।"

তারপর জনা এতক্ষণের পর একটি যুক্তির কথা বলিল

"মাখিয়ে কলঙ্ক কালি অপমান সয়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ?"

হায়! যদি জনা এই কথাটি একবার ভুলিয়া প্রথম অঙ্কে রাজাকে শুনাইয়া দিত তাহা হইলে আর আমাকে এত কথা লিখিতে হইত না। তারপর জনা একটা মিথ্যা কথা কহিল!—

"গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর
যাও শীঘ্র—আজ্ঞা জাহ্নবীর"

তারপর সকলে চলিয়া গেল। জনা আক্ষেপ করিয়া বলিল,—রাজা উপস্থিত নাই, কাজেই আমি মেয়েমানুষ হইয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া সেনাগণকে উৎসাহ দিতে আসিয়াছি। কেন? রাজা নাই কিন্তু প্রবীর কোথা?—প্রবীর কি নিদ্রিত? এ সময়ে কি তাহার নিদ্রার সময়?

৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

তারপর শিবিরের পথ শ্রীকৃষ্ণ একা বেড়াইতেছেন আর বলিতেছেন

"ধরিয়াছি নরদেহ ধরার রোদনে।"
নীর হেরি নারীর চক্ষে দয়া না করিব
প্রবীরে বধিব।"

বলি দয়া না করাই কি দয়াময় হরির কার্য্য নাকি?

প্রবীরের অপরাধ কি? মারিবে কেন? শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াছেন বটে "মহাবীর প্রবীর পতন না হইলে পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে"; কিন্তু ইহাই কারণ নাকি?

স্বাহা ও মদনমুঞ্জরী বৈষ্ণবী ভিখারিনী বেশে অর্জ্জুনের সহিত দেখা করিতে যাইবার উদ্দেশে এই পথে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পড়িলেন। তাঁহারা একটি গোষ্ঠ লীলার গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন। গানটি অতি সুন্দর। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ছলনা করিয়া তাঁহাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া কয়েকটি বস্ত্র ও একটি মুকুট দিয়া ভুলাইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন, বলিয়া দিলেন যে এগুলি গঙ্গা প্রবীরকে উপহার দিলেন। মদনমুঞ্জরী ছলনায় ভুলিল কিন্তু স্বাহার মনে সন্দেহ জন্মিল "হরি বুঝি করে গেল ছল" কাজেই সে

ভ্রাতৃজায়াকে অর্জ্জুন দর্শনে যাইতে অনুরোধ করিল

"সন্দ নাহি হয় দুর
চল যাই পার্থের সদন
কুমারের প্রাণ ভিক্ষা মাগি।"

বধূ বলিল,—"অদ্ভুত সন্দেহ তব ননদিনী আজি, ইত্যাদি।"

এইটুকু বেশ। স্বাহার চিত্রটি বাস্তবিকই বেশ মনোরম হইয়াছে। এখানে মদনমুঞ্জরীও উজ্জ্বলা। স্বাহার শেষ কথাটি আরও সুন্দর। মদনমুঞ্জরী একান্ত গেল না দেখিয়া স্বাহা বলিল

"চল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন।"

সকলে চলিয়া গেল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন ইহা রাত্রির ঘটনা।

তৎপরে প্রবীরের শয়ন গৃহ। প্রবীর নিদ্রিত, জনা আসিল। পূর্ব্বে জনা সৈন্যগণকে উৎসাহ দিবার সময়ে বলিয়াছিল "প্রভাত নিকট।" আর এখানে দেখিতেছি প্রবীর নিদ্রিত, জনা ঘুম ভাঙ্গাইল। কাজেই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যাহার দুয়ারে শমনসম শত্রু দাঁড়াইয়া সে প্রত্যূষে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে কিরূপে?

"ধেনুর্ব্বৎস প্রযুক্তা বৃষগজ তুরগা"

প্রভৃতি শ্লোকটি বাঙ্গালায় গীতাকারে রচিত করিয়া গিরীশ বাবু বাস্তবিক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তৎপরে দূত আসিয়া সংবাদ দিল শত্রুরা আক্রমণ করিয়াছে, সেনাপতি প্রায় পরাজিত, পাঠক! দেখুন, প্রবীর কত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রায় ছিল!

তার পর ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক—বিদূষক ও গঙ্গারক্ষক। বিদূষকের স্বগত বাক্যটি বেশ প্রশংসার যোগ্য। প্রথম চরণটি, অতি সৌন্দর্য্য পূর্ণ "ভরসার মধ্যে এই পাণ্ডবেরাও হরি হরি কচ্ছে।" তৎপরে সপ্তম দৃশ্য রণস্থল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একেবারেই মুস্‌ড়ে পড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিতেছেন।

তার পর অষ্টম গর্ভাঙ্ক—রণস্থলের অপর পার্শ্ব। প্রবীর একা উপস্থিত। প্রবীর বলিতেছেঃ—

"আজিকার মত রণ অবসান।
একি,
কোথা হতে যন্ত্রধ্বনি উঠে সুমধুর!
মরি মরি
বিদ্যুৎ ঝলক সম কে রমণী হেরি?
আহা!
রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল।
কে রমণী? কোথায় লুকাল!

অনুমানে বুঝিতে হইতেছে, যুদ্ধশেষে প্রবীর এক পার্শ্বে একা দাঁড়াইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময়ে শিব-প্রেরিত ভগবতীর প্রধানা নায়িকা মোহিনীবেশে একবার দেখা দিয়া লুকাইল। অমনি বালক বালিকা বেশে রতিকাম দেখা দিল। তাহারা নাচিল গাহিল প্রবীরকে মোহিত করিল। প্রবীর তাহাদিগকে পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। রতিকাম তাহাকে তাহার বাড়ী লইয়া যাইবে বলিয়া লইয়া গেল। রতি কামের গান দুটি বেশ।

তারপর দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ।

শারীর বিজ্ঞান।

চিকিৎসা কার্য্যে শরীর বিজ্ঞান একটী অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষয়। শরীর বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই চিকিৎসা কার্য্যে কুশলতা লাভ করিতে পারেন না। অনেক দিন অতীত হইতে চলিল, আর্য্যজাতির সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে বসিয়াছে, ভারত গগণ ক্রমশঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। আর্য্য কীর্ত্তি কলাপ সমূহ অতীতের স্মৃতির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যে অভাবটী ভারতে একবার ঘটিতেছে, সেটী আর কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না। নিশ্চয়ই বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। জ্ঞানবিজ্ঞান-পূর্ণ যে আর্য্য-দর্শন লইয়া অন্যান্য জাতি কত আলোচনা কত উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের অনুরাগ নাই, তাহার অর্থ আমরা বুঝিনা। যে চিকিৎসা শাস্ত্র যে জ্যোতিঃশাস্ত্র লইয়া উন্নতিশীল জাতি ভীষণ আলোড়ন করিতেছেন। যে শাস্ত্র-সিন্ধু সিন্ধুর ন্যায় মথিত হইয়া কত সুধাময় ফল প্রদান করিতেছে, আমরা সে ফলে বঞ্চিত, সেই সুধানিধি শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি—গণের বংশধর হইয়াও আমরা সে ফলে বঞ্চিত। সেই শাস্ত্র রহিয়াছে, কিন্তু মন্থন করে কে? এক কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রচুর আয়োজনে ও সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্মশানবাসী মহাদেব যখন মন্থন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি কিছুই উপকরণের আয়োজন করিতে পারেন নাই, কাহারও নিকট সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ভাগ্য ক্রমে (পোড়া কপালে) হলাহল বিষ উঠিয়া পড়িল। আমাদেরও সেই রূপ অর্থের অভাব, উপকরণের সম্পূর্ণ অভাব, সাহায্য কিছু-মাত্র পাই না। যদি কখন কোন ভারত সন্তান প্রাণের আবেগে দুরাশার প্ররোচনায় মন্থন করিবার নিমিত্ত অগ্র-সর হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, ভাগ্য দোষে সুধা বিনিময়ে হৃদয়ে গরল লইয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইতে হয়।

শরীর বিজ্ঞানের অবনতি যে এতদূর কেন ঘটিয়াছে, বোধ হয় অনেক হৃদয়-বান্ ব্যক্তি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। মহাত্মা ইংরাজ রাজের কৃপায় অস্ত্র চিকিৎসার অসীম শক্তি যে সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, ইহাও আমাদের একটী সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ঐ পাশ্চাত্য জাতির নিকট অস্ত্র চিকিৎসা দেখিতে না পাইতাম, উহার মহিমা ধারণা করিতে পারিতাম না। ক্ষৌরকারের ব্যবসায় বলিয়া অশ্রদ্ধাই করিয়া আসিতাম।

যেদিন হইতে শবচ্ছেদ প্রথা হিন্দুগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে এই ঘোর অবনতি পথে পদার্পণ করিয়াছেন, শবচ্ছেদ ব্যতীত যে, কোন রূপে

শরীরবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করা যায় না এবং শরীর-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসা কার্য্যে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল ভ্রমণ করিতে থাকে। ইংরাজ রাজের কৃপায় আজ আমারা তাহা বুঝিয়াছি কিন্তু বুঝিয়া কি করিব? সময় হারাইয়াছি। এখন চেষ্টা করিলেও কিছু ফল হইতেছে না। রাজা বিদেশী, সুতরাং মনোযোগ না করিলেও তাঁহার ক্ষতি নাই, কিন্তু দেশীয় রাজা, জমিদার ও ধনবান্ সাধারণের নিকট যে এত কান্দিতেছি, কৈ এহেন দুঃসময়ে তাঁহাদের একমাত্র কৃপাবিন্দুও ত নিপতিত হইল না। এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইয়াও ত ভারত মাতার উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিল না। তবে আর কিরূপে ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য পুনরায় সমুদিত হইবে? মহর্ষিগণের নির্ম্মল কীর্ত্তি প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত সমদ্ভাসিত হইবে? বুঝিতে পারিতেছি যে একের চেষ্টায়, এক দিনের চেষ্টায় কিছুই হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যতীত এই ঘোর অবনতি দূর হইবে না। তথাপি নিরস্ত থাকা সঙ্গত নহে, জীব সমুদয় আশাতেই বাঁচিয়া থাকে। আমাদেরও আশা রজ্জুতে হৃদয় দৃঢ় সংযত করিতে হইবে। নিয়ত চেষ্টা করিতে হইবে, সকলের একপ্রাণ এক-মন হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্যই চিরদিন সমান থাকিবে না।

শবচ্ছেদ করিয়া দেখাইবার অধিকার আর আমাদের নাই, সুতরাং চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত উপায় নাই। আমরা এই সংখ্যায় একটী নর কঙ্কালের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিব। পাঠকগণ! বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিবেন, যদিও এই রূপ গুরুতর বিষয় উপদেশ ব্যতীত সম্যক্ বোধগম্য হয় না, তথাপি চেষ্টা করিলে অনেক পরিমাণে জানা যাইতে পারে। আমরা যতদূর হইতে পারে, সহজ ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অস্থিতত্ত্ব।

সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বং শরীরং বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কাৎস্ন্যেন বেদ লোকসুখপ্রদম্॥

যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে শারীর তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি লোক সুখকর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সমগ্রভাবে জ্ঞাত আছেন।

শরীরং দ্বিবিধং স্থূল সূক্ষ্ম ভেদাৎ, তদ্‌যথা—ক্ষিত্যপতেজো মরুদ্ ব্যোমময়ং চক্ষুরাদিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যং স্থূল সঞ্জ্ঞং, তথা পঞ্চপ্রাণমনো বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিত মপঞ্চীকৃতভূতোত্থং শরীরং সূক্ষ্ম সংজ্ঞাং লভতে।

জীব শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতাত্মক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেহকে স্থূল দেহ এবং পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় সমন্বিত অপঞ্চ ভূতজ দেহকে সূক্ষ্ম দেহ বলা যায়।

এবং বিবর্দ্ধিতঃ স যদা হস্ত পাদ জিহ্বা ঘ্রাণ কর্ণ নিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেত স্তদা শরীর মিতি সংজ্ঞাং লভতে। সুশ্রুতঃ।

এইরূপে গর্ভ বিবর্দ্ধিত হইয়া হস্ত, পদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গে যুক্ত হইয়া শরীর শব্দে অভিহিত হয়।

অস্মিন্ পুনঃ শাস্ত্রে স্থূলদেহপ্রকৃতিরেব বর্ণনীয়া। দেহঃ স হি সারভূতৈ রস্থিভি রেব ধ্রিয়তে।

এই শাস্ত্রে মনুষ্যের স্থূলদেহ প্রকৃতি বর্ণনীয়। জীব দেহ সারভূত অস্থি সমূহ দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে।

তথাচ—
অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্॥
তস্মাচ্চির বিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি কলাভিঃ শ্ছাদিতানি হি।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥

যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সার দ্বারা বৃক্ষ সকল অবস্থিত থাকে, সেইরূপ দেহিদিগের দেহ সারভূত অস্থি দ্বারা ধৃত থাকে। ত্বক্ মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেলেও অস্থি সমস্ত নষ্ট হয় না। কলাচ্ছাদিত মাংস সমূহ অস্থিতে অবস্থিত ও দৈহিক বন্ধনে বদ্ধ থাকাতে বিশীর্ণ ও পতিত হইতে পারে না।

তান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ভবন্তি। তদযথা—কপাল রুচক তরুণ বলয় নলক সংজ্ঞকানি। তেষাং জানু নিতম্বাংস গণ্ড তালু শঙ্খ শিরঃসু কপালানি। দশনাস্তু রুচকানি, ঘ্রাণ কর্ণ গ্রীবাক্ষি কোষেষু তরুণানি, পাণি পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠোদরোরঃসু কপালানি, শেষাণি নলক সংজ্ঞকানি।

সুশ্রুতঃ—।

মহর্ষিগণ শরীরাস্থি সমুদয়কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা কপালাস্থি, রুচকাস্থি, তরুণাস্থি, বলয়াস্থি ও নলকাস্থি। তন্মধ্যে জানু, নিতম্ব, অংস, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, ও মস্তক দেশে কপালাস্থি অবস্থিত। দেহের অস্থিময় গর্ত্ত সকল কপালাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহারা প্রশস্তাকৃতি। দন্ত সকলকে রুচকাস্থি কহা যায়। এই রুচকাস্থি চারি প্রকার যথা—ছেদন, শোধন, দ্ব্যগ্র ও পেষণ। ছেদনদন্ত ঊর্দ্ধপংক্তিতে ৪, ও নিম্ন পংক্তিতে ৪। শোধন দন্ত ঊর্দ্ধে ২ ও নিম্নে ২। দ্ব্যগ্র দন্ত ঊর্দ্ধে ৪ ও নিম্নে ৪ এবং পেষণ দন্ত ঊর্দ্ধে ৬, ও নিম্নে ৬, এই সমুদায়ে ৩২টী দন্ত। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলস্থ অস্থি বলয়াস্থি নামে অভিহিত হয়, কেহ কেহ ইহাদিগকে অণ্বস্থি বলিয়া থাকেন, সুতরাং কোন কোন স্থানে বলয়াস্থিকে অণ্বস্থিও বলা হইবে। শরীরের মধ্যে দৃঢ় ও ঈষচ্চল অঙ্গ সমস্ত বলয়াস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও অক্ষিকোষস্থ অস্থি সমুদায় তরুণাস্থি নামে অভিহিত। ইহাকে অসমগাত্রাস্থিও বলা হয়। এই সমস্ত অস্থির কোন অংশ সূক্ষ্ম কোন অংশ দীর্ঘ। ইহাকে উপাস্থিও বলা হয়।

অপর সমুদায় অস্থিকে নলকাস্থি বলে।

অন্যচ্চ—নলকাস্থীনি নলবচ্ছুষিরাণি সুদীর্ঘাণি চ তানি শাখাস্ববস্থিতানি।

নলকাস্থি সমুদায় নলের ন্যায় অন্তশ্ছিদ্র অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত। ইহারা বাহু ও শক্থিতে অবস্থিত।

সর্ব্বাণ্যেবাস্থীনি বহিরন্তঃ সমন্তাৎ কলাবৃতানি সগর্ভাণি চ। তেষাং গর্ভাঃ পীতাভ স্নেহ বিশেষেণ পূর্ণাঃ, স মজ্জা ইত্যভিধীয়তে। অস্থ্নাং সন্ধিষু কলা ন দৃশ্যতে। তে হি তনুভিস্তরুণাস্থিভি রাবৃতাঃ সন্তি। অস্থিগাত্রাণি কচিদ বটুমন্তি, কচিদুৎসেধবন্তি চ।

অস্থি সমস্ত বহির্ভাগে ও অন্তর্ভাগে, সমন্তাৎ কলা অর্থাৎ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে, কিন্তু ইহাদের সন্ধি সমস্ত কলা দ্বারা আবৃত থাকে না, সন্ধিস্থান পাতলা উপাস্থি দ্বারা আবৃত থাকে। অস্থি সকল সগর্ভ, ইহাদের গর্ভ পীতবর্ণ স্নেহবিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে, উহাকে মজ্জা বলা যায়। অস্থি গাত্রে কোথাও গর্ত্তবৎ খাত, কোথাও বা উচ্চতা দৃষ্ট হয়।

ত্বঙ্‌মাংসাদি রহিতঃ স্বস্থানস্থিতঃ শরীরাস্থি চয়ঃ কঙ্কালসংজ্ঞো ভবতি।

ত্বঙ্‌মাংসাদি রহিত স্বস্থানস্থিত দেহাস্থি সমূহকে কঙ্কাল বলা যায়।

কেহ কেহ এই কঙ্কালকে ছয়-ভাগে বিভক্ত করেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন—

তত্রায়ং শরীরস্যাঙ্গবিভাগঃ। তদ্ যথা— দ্বৌ বাহূ, দ্বে সক্‌থিনী, শিরো গ্রীব মন্তরাধি বিতি ষড়ঙ্গ মঙ্গং।

শরীরের ছয়টী অঙ্গ বিভাগ যথা— দুইটী বাহু, দুইটী ঊরু, শিরোগ্রীব, এবং অন্তরাধি (মধ্য শরীর)।

অস্থি গণনা বিষয়ে পরস্পর মতের বড়ই পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুশ্রুত বলেন—"শল্যতন্ত্রে ত্রীণ্যেবশতানি" মনুষ্য দেহে তিনশত অস্থি আছে। চরক— শরীরের অস্থি সংখ্যা তিনশত ষাট নির্দ্দিষ্ট করেন যথা—

ত্রীণি ষষ্ঠ্যধিকানি শতান্যস্থ্নাং সহ দন্তোদূখল নখৈঃ।

চরক প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থের মত সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধৃত করায়, বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা না দেখিয়া আমরা সে বিষয়ে নিরস্ত থাকিলাম। ইচ্ছা হইলে মূল পুস্তক দেখিয়া সংশয় দূর করিতে পারেন। আমরা এ প্রবন্ধে সুশ্রুতোক্ত ও সংগ্রহকার ধৃত মতই উদ্ধৃত করিলাম। ইহা দ্বারা কেহ যেন মহামান্য চরক প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকর্ষ বিষয়ে ন্যূনতা বোধ না করেন।

তেষাং সবিংশ মস্থিশতং শাখাসু, সপ্তদশোত্তরং শতং শ্রোণিপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু। গ্রীবাংপ্রত্যূর্দ্ধং ত্রিশষ্টিঃ। এব মস্থ্নাং ত্রীণি শতানি পূর্য্যন্তে।

হস্ত ও পাদদ্বয়ে একশত কুড়িখানি ১২০, শ্রোণি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষস্থলে একশত সতরখানি ১১৭, গ্রীবার ঊর্দ্ধে তেষট্টিখানি ৬৩, সমুদায়ে তিনশত। ১২০ + ১১৭ + ৬৩ = ৩০০।

একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ। তলকূর্চ্চ গুল্ফ সংশ্রিতানি দশ। পাষ্ণ্যা মেকম্। জঙ্ঘায়াং দ্বে। জান্বন্যেকম্। এক মূরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ শক্‌থ্নি ভবন্তি। এতেনেতব শক্‌থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ। শ্রোণ্যাং পঞ্চ তেষাং গুদ ভগ নিতম্বেষু চত্বারি। ত্রিক-সংশ্রিতমেকম্। পার্শ্বে ষট্‌ত্রিংশদেবমেকস্মিন্, দ্বিতীয়েঽপ্যেবম্। পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ। অষ্টাবুরসি। দ্বে অক্ষকসংজ্ঞে, গ্রীবাযাং নবকম্। কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি। দ্বে হন্বোঃ। দন্তা দ্বাত্রিংশৎ। নাসায়াং ত্রীণি। একং তালুনি। গণ্ড কর্ণ শঙ্খেষ্বেকৈকম্। ষট্ শিরসি।

এক এক পদাঙ্গুলিতে তিন তিনখানি করিয়া পোনের খানি অস্থি আছে। এইস্থলে একটী মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য হস্ত ও পদাঙ্গুলিতে চতুর্দ্দশখানি করিয়া অস্থি গণনা করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পণ্ডিতগণও অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপর অঙ্গুলিতে তিনখানি ও অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি অস্থি গণনা করেন।

আমাদের বোধ হয় সর্ব্বভূত তত্ত্বজ্ঞ অগ্নিবেশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ এস্থলে অঙ্গুষ্ঠ মূলের অস্থি ধরিয়া গণনা করিয়া থাকিবেন। সুশ্রুতমতে স্পষ্টই বোধ হয় যে অঙ্গুল্যস্থি গণনা ঐরূপেই হইয়াছে, কারণ সুশ্রুত ও সংগ্রহকারগণ সকলের মতেই সমগ্র হস্তে ও পদে ষাটিখানি করিয়া অস্থি আছে। সুতরাং ঐরূপ গণনা না হইলে সমষ্টিতে একরূপ হইতে পারে না।

আমরা সংগ্রহকারগণের মতও উদ্ধৃত করিতেছি, আধুনিক প্রথার সহিত উহার অনেক সাদৃশ্য আছে এবং সহজে লোকের বোধগম্য হয়।

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি, অন্যত্রাঙ্গুষ্ঠাৎ, অঙ্গুষ্ঠে দ্বে, তানি চতুর্দ্দশ। প্রপদে পঞ্চ, তান্যগ্রতোঽঙ্গুলীনাং মূলাস্থি খণ্ডৈঃ পঞ্চভি র্মিলিতানি, তেষাং কতিপয়ানি গুল্ফ সন্ধি পর্য্যন্তং বিস্তৃতানি।

গুল্‌ফে সপ্ত। জঙ্ঘায়াং দ্বে। জান্বন্যেকম্। একমূরাবিতি। ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি দ্বিয়োঃ সক্থ্নো রুপরি বস্তিমুভয়তো দ্বে শ্রোণ্যাস্থিনী স্তঃ। অনয়োরবগ্রভাগা বৌপস্থিকাস্থি সংজ্ঞাং লভেতে, এতেনেতর সক্থি ব্যাখ্যাতম্।

অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপর চারি পদাঙ্গুলিতে তিন তিন খানি করিয়া অস্থি আছে, অঙ্গুষ্ঠে দুই খানি, অতএব পাঁচ অঙ্গুলিতে অস্থি সংখ্যা ১৪। প্রপদে ৫ খানি, ইহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগ যথক্রমে পাঁচটী অঙ্গুলির মূল পর্ব্বাস্থির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের কয়েকটী মাত্র গুল্‌ফ সন্ধির সহিত মিলিত। গুল্‌ফে ৭ খানি অস্থি। জঙ্ঘায় ২ খানি। জানু অর্থাৎ হাঁটুতে ১ খানি, ইহাকে চলিত ভাষায় মালাই-চাকি বলে। ঊরুতে ১ খানি। অতএব প্রত্যেক সক্‌থিতে (বঙ্ক্ষণ সন্ধি হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্থানে) ৩০ খানি করিয়া অস্থি আছে। অপর প্রত্যেক সক্‌থির উপর বস্তির উভয় পার্শ্বে এক এক খানি শ্রোণ্যস্থি আছে, ইহাদের অগ্রভাগকে ঔপাস্থিকাস্থি অর্থাৎ মেঢ্র বা যোনি সংপৃক্ত অস্থি কহে। শ্রোণ্যস্থি লইয়া গণনা করিলে প্রত্যেক অধঃশাখায় অস্থি সংখ্যা ৩১ খানি করিয়া হইবে।

পাদাঙ্গুলিবৎ করাঙ্গুলিষু চতুর্দ্দশ। প্রপদবৎ করভে পঞ্চ। মণিবন্ধে অষ্টৌ, প্রকোষ্ঠে দ্বে। প্রগণ্ডে একম্। ত্রিংশদেব মেকস্মিন্ বাহা বস্থীনি ভবন্তি। প্রগণ্ডাস্থ্ন উপরিত এক মংসাস্থি। অংসাস্থিত উরোঽস্থি পর্য্যন্তং বিস্তৃতং জত্র্বস্থি। এতেনেতরবাহুর্ব্যাখ্যাতঃ।

পাদাঙ্গুলির ন্যায় পঞ্চ করাঙ্গুলিতে ১৪ খানি অস্থি আছে। প্রপদবৎ করভে ৫ খানি। মণিবন্ধে ৮ খানি। প্রকোষ্ঠে ২ খানি। প্রগণ্ডে ১ খানি। অতএব প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি করিয়া অস্থি আছে। প্রগণ্ডাস্থির উপর অংসাস্থি। অংসাস্থি হইতে উরোঽস্থি পর্য্যন্ত বক্ষের উপরে ও সম্মুখভাগে এক এক জত্র্বস্থি আছে। অংসাস্থি ও জত্র্বস্থি লইয়া গণনা করিয়া এক এক উর্দ্ধশাখায় ৩২ খানি করিয়া অস্থি হইবে।

উরোঽস্থি অর্থাৎ বক্ষোঽস্থি, একখানি, ইহা উভয় পার্শ্বীয় জত্রুদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত। এই অস্থি ক্রমশ উদরাভিমুখে নিম্নে আসিয়াছে। ইহার নিম্নান্ত অঙ্গুলী দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে ইহাকে চলিত ভাষায় বুকের কড়া বলা হইয়া থাকে। এই অংশ উপাস্থি স্বরূপ।

পৃষ্ঠ বংশঃ পরস্পরমিলিতৈঃ কশেরুকাভিধৈঃ ষড় বংশত্যস্থিখণ্ডৈ র্নির্ম্মিতানি। স হি গ্রীবা মারভ্য ক্রমেণ নিম্নাভিমুখো গুহ্যপশ্চাদ্‌ভাগ পর্য্যন্ত মাগতঃ। নিম্নখণ্ডং ত্রিকনাম্নাভিধীয়তে।

পৃষ্ঠবংশ (পিঠের দাঁড়া) পরস্পর মিলিত ২৬ খানি অস্থিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত এবং গ্রীবাদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখ হইয়া গুহ্য দেশের পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত হইয়াছে। ঐ ২৬ খণ্ডের প্রত্যেককে এক একটী কশেরুকা বলা যায়। সর্ব্ব নিম্নের কশেরুকার বিশেষ নাম ত্রিকাস্থি।

একৈকস্মিন্ পার্শ্বে দ্বাদশ পর্শুকাঃ পৃষ্ঠবংশতো ধনুর্ব্বদ্ বক্রাঃ। দেহস্য সম্মুখভাগমাগতাস্তাসা মূর্দ্ধস্থাঃ সপ্ত উরোহস্থ্না মিলিতাঃ, শেষাঃ পঞ্চ সাম্মুখ্যেন কেনাপ্যস্থ্না মিলিতাঃ। প্রথমামারভ্য অষ্টম পর্শুকাং যাবৎ ক্রমেণ দৈর্ঘ্যবৃদ্ধিস্ততঃ ক্রমশো হানিঃ। একৈকস্যাঃ পর্শুকায়া অগ্রত একৈকং তরুণাস্থি বিদ্যতে তত্রোর্দ্ধস্থানাং সপ্তানাং তরুণাস্থীনি উরোহস্থ্না, তন্নিম্নগতানাং তিসৃনাং ত্রীণি পরস্পরং মিলিতানি শেষয়োর্দ্ধয়োর্দ্ধে ন কেনাপি মিলিতে।

শরীরের প্রত্যেক পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া পর্শুকা অর্থাৎ পঞ্জরাস্থি আছে, ইহাদের প্রত্যেকটী পৃষ্ঠবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া শরীরের সম্মুখ দিকে আসিয়াছে। তন্মধ্যে উপরিস্থ ৭ খানি বক্ষোঽস্থির সহিত মিলিয়াছে, নিম্নের পাঁচ খানি অভিমুখ দিকে কোন অস্থির সহিত মিলিত হয় নাই। প্রথম হইতে অষ্টম পর্শুকা পর্য্যন্তের ক্রমশঃ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, তন্নিম্নের ৪ খানির যথাক্রমে দৈর্ঘ্যের হ্রাস হইয়াছে। প্রত্যেক পর্শুকার অগ্রভাগে একখানি করিয়া তরুণাস্থি বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে উর্দ্ধস্থ ৭ খানির তরুণাস্থি বক্ষোঽস্থির সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তন্নিম্নস্থ ৩ খানির তরুণাস্থি পরস্পর মিলিত। অবশিষ্ট পর্শুকা দুইখানির উপাস্থি কাহারও সহিত মিলিত হয় নাই।

করোটা বষ্টাস্থীনি সন্তি যথা, একং ললাটে। দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োরূর্দ্ধতঃ পরস্পর মিলিতে দ্বে উর্দ্ধশিরঃ পার্শ্বাস্থিনী। তন্নিম্নতো দ্বয়োঃ পার্শ্বযোর্দ্বে শঙ্খাস্থিনী। পশ্চাদেকং পৃষ্ঠ বংশস্যোর্দ্ধকশেরুকোপরি স্থিতম্। করোটিমূলেঽগ্রতঃ শৌষিরাস্থি, বহুভিঃশুষিরৈ র্ব্যাপ্তত্বাদস্য শৌষির সংজ্ঞা। করোটি মূলে পশ্চিমা একম্। এতচ্ছেষৈঃ সপ্তভির্মিলিতম্। এবং করোটা বষ্টাস্থীনি পূর্য্যন্তে। করোটিগহ্বরং মস্তিষ্কস্য স্থানম্।

করোটীতে ৮ খানি অস্থি আছে, যথা ললাটে এক খানি। দুইপার্শ্বে উর্দ্ধদিকে ২ খানি উর্দ্ধশিরঃপার্শ্বাস্থি, ইহারা উর্দ্ধদিকে পরস্পর অতি সুন্দররূপে মিলিতহইয়াছে। উর্দ্ধশিরঃপার্শ্বাস্থিদ্বয়ের নিম্নে দুইপার্শ্বে দুই শঙ্খাস্থি। পশ্চাতে ১ খানি উপরিস্থ পৃষ্ঠকশেরুকার উপরিস্থিত। করোটির মূলে ও অগ্রে শৌষিরাস্থি, বহু শুষির অর্থাৎ ছিদ্রের দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া ইহার শৌষির নাম হইয়াছে। কারোটির মূলে ও পশ্চাতে একখানি, ইহা উক্ত সাত খানি অস্থিরই সহিত মিলিত থাকে। করোটি গহ্বরে মস্তিষ্ক অবস্থিত থাকে।

বদন মণ্ডলে চতুর্দ্দশাস্থীনি সন্তি। যথা দ্বে নাসাস্থিনী বদন মণ্ডলস্যোর্দ্ধং মধ্যতো দ্বয়োঃ পার্শ্বযোঃ স্থিতে পরস্পর মিলিতে চ। নেত্র বিবরস্যাভ্যন্তর মভিতো দ্বে তন্বস্থিনী। নাসারন্ধ্র ব্যবধায়িন্যা ভিত্তেঃ পশ্চাদেকম্। নাসিকাধশ্ছিদ্রস্য উপরি দ্বে উষ্ণীষাস্থিনী। তালুনি দ্বে। দ্বে গণ্ডয়োঃ। দ্বে উর্দ্ধহন্বস্থিনী বদন মণ্ডল মুভয়তোঽধিষ্ঠিতে, দন্তবেষ্টীয় বৃহদ্ গহ্বর বতী চ। এক মধো হন্বস্থি নিম্নতো বদনস্যাবস্থিতং। অত্রৈবাধোদন্ত পংক্তি স্তিষ্ঠতি।

বদন মণ্ডলে ১৪ খানি অস্থি আছে যথা—নাসাস্থি দুই খানি, ঐ অস্থিদ্বয় বদন মণ্ডলের উর্দ্ধভাগে মধ্যাংশে উভয় পার্শ্বে-স্থিত ও পরস্পর মিলিত। নেত্রবিবরের অভ্যন্তরের সম্মুখে তন্বস্থি অর্থাৎ পাতলা অস্থি দুই খানি। নাসারন্ধ্র ব্যবধায়িনী ভিত্তির পশ্চাতে এক খানি। নাসিকার অধশ্ছিদ্রের উপরে উষ্ণীষাস্থি দুই খানি, উষ্ণীষাকৃতি বলিয়া ইহাদের নাম উষ্ণীষাস্থি। তালুতে দুই খানি। দুইগণ্ডে দুই খানি। উর্দ্ধ হন্বস্থি দুই খানি, বদনমণ্ডলের উভয়পার্শ্বে স্থিত এবং উর্দ্ধ দন্ত বেষ্টীয় বৃহৎ গহ্বরযুক্ত।

অধোহন্বস্থি ১ খানি, বদনমণ্ডলের নিম্নভাগে অবস্থিত, ইহাতে অধঃস্থ দন্ত পঙ্‌ক্তি অবস্থিত থাকে।

একৈকস্য কর্ণস্যাভ্যন্তরত স্ত্রীণি ত্রীণি ক্ষুদ্রাস্থীনি সন্তি।

প্রত্যেক কর্ণের অভ্যন্তরে ৩ খানি করিয়া ক্ষুদ্রাস্থি আছে।

জিহ্বামূলাৎপশ্চাদেকং ক্ষুদ্রাস্থি, ন কেনাপ্যস্থ্না সংযুতং, পেশীভি বেব ধৃতং তিষ্ঠতি।

জিহ্বামূলের পশ্চাদ্দিকে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে, উহা অপর কোন অস্থির সহিত সংযুক্ত নহে। পেশীদিগেব দ্বারা ধৃত হইয়া স্বস্থানে অবস্থিত থাকে।

অঙ্গুষ্ঠ মূলাদিষু কলায পরি মণ্ডলানি কতি পয়াণ্যণুমণ্ডলাস্থীনি সন্তি, সংখ্যাত শ্চৈতানি প্রায়শোঽষ্টৌ।

অঙ্গুষ্ঠ মূল প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি অণুমণ্ডলাস্থি আছে, ইহাদের আকৃতি মটরকলায়ের ন্যায়। ইহাদের সংখ্যা সচরাচর ৮।

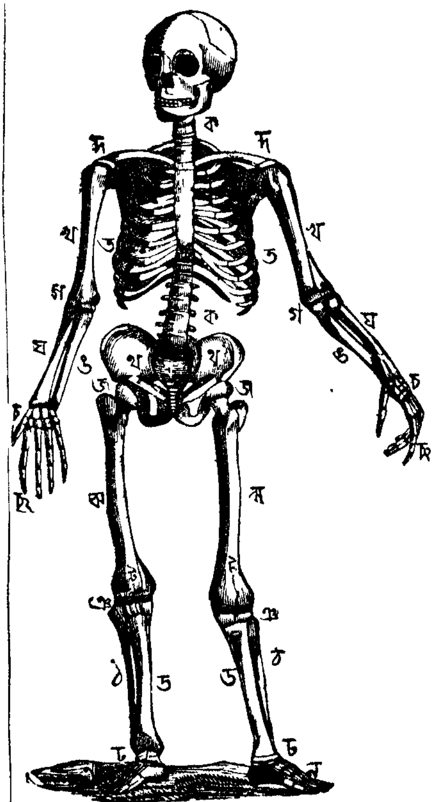
অতঃ ষট্ চত্বারিংশ দধিক দ্বিশত সংখ্যকাস্থি ময়োঽয়ং নর কঙ্কাল ইতি ভগবত উরভ্রস্য মতম্। যথা—

শকথ্নো র্দ্বিষষ্ঠি রস্থীনি বাহ্বোস্তু দ্ব্যধিকানি চ।
উরস্যেকং পৃষ্ঠবংশে ষড়বিংশতি রতঃপরম্॥
পর্শুকাঃ পার্শ্বয়ো র্জ্ঞেয়া শ্চতুর্বিংশতি সম্মিতাঃ।
অস্থীন্যষ্টৌ করোটৌ চ বদনেঽথ চতুর্দ্দশ॥
কর্ণয়োঃ ষট্ তথৈকঞ্চ রসনামূলসংশ্রিতম্।
অষ্টাণু মণ্ডলানি স্যু র্দ্বাত্রিংশদ্ দশনা মতাঃ॥

এতেভ্যোঽতি রিক্তান্যপি কতিপয়ানি ক্ষুদ্রাস্থীনি কঙ্কালে দৃশ্যন্তে।

অতএব নরকঙ্কালে ২৪৬ খানি অস্থি সংখ্যা করা হয়। যথা—

শকৃথিদ্বয়ে	...	৬২
বাহুদ্বয়ে	...	৬৪
বক্ষে	...	১
পৃষ্ঠবংশে	...	২৬
পার্শ্বদ্বয়ে (পর্শুকা)	...	২৪
করোটিতে	...	৮
বদনমণ্ডলে	...	১৪
কর্ণদ্বয়ে	...	৬
জিহ্বামূলে	...	১
অণুমণ্ডলাস্থি	...	৮
দন্ত	...	৩২
সমষ্টি	...	২৪৬



এই চিত্রে ন গুল্‌ফ সন্ধি ও তত্রত্য-সপ্ত অস্থি, ইহাদের অগ্রভাগে পঞ্চ পদাঙ্গুলি।

ট গুল্ফ সন্ধি।
ঠ ও ড জঙ্ঘাস্থ অস্থিদ্বয়।
ঞ জানু সন্ধি।
ট জান্বস্থি বা মালাইচাকি।
ঝ উর্ব্বস্থি।
জ বঙ্ক্ষণ সন্ধি।
থ শ্রোণ্যস্থি।
ছ হস্তাঙ্গুলি সকল।
ছ হইতে চ পর্য্যন্ত অংশে পঞ্চ করভাস্থি।
চ মণিবন্ধস্থ অষ্ট অস্থি।
ঙ ও ঘ প্রকোষ্ঠস্থ অস্থিদ্বয়।
গ কূর্পর সন্ধি।
খ প্রগণ্ডস্থ অস্থি।
দ স্কন্ধ সন্ধি ও অংসাস্থি।
ক পৃষ্ঠবংশ। ইহার সম্মুখে উরোস্থি, ইহা উভয় পার্শ্বস্থ জত্রুদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠবংশ ক হইতে আরম্ভ করিয়া গুহ্য দেশের পশ্চাদ্ভাগে শেষ হইয়াছে, নিম্ন খণ্ডের নাম ত্রিক।

দ হইতে উরোঽস্থি পর্য্যন্ত জত্রুদ্বয়।

ত পর্শুকা সমূহ।

পৃষ্ঠ বংশের উপর দিকে বদন মণ্ডলাস্থি ও করোট্যস্থি প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদ পরিভাষা।

অব্যামুক্ত লেশোক্ত সন্দিগ্ধার্থ প্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥

শাস্ত্রের যে সমস্ত অর্থ অব্যক্ত অর্থাৎ পরিস্ফুট নহে, যাহা উক্ত হয় নাই, যাহা সংক্ষেপে উক্ত কিম্বা যাহার গূঢ় মর্ম্ম সন্দিগ্ধ অর্থাৎ যাহাতে সন্দেহ দূর হয় না, সেই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য বস্তু প্রকাশক দীপ স্বরূপ পরিভাষা কথিত হইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন যে, চিকিৎসা কার্য্যে ঔষধের মাত্রা নিরূপণ একটী প্রধান কার্য্য, সেই মাত্রা অনেক স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, কিরূপে কার্য্য হইবে? কোথাও ঔষধের পরিমাণ বিভিন্ন দেশীয় মতানুসারে লিখিত হইয়াছে। কোন স্থলে একটী উদ্ভিদের নাম মাত্র উল্লেখ রহিয়াছে, উহার মুল, শাখা, পত্র কিম্বা ত্বক্ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কিছুরই উল্লেখ নাই এবং কোন্ বস্তু শুষ্ক গ্রহণ করিতে হইবে বা কোন্ বস্তু আর্দ্র গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও স্পষ্টরূপে লিখিত নাই। পক্ষান্তরে প্রত্যেকবার প্রত্যেক স্থলে না বলিয়া একস্থলে বলিলেই সুবিধা বলিয়া বোধ হয় বলেন নাই। যাহা হউক পরিভাষার বিষয় গুলি জানা না থাকিলে কোন রূপেই চিকিৎসা করা যাইতে পারে না। বিজ্ঞ পাঠকদিগকে অদ্য আমরা ঐ পরিভাষা সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম অবগত করাইতেছি।

ন মানেন বিনা যুক্তি র্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতঃ প্রয়োগ কার্য্যার্থং মান মত্রোচ্যতে ময়া॥
তত্তু মত ভেদান্নানাবিধং ভবতি।

পরিমাণ জ্ঞান ব্যতীত দ্রব্য সমুদয়ের প্রয়োগ অবগত হওয়া যায় না, অতএব প্রথমতঃ প্রয়োগ কার্য্যের নিমিত্ত মান পরিভাষা নির্ণয় করা যাইতেছে। মতভেদ হেতু মান নানাবিধ।

মাগধ মানপরিভাষা।

ত্রস রেণুস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণুস্তু পর্য্যায়নাম্না ধ্বংসী নিগদ্যতে॥
ষড়্ ধ্বংসস্তু মরীচিঃ স্যাৎ ষণ্মরীচ্যস্তু সর্ষপঃ।
ষট্‌সর্ষপৈ র্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈ স্ত্রিভিঃ॥
গুঞ্জাভি র্দশভিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা পুরা।

হেমশ্চ ধামকশ্চৈব পর্য্যায় স্তস্য কীর্ত্তিতঃ।
চতুর্ভি র্মাষকৈঃ শাণঃ স নিষ্কাষ্টক মেব চ।
শাণৌ দ্বৌ দ্রঙক্ষণং বিদ্যাৎ কোলং বটকমেব চ॥
কর্ষার্দ্ধং দ্বিগুণং কর্ষং সুবর্ণঞ্চাক্ষমেবচ।
কিঞ্চিদ্ বিড়াল পদকং পিচুঃ পাণিতলং তথা॥
উড়ুম্বরং তিন্দুকঞ্চ কবড়গ্রহমেব চ।
দ্বে সুবর্ণে পলার্দ্ধং স্যাৎ শুক্তি রষ্টমিকা তথা॥
দ্বে পলার্দ্ধে পলং মুষ্টীঃ প্রকুঞ্চশ্চ চতুর্থিকা।
বিল্বং ষোড়শিকাম্রঞ্চ দ্বে পলে প্রসৃতং বিদুঃ॥
কুড়বঃ প্রসৃতাভ্যাং স্যাদঞ্জলিঃ স নিগদ্যতে।
অষ্টমানং শবাবার্দ্ধং তস্য পর্য্যায় এবচ॥
কুড়বাভ্যাং মাণিকা স্যাৎ শবাবোঽষ্টপলং তথা।
মাণিকাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থো জ্ঞেয়ং ষোড়শভিঃ পলৈঃ॥
চতুঃপ্রস্থৈ রাঢ়কঃ স্যাৎ পাত্রং কংসশ্চ ভাজনম্।
অয়ং ভিষগ্‌ভি রাখ্যাত শ্চতুঃষষ্টি পলৈ রিহ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈ র্দ্রোণঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
ঘটঃ কলস উন্মানো নল্বণোঽর্ম্মণ এব চ॥
দ্রোণপর্য্যায় নামানি কীর্ত্তিতানি ভিষগ্‌বরৈঃ।
অয়ঞ্চ পলসংখ্যাতঃ ষট্‌পঞ্চাশৎ শতদ্বয়ম্॥
দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টি শরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বৃহদ্দ্রোণী চ সা স্মৃতা॥
দ্রোণী চতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃ সহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারঃ স্যাদ্ বিংশতিস্তুলা।
পলানাং দ্বিসহস্রাণি ভারঃ পরিমিতো বুধৈঃ॥
মাষকঃ শাণ তিন্দূকে পলং কুড়ব প্রস্থকৌ।
রাশি র্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তর চতুর্গুণাঃ॥
শুষ্ক দ্রব্যে দ্বিদং মানং দ্বিগুণন্তু দ্রবার্দ্রয়োঃ॥
জ্ঞাতব্যং কুড়বাদূর্দ্ধং প্রস্থাদিপ্রভৃতি মানতঃ॥
কুড়বেঽপি কচিদ্ দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্।
অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শন মুচ্যতে॥
অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে তথৈব চ।
অন্যচ্চ—কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে॥
শুষ্ক দ্রব্যে তু যা মাত্রা চার্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।
শুষ্কস্য গুরু তীক্ষ্ণত্বা তস্মাদর্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্।

মাগধ পরিভাষা অনুসারে ৩০ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু বা ধ্বংসী। ৬ ধ্বংসীতে এক মরীচি। ৬ মরীচিতে একসর্ষপ। ৬ সর্ষপে এক যব। ৩ যবে এক গুঞ্জা বা রতি। ১০ রতিতে এক মাষা। মাষার অপর নাম হেম ও ধামক। ৪ মাষায় ১ শাণ। ৮ নিষ্কেও ১ শাণ হয়। ২ শাণে ১ দ্রঙ্ক্ষণ। দ্রঙ্ক্ষণের অপর নাম কোল ও বটক। ২ দ্রঙ্ক্ষণ বা কোলে এক কর্ষ। সুবর্ণ, অক্ষ, বিড়াল পদক, পিচু, পাণিতল, উড়ুম্বর, তিন্দুক ও কবড়গ্রহ কর্ষের নামান্তর। ২ কর্ষে ১ পলার্দ্ধ, শুক্তি বা অষ্টমিকা। ২ শুক্তিতে ১ পল, ইহার অপর নাম মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব, ষোড়শিকা ও আম্র। ২ পলে ১ প্রসৃত। ২ প্রসৃতে ১ কুড়ব, ইহার নামান্তর অঞ্জলি, অষ্টমান ও শরাবার্দ্ধ। ২ কুড়বে ১ মাণিকা, ইহার পর্য্যায় শরাব ও অষ্টপল। ২ মাণিকায় ১ প্রস্থ। ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক। পাত্র, কংস ও ভাজন আঢ়কের অপর নাম। ৬৪ পলে ১ আঢ়ক হয়। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ, ইহার পর্য্যায়—ঘট, কলস, উন্মান, নল্বণ ও অর্ম্মণ। ১ দ্রোণে ২৫৬ পল। ২ দ্রোণে ১ সূর্প বা কুম্ভ। ৬৪ শরাবে ১ সূর্প। ২ সূর্পে ১ বৃহৎ দ্রোণী। ৪ দ্রোণীতে ১ খারী। ৪০৯৬ পলে ১ বৃহৎ দ্রোণী হয়। ১০০ পলে ১ তুলা। ২০ তুলাতে ১ ভার। ২০০০ পলে ১ ভার। মাষা, শাণ, তিন্দুক, পল, কুড়ব, প্রস্থ, রাশি, দ্রোণী, ও খারী ইহারা যথোত্তর চতুর্গুণ অর্থাৎ মাষার চতুর্গুণ শাণ, শাণের চতুর্গুণ তিন্দুক, তিন্দুকের চতুর্গুণ পল, পলের চতুর্গুণ কুড়র, কুড়রের চতুর্গুণ প্রস্থ, প্রস্থের চতুর্গুণ রাশি, রাশির চতুর্গুণ দ্রোণী, এবং দ্রোণীর চতুর্গুণ খারী।

শুষ্ক দ্রব্য বিষয়ে ইহাই পরিমাণ। দ্রব ও আর্দ্র বস্তুর পক্ষে প্রস্থ প্রভৃতি

পরিমাণবাচক শব্দ দ্বৈগুণ্যবোধক। রতি হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত শব্দ সকল দ্রব ও আর্দ্র উভয়স্থলেই তুল্য।

কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দ উল্লেখ করিয়া যাহাদের পরিমাণ বলা যায়, তাহাদের দ্বৈগুণ্য হইবে না কিন্তু কুড়ব পরিমাণে কদাচিৎ দ্বৈগুণ্য দেখা যায়।

পরিমাণবাচক শব্দ সমস্ত শুষ্ক দ্রব্যে যেরূপ অর্থ বোধক হয়, আর্দ্র দ্রব্যে তাহার দ্বৈগুণ্য বাচী হয়।

বাসা নিম্ব পটোল কেতকি বলা কুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী, বর্ষাভূ কুটজাশ্চ গন্ধ সহিতা স্তা পূতিগন্ধামৃতাঃ। মাংসং নাগবলা সহাচর পুরৌ হিঙ্গার্দ্রকে নিত্যশো, গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ।

অন্যচ্চ—

গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী।
অশ্বগন্ধা সহচরো শতপুষ্পা প্রসারণী॥
প্রয়োক্তব্যাঃ সদৈবার্দ্রা দ্বিগুণান্ নৈব কারয়েৎ।

অন্যচ্চ—

বালাকুটজ কুষ্মাণ্ড শতপুষ্পাঃ সহামৃতাঃ।
প্রসারণ্যশ্চ গন্ধাচ নাগাখ্যাতিবলা বলা॥
নিত্য মার্দ্রাঃ প্রয়োক্তব্যা ন তাসাং দ্বিগুণং ভবেৎ।

বাসক, নিম্ব, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষ চাকুলে, ঝাঁটী, গুগ্‌গুলু, হিঙ্গু, আর্দ্রক ও ইক্ষুজাত ঘনদ্রব্য অর্থাৎ গুড় প্রভৃতি আর্দ্র অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাদের দ্বৈগুণ্য দিতে হইবে না।

কালিঙ্গ পরিভাষা।

গবাক্ষ মধ্যে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অতি সূক্ষ্ম রেণু দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে ধ্বংসী কহে। ৬ ধ্বংসীতে ১ মরীচি। ৬ মরীচিতে ১ রাজিকা। ৩ রাজিকায় ১ সর্ষপ। ৮ সর্ষপে ১ যব। ৪ যবে ১ গুঞ্জা বা রতি। ছয় রতিতে ১ মাষা। অপর সমুদায় মাগধ পরিভাষার ন্যায়।

সরল পরিমাণ জ্ঞান।

৩০ পরমাণুতে	১ ত্রসরেণু বা ধ্বংসী।
৬ ধ্বংসীতে	১ মরীচি।
৬ মরীচিতে	১ সর্ষপ।
৬ সর্ষপে	১ যব।
৩ যবে (৪ ধান)	১ রতি।
১২ রতিতে	১ মাষা।

কাহারও মতে ৬ বা ১০ রতিতেও মাষা হয়।

৪ মাষায়	১ শাণ। ।৹ তোলা।
২ শাণে	১ কোল বা ১ তোলা। দ্রংক্ষণ
২ তোলায়	১ কর্ষ।
২ কর্ষে	১ শুক্তি বা ৪ তোলা।
২ শুক্তিতে	১ পল ৮ তোলা।
২ পলে	১ প্রসৃতি ১৬ তোলা।
২ প্রসৃতিতে	১ কুড়ব বা ৩২ তোলা।
২ কুড়বে	১ শরাব, ৬৪ তোলা বা সের।
২ শরাবে	১ প্রস্থ বা /২ সের।
৪ প্রস্থে	১ আঢ়ক বা /৮ সের।
৪ আঢ়কে	১ দ্রোণ বা ৸২ সের।
২ দ্রোণে	১ কুম্ভ বা ১॥৪ সের।
২ কুম্ভে	১ গোণী বা ৩/৮ সের।
৪ গোণীতে	১ খারী বা ১২৸২ সের।
২০০০ পলে	১ ভার।
১০০ পলে	১ তুলা বা ১২॥৹ সের।

ক্রমশঃ—

নাড়ী পরীক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতর প্রাণীগণের গতি অনুসারে যেরূপ নাড়ী পরীক্ষা ক্রিয়া সাধিত হয়, সেইরূপ স্থৌল্য কাঠিন্য ও সন্তাপ অনুসারে নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা বাত পিত্তাদির প্রকোপ ও তজ্জনিত পীড়া অবধারিত হয়।

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা।
ঈষচ্চ দৃশ্যতে তুষ্ণা মন্দা স্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা॥
নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতি বাতলা।
রুক্ষ বাতভবে তস্য নাড়ী স্যাৎ পিণ্ডসন্নিভা॥
সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্ম সমুদ্ভবা।

বাতপৈত্তিক জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, দোলায়মান, স্থূল ও কঠিন হয়। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে নাড়ী ঈষৎ উষ্ণ ও মন্দবেগ সম্পন্ন হয়, যদি বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে বায়ুর অধিক প্রকোপ ও শ্লেষ্মার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম হয়, তবে নাড়ী সর্ব্বদা প্রখর ও রুক্ষভাব ধারণ করে, আর যদি বায়ুর অতিশয় প্রকোপ হয় তবে নাড়ী পিণ্ডবৎ অর্থাৎ অতিশয় বক্র ও অতি স্থূলরূপে অনুভূত হয়। পিত্তশ্লেষ্ম প্রকোপ জন্য জ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম শীতল ও মন্দবেগ হয়।

ঐকাহিক জ্বরে নাড়ী সরল গতি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্বগামিনী হয়। দ্বিতীয়ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে নাড়ী উষ্ণ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয়।

জ্বরকালীন স্ত্রীসঙ্গমে নাড়ী ক্ষীণ ও মন্দগামিনী হয়। শ্রমজনক কর্ম্ম, ভ্রমণ, উৎকট চিন্তা ও শোকাদির দ্বারা জ্বরমুক্ত ব্যক্তির নাড়ীও নানাবিধ গতি অবলম্বন করে।

অজীর্ণে তু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া।
প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতাচ প্রবর্ত্ততে॥
পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেত্তু যা।
লঘ্বী ভবতি দীপ্তাগ্নে স্তথা বেগবতী মতা॥

অজীর্ণ রোগের আম অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় নাড়ী কঠিন ও পার্শ্বে জড়তা প্রাপ্ত হয় এবং কখন নির্ম্মল নির্দ্দোষ ও দ্রুতবেগ সম্পন্ন হয়। পক্কাজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিরহিত হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন ব্যক্তির নাড়ী লঘু ও বেগবতী হয়।

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।
মন্দেঽগ্নৌ ক্ষীণতাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতি স্তথা॥

মন্দাগ্নি ও ক্ষীণ ধাতু সম্পন্ন ব্যক্তির নাড়ী অতিশয় মন্দগামিনী হয়। সাধারণত অগ্নিমান্দ্যে নাড়ী ক্ষীণা হইয়া হংসের ন্যায় গমন করিতে থাকে।

যাহার পাদস্থ নাড়ী হংসের ন্যায় ও করস্থ নাড়ী ভেকের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহার অগ্নিমান্দ্য কিম্বা গ্রহণী রোগ উপস্থিত হইয়াছে, জানিতে হইবে।

সংগ্রহ গ্রহণী রোগে তরল ভেদের পর নাড়ী শান্তবেগ সম্পন্ন হয়। অতিসারক তরল মলভেদে নাড়ী নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। বিলম্বিকা রোগে নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয় এবং আমাতিসারে উহা স্থূল ও জড়বৎ হয়।

মল মূত্র কিম্বা উভয় একদা রুদ্ধ হইলে বা উহাদের বেগ ধারণ করিলে নাড়ী ভেকের ন্যায় গতি ধারণ করে।

ক্রমশঃ—

চক্ষুর্দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে পিত্ত প্রকোপ জনিত জ্বর স্থির করিতে হইবে। পিত্তজ্বরে প্রথমতঃ

বিরেচন ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠের শুদ্ধি বিধান করা প্রয়োজন। কোষ্ঠ শুদ্ধি বিষয়ে আমাদিগের ইচ্ছাভেদী বটিকা একটী মহোপকারক ঔষধ। দ্রাক্ষাদি ক্বাথ পান করাইলে পিত্তজ্বরে অতিশীঘ্র উপকার হইতে দেখা যায়।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ।

দ্রাক্ষা, হরিতকী, মুতা, কট্‌কী, সোঁদাল আঁঠা ও ক্ষেত পাপড়া মিলিত ২ তোলা ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিবে ও অর্দ্ধ পোয়া পরিমাণ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা ২।১ বার মল ভেদ হইয়া জ্বর ত্যাগ হয় এবং জ্বরের আনুষঙ্গিক মুখ শোষ, (মুখ শুকাইয়া যাওয়া), মুখ বৈরস্য (মুখের বিকৃতাস্বাদ) দাহ, পিপাসা, ভ্রম, মূচ্ছা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়। ইহার অমৃতময় ফল বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ ভেদক ঔষধ অতিরিক্ত ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রথম দিবসেই যদি উপযুক্ত ভেদ হইয়া কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তবে আর সেবন না করাইলেও হয়। যাহাদের কোষ্ঠ কঠিন অর্থাৎ সহজে ভেদ হয় না, তাহাদিগের পক্ষে হরীতকী বা সোঁদালের ভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বেশী দেওয়া উচিত, কিন্তু বিরেচন ঔষধ সাবধান পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে হয়, কোন রূপ বৈপরীত্য ঘটিলেই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

পটোলাদি ক্বাথ।

পলতা, ইন্দ্রযব, ধনে ও যষ্টিমধুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, দাহ, ও পিপাসা নষ্ট হয়।

আমরা সদা সর্ব্বদাই মধু ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু মধুর দোষ গুণের প্রতি আমাদের লক্ষ্য অতি কম। দুই একস্থলে আমরা অতি জঘন্য (ধূলি বা পিপিলিকা মিশ্রিত শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ) মধু ও ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। প্রসঙ্গ ক্রমে অত্র মধুর বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে, সকলেরই সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখা অতীব আবশ্যক।

নবং মধু ভবেৎ পুষ্ট্যৈ নাতিশ্লেষ্ম হরং পরম্।
পুরাণং গ্রাহকং রূক্ষং মেদোঘ্ন মতিলেখনম্॥
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ।
একসংবৎসরাতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥

নূতন মধু—পুষ্টিকারক, সারক এবং অতিশয় কফনাশক নহে। পুরাতন মধু ধারক, রূক্ষ, মেদোনাশক এবং অত্যন্ত কৃশতা কারক। নূতন মধু অপেক্ষা পুরাতন মধুই সমধিক ফলদায়ক। এক বৎসর অতীত হইলেই মধু, শর্করা ও গুড় পুরাতন হয়।

বিষান্বয়াত্তদুষ্ণস্তু দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ।
উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু॥

সবিষ ভ্রমরাদি বিষ-বিশিষ্ট পুষ্প হইতেও মধু আহরণ করিয়া থাকে, সেজন্য মধুতেও বিষবৎ পদার্থ আছে। সুতরাং উষ্ণ মধু অতীব অহিতকর। এমন কি উষ্ণার্ত্ত অর্থাৎ গুরুতর পরিশ্রমের পর শরীর উষ্ণ হইলে, উষ্ণকালে কিম্বা উষ্ণ বস্তুর সহিত মিশ্রিত

করিয়া সেবন করিলে প্রভুত অনিষ্টের সম্ভাবনা।

মধু মক্ষিকা কর্ত্তৃক সঞ্চিত মধুকে মাক্ষিক বলে। ছোট ছোট কপিল বর্ণ মক্ষিকাদিগকে ক্ষুদ্রা বলে, ইহাদের সঞ্চিত মধুকে ক্ষৌদ্র বলে। মাক্ষিক দেখিতে সর্ষপতৈল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, বর্ণ ঐরূপ। মধুর মধ্যে মাক্ষিকই শ্রেষ্ট ও অতিশয় লঘু। ক্ষৌদ্র মধু কপিল বর্ণ ও তরল, ইহাও মাক্ষিকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা প্রমেহ নাশক।

গুড়ুচ্যাদি ক্বাথ।

গুড়ূচ্যাম লকৈ র্যুক্তঃ কেবলো বাপি পর্পটঃ।
পিত্তজ্বরং হরে ত্তূর্ণং দাহ শোষ ভ্রমান্বিতম্ ॥
একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর বিনাশনঃ।
কিং পুন র্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ ॥

গুড়ূচী ও আমলকীর সহিত ক্ষেত পাপড়ার ক্বাথ অথবা কেবল ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ পান করিলে দাহ, শোষ ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রববিশিষ্ট পৈত্তিকজ্বর অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়।

একমাত্র ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর নিবারিত হয়, কিন্তু যদি উহার সহিত রক্তচন্দন, বালা, (বিলাতি পাথর কুচি) ও শুঁঠ সংযোগ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই ঐ জ্বরেরও যে আশু প্রতিকার হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কেহ কেহ চন্দনোশীর বালকৈঃ এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল ও বালা এই তিনটী বস্তু দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেন। যাহা হউক আমরা উভয়বিধ কল্পনা দ্বারাই যথোচিত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু সচরাচর প্রথমোক্ত নিয়মেই কার্য্য করা হইয়া থাকে।

পাঠক মহোদয়গণকে আমাদের অনুরোধ একবার ব্যবহার করিয়া ক্ষেত্র পর্প্পটীর এই অপরিসীম শক্তি সন্দর্শন করুন। পিপাসা, দাহ ও বমনবেগ নিপীড়িত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে উক্ত মহৌষধ সেবন করাইয়া, দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান করুন, দেখিতে পাইবেন, বুঝিতে পারিবেন যে, অমরা অত্যাসন্ন (সমীপস্থ) স্নিগ্ধ সলিলা স্রোতস্বিনী পরিত্যাগ করিয়া, মৃগতৃষ্ণায় তৃষ্ণা শান্তি করিতে উদ্যত হইতেছি, বহুমূল্য হীরকখণ্ড ত্যাগ করিয়া বালুকাকণা সযতনে রাখিয়াছি, অনায়াসসাধ্য আর্য্য চিকিৎসায় আস্থা না করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে ভাবী অনিষ্টের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি।

যাহাতে ভারতসন্তানগণ অনায়াসে ভীষণ রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সমধিক প্রচলন হইয়া সেই আর্য্য গৌরব পুনরায় সংস্থাপিত হয়, তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সুপরিক্ষিত সহজ সহজ ঔষধ সমুদায়ের ব্যবহার, গুণ ও প্রস্তুত প্রণালী ক্রমশঃ সুস্পষ্টরূপে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যে সমুদায় ঔষধ প্রস্তুত করা পরিশ্রম ও আয়াস সাধ্য, ঐ সমুদায় ঔষধ আপাততঃ প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিয়া সহজে ও অল্পব্যয়ে যাহা হয় দীন দুঃখী সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন, এরূপ ঔষধ সমুদায় প্রকাশ করা যাইতেছে।

দোষের প্রবলতা অনুসারে জ্বরকালে বমি, তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, অতিসার, হিক্কা,

শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া রোগীকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। ঐ সময়ে উপস্থিত উপদ্রবের নিবারণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

জ্বরকালে পিপাসা প্রবল থাকিলে ধন্যাভিজার জলের সহিত বচাদি বটী ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। অর্দ্ধসের পরিমিত গোদুগ্ধে অর্দ্ধ ছটাক পুরাতন তেঁতুল শস্য গুলিয়া মৃৎপাত্রে ১০ মিনিট কাল জ্বাল দিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে উহার উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ অর্দ্ধছটাক মাত্রায় ১ ঘণ্টায় ৩।৪ বার সেবন করাইলে পিপাসা নিবৃত্তি হয়। একটী পরিস্কৃত শিশি কিম্বা বোতলের মধ্যে অর্দ্ধসের পরিস্কৃত জল দিয়া তাহাতে ১ টী পাতি কিম্বা কাগজী লেবু ৩।৪ খণ্ড করিয়া দিয়া বোতলের মুখ বন্দ করিয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিবে, পরে উত্তমরূপে নাড়িয়া ছাঁকিয়া প্রস্তর বা কাঁচ পাত্রে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ৩।৪ বার সেবন করাইবে। কোন সূক্ষ্ম নল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পান করিতে পারিলে অত্যাশ্চর্য্যরূপে পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক থাকিলে উল্লিখিত উপায় অবলম্বন না করিয়া উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহাতে অল্প শ্বেতচন্দন ঘসিয়া দিয়া একটী মৌরির পুটলী দ্বারা বারম্বার চুষিতে দিবে। ষড়ঙ্গ পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে পারিলেও বিশেষ উপকার হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়।

মুস্ত পর্পটকোশীর চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেনারমূল, রক্ত চন্দন, বালা ও শুঁট মিলিত ২ তোলা /৪ সের জলে জ্বাল দিয়া /২ সের আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে এই জল পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হয় ও জ্বর প্রশমিত হয়।

জ্বর কালীন বমন নিবারণের জন্য এলাদি চূর্ণ ২ রতি মাত্রার বড় এলাইচের জলের সহিত মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে বমন ও বমনবেগ নিবৃত্তি হয়।

অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে ১০।১২ খানি পরিষ্কার বাতাসা ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাতে শ্বেতচন্দন ঘসা অর্দ্ধতোলা ও বেনাবমূল অর্দ্ধতোলা শিলায় পেষণ করিয়া দিবে এবং উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া গেলে, ছাঁকিয়া লইয়া এক তোলা মাত্রায় বারম্বার সেবন করাইলে অতি শীঘ্র বমি ও বমির বেগ প্রশমিত হয়।

বরফের খণ্ড মুখে ধারণ করিলে বমি ও হিক্কা আশু নিবৃত্ত হয়। ২ তোলা ক্ষেতপাপড়া অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ২।৩ বার সেবন করাইলে বমির বেগ ও হিক্কা নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। টাক্‌কা মুড়িভিজার জল ও পোড়ারুটী ভিজার জল বমি নিবারণের মহৌষধ।

হিক্কা উপস্থিত হইলে রোগীর ঊর্দ্ধ উদরোপরে (উপর পেটে) তৈল মর্দ্দন করিয়া জলস্বেদ (ফোমেণ্ট) দিবে।

রহিসর্ষপচূর্ণ অর্দ্ধতোলা অর্দ্ধসের জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া শীতল হইলে তাহার স্বচ্ছাংশ অর্দ্ধছটাক মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

নির্ধূম অঙ্গারাগ্নি অর্থাৎ কাঠের কয়লার আগুন যখন ধূমরহিত হয়, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ হিঙ্গু, গোল মরিচ কিম্বা মাষ কলাই ইহার কোন একটী নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। উল্লিখিত উপায় সমুদয় দ্বারা আশু সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা অনেক স্থলে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শ্লেষ্ম জ্বর চিকিৎসা।

শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজমিতি
সুশ্রুতঃ।

শ্লেষ্ম প্রকোপ জন্য জ্বরে লঙ্ঘনের সীমা দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ দোষের শমতা না হইলে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্তও রোগীকে লঙ্ঘনাবস্থায় রাখিতে হয়। শ্লৈষ্মিক জ্বরের যে সমস্ত উপদ্রব বা লক্ষণ লিখিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদ্বারাই নিশ্চয় করিতে হইবে যে, ইহা শ্লেষ্ম প্রকোপ সম্ভূত জ্বর।

নিম্বাদি ক্বাথ।

নিম্ব বিশ্বামৃতা দারু শঠী ভূনিম্ব পৌকরম্।
পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরম্॥

নিমছাল, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, দেবদারু, শটী, চিরতা, কুড়, পিপ্পলী ও বৃহতী এই সমুদায়ের সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিবে ও অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে শ্লৈষ্মিক জ্বর প্রশমিত হয়।

ক্বাথ পাক বিধি অনুসারে নিশিন্দা পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে পিপ্পলী চূর্ণ ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে শ্লৈষ্মিক জ্বর প্রশমিত হয় এবং জঙ্ঘাদৌর্ব্বল্য ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা দূর হয়।

জ্বরের মধ্যে শ্বাস বা কাস বর্ত্তমান থাকিলে চতুর্ভদ্রাবলেহিকা প্রদান করা বিধেয়। কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী ও পিপ্পলী ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ মিশ্রিত করিয়া দ্বিগুণ মধুর সহিত ২ মাষা (১৬ রতি) পরিমাণে অবলেহন করিলে শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব সমন্বিত জ্বর নষ্ট হয়।

উর্দ্ধজত্রুজ রোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা।
অধোরোগহরী যা তু সা পূর্ব্বং ভোজনান্মতা॥

উর্দ্ধজত্রু অর্থাৎ কণ্ঠদেশের উপরি ভাগস্থ রোগ নাশের জন্য সন্ধ্যার সময় অবলেহ করিতে হইবে এবং কণ্ঠদেশের অধোভাগস্থ পীড়া প্রশমনের জন্য প্রাতঃ কালে অবলেহ করিতে হইবে। প্রসঙ্গ ক্রমে অবলেহ সম্বন্ধে যে নিয়ম অত্র বলা হইল। পাঠকগণের সর্ব্বত্রই ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্লৈষ্মিক জ্বরের বা সান্নিপাতিক জ্বরের প্রথম হইতেই "কফকেতু" ঔষধ ব্যবহার করাইলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। জ্বরের প্রবলতা অনুসারে কিঞ্চিৎ মহালক্ষ্মীবিলাস, স্বর্ণসিন্দুর বা "বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব রস" মধু দিয়া মাড়িয়া পানের রস, আদার রস কিম্বা আদা পান উভয়ের রসের সহিত সেবন করাইলে অতি শীঘ্র উপকার হইয়া থাকে। এই সমস্ত তেজস্কর ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইয়াই বিশেষ ফল প্রদান করে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা ন্যায় সঙ্গত নহে।

কফকেতু।

শঙ্খভস্ম ॥০ তোলা, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,) সমভাগে মিলিত ১॥০ তোলা, সোহাগার খই ॥০ তোলা ও শোধিত মিঠাবিষ ২॥০ তোলা আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার ১ বটী আদার রসের সহিত সেব্য। ইহা-সেবনে শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

নিদ্রা।

মহর্ষিগণ অষ্টবিধ পুরুষকে নিন্দিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অতি স্থূল ও অতিকৃশ ব্যক্তিই বিশেষ নিন্দনীয়। এই স্থৌল্য ও কৃশতা সম্পূর্ণরূপে আহার ও নিদ্রার আয়ত্ত, আহারে দ্বারা মনুষ্যগণ যেরূপ বল, বর্ণ, স্থৌল্য ও কৃশতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিদ্রা দ্বারাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিদ্রা ও আহার পরস্পর পরস্পরের সাহায্য লইয়া উল্লিখিত ও অপরাপর দোষ গুণ উৎপাদন করে। কেবলমাত্র আহার বা নিদ্রা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, সুতরাং আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধীয় নিয়ম সমুদায় আমাদিগের স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, যেরূপ নিদ্রা আমাদের পক্ষে হিতকরী তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

অচিন্তনাচ্চ কার্য্যাণাং ধ্রুবং সন্তর্পণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরো বরাহ ইব পুষ্যতি॥

মহর্ষি লিখিয়াছেন—কোনরূপ বৈষয়িক চিন্তা না করা, সন্তর্পণ ঔষধি অর্থাৎ যাহাতে শরীর স্নিগ্ধ ও পুষ্ট হয় এবং নিয়মিত সুনিদ্রা এই সকল দ্বারা মনুষ্য বরাহের ন্যায় পুষ্টিলাভ করে। মহর্ষির এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, অতি কৃশ ব্যক্তিও যদি উল্লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করেন, তবে অবশ্যই তাহার শরীর স্থূল হইয়া উঠে। সাধারণতঃ সমুদায় মনুষ্যের একরূপ নিদ্রা হিতকর হইতে পারে না, কারণ সকলেরই প্রকৃতি বিভিন্ন।

অকালেঽতি প্রসঙ্গাচ্চ নচ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী নরা কুর্য্যাৎ কালোযেবাগতা নরং॥
সৈবযুক্তা পুনয় ঙ্‌ক্তে নিদ্রা দেহং সুখায়ুসা।
পুরুষং যোগিনং সিদ্ধ্যা সত্যা বুদ্ধি বিবাগতা॥

অসময়ে অতি নিদ্রা ও সময়ে অনিদ্রা মনুষ্যের সুখ ও আয় নষ্ট করে। সেই নিদ্রা সুনিয়মে সেবিত হইলে মনুষ্যকে সুখ ও আয় প্রদান করে।

সময় বিচার করিতে হইলে রাত্রিই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। মনুষ্যগণ দিবসে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশ্রান্ত হয়, দিবসের অবসানে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের আর পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকে না, কিন্তু রাত্রিতে সুনিদ্রা উপভোগ করিয়া দৈনিক শ্রম হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত হয়, রাত্রি প্রভাত হইলে পূর্ব্ববৎ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি কোন দিন কোন মতে কাহারও রাত্রিতে সুনিদ্রা না হয়, তবে শরীর এতই অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহা বলা কঠিন। মনুষ্য ২।৪ দিবস অনাহারে যে কষ্ট অনুভব না করে, অনিদ্রাজন্য তদপেক্ষা সমধিক বোধ করিয়া থাকে। রাত্রিতে অনিদ্রা যেরূপ

আমাদের শরীরের ঘোর অনিষ্ট সাধন করে, দিবসের নিদ্রাও তদ্রূপ।

আমাদের ধারণা যে কোন কালেই দিবানিদ্রা হিতকরী নহে কিন্তু গ্রীষ্ম-কালে যে দিবানিদ্রার বিধি আছে তাহা সাধারণের অবগত হওয়া প্রয়োজন, কারণ ঐ সময়ের দিবানিদ্রা আমাদের অপকার না করিয়া বরং উপকারই করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মে চাদানকক্ষাণাং বর্দ্ধমানে চ মারুতে।
রাত্রীণাঞ্চাতি সংক্ষেপা দ্দিবাস্বপ্নঃ প্রশস্যতে।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে মনুষ্যের শরীর রুক্ষভাব ধারণ করে, বায়ু প্রকুপিত হয় এবং রাত্রির সংক্ষেপ হেতু নিদ্রা পূর্ণ হয় না ইত্যাদি কারণে দিবানিদ্রা অহিতকর নহে।

গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বপ্নাৎ প্রকুপ্যতঃ।
শ্লেষ্মপিত্তে দিবাস্বপ্নস্তস্মাদন্যেষু নেষ্যতে॥

গ্রীষ্ম ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিদ্রা দ্বারা শ্লেষ্ম ও পিত্ত প্রকুপিত হয়, সে জন্য গ্রীষ্ম ভিন্ন কালে দিবসে নিদ্রা যাওয়া সঙ্গত নহে। দিবসে নিদ্রা অনুচিত হইলেও কিন্তু আহার করিয়াই তৎক্ষণাৎ কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম বিধেয় নহে। আমাদের এখন আহারের পর পরিশ্রম করা একরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল অধিকাংশ লোকের ঐরূপ অনুচিত পরিশ্রম না করিলে উপায় নাই, পরন্তু ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল ও মোক্তার প্রভৃতি স্বাধীনতাভিমানী ব্যক্তিদিগকেও প্রতিনিয়ত ঐরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে, বরং অধিক পরি-মাণে করিতে হইতেছে। আমাদের মতে যাঁহাদের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কোন মতেই বিহিত নিয়ম হইতে বিচলিত হওয়া সঙ্গত নহে। ভোজন করিয়া প্রথমতঃ শতপদ গমন করিয়া কিয়ৎকাল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকিবে। ইহাই আর্য্য-শাস্ত্র সম্মত নিয়ম। কতকগুলি লোকের আহার বিহার সম্বন্ধীয় নিয়মের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। কেহ কোন সময় প্রসঙ্গক্রমে বলিলেও উপহাস বই সমাদর করেন না। ইহাও এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি কোন নিয়মিত কার্য্যের ভার অর্পিত নাই। এরূপ লোক মফঃসলেই বাহুল্যরূপে দেখা যায়। আর যাহারা বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত দিবানিশি মানসিক পরিশ্রমে রত থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কতক-গুলি নির্ব্বোধ বালক স্বীয় উন্নতি লাভ অভিলাষে ভবিষ্যৎ জীবনকে একেবারে ক্লেশসঙ্কুল করিয়া তুলেন। নিয়মিত নিদ্রার অভাবে প্রথমতঃ তাহাদিগকে শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে আক্রমণ করে, তাহাতেও পরিশ্রম হইতে বিরত না হইলে সুনিয়মের সহায়তা না লইলে, বিদ্যাশিক্ষা বা বিদ্যাবিষয়ক উন্নতি দূরে থাকুক, তাহাকে বলবীর্য্য উৎসাহহীন জটিল রোগ জর্জ্জরিত কঙ্কাল-সার দেহে সুখের বিনিময়ে সুকঠোর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, হয়ত কাহাকেও বা পুত্রমুখাপেক্ষি জনক জননীর বিপুল অর্থ বিনষ্ট করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে চিরনৈরাশ্য নিহিত করিয়া, অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে জীব-লীলার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। বোধ হয় পাঠকগণকে এরূপ দৃষ্টান্তের জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না।

তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, স্বাস্থ্যের তুল্য অমূল্য ধন জগতে আর নাই। একবার শরীর অসুস্থ হইলে রাশি রাশি ধন রত্ন ব্যয় করিয়াও সময় সময় সুস্থ হওয়া সুকঠিন হইযা পড়ে।

অসুস্থ এব জানাতি ন সুস্থঃ স্বাস্থ্যজংসুখম্।
দন্তৈস্তু পরিহীনস্থ ভবেদ্দন্ত গুণগ্রহ, ॥

মনুষ্য দন্তবিহীন হইলেই তাহাব উপকারিতা বুঝিতে পারে, যতদিন দন্ত সকল কার্য্যক্ষম থাকে, ততদিন কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। (দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম বুঝে না) সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলেই স্বাস্থ্যেব সুখ বুঝিতে পারে। স্বাস্থ্য একবার ভগ্ন হইলে বুঝা না বুঝা তুল্য হইযা পড়ে।

সর্ব্বমন্যং পবিত্যজ্য শবীব মন্থ পালযেৎ।
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শবীবিণাম ॥

মহর্ষি লিখিযাছেন সমস্ত ত্যাগ কবিযা শরীরকে পালন করিবে, কারণ শরীরের অভাব অর্থাৎ স্বাস্থ্য হানি হইলে সমস্তেরই অভাব হইযা পড়ে। তাই বলিতেছি যথা সম্ভব স্বাস্থ্য সংবক্ষণে সকলেরই অল্পাধিক যত্ন করা উচিত।

দিবা শ্রমো ন কর্ত্তব্য স্ত্রিযামা দধিকং ক্বচিং।
ন্যূন যামদ্বযাত্তুর্দ্ধং স্বপনং ন হিতং নিশি ॥
বলাবলে শ্রমায়ত্তে নিদ্রাযত্তে সুখাসুখে।
তস্মাদ্ধিতাহিতং বুদ্ধা শ্রমং নিদ্রাঞ্চ শীলযেৎ ॥

দিবসে তিন প্রহবের অবিক কখনই শ্রম করা উচিত নহে, সেইরূপ রাত্রিতেও দুই প্রহরের কম নিদ্রা যাওয়া হিতকর নহে। বলাবল শ্রমের অধীন এবং সুখ দুঃখ নিদ্রার আয়ত্ত অর্থাৎ নিয়মিত শ্রম দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ ও অনিয়মিত শ্রমদ্বারা শরীর দুর্ব্বল হয়। এইরূপ সুনিদ্রা হইতে সুখ ও অনিদ্রা হইতে দুঃখ জন্মিয়া থাকে।

আমাদেব মতে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা কাল শারীরিক অবস্থা অনুসারে সকলেরই নিদ্রা যাওয়া উচিত, তাহা হইলেই শরীর বিলক্ষণ সুস্থ থাকিতে পারে। দিবসে যদিও অবিকাংশ লোকের এবং বিদ্যা-শিক্ষার্থিদিগের আহারের পরই কঠিন মানসিক পবিশ্রম দ্বারা সময় অতিবাহিত কবিতে হয়, না করিয়া উপায় নাই, তথাপি তাহাদিগকে নিয়মিত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আহারাদি সমাপন করিয়া ১০।২০ মিনিট নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিযা বিশ্রাম লাভ করা উচিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্লেশেব অনেকটা লাঘব হয়। এখন দেখিতে হইবে যে, গ্রীষ্ম ভিন্ন ঋতুতে কিরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিব দিবা নিদ্রা বিধেয।

গীতাধ্যযন মদ স্ত্রী কর্ম্ম ভারাধ্বকর্ষিতাঃ।
অজীর্ণিনঃ ক্ষতাঃ ক্ষীণাঃ বৃদ্ধা বালা স্তথাবলাঃ ॥
তৃষ্ণাতিসার শূলার্ত্তা, শ্বাসিনো হিক্কিনঃ কৃশাঃ।
পতিতাভিহতোন্মত্তাঃ ক্লান্তা যান প্রজাগরৈঃ ॥
ক্রোধ শোক ভয ক্লান্তা দিবাস্বপ্নোচিতাশ্চ যে।
সর্ব এতে দিবা স্বপ্নং সেবেবন সার্ব্বকালিকম্ ॥

অবিক রাত্রি পর্য্যন্ত যাহারা সঙ্গীত কিম্বা অধ্যযন কবেন, স্ত্রীসংসর্গ, পরিশ্রম জনক কার্য্য, ভার বহন এবং পথ পর্য্যটন দ্বারা যাহারা কৃশ অর্থাৎ দুর্ব্বল, মদ্যপায়ী, অজীর্ণ রোগ গ্রস্ত, ক্ষত ক্ষীণ, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, তৃষ্ণা, অতিসার ও শূল রোগ প্রপীড়িত ব্যক্তি, শ্বাস রোগী, হিক্কা রোগী, অত্যন্ত কৃশব্যক্তি, উচ্চ স্থান হইতে পতিত ও আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি, উন্মত্ত ব্যক্তি, অশ্বাদি যান কিম্বা জাগরণ দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তি, ক্রোধ

বা ভয় গ্রস্ত ব্যক্তি এবং যাহাদের দিবা নিদ্রা চিরকাল অভ্যস্ত অর্থাৎ যাহারা দিবসে নিদ্রা না গেলে কষ্ট অনুভব করেন, ইহারা সকল ঋতুতেই দিবা নিদ্রা সেবন করিতে পারেন। ইহাতে উপকারই হইয়া থাকে।

ধাতু সাম্যাত্তথাহেষাং বলঞ্চাপ্যুপজায়তে।
শ্লেষ্মা পুষ্যতি চাঙ্গানি স্থৈর্য্যং বহতি চায়ুষঃ॥

ধাতুর সমতা হেতু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি সকলের বল জন্মে কফ অঙ্গ সকলের পুষ্টি সম্পাদন ও আয়ুর স্থিরত্ব সম্পাদন করে।

মেদস্বিনঃ স্নেহনিত্যাঃ শ্লেষ্মলাঃ শ্লেষ্মরোগিণঃ।
দূষীবিষার্ত্তাশ্চ দিবা ন শয়ীরন্ কদাচন॥

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের দিবানিদ্রা যেরূপ হিতকরী, সেইরূপ নিম্নলিখিত ব্যক্তি সকলের কোন ক্রমেই দিবসে নিদ্রা যাওয়া সঙ্গত নহে। যথা স্থূলকায় ব্যক্তি যাহারা প্রত্যহ স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত মাখন প্রভৃতি সেবন করেন, শ্লেষ্ম প্রধান ব্যক্তি, শ্লৈষ্মিক রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি এবং বিষ প্রপীড়িত ব্যক্তি।

হলীমকং শিরঃশূলং স্তৈমিত্যং গুরুগাত্রতা।
অঙ্গমর্দ্দোঽগ্নিনাশশ্চ প্রলেপো হৃদয়স্য চ॥
শোথারোচক হৃল্লাস পীনসার্দ্ধাবভেদকাঃ।
কোঠারুঃ পীড়কাঃ কণ্ডুস্তন্দ্রাকাসো গলাময়াঃ॥
স্মৃতিবুদ্ধি প্রমোহশ্চ সংরোধঃ স্রোতসাং জ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণা মসামর্থ্যং বিষবেগ প্রবর্ত্তনম্॥
ভবেন্নৃণাং দিবাস্বপ্নস্যাহিতস্য নিষেবণাৎ।
তস্মাদ্ধিতাহিতং স্বপ্নং বুদ্ধা স্বপ্যাৎ সুখং বুধঃ॥

অসময়ে অনুচিত নিদ্রা সেবন করিলে মনুষ্যগণ নিম্নলিখিত কঠিন পীড়া সকল দ্বারা আক্রান্ত হয়, যথা হলীমক, শিরোবেদনা, স্তৈমিত্য (আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত বোধ) শরীরের গুরুতা, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নিমান্দ্য, কফের দ্বারা শরীর লিপ্ত বোধ, শোথ, অরুচি, বমন বেগ, পীনস অর্থাৎ নাসারোগ, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে মাথা ধরা), কোঠ, (বোলতা দষ্ট স্থানের ন্যায় চক্রাকার হওয়া) পীড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, (নিদ্রার ন্যায় ক্লান্তি বিশেষ), কাস, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধির নাশ, স্রোতঃ পথ অর্থাৎ রক্ত বাহিনী শিরার রোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয় গণের দুর্ব্বলতা এবং বিষ পীড়িত ব্যক্তির পীড়া বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এজন্য ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিবেচনা করিয়া নিদ্রা সেবন করিবেন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কতিপয় মুষ্টিযোগ।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগে রোগী অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে। ঐ বেদনার দুঃসহ যন্ত্রণা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবে না। আমরা ঐ যন্ত্রণা নিবারক একটী অতি সহজ উপায় পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি, আশা করি বিজ্ঞ পাঠক সাদরে গ্রহণ করিয়া একবার পরীক্ষা করিবেন।

নাভীর নিম্নভাগে অর্থাৎ যে স্থানে বেদনা বোধ হয়, সেই স্থানে, থুলকুড়ি (থান কুনি ও ইহার সংস্কৃত নাম মণ্ডূক পর্ণী) শাকের কতকগুলি ভাল ভাল পাতা ধৌত করিয়া শিলায় অল্প অল্প থেঁতো করিয়া বসাইয়া দিবে এবং তাহার উপর একখানি কচি কলার পাতা দিয়া, একখানি পিত্তল বা লৌহ নির্ম্মিত হাতা উষ্ণ করিয়া সহ্যমত অল্প অল্প সেক দিলে

২।৩ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই বেদনার শান্তি হয়। ইহার রস নাভিতে দিলে ও বেদনার আশু শান্তি হয়।

আমাশয় রোগে বেল পোড়া যে, একটী মহৌষধ, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। আমরা উহার সহিত অন্য আর একটী পদার্থ যোগ করিয়া ব্যবহার করায় অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বেল মাত্রই যে সমান উপকারক, তাহা নহে। পাকা বেল অপেক্ষা কাঁচা বেলেই অধিক উপকার হইতে দেখা যায়। কাঁচা বেল কাটের আগুণে রাত্রিতে পোড়াইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে উহার শস্য ইক্ষুচিনি কিম্বা ইক্ষুগুড় দিয়া মাখিয়া বিম্বী অর্থাৎ তেলাকুচা পাতার রস তাহাতে ১।১॥ বা ২ তোলা পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ২।৩ দিবসেই আমাশয় রোগ প্রতিকৃত হয়। থুলকুড়ীর আকৃতি ও বিবরণ।



থুলকুড়ীর হিন্দি নাম ব্রহ্ম মাণ্ডুকী।

পর্য্যায় বা অপর নাম মণ্ডূক পর্ণী, মাণ্ডূকী; ত্বষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী। গুণ— শীতল, সর, তিক্ত, ও লঘু, স্মরণ শক্তি বৰ্দ্ধক; কষায় মধুর, পাকে স্বাদু, আয়ুষ্য, রসায়ন, ও স্বর পবিষ্কারক। ইহার সর্ব্বাংশ ও স্বরস গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা অর্থাৎ ১৬ রতি। ইহার সরস সেবনে কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষদোষ, শোথ ও জ্বর নিবারিত হয়।

থুলকুড়ির পাতা লবণের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া রগে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ মাথা ধরা নিবৃত্তি হয়।

বিচর্চ্চিকা (কাউর বা বিকজ)— লোহার ঝামা অর্থাৎ কামার যে সময় লোহা পোড়ায় সেই সময়ে ঝামার ন্যায় একরূপ পদার্থ আগুনের নিম্নে পড়িয়া থাকে, ঐ ঝামা উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কাঁঠালি কলার সহিত উত্তম মিশ্রিত করিতে হইবে, পরে উহা ঐ ক্ষত স্থানে পুরু করিয়া প্রলেপ দিয়া কোমল কলার পাতা দিয়া উত্তমরূপ বান্ধিয়া রাখিবে। ২ বা ২॥ ঘণ্টা ঐরূপে বান্ধিয়া রাখিয়া খুলিয়া ফেলিবে এবং গরম জলে ধোযাইয়া দিবে তিন দিন এইরূপ করিলেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

অম্লপিত্তে—

১। কিছু পাতলা দধি ৩।৪ দিন পঁচাইয়া রাখিযা দিবে অনন্তর উহাতে কতকগুলি হরিতকী ভিজাইয়া ১০।১২দিন রাখিবে। যখন দেখা যাইবে যে হরিতকী সমস্ত অম্লরস হইয়াছে, তখন ঐ পাত্র হইতে হরিতকী গুলি লইয়া গব্যঘৃতে ভাঁজিতে হইবে। ভাঁজার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, না পুড়িয়া যায় বা কাঁচা না থাকে। ভাঁজার পূর্ব্বে হরিতকীর বীচি গুলি ছাড়াইয়া ফেলিতে

হইবে। ঐ ভৃষ্ট হরিতকী উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তাহাতে পরিমাণ মত কিছু যমানী চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার শিশি কিম্বা বোতলের মধ্যে রাখিয়া ভালরূপে মুখ বন্দ করিতে হইবে, যেন উহাতে বায়ু প্রবেশ না করে।

এই চূর্ণের ।।৹ আধ তোলা ডাবের জল কিম্বা শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অম্লপিত্ত নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে। অম্লপিত্তের আনুষঙ্গিক বুকজ্বালা, ধূমোদ্গার, আহারান্তে বমন ও শূলবেদনা প্রভৃতি সমস্ত উপদ্রব নিবৃত্ত হয়। কিছু বেশী দিন সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হয়। মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণে উক্ত চূর্ণ সেবন করিলে কোষ্ঠ সুন্দর পরিষ্কার হয় অথচ তরল ভেদ না হয় ঐ পরিমাণে মাত্রা স্থির করিতে হইবে।

২। একটী ঝুনানারিকেলের মুখ কাটিয়া জল ফেলিয়া উহার ভিতরে যমানী চূর্ণ ১০ তোলা, বিট্‌লবণ ১০ তোলা ও শামুকের মুখ ভস্ম (চূণ প্রস্তুত করিবার ন্যায় পোড়াইলেই ভস্ম হয়) ১০ তোলা পুরিয়া মুখ বন্দ করিয়া দিবে। মাটি দিয়া ঐ নারিকেলটী উত্তমরূপে লেপন করিবে ও ঘুঁটের আগুনে উত্তমরূপ পোড়াইবে। একহস্ত পরিমিত ১টী গর্ত্তের নিম্নে ২০।২২ খানি ঘুঁটে দিয়া তাহার উপর ঐ নারিকেলটী রাখিবে এবং উহার উপরে কতকগুলি ঘুঁটে এই পরিমাণে দিতে হইবে, যাহাতে নারিকেলটী বেশ পোড়া হয়। অনন্তর শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। প্রাতে ৵০ আনা মাত্রায় শীতল জলসহ সেব্য। পীড়া প্রবল হইলে আহারের পরেও সেবন করা উচিত।

কাল।

অথাত ঋতুচর্য্যাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। সুশ্রুতঃ।
তস্যাশিতাদ্যাহারাদ্বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে।
যস্যর্ত্তুসাত্ম্যং বিদিতং চেষ্টাহারব্যপাশ্রয়ম্॥

চেষ্টা ও আহার সম্বন্ধীয় ঋতুপযোগী নিয়ম যিনি অবগত আছেন অর্থাৎ যিনি জানেন যে, কোন্ ঋতুতে কোন্‌রূপ আহার ও বিহার হিতকর হইবে, সেই ব্যক্তির বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়।

আজ আমরা ঋতুচর্য্যা সম্বন্ধীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মত কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিব। প্রথমত কাল কি পদার্থ তাহা স্থির করা আবশ্যক কারণ এক একটী ঋতু কালের এক একটী অঙ্গ মাত্র।

কালো হি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভু রনাদি মধ্য নিধনো ঽত্র রসব্যাপৎ সম্পত্তী জীবিত মরণে চ মনুষ্যাণা মায়ত্তে।

কাল ভগবান্, অর্থাৎ ইহার মহাত্মা অচিন্ত্য। কালকে কেহ উৎপাদন করেন নাই, কাল স্বয়ম্ভু। অনাদি-মধ্য-নিধন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্তও নাই। অন্ত কালের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল, ভবিষ্যতে সম্যক্‌রূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মধুরাদি রস বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং জীবগণের জীবন মরণ সম্পদ বিপদ সমস্তই কালের আয়ত্ত। কাল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়াও স্বয়ং বিনষ্ট হয় না কিম্বা প্রাণীদিগকে একত্র করে বা সুখ দুঃখ যোগ করে অথবা সমস্ত জীব জন্তুকে কাল সন্ধানে

প্রেরণ করে বলিয়া ইহার নাম কাল হইয়াছে। কেহ বলেন উহা দ্বারা সমস্ত বিষয়ের সংখ্যা করা হয়, এজন্য কাল বলা যায়।

তস্য সম্বৎসরাত্মনো ভগবানাদিত্যো গতি বিশেষণাক্ষিনিমেষ কাষ্ঠা কলা মুহূর্ত্তাহো রাত্র পক্ষ মাসর্ত্ত্বয়ন সম্বৎসর যুগ প্রবিভাগং করোতি।

ভগবান্ আদিত্য গতিবিশেষ দ্বারা সম্বৎসর স্বরূপ কালকে নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর ও যুগ এই সমস্ত উপাধি দ্বারা বিভক্ত করিতেছেন।

তত্র লঘ্বক্ষরোচ্চারণমাত্রোঽক্ষিনিমেষঃ। পঞ্চদশাক্ষিনিমেষাঃ কাষ্ঠা। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাঃ কলা। বিংশতি কলো মুহূর্ত্তঃ কলা দশভাগশ্চ, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত মহো রাত্রং। পঞ্চদশাহো রাত্রাণি পক্ষঃ। স চ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ, তৌ মাসঃ।

অকার প্রভৃতি একটী লঘু্ বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে নিমেষ বলা যায়। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা। বিংশতি কলায় এক মুহূর্ত্ত। কলার দশ ভাগের এক একটী ভাগকে মুহূর্ত্ত বলে। ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিন রাত্রি। পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ। পক্ষ দুই প্রকার শুক্ল ও কৃষ্ণ। দুই পক্ষে এক মাস।

তত্র মাঘাদয়ো দ্বাদশ মাসা দ্বিমাসিকমৃতুং কৃত্বা ষড়্ ঋতবো ভবন্তি, শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরদ্ধেমন্তাঃ।

মাঘ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস ছয়টি ঋতু দ্বারা বিভক্ত, দুই দুই মাসে একএকটী ঋতু। এইরূপে শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই ছয়টী ঋতু।

তেষাং তপস্তপস্যো শিশিরঃ, মধুমাধবৌ বসন্তঃ, শুচিশুক্রৌ গ্রীষ্মঃ, নভোনভস্যৌ বর্ষা, ইষোর্জ্জৌ শরৎ, সহঃ সহস্যৌ হেমন্তঃ ইতি।

মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত।

তত্র তে শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণা শ্চন্দ্রাদিত্যয়োঃ কাল বিভাগ করত্বা দয়নে দ্বে ভবতো দক্ষিণ মুত্তরঞ্চ।

শীত, উষ্ণ ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর লক্ষণ। চন্দ্র ও আদিত্য কর্ত্তৃক কাল সমস্ত বিভক্ত হয়, এজন্য দুইটী অয়ন গণনা করা হয়।

তয়ো র্দ্দক্ষিণং বর্ষা শরদ্ধেমন্তাস্তেষু ভগবানাপ্যায্যতে সোমোঽম্ললবণ মধুরাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্ব প্রাণিনাং বলমভিবর্দ্ধতে।

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত দক্ষিণায়ন। এই কালে চন্দ্র ক্রমশঃ আপ্যায়িত হইতে থাকেন। বর্ষা ঋতুতে অম্লরস, শরৎকালে লবণ রস ও হেমন্ত কালে মধুররস বলবান্ হয়। উত্তরোত্তর জীব গণের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে।

উত্তরঞ্চ শিশির বসন্ত গ্রীষ্মা স্তেষু ভগবানাপ্যায্যতেঽর্কস্তিক্ত কষায় কটুকাশ্চ রসা বলবন্তো ভবন্ত্যুত্তরোত্তরঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং বলমপহীয়তে।

শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম উত্তরায়ণ। এই সময়ে ভগবান্ অর্ক বলবান্ হন। তিক্ত, কষায় ও কটুরস বলবান্ হয়। জীবগণের ক্রমশঃ বল ক্ষীণ হইতে থাকে।

অথ খল্বয়নে দ্বে যুগপৎ সম্বৎসরো ভবতি। তে তু পঞ্চযুগমিতি সংজ্ঞাং লভন্তে। স এষ নিমেষাদিযুগপর্য্যন্তঃ কাল শ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ কালচক্র মুচ্যত ইত্যেকে।

দুই অয়নে এক বৎসর হয়। পাঁচ বর্ষে এক যুগ হয়। নিমেষাদিযুগ পর্য্যন্ত কাল নিয়ত চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে এজন্য উহাকে কালচক্র বলা হয়।

তা বেত্তাবর্কবায়ু সোমশ্চ কালস্বভাব মার্গ পরি গৃহীতাঃ কালর্ত্তু রস দোষ দেহ বলনির্ব্বৃত্তি প্রত্যয় ভূতাঃ সমুপদিশ্যন্তে।

সূর্য্য, বায়ু ও চন্দ্র স্বস্ব কালে এবং স্বভাব অনুসারে স্বীয় স্বীয় মার্গ অবলম্বন করিয়া কাল, ঋতু, রস, দোষ, দেহ এবং বলোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকেন।

উত্তরায়ণ কালকে আগ্নেয় বলা হয়। এই সময়ে সূর্য্য প্রখর কিরণ দ্বারা জগতের স্নেহ অর্থাৎ রস আকর্ষণ করেন। বায়ুও সেই জন্য রূক্ষ এবং তীব্র ভাব ধারণ করিয়া উত্তরোত্তর রস শোষণ করিতে থাকেন, সুতরাং শিশির, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে যথাক্রমে রৌক্ষ্যাধিক্য সম্পাদিত হয়। তিক্ত কষায় ও কটু রস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এই সমুদয় কারণে মনুষ্যাদি জীবগণের দৌর্ব্বল্য জন্মিতে থাকে।

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে দক্ষিণাভিমুখ সূর্য্যকিরণ কাল, মার্গ, মেঘ, বাত ও বর্ষা কর্ত্তৃক মন্দতেজঃ ও চন্দ্রের প্রভা অব্যাহত হয়।

বৃষ্টি জলে জগতের সমস্ত সন্তাপ প্রশান্ত হয়, সুতরাং স্নিগ্ধ অর্থাৎ অম্ল, লবণ ও মধুর রস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অতএব জীবগণের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আদা বন্তেচ দৌর্ব্বল্যং বিসর্গাদানয়ো র্নৃণাম্।
মধ্যে মধ্যবলং ত্বন্তে শ্রেষ্ঠ মগ্রেচ নির্দ্দিশেৎ॥

উক্ত ছয়টী কালের মধ্যে কোন্ কালটী কিরূপ উক্ত শ্লোক দ্বারা তাহাই কথিত হইতেছে। বিসর্গ ও আদান অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। বিসর্গের আদি বর্ষা এবং আদানের অন্ত গ্রীষ্মকালে মনুষ্য হীন বল হয়। মধ্যে (শরৎ বসন্তে) মধ্যবল এবং বিসর্গের অন্তে হেমন্ত কালে ও আদানের অগ্রে শিশির কালে অধিক বল সম্পন্ন হয়।

ক্রমশঃ—



৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দিন যায়, দিন আসে; কিন্তু যে দিন একবার যায়, সেদিন আর ফিরিয়া আসে না। স্বর্গের সুখৈশ্বর্য্য, ইন্দ্রের অমরাবতী, হৃদয়ের শোণিতধারা দিলেও সেদিন ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সেই দিনের সঙ্গে মানবের সুখদুঃখ, আশা আশঙ্কা,—সকলই চলিয়া যায়, অথবা নবীভূত হয়। ইহাই জগতের নিয়ম, বিশ্বের পরিণতি, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়তি। এই নিয়তি-চক্রে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত নিসর্গ আবর্ত্তিত হইতেছে। ত্রিগুণ ইহার সামান্য কণা হইতে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হইতেছে, ষড়ৈশ্বর্য্য ও ত্রিতাপ ইহার অণুমাত্র সংস্পর্শে অনন্তধারে অনন্ত দিকে ছুটিতেছে, পঞ্চতন্মাত্রা ইহার সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহাতেই বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, যমের যমত্ব, অনন্তের অনন্তত্ব। ইহারই অঘটন-ঘটনপটীয়সী ক্ষমতায় আজি বঙ্গের একটী জ্বলন্ত গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া অনন্ত কালসাগরে পতিত হইল। আজি সমগ্র বঙ্গভূমি দারুণ শোকে আচ্ছন্ন, বঙ্গসন্তান আজি ভীত—বিভ্রান্ত—আত্মহারা। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী বীণার মনোমোহন ঝঙ্কার বঙ্গভূমি স্তব্ধ ও শ্বাসশূন্য হইয়া শ্রবণ করিয়াছিল, আজি তিনি অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন, আজি আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া দুইটী অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী প্রধান বীর। বীরপূজায় হৃদয় প্রশস্ত হয়, অন্তরের কলুষরাশি দূরীভূত হইয়া যায়, মনের অন্ধকার ধীরে ধীরে বিলীন হয়। বাঙ্গালী যত দিন না বীরপূজা

করিতে শিখিতেছে, যতদিন না বীরের স্বর্গীয় আদর্শে তন্ময় হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালার উন্নতি সুদূরপরাহত। তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা অদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে বসিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি তিনি নিজের জীবনী নিজে প্রকটিত করিয়া তৎপ্রকাশের ভাব স্বীয় দৌহিত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশবর্ষ পরে সেই জীবনী জনসমাজে প্রকাশিত হইবে। আমাদিগকে ততদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। আজি আমরা তাঁহার জীবনেব কেবল স্থূল স্থূল কয়েকটী ঘটনা বিবৃত করিব।

পূর্ব্বপুরুষ ও জন্ম।

হুগলি জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম আবাস-ভূমি। অনুমান দেড়শত বৎসব পূর্ব্বে তত্রত্য রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাঁটালপাড়া-নিবাসী রঘুদেব ঘোষালেব কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদীয় পুত্র মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বাস করিলেন। যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাঁরই বংশে উদ্ভূত। কাঁটালপাড়ার মধ্যে যাদবচন্দ্রের অবস্থা বিশেষ উন্নত। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে তিনি বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। রাজসেবায় তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ কদাপি নিকৃষ্ট বিলাসবাসনার চরিতার্থতা সাধনে ব্যয়িত হয় নাই; পরিবারবর্গের নিয়মিত ভরণ পোষণ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত রাখিতে পারিতেন, পূজা প্রতিষ্ঠা ও দানাদি সৎকর্ম্মে তাহা খরচ করিতেন। সেই পুণ্যবলেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় দিগ্বিজয়ী পুত্র লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

যাদব চন্দ্রের জীবন অতীব বৈচিত্র্যময়। সেই বৈচিত্র্য পুত্রের জীবনে প্রভূত পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। যাদব চন্দ্রের কোন সহোদর উড়িষ্যাঞ্চলে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন; যাদবচন্দ্র কারণ বশতঃ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াই তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একদা যাদব চন্দ্রের জীবনের সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হইলে তদীয় ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া, নদীতীরস্থ শ্মশানে সৎকার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। সৎকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময়ে সেই শ্মশান ঘাটে একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল;—দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা হইতে এক সন্ন্যাসী অবতরণ করিয়া যাদব চন্দ্রের শরীর পার্শ্বে আগমন করিলেন, এবং "ইনি জীবিত আছেন, এখন ইহাঁর মৃত্যু হইবে না"—বলিয়া যাদব চন্দ্রের জড় ও নিঃস্পন্দ দেহে স্বীয় পবিত্র কর সঞ্চালিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে যাদব চন্দ্রের দেহে সমস্ত জীবিতচিহ্ন পুনঃপ্রতীয়মান হইল। তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া যোগীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে

নিবারণ করিয়া বলিলেন "তোমার সংসারের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় নাই। তুমি অদ্বিতীয় পুত্র রত্ন লাভ করিয়া জগতে যশস্বী হইবে। অতএব সংসারে প্রবেশ কর।" এই কথা বলিয়া যোগী প্রস্থানোদ্যত হইলেন; কিন্তু যাদব চন্দ্র তাঁহার চরণ যুগল ধারণ করিয়া বালকের ন্যায় অবিরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন "ভগবন! আবার কবে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব?" "জীবনে আর তিনবার মাত্র আমাকে দেখিতে পাইবে" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মহাপুরুষ নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে আগমন করিয়া তাঁহাকে নিজ কাষ্ঠপাদুকা দিয়া গিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্র জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত সেই পবিত্র পাদুকার পূজা করিয়াছিলেন। পিতৃজীবনের এই ঔপন্যাসিক ঘটনা পুত্রের অতুল্য উপন্যাস সমূহের স্তরে স্তরে একটী উৎকট জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; এখন একমাত্র কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র অগ্রজদিগের শোকবহ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবিত রহিয়াছেন। ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন) তারিখে বঙ্গের গৌরব রবি বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী উক্ত কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে রাশিচক্রে গ্রহনক্ষত্রগণের যে শুভকরী স্থিতি ছিল, তদ্দ্বারাই তাঁহার ভবিষ্য জীবনের স্পষ্ট রেখাপাত হইয়াছিল।

শৈশব।

শৈশবেই মহাপুরুষদিগের জীবনের সূচনা হইয়া থাকে। খ্যাতনামা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য-বীরগণের শৈশবেই তাঁহাদের ভবিষ্য অমর জীবনের সমস্ত ছায়া পাতিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আশৈশব অতীব তীক্ষ্নবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। তিনি একদিনে সমগ্র বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং পাঠশালে প্রবেশ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষায় অল্প দিনের মধ্যেই পারদর্শী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটী কলেক্টরী পদে আসীন। পুত্রের অভিনিবেশের পরিচয় পাইয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে তথায় লইয়া গেলেন এবং তত্রত্য ইংরাজী স্কুলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র তথায়ও অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষকদিগের প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি সহতীর্থদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন এবং প্রতি বৎসরেই এক এক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধতন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইতেন। কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ—সকলেই বালক বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

কৈশোর।

"বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৫১ সালে ৺ যাদবচন্দ্র চব্বিশ পরগণায় বদলী হইয়া

আসিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাঁহার সহিত আসিতে হইল। এবার ইনি হুগলি কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ইহাঁর জ্ঞানলিপ্সা এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে শুধু বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্ত না হইয়া ইনি বিদ্যালয়স্থ পুস্তকালয়ের পুস্তক সমূহ একে একে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রাতিদিনের নির্দ্দিষ্ট পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার মেধাশক্তি এতই অদ্ভূত ছিল যে, পরীক্ষার দুই চারি দিন পূর্ব্বে পাঠ্য পুস্তক সমূহ দুই চারি বার পড়িয়া এমনই আয়ত্ত করিয়া লইতেন যে, পরীক্ষান্তে প্রতি বৎসরই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক, রৌপ্য পদক, বিবিধ পুস্তক ইত্যাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। হুগলী কলেজ হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়ার স্কলার্‌শিপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। একবার গণিতাধ্যাপক তাঁহাকে জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞা বোর্ডে বুঝাইতে বলেন। সেইটী বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্র ৭০টী প্রতিজ্ঞার অবতারণা করেন। অধ্যাপক বালকের সেই আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন! হুগলী কলেজে অধ্যয়ন-কালে তিনি চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিন বৎসর ও কয়েক মাসের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যেরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, অনেকে পড়িয়াও বহুকালে ততদূর সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারেন কিনা সন্দেহ।" *

* হিতবাদী ৩১শে চৈত্র, ১৩০০।

১২৬২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া অত্রত্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি প্রবাণের পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। যে জীবন এককালে বিশ্ববলিনী প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এই সময় হইতেই তাহা শনৈঃ শনৈঃ প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বঙ্কিম চন্দ্র আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যবহার শাস্ত্রের চর্চ্চায় তৎকালে অনেকে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকা নাথ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেশীয় উচ্চতম বিচারালয়ে প্রাড়্‌বিবাকের আসন লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ও যশস্বী হইয়াছিলেন। এই দুইটীর মধ্যে কোন্ পদবীতে পদক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইয়া বঙ্কিম চন্দ্র ব্যবহারাজীবের শাস্ত্রকলাপ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাহা বলা যায় না। ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যয়নে তিনি এত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার যেরূপ অভিসন্ধি থাকুক না কেন, বিধাতা ধীরে ধীরে তাঁহার জন্য আর একটী প্রশস্ত পন্থা উদ্ঘাটিত করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে বি, এ, পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। বঙ্কিম চন্দ্র তজ্জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুরূহ ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যয়নে সর্ব্বান্তঃকরণে ধৃতব্রত থাকিয়াও তিনি বি, এ, পরীক্ষার দুই মাস পূর্ব্বে পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে বি, এ, পরীক্ষা গৃহীত হইল; বঙ্কিম চন্দ্র তাহাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া সকলের নিকট যশস্বী হইলেন। তিনি এবং বাবু যদুনাথ বসু বঙ্গের প্রথম বি, এ, উপাধিধারী। এই সময়ে প্রসিদ্ধ হেলিডে সাহেব বঙ্গের ছোট লাট পদে আসীন ছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্রের অতুল বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তিনি ইহাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অভিষেক করিতে চাহিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তাঁহার পূর্ব্বাভিসন্ধি বিতথ হইল; সঙ্কল্পিত স্বাধীন ব্যবহারাজীবের বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া তিনি রাজপুরুষের সঙ্কীর্ণ পদমর্য্যাদায় প্রবেশ করিলেন। এ বিষয়ে কে তাঁহাকে প্ররোচনা দিয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু এ জন্য নিজে পরিণামে বিস্তর অনুতাপ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র যদি রাজসরকারে প্রবেশ না করিয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনস্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইত, বলা যায় না।

রাজকার্য্য।

বিংশতি বর্ষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া যশোহর গমন কবিলেন। সেইস্থানে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। আলাপ অচিরে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইয়া উভয়ের জীবন এক অভিন্ন কার্য্যসূত্রে গ্রথিত করিল। প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে হুগলি কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র কবিবর ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্তের প্রসিদ্ধ “প্রভাকর” ও “সুধী-রঞ্জন” নামক পত্রিকাদ্বয়ে কবিতা প্রকাশ করিতেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ অধিকারীরও কবিতাযুদ্ধ সেই দুইখানি পত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। সেই সময়ে দীনবন্ধুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরোক্ষভাবে পরিচয় হয়। আজি যশোহরে আসিয়া সাক্ষাৎসন্দর্শনে তাহা ঘনীভূত হইল। দীনবন্ধু তখন মাতৃভাষার সেবায় অনেক-দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষার পূজায় ধৃতব্রত হইলেন। সেইদিন দুইটী বন্ধুর জীবনস্রোতঃ এক পথে অগ্রসর হইল। যশোহরে ৬।৭ মাস অবস্থিতি করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বিচারদক্ষ-তার পরিচয় দিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার প্রথমা পত্নীর লোকান্তর হয়। একাদশ বর্ষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যশোহর হইতে তিনি কাঁথিতে বদলী হইলেন। এইখানেই তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। সেই দ্বিতীয় পত্নীর নাম সূর্য্য মুখী।

মানব অবস্থার দাস, কিন্তু যাঁহারা সংসারে অমর জীবন রাখিবার নিমিত্ত আগমন করেন, তাঁহারা অবস্থার দাস না হইয়া অবস্থাকে নিজের দাস্থে পরি-ণত করিয়া থাকেন;—প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেয়; ইহাই পুরুষকার। পুরুষকার দৈবকে নিরাকৃত করিয়া শত বাধা বিপত্তির প্রতিকূলেও নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়। যাঁহারা পুরুষ, তাঁহা-দিগের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা জীবনে একএকটী অনপনেয় গভীর রেখাপাত করিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে এরূপ অনেক গুলি রেখাপাত হইয়াছিল;— এস্থলে একটীর উল্লেখ করিব। কাঁথিতে

অবস্থিতি কালে একদা গভীর নিশীথে তিনি নিজের বাঙ্গালায় শয়ন করিয়া আছেন। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ—সুষুপ্ত; প্রবল নৈশপবন বৃক্ষলতাদি কম্পিত করিয়া দুরন্ত বালিয়াড়ীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উন্মুক্ত দ্বার ও বাতায়ন পথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন;—এমন সময় একদিকের দ্বারে কি শব্দ হইল; তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, তিনি সেই দ্বারের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন প্রায় সমগ্র দ্বার অবরোধ করিয়া এক অপূর্ব্ব কাপালিক দণ্ডায়মান; তাহার একটী মাত্র হস্ত! বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত ভাবে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন; তাঁহার তিলমাত্রও ভয় হইল না; ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বলিলেন "চলিয়া যাও।" কাপালিক ভ্রূকুটী করিল এবং "আবার আসিব" গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিয়া নৈশ অর্দ্ধস্ফুট ছায়ায় মিলাইয়া গেল। এই ঘটনাতেই কপালকুণ্ডলার অঙ্কুরোদ্গম হয়।

এক বৎসর কাঁথিতে থাকিয়াই তাঁহাকে খুল্‌নায় আসিতে হইল। খুল্‌না তখন যশোহরের একটী মহকুমা। তৎকালে তথায় নীলকর ও জলদস্যুর বড়ই অত্যাচার। এই দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডদিগের উৎপীড়নে প্রজাকুলের ধন প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নীলকরের মধ্যে মরেলগঞ্জের মরেল সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচারী। ইহার উৎপীড়নে শত শত প্রজা-গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া দূর প্রবাসে নির্ব্বাসিতের ন্যায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছিল, শত শত গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। খুল্‌নায় উপস্থিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বচক্ষে নীলকরের শোণিতময় কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিলেন, স্বকর্ণে তাহাদের অত্যাচারের শত শত হৃদয়ভেদি বিবরণ শুনিলেন। ইতিপূর্ব্বে যশোহরে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু মিত্রের নিকট তিনি নীলকরের পাশব অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া নীলকর বিষধরের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত বজ্রের সৃষ্টি করিলেন। হিলি সাহেব খুল্‌না পরিত্যাগ করিয়া আসামে পলায়ন করিল। তত্রত্য নীলকর সমাজে একটা বিভীষিকার ছায়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহাদের দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ বঙ্কিমচন্দ্রের বজ্রানল হইতে ভীত হইয়া তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে সুদূর বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ওয়ারেণ্ট ভীমবেশে তথাও তাহাদের অনুসরণ করিল। যাহারা ধৃত হইল, কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিল। এইরূপে খুল্‌নায় নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার নিরাকৃত হইয়াছিল। এই খুলনাতেই জলদস্যুগণের ও ভীষণ অত্যাচার। খুলনার অধিকাংশ ছোট বড় নদনদীতে সমাচ্ছন্ন, অধিকাংশ বনাবৃত; তন্মধ্যে সুন্দরবনের নিবিড়তায় অধিকাংশ প্রদেশ দুর্গম। দুষ্ট জলদস্যুগণ সেই সমস্ত নিবিড় বনের আবরণে লুক্কায়িত থাকিয়া জলপথে বহুদূর পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়া বেড়াইত। বঙ্কিমচন্দ্রের কৌশলে ইহারা অল্প দিনের মধ্যেই ধৃত ও দণ্ডিত হইল। খুলনার জলপথ নিরাপদ হইল;—খুলনাবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যুবক বঙ্কিমকে মুক্তপ্রাণে

আশীর্ব্বাদ করিলেন। খুল্‌না হইতে ইনি বারুইপুরে আসিলেন। সেই সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণের বেতনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন স্থাপিত করেন। হাই-কোর্টের বর্ত্তমান প্রথিতনামা বিচারপতি প্রিন্সেপ সাহেব সেই কমিশনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বিলাত গমন করাতে বঙ্কিম চন্দ্র তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। যুবক বঙ্কিম চন্দ্রের পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে! এই সময়েই বঙ্কিম চন্দ্র বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। *

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে প্রেরিত হইলেন। তথায় শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মালদহে গমন করিলেন; মালদহ হইতে হুগলি আসি-লেন। ইহার পর তিনি বঙ্গীয় গবর্ণ-মেণ্টের দপ্তরে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদে উন্নীত হইলেন, তথায় বিনাকারণে প্রধান সেক্রেটরীর বিষনয়নে পতিত হইয়া আলি-পুরে বদলী হইলেন। কার্য্যের শেষ কাল পর্য্যন্ত আলিপুরেই ছিলেন, জীবনের অবশিষ্টকাল শান্তি সম্ভোগ করিবার অভি-প্রায়ে গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করিলেন!

সাহিত্যসেবা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসেবাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি মাতৃভাষার পরি-চর্য্যায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষার ক্ষীণ বিশুষ্ক শিশু হৃদয়ে যৌবনের তীব্রতেজ আহিত হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা গদ্যের প্রবর্ত্তক না হই-লেও তাহার রচনা-প্রণালীতে একটী যুগান্তর সাধিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার গদ্যময় সাহি-ত্যের দুইটী যুগ অতীত হইয়াছিল। প্রথম যুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রাম-মোহন রায়। চৈতন্যের সময় হইতে যেমন বাঙ্গালা পদ্যের সূচনা, রামমোহন রায়ের আমল হইতে সেইরূপ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বলিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত পোষণের অভাবে সদ্য প্রসূত শিশু যেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, রাজা রাম মোহন রায়ের পর উপযুক্ত লোকের অভাবে বঙ্গের গদ্যেরও ঠিক সেইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার গদ্য-ময় সাহিত্য নিতান্ত দীন দশায় পরিণত হইয়া দিন দিন ম্রিয়মাণ হইতেছিল, এমন সময়ে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হইল; তৎপ্রণীত "বেতাল পঁচিশ" পাঠ করিয়া বঙ্গবাসী যেন এক নূতন যুগে প্রবেশ করিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কঠোর ও বিকলাঙ্গ বাঙ্গালা লোকে ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল;—পুরুষ পরীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থের আর তত আদর রহিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুললিত, প্রাঞ্জল ও তেজস্বিনী ভাষা লোকে আগ্র-হের সহিত পাঠ করিতে লাগিল; একটী লোকের জীবনে বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ নবীভূত হইল। ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইহাঁর অপূর্ব্ব রচনাকৌশলে যখন নীরস বৈজ্ঞা-নিক তত্ত্ব সকল সরস ও শ্রুতিমধুর হইয়া

* সঞ্জীবনী, ২ বৈশাখ, ১৩০১।

অবতারিত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালা গদ্যময় সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ক্রমে এই দুইটী সাহিত্যবীর বাঙ্গালা ভাষার দুইটী কেন্দ্র অধিকার করিয়া রহিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শত চেষ্টা করিয়াও ইহাঁরা বঙ্গভাষাকে সাধারণের—বিশেষতঃ তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরণীয় করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি লোকের নবানুরাগ; ইংরেজী ভাষা তখন লোকের জীবিকার নানাবিধ উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া দিতেছিল, তদানীন্তন সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিতেছিল। সুতরাং ইংরেজিভাষার উপর লোকের অনুরাগ গাঢ়তর হইতে লাগিল। এমন সময়ে "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতুম" আবির্ভূত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বাঙ্গালিদিগের মস্তকে মুগ্দর প্রহার করিল; বাঙ্গালি নিজ চরিত্রের সংশোধন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অল্প লোকেরই অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহার কারণ তাঁহাদিগের ভাষা সকলের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সেবায় মনোনিবেশ করিয়া গদ্যময় সাহিত্যের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে সকলের আদরণীয় হয়, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। হুগলি কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে তৎপ্রচারিত "প্রভাকর" ও "সুধীরঞ্জন" পত্রিকায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা রচনাই যে, তাঁহার সাহিত্যসেবার প্রথম উদ্যম, তৎপ্রণীত "মানসী" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য তাহার প্রমাণ। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবা মাত্র বাঙ্গালি আগ্রহের সহিত তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিল, ক্রমে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি সেইরূপ আদরের সহিত সাধারণ্যে গৃহীত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে; এই সমস্ত উপন্যাস হইতে হিন্দু সমাজের কি উপকার বা অপকার হইয়াছে, আজি তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁহার শোকে আজি আমরা সকলেই কাতর; এখন তাঁহার কার্য্যের আলোচনা করিবার সময় নহে।

সন্তান সন্ততি।

বঙ্কিমচন্দ্র পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই,—তাঁহার তিনটীমাত্র কন্যা। সকলেই সমান স্নেহের পাত্রী হইলেও কনিষ্ঠের উপর পিতামাতার একটু বেশী আদর প্রায়ই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয় নাই। এই কন্যার শোচনীয় অপমৃত্যুই ইহাঁর পীড়ার উত্তেজক কারণ। ইতিপূর্ব্বে বহুমূত্র যে শরীরকে দুর্ব্বল ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া রাখিয়াছিল, কন্যার মৃত্যু তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

রোগশয্যা ও মৃত্যু।

৭ই চৈত্র রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের জ্বর প্রকাশ পায়। ঐ দিন অপরাহ্নে জ্বর ১০৫ ডিগ্রিতে উত্থিত হইল; তাহার প্রকোপে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন, সোমবার শরীরতাপ কমিয়া আসিল, কিন্তু মঙ্গলবারে আবার বাড়িয়া ১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিল। বুধবারে জ্বর আবার কমিয়া, বৃহস্পতিবারে পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে একদিন অন্তর জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল, জ্বরের প্রকোপ কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া আসিল, কিন্তু উপসর্গ বাড়িতে লাগিল। মূত্রাঘাত দেখা দিল, কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া পড়িল; ক্রমে মলদ্বারের ভিতর একটী স্ফোটক প্রকাশ পাইল; তাহা আপনিই ফুটিয়া গেল কিন্তু জ্বর বাড়িতে লাগিল; চিকিৎসায় কোন ফলই হইল না। পরিশেষে ৮ই এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের পার্থিব প্রাণবায়ু বাহির হইল; বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া তিনি অমরধামে যাত্রা করিলেন।

গ্রন্থাবলী।

১৮৬১ সালে "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিত এবং পর বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৬৭ সালে কপালকুণ্ডলা ও ১৮৭০ সালে মৃণালিনী প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। নিম্নলিখিত সনে বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তক প্রকাশিত হয়।—

১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়; ১২৮১ সালে রজনী; ১২৮০।৮১।৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর; ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৫ সালে রাজসিংহ; ১২৮৭।৮৮।৮৯ সালে আনন্দমঠ; ১২৮৭ সালে মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত; এবং ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশমাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার পর নবজীবন ও প্রচার পত্রে দুই তিনখানি পুস্তকের কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে কৃষ্ণ চরিত্রের প্রথমাংশ প্রচার হইয়া পুনর্মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ কৃষ্ণ চরিত্র ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে নবজীবনে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালে সীতারাম প্রকাশিত হয়। প্রচারে গীতাধর্ম্ম ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

সিটি থিয়েটার।

সিটি থিয়েটারে ৺ বঙ্কিম চন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে শোকোচ্ছাশ পূর্ণ যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে সকলকেই কাঁদিতে হইয়াছিল; সঙ্গীতটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। সিটি থিয়েটর প্রকৃতই রঙ্গালয়ের মান সম্ভ্রম বাড়াইতে সমুৎসুক। সাহিত্য সেবিগণকে এই রঙ্গালয়েব কর্ত্তৃপক্ষগণ কিরূপে আদব করিতে হয় তাহা জানেন, আশীর্ব্বাদ করি সিটিথিয়েটার চিবজীবী থাকিয়া দেশের মুখোজ্জ্বলে কৃতকার্য্য হয়েন। অত্র রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সমুদয় নির্দ্দোষরূপে অভিনীত হইলেও কেন যে সাধারণে ইহাতে উৎসাহ দেন না, ইহা বস্তুতই পরিতাপের বিষয়।

বেহদ্দ বেহায়া।

"বেহদ্দ বেহায়া প্যানটোমাইমের প্রকৃত ছবি, সং রং ঢংযেব সঙ্গে সন্নীতিপূর্ণ ছায়ার প্রতিভা অতি সুন্দর ফুটিযাছে—

প্রস্তাবনা।

সাধে কি মা বঙ্গ ভূমি কাঁদি গো সকলে মিলে
অকালে কাল কেড়ে নিলে সাধেব বঙ্কিম ভাল বলে
দেখতে পাই মা তোর কপালে,
বাচে না তোর ভাল ছেলে,
তোব যত ছেলে ছিল ভাল,
একে একে যমে নিলে॥
কে আর লেখনি ধরি
আঁকিবে কাব্য সুন্দরী
বল দেখি মা তেমন তব
দেখতে পাব কোথা গেলে॥
আয়েষা কি মনোরমা
মৃণালিনী তিলোত্তমা
কুন্দ শান্তি সূর্য্য মুখী
কে দেখাবে অবহেলে॥
রজনী শ্রী কি লবঙ্গে,
ভ্রমর ইন্দিরা সঙ্গে,
চৌধুরাণী রাধা বাণী
দেখিব গো কুতূহলে॥
সইল না মা তোর কপালে
মেঘে শশী ঢেকে নিলে
বঙ্কিম চন্দ্র অস্ত গেল
তাই ভাসি মা নয়ন জলে॥

সুবিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতি হরিসুন্দরী দাসী কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

১ম খণ্ড। | সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। | ৮ম সংখ্যা।

জয়দেব।

গীতগোবিন্দের নামে মোহিত না হয়েন সুধীগণের মধ্যে এরূপ লোক বিরল। তাহার গীতিকুঞ্জে যিনি বিহার করিয়াছেন—সুধাময় কলকূজন যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন যে গীত গোবিন্দ কি মনোহর! তিনি তাহার রচয়িতা কবি জয়দেবকে সহস্রমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। জয়দেব বঙ্গের মহা গৌরবস্থল ; বঙ্গদেশে অজয়নদীতীরস্থিত কেন্দুবিল্বগ্রামে তাঁহার জন্ম। গ্রামটীর এই বিশুদ্ধ কেন্দুবিল্ব নাম জনমুখে ক্রমে অপভ্রষ্ট হইয়া এখন কেঁদুলি আকার ধারণ করিয়াছে। *

এই কেন্দুবিল্ব গ্রাম আজও পর্য্যন্ত জয়দেবের স্মৃতি ধারণ করিতেছে ; এখানে প্রত্যেক বৎসরে মাঘ মাসের মকর-সংক্রান্তির দিনে জয়দেবের স্মরণার্থে একটী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলা বৎসর বৎ .র চলিয়া আসাতে জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রাম যেন আমাদের সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করিতেছে। এই কেন্দুবিল্বে যে তাঁহার জন্ম ইহার প্রমাণের জন্য অন্যত্র ঘুরিবার তেমন প্রযোজন হয় না ; ইহা সর্ব্বাগ্রে আমরা

* এইরূপ নামের অপভ্রষ্টতার দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখাইতে পারি, যেমন বলুহাটি নামে কোন গ্রামকে লোকমুখে বলুটি বলিতে শোনা যায়, কান্যকুব্জকে লোকেরা চলিত ভাষায় কনোজ কহে, সেইরূপ কেন্দুবিল্ব কথাটীও জনমুখে কেন্দুলি হইয়া গিয়াছে। ভাষাতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মই এই, যে ভাষা সুবিধা পাইলেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে চায়—ভাষালোচনার দ্বারা ইহা রীতিমত বুঝিতে পারা যায়। দেখ প্রস্থ কথাটী যেন পুরাতন কথাটীরই সংক্ষিপ্ত সার হইয়া বিরাজ করিতেছে। পুরাতন হইলেই সকল বিষয় সংক্ষিপ্তসার হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে। কেন্দুবিল্বও ক্রমে পুরাতন হইয়া ক্রমে ‘কেন্দুলি’তে সংক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

ভাষাতত্ত্বের প্রণালী অনুসারে কেন্দুবিল্ব কথাটীর কেন্দুলিতে পরিণত হইবার ক্রমভাব যথাসাধ্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ এইরূপ :—কেন্দুবিল্ব—কেন্দুবিল্বি (কারণ বিল্বকে বিল্বিও চলিত ভাষায় বলে যথা বিল্বিপত্তর)—কেন্দুউইল্বি (যে হেতু বিল্বের ‘বি’র ‘ব’টী অন্তঃস্থ ব সেই হেতু তাহার প্রকৃত উচ্চারণ স্বাভাবিক স্বরশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দেখিতে

তাঁহার গ্রন্থটী পাঠ করিলেই জানিতে পারি; তিনি গীতগোবিন্দের মধ্যেই বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণেন ॥"

সমুদ্রে রোহিণীনাথের যেরূপ সম্ভব কেন্দুবিল্বে সেইরূপ সম্ভূত নম্র জয়দেবের দ্বারা এই হরিবিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার কেন্দুবিল্বে জন্মকথা ভক্তমাল গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য বৈষ্ণব কবির গানেও তাহার উল্লেখ আছে।

জয়দেবের জন্মস্থান জানা গেল কিন্তু তাঁহার জন্মকাল এখনও নির্দ্দিষ্ট রূপে জানিতে পারা যায় নাই। অনুসন্ধানের দ্বারা আমাদের এইরূপ অনুভব হয় যে তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা একরূপ স্থির যে তিনি দ্বাদশশতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন। ভারতে দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহার বিদ্যমানতার বিষয়, তৎকালীন বঙ্গাধিপ লক্ষণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থিত প্রস্তর ফলকে লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকটীর দ্বারা জানিতে পারা যায়।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণস্য চ ॥"

জয়দেব লক্ষণ সেনের রাজ সভার পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। এক্ষণে, গীতগোবিন্দের জয়দেব আর লক্ষণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকোল্লিখিত শ্লোকের জয়দেব এক কিনা তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তজ্জন্য, আমরা পাঠককে গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের চতুর্থ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি।

"বাচ পল্লবযত্যুমাপতিধরঃ
সন্দর্ভ শুদ্ধিংগিরাং
জানীতে জযদেব এব শরণঃ
শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেযরচনৈ
বাচাং গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী
কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥"

এই শ্লোকটীতে আমরা পূর্ব্বোক্ত সভামণ্ডপদ্বারস্থিত শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি পাইতেছি। সেই শ্লোকের গোবর্দ্ধন শরণ, জয়দেব, উমাপতি আর কবিরাজ (অর্থাৎ কবিরাজ ধোয়ী) এতৎ সমুদয়ই গীতগোবিন্দের মধ্যে কথিত হইয়াছে। এই কারণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে জয়দেব গৌড়াধিপতি লক্ষণসেনের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন—দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

রাজা লক্ষণসেনের রাজসভায় জয়দেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের ন্যায় জয়দেব গৌড়ভূপ লক্ষণসেনের সভার

গেলে এই প্রকার দাঁড়ায় ঃ—দ্রুত হসন্তমাত্রিক উকারযুক্ত ইকার অর্থাৎ দ্রুত উ টী স্পর্শ করিয়াই মুখ্য স্বরবর্ণ ইকারে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে)— কেন্দুইবি—কেন্দুবি (যেমন দুইটী দুটী হয় সেই রূপ 'দুই'বির' 'দুবি' হওয়া সম্ভব, আশ্চয্য নয়। পুনশ্চ ভাষাতত্ত্বে দেখা যায় যে কখন উ ই এক সঙ্গে থাকিলে 'ই'টী অপ্রধান হইয়া উতে প্রবিষ্ট হয় তখন উকারটীই মুখ্যরূপে উচ্চারিত হয় কিন্তু সেই উচ্চারণের মধ্যে ইকারের অস্তস্পর্শ জনিত কিঞ্চিৎ বিকৃতিভাব থাকেমাত্র, ইহার উদাহরণ ইউরোপীয় ভাষায় সুলভ। কেন্দুবি (কেন্দুলিও হয়) লইয়া আর বাক্যবাহুল্যে আবশ্যক নাই।

শোভা বিস্তার করিতেন। রাজা তাঁহার কাব্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবিকুল শিরোমণিরূপে দেখিতেন। বৈষ্ণবকবি বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে কবিনৃপতি—শিরোমণি বলিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত চাঁদ কবি তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তাঁহাকে প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশেষ কবি বলিয়া গভীর প্রাচীনতার সম্মানে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে জয়দেব তাঁহার সভায় অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিলেন। এই সমাদর নিতান্ত নিষ্কণ্টক ছিল না। এই সমাদরের জন্য কাব্যরাজ্যে তাঁহার পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। চারিজনের নাম তিনি স্বীয় গ্রন্থেই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা কবি উমাপতিঃ ইনি ক্রমাগত বাক্য পল্লবিত করিয়া কাব্য রচনা করিতে পারিতেন; কবি শরণ তিনি দুরূহ কবিতা দ্রুতরচনায় প্রশংসনীয় ছিলেন; কবি গোবর্দ্ধন শৃঙ্গার বিষয়ক খণ্ড খণ্ড সৎকবিতা রচনায় স্পর্দ্ধী ছিলেন এবং কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী শ্রুতিধর ছিলেন, কিন্তু জয়দেবের ন্যায় সন্দর্ভশুদ্ধি বাণী বিস্তারে কাহার সামর্থ্য ছিল না, জয়দেবই কেবল তাহাতে সমর্থ ছিলেন। জয়দেবের কথিত এই চারিজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর পঞ্চম প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি, তিনি পুরুষোত্তমের রাজা ছিলেন। রাজা বলিয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু প্রবল। ইনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের যশে ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং একটী গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া তৎপ্রচারার্থ স্বীয় জনগণকে আদেশ করেন কিন্তু তাহা জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় কাহাকেও মোহিত করিতে সমর্থ হয় নাই তাই তাহার প্রচারও হইল না, জয়দেবের গ্রন্থ জন সাধারণের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া রহিল; ভারতে জয়দেবেরই জয়জয়কার হইল। রাজা অর্থবলে লোকবলে বলপূর্ব্বক যে সরস্বতী প্রচার করিবেন তাহা হইবার যো নাই, অন্তঃসলিলা সরস্বতী নিগূঢ়ভাবে, সূক্ষ্মভাবে স্বয়ং প্রবাহিত হইয়া মানবের অন্তররাজ্য সিক্ত করে। ইহা লোকালয়ের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় কার্য্যসিদ্ধ করে। এই কারণে জয়দেবের জয় হইল; তাঁহার প্রকৃত অকৃত্রিম গীতগোবিন্দের কাছে পুরুষোত্তমের রাজার অপকৃত কৃত্রিম গীতগোবিন্দের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া গেল। জয়দেবের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল, তাঁহার যশ ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াপড়িল।

জয়দেব কুলশীল সম্পন্ন, সুরসিক ও একজন [illegible]তিবিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী। ইহা তিনি তাঁহার [illegible]তগোবিন্দের শেষ সর্গের শেষ শ্লোকের মধ্যে কহিয়া গিয়াছেনঃ—

"শ্রীভোজদেব প্রভবস্য বামাদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য"।

ভোজদেব ও বামাদেবী ইহাঁদের সকলেরই ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম। ইহাঁরা জয়দেবরূপ পবিত্র রত্ন প্রসব করিয়া জগতে ধন্য।—পুত্র ভাল হইলে পিতামাতাও সংসারে কৃতার্থ ও যশস্বী হন। আমরা জয়দেবের কারণেই তাঁহার পিতামাতা ভোজদেব ও বামাদেবীকে উল্লেখ যোগ্য জ্ঞান করিতেছি; জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও নাম আমরা চিরস্থায়ী দেখিতে ইচ্ছা করি। জয়দেব আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহার পিতা-

মাতার নাম তাঁহার লোকবিখ্যাত গীতগোবিন্দের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া যথার্থ সুপুত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এইজন্য জয়দেব আমাদের নিকটে অত্যন্ত ধন্য।

কুলপাবন জয়দেব শ্রেষ্ঠ বিপ্রকুলে জন্মলাভ করিয়া বিপ্রকুল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র, উদয় হইয়া ভারতকে আরও প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন।—মাধুর্য্যরসে ভারতকে কতটা মধুর ও পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন!

জয়দেব অতিশয় মাধুর্য্যরস প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার ভাবমাধুর্য্য স্ত্রীগ্রহণান্তর সমধিক বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহের পর জয়দেবের পতিব্রতা পত্নী তাঁহার উন্নতিবিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম পদ্মাবতী ছিল। পদ্মাবতী ব্রাহ্মণ দুহিতা ছিলেন। জয়দেবের সহিত পদ্মাবতীর পরিণয় সম্বন্ধে এক কৌতুকজনক আখ্যান আছে:—

জয়দেব বৈরাগ্যব্রতধারী হইয়া, কন্থা পরিধান পূর্ব্বক করে কমণ্ডলু লইয়া একদা পুরুষোত্তমক্ষেত্রের পথে বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়াছেন এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ একটী কন্যাসহ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে জগন্নাথদেবের আদেশ এই যে তাঁহাকে তাঁহার কন্যাটী গ্রহণ করিতে হইবে, জগন্নাথ দেবের আদেশ তিনি যেন অবমাননা না করেন। জয়দেব তচ্ছ্রবণে স্তম্ভিত হইলেন, তিনি বৈরাগ্যব্রত ধারণ পূর্ব্বক, উদাসীন হইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে রহিয়াছেন তাঁহার মনে প্রথমে বিবাহের কথা স্থানই পাইল না, তিনি ব্যাকুল হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে জগন্নাথ প্রভুরও আদেশ তিনি পালন করিতে পারিবেন না; ব্রাহ্মণকে কন্যা লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; ব্রাহ্মণ তাহা শুনিলেন না, জগন্নাথদেবের আদেশ বলিয়া তাঁহার কন্যাকে জয়দেবের কাছে ফেলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় তাঁহার কন্যাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যে জয়দেবই তাহার স্বামী। জয়দেব ব্রাহ্মণকে কত বলিলেন। কন্যা লইয়া ফিরিয়া যাইবার অনুরোধের সঙ্গে ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি বরঞ্চ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন তত্রাচ বিবাহ করিবেন না; তাঁহার প্রতি এই কার্য্য জগন্নাথ প্রভুর অনুকম্পা নয় ইহা অকরুণা। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ কাতরতা সকলই ব্যর্থ হইল। জগন্নাথ দেবের মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।—ব্রাহ্মণ জয়দেবের কথা না মানিয়া চলিয়া গেলেন পদ্মাবতী জয়দেবকে পত্নীর ন্যায় কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে লাগিলেন। আর তিনি জগন্নাথদেবের আদেশ না পালন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পবিত্র সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহ করিয়া তিনি পদ্মাবতীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাঁহার প্রণয় পাশে অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার গ্রন্থের কথার দ্বারাই প্রতীয়মান হয়;—তিনি গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে আপনাকে—"পদ্মাবতীচরণ চারণচক্রবর্ত্তী" পদ্মাবতী চরণযুগলের প্রিয়সেবক কহিয়া গিয়াছেন।

পদ্মাবতীও তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করি-তেন। তিনি অতিশয় পতিপ্রাণা ছিলেন।

জয়দেব তাঁহার পতিব্রতা পত্নীকে নিজের ন্যায় সতত হরিপরায়ণা করিতে চেষ্টা করিতেন। রাধামাধব বিগ্রহ সংস্থাপন পূর্ব্বক জয়দেব পদ্মাবতীকেও সেই বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

জয়দেব পত্নীসহ রাধামাধবের সেবায় কায়মনোযোগে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় জীবনের সাতিশয় পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভক্তিভরে তিনি প্রত্যহ রাধামাধবের পূজা করিতে করিতে তাঁহার মনে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল; তিনি হরিলীলা বিষয়ক একখানি গীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার গীতিগোবিন্দ নামকরণ করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে ইহা জগন্নাথদেব ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল। এই গীতগোবিন্দ প্রণয়নে গোবিন্দ জয়দেবের এক মহাসহায় ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে যে খণ্ডিতা নায়িকা রাধিকার মধুরতা বর্ণন করিবার সময় মাধব আকুল হইয়া রাধাচরণকমলে পতিত হইয়া থাকেন, জয়দেব তাহাতে সন্দিহান ও তদ্বর্ণনে অক্ষম হইলেন; পরে দুঃখের সহিত স্বীয় পুস্তকখানি গৃহে রাখিয়া স্নানার্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধরিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পুস্তক মধ্যে "দেহি-পদপল্লবমুদারং" এই কয়েকটী কথা লিখিয়া চলিয়া যান; জয়দেব স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে পদ্মাবতী তাঁহাকে, মাঝে একবার পুস্তক লিখিবার নিমিত্ত গৃহে আগমনের কথা ও তৎপরে এত দ্রুত স্নানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মাবতীর কথা শুনিবামাত্র তিনি যথার্থ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সত্বর স্বীয় পুস্তক খুলিয়া দেখিলেন; খুলিয়া প্রভুর অকৃত্রিম রচনা দেখিতে পাইয়া ভক্ত হইয়া উঠিলেন, দরদর ধারায় তাঁহার নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি তখন পদ্মাবতীর চরণ ধরিয়া বলিলেন পদ্মাবতি! তুমি ধন্যা সার্থক তোমার জীবন, তোমার ভাগ্যে প্রভুদর্শন হইয়াছে।

প্রভুদর্শনাকুল জয়দেবের জীবন ধন্য। সতত প্রভুদর্শন লালসায় উল্লসিত থাকিতেন। প্রভুপ্রসাদস্বাদবাহী হইয়াই তিনি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার গীতগোবিন্দ অত মধুর ও সরল; তাই তাঁহার গ্রন্থের দ্বাদশ সর্গ যেন গীতাকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

জয়দেব যেমন হরিপরায়ণ ছিলেন সেইরূপ সাংসারিক কর্ত্তব্যপরায়ণও ছিলেন; অলস ছিলেন না—ভাবিয়া দেখ গঙ্গা, কেন্দুবিল্ব গ্রাম হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও প্রত্যহ তিনি গঙ্গাস্নান না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি পুণ্যানন্দ সম্ভোগ করিতেন। একদিবস কোন কারণবশতঃ অতদূর যাইয়া গঙ্গাস্নান হইয়া উঠে নাই বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আছে প্রিয়ভক্ত জয়দেবের ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া ভাগিরথী সেই দিন কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার আসনের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জয়দেবের চরিত্র রীতি কুল সকলি পবিত্র ছিল। জয়দেব বাস্তবিকই তাঁহার

চরিত্রগুণে গঙ্গাতীরস্থ কেন্দুবিল্বের এক মহা সাধু ছিলেন, অজয়তটে * এক দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন—জয়দেব বা অজয়-দেব † ছিলেন। বৈষ্ণব নরহরি দাস তাঁহার একটি গানে দেবের স্তুতি গান করিয়া গিয়াছেন:—

"জয় জয়দেব প্রেমময় পিরীতি রতনখানি।
পরম পণ্ডিত কাব্য গুণগণ মণ্ডিত চতুরমণি॥
মধুর মূরতি অতি অনুপম বিদিত চরিত রীতি।
এক শেখর সুখময় পদ্মাবতীর পরাণ পতি॥
বিপ্র বংশ অবতংস কবিভূষণ কে সম তার।
প্রেমরসে মহামত্ত সদা কেন্দুবেলিতে বসতি যার॥
শ্রীরাধা মাধব সেবা সুবিগ্রহ কিবা না হেরিয়া ভুলে।
সে রস অমিয়া পিয়া দিবানিশি ভাসয়ে আনন্দ জলে॥
পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ নৃত্যে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষ ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব কিন্নর মনসে লাজে।
যারবিরচিত শ্রী গীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুকোমল পাঠে।
গোবিন্দ আনন্দে দেহি পদপল্লবাদি বলিলেন তাতে॥
প্রেমে রাখি রাখি তেন যেন সব এসব অদ্ভুত ভাতি।
নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ যাঁহা শুনয়ে আনন্দে মাতি॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে অবতরি রাঙ্গে।
যার কাব্যরস আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ সঙ্গে॥
পরম দুঃখে দুঃখী পদ্মাবতী নাথপদে সে করয়ে আশ।
যুগল পিরীতি রসে সে ভাসয়ে ভণে নরহরি দাস॥

এই গানে জয়দেব পদ্মাবতীর পরাণ পতি শব্দে যে অভিহিত হইয়াছেন তাহা প্রকৃতই হইয়াছে। সত্য সত্যই জয়দেব পদ্মাবতীর পরাণপতি ছিলেন। সাধ্বী পতিব্রতা পদ্মাবতীর প্রাণ জয়দেব ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে সমর্থ হইত না। পদ্মাবতীর পতিপ্রাণতার পরীক্ষা করিবার জন্য এক সময়ে জয়দেবের প্রতিপদ কোন এক রাজার পত্নী একবার মিছামিছি পদ্মাবতীকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী মরিয়া গিয়াছেন; পতিপ্রাণা পদ্মাবতী সেই কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে জয়দেব আসিয়া তাঁহাকে হরিনামামৃত পান করাইয়া নবজীবন দান করিলেন। তিনি নিজে হরিনামামৃত পান করিয়া সদাসর্ব্বদা সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেন, হরিগুণ গানে তিনি মহা আনন্দ লাভ করিতেন, তাহাতেই প্রাণ মন সকলি ঢালিয়াছিলেন। পদ্মাবতী পুনশ্চ জয়দেবে প্রাণ মন সমুদয় ঢালিয়া তাঁহার সহিত হরিনামামৃত সম্ভোগ করিয়া সুতৃপ্ত হইতেন;—পতির নিকট হইতেই হরিনামরূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া তাহার নীরস নির্জ্জীব তনু সরস সজীব হইয়া উঠিল।

বাস্তবিক, ভগবান তিনি রসময় তাঁহার ভক্ত হইলে তাঁহার নাম গুণে—নাম গানে প্রাণ মনে কেমন সরসতা জাগিয়া উঠে, নীরসভাব আর থাকিতে পায় না। উপনিষদে আছে তিনি

"রসো বৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥"

তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দলাভ করে, স্পর্শে জীবন রসবিলসিত হইয়া উঠে। জয়দেবের প্রাণ যথার্থ ভগবদ্ভক্ত হওয়াতে সেই আদিদেবের আদিরসবিলাসে সতত বিলসিত থাকিত। তাই তিনি, হরিপ্রেমের সরসতায় রসান্বিত হইয়া,

* আমার বোধ হয় কেন্দুবিল্বের নাতিবিস্তৃত নদীটির অজয় নাম জয়দেবের নাম মাহাত্ম্যেই ঘটিয়াছে। অজয় নামের অন্য কারণ আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

† এমনও হইতে পারে যে লোকে তাঁহাকে অজয়দেব বলিতে বলিতে ক্রমে জয়দেব নামে খ্যাত করিয়াছিল। দ্রুতোচ্চারণ প্রভাবে অজয়ের অকারটি মনে হয় স্বভাবতই লুপ্ত অকার প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে হরিপ্রেমে নির্ভর করিয়া, বিলাসকলাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়াই তৎকুতূহল নিবারণার্থে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন :—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং।
মধুর কোমল বসন্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥

হরিলীলার কেলিকলায় জয়দেব বিভোর হইয়া থাকিতেন। এইজন্য তিনি অমন সুন্দর সরস হরিলীলা বিষয়ক গীতি রচনায় পারগ হইয়াছিলেন। আমাদের অন্তরের ভাব যেরূপ হইবে আমাদের গানও সেইরূপ হইবে। জয়দেবের অন্তরে হরিপ্রেম ঘটিত আদিরসের এক আশ্চর্য্য মৌলিকতা ছিল তাই তিনি অমন সুললিতরূপে কৃষ্ণের আদিরসের গান গাহিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; একজন সূক্ষ্ম শৃঙ্গারবিবেকতত্বজ্ঞ ছিলেন। শৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বে সুপণ্ডিত জয়দেব হরিপ্রেমের সহিত যুক্ত করিয়া আদিরসকে প্রকৃত অমৃত চক্ষেই দেখিতেন। আদিরসের সার, তন্ময়লালাতে মগ্ন হইয়াই তিনি গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন। অশ্লীলপ্রাণে তিনি কখনই গীতগোবিন্দ লেখেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার অমন রচনামাধুর্য্য কখনই বাহির হইত না। তিনি তাঁহার শৃঙ্গার সারস্বতের মহিমা হৃদয়ের সহিত উপলব্ধি করিয়াই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন :—

"সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি
ভবতঃ শর্করে কর্করাসি।
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি
ক্ষীর নীরং রস স্তে।
।।কন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণীতলং
গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্
ভাবং শৃঙ্গার সারস্বতমিহ
জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি॥

ইহলোকে যাবৎ জয়দেবের বচন পরম্পরা শৃঙ্গারসারস্বত চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিবে তাবৎ হে মাধ্বীক চিন্তা আর ভালরূপ হইতেছে না; হে শর্করা তুমি কর্কর হইতেছ; হে দ্রাক্ষা তোমায় আর কে দেখিবে; হে অমৃত তুমি মৃত; হে ক্ষীর তোমার রস যেন নীর; হে সহকার তুমি ক্রন্দন কর; হে কান্তাধর তুমি ধরণীতে গমন কর।" বাস্তবিক গীতগোবিন্দের ন্যায় গীতিকাব্যে এরূপ মাধুর্য্য কোথাও দেখি নাই। গ্রন্থটীর লালিত্য এ পর্য্যন্ত কেহই মলিন করিতে সমর্থ হইল না। জয়দেবের ন্যায় এ প্রকার সুললিত সুনিপুণ গীতিকবির গীতিগ্রন্থকে মলিন করিবে? গীতগোবিন্দ যখন পাঠ করি তখন বুঝিতে পারি যে গান রচনায় জয়দেবের কি প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।—গন্ধর্ব্বকলার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল! গন্ধর্ব্বকলা কৌশলে তিনি যে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা গীতগোবিন্দ পাঠে, বিশেষতঃ গ্রন্থটীর দ্বাদশ সর্গস্থিত চতুর্থ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়। এই শ্লোকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানের ও শৃঙ্গারতত্ব বিবেকের সঙ্গে সুধীজনকে গান্ধর্ব্বকলা সুকৌশলও গীতগোবিন্দ হইতে পরিশোধন করিয়া লইতে বলিয়াছেন :—

"যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং।
যচ্ছৃঙ্গার বিবেকতত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতং॥
তৎ সর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ।
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥"

গীতিরচনায় জয়দেবের ভাষা ...-চন শক্তি বিলক্ষণ ছিল।—সুললিত পদবিন্যাসে তিনি নিরতিশয় দক্ষ ছিলেন। তাঁহার গান দেখিয়া মনে হয় যে গানে তিনি শ্রুতিকটুতা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না; গানকে তিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রুতিমধুর করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কালিদাস এইরূপ গানকে শ্রুতিমধুর করিবার পথ প্রথমে জগৎকে দেখাইয়াছেনঃ—

রাগিণী চর্চরী।

ময়ূর পরভৃত হংস রথাঙ্গম্
অলি গজ পর্ব্বত সরিৎকুরঙ্গম্।
তব নিমিত্তমরণ্যে ভ্রমতা,
কো ন খলু পৃষ্টো ময়া রুদতা॥
বিক্রমোর্ব্বশী।

এইরূপ আরও অনেক গান আছে। কিন্তু গানের ভাষার সৌকুমার্য্য, লালিত্য আনয়ন করিবার প্রকৃষ্ট পথ জয়দেব সর্ব্ব প্রথমে প্রদর্শন করিয়াছেন; বলিতে কি এ বিষয়ে তিনি পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। কাব্যরাজ্যে অনেকানেক মহোদয় আছেন যাঁহাদের প্রভায় জয়দেব নিষ্প্রভ হইলেও হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার গানের দিকে যখন চাহিয়া দেখি তখন মনে হয় যে তাহার সৌন্দর্য্য দুর্জ্জয়। জয়দেবের গানই গীতগোবিন্দের প্রাণ। কবি জয়দেবের গানের প্রতি কিরূপ যত্ন ছিল গীতগোবিন্দ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—গোবিন্দের উদ্দেশে কতকগুলি সুললিত গীত প্রধানতঃ রচনা করিয়া তিনি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার গীতিরচনার সুরভিতেই মুখ্যতঃ গীতগোবিন্দের মাহাত্ম্য জনসমাজে প্রকাশিত। গীতাংশ বাদ দিলে গীতগোবিন্দের থাকিবার কিছুই থাকে না; কেবল কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকে। গীতিকবি জয়দেব গীতগোবিন্দের অন্যান্য স্থলাপেক্ষা গীতগুলিতেই প্রকৃতরূপে লালিত্য, মাধুর্য্য সৌকুমার্য্য ঢালিয়াছেন। মধুর মিল ও অনুপ্রাসের দ্বারা তিনি তাঁহার গীতগুলি বিভূষিত করিয়াছেন।

জয়দেবের অনুকরণে, সংস্কৃত ভাষায় সুললিত করিয়া গান লিখিতে সনাতন দেব, গোবিন্দ দাস, রামানন্দ রায় প্রভৃতি বৈষ্ণবকবি প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সে প্রয়াস তেমন সফল হয় নাই। জয়দেবের গীতিরচনা মাধুরীর কাছে তাঁহাদের গীতিরচনামাধুর্য্য মন্দীভূত হইয়া যায়। কেহই তাঁহার ন্যায় সন্দর্ভশুদ্ধি-বাণীবিশিষ্ট গীতিরচনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। নমুনাস্বরূপ তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

সনাতন দেবের গান।

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতং
রময় জনং নিজ দয়িতং।
কিমুফলমপরাধিক্রুধা
সম্প্রতি তব রাধিকয়া॥
মাধব পরিহর কপট ভঙ্গং
বেত্তি ন কা তব রঙ্গং।
আঘূর্ণতি তব নয়নং
যাহি ঝটিং ভজ শয়নং॥
অনুলেপং রচয়ালং
পশ্য তু নখপদজালং।
ত্বামিহ বিহসতি বালা
মুখর সখীনাং মালা॥
দেব সনাতন বন্দে
ন কুরু বিলম্ব মলিন্দে।

গোবিন্দদাসের গান।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং।
ব্রজ বনিতা কুচকুঙ্কুম ললিতং॥
বন্দে গিরিবরধর পাদ কমলং।
কমলাকর কমলাঞ্চিত মমলং॥
মঞ্জুলমণি নূপুর রমণীয়ং।
অচপল কুলরমণী কমনীয়ং।
অতি লোহিতমতি রোহিত ভাষং।
মধুমধুপীকৃত গোবিন্দ দাসং॥

রামানন্দ রায়ের গান।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং
পঙ্কজমিব মৃদু মারু চলিতং
কেলি বিপিনং প্রকাশিত রাধা
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ রাধা
বিনি দধতি মৃদুমন্থর পাদং
রচয়তি কুঞ্জরগতি মনুবাদং॥
জনয়তি রুদ্র গজাধিমুদিতং
রামানন্দ রায় কবি গদিতং

জয়দেবের গীতরচনার শোভার কাছে এ সকল গীতরচনা ম্লানভাব ধারণ করে। তাঁহার গানের ভাষাও যেরূপ মধুর, ভাবও প্রায় সেইরূপ মাধুর্য্য-প্লাবিত। তাঁহার গীতগুলিতে—প্রায় সমস্ত গীতগোবিন্দের মধ্যে মধুর আদি-রস আশ্চর্য্যরূপে প্রবাহিত। গীত-গোবিন্দের ন্যায় প্রকৃতপক্ষে আদিরস-প্রধান গীতিকাব্য পাওয়া দুষ্কর গীতি-কাব্যে ইহা পৃথিবীর মধ্যে মৌলিক। যদি ঠিক শুদ্ধ আদিরসের গীতিকবি কাহাকেও বলা যায় তবে সে গীত-গোবিন্দের কবি জয়দেবকে। এমন আদিরসস্নাতভাব আমরা অন্য কোন গীতিকাব্যে দেখিতে পাই না, এরূপ প্রণয়রঙ্গরঞ্জিত চিত্র অন্য গীতিকাব্যে বিরল, এ প্রকার উদ্বেগভরা অনুরাগ-ঘটাময় গোবিন্দের কথা আমরা গোবিন্দ সম্পর্কীয় অন্য কোন গানে দেখি নাই। আদিরস অন্তরে বসাইতে গীতগোবিন্দের ন্যায় অন্য কোন গীতিকাব্য তেমন পটু শক্তিমান বলিয়া মনে হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দকে একরূপ আদি-রসের ইতিহাস বা তাহার নিখুঁত ‘ফোটো-গ্রাফ’ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই শৃঙ্গারতত্ত্ব যদি শুদ্ধকাব্যে বা নাট্য-কাব্যে বর্ণনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলে তাহা এত মধুর হইত না। তাঁহার বর্ণিত রাধামাধবের শৃঙ্গারলীলা গীতিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তাহা এত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে, গীতগোবিন্দ এত উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। জয়দেব গীতগোবিন্দ গাহিয়া গীতগোবিন্দ নামের যথার্থই সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন—গীতি কবিত্বের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানির আরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে—মেঘাবৃত আকাশের তলে আরম্ভ করাতে।

যিনি কবি তাঁহার প্রধান ব্রত দেশ-কালের ঠিক প্রকৃতি অনুভব ও কাব্যের দ্বারা তাহা চিত্রিত করা। ভারতে মেঘালোকে আদির সানুরাগ যে লোকের কিরূপ প্রিয়বস্তু তাহা সম্ভবতঃ জয়দেব বুঝিতে পারিয়াই ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানে মেঘালোকে বিরহ যে অসহ্য ও অনুরাগ যে প্রবল হয় তাহা নানা হিন্দু-স্থানী গানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—

"এয়সে বরখা ঋতুমে ক্যায়সে একেলি—"

এই বরষা ঋতুতে কি প্রকারে একেলা (রহিব)—"

"পিতমরে রিতুবরখা আওয়ানা কিন"

ঋতু বরষা প্রিয়তম রে আসে নাই কেন?—ইত্যাদি।

বঙ্গকবির গানেও মেঘচ্ছায়ে অনুরাগপ্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের একটী গানে রাধা বিরহ জ্বালায় কাতর হইয়া বলিতেছেন।

"মেঘের গর্জ্জন কত না সহিব প্রাণে"

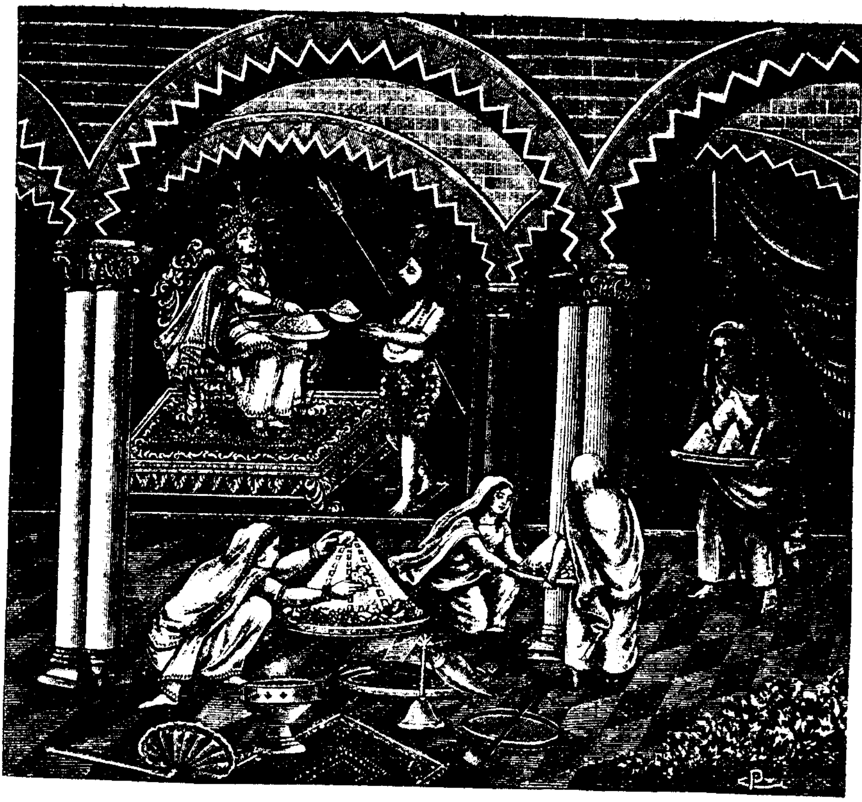
ভারতে মেঘমাসে সকলেরই ভাব গৃহমুখী হয় সকলেই তৃষিতনেত্রে গৃহে প্রিয়জন সন্দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তখন প্রিয়জনদিগের মধ্যে কেহ কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিতে ভালবাসে না। বিশেষতঃ প্রণয়ীজনেরা তখন বিরহ জ্বালায় বড় কাতর হয়, একে অন্যকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে চায় না—একে অন্যের অভাবে নিদারুণ হৃদয় বেদনা অনুভব করে। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস—তিনিও মেঘালোকে এইরূপ বিরহ ব্যথা রীতিমত অনুভব করিতেন। তাঁহার মেঘদূত তাহার প্রধান সাক্ষী। ইহা ছাড়া তিনি মেঘদূতের মধ্যে মেঘকে কৌতুকাধানহেতু কহিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনো প্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণি জনে কিং পুনর্দূর সংস্থে॥"

এই সকল বুঝিয়াই কালিদাস মেঘালোকে মেঘদূত প্রকাশ করিয়াছেন; "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"র দ্বারা মেঘদূতকে ঘনঘোর করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। জয়দেবও তাঁহার শৃঙ্গার রসপ্রধান গীতগোবিন্দে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং—" বলিয়া, আকাশকে মেঘাবৃত করিয়া তবে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেঘালোকে প্রণয় যেন প্রকৃতির বিরহজনক নিদারুণ তাপের পর মিলনবারির দ্বারা স্নিগ্ধ হইতে চায়। অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়ের ন্যায় তাহার পুষ্ট সরসতা ও গভীরতা জাগিয়া উঠে। বিরহজ্বালা অতিক্রম করিয়া মেঘালোকে মিলনাকুলতাই ভারতের কাব্যে দেখা যায়;—ভারতীয় কাব্যের স্বাভাবিক ধ্বনি। গীতগোবিন্দে ভারতীয় কাব্যের সে স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয় নাই। জলদের মেদুরচ্ছায়ালোকে শৃঙ্গাররাগ গীতগোবিন্দে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেঘালোকে শৃঙ্গাররাগ ভারতীয় কাব্যের স্বাভাবিক প্রাণ। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রেও মেঘরাগ শৃঙ্গারপূরক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই হেতু জয়দেব তাঁহার শৃঙ্গার গীতিকাব্য গীতগোবিন্দকে মেঘচ্ছায়ায় ফুটাইয়া গীতিকবিতারবিন্দ করিয়া তুলিয়াছেন।

এই গীতি কবিতারবিন্দ গীতগোবিন্দের ভারতের সর্ব্বত্র সমাদর। ইউরোপেও ইহার আদর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনাতন প্রাচ্যভাবমগ্ন ইংরাজ কবি এড্‌ইন আর্ণল্ড্‌ও ইহার মাধুর্য্য উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; তিনি তাহা ইংরাজী ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন। তৎকৃত পদ্যানুবাদে গীতগোবিন্দের অনেক নূতন মাধুর্য্যে ইংরাজী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে।



মধুমাসে।

মধুমাসে মাধবীর ফুল ফুটিয়াছে। মাধবী সহকার-শিরে পল্লবিত বাহুলতা বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চারিধারে সৌরভরাশি ছড়াইতেছে। বকুলশিরে গাছভরা মুকুলমালাও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, প্রভৃতি বাসন্তি-কুসুমের সৌন্দর্য্য ও মধুগন্ধ চারিদিক শোভিত ও আমোদিত করিয়াছে। সেই গন্ধে বিভোর হইয়া মধুকর-নিকর উল্লাসে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাধবীলতার বকুলশিরে, অশোক ফুলে আসিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে, মধুচক্রে যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

বাসন্তী গৃহোপবনে নব-মল্লিকার কুসুম-সৌন্দর্য্য বিকসিত। অগণ্য প্রফুল্ল ফুলরাজি শ্বেত শোভায় বন আলোকিত করিয়া প্রভাতের বিমল বিভার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে গোলাপ রূপবতী সেই সৌন্দর্য্যের রমণীয়তা ও বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। সেই কুসুমিত মধুকাননে, সুবাসিত গোলাপ বাগানে, প্রফুল্লিত মল্লিকা বনে, সুরকান্তি

বিকসিত করিয়া এক বালিকাসুন্দরী পুষ্পচয়নে আসিয়াছেন। করপল্লব বাড়াইয়া কুমারী কত উল্লাসে ব্যস্ত হইয়া ফুল তুলিতেছেন! কুমারীর ওষ্ঠোপরি গজমতি। নব-বসনে দেহ আবরিত। কণ্ঠে স্থবর্ণ হার, কুমারীর হেমবালা-করে ফুলডালা। দেখিলে অনুমান হয়, পূর্ব্বরাগরূপিণী দেবকন্যা উমা বুঝি হরমন তুষিবার জন্য উদয় হইয়াছেন।

গৃহাভ্যন্তরে আবার অন্যদৃশ্য। তথায় প্রফুল্লিতা পদ্মিনীর ন্যায় কমলারূপা গৃহিনী পূজার ব্রতে ব্রতী। নবস্নাতা, উজ্জ্বল পট্টবস্ত্র-পরিধানা, রূপলাবণ্যবতী পুণ্যকার্য্যের আয়োজনে গৃহ আলো করিয়া রহিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহার দেহ ভূষিত। শিরে সিন্দুর, পায়ে অলক্তরাগ। গলে স্বর্ণহার, কর্ণে হীরক দুল। আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। চন্দ্রবদন কার্য্যে অবনত। গৃহিনী নিজ বিধবা কন্যাকে লইয়া নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। কন্যার রূপে মাধুরী ও মলিনতা—মুখে শান্তি-ছায়া। পদ্মপার্শ্বে যেন অর্দ্ধনিমীলতা, বিষাদিতা কুমুদিনী। দুজনে শুদ্ধাচারে, আস্তে আস্তে একমনে ও নীরবে কার্য্য করিতেছেন। শ্রদ্ধা যেন শুদ্ধিকে লইয়া দেবসেবার আয়োজন করিতেছেন। পবিত্র মনে, পবিত্র বসনে, সংসার ভুলিয়া সংসারিণী আজ মায়ার সঙ্গে জগৎ সংসারিণীকে পূজা করিবেন। আর এ সমস্ত শোভা পরাজিত করিয়া পুরমধ্যে নিজে ভক্তিময়ী উদয় হইয়াছেন। ঋতুমাধব দেবদোলের পর আবার বুঝি মাধব ও মাধবীকে আনিয়াছেন। অথবা এই বাসন্তী সৌন্দর্য্যময় বঙ্গধামকে কৈলাস ভ্রমে হরপার্ব্বতী দেখা দিয়াছেন। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেই খানে হিন্দু-কল্পনা দেবসমাগম দেখে। হিন্দুর দেবপূজা হেমন্তে ও বসন্তে, ফুলে ও চন্দনে। হিন্দুর দেবতা সৌন্দর্য্যে প্রেমে ও দয়াতে পরিপূর্ণ। জগৎ-সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ সেই সৌন্দর্য্য, জগৎ-প্রেম-পূর্ণতায় দেবতার চির-যৌবন, আর, ভক্তবাৎসল্যে সে যৌবনের মাধুরী। চিরযৌবন ভক্তিময়ীর বক্ষঃদেশ জগৎপ্রেমে স্ফীত হইয়াছে। জগৎ স্নেহরসে জগন্মাতার পয়োধর পরিপূর্ণ। শতকণ্ঠী সুলম্বিত মুক্তামালা সে প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে সম্যক্ আবরিত করিতে পারে নাই। জগৎ-সংসারিণী ত্রিনয়নে ত্রিসংসার রক্ষা করিতেছেন। শক্তিরূপা প্রকৃতি-সুন্দরী আজ প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা হইয়াছেন। তাঁহার গাত্রদেশে হেমকান্তি প্রতিফলিত হইতেছে। রুদ্রাদি-রূপধারিণীর পদতলে ইন্দ্রাদির সাম্রাজ্য পদ্মরূপে বিকসিত হইয়াছে। বদনে কোটিচন্দ্র বিভাসিত। মস্তকে মনিময় মুকুট। হস্তে হীরক বলয় ও কেয়ুর। কর্ণে চন্দ্রার্ক সম কুণ্ডলদ্বয়। বালার্কবর্ণেশ্বরীর বসনে অগ্নিনিভ উজ্জ্বলতা। সর্ব্বানন্দদায়িনীর বিম্বাধরে আনন্দের মৃদুমন্দ হাস্য। সর্ব্বসংসারিণীর। দক্ষিণ করে রজত দর্বী, বামকরে স্বর্ণ পাত্র, সম্মুখে ভক্তিভিখারী হরি ভক্তি অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এ সেই মানিনীর কাছে যোগীবেশে মানভিখারী। ভিখারী বেশে হরি আজ হররূপে উদয় হইয়াছেন *। তাহার

* ভক্তের নিকট হরি হর একই মূর্ত্তি। কৃষ্ণভক্ত নারদ মহাদেবেরও পরম ভক্ত ছিলেন। টীকাকার শ্রীমধুসূদন মহিম্ন-স্তোত্রের কৃষ্ণপক্ষে

পীতাম্বর বাঘাম্বর হইয়াছে। তাঁহার বেণু ত্রিশূলে পরিণত। বিষ্ণু নিজরূপে শ্বেতবর্ণ। তাঁহার মৃণালমালা অহিবেষ্টনে গললগ্ন রহিয়াছে। কণ্ঠের কুবলয় মালায় তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম নেত্র ঢুলু ঢুলু করিতেছে। ভক্তিসুধাপানে হরি মৃত্যুঞ্জয় রূপে মোহনচূড়ার স্থানে ভুজঙ্গ-ফণা শিরে ধারণ করিয়াছেন। সেই উদাসীন সাজে পুরুষ আজি প্রকৃতির কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন? কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। অন্ন—ভক্তি। যে অন্ন জগতের সর্ব্বস্ব ও প্রাণ, সেই অন্ন সন্ন্যাসী জগন্ময় দিবেন বলিয়া অন্নময়ী * প্রকৃতির কাছে তাহা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। যে ভক্তির জন্য জগৎ লালায়িত সেই ভক্তি জগতে দিবেন বলিয়া হরি সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তি-পূর্ণার কাছে তাহা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এ বড় সুন্দর দৃশ্য। জগৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যখন জগতের অন্নভোগ জন্য জগৎপতি অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঙ্ক হইতে সেই অন্ন জগতে বিতরণ করিতেছেন, তখন সংসারিণী কেন না সে দৃশ্যে মোহিতা হইবেন, মোহিতা হইয়া সে রূপকে পূজা করিবেন।

সংসারিণী বড়ই ভক্তিভাবে, বড়ই নিকট সম্বন্ধভাবে জগৎ সংসারিণীকে পূজা করেন। তিনি নিজ ক্ষুদ্র সংসারে যেরূপ সংসারিণী, দেবী জগৎ সংসারে সেইরূপ সর্ব্বসংসারিণী। তিনি ক্ষুদ্র সংসারের অন্নদাত্রী, দেবী জগৎ সংসারের অন্নপূর্ণামূর্ত্তি। তিনি যে হিন্দুসংসারের সংসারিণী, সে সংসার প্রেমের রাজ্য। সে সংসারে মানব প্রকৃতির প্রমোদ ও নৃত্য। পরিবার মণ্ডলীর সকলে এক সঙ্গে প্রেমে, স্নেহে, মমতায়, মায়ায়, আদরে, যত্নে, সোহাগে, অভিমানে, ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, সহিষ্ণুতায়, লজ্জায়, পূজায়, সেবায় ও ভক্তিতে আবদ্ধ। সে সংসারে যৌবনোদ্দৃপ্ত লালসা ও রিপুকুল শাসিত থাকে—প্রেমের, আদরের, স্নেহের, মমতার ও ভক্তির শাসনে শাসিত। শাসন করে দারা সুত, আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনেরা। যৌবন, সংসারভারে ও বন্ধনে শাসিত। যৌবনের শাসন যেমন, বার্দ্ধক্যের লীলা তেমনই। বৃদ্ধ, স্নেহ ও মমতায় আবদ্ধ হইয়া সুখে সংসার লীলায় জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন। হিন্দুসংসারে পুত্র পরিবার, আদরে ও যত্নে প্রবৃদ্ধ হয়। ইউরোপীয় সংসারে এ প্রেম রাজ্য নাই—সেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার-মণ্ডলী নাই। কেবল হিন্দুকুলে ও ভারতে এই সমাজিক নিয়ম—এই হিন্দু ঋষিগণের উদার হৃদয়ের প্রেমসংসার-লীলার প্রতিষ্ঠা। হিন্দুসংসারে হৃদয়ের যত কোমল ভাব প্রস্ফুরিত হয়। সংসারকে হিন্দু কেবল বাড়াইতে চাহে। বাড়াইতে চাহে প্রতিবাসী লইয়া, স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া এবং অতিথি লইয়া। কেবল পরিবার মণ্ডলীতে সে প্রেম আবদ্ধ থাকিতে পারে না—প্রেম দয়াতে, ক্ষমাতে প্রশস্ত হইয়া বাহিরে বিস্তারিত হয়। আমোদে ভোজনে অন্নসত্রে সংসারক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। হিন্দু উদার প্রেমে মুক্ত হস্তে অতিথি সেবায় নিরত হন—নিত্য অতিথি

অর্থ করিয়াছেন। মিথিলানিবাসী কবি কৃষ্ণদত্ত শিবপক্ষে সমস্ত গীতগোবিন্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* অন্ন—পর্য্যায়ে অন্ধ (প্রকৃতি). ভক্ত।
অমরকোষ।

গণ তাঁহার সংসার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেয়। এই সংসার বিস্তৃতির নাম হিন্দু-সংসার, মায়া ও প্রেমের রাজ্য, দয়ার উদ্বেলিত সাগর। দেখিও হিন্দু, ঋষির এমন সুন্দর-প্রেম সংসার-রচনা যেন ভাঙ্গিও না; এক্ষণকার দূষিত ইংরাজী শিক্ষার বিষকৃমিকে এ সংসারে প্রবেশ লাভ করিতে দিও না।

এই প্রেম-বিস্তৃত হিন্দুসংসারে সর্ব্ব-সংসারিণী অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিতা আছেন বলিয়া গৃহীর নিজ আশ্রম এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীর অন্নসংস্থান হইতেছে। যখন সন্ন্যাসী সংসারীর কাছে অন্ন-ভিখারী অতিথিরূপে উদয় হন, সংসারী তাঁহাকে হররূপে পূজা করেন। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে, অতিথির বেদজ্ঞান গোত্র, আচরণ ও কুল কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না; বিষ্ণুরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে *। হিন্দু জানেন, দেবতারা ভিখারী বেশে উদয় হন। দেবতারা দেখা দেন, তাঁহার প্রেম পরীক্ষার জন্য। যিনি দয়াধর্ম্ম ও প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিতে আসেন, তিনি দেবতা নয় তো কি? হিন্দু দয়াতে কতদূর পরিপূর্ণ হইয়াছেন, তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে অতিথির উদয়। সন্ন্যাসাশ্রমী সন্ন্যাসী সংসারীর অন্নে সেবিত হইয়া দেবকার্য্যে প্রাণ মন অর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। গৃহী সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিপালক—প্রতিপালনের নিমিত্ত-কারণ মাত্র। নহিলে যিনি সর্ব্বপ্রতিপালনের বিধাতা, তিনিই জগতের প্রতিপালক। গৃহী তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। সংসারী সন্ন্যাসীর সৎকার করিয়া বিধাতারই কার্য্য করেন—দেবতার সৎকার করেন—দেবসেবার আয়োজন করিয়া দেন। সংসারী, বনবাসী তপস্বীকে বিত্তদান করিয়া দেবকার্য্যেরই সহায়তা করেন। এই সংসারাশ্রমের গৃহিণী লক্ষ্মীরূপা সংসারিণী। সেই সংসারিণীর দেবত্ব অন্ন পূর্ণা মূর্ত্তি।

ভগবতী যে অংশে লক্ষ্মীরূপা, সেই অংশে তিনি অন্নপূর্ণা। ভগবৎ-শক্তি নারীরূপে সংসারধর্ম্মে গৃহীর অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হিন্দু গৃহিণী যেরূপে লক্ষ্মীরূপা ব্যাস তাহা মহাভারত মধ্যে সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুগৃহী যত কেন ধন-সম্পত্তির অধিপতি হউন না, তাঁহার গৃহিণীর কার্য্য কিরূপ হইবে, তাহা আমরা দ্রৌপদী চরিত্রে পরিষ্কার বুঝিতে পারি। রাজান্তঃপুরে যাজ্ঞসেনী যে কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন, তাহা তিনি সত্যভামার নিকট একদা নিজেই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন;—"আমি প্রত্যহ উত্তম-রূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।" দ্রৌপদী এইরূপে গৃহস্বামিনী হইয়া পতিগণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী পতিপরায়ণতার নিদর্শন স্বরূপ গৃহকার্য্যের সমস্ত ভার লইয়া স্বামীরই সংসার ধর্ম্মে সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী হয়েন। গৃহী, ধন মান ও

* স্বাধ্যায় গোত্রচরণম পৃষ্টাপি তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যাতংমন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।
বিষ্ণুপুরাণ। ৩ অংশ—১১ অধ্যায়।

সঞ্চয়ের জন্য সংসারে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন ; গৃহিণী অন্তঃপুরের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও সমাধা করিয়া গৃহীকে দেবতারূপে সৎকার ও পরিতুষ্ট করিতেছেন। প্রাচীনাদিগের মধ্যে আমরা অনেক হিন্দুগৃহে এইরূপ হিন্দুগৃহিণী দেখিয়াছি। গৃহীর কার্য্যক্ষেত্র গৃহের বহির্দ্দেশে, গৃহিণীর রাজত্ব ও কার্য্যক্ষেত্র গৃহপুরী-মধ্যে। গৃহিণীর রাজত্বে গৃহী বশীভূত, শাসিত এবং পরিতুষ্ট। সে .ানে সুখ আছে, সে পূজাতে পর্য্যাপ্ত পরিতোষ। তত সুখ আর কোথাও নাই। তাই গৃহী যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে, নিজ গৃহের সেই শান্তিময় নিকেতনে, যেখানে গৃহিণী তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্নবিতরণ করেন, আর অমৃতময় বাক্যে পূজা করেন। সেই পূজাতেই গৃহীর শাসন, বশ্যতা, প্রভুত্ব, পরিতোষ ও সুখ। গৌরীকান্ত সেইরূপ গৃহী, আর অন্নপূর্ণা সেইরূপ সংসারিণী। অন্নপূর্ণা দর্ব্বী ও পাত্র করে গৃহিণীর দেবত্ব ও স্বধর্ম্ম কি, তাহাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন, যে সংসারের গৃহিণী নিজ হস্তে সমস্ত গৃহকার্য্য, অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণ ও দ্রৌপদীর ন্যায় অন্ন ব্যঞ্জন পাক করেন, সেই সংসারেই লক্ষ্মী অবতীর্ণা হন, সেই সংসারেই সকলের তৃপ্তি ; ভোজনে, পানে, সর্ব্ববিষয়েই তৃপ্তি। হিন্দুগৃহিণীর সমক্ষে অন্নপূর্ণার এই আদর্শ। এই আদর্শের দেবতা, দর্ব্বী ও পাত্রকরশালিনী, ঐশ্বর্য্য ভূষিতা, লক্ষ্মীরূপা অন্নপূর্ণা।

মধুমাসে সমস্ত রবিশস্য গৃহাগত হইয়াছে। একালে আর তৃণ ধান্য ক্ষেত্রে পতিত নাই, সমুদয় গৃহে আহৃত হইয়াছে, শুধু আহৃত নয়, ধান্যরাশি অন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই অন্নরাশি দেখিয়া গৃহিণী বড় আহ্লাদিতা, সেই অন্নরাশি হইতে একবার দেবতার জন্য কিছু না ব্যয় করিলে তাহার হৃদয় তৃপ্ত নহে। তাই তিনি অন্নকোট করিতে বাসনা করিয়াছেন। ভক্ত যেখানে অন্নকোট করেন, বিষ্ণুর সেখানে আবির্ভাব। বিষ্ণু অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সেখানে অন্নের ভিখারী *। অন্নের ভিখারী নয়, ভক্তির ভিখারী। ব্রাহ্মণপত্নীগণের অন্নকোটে এজন্য আমরা হরির সহিত বৃন্দাবনের রাখালগণকে অন্নভিখারী রূপে দেখিতে পাই। তাহারা ত অন্নের জন্য আসেন নাই, মুনিপত্নীগণের ভক্তি-পূর্ণতা সমাধা-করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তিতে ব্রাহ্মণীগণ গৃহে আবদ্ধা থাকিবার পাত্রী নহেন, তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াগোষ্ঠে গোপালগণের সহিত হরিকে অন্নদান করিয়া আসিয়া তবে যজ্ঞ সার্থক করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভক্তিতে বুঝি আজ গৃহিণী অন্নপূর্ণার যজ্ঞে মাতিবেন। তাই এই মধুমাসে অন্নরাশির অধীশ্বরী হইয়া ভক্তি সহকারে দেবীকে পুরমধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। অন্নসত্র করিয়া গৃহলক্ষ্মী আজি জগৎলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে পূজা করিবেন। সেই পূজার জন্য গৃহিণী নিবিষ্টচিত্তে আয়োজন করিতেছেন।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আমরা যে শুধু জগৎ-সংসারিণীকে দেখি এমত নহে,

---

* ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নির্বসুগণোঽর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে ভুঞ্জিতেঽন্নং নরেশ্বর
বিষ্ণুপুরাণ।—৩ অ-১১।

তিনি মহেশ্বরকে অন্নদান করিয়া বিশ্বাত্মাকে প্রীত ও পরিতুষ্ট করিতেছেন। হিন্দুর চক্ষে, বিশ্ব ও ব্রহ্ম একই। এক বিশ্বাত্মা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। বিশ্ব সেই পরমাত্মারই রূপ মাত্র। হিন্দু সেই জন্য পরমাত্মার পূজা করিয়া বিশ্বকে পূজা করেন। বিশ্ব ও পরমাত্মাকে যিনি অভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহার বিশ্ব পূজা পরমাত্মার পূজা মাত্র। তিনি বিশ্বময় কেবল পরমাত্মাকেই দেখিতে পান। এজন্য হিন্দু জানেন, পরমাত্মার পরিতোষ হইলেই জগৎতুষ্ট। আর, জগৎকে তুষ্ট করিলেই পরমাত্মা পরিতুষ্ট। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :—

"নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি সকলই বিষ্ণু স্বরূপ ; কারণ, বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই জন্য সমুদয় ভূত সমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে। আমি সমুদয় জীবস্বরূপ ; সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম *।"

হিন্দু এই ভাবে জগতের পূজা করেন। তাঁহার বিশ্বপ্রীতি ও বিষ্ণুভক্তি একই হইয়া পড়ে। যিনি প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত তিনি কখন বিশ্বের প্রতি বিরাগী হইতে পারেন না। তিনি বিশ্বপ্রেমে পরিপূরিত হইয়া সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিষ্ণুভক্তিতে উপনীত হয়েন। যিনি বিষ্ণুকে পূজা করিতে গিয়া বিশ্বকে অবহেলা করেন, তিনি বিষ্ণুপূজা করেন না। বিষ্ণুর পূজা তখন সম্পূর্ণ হয়, যখন বিশ্ব পরিতুষ্ট হয়। যিনি বিশ্বপ্রেমে জগৎকে পরিতুষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণুভক্ত। এইরূপ বিষ্ণুভক্তি ব্যাস জলদক্ষরে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন, বিশ্বাত্মাকে পূজা করিলে বিশ্ব পরিতৃপ্ত হয় এবং বিশ্বকে পরিতুষ্ট করিলে বিশ্বাত্মা পূজিত হয়েন। অন্নপূর্ণা-প্রতিমায় আমরা দেখিতে পাই, দেবী হরকে অন্ন দান করিতেছেন। সে অন্নদান কোথায় পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহা এ প্রতিমায় চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা জ্ঞানচক্ষু ও ভক্তিতে প্রতীয়মান। ব্যাস তাহা আর একস্থানে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। দুর্ব্বাসার পারণে তাহা স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্রৌপদী যখন স্থালীসংলগ্ন অবশিষ্ট শাকান্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহা আহার করিলেন, তখন সেই আহারে দুর্ব্বাসার দশ সহস্র শিষ্যের উদর পরিপূর্ণ হইল। ব্যাসের এই রূপক কথায় আমরা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির সমুদয় রহস্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, দুর্ব্বাসার পারণ অন্নপূর্ণা প্রতিমার অপরাংশ মাত্র। দেখিতে পাই, অন্নপূর্ণা হরকে অন্নদান করিয়া বিশ্বকে অন্নদান করিলেন। যে অন্ন বিশ্বরূপ ভব প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন, সেই অন্ন ভবসংসারে উপনীত হইল। বিশ্বেশ্বর মহাদেব জগৎস্বরূপ, আর বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা ও দ্রৌপদী কৃষ্ণা বিষ্ণুভক্তিরূপা। অন্নসত্র করিয়া বিশ্বকে পরিতুষ্ট না করিলে কখন অন্নপূর্ণা পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তাই ভক্ত অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া অন্নসত্র

* ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহম্ ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥ ৫২ ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৩ অংশে। ১১ অধ্যায়।

করেন। অন্নসত্র না করিলে জগৎ পরিতুষ্ট হয় না। জগৎ পরিতোষের প্রতিমাই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি।

যে দান জগদ্ব্যাপ্ত, তাহাই দেবদয়ার বিকাশ। যাহা অনন্তভাবে পরিপূর্ণ, তাহাই দেবত্ব; দয়ার অনন্ত প্রসারে দয়ার দেবত্ব। দেবদয়াতেই সংসার চলিতেছে। এই দেবদয়া জীবের জীবন-নিদান। জীব যাহা কিছু সম্ভোগ করে, প্রকৃতির যত কিছু বিভব ও সম্পত্তি, সমস্তই দেবদয়ার সামগ্রী। জগৎ দেব দয়াময়। যেখানে দেবদয়া নাই, সেখানে পুরুষকার বিফল। মহাভারত কহেন ঃ—

"পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল উৎপন্ন হয়।"

দেবদয়ারসে পৌরুষতরু মুঞ্জরিত হয়। সেই দেবদয়ার প্রতিমূর্ত্তি অন্নপূর্ণা এবং পৌরুষের মূর্ত্তি ভিখারী হর। পুরুষ, প্রকৃতির সঙ্গে না মিলিলে বিশ্ব সমুদ্ভূত হয় না। বৃন্দাবন-বিলাসিনীর শক্তি সঞ্চারে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারী—প্রজাবর্দ্ধন সংসার-ধারী। অনন্তদেব অনন্ত-নাগ-শক্তিতে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। মহাদেবের এক নাম এই জন্য "অনন্ত সর্পরূপী"। "সন্ন্যাসী" এই শক্তি-ভিখারী "ভিক্ষু" * পুরুষকার দেবদয়ার কাঙ্গাল হইয়া বেড়াইলে তবে তাহা লাভ করিতে পারে।

"Knock and it will be opened to you"—Jesus.

যাঁহারা এবিশ্বের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দৃঢ়ব্রত কেবল দেবদয়া প্রভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছে। দেবদয়া প্রভাবে তাঁহাদের প্রবৃত্তি সংসার-ব্যাপিনী হইয়া পুরুষকারের মহাব্রত-পালনে সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এরূপ প্রবৃত্তি কি সকলের হয়? অন্নপূর্ণার দয়া কোথা হইতে নিঃসৃত হইতেছে, কেহ বুঝিতে পারে না। না বুঝিতে পারিয়া ভাবে নিজেরই পুরুষকার ও সামর্থ্য। জীবের সামর্থ্য—দেবতার শক্তি ও দয়া। দার্শনিক চক্ষে যাহা দেবশক্তি, ভক্তির চক্ষে তাহা দেবদয়া। জীবে যে পুরুষ বর্ত্তমান, সেই পুরুষ দিয়া সে দয়ার সঞ্চার হয়। পুরুষ দিয়া যে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহার কার্য্য না করিলে দেবদয়ার বৃদ্ধি হয় না। এজন্য হিন্দুসমাজে এত দয়ার কার্য্য প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত দয়ার কার্য্য, দেবানুগ্রহ লাভের শিক্ষামাত্র। হিন্দু সংসারে ও সমাজে এই দেবকৃপার বড়ই আদর। হিন্দুসংসার ও সমাজ তাই দয়াতে পরিপূর্ণ-দয়ার প্রধান শিক্ষা স্থল।

হিন্দুসংসারী দানধ্যানে এই দয়াই শিক্ষা করেন। তাঁহার লক্ষ্য দেবদয়া স্বরূপা অন্নপূর্ণা—যাহার দান সংসার ব্যাপী। হিন্দু মুষ্টি-ভিক্ষা দানে যাহা

* মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে যাহা তত্ত্বীকৃত স্তব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মহাদেবের সহস্র নাম ও গুণকীর্ত্তন হইয়াছে, যে জ্ঞানী সেই স্তব বুঝিতে পারেন। তিনি মহাদেবের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ও গুণ বুঝিতে পারেন। আমাদের এই প্রস্তাবে মহাদেবের একদেশ মাত্র বিবৃত হইয়াছে। মহাদেব অথবা পরমপুরুষ "সহস্র মূর্দ্ধা" "শতজিহ্ব" "সহস্রবাহু", "সর্ব্বদেবময়" ও "সর্ব্বাঙ্গ"। অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির সহিত মহাদেবের যতটুকু সম্বন্ধ, এই প্রস্তাবে কেবল ততটুকু বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আরম্ভ করেন, অন্নসত্রে তাহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। ক্রমে হিন্দুর যেমন ঐশ্বর্য্য বাড়ে, তেমনি তাহার দান বাড়ে। হিন্দুর ঐশ্বর্য্য-কামনা দয়াধর্ম্ম বিস্তারে পরিতৃপ্তি লাভ করে। হিন্দুর দয়া সর্ব্বসংসারে প্রসারিত হইতে চায় বলিয়া হিন্দু ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন এবং সেই ঐশ্বর্য্য লইয়া দয়াধর্ম্মে এত অকাতর ও মুক্ত-হস্ত হয়েন। এত অকাতর ও মুক্ত-হস্ত হইয়াও হিন্দু অন্নপূর্ণার সর্ব্বসংসার ব্যাপিনী দয়াতে আসিতে পারেন না। তাঁহার বিষ্ণুপূজার আকাঙ্ক্ষা কিছুতে পরিপূর্ণ হয় না। হিন্দুর বিষ্ণুপূজা কেবল দেবতাদেরই সম্ভবনীয়। তাই ত্রিপুরারি হর বিষ্ণুপূজায় রত। যখন দিগম্বর অন্নপূর্ণার অন্ন লইয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত করেন এবং বিষ্ণুর দয়া সর্ব্বসংসারে বিস্তৃত করিয়া নৃত্য করেন, তখন তিনি বিষ্ণুপূজাতেই রত রহিয়াছেন। ব্রহ্মা সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপারে বিষ্ণুর দয়া বিস্তৃত করিয়া বিষ্ণুপূজাতেই নিমগ্ন হন। সেই বিষ্ণুপূজা করিয়া মহেশ্বর সদাশিব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বিষ্ণুপূজায় ব্রহ্মার সৃষ্টি শত সৌন্দর্য্যে কুসুমিত ও শত সুখসাগরে প্লাবিত হইয়াছে।

হিন্দুসমাজ এই জগৎ বিসারিণী দয়ার প্রতিমা। হিন্দু সমাজ দয়াধর্ম্মের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। সামান্যাকারে প্রতি হিন্দুগৃহে যেমন প্রতিদিন অন্নযজ্ঞ হইতেছে, হিন্দুসমাজেও সেই মহাযজ্ঞ ব্যাপার। ভারতবর্ষ প্রচুর অন্নময় ক্ষেত্র। শস্যপূর্ণ ভারত কখন অন্নের জন্য দীন নহে। তাহার একবৎসরের উৎপন্ন অন্ন দুই বৎসর চলিতে পারে। বঙ্গদেশের কৃষক পর্য্যন্ত দুই বেলা ভুক্ত হয়। আর কোন দেশের দীন দরিদ্রগণ দুই বেলা অন্নলাভ করেনা। বঙ্গদেশের অন্ন বাহিরে পৃথিবীময় যাইতেছে, তবু সে দেশবাসিগণ অন্নের জন্য কাতর নহে। বঙ্গদেশের এত অন্ন বাহিরে যাইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশ পূর্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্র সমুদয় স্বর্ণবর্ষণ করিতেছে—অন্ন-মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই হাস্যময় হইয়া রহিয়াছে। যত অন্ন বাহিরে যাইতেছে, আমরা ততোধিক অন্ন লাভ করিতেছি। আজিও শত শত বিস্তৃত ভূমি খণ্ড অকৃষ্ট রহিয়াছে। অন্নের অভাব হইলেই আমরা মাতা ধরিত্রীর কাছে ভিখারী হই, জননী নিজ বক্ষঃদেশ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়, এবং মাতৃস্তন হইতে অমৃতস্বরূপ অন্ন বাহির করিয়া দেন। এক হস্ত কেন, শত হস্তে বাহির করিয়া দেন। আমরা খাই, বিলাই, ভিক্ষা দিই। সেই অন্নে পূজা করি, পার্ব্বণ করি, সংসার পালন করি, আবার সংসারের চারিধারে অন্ন-ক্ষেত্র করি।

হিন্দুসমাজ এইরূপ অন্নদানময়। হিন্দুসমাজভুক্ত কেহ অভুক্ত থাকে না। যে অতি দীন, সেও ভিক্ষালব্ধ অন্নে অনায়াসে কালাতিপাত করে এবং অন্য ভিখারীকেও ভিক্ষা দেয়। হিন্দুসমাজে এত প্রচুর অন্নদান আছে বলিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্বদা জীবিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনেকে এখানে অনায়াসে সংসারবিরাগী হইয়া ঈশ্বর-পরায়ণ সন্ন্যাসী হইয়া পড়ে। অন্নের জন্য কাহারও ভাবনা নাই। তবে কেন লোক ভগবানের কার্য্যে বিরত হইবে—ভক্তি অতৃপ্ত থাকিবে? যখন উদরান্নের ভাবনা নাই, ভগবান্ নিজেই অন্নদাতা, তখন কেন তাঁহার ধ্যানে চির-

দিন নিমগ্ন থাকি না,—এইরূপ ভাবিয়া সমাজের শত শত লোক সংসার-বিরাগী হইয়া ভগবানসেবায় কালাতিপাত করেন। বিরাগী হন কিসের বলে? হিন্দুসমাজের আতিথ্য ধর্ম্মবলে। সেইরূপ বিরাগী ঈশ্বর পরায়ণ সহস্র লোক হিন্দুসমাজকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের পুণ্যবল, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধর্ম্মাচার প্রভাবে হিন্দু-সমাজ ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মকে পালন করিতেছে, ধর্ম্ম হিন্দুসমাজকে পরিপুষ্ট করিতেছে। গৃহীর আতিথ্য ধর্ম্মের এজন্য এত গৌরব। হিন্দুসমাজের ধর্ম্মে অন্নপূর্ণা দেদীপ্য-মান বিরাজিতা থাকিয়া সংসার পালন করিতেছেন। হিন্দুসমাজ মহা তীর্থধাম হইয়াছে।

যে হৃদয় দয়াতে প্রবুদ্ধ হয়, সেই হৃদয়েই প্রেম সঞ্চারিত হয়। প্রেমের উদ্রেকেই ভক্তির আগমন। ভক্তির উন্মেষে ভগবানের উপাসনা। ভগবানের উপাসনায় সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তৃত হয়। এইজন্য হিন্দুসংসারে এত আতিথ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। এইজন্য ব্যাস শুক-দেবকে বলিয়াছিলেনঃ—

"সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানো-পার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে *।"

যখন জীবশরীরে কেবল পাপের প্রাদুর্ভাব, তখন তাহার জীবনে কলি-যুগের উদয়। সেই কলিযুগে দানধর্ম্মের প্রবৃত্তি রাখিলে ক্রমে তাহাতে দ্বাপরের সঞ্চার সম্ভাবনা। দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠানের সাধনায় যে চৈতন্যোদয় হয়, সেই চৈতন্যোদয় হইলে লোক ত্রেতাযুগে তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিবেন। জ্ঞানা-র্জ্জনের পর সত্যযুগে জীব তপস্যায় নিরত হইবে। মানবের জীবিত কালেই এই যুগধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটে। সংসারাশ্রমে দান ও যজ্ঞ, বাণপ্রস্থে তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন এবং সন্ন্যাসে তপস্যা। দান ও যজ্ঞই, জ্ঞানার্জ্জন এবং তপস্যার সোপান স্বরূপ। সেই দানধর্ম্ম ও যজ্ঞ এই জন্য গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সামান্য দান হইতে লোক ক্রমে ক্রমে বিশ্বপ্রেমে ও ঈশ্বর-ভক্তিতে উপনীত হইতে পারেন।

দানের ফল অপর্য্যাপ্ত। অন্নদানের ফল হাতে হাতে। দাতা গৃহীতা উভয়েই দানে তৃপ্ত। এই তৃপ্তি অন্নদানে যেমন অন্য দানে ততদূর নহে। ক্ষুধার্ত্তকে পরিতৃপ্ত হইতে দেখিলে কাহার না সুখ? যে দান করিতেছে তাহার সুখ, যে দান গ্রহণ করিতেছে তাহার সুখ ও তৃপ্তি, যে খাওয়াইতেছে তাহার সুখ, আর যে দেখি-তেছে তাহারও সুখ। শুদ্ধ তাহাই নহে, যে সেই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে বা করিয়াছে, তাহারও সুখ। আর কোন দানে ভিখারীকে তৃপ্ত করা যায় না। এত আমোদ, এত সুখ আছে বলিয়া হিন্দুসমাজে আমরা অন্নসত্র সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, হিন্দুসমাজের যেখানে সেখানে কেবল পান ভোজনের আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, সহস্র সহস্র কাঙ্গালী পাত পাতিয়া পর্য্যন্ত পরিমাণে আহার পান করিতেছে। আর সেই অন্নসত্রের ঘোর কলরব ও আমোদের উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। আমোদ সমস্ত পরিবারের; সমস্ত ক্ষুধার্ত্তের, সমস্ত পল্লির এবং সমস্ত

* মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব—২৩১ অধ্যায়।—

সমাজের। এই আমোদে অন্নপূর্ণার উদয়। সেখানে অন্নসত্র চলিতেছে, যেখানে কেবল পান, ভোজন ও দান, শত হস্তে পান ও দান, সেইখানেই যজ্ঞেশ্বরী অন্নপূর্ণা বিরাজিতা।

বঙ্গের প্রচুর অন্নক্ষেত্র দয়ার প্রবৃত্তি স্রোত গঙ্গার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। এই দয়াস্রোতে দেশশুদ্ধ পরিপুষ্ট ও রসার্দ্র হইয়া আছে। দরিদ্রের কুটীরেও শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতেছে। যে যেখানে আছে, সে সেইস্থান হইতে নিজ আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। কাহাকেও অন্নের জন্য দেশ দেশান্তরে যাইতে হয় না। এ দেশে প্রতি ব্যক্তি দয়া দাক্ষিণ্যের আধার। সংসারীকে দয়াশীল কাজে কাজে হইতে হয়। এত ভিখারী, এত অতিথি, এত পূজা পার্ব্বণ, এত অন্নসত্রের কারখানা, যে দয়ার ব্যবহার না করিয়া কেহ সমাজে থাকিতে পারে না। এখানে প্রতি গৃহ অতিথিশালা, প্রতি গৃহস্থাশ্রম দেবমন্দির। অন্নদান সবাই সবাইকে করিতেছে। হিন্দু রাজ-সংসারে শত শত সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেছে। কত মধ্যবিত্ত লোক কত নিরাশ্রয় কুটুম্ব সাক্ষাৎকে অনায়াসে প্রতিপালন করিতেছে। যাহা বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্য সর্ব্বত্রও সেইরূপ দয়ার ব্যবহার ন্যূনাধিকরূপ বর্ত্তমান। হিন্দুসমাজস্থ জনগণ দয়া ও প্রেমে সম্বদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত। এ সমাজে প্রতি ব্যক্তি দয়ার ব্যবহারে বিশ্বপ্রেম বিস্তারিত করিতেছে। দয়া ও প্রেমে সমাজ ও দেশশুদ্ধ প্লাবিত।

ইউরোপীয় খৃষ্টীয় সমাজে কি এইরূপে দয়া ধর্ম্মের অনুশীলন হয়? সেখানে ভিখারীরা অন্তরূপে প্রতিপালিত। হিন্দু সমাজে দাতা দরিদ্রকে সাক্ষাৎ দান করেন। ইউরোপে দানের সেরূপ প্রণালী নাই। সেখানে চার্চ্চে, অতিথিশালায় ও অন্যান্য দাতব্য মন্দির ভিন্ন দান মেলে না। সেখানে ভিখারীকে প্রতি গৃহে যাইবার যো নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিযা তাহাদিগকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয। সেখানে ধনিগণ কেবল বড় বড় দাতব্যাগার নির্ম্মাণের জন্য এবং অতিথি সৎকারের জন্য বড় বড় দান দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের অর্থে ও তাহার সুদে স্থানে স্থানে অতিথি সৎকার হয। দাতার সহিত দানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে প্রতি বাড়ীতে ভিক্ষা মেলে না, ভিক্ষুককে দেখিলে লোক বিরক্ত হয়। সুতরাং প্রতি লোকের দয়ানুশীলনের অবসর ঘটে না। সেখানে অন্ধ, কুব্জ, বিকলাঙ্গ জনগণের প্রতিপালন জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে তাহাদের দেখিবার যো নাই। দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া তাহারা এক স্থানে সমবেত হইয়াছে। সেইখানে না যাইলে তাহাদের গতি নাই। জনসমাজে সুতরাং দয়ার অনুশীলন অল্পই আছে। সমাজস্থ প্রতি লোকের প্রেম প্রসারিত হইতে পারে না। সে প্রেম কেবল পরিবার মধ্যেই আবদ্ধ। পরিবারও অতি সঙ্কীর্ণ। নিতান্ত শিশুগণ ও স্ত্রীমাত্র লইয়া সংসারধর্ম্ম। আত্মীয় ও কুটুম্ব সাক্ষাৎ তত পরভাগ্যোপজীবী হইতে পারে না। আবার ইউরোপীয় জাতিগণ অত্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যপ্রিয়। সেই জন্য অনেক সময় অনেক লোককে

পরিবার মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয়। পৈতৃক বিষয় বিভব ও ধন সম্পত্তি কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পাইয়া থাকে। এ জন্য পিতার অপরাপর সন্তানেরা এদেশীয় ত্যজ্য পুত্রের ন্যায় নিতান্ত নিজ ভাগ্যোপজীবী! তজ্জন্য তাহারা নিঃস্ব। নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। এমনও দেখা যায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপুল সম্পত্তির স্বামী হইয়া গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহার সহোদরকে উদরান্নের জন্য দেশে দেশে কিম্বা জাহাজে জাহাজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কোথায় তাহার গৃহ, কোথায় তাহার পুত্র পরিবার! যে দেশের সমাজ গঠন এই প্রকার, সে দেশে কি দয়া, স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? সংসার আশ্রম পাতিবার যে দেশে এত ব্যাঘাত, সে দেশে কি অতিথিসেবা হইতে পারে? আতিথ্যসেবা করিবে কে? সে দেশের দায়ভাগ দোষে ধন বিভাগও নিতান্ত দুষ্ট। তজ্জন্য দারিদ্র্য পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। কেহ অতুল সম্পত্তির অধিকারী, কেহ একেবারে নিঃস্ব। সেখানে কৃষিকার্য্যের তেমন সুবিধা নাই যে, লোক চাষবাস করিয়া খাইবে। সামান্য মজুরির উপর লোকের নির্ভর। মজুরি তত জুটে না। অনেক কষ্টে লোককে দেশের বাহিরে যাইতে হয়। তাই আমরা ইউরোপীয়গণকে হা অন্ন যো অন্ন করিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি। এই দেখুন, আনি বেসাণ্ট কলিকাতার টাউনহলে লণ্ডনের দারিদ্র্য কিরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেনঃ—

"লণ্ডন সহরে এক অংশে দেখিবে, ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি; তথাকার ধন, ঐশ্বর্য্য সুখ, বিলাস, বাহ্যাড়ম্বর দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। কিন্তু সেই লণ্ডন সহরের অপর অংশে দেখিবে, উলঙ্গ, অন্নকষ্ট, অনাহার, রোগ এবং অতি বীভৎস ব্যাপার। স্বার্থপরতা—পাশব স্বার্থপরতা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরহিতৈষিতা; পরদুঃখানুভূতি সভ্য ইউরোপীয় জগতে এ সব কিছুই দেখিতে পাই না।

এই পৌষ মাসের গভীর শীত; পথে বরফ পড়িতেছে; কিন্তু এই দিনে অতি প্রত্যূষে একবার লণ্ডন সহরের ডকে গিয়া দুঃখের দৃশ্যটা দেখিয়া আইস। রাত্রি পাঁচটা; শীতে পথে বাহির হইবার যো নাই। কিন্তু সেখানে কি দেখিবে? দেখিবে, সহস্র সহস্র লোক বস্ত্রহীন, এই দারুণ শীত বুক পাতিয়া লইয়া সামান্য কাজ পাইবার জন্য সেখানে যাইয়া জড় হইতেছে। শীতে ভ্রূক্ষেপ নাই; হয় তো কয়দিন একটুকরা রুটিও জুটে নাই; শীর্ণ দেহে ক্ষীণ প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে। আশা, আজ ডকে কাজ পাইবে; কাজ পাইলে দুপয়সা উপার্জ্জন হইবে! তাহাতে এক টুকরা রুটি কিনিয়া সাত দিনের সঞ্চিত উদরজ্বালা নিবৃত্তি করিবে! কিন্তু কাজ কি সকলে পায়? কাজের জন্য মারামারি, কাটাকাটি করিয়াও অনেকের কাজ জুটে না। প্রত্যহ প্রায় পঁচিশ সহস্র লোক কাজ না পাইয়া হতাশপ্রাণে এই ডক হইতে ফিরিয়া আইসে। পেটের দায়ে একমুষ্টি অন্নের জন্য বিলাতী মহিলাগণ কেমন করিয়া আত্মবিক্রয় করে, সতীত্ব জলাঞ্জলি দেয়! পাশ্চাত্য সভ্যতার

এই দুঃখের কাহিনী শ্রীমতী আনি-বেসাণ্ট তাঁহার বাক্‌পটুতায় অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।”

দারিদ্র্যের এ ভয়ঙ্কর ছবি এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশের সকল দায়াদ সমবিত্তভোগী। যেখানে জ্যেষ্ঠাধিকার আবশ্যক, সেখানে তাহা ছিল। জ্যেষ্ঠাধিকার ভারতের রাজনিয়ম মাত্র। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন তাহা কেবল রাজবংশে প্রচলিত ছিল। এখন আর সে নিয়ম দেখা যায় না। এখন সকলেই সমান বিত্তভোগী। ভারতের সকলেই স্বদেশীয় ধনধান্যের অধিকারী। ধনধান্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; সুতরাং এদেশের লোককে অন্য কোথায় যাইতে হয় না। কৃষিজীবী দেশে ব্যবসা চলিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। ভারতীয় হিন্দুরা স্ব স্ব দেশে আবদ্ধ। স্ব স্ব দেশ মধ্যেই অপর্য্যাপ্ত অন্ন সংগ্রহ হইয়া থাকে। স্ব স্ব দেশ মধ্যে আদান প্রদানে অন্নের বিভাগ হইয়া সকলেরই সংকুলান হয়। সামাজিক নিয়মে তাহা সংকুলান করিয়া দেয়। সেইরূপ সংকুলান করিবার জন্য এদেশে মুষ্টি-ভিক্ষার প্রথা প্রচলিত। এদেশে অতিথি-সৎকারের তাই এত গৌরব, আদান প্রদানের এত প্রচলন, দয়া ধর্ম্মের এত আদর। প্রতি লোক দয়া ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া, দয়া ও প্রেম প্রসারিত করিয়া সুখী হয়। কৃষিজীবী হিন্দু ভারত-বাসিগণ পরিবার মণ্ডলী মধ্যে সুখে বাস করে। সেই পরিবার মণ্ডলী মধ্যে সকল ভক্তিভাজন, স্নেহাস্পদ ও প্রণয়-পাত্র একত্র মিলিত। সেই পরিবার মণ্ডলী কেমন প্রেমের লীলাক্ষেত্র, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পুত্রকন্যা উৎপাদন করিয়া এখানে সংসার আশ্রম না করিলে মহাপাতক হয়। বিদেশীয় ম্লেচ্ছ ব্যবহার ও নির্দ্দয় নিয়মাবলি পাছে এই আশ্রমের সুখ ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়, তাই ভারতে সিন্ধুপারে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যে সংসারে দয়া নাই, প্রেম নাই, স্নেহ মমতা ও ভক্তি নাই, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা নাই, সে সংসারে কখন দেবভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। দেবভাবের স্ফূর্ত্তিতে দেবতার উদয়। দেবতারা উদয় হন প্রেমের রাজ্যে ও দয়ার সংসারে। হিন্দু সংসার দেবসেবা ক্ষেত্র, যাগযজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। হিন্দু সংসারে মানবের যত দেবভাবের উৎকর্ষ সাধন হয় বলিয়া দেবতারা সে সংসারে প্রসন্ন হইয়া লীলা করেন। হিন্দুর দেব সংসার নিত্য যজ্ঞময়। যখন দয়া ও প্রেম উছলিয়া উঠে, তখন হিন্দু আবার বিরাট যজ্ঞে অন্নদান করেন। সেই বিরাট যজ্ঞই অন্নপূর্ণা ও শিবের যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে যত দেবভাবের বিরাট বিকাশ হয়। সেই জন্য শিব ও সতী বিনা হিন্দুর যজ্ঞ নাই। এই যজ্ঞে সমস্ত দেবতারা আহূত ও সমাদৃত হন। শিব-রহিত যজ্ঞ অসম্ভব হাস্যকর ও অশিবময় ব্যাপার। সেই উপহাস্য ব্যাপার পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ; তাহাই হিন্দু সংসারের বিপর্য্যস্ত স্থূলভাব। দক্ষযজ্ঞে দেবতারা আসিয়া দেখিলেন, সতী—দয়া ও প্রীতি—দক্ষ পীড়নে দেহত্যাগিনী। দেবতারা অমনি পলাইয়া গেলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হইল। দক্ষের এক অসম্ভব ছাগ-মস্তক হইল। যিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি বুঝিতে

পারেন, তিনিই দক্ষযজ্ঞের রহস্য বুঝিতে পারেন। তিনি আরও বুঝিতে পারেন, যে যে স্থানে অন্নপূর্ণা সতীদেহের অংশ-পাত হইয়াছে, সেই সেই স্থান অন্নপূর্ণা ও মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ভূমি এবং অন্নক্ষেত্রময় তীর্থধাম হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ স্থান কাশী। হিন্দুর মনে সেই স্থানই বারাণসী, যে স্থানে বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার বিকাশ *। যে বিশ্বপ্রেমময়ী বারাণসী ভক্তের মানসপটে অঙ্কিত, কাশী তাহার স্থূল অনুরূপ স্থান। মানসিক বারাণসীকে মূর্ত্তিমতী করিবার জন্য হিন্দু কাশীপুরী রচনা করিয়াছেন। তথায় অন্নপূর্ণা বিরাজিতা—পার্শ্বে বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর—আর এই বিশ্বের অনুরূপ অন্নক্ষেত্র কাশী। কাশীতে কেহ অভুক্ত থাকে না। কাশী কোথায় স্থাপিত? যথায় গঙ্গাধরের প্রতি গঙ্গা ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন। পতিতপাবনী সংসার-তারিণী গঙ্গা জগদুদ্ধারের জন্য যখন সাগরাভিমুখে আসিতেছিলেন। তখন গঙ্গা একবার যেস্থানে ফিরিয়া নিজ পতির পানে চাহিলেন, যেস্থানে গঙ্গার হৃদয়ে শিবশঙ্করের প্রেম একবার জাগিয়া উঠাতে উত্তরবাহিনী হইয়া গঙ্গা কৈলাসাভিমুখে স্রোত ফিরাইলেন, যেস্থানে এই দেবপ্রেমের বিকাশ হইল, সেইস্থান পবিত্র হইয়া গেল। কাশী সেই প্রেমে পবিত্র। যে বিশ্বপ্রেম গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত, সেই বিশ্বপ্রেমে গঙ্গা যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশ ফল মূল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে—সে দেশ অন্নময় হইয়াছে সে দেশ উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। এই বিশ্বপ্রেমে প্রবাহিত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে গঙ্গা পবিত্র—গঙ্গা দেবতা। গঙ্গা মাতার অধিক স্নেহে শত শত দেশকে অন্নদান করিতেছেন। গঙ্গাস্নানকালে হিন্দু তাই মাতর্গঙ্গে বলিয়া গঙ্গাপ্রেমে নিমগ্ন ও পবিত্র হইয়া যান। অতি ভক্তিসহকারে হিন্দু গঙ্গাকে পূজা করেন। গঙ্গা যে স্থানে শিবপ্রেমে উচ্ছ্বসিতা হইয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবেষ্টিত দেশ শিবময়—আর তিনি বিশ্বপ্রেমে যেরূপ অন্নময়ী, গঙ্গা সেই অন্নময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে তথায় উদিতা। এই শিবপুরীতে গঙ্গা গঙ্গাধরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। গঙ্গার দেবপ্রেমে পরিপূরিতা বারাণসী মোক্ষদাপুরী,—মহাশ্মশান—রুদ্রাবাস—তীর্থধাম। মৃত্যুঞ্জয়ের শিরো-দেশে যে মুক্তিবারি রহিয়াছে, তাহাই জ্ঞানবাপীতে নির্ঝরিত হইয়া মনিকর্ণিকায় আসিয়া গঙ্গা স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গা অন্নপূর্ণার বিস্তীর্ণ মূর্ত্তি। কাশী ভক্তিময় তীর্থধাম—স্থূলরূপা ভক্তি।

আর অন্নদাতা শতক্রতু দেবপতি ইন্দ্র। নিদাঘের আতপতাপে পৃথিবীতল যখন শুকাইয়া আইসে, যখন তৃণ শস্য বারি বিনা নীরস ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, যখন তৃষ্ণার্ত্ত উদ্ভিদ-জগৎ মৃতপ্রায় হইয়া উঠে, যখন ভারতের কৃষিবল জলের জন্য কেবল আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত দেবেন্দ্র মেঘমালা সাজাইয়া বারিবর্ষণ করিতে থাকেন। প্রতি বৃষ্টিধারা তখন অন্নরূপে ভূতলে পতিত হইতে থাকে। তখন প্রকৃতি অন্নপূর্ণা রূপে পৃথিবীকে রক্ষা করে। ভারতময়

* বারাণসী—যে গঙ্গার উপর আছে ও পুনর্জন্ম বারণ করে। মোক্ষদাপুরী বিশেষ। শিবপুরী।

পুরুষ তখন অন্নভিখারী,—প্রকৃতি দেবী অন্নহরণ করিয়াই যেন পুরুষের সহিত প্রেমলীলায় রত হইয়াছেন। বারিবর্ষণের সুধা ধারায় জগতের ক্ষুধা নিবারণ করিতেছেন। এই মূর্ত্তিই প্রকৃতির অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি।

অন্নপূর্ণা—প্রেমময়ের সহিত প্রেমময়ীর লীলা—হরণ ও পূরণের লীলা। জগন্ময়—ব্রহ্মাণ্ডময় এই হরণ ও পূরণের লীলা চলিতেছে। বিশ্বে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। লয়—হরণ, স্থিতি—পূরণ এবং সৃষ্টি সেই পূরণ সাধন করে। সৃষ্টি ব্যাপারে একবার হরণ হইতেছে, আবার তাহার পূরণ হইতেছে। জরায়ুজ অণ্ডজঃ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ জীবদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের পর দেহ-পালন, দেহ-পালনের পর আবার মৃত্যু ও নবকলেবর। জড়জগৎ চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীরকে পালন কবিতেছে, স্থূল শরীর ধ্বংস হইয়া আবার জড়ে আসিতেছে। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজগৎ পরস্পরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। এজগৎ পরস্পর খাদ্য খাদকের সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের লয়ে অন্যের পালন ও সৃষ্টি। শৈশবে সৃষ্টি, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে পূরণ এবং বার্দ্ধক্যে লয়ের আধিক্য। দেহ-পালনেও প্রতিক্ষণে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। যাহা মানব দেহের নিয়ম, তাহা সর্ব্ব জীবের নিয়ম। সর্ব্বসংসারে প্রকৃতি সতত নবীন বেশে দেখা দিতেছেন। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম ও মঙ্গল। এই হরণ ও পূরণই সংসারের শিবময় ব্যাপার। হরণ না থাকিলে সংসারের পূরণ, ব্রহ্মার সৃষ্টি ও জগতের মঙ্গল-বিধান হইত না। কাল নিয়তই হরণ করিতেছে, এজন্য মহাদেবের এক নাম কাল। অতএব তাঁহার নিত্য-ধর্ম্ম, হরণ তাঁহার নিত্য কার্য্য। এজন্য কাল শ্মশানবাসী ভিখারী। যিনি সংসার-বিষ হরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়, সেই বিষপানে তিনি নীলকণ্ঠ, সেই বিষময় সর্প তাঁহার শিরোভূষণ। চন্দ্রচূড় জ্ঞান-চক্ষে ত্রিসংসার ও ত্রিকালজ্ঞ, যে জ্ঞান জীবের অতীত, সেই জ্ঞানে তিনি চন্দ্রচূড়। শিবনেত্রে তিনি সংসার রক্ষা এবং ভক্তের মঙ্গল-বিধান করেন, আর তৃতীয় নয়নে বিশ্বনাথ ভক্তি ও শক্তিময়ী প্রকৃতি সুন্দরী ভগবতীর পানে চাহিয়া আছেন। * যিনি ধ্বংসময়, সেই ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্ম তাঁহার রূপ। কালের আদি অন্ত নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, এজন্য শিব স্বয়ম্ভু। যিনি সকল বলের সংহারী, ত্রিশূল তাঁহার মহাদণ্ড। তাঁহার শিঙ্গা মহাকালের ডাক জগন্ময় ঘোষণা করে। শিবদাতা, আনন্দময় আবার সেই শিঙ্গা ও ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করেন, তাঁহার সর্পও শিরে সেই বাদ্যে নৃত্য করে। সংসারে তিনি এইরূপে বর্ত্তমান। যদি কালকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে হয়, তবে কেবল হিন্দুই তাহাকে প্রকৃত মূর্ত্তিতে জাজ্বল্যমান দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, পঞ্চমহাভূত তাঁহার পঞ্চমুখ; এই পঞ্চভূত লইয়া যাঁহার লীলা

* কোন কোন মতে মহাদেবের ত্রিনেত্র জ্ঞানদৃষ্টির ত্রিপথ—শব্দ, লিঙ্গ এবং অক্ষ। বেদাদি শব্দ (সূর্য্য), ন্যায়দর্শনমতে অনুমানই লিঙ্গ-পরামর্শ (চন্দ্র), এবং ইন্দ্রিয় গোচর জ্ঞান, অক্ষ (অগ্নি)। শাণ্ডিল্য সূত্র ৯৯। ত্র্যম্বকের অর্থ ত্রি, তিন বেদ বা অ, উ, ম এবং অম্বক চক্ষু।

ও নৃত্য তিনি ভূতনাথ *। এই পঞ্চীকরণ দেবতার নাম হর। প্রকৃতি তাঁহার লীলাক্ষেত্র। এই ভূতনাথের লীলায় প্রকৃতি নিজগুণে—ব্রহ্মার সৃষ্টি গুণে নব নব সাজে নিত্য সাজিতেছেন, নিত্য নব সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রকৃতি সতী উমারূপে নব সৌন্দর্য্যে নবীভূত হইয়া উদয় হইতেছেন। সেই সর্ব্বসুন্দরী উমা হরমনোমোহিনী। ভূতনাথ প্রকৃতি—প্রেমে বিভোর। তিনি যেমন প্রকৃতি লইয়া লীলা করিতেছেন, প্রকৃতি আবার তেমনি তাঁহাকে লইয়া লীলা করিতেছেন। স্থূল প্রকৃতি পুরুষের এই লীলাময় শাস্ত্রই পুরাণ। হিন্দুকবির কল্পনা এই লীলাময় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। সাঙ্খ্য, যে জ্ঞানতত্ব আহরণ করিয়াছে, ভক্তি তাহা লইয়া শতমূর্ত্তি শোভায় হিন্দু সংসারকে শোভিত করিয়াছে।

ভক্তি একদা প্রকৃতি সুন্দরী প্রেমময়ীর লীলা রচনা করিলেন। পার্ব্বতীকে লইয়া হর সংসারী; হরকে লইয়া পার্ব্বতী সংসারিণী। দুইজনে এত প্রেম যে, লীলায় মাখামাখি। লীলায় মাখামাখি যেমন কৃষ্ণ রাধা। কৃষ্ণরাধার বিরহ কাল্পনিক মাত্র; তিলেকের জন্য বিরহ—কবির বিরহ কল্পনা। কবি বিরহ কল্পনা করেন, কেবল প্রেমকে বাড়াইবার জন্য; প্রেমকে নূতন করিয়া নবোজ্জ্বল বেশে দেখাইবার জন্য বিরহের কল্পনা না করিলে প্রেম-লীলার সৌন্দর্য্য ফুটে না। রাধার সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ বিরহে। সেই সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য ভক্ত-কবির দেববিরহকল্পনা। নহিলে, বাস্তবিক দেববিরহ ঘটিতে পারে না। রাধা নিত্য হরি-ময়ী, হরি নিত্য-রাধাময়—তাই মথুরা ও দ্বারকা-লীলা সম্ভব *। রাধার শক্তি সঞ্চারে কৃষ্ণ লীলাময়। সতী নিত্য শিবময়ী। দুর্গার শিরে সদাশিব বর্ত্তমান। একদা ভক্তকবি শিবদুর্গার বিরহ কল্পনা করিলেন। সেই বিরহে শিব দুর্গাহারা। শিব দুর্গা হারা বলিয়া অন্নহারা। কারণ, মহাপ্রকৃতি দেবীই জগতের অন্ন। ভিখারী অন্নহারা হইয়া পাগল—ঘুরিলেন সর্ব্বদেশে, সর্ব্বগৃহে। অন্নহারা শিব অন্নপূর্ণার জন্য যখন একান্ত লালায়িত, পথশ্রান্ত, ক্লান্ত, তখন আর দয়াবতী স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজ দয়াগুণে শিবকে দেখা দিলেন। দেখা দিলেন কিরূপে?—অন্নপূর্ণা রূপে। দেখাইলেন, অন্নপূর্ণা যাহার ঘরে, সেই শিব কিসের জন্য ভিখারী? বাস্তবিক অভাব কি কিছু আছে? বাস্তবিক সংহার ও মৃত্যু বলিয়া কি কিছু আছে? একের মৃত্যু, অপরের জন্ম, একের বিনাশ, অপরের সৃষ্টি, কেবল রূপ পরিবর্ত্তন মাত্র। এই রূপ-পরিবর্ত্তনের নাম মৃত্যু ও জন্ম। প্রকৃতি নিত্য পরিবর্ত্তনময়ী। প্রকৃতি নিত্য অন্নপূর্ণা রূপে কালকে নিত্য অন্ন যোগাইতেছেন।

কবিহৃদয়ের এই বিরাট-বিকাশ। ভক্তি, কবিহৃদয়ে মিশিয়া যে সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, অন্নপূর্ণার উপন্যাস সেই সুন্দর পৌরাণিক কল্পনা। এই

* শৈবদর্শন মতে ঈশ্বরের কৃত্য পঞ্চবিধ।—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং অনুগ্রহ-করণ। এইরূপেই তিনি সর্ব্বকালেই উদিত ও স্বপ্রকাশ হইয়া আছেন।

* ভক্ত গোবিন্দ অধিকারী নিজ কৃষ্ণযাত্রার পালায় মাথুর লীলা শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন করিয়া গিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবির একেবারে মিথ্যা কল্পনা নহে। বাস্তবিক ব্যাপারের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে গেলে যে রচনার আবশ্যকতা, তাহাই কল্পনার সৃষ্টি। বিশ্বলীলা অসত্য ব্যাপার নহে। তাহা ভগবানের নিত্যলীলা। সেই লীলার, কবিত্বময় স্থূল রূপরচনাই পৌরাণিক কল্পনা। প্রতি দেবরূপ, শক্তিলীলার বিকাশ মাত্র। অনন্ত-দেবের আংশিক বিকাশ। তেত্রিশ কোটি দেবতায় অনন্ত দেবের লীলা বিকাশ শক্তি ও ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কল্পনার সহিত মিশিয়া সেই লীলাকে নানা অলঙ্কারে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখায়। ভক্তি, কখন অসত্য ব্যাপারে মোহিতা নহেন। প্রকৃত জ্ঞান, ভক্তিরসে পরিপুষ্ট হইয়া কবি-হৃদয়ে কুসুমিত হয়। ভক্তি, কল্পনাসাহায্যে সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখেন—এ বিশ্বপ্রভৃতিকে বাস্তবিক অন্নময়ী রূপে দেখেন। দেখেন, প্রকৃতি-দেবী অন্নরূপা, আর পরম পুরুষ তাঁহার ভোক্তা। প্রকৃতি মায়া; মহেশ্বর মায়াময় পুরুষ *।

এই বিশ্ব, প্রকৃতি পুরুষের প্রেম-লীলা। সেই প্রেমলীলা দেখিয়া জীব মোহিত। জীব সতত সেই প্রেম ও কৃপাপ্রার্থী। তাই শঙ্করাচার্য্য স্তুতি করিলেন।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষান্দেহি নমোঽস্তুতে।

* মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

সুরমা।

বিধু বিলাসিতা সিতা বাসন্তী যামিনী।
রজত পারদ নিভ ধবলা মেদিনী॥
প্রাসাদ মন্দির শির সরসীর নীর।
জলে ছটা সকলে সে শশির হাসির॥
নবীন বিপীন মন্দ আন্দোলিত বায়।
নিদ্রা ভুলে পুলকে কোকিল কুহু গায়॥
বিষয় কলহ দিবা কোলাহল লীন।
সুখদা শান্তির কোলে সংসার আসীন॥
হিম শৈলে শির দিয়া নিতম্ব সাগরে।
তীর উপাধানমাঝে খাদ শয্যাপরে॥
অঙ্গ মেলি গঙ্গা যেন প্রশান্ত নিদ্রায়।
তরঙ্গ উল্লাস শ্বাস সঞ্চরণ প্রায়॥
কূলে তার শোভে এক সুন্দর ভবন।
স্তম্ভরাশি সুচারু বিচিত্র বাতায়ন॥
নিশীথে নিদ্রিত সব পুরবাসি গণে।
একাকিনী বালা এক বসি বাতায়নে॥
কি চারু বদন রুচি গবাক্ষে বিকাসি।
সপুলকে কপোল পরশে হের শশি॥
ভবনের তলে বালা চাহি ক্ষীণ স্বরে।
কহে কথা ফুল মুখে মধু যথা ঝরে॥
তোমার সোনার কায় ক্রমে হলো কালি।
অভাগিনী আমি মাতা পিতা দেয় গালি॥
প্রহরী সমান সবে ঘোরে পায় পায়।
বারেক দেখিতে নাথ দেয় না তোমায়॥
পিতা কাটিবারে চায় মাতা বিষ দিতে।
কিসে এত দোষী আমি কি দোষ দেখিতে॥
কত শত জনে দেখি দোষ নাই তায়।
কেবল কি পাপ নাথ দেখিতে তোমায়॥

দেখিতে যা চাই যদি দেখিতে বারণ।
বিধাতা দিলেন তবে কেন বা নয়ন ॥
বিশেষ না জানি কিন্তু হেন লয় মন।
মানোমত ভালবাসে সবে প্রিয় জন ॥
মাতা ভালবাসে পিতা ভগ্নী ভগ্নীপতি।
আমি ভালবাসি তায় দোষী হই অতি ॥
ভালবেসে সুখে যারা সময় কাটায়।
আমি ভালবাসি তারা বাদি হয় তায় ॥
মন নিবারিতে তারা বলে কি কারণে।
সেই ভাল নয় কি যা ভাল লাগে মনে ॥
ভুজঙ্গ নিকটে কেহ না চায় যাইতে।
কে না চায় শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে ॥
কোকিলের ভাল স্বর ভাল লাগে কানে।
বজ্র ডাক ভাল নয় ভয় হয় প্রাণে ॥
তবে সবে বলে কেন ভুলিতে তোমায়।
চেষ্টা করে ভাবি কি যে ভুলিব চেষ্টায় ॥
কে করেছে অনুরোধ ভালবাসিবারে।
অনুরোধ তবে কেন করে ভুলিবারে ॥
আঁখি কি নিমেষ ছাড়ে লোকের কথায়।
কেহ যাহা না শিখালে কে ভুলাবে তায় ॥
নিশ্বাস সঞ্চারে প্রাণে আপনি যেমন।
প্রেম কি প্রাণের নয় স্বভাব তেমন ॥
শ্বাস রোধ হয়ে যদি প্রাণ মারা যায়।
প্রেম রোধে বাঁচিবে কি সম্ভাবনা তায় ॥
কতই যাতনা নাথ জানাব তোমায়।
আঘাত হয়েছে মম আভরণ প্রায় ॥
দৈবে শ্বাস যদি ছাড়ি তোমায় ভাবিতে।
ক্রটি না করেন মাতা প্রহার করিতে ॥
অন্য মনে চলে যেতে পড়ি ধরাতলে।
ভগ্নী ক্রোধে অগ্নিসম মর মর বলে ॥
যেমন ছিলাম পূর্ব্বে নয়ন পুত্তলি।
তেমনি হয়েছি নাথ নয়নের ধূলি ॥
বিষ দিবে কাটিবে না ভয় করি তার।
কিন্তু নাথ এখানে এসোনা তুমি আর ॥
কে কবে দেখিবে কোথা বিপদ ঘটিবে।
আমা হতে প্রতিকার কিছু না হইবে ॥
আমি যত কান্দিব হাসিবে তারা তায়।
এসোনা এখানে আর ধরি তব পায় ॥
আর কি উপায় আছে কি করিব হায়।
বিরলে বসিয়া ভেবে দেখিব তোমায় ॥
না দেখিয়া মরি যদি ক্ষতি নাহি তায়।
আমার শপথ নাথ এসোনা হেথায় ॥
যাবৎ এ দেহে প্রাণ রহিবে আমার।
দূরে বা নিকটে আমি কিঙ্করী তোমার ॥
যে ভাবে যেখানে হয় যে দিন মরিতে।
মরিব তোমার ছবি দেখিতে দেখিতে ॥
ভাগ্যবতী, যেই হয় পুণ্যের আধার।
সে বিনা কে হতে পারে সঙ্গিনী তোমার ॥
আমি অভাগিনী বৃথা আশা করি তায়।
বিবাহ কালে কি নাথ ভাবিবে আমায় ॥
কম্পিত শোকের স্বরে বিলীন বচন।
প্রাণে ক্ষোভ দিয়া মগ্ন বীণার বাদন ॥
দর দর নয়ন কপোল পরে ঝরে।
ঢল ঢল জলে তথা শশি কর ভরে ॥
আলয়ের তল হতে প্রাণ প্রিয় তার।
উত্তর করিলা প্রাণ প্রতিমা আমার ॥
এত জ্বালা পেলে দয়া ক'রে অভাগায়।
শমন স্মরণ, তবু ক'র না আমায় ॥
ও নীল নলীন নেত্রে ঝরে অশ্রুধার।
হা ধাতা সংসার কেন না হয় সংহার ॥
কোন দোষ নাই তব পিতার মাতার।
কে না শত্রু প্রেয়সী বিধাতা শত্রু যার ॥
এত দিন ছিলে তুমি নয়ন পুত্তলি।
হয়েছ আমার তরে নয়নের ধূলি ॥
ভাগ্যবলে হলে ধনী প্রণয়ী তোমার।
আগে আহ্লাদিনী হতে পিতার মাতার ॥
ধন জন হীন আমি কেমনে তোমায়।
কোন প্রাণে বল তারা সঁপিবে আমায় ॥
পিতা মাতা কোন কালে শত্রু হয় কার।
জে'ন স্থির আমি শত্রু প্রেয়সী তোমার ॥

শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে সবে চায়।
ভুজঙ্গ ধরিতে মানা কে না করে কায়॥
দিবা নিশি ভাবি আমি কম্পিত অন্তরে।
কি জানি কি করে কবে কুলমান ভরে॥
অতএব রেখ প্রিয়ে মিনতি আমার।
নিশায় গবাক্ষে তুমি এসোনা কো আর॥
প্রতিদিন আমি হেথা এমনি আসিব।
থাক বা না থাক আমি দেখিতে পাইব॥
আমার কি ভয় ধনি! কথা হাসিবার।
শমনে না ডরে সে ডরিবে কারে আর॥
অসি যদি হানে কণ্ঠে আত্মীয় তোমার।
পুলকে লোটাব শিব চরণে তাহার॥
হায়রে প্রাণের কথা কিসে বুঝাইব।
মাংসময়ী নারী ছি ছি বিবাহ করিব॥
প্রেম ব্রত ধারী, নারী কি কাজ আমার।
উপাসক সুরমা সুষমা প্রতিমার॥
লোকালয় পরিহরি যাব সেইখানে।
নাই বিঘ্ন অপ্রেমির কলহ যেখানে॥
বিজন বিপিনে বসি বীণা তার ভরে।
গাইব সুরমা গীত সুললিত স্বরে॥
প্রতিধ্বনি সে তান করিবে তরঙ্গিত।
সুরমা সুরমা রমা কাননে নাদিত॥
সুরমা সুরমা রমা সুর ক্রমে ক্ষীণ।
ধীরে ধীরে ভূধরে বিরামে হবে লীন॥
শাখী পরে পাখী বসে শুনিয়া শিখিবে।
মৃত্যুকালে ভুলিলে স্মরিয়া তারা দিবে॥
যাপিব জীবন এ সুখের তপস্যায়।
সুরালয়ে যাইয়া দেখিব সুরমায়॥
ব্রহ্মচারী বিনোদ প্রেমের ব্রতধারী।
বিবাহ করিবে সে কি মাংসময়ী নারী॥
শত্রুতায় কি হইবে তোমার পিতার।
হৃদে মম সুরমা তিনি কি পিতা তার॥
অনুক্ষণ মনে তার আস্বাদন পায়।
আঁখি চায় তাই প্রিয়া দেখাই তোমায়॥
নিরাকারে নিরাকারে সদাই বিহার।
মনোরমা সাকার প্রতিমা তুমি তার॥
অনিলে অনিলে মিলে কিরণে কিরণে।
কে নিবারে কি ভাব বুঝিবে কোন জনে॥
সৌরভ পরশি নানা তোষে কথা মন।
কান্ত কথা পানে তুষ্ট কামিনী তেমন॥
বিলোল লোচন আর ঝরে না ধারায়।
দিবার সন্তাপ সব জুড়াল নিশায়॥
উত্তরিল প্রিয় হে প্রণয় প্রাণ ধন।
তুমি বনে গেলে যে সংসার হবে বন॥
হৃদয়ের কথা না হইতে সমাধান।
গরজিল স্বর এক অশনি সমান॥
কলঙ্কিণী তোর কি হৃদয়ে নাই ভয়।
জন্মমাত্র কেন না গেলিরে যমালয়॥
দিন রেতে চোখে কিরে ঘুম নাই তোর।
কোথা সে পাষণ্ড বেটা যাদুকর চোর॥
এখনি কাটিব মাথা বলে কোপে জ্বলে।
কর প্রহারিল কন্যা-কপোলকমলে॥
কেশে আকর্ষিয়ে বলে লয়ে চলে যায়।
পদে পদে বিজড়িত অঞ্চল জড়ায়॥
পদে পদে প্রহারে তথাপি বলে তায়।
শপথ আমার নাথ থেকোনা হেথায়॥
পদে পদে হেন মতে বলিয়া চলিল।
ক্ষীণ স্বর ক্ষীণ তর বিলীন হইল॥
নিকেতন তলে তার ছিল প্রিয়জন।
ছিল কি চেতন আর তার সে জীবন॥
হৃদি ভেদি দীর্ঘ শ্বাস বহিল যখন।
হৃদি কম্পে জানিল সে জীবিত তখন॥
ভাবিয়া চেষ্টায় জানে করে অন্বেষণ।
কি দায় ঘটালে ভেঙ্গে প্রণয় স্বপন॥
ঘুরে ঘুরে উর্দ্ধে ধরা উঠিল যেমন।
ধূলি হয়ে উড়ে কেন গেল না তখন॥
স্মৃতি সাপে হৃদে কি কাটিত তবে আর।
প্রহার সহিল অঙ্গে সুরমা আমার॥
কে জানো কে আছো হেথা বলরে নিশ্চয়।
রয় কি নরের চিত্ত দেহ হলে লয়॥

মরি তবে হৃদে ধ্যানে ধরি সুরমায়।
পারি না সে সুখ স্মৃতি লোপের শঙ্কায়॥
প্রণয়ীর হৃদে হেন শোকের বিকার।
কার সাধ্য বাক্যে দিবে পরিচয় তার॥
জুড়াত শুনিতে পেলে কথা সুরমার।
হা শশি তুমিই হলে রাহুর আহার॥

হা প্রেম অভাগ্য চির সঙ্গী কি তোমার।
যথা তুমি তথা দেখি অত্যাচার তার॥
প্রেমের বিধান সদা মনে এই জাগে।
ভালবাসা প্রিয় ফুল কীটে কাটে আগে॥
নিশি শশি ম্লান এবে চলে অস্তাচলে।
ম্লানাননে বিরহ বিধুর বাসে চলে॥

ক্রমশঃ—

পেঁড়োর মন্দির।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেলে, সম্রাট্‌সেনা পাণ্ডুয়াভিমুখে যাত্রা করিল। পাণ্ডুয়ায় তাহারা উপস্থিত হইলে পর তথায় হিন্দুদিগের সহিত এক দিবস যুদ্ধ করিয়াই তাহাদিগের বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ—হইল; হিন্দুরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা কাপুরুষ, এই ধারণা তাহাদের হৃদয় হইতে দূর হইয়া গেল। মুসলমানেরা দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বিনা যুদ্ধেই আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট্ বিদ্রোহী পাণ্ডুরাজার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতেছেন শুনিয়া সকলেই তটস্থ, সুতরাং তাহাদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে কে? হিন্দুরা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের বিপক্ষতা করিলে কেবল যে পরাজিত হইতে হইবে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জোরজুলুমে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। বিধর্ম্মী হওয়া অপেক্ষা পরাজয় শ্রেয়, ইহা ভাবিয়া হিন্দুরা তাহাদিগের শাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিল। সকলকেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে দেখিয়া মুসলমানেরা গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাঙ্গালীদিগের নিকট যে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে, তাহা তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পথে সকলেই তাহাদিগকে পাণ্ডুরাজার দৈববল এবং পাণ্ডুয়ার অজেয় দুর্গের বিষয়ে বলিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পথ অতিবাহিত করিয়া তাহারা একদিন সন্ধ্যার সময়ে পাণ্ডুয়ার সীমানায় উপস্থিত হইল এবং সে রাত্রির জন্য সেখানেই তাম্বু ফেলিয়া রহিল।

পূর্ণিমা রাত্রি; বৈশাখের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাসুধায় ধরাতল আপ্লাবিত। কিন্তু সেদিন চন্দ্রগ্রহণ; দেখিতে দেখিতে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল—তাহাতে পূর্ণগ্রাস। অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানেরা কুসংস্কার বশতঃ ভীত হইয়া উঠিল; তাহারা ভাবিল যে সয়তানে চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, তাই তাহারা সয়তানকে তাড়াইবার জন্য চন্দ্রের দিকে অস্ত্র প্রদর্শন করিয়া তাহাকে

ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহারা শীঘ্রই এক ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল এবং এই শঙ্কাবশতঃ অনেকেই স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইল। সমগ্র সেনার ভিতরে যাহারা তত বেশী কুসংস্কারাপন্ন ছিল না, তাহারাই অপরাপর সকলকে সাহস প্রদান করিতে লাগিল এবং ক্রমে সকলেই "মহম্মদ আমাদিগকে রক্ষা করুন" বলিতে বলিতে প্রশান্তভাব ধারণ করিল।

চন্দ্রগ্রহণও ক্রমে শেষ হইয়া আসিল; ক্রমে আবার পূর্ব্ববৎ চন্দ্র তাহার শীতল সুধা বর্ষণ করিয়া ধরণীকে শান্তিদান করিতে লাগিল। এক প্রহরী আসিয়া সেনাপতি সুফিউদ্দীনকে সংবাদ দিল যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাণ্ডুয়ার রাজসভা হইতে এক দূত আসিয়াছেন।

সুফিউদ্দিন 'কাফের' হিন্দুদিগের উপর বদ্ধবৈর হইলেও সভ্যতা ও ভব্যতায় সাধারণ মুসলমানদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন। পরাজিত হিন্দুরাজাদিগেরও প্রতি ঘৃণা প্রকাশ বা অত্যাচার করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। তিনি দূত আসিয়াছে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ এক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন এবং সেই সভায় দূতরাজ বলভদ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গ যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত আনীত হইলেন। বলভদ্র পাণ্ডুরাজার প্রধান মন্ত্রী। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীবর্গ মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুফিউদ্দিনের নিকটে আসিয়া বলভদ্র মস্তক অবনত না করিয়াই তাঁহাকে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "যবন সেনাপতি! আমার পরাক্রান্ত প্রভু পাণ্ডুরাজা আপনার বীরত্বের যথেষ্ট খ্যাতি শুনিয়াছেন। কিন্তু আপনাকে তিনি বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক বলিয়াও জানেন বলিয়াই আমার দ্বারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যখন তিনি আপনার কোন অপকার করেন নাই, তখন আপনি তাঁহার অনুমতি বিনা উভয় রাজ্যের সাধারণ সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন কেন? আপনি যদি বন্ধুভাবে আসিয়া থাকেন, তবে আপনার সঙ্গে এত সৈন্য কেন? তাহা যদি না হয়, তবে কি আপনি জেতৃত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া তাঁহার রাজ্যধ্বংস এবং নগর সকল দগ্ধ করিতে আসিযাছেন? যদি বন্ধুতাই আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনার সৈন্যদল যেন আর এক পদও অগ্রসর না হয়। আপনি বন্ধুভাবে উপযুক্ত সংখ্যক অনুচর লইয়া রাজধানী পাণ্ডুয়াতে আগমন করুন, পাণ্ডুরাজা আপনার বীরোচিত সাহস ও পদগৌরবের উপযুক্ত সম্মানের সহিত আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইবেন। আপনার অভ্যর্থনার জন্য এদেশে যত প্রকার কৌতুকপ্রদ ক্রীড়া থাকিতে পারে, সকলই প্রদর্শিত হইবে। আপনার স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে আমার প্রভু আপনাকে এক শত হস্তী এবং তাহারা যত বহিতে পারিবে তত ধনরত্ন প্রীতিনিদর্শনস্বরূপে উপঢৌকন প্রদান করিবেন। আর যদি আপনি পাণ্ডুয়া জয় করিতে আসিয়া থাকেন, তবে আমার প্রভুর আজ্ঞা যে আর অগ্রসর হইবেন না। ন্যায় আমাদের স্বপক্ষে

আছেন এবং আমরা আমাদের দেবতার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।"

দূতরাজ যেমন নীরব হইলেন, অমনি মুসলমানদিগের মধ্যে একটা ক্রোধসূচক কলকলধ্বনি চলিয়া গেল। তরবারির উপর সকলেরই হস্ত যেন অজ্ঞাতসারে পতিত হইল। সেনাপতি সুফিউদ্দিন অতি গম্ভীর ও স্থিরভাব ধারণ না করিলে সে যাত্রায় দূতরাজ ও তাঁহার সঙ্গীদিগের জীবন লইয়া প্রভু সমীপে প্রত্যাগমন করা হইত কি না সন্দেহ।

সুফিউদ্দিন প্রত্যুত্তরে বলিলেন "আমি বন্ধুভাবে আসিয়াছি বটে কিন্তু আপনারা আমার বন্ধুতার সম্মান রক্ষা করেন নাই। আপনারা আমাদের প্রবলপরাক্রম সম্রাটের গফুর নামক কোন প্রজার একটীমাত্র পুত্রকে আপনাদের পুতুল, যাহাকে আপনারা দেবতা বলিয়া আপনাদের পাপভার বৃদ্ধি করেন, সেই পুতুলের সম্মুখে নির্দ্দয়ভাবে বলি দিয়া আতিথ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন এবং আমি তাহার ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করি। গফুর আপনাদের এখানে বন্ধুভাবে বহুদিন অবস্থিতি করিয়া আপনার প্রভুর অধীনে মুহুরিগিরিও করিয়াছিল, কিন্তু সহসা অযথা ক্রোধের বশীভূত হইয়া আপনারা যে নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ দেখুন শত শত বীরপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

দূত। "যাহাতে স্বীয় প্রজাবর্গের মঙ্গল হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক রাজার আপন আপন রাজ্যে স্বরচিত ব্যবস্থা প্রচার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমার প্রভুও অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে ইহাও এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা করিতে পারিবে না এবং কেহ গোহত্যা করিলে দেবতার নিকটে তাহাকে আত্মবলি দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সেখ গফুর এই ব্যবস্থা বেশ্ জানিত এবং এখানে বসতি করিবার পূর্ব্বে সে এই সকল ব্যবস্থার প্রত্যেকটী মানিয়া চলিতে শপথ করিয়াছিল। আব তাহার মুহুরিগিরির জন্য প্রভু তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যখন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রাজব্যবস্থা অমান্য করিয়া গোহত্যা করিল, তখনি শাস্তিস্বরূপে তাহার পরিবর্ত্তে কৃপা করিয়া তাহার পুত্রকে বলি দেওয়া হইল।"

সুফিউদ্দিন কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "দূতরাজ! আপনার প্রভু পাণ্ডুরাজা যদি পূজার অযোগ্য কতকগুলি তুচ্ছ জিনিসকে দেবতাবোধে পূজা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ অযথা ব্যবস্থা করিতেন না যে, একটা পশুর প্রাণ লইবার অপরাধে একটা মানুষের প্রাণদণ্ড হইবে। যদি আপনাদের ধর্ম্মে একথা থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম নামেরই উপযুক্ত নহে এবং আপনারা সহজে এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে বলপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম ছাড়াইয়া মক্কার পেয়গম্বরের (তাঁহার জয় হউক!) ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে আমি আমার প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। আপনারা একটা কুসংস্কার বজায় রাখিতে গিয়া নীতিবিগর্হিত অতি

ঘৃণিত এক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম নরহত্যার বিষয়ে উৎসাহ দেয়, তাহা আল্লার ধর্ম্ম নহে, সয়তানের ধর্ম্ম। পেয়গম্বর মহম্মদ আমাদের প্রতি সেই ধর্ম্ম তরবারির বলে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব সেই আল্লা এবং তাঁহার প্রতিনিধি মহম্মদের আদেশ শিরোধার্য্য করুন। (পরে এক হস্তে কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি ধরিয়া) হয় ইহা গ্রহণ করুন, নচেৎ এই তরবারি উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। আপনাদের রক্তপিপাসু দেবতা সকলকে দূর করিয়া দিয়া বলুন 'লা এলাহা এল্লাল্লা, মহম্মদ উল রসুল আল্লা'। এই সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আসুন আমরা সকলে আল্লার নামে এক হই। আমাদের মধ্যে কলহ বিবাদ থাকিবে না। আমাদের প্রভুও অতিশয় দয়ালু, তিনি আপনাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। আমাদের সহিত আপনাদের কন্যাদিগকে বিবাহিত করুন এবং আপনারা আমাদিগের কন্যা গ্রহণ করুন। এইরূপে আপনারা নিরাপদে থাকিতে চাহেন থাকুন, নচেৎ আপনারা সকলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন!"

বলভদ্র সুফিউদ্দীনের ভয় বা লোভ প্রদর্শনে কোন প্রকারে বিচলিত না হইয়া বলিলেন—"আপনার কথার ভাবে বোধ হয় যে আপনি এই সর্ত্তগুলি ব্যতীত সন্ধি করিতে সম্মত নহেন। জানিবেন যে, আপনাদের রক্তপিপাসা, অত্যাচার অনাচার প্রভৃতি আমরা সকলই জানি। আমাদের কাছে ধর্ম্মের ভাণ করিবেন না। আপনাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া আমার প্রভু এই কারণে আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন যে, আমরা বন্ধুভাবে সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিব এবং যাহাতে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল রাশি রাশি নরহত্যা, দেশলুণ্ঠন প্রভৃতি বৃথা অনুষ্ঠিত না হয় সে বিষয়ে চেষ্টিত হইব। কিন্তু আমার প্রভুর আদেশানুসারেই আপনাদের ঘৃণিত ধর্ম্মগ্রহণ করিতে আমরা অস্বীকার করিতেছি এবং তাঁহার আদেশানুসারেই ইহাও বলিতেছি যে, যদি আপনারা আর অগ্রসর হন, তবে দেখিবেন যে, যাহাদের বাক্যবল বেশী, অসিবল তাহাদের অল্প এবং ইহাও জানিবেন যে, দিল্লীর ন্যায় বঙ্গদেশেও উৎকৃষ্ট তরবারি সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।"

বলভদ্রের এই সকল কথা শুনিয়া সমস্ত সভা ক্রোধবেগে যেন কাঁপিয়া উঠিল। তরবারির উপরে সকলেরই হস্ত নিক্ষিপ্ত হইল এবং যেই তাহাদের নেতা সুফিউদ্দিন স্বীয় আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, অমনি শত শত তরবারি সভাস্থ মসালের আলোকে বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল। সকলেই দূতরাজ ও তাঁহার অনুচরবর্গের বধ সাধনার্থ সেনাপতির আদেশমাত্র প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সুফি তাহাদিগের প্রতি সগর্ব্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "না, তোমরা সকলে অস্ত্র প্রতিসংহার কর"; তদনন্তর দূতরাজ বলভদ্রের প্রতি ফিরিয়া আপনার মহত্ত্ব অনুভব করিতে করিতে ঈষদ্ধাস্যমুখে বলিলেন "এই অবস্থায় অন্য কোন সেনাপতি যাহা করিতেন, করিতেন; কিন্তু আমরা দূতদিগের সম্মান রক্ষা করিতে জানি। আপনারা নিরাপদে অক্ষতশরীরে আপনাদের প্রভু পাণ্ডু-

রাজার নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিবেন যে আগামী কল্য আমার বীর সহচরগণ তাঁহার সম্ভ্রান্ত পারিষদ্‌বর্গের অন্তঃপুরে শয্যা রচনা করিবেন।"

প্রত্যুত্তরে দূতরাজও বলিলেন "আগামী কল্য পাণ্ডুয়ার সতী কন্যা-দিগের পবিত্র মুখ চুম্বনের পরিবর্ত্তে আপনার বীর সহচরগণ তাহার নর্দ্দামা সকলের পঙ্করাশি চুম্বন করিবে।" এই কথা বলিয়া তিনি সঙ্গীদিগের সহিত পাণ্ডুয়ার দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সকলেই যুদ্ধের জন্য এত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, সকলেরই যেন বোধ হইতে লাগিল, সে রাত্রি আর ফুরায় না। ক্রমে পূর্ব্বদিকে শুকতারা উদিত হইয়া প্রভাত সূচিত করিয়া দিল, এদিকে সম্রাট্‌সেনা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাম্বু উঠাইয়া পাণ্ডুয়া নগরের অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা এত দ্রুত চলিয়াছিল যে সূর্য্য উঠিতে না উঠিতেই খন্যানের দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইল। খন্যানের দুর্গ পাণ্ডুয়ার একটী বহির্দুর্গ মাত্র। এই দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বলভদ্র মুসলমান সভা হইতে প্রত্যাগমন কালে দুর্গাধ্যক্ষকে উহা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য ও প্রজাবর্গের সহিত পাণ্ডুয়ার ভিতরে যাইতে বলিয়াছিলেন। সেই আদেশানুসারে তিনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া এবং তৎ সঙ্গে খন্যান গ্রামটীও ভস্মসাৎ করিয়া সৈন্য ও প্রজাবর্গের সহিত পাণ্ডুয়ার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা আসিয়া শূন্যদুর্গ ও ভস্মীভূত গ্রাম মাত্র অধিকার করিল এবং তাহারা দুর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ প্রস্থান, হিন্দুদিগের ভীরুতার পরিচয় ভাবিয়া অধিকতর গর্ব্বস্ফীত হইয়া আরও দ্রুতপদে পাণ্ডুয়ার দুর্গাভিমুখে ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে পাণ্ডুয়া দৃষ্টিগোচর হইল। যে মন্দিরচূড়ার উপরে ময়ূর বিরাজ করিতেছিল, সেই চূড়া সর্ব্বাগ্রেই দৃশ্যমান হইল। সুবর্ণ ময়ূরটী সেই চূড়ার উপরে থাকিয়া তাহার কনককিরণে দিগ্বিদিক্ ভাসাইয়া দিতেছিল। সুফি-উদ্দীন কোথাও আর না থামিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। অবশেষে দুর্গের সম্মুখে আসিয়াই দুর্গের বহিঃস্থিত বংশ-নির্ম্মিত একটী সামান্য মঞ্চকে গতিরোধ করিতে দেখিয়া থামিতে বাধ্য হইলেন। তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বাঁশের সামান্য একটী মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছে দেখিয়া সুফিউদ্দীনের সৈন্যগণ হাসিয়াই আকুল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তাহাদের এই হাস্য শীঘ্রই রোদনে পরিণত হইবে। তাহারা মঞ্চ লইয়া খুব হাসাহাসি করিতেছে, এমন সময়ে তাহারা দেখিল যে, দুর্গের প্রথম প্রাকারে দাঁড়াইয়া একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক অতি মিষ্টস্বরে তাহাদিগকে বলিতেছেন "এখনও অত আহ্লাদ করিও না; তোমরা আগে পাণ্ডুরাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, তার পরে আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিও।" সেই স্ত্রীলোকটী এই কথা বলিয়া বারম্বার তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন,

"বিলম্ব করিতেছ কেন? এস, আর এই কথা মনে রেখো যে, শত্রুদিগের প্রতি উপহাস করিলে তাহারাও উপহাস করিবার সময় পাইতে পারে।" মুসলমানেরা সেই সুন্দরীকে ভালরূপে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বংশমঞ্চের উপর উঠিয়া গেল; সহসা সেই মঞ্চের কতকগুলি বংশদণ্ড সরিয়া গেল এবং তৎসঙ্গে প্রায় তিন হাজার মুসলমানসেনা শত হস্ত গভীর এক খাদের মধ্যে পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনাতে জীবিতগণের হৃদয়ে বিষম ভীতির সঞ্চার হইল। তাহাদিগের অধিনেতা সুফি এখন প্রাকারে স্ত্রীলোকটীর আবির্ভাবের কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত তীরের অতীত স্থানে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্গের অভ্যন্তর হইতে এক মহান্ আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল এবং দেখিতে না দেখিতে মুসলমানদিগের মস্তকোপরি স্ত্রীলোকদিগের চটীজুতা অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রতি জুতাতে লেখা ছিল "আমরা জুতা পরিয়া শয়ন করি না এবং তোমরা আমাদের অপেক্ষা যখন স্বর্গের হুরিদিগকে অধিক ভাল বাস, তখন এই জুতাগুলি তাহাদিগকে উপহার দিও।" এই সকল দেখিয়া সমস্ত সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিল এবং সকলেই যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়া সেনাপতিকে হিন্দুদিগের উপহাসের ভয় দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু সুফি বুদ্ধিমানের মত স্থির করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, সামান্য উপহাসের ভয়ে কাফেরদের হাতে প্রাণ সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার সন্দেহ হইল যে মায়াজালের সহিত তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। এইরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে "আজ সকলকে আল্লা ও মহম্মদের নিকট জয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমানদিগকে জয়ী করিয়া আজিকার অপমানের প্রতিশোধ লইতে দিবেন"। মুসলমানেরা অবনতমস্তকে স্ব স্ব শিবিরে ফিরিয়া গেল। সেনাপতির ঘোষণা সত্ত্বেও সে রাত্রি আর 'নেমাজ' ভালরূপে কাহারই পড়া হইল না; সকলের সেই সহসা অন্তর্হিত তিন হাজার সৈন্যের জন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে নিশা প্রভাত হইল।

সুফি অপরাপর সকলের ন্যায় অধীর হয়েন নাই। তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে 'নেমাজ' পাঠ করিয়া পর দিবসের যুদ্ধের জন্য যেন একটু সাহস প্রাপ্ত হইলেন। নেমাজ হইয়া গেলে তিনি হুমদমকে (আমরা এখন হইতে তাহাকে তাহার স্বগৃহীত নামে সরফ খাঁ বলিয়া ডাকিব) নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে প্রাতের ঘটনা সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছে।

সরফ খাঁ। "খোদা আমাদিগকে রক্ষা করুন"।

সুফি। "কিন্তু সরফ্! এই যে আমাদের এতগুলি সৈন্য একেবারে হটাৎ অদৃশ্য হইল, এটা কি সয়তানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না"?

সরফ। "কি বলিব—আমার তো সম্পূর্ণই ঐরূপ ধারণা। যে স্ত্রীলোক প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়াছিল, সে বোধ হয় সত্যিকার স্ত্রীলোক নহে; সয়তান

বোধ হয় ভেঙ্কিবাজি খেলিয়াছিল—আমি দেখিলাম, সে যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতেই বাতাসের সহিত মিশাইয়া গেল"।

এইরূপ মায়াজাল, সয়তান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিষয়ে সুফিউদ্দীন যে সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা বিশেষ উন্নত ছিলেন, তাহা নহে। তিনিও সরফের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, তথাপি সরফকে এবং তৎসঙ্গে আপনার মনকেও কতকটা আশ্বস্ত কবিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "না—না; যদিও এই কাফের হিন্দুরা সয়তানের সহিত সদ্ভাব করিয়া জাদুগিরি অভ্যাস করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি যে বিষয় বলিলে, তাহা কি ঠিক—তোমার দেখিবার ভুলও হইতে পারে। যাই হউক, এবিষয়ে সৈন্যদের কাছে কিছুমাত্র বলিও না; যাহা হইবাব ছিল, হইয়া গিয়াছে; আমরা পেয়গম্বরের প্রসাদে শীঘ্রই কাফেরদিগকে সত্যপথ দেখাইতে পারিব।"

সরফ। "আল্লা! আ-া! আমি বলিব কেন—কাহাকেও বলিব না; কিন্তু আমাদের বাবর আলী যে ইহা জানে এবং আমাদের রমজান আলী যে এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। জাঁহাপনা, যদি সয়তানের দল আজিকার মত দিনে আমাদের হাজার হাজার সৈন্য গিলিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি আপনি ইহাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব বিবেচনা কবেন"?

সুফি। "কোরাণে আছে, আল্লার উপর নির্ভর করিয়া থাক—তাঁহার নিকট কিছুই অসম্ভব নাই। আর সরফ্, যদি খোদা থাকেন, আর যদি মহম্মদ পেয়গম্বর হন, তাহা হইলে শেষে আমাদের জয়লাভ হইবেই"।

এই কথা বলিয়া সুফি সরফকে বিদায় দিয়া প্রহরীদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন। শয়নের পূর্ব্বে তিনি আল্লার নাম স্মরণ করিয়াও মন হইতে সেই স্ত্রীলোকের সহসা অন্তর্দ্ধান হইবাব কথা ও তজ্জনিত ভীতি দূর করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে অনেক আলোচনার পর স্থির করিলেন যে, যখন আল্লা ও তাঁহার প্রতিনিধি মহম্মদের অধীনেই এই সমস্ত জগৎসংসার চলিতেছে, তখন তিনি যদি প্রকৃত মুসলমান হন, তবে তাঁহাব জয়লাভ হইবেই। ক্রমে তিনি নিদ্রাদেবীর অঙ্কাধিগত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তারাগুলি একে একে ফুটিয়া উঠিয়া আকাশকে হীরকখচিত করিয়া তুলিল। চন্দ্রমা উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তুলিল। ক্রমে চন্দ্রমা অস্ত গেল; পাখীরা প্রভাতের গীত গাহিবা যেন সাদর অভ্যর্থনার সহিত প্রভাত আনয়ন করিল, আর এদিকে আক্রমণকারী সেনাদল প্রস্তুত হইয়া উঠিল। সুফিউদ্দীন তাহাদের অগ্রগামী হইয়া পুনরায় তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। তিনি প্রভঞ্জনের ন্যায় পড়িয়া দুর্গ অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গের চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্গের পরিধি এক মাইল। তাহার গৃহভিত্তি সকলের উচ্চতা যেরূপ, পরিসরও তদনুরূপ। দুর্গ হইতে কিছু দূরে কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট পোকার দণ্ডায়মান থাকিয়া দুর্গকে রক্ষা করিত। মুসলমান সেনা সেই গৃহভিত্তি সকল আরও ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যেমন দুর্গের নিকটে আরও কিছু অগ্রসর হইল, অমনি সহসা দুর্গের দ্বাদশ সিংহদ্বার খুলিয়া গেল এবং দুর্গের অভ্যন্তর হইতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দূতরাজ বলভদ্র তাঁহার দুই ভ্রাতা বীরভদ্র ও রামভদ্র এবং কতকগুলি সুনির্ব্বাচিত বীর পুরুষ সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেকেই অশ্বারোহী, প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি সুতীক্ষ্ণ কুঠার এবং প্রত্যেকের কটিবন্ধে এক একখানি স্বর্ণখচিত তরবারি। অবিলম্বেই বলভদ্র উপযুক্ত ব্যূহ রচনা করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানগণ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছিল, অবশেষে সেনাপতি সুফিউদ্দীন ও অন্যান্য কতিপয় সেনানীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তাহাদের চৈতন্য হইল।

প্রথমে উভয়পক্ষ হইতে এক এক জন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, ক্রমে নির্ব্বিচারে সকলেই আসিয়া স্ব স্ব দলে যোগ দিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সংগ্রাম ভীষণভাব ধারণ করিল। যুদ্ধের প্রথমেই এক মুসলমান সেনানী সায়াদ জুলাল বলভদ্রের কুঠারের আঘাতে ধরাশায়ী হইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একা বলভদ্রের কুঠারতলে অন্যূন বিংশতি বিপক্ষ সেনানী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় হইল, যুদ্ধ তখনও ঘোরতর চলিতে লাগিল। সুফিউদ্দীন ও বলভদ্র উভয়ে পরস্পরকে বাছিয়া লইয়া উভয়েই সমান বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাবর আলী দ্বাদশ জন হিন্দু সৈনিক কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সিংহের ন্যায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে যখন দ্বাদশ জনের মধ্যে তিনজন অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে এক কুঠার আসিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করে আর কি—পশ্চাৎ হইতে কে তাহা প্রতিরোধ করিয়া তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিল। বাবর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন ফার্দ্দুস আলী। বাবর ইহাঁকে কতবার অপমান করিয়াছেন, তথাপি ইনি তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। বাবরের নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও ফার্দ্দুস তাঁহার পশ্চাদ্গামী চিরসহচর। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তর্ক করিবার বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ নাই। তাঁহারা এখন উভয়ে মিলিত হইয়া অবশিষ্ট তিন জনকেও শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সুফিউদ্দীনের তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে বলভদ্র ধরাশায়ী হইলেন। তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট হিন্দু সেনা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং সিংহদ্বারগুলি যেন বিপদ্ জানিয়াই বন্ধ হইয়া গেল। অদ্যকার যুদ্ধের ফলে মুসলমানেরা পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

রাসমালা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বল্লভীর ভাগ্যগগণ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, ভবিষ্যৎ বিপদ জানিতে পারিয়া শ্রীচন্দ্রপ্রভু, শ্রীবর্দ্ধমান দেব ও অপর অপর দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বল্লভী ত্যাগ করিয়া শিবপত্তন (প্রভাস), শ্রীমলপুর ও অন্যান্য নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে ঋষিবর শ্রীমলস্থরিও স্বীয় শিষ্যানুশিষ্য সমভিব্যাহারে পঞ্চাসর নগরে উপস্থিত হইলেন। দৃঢ়পদে ভীষণ বলসহকারে ম্লেচ্ছ সেনা বল্লভীপুরের সিংহদ্বার আক্রমণ করিল। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক রঙ্ক গোরক্ত দ্বারা মহারাজ শিলাদিত্যের পবিত্র সূর্য্যকুণ্ড দূষিত করিতে পরামর্শ দিল। অবিলম্বে তাহার বাক্য পালিত হইল ; তখন সূর্য্যদেবের পবিত্র ঘোটক সেই অপবিত্রীকৃত কুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে আকাশমার্গে উত্থিত হইল। শিলাদিত্যের একমাত্র বাহুবল, বল্লভীর প্রধানতম সহায়, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে তদীয় বিরাট রাজধানী বল্লভীর ধ্বংস করিল।

বল্লভীপুরের ধ্বংস সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী ও কাল্পনিক বিবরণ শ্রুত হইয়া থাকে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই সকল বৃত্তান্তের কিছুমাত্রও সত্যতা পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ তন্মধ্যে কেবল একটী এস্থলে বর্ণিত হইল। কথিত আছে, "ঢুণ্ডলীমল নামে জনৈক যোগী একটীমাত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে বল্লভীপুরে আগমন করেন। চমাদ্রির নিকটস্থ ঈশাম্বো নামক গিরিকুটের পাদদেশে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎকালে এতৎপ্রদেশ বল্লভীর ঠিক প্রান্তসীমায় স্থাপিত ছিল। ঢুণ্ডলীমল সেইস্থলেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য ভিক্ষার্থ প্রত্যহ রাজধানীতে গমন করিত ; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাহাকে মুষ্টিমাত্রও তণ্ডুল প্রদান করিত না। ক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া মুনিকিঙ্কর বন হইতে কাষ্ঠ সঞ্চয়পূর্ব্বক নগরে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং বিনিময়ে যাহা কিছু পাইল, তদ্দ্বারা গোধূম চূর্ণ ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু কেহই তাহাতে রোটিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইল না। ঢুণ্ডলীমলের শিষ্য দ্বারে দ্বারে লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিল ; কিন্তু কেহই তাহার মুখের দিকে চাহিল না ; অবশেষে এক কুম্ভকারপত্নী সযত্নে তাহার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। প্রত্যহ কাষ্ঠভার বহন প্রযুক্ত শিষ্যের শিরোরুহ ক্রমে ক্রমে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। যোগিবর তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কিঙ্কর উত্তর করিল :—"প্রতাপান্বিত রাজন্! এই রাজধানীতে কেহই ভিক্ষা দেয় না ; সেই জন্য আমি বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক নগরে বিক্রয় করিয়া ময়দা ক্রয় করিয়া আনি ; একজন কুম্ভকারপত্নী তাহাতে রোটিকা প্রস্তুত করিয়া দেয় ; দিন দিন এই পরিশ্রম জন্য আমার মাথার

সমস্ত কেশ উঠিয়া গিয়াছে।” এই কথা শ্রবণে মুনিবর বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, “ভাল, অদ্য আমি স্বয়ং ভিক্ষার্থ নগরে যাইব; দেখি আমাকে কেহ ভিক্ষা দেয় কি না।” তদনুসারে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই কুম্ভকারবনিতা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার সম্মান রাখিল না। যোগিবর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় শিষ্যকে সেই সাধু কুম্ভকারের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন “অদ্য তুমি সপরিবারে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাও; অদ্যই ইহার ধ্বংস হইবে।” ঘটকার সস্ত্রীক ও সপুত্র বল্লভীপুর পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহাদের প্রস্থানকালে ঢুণ্ডলীমল কুম্ভকারপত্নীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, “নগর হইতে বহির্গত হইয়া তুমি কদাপি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিও না।” কিন্তু সে হতভাগিনী রমণী তাহা ভুলিয়া গিয়া সাগরতটের নিকট হইতে পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; অমনি তাহার দেহ পাষাণ প্রতিমায় পরিণত হইয়া পড়িল। সেই প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি তৎপ্রদেশে রূবাপুরী মাতা নামে পূজিত হইয়া থাকে। তন্মুহূর্ত্তে যোগিবর ঢুণ্ডলীমল একখানি মৃৎপাত্র হস্তে লইয়া তাহা বিপর্য্যস্ত করিলেন এবং ভীমগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন “নগর! এখনই রসাতলে যাও, তোমার ধনরত্ন ধূলিতে পরিণত হউক। অমনি তৎক্ষণাৎ বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইল *।”

* বল্লভীর ধ্বংস সম্বন্ধে রাজস্থানে অন্য প্রকার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা।

যে বল্লভীপুর একদা সমগ্র ভারতের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, আজি তাহার সেই পোচীন গৌরব ও সমৃদ্ধির ক্ষীণ নিদর্শন বর্ত্তমান বুল্লে নগরীর পশ্চিম ও উত্তর ভাগস্থ বিশাল অরণ্যানির অভ্যন্তরে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টক প্রস্তরাদির অনুসন্ধানে অনেকে অনেকবার এই মহাবনের অনেকস্থল খনন করিয়াছে; সেই সকল খনিত ভূমির অভ্যন্তরে নানা প্রকার ইষ্টক-প্রাচীর ও পাষাণভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত ইষ্টকের এক একখানি ষোল ইঞ্চ দীর্ঘ, দশ ইঞ্চ প্রস্থ এবং তিন ইঞ্চ পুরু †।

এই জঙ্গলের পদস্থল বিধৌত করিয়া এক ক্ষীণা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে দূর সাগরের উদ্দেশে বহমান হইয়াছে। বর্ষাকালে ইহা কূল পরিপ্লাবন পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হয় বলিয়া তৎপ্রদেশে ইহা ঘিলো “উন্মাদিনী” নামে অভিহিত। প্রায় প্রতি বৎসর ঘিলোর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ইহার পরিত্যক্ত প্রণালি

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন,“ইহার (বল্লভীর) আধুনিক নাম বল্লি, বা বুল্লে; কিন্তু তত্রত্য গোহিল সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করাতে যখন তিনি বলিলেন যে, ইহার প্রাচীন নাম বল্লভীপুর, তখন আমার অন্তঃকরণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।” পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করিতে যাইয়া টড সাহেব বল্লভীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব্বে বল্লভীপুরের পরিধি অষ্টাদশ ক্রোশ ছিল; ইহার ধ্বংসরাশি খনন করিতে করিতে যে সমস্ত ইষ্টক বহিস্কৃত হয়, তাহার এক একখানি দৈর্ঘে দেড় হস্তেরও অধিক এবং ওজনে প্রায় অর্দ্ধ মন হইবে।
Tod's Western India, pp. 148, 268.

দ্বারা বল্লভীর ভগ্নাবশেষ কিছু না কিছু পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া থাকে; নগরের উত্তরভাগে অদ্যাপি একটী বৃহৎ কুণ্ডের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্দেশীয় লোক ইহাকে "ঘোড়ার্দ্দমন" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

সেই বিশাল বনস্থলীর অভ্যন্তরে এবং বর্ত্তমান বল্লে নগরীর চারিদিকেই নানাবিধ প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও বৃষমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত প্রাঙ্গন ও অলিন্দের উপর সেই সকল পাষাণ-প্রতিমা স্থাপিত, তাহাদের অবস্থা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, বল্লভীপুর ভূকম্পন অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে ভূগর্ভে প্রোথিত হয় নাই;—শত্রুর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

মহাত্মা কর্ণেল টড্ বলেন যে, ১৪৪ খৃষ্টাব্দে কনকসেন নামে জনৈক সূর্য্য-বংশীয় নরপতি পিতৃপুরুষগণের আবাস-ভূমি কোশলরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন বিরাট নগরের নিকটে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে তথায় প্রমার-বংশীয় জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। কনকসেন তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া বিরাট নগর স্থাপন করেন। তাঁহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বিজয়সেন বিজয়পুর ও বিদর্ভ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎকাল হইতে বিদর্ভ সিহোর (সিংহপুর) নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই কীর্ত্তিমান্ রাজবংশ দ্বারাই বর্ত্তমান কাম্বে নগরের সন্নিকটে বল্লভীপুর ও গজনী নগর স্থাপিত হইয়াছিল। বল্লভীর সহিত গজনীরও শোচনীয় অধঃপতন হয় *।

মহাত্মা কর্ণেল টড্ আর একখানি গ্রন্থের কয়েকস্থলে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ কনকসেন সৌরাষ্ট্রদেশে উপ-নিবিষ্ট হইয়া প্রাচীন মুঙ্গিপত্তন (ঢাঁক) নগরে বাসভূমি স্থাপন করেন। তাহার পর তদীয় বংশধরগণের তত্রত্য বালক্ষেত্র প্রদেশ জয় করিয়া আপনাদিগকে বাল-রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিল †।

প্রসিদ্ধ বল্লভী পুর যে ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া-ছিল, তাহার নিরূপণ বিষয়ে আজিও নানা মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল জৈনগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম, তৎসমুদায়েই বর্ণিত আছে যে, ৩৭৫ বিক্রম সম্বতে (৩১৯ খৃঃ অব্দে) বল্লভীর অধঃপতন হয়। এই বৎসরেই বল্লভী সম্বৎ নামে আর একটী সম্বৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ণেল ফর্ব্বস বলেন, "রাসপ্রণেতারা সম্ভবতঃ বল্লভী ধ্বংসের বৎসরের সহিত বল্লভী সম্বৎ প্রতিষ্ঠার বৎসরের গোল-যোগ করিয়াছেন।" প্রসিদ্ধ "শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সম্বৎ ৪৭৭ (খৃঃ ৪২১) অব্দে শিলাদিত্য নামে জনৈক নরপতি সৌরাষ্ট্রের সিংহা-সনে আরূঢ় হইয়া শত্রুঞ্জয় গিরিশিখরস্থ মন্দিরগুলি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি যে সকল তাম্র-শাসন ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ে বল্লভী রাজতালিকায় সর্ব্বসমেত চারি জন শিলাদিত্যের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত তাম্রলিপিতে কেবল অষ্টাদশ জন বল্লভীরাজের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে

* রাজস্থান ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† Western India, pp. 51. 148

প্রথম নরপতিদ্বয় "সেনাপতি" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় ইঁহারা উজ্জয়নীর তদানীন্তন প্রামার নৃপতিদিগের অধীনে সামন্তরাজরূপে অবস্থিত ছিলেন, সেই জন্যই স্বাধীনতাসূচক মহারাজা উপাধি ধারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী রাজগণ উক্ত গৌরবসূচক উপনাম ধারণ করিয়া ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত নরপতিগণ "শ্রীভট্টার্ক" (মহাযোদ্ধা) নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শৈব ছিলেন, কেননা ইঁহাদের পতাকা ও মুদ্রায় বৃষ ও নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বল্লভীর ধ্বংসরাশির মধ্যেও অনেক শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত মুদ্রা, শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতিতে বল্লভীধ্বংসের যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, খৃষ্টীয় ১৪৪ অব্দ হইতে ৫৫৯ অব্দের মধ্যে এক এক সময়ে বল্লভী নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

যৎকালে সুবিখ্যাত চৈন পরিব্রাজক হিয়ানসঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ধ্রুবভট্ট নামে জনৈক নরপতি বল্লভীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের একস্থলে লিখিত আছে, "এ প্রদেশে (বল্লভীরাজ্যে) ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিতেছেন; স্বর্গীয় রাজা মালবরাজ্যের অধিপতি মহারাজ শিলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন; এক্ষণে যিনি সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন, ইনি কনোজরাজ শিলাদিত্যের জামাতা, ইহাঁর নাম ধ্রুবভট্ট।" মহাত্মা জেকোয়ে এই ধ্রুবভট্টকে বল্লভী বংশের একাদশ নরপতি দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। চতুর্থ শিলাদিত্যের সহিত বল্লভীরাজ্য ও বল্লভীপুরের পর্য্যবসান হয়। হিয়ানসঙ্গ ৬৩০ খৃঃ অব্দে সৌরাষ্ট্রে উপস্থিত হয়েন। তৎকালে ধ্রুবসেন বল্লভীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন; ধ্রুবসেনের পর আর সপ্ত জন নরপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সপ্ত জনের প্রত্যেক রাজত্বকে গড়ে বিংশতি বৎসর করিয়া অর্পণ করিলে বল্লভীধ্বংস ৭৭০ খৃঃ অব্দে আনীত হয়। কিন্তু ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; কেননা রাজস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে; যে, গিহ্লোটকুলকেশরী বীরবর বাপ্পা রাওল ৭২৮ খৃঃ অব্দে চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন *। বীরকেশরী বাপ্পা শিলাদিত্যের অধস্তন দশমপুরুষে অবতীর্ণ হয়েন। যদি বাপ্পার পূর্ব্ববর্ত্তী নয় জন সেনাপতির রাজত্বকালকে গড়ে ২০ বৎসর দেওয়া যায়, তাহা হইলে ৭২৮—১৮০ = ৫৪৮ খৃঃ অব্দ বল্লভীধ্বংসের কালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। রাজস্থানে এক প্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ৫৪৮ খৃঃ অব্দে বলভীপুর ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল †। ওয়েদেন, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, ম্যালকম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রায় এই সময়কেই বল্লভীধ্বংসের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ‡। এদিকে পণ্ডিতবর

* রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।

† রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।

‡ টড সাহেবের স্বপ্রণীত "পশ্চিম ভারতে" অন্য সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি তাহার একস্থলে লিখিয়াছেন, "মিবারে যে সমস্ত পাও লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ে লিখিত আছে যে, ইন্দুজিৎ আক্রমকগণ কর্ত্তৃক বল্লভী সম্বৎ ৩০০ অব্দে বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ধনেশ্বর স্বরি স্বপ্রণীত "শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য" নামক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, বিক্রমের ৪৭৭ বৎসর পরে (৪২১ খৃঃ অব্দে) বল্লভীরাজ শিলাদিত্য সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে দূর করিয়া দিয়া শ্বেতাম্বরদিগকে (জৈন) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাতে আবার এক শত বৎসরের ন্যূনাধিক্য ঘটিতেছে।

যাহা হউক ঠিক কোন্ সময়ে এবং কোন্ ম্লেচ্ছজাতি কর্তৃক বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হয় নাই। কর্ণেল টড সেই ম্লেচ্ছ শত্রুদিগকে পারদ বা হুন, ওয়েদেন ইন্দুবক্তির এবং এলফিনষ্টোন নৌশেরোযার অধীনস্থ পারসিকগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নৌশেরোয়া খৃঃ অব্দ ৫৩১ হইতে ৫৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্যার জন ম্যালকম অনেক পারসিক গ্রন্থকারের মতোদ্ধার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, উক্ত পারসিকবীর (নৌশেরোয়াঁ) উত্তরে সুদূর ফরগণা এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়ী সেনাদল পরিচালিত করিয়াছিলেন; এদিকে স্যার্ হেনরি পটিঞ্জর অতি সূক্ষ্ম ও সম্ভবনীয় মত প্রদর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, নৌশেরোয়াঁ মিকরাণোপকূল হইয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব বল্লভী যখন সিন্ধুরাজ্যের অতি নিকটে অবস্থিত, তখন তিনি যে, তন্নগরে আপতিত হইযা তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সহজে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ক্রমশঃ—

ইহাতে ৩০০ + ৩৭৫ = ৬৭৫ — ৫৬ = ৬১৯ খৃঃ অব্দ বল্লভীর ধ্বংস কালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।"

Tod's Western India, P. 352.

আয়ুর্ব্বেদ।

জ্বর বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সম্প্রতি এতদ্দেশে এই বিষম জ্বরের প্রাদুর্ভাব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। "প্রজ্ঞাপরাধ" একটী কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ প্রজ্ঞাপরাধই ইহার মূল। জ্বর হইতে না হইতেই আমরা অবৈধভাবে কুইনাইন প্রভৃতি উগ্রবীর্য্য পদার্থ দ্বারা জ্বরমুক্ত হইতে চেষ্টা করি, স্থান বিশেষে জ্বর নিবৃত্তও হয় বটে, কিন্তু জ্বরোৎপাদক দোষের পরিশুদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং ২।৪ দিবসের মধ্যে পুনরায় জ্বর দেখা দেয়। ক্রমে প্লীহা ও যকৃৎ উপস্থিত হয়। কাজে কাজেই এখন বিষম জ্বরের এত প্রাদুর্ভাব।

দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষম জ্বরম্।

জ্বর মুক্ত ব্যক্তির শরীরস্থ অল্প কুপিত দোষ (বাত, পিত্ত ও কফ) অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা পুনরায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং রসরক্তাদি কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে। "জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা" এই কথাটী দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃও বিষম জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং—

যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃস্মৃতঃ॥

যে জ্বরের কাল অনিয়ত, শীত ও উষ্ণতা অনিয়মিত এবং যাহার বেগের ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহাকে বিষম জ্বর বলে। এই বিষম জ্বর পঞ্চবিধ—

সন্ততং সততোঽন্যেদ্যু স্তৃতীয়ক চতুর্থকৌ।

সন্তত, সতত বা সততক, অন্যেদ্যুঃ (অন্যেদ্যুষ্ক), তৃতীয়ক ও চতুর্থক।

সন্ততং রসরক্তস্থঃ সততং রক্তধাতুগঃ।
দোষঃ ক্রুদ্ধো জ্বরং পুংসাং সোঽন্যেদ্যুঃ
পিশিতাশ্রিতঃ॥
মেদোগত স্তৃতীয়েঽস্থি অস্থি মজ্জগতঃ পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চাতুর্থকং ঘোর মন্তকং রোগসঙ্করম্॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাত পিত্তাদি দোষ রস রক্তাদি কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। তন্মধ্যে রস ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া সন্তত জ্বর, রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সততক জ্বর, মাংসকে আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর, মেদো ধাতুকে আশ্রয় করিয়া তৃতীয়ক এবং অস্থি ও মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া চাতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে।

সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহ মথাপি বা।
সন্তত্যা যো বিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে॥

সাত দিন, দশ দিন কিম্বা দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত যে জ্বর নিরন্তর ভোগ করে, তাহাকে সন্তত জ্বর বলে। এস্থলে একটী আপত্তি হইয়া থাকে যে, "মুক্তানু-

বন্ধিত্বং বিষমত্বম্” (যে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, তাহাকেই বিষম জ্বর বলে) কিন্তু সন্তত জ্বরের বিচ্ছেদ হয় না, নিয়মিত দিবস পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভোগ করে, অতএব সন্তত জ্বরকে কিরূপে বিষম জ্বর বলা যায়?

জ্বরাঃ পঞ্চ তু যে প্রোক্তাঃ পূর্ব্বে সন্ততকাদয়ঃ।
চত্বারঃ সন্ততং হিত্বা জ্ঞেয়াস্তে বিষমজ্বরাঃ॥

ভাবমিশ্র খরনাদের এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্তত জ্বর ব্যতীত অপর চারিটীকে বিষম জ্বর বলিলেও চলিতে পারে। খরনাদ মুক্তানুবন্ধিত্বের অল্পতা বশতই সন্তত জ্বরকে মুক্তানুবন্ধী বলিতে চান না। বাস্তবিক পক্ষে সন্তত জ্বর মুক্তানুবন্ধী ও বিষম জ্বরের অন্তর্গত।

“বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা দিবসেঽব্যক্তলক্ষণঃ।
দুর্লভোপশমঃ কালং দীর্ঘ মপ্যনুবর্ত্ততে॥”

চরক এই সন্দেহ নিরাসার্থই উক্ত বচনটীর অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অর্থ, দ্বাদশ দিবসে সন্তত জ্বরের বিচ্ছেদ হয়, তদনন্তর অব্যক্ত লক্ষণ ও দুর্লভোপশম হইয়া দীর্ঘকাল ভোগ করিতে থাকে।

অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।

দিন রাত্রির মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিবসে একবার ও রাত্রিতে কিম্বা রাত্রিতে দুইবার অথবা দিবসেই দুইবার জ্বর উপস্থিত হইলে তাহাকে সততক জ্বর বলা যায়।

অন্যেদ্যুষ্ক স্ত্বহোরাত্র এক কালং প্রবর্ত্ততে।
তৃতীয়ক স্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ॥

অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর দিন রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র উপস্থিত হয়। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ এক এক দিন অন্তর জ্বর উপস্থিত হইলে তাহাকে তৃতীয়ক এবং দুই দিবস ভাল থাকার পর চতুর্থ দিবসে পুনরায় জ্বর আসিলে তাহাকে চাতুর্থক জ্বর বলে। জ্বরাগমন দিনকে গ্রহণ করিয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ গণনা করিতে হইবে যথা—

দিনমেক মতিক্রম্য যো ভবেৎ স তৃতীয়কঃ।
দিনদ্বয়মতিক্রম্য যঃ স্যাৎ স হি চতুর্থকঃ॥

এক দিন ভাল থাকিয়া জ্বর হইলে তৃতীয়ক ও দুই দিন ভাল থাকিয়া জ্বর হইলে চতুর্থক বলা যায়।

তে বৃদ্ধিং বল কালঞ্চ প্রাপ্য দোষা স্তৃতীয়কম্।
চাতুর্থকঞ্চ কুর্ব্বন্তি প্রত্যনীকং বলক্ষয়াৎ॥
কৃত্বা বেগং গতবলাঃ শ্লেষ্ম-স্থানে ব্যবস্থিতাঃ।
পুন র্বিবৃদ্ধাঃ স্বে কালে জ্বরয়ন্তি নরং মলাঃ॥

তৃতীয়ক ও চাতুর্থকারম্ভক দোষ সকল স্ব স্ব প্রকোপকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রোগীর বলক্ষয় করে এবং বলক্ষয় হেতু পীড়াকে দুশ্চিকিৎস্য করিয়া তুলে। স্ব স্ব প্রকোপ হেতুতে মল অর্থাৎ বাত-পিত্তাদি কুপিত ও আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং তদনন্তর গতবল হইয়া শ্লেষ্মস্থানে অবস্থান করে, পুনরায় নিয়মিতকালে আসিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

কফ স্থান বিভাগেন যথাসংখ্যং করোতি হি।
সততান্যেদ্যু স্তৃতীয় চতুর্থক প্রলেপকান্॥
অহোরাত্রা দহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে।
দোষ আমাশয়ং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥

সুশ্রুতের এই বচন দ্বারাও চরকোক্ত মতের তাৎপর্য্য সমর্থিত হয়। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐরূপ দিবসে দুইবার, দিবসে একবার, তৃতীয় দিবসে

এবং চতুর্থ দিবসে এই কারণেই জ্বর পুনরাগমন করে। কফের আশ্রয়স্থান পাচটী—আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ ও সন্ধিস্থান সমুদয়। দিবা ও রাত্রির মধ্যে দোষ প্রকোপের কালও দুইটী। ইহা আমরা সমীরণের তৃতীয় সংখ্যায় বিস্তার-রূপে বলিয়া আসিয়াছি। দোষ এক এক দিন রাত্রিতে উক্ত একটী কফস্থান হইতে অপর কফ স্থানে গমন করে এবং আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া প্রকোপ সময়ে জ্বর উৎপাদন করে। কফস্থান সমুদায়ের উক্ত বিভাগ বশতই সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের জ্বর উপস্থিত হয়।

আমাশয়স্থ দোষ দিন এবং রাত্রির যে যে সময়ে প্রবৃদ্ধ হয়, সেই সেই সময়েই জ্বর উপস্থিত হয়। দোষের প্রকোপকাল দুইটী, সে জন্য দুইবার জ্বর উপস্থিত হয়, ইহাকে সততক জ্বর বলে। এই সততক জ্বর রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জন্মে।

এইরূপ মাংসাশ্রিত দোষ মেদো-বাহিনী শিরাকে রোধ করিয়া হৃদযে অবস্থান করে এবং হৃদয় হইতে আমা-শয়ে আসিয়া দিন রাত্রির মধ্যে একবার-মাত্র জ্বর উৎপাদন করে। ইহাকেই অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর বলে।

মেদ আশ্রিত দোষ কণ্ঠদেশে অবস্থান করে, কণ্ঠ হইতে একদিন রাত্রিতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে একদিন রাত্রিতে আসিয়া আমাশয়ে উপস্থিত হয় ও জ্বর উৎপাদন করে, সুতরাং মধ্যে একদিন জ্বর হয় না, পরদিনে জ্বর হয় ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর বলে।

এইরূপ অস্থি মজ্জাগত দোষ মস্তকে অবস্থিতি করে এবং একদিনে কণ্ঠে ও একদিনে হৃদয়ে এবং তৎপরদিনে আমা-শয়ে উপস্থিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে মধ্য দুই দিন ভাল থাকে ও তৎপরদিন জ্বর উপস্থিত হয়, ইহাকে চাতুর্থক জ্বর বলে।

দোষ যখন সন্ধিস্থল সমুদায়ে অব-স্থান করে, সেই সময়ে প্রলেপক নামক নিবিরাম জ্বর উপস্থিত করে। আমাশয় প্রভৃতি শরীরের সর্ব্বত্রই সন্ধি আছে, সুতরাং সর্ব্বদাই জ্বর বর্ত্তমান থাকে, ইহার লক্ষণ পরে বলা যাইতেছে।

যে দিবসে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহার তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে জ্বর উপস্থিত হইতে পারে না, কারণ দোষের এক-স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে যেরূপ দিন রাত্রি সময় আবশ্যক। ফিরিয়া আসিতেও সেই সময় আবশ্যক, সুতরাং ঐ তৃতীয় দিবসে জ্বর উপস্থিত হইতে পারে না। ফলতঃ দোষ আমাশয়ে গমন করিবার সময়েই ঐরূপ রীতি অবলম্বন করে।

দোষঃ প্রকোপ কালে হি বেগবত্বেন লাঘবাৎ।
বেগাবসর এবায়ং স্বস্থান মধিগচ্ছতি ॥

দোষ প্রকোপকালে বেগবান্ হয় এবং তৎকর্ত্তৃক লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া বেগাবসরে অর্থাৎ জ্বরান্তে স্বস্থানে আগমন করিয়া থাকে সুতরাং তৃতীয় চতুর্থ দিবসে পুনরায় জ্বরোৎপত্তি যে হইতে পারে না, এরূপ আশঙ্কা বৃথা।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলেন যে, বিষম জ্বর নিবৃত্ত হইয়া যে পুনরাগত হয়, তাহার কারণ স্বভাব। সুশ্রুত বলেন—

সচাপি বিষমো দেহং ন কদাচিৎ প্রমুঞ্চতি।
গ্লানি গৌরব কার্শ্যেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে ॥

বেগে তু সমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতি লক্ষ্যতে।
ধাত্বন্তরেষু লীনত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যান্নৈবোপলভ্যতে ॥

শরীরের গ্লানি, গুরুতা ও কৃশতা যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন জানিতে হইবে যে বিষম জ্বর দেহকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় না। অতি সূক্ষ্মভাবে ধাতু মধ্যে লীন থাকে, সুতরাং আছে বলিয়া বোধ করা যায় না।

অধিশেতে যথা ভূমিং বীজং কালে চ রোহতি।
অধিশেতে তথা ধাতূন্ দোষঃ কালে প্রকুপ্যতি ॥

বীজ ভূমিতে থাকিয়া যেরূপ যথাকালে প্ররূঢ় হয়, দোষ সেইরূপ ধাতুতে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময়ে প্রকুপিত ও জ্বর উপস্থিত করে।

উল্লিখিত তৃতীয়ক জ্বর ত্রিবিধ। কফ ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ত্রিক (পৃষ্ঠ বংশের নিম্নপ্রান্ত) স্থানে বেদনা উপস্থিত হয়। বায়ু ও কফের আধিক্য থাকিলে পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইয়া পরে জ্বর উপস্থিত হয় এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বর্ত্তমান থাকিলে মস্তক বেদনার পর জ্বর উপস্থিত হয়। চাতুর্থক জ্বরেরও দোষ ভেদে দুই প্রকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। শ্লৈষ্মিক চাতুর্থক জ্বরের পূর্ব্বে জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা উপস্থিত হয় এবং বায়ু প্রকোপজনিত চাতুর্থক জ্বরে প্রথমে মস্তকে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

বিষম জ্বর এবান্য শ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
অস্থি মজ্জগতো দোষ শ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
জায়তে ভিষজ্ঞা জ্ঞেয়ো বিষম জ্বর এব সঃ ॥

দোষ অস্থি মজ্জাগত হইয়া চাতুর্থক বিপর্য্যয় নামক এক প্রকার বিষম জ্বর উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথম ও শেষ দিবসে জ্বর হয় না, মধ্য দুই দিনে জ্বর হয়, ইহা অতি বিরল।

প্রায়শঃ সন্নিপাতেন দৃষ্টঃ পঞ্চবিধো জ্বরঃ।
সন্নিপাতে তু যো ভূয়ান্ স দোষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

পঞ্চবিধ বিষম জ্বরই দোষত্রয়ের প্রকোপে জন্মে, তন্মধ্যে যে দোষটী সমধিক বলবান্ হয়, তাহাকেই দোষ বলিয়া গণনা করা হয়। প্রায় শব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, একদোষেও বিষম জ্বর উৎপন্ন হয়।

এতে বিষম জ্বরোপলক্ষকাঃ, অন্যে রাত্রি-জ্বরাদযোঽপি বিষমজ্বরা বোদ্ধব্যাঃ।

সন্ততাদি জ্বর বিষম জ্বরের উপলক্ষণ মাত্র, রাত্রিজ্বরাদিও বিষম জ্বরের অন্তর্গত।

সমৌ বাতকফৌ যস্য ক্ষীণপিত্তস্য দেহিনঃ।
রাত্রৌ প্রায়ো জ্বর স্তস্য দিবা হীনকফস্যতু ॥

যে ব্যক্তির বায়ু ও কফ সমভাবে থাকে, পিত্ত ক্ষীণ হয়, তাহার রাত্রিতেই প্রায় জ্বর হয়। এবং যাহার বায়ু ও পিত্ত সমভাবে থাকে, কফ ক্ষীণ হয়, তাহার প্রায়ই দিবসে জ্বর উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্ম এবং বায়ু ত্বক্‌গত হইলে জ্বরের আদিতে শীত বোধ হয়, অনন্তর শ্লেষ্ম ও বায়ুর বেগ প্রশান্ত হইলে পিত্ত জন্য দাহ উপস্থিত হয়। পিত্ত চর্ম্মগত হইলে জ্বরের প্রারম্ভে দাহ এবং পিত্তবেগ প্রশমিত হইলে কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক হস্ত পদ শীতল হইতে থাকে। দাহ পূর্ব্ব এবং শীত পূর্ব্ব এই দুইটী জ্বরও সংসর্গজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক, ইহার মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বর কষ্টসাধ্য ও শীতপূর্ব্ব-জ্বর সুখসাধ্য।

সময়ে সময়ে বিষম জ্বরের আরও কয়েকটী নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধ পাক বশতঃ অম্লজ রস দূষিত ও তৎকর্ত্তৃক কফ ও পিত্ত দূষিত হইলে, কফ দ্বারা শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ শীতল ও পিত্ত দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গ উষ্ণ হয়। ইহা অর্দ্ধ নারীশ্বরাকারে কিম্বা নর-সিংহাকারে হইয়া থাকে।

যদি পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠে এবং কফ দূষিত হইয়া হস্ত পদে অবস্থিতি করে, তবে শরীর উষ্ণ ও হস্ত পদ শীতল হয় আর যদি দুষ্ট কফ কোষ্ঠে ও দুষ্ট পিত্ত হস্ত পদে অবস্থিতি করে, তবে শরীর শীতল ও হস্ত পদ উষ্ণভাব ধারণ করে।

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ।
মন্দজ্বরবিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥
প্রলেপাখ্যোহি বিষমঃ প্রায়শঃ ক্লেশশোষিণাম্।
জ্বরাশ্চ বিষমাঃ সর্ব্বে প্রায়ঃ ক্লেশায শোষিণাম্॥

প্রলেপক নামক অপর এক প্রকার বিষম জ্বর আছে, ইহাতে শরীর ঘর্ম্মযুক্ত ও গৌরবান্বিত থাকে এবং অল্প অল্প জ্বর সর্ব্বদাই শরীরে বিদ্যমান থাকে ও রোগী শীত বোধ করে। সুশ্রুত বলেন এই প্রলেপাখ্য বিষম জ্বর প্রায়ই যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়। সুশ্রুত ইহাও বলেন যে, সকল প্রকার বিষম জ্বরই যক্ষ্ম-রোগীর পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর অর্থাৎ মারাত্মক হইয়া থাকে।

জ্বর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা মনের দৈন্য, উদ্বেগ, অঙ্গ সমুদায়ের অবসন্নতা, বমন, অরুচি, বাহ্যিক উত্তাপ, অঙ্গ বেদনা ও জৃম্ভা (হাই উঠা) প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তগত জ্বরে পিড়কা, তৃষ্ণা, নিষ্ঠী বনের (থুথুফেলা) সহিত রক্ত নির্গম, দাহ, শরীরের রক্তবর্ণতা, ভ্রম, মত্ততা, ও প্রলাপাদি উপস্থিত হয়।

মাংসগত জ্বরে—অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতিসার, শরীরের দৌর্গন্ধ্য ও হস্ত পদাদি সঞ্চালন প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

জ্বর মেদোগত হইলে ঘর্ম্ম, অত্যন্ত পিপাসা, প্রলাপ, মনের অসন্তোষ, মুখের দৌর্গন্ধ্য, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

জ্বর অস্থিগত হইলে বিরেচন, বমন, অস্থিভেদ, অন্ত্রকূজন (আঁতডাকা) হস্ত পদ সঞ্চালন ও শ্বাস উপস্থিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, অন্ধকাব দর্শন, মর্ম্মস্থান অর্থাৎ হৃদয়াদিতে ছেদন বৎ ব্যথা; শরীরের বহির্ভাগে শীত ও অন্তর্দাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শুক্রগত জ্বরে পুরুষাঙ্গ জড়বৎ স্তব্ধ এবং তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্রক্ষরণ হয়। শুক্রগত জ্বরে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

রস ও রক্তস্থ জ্বর সাধ্য, মাংস, মেদ ও অস্থিগত জ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়।

ক্রমশঃ—

কাল।

(ঋতু চর্য্যা) পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

গঙ্গায়া দক্ষিণে দেশে বৃষ্টের্বহুল ভাবতঃ।
উভৌ মুনিভি রাখ্যাতৌ প্রাবৃড়্ বর্ষাভিধা বৃতু॥

কোন কোন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের মতে ভাগীরথীর দক্ষিণদেশবর্ত্তি স্থান সমুদায়ে বৃষ্টির বাহুল্য হেতু প্রাবৃট্ ও বর্ষা এই দুইটী ঋতু গণিত হয়। উক্ত মতের প্রচলন অতি বিরল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ শীত, ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত এইরূপ ঋতু গণনাই অধুনা সমধিকরূপে প্রচলিত। ফলতঃ শিশির বা গ্রীষ্ম যেটী-কেই প্রথমে ধরিয়া ঋতু গণনা করা হউক না কেন, ফলে সকলই একরূপ। আমরা এ প্রবন্ধে শিশির অর্থাৎ শীত ঋতুকেই প্রথমে গণনা করিলাম।

শীতে শীতানিলস্পর্শ সংরুদ্ধো বলিনাং বলী।
পক্তা ভবতি হেমন্তে মাত্রাদ্রব্যগুরুক্ষমঃ॥
স যদা নেন্ধনং যুক্তং লভতে দেহজং তদা।
রসং হিনস্ত্যতো বায়ুঃ শীতঃ শীতে প্রকুপ্যতি॥
তস্মাত্তুষার সময়ে স্নিগ্ধাম্ল লবণান্ রসান্।
ঔদকানূপ মাংসানাং মেধ্যানামুপযোজয়েৎ॥

শীতকালে শীতলানিল সংস্পর্শে মনুষ্য-দিগের পাচকাগ্নি শরীরাভ্যন্তরে নিরুদ্ধ থাকিয়া সমধিক বলশালী হয়, সুতরাং অধিক মাত্রায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলেও সহজে পরিপাক হয়। ঐ বলবান্ পাচকাগ্নি যখন উপযুক্ত ইন্ধন অর্থাৎ ভুক্ত বস্তু প্রাপ্ত না হয়, তখন দৈহিক রস শোষণ করিতে থাকে, সুতরাং শৈত্য গুণশালী বায়ু শীতকালে প্রকুপিত হয়, অতএব শীতকালে স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ রস ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য এবং আনূপ (বরাহ মহিষাদি) ও ঔদক (মীন কূর্ম্মাদি) মাংসরস সেবন অতীব হিতকর। হেমন্ত ও শীত উভয়েরই প্রতিপাল্য নিয়ম এক-রূপ, সুতরাং মিশ্রণ ভাবেই বলা হইবে।

হেমন্তকালে মুক্ত বায়ুসেবন, অল্পা-হার এবং সজল শক্তু (ছাতু) সেবন বর্জ্জনীয়।

হেমন্ত অপেক্ষা শীত ঋতুতে আদান কাল জন্য রৌক্ষ ও মেঘ মারুতবর্ষা-জাত শৈত্য অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, অত-এব হেমন্ত ও শীত ঋতুর প্রতিপাল্য বিষয় তুল্য হইলেও শীত ঋতুতে বিশেষ-রূপে অর্থাৎ অধিকতর নিবাতস্থান ও উষ্ণ গৃহ প্রভৃতি সেবন এবং কটু তিক্ত কষায়, বাতল ও শীতল অন্নপান বর্জ্জন করা উচিত।

এই কালে শীতল অনিল সংস্পর্শে রোমকূপ সমুদায় সঙ্কুচিত হয়, দৈহিক উষ্মা সম্যক্ নিঃসৃত হইতে না পারিয়া কোষ্ঠাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে বলবান্ করে। এই ঋতুতে রাত্রিমান অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং প্রাতঃ-কালেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মলোৎসর্গ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রৌদ্রে উপবেশন করিয়া মস্তকা-দিতে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে। লোধ্র প্রভৃতির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা শরীরের অভ্যক্ত তৈল ধৌত করিয়া অবগাহন স্নান করিবে। শরীর অবগাহন স্নানের অযোগ্য হইলে, উষ্ণ-জল শীতল করিয়া তাহাতে স্নান করা বিধেয়। স্নানান্তে শরীরে কস্তূরী ও চন্দন প্রভৃতি বিলেপন করিয়া অগুরু কাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিবে। স্বাদু, অম্ল ও লবণ রস ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য মেদস্বী পশুর মাংস, গুড়জাত মদ্য, প্রসন্নাসুরা, গোধূম-চূর্ণ, ইক্ষু গুড়াদি ও দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা ও তিলতৈল সেবন আবশ্যক ও হিত-কর। রাত্রিতে উষ্ণ জল পান ও উষ্ণ জল দ্বারা পাদ প্রক্ষালনাদি অতীব হিতকর। পশুলোম নির্ম্মিত কম্বল, বনাত, গালিচা, দুলিচা, পট্টবস্ত্র ও শাটিন

প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার বিধেয়। উপযুক্ত-রূপ রৌদ্রসেবা, স্বেদ গ্রহণ ও পাদত্রাণ (জুতা, মোজা) ব্যবহার করা উচিত।

হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ভাভি বীধিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাং স্ততঃ প্রকুরুতে বহুন্॥

হেমন্তকালে শৈত্য সংযোগে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। বসন্তকালে ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মা সূর্য্যের প্রখর কিরণে পরিচালিত হইয়া কায়স্থ অগ্নিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে, সুতরাং বসন্তকালে মনুষ্যদিগের নানাবিধ শ্লৈষ্মিকপীড়া জন্মে। বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বসন্তকালে সর্দ্দি, কাসি, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি কতক গুলি শ্লৈষ্মিক রোগ বাহুল্যরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে।

আজ কাল আবার "ইনফ্লুয়েঞ্জা" রোগ লইয়া এদেশে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ আবার সুরে সুর মিলাইয়া অমনি বলিতেছেন—ইহা নূতন আমাদের দেশে ছিলনা, বেদে নাই, শাস্ত্রে নাই, ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ঐ সমুদায় লোকের এতই ভ্রম, এতই অদূরদর্শিতা যে, একবার দেখেন না বা দেখিতে ইচ্ছা করেন না যে—আমাদের ভারত ভাণ্ডারে কোন্ বস্তু নাই, শাস্ত্র কল্পতরু কোন্ ফল দানে বিরত। নাই, এমন কিছুই নাই, চিনিয়া লইতে পারিলেই হয়। আধুনিক শাস্ত্রের ন্যায় বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র কোনরূপ অভাবগ্রস্ত বা পরিবৃত্তি সহ নহে।

"ইনফ্লুয়েঞ্জা" নূতন পীড়া নহে, জ্বর বিজ্ঞান প্রবন্ধটী দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর মাত্র। এবং সেই জন্যই বসন্তকালে বহুল ভাবে সংঘটিত হয়। এই পীড়াটী সংক্রামক, এক জনের হইলে সেই বাটীর অপর সকলেরও হইতে দেখা যায়। বসন্ত প্রারম্ভেই ইহার প্রাদুর্ভাব, কারণ ঐ সময়ে দিবসে সূর্য্যকিরণ প্রখর হয়, রাত্রিতে আবার বিলক্ষণ শীত অনুভূত হয় সুতরাং নানাবিধ শ্লৈষ্মিক পীড়া জন্মে। এই সময়ে ঋতুচর্য্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিলে, জ্বর, বিসূচিকা ও বসন্ত প্রভৃতি বসন্ত সম্ভূত পীড়ার দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, সাধারণে ঋতুচর্য্যার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া রোগের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিবেন।

বসন্তকালে কফ নাশক ক্রিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ নস্য, লঘু ও রুক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, গাত্রমার্জ্জন ও পরস্পর পাদাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ কফকে জয় করিবে। স্নানান্তে কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর ও চন্দনাদি লেপন করিবে। যব, গোধূম ও শূলপক্ক জাঙ্গল মাংস প্রভৃতি সেবন করা বিধেয়। বসন্ত ঋতুতে শুণ্ঠী, মুস্তক ও চন্দনাদি দ্রব্যের ক্বাথ এবং অল্প মধু মিশ্রিত জল পান করা উচিত। মলয় সমীরণে সুশীতল, চতুর্দ্দিকে জল প্রণালী পরিবেষ্টিত, মণি বেদিকা বিরাজিত, কোকিল কলরব মুখরীকৃত, রমণ ভূমি বিভূষিত ও বিবিধ বসন্ত পুষ্প শোভিত সৌন্দর্য্যময় উপবনে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ প্রমোদ জনক বাক্যালাপে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহন করিবে। দোষ রহিত—আসব, অরিষ্ট ও অল্প মদ্যপান হিতকর। বসন্তকালে গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, অম্ল, মিষ্ট এবং দিবানিদ্রা বর্জ্জন করা বিধেয়।

মন্থুখৈ র্জগতঃ সারং গ্রীষ্মে পেপীয়তে রবিঃ।
স্বাদু শীতং দ্রবং স্নিগ্ধ মন্ন-পানং তদা হিতম্॥

গ্রীষ্মকালে—সূর্য্য প্রখর কিরণ সমূহ দ্বারা জগতের রস শোষণ করে, এই সময়ে স্বাদু শীতল দ্রব্য এবং স্নিগ্ধ অন্ন পানাদি শরীরের পক্ষে হিতকর। গ্রীষ্মকালে আহারাদির সুনিয়ম না করিলে জীবসমুদায় ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে। এই সময়ে শর্করাজল (চিনি কিম্বা মিছরির সরবত) মন্থ (শক্তু নির্ম্মিত পেয় বিশেষ) জাঙ্গল, মৃগ ও পক্ষি মাংস, ঘৃত ও দুগ্ধ আহার করিলে শরীর কখনই অবসন্ন হয় না। গ্রীষ্মকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি পান করা নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে বহু পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া অল্প পান করিতে হয়।

লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন এবং ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত। এই কালে দিবসে নিভৃত শীত গৃহে অবস্থান করিবে। রাত্রিতে যে গৃহে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে পারে সেই গৃহে শয়ন করা উচিত কিম্বা শরীরে চন্দন মাখিয়া প্রাসাদোপরে শয়ন করিবে। চন্দন জল সিক্ত ব্যজন অনিল সেবা করিবে। গ্রীষ্ম কালে নিকুঞ্জ কানন, শীতল জল ও কুসুম সেবন হিতকর।

ক্রমশঃ—

শারীর বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উভয়োর্মিলনং সন্ধিরস্থ্নোঃ স দ্বিবিধো মতঃ।
চেষ্টাবান্ স্থিরসন্ধিশ্চ চেষ্টাবাংশ্চ পুনর্দ্বিধা॥
সম্যক্ চেষ্টোহল্পচেষ্টশ্চ তরণাস্থিভি রাদিমঃ।
সংবৃতঃ কলয়া স্নেহ-স্রাবিণ্যা চ সমাবৃতঃ॥

উভয় অস্থির পরস্পর সংযোগ স্থানকে সন্ধি বলে। ঐ অস্থি সংযোগ বা সন্ধি দুই প্রকার চেষ্টাবান্ সন্ধি ও স্থির সন্ধি, চেষ্টাবান্ সন্ধি আবার দুই প্রকার, সম্যক্চেষ্টসন্ধি ও অল্পচেষ্টসন্ধি। সম্যক্চেষ্টসন্ধি উপাস্থি সংযুক্ত ও স্নেহ স্রবণশীল কলা অর্থাৎ ঝিল্লী দ্বারা সমন্তাৎ আবৃত থাকে। শেষোক্ত অল্প চেষ্টসন্ধি উপাস্থি লিপ্ত বা রজ্জুসমাবৃত অস্থি প্রান্ত দ্বারা নির্ম্মিত।

অস্থিপ্রান্তৈঃ কৃতোঽন্ত্যশ্চ স্থিরস্তু কেবলাস্থিভিঃ॥

স্থির সন্ধি সমস্ত কেবল পরস্পর অস্থিপ্রান্ত দ্বারা নির্ম্মিত। শাখা (হস্ত পদ) চতুষ্টয়ে, হনুদ্বয়ে, কটিতে, উর্দ্ধ কশেরুকাদ্বয়ে ও জত্রুতে সম্যক্চেষ্ট সন্ধি বিদ্যমান আছে। অবশিষ্ট কশেরুকা সমুদায়ে অল্পচেষ্ট সন্ধি। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় সন্ধি স্থির সন্ধি।

অস্থ্নাংতু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশী স্নায়ু শিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

এস্থলে কেবলমাত্র অস্থি সন্ধিই উল্লিখিত হইল, পেশী, স্নায়ু ও শিরা সকলের সন্ধি সংখ্যা করিতে পারা যায় না।

এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধাঃ, কোরোদূখল সামুদ্গ
প্রতর তুন্নসেবনী বায়স তুণ্ড মণ্ডল শঙ্খাবর্ত্তাঃ।

উল্লিখিত সন্ধি সমুদায় আটভাগে বিভক্ত যথা,—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্ন সেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত।

তেষামঙ্গুলি মণিবন্ধ গুল্ফ জানুকূর্পরেষু
কোরাঃ সন্ধয়ঃ।

তন্মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পরের সন্ধিকে কোর সন্ধি বলা হয়।

কক্ষা বঙ্ক্ষণ দশনেষূদূখলাঃ।

কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দশনে উদূখল নামক সন্ধি অবস্থিত।

অংশ পীঠ গুদ ভগ নিতম্বেষু সামুদগাঃ।

অংশ (স্কন্ধ) পীঠ, গুদ, ভগ ও নিতম্বের সন্ধিকে সামুদ্গ সন্ধি বলে।

গ্রীবাপৃষ্ঠ বংশয়োঃ প্রতরাঃ—

গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশের সন্ধিকে প্রতর সন্ধি বলে।

শিরঃকটী কপালেষু তুন্ন সেবনী—

মস্তক কটী ও কপালে তুন্নসেবনী নামক সন্ধি অবস্থিত।

হন্বো রুভয়তস্তু বায়স তুণ্ডাঃ—

হনুর উভয়পার্শ্বে বায়সতুণ্ড নামক সন্ধি অবস্থিত।

কণ্ঠ হৃদয়ক্লোম নাড়ীষু মণ্ডলাঃ।

কণ্ঠ, হৃদয়, নেত্র ও ক্লোম নাড়ীতে যে সন্ধি আছে, নাহার নাম মণ্ডল সন্ধি।

শ্রোত্র শৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ। তেষাং নামভি রেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।

শ্রোত্র ও শৃঙ্গাটক সমুদায়ে শঙ্খাবর্ত্ত নামক সন্ধি বিদ্যমান আছে, সন্ধি সমুদায়ের আকৃতি অনুসারেই নামকরণ হইয়াছে। ক্রমশঃ—

বেগরোধের অপকারিতা।

সমুৎপন্ন রোগ শান্তির নিমিত্ত মনুষ্যের যেরূপ যত্ন করা উচিত, সেইরূপ রোগের অনুৎপত্তি বিষয়ে সাবধান থাকাও অতীব প্রয়োজন। কিরূপ উপায় সমুদায় অবলম্বন করিলে মনুষ্য সুদীর্ঘ কাল সুস্থদেহে কালযাপন করিতে পারেন এবং ঐ সমুদায় নিয়ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াই বা কি কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন, আমরা তাহা ক্রমশঃ "চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ" পাঠকদিগের অবগতির নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ধৃত করিব।

অথাতো ন বেগান্ ধারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি হস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসু বলিয়াছিলেন—অতঃপর আমরা নবেগান্ ধারণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

ন বেগান্ ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্র পুরীষয়োঃ।
ন বেতস্য ন বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষবথো র্ন চ॥
নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ॥
এতান্ ধারয়তো জাতান্ বেগান্ রোগা ভবন্তি যে।
পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার্থং তন্মে নিগদিতঃ শৃণু॥

ধীমান্ ব্যক্তি মল, মূত্র, শুক্র, বায়ু, বমি, ক্ষবথু (হাঁচি) উদ্গার, জৃম্ভা, ক্ষুধা, পিপাসা, রোদন, নিদ্রা, ও পরিশ্রমজনিত শ্বাসের বেগ উপস্থিত হইলে ধারণ অর্থাৎ প্রতিরোধ করিবে না। এই সমুদায় বেগ ধারণ করিলে যে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগ চিকিৎসা-সৌকর্য্যার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

বস্তি মেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্র নিগ্রহে॥

মূত্রবেগ ধারণ করিলে বস্তি ও লিঙ্গে বেদনা হয়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শিরঃশূল উপস্থিত হয়, মূত্রবেগ উপস্থিত হইলে কোয়াইয়া পড়িতে থাকে এবং কুচকিতে কর্ষণ, (টানিয়া ধরা) ও আনাহ রোগ (মল

মূত্র রুদ্ধ হইয়া উদর ফুলিয়া উঠা) উপস্থিত হয়। মূত্রবেগ ধারণ জনিত উল্লিখিত পীড়া উপস্থিত হইলে, স্বেদ, অবগাহন, অভ্যঙ্গ ও বায়ুর অনলোমন ঘৃত মর্দ্দনাদি ক্রিয়া করিবে। বস্তিদেশে স্বেদ, অবগাহন স্নান, তৈলাভ্যঙ্গ অর্থাৎ বস্তি প্রভৃতি সমস্ত শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন এবং মূত্রাশয়ে পুরাতন ঘৃত অল্প অল্প জলের সহিত মালিশ করিবে।

পক্কাশয় শিরঃশূলং বাত বর্চ্চো নিরোধনম্।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনাধ্মানং পুরীষে স্যাদ্ বিধারিতে॥

পুরীষ (মল) বেগ ধারণ করিলে পক্কাশয়ে শূল-বেদনা, মস্তকে বেদনা, বায়ু ও মল রোধ, পিণ্ডিকা অর্থাৎ পায়ের ডিমে বেদনা এবং আধ্মান (উদর স্ফীতি) প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হয়। পক্কাশয়ে স্বেদ, তৈল মর্দ্দন, অবগাহন স্নান, বর্ত্তি প্রয়োগ, বস্তি কার্য্য, বাতানুলোমক ঔষধ ও অন্ন পান দ্বারা উহা প্রশমিত হয়। ভারতবাসীদিগকে অনেক সময় আলস্য পরবশ হইয়া এইরূপ অপরাধ করিতে দেখা যায়, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত এইরূপ অনিয়ম অধিক দেখা যায়।

সঞ্জাত শুক্রবেগ ধারণ করিলে উপস্থ এবং কোষে তীব্র বেদনা, অঙ্গ মর্দ্দ, হৃদয়ে বেদনা ও মূত্ররোধ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ঐরূপ অবস্থায় তৈল মর্দ্দন, সজল মদিরা পান, কুক্কুটমাংস সেবন, রক্ত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন, দুগ্ধ পান, নিরূহ ও মৈথুন হিতকর।

বায়ুবেগ ধারণ করিলে বাত, মূত্র ও পুরীষের বদ্ধতা, আধ্মান, ক্লান্তি, উদরে বেদনা ও অন্যান্য বাতজ রোগ উপস্থিত হয়।

বায়ুবেগ ধারণ জনিত রোগে স্বেদ ও বাতানুলোমক পান ভোজন এবং বস্তি কর্ম্ম হিতকর।

উদীর্ণ বমন বেগ প্রতিরোধ করিলে গাত্রে কণ্ডূ, বোলতা কামড়ানের ন্যায় গোলাকার চিহ্নোৎপত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গ (মুখে মেচেতা পড়া), শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, হৃল্লাস (বমন বেগ বোধ) এবং বিসর্প রোগ জন্মে। উল্লিখিত রোগ সমুদায়ে প্রথমতঃ ভোজন করিয়া বমন, আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধিপূর্ব্বক ধূমপান, লঙ্ঘন, রক্ত মোক্ষণ, রূক্ষ অন্নপান, ব্যায়াম এবং বিরেচন হিতকর।

হাঁচির বেগ রোধ করিলে মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবার পশ্চাদ্দিকস্থ শিরা বেদনা), শিরঃশূল, অর্দ্দিত, অর্দ্ধাবভেদক (আধ্-কপালে মাথা ধরা) ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

ক্ষবথু নিরোধ জন্য পীড়ায় তৈল মর্দ্দন, বায়ুর অনুলোমক ঘৃতান্ন ভোজন, স্বেদ, ধূমপান এবং নস্য গ্রহণ উপকারী।

উদ্গার বেগ রুদ্ধ হইলে, হিক্কা, শ্বাস, অরুচি, কম্প, এবং হৃদয়ে শ্লেষ্ম-বসার ন্যায় বোধ হয়। ইহাতে হিক্কা রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

জৃম্ভার বেগ রোধ করিলে বিনাম (কোয়াইয়া প্রস্রাব পড়া), আক্ষেপ, সঙ্কোচ, স্পর্শানভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোন বস্তু স্পর্শ করিলে শৈত্য বা উষ্ণতা বোধ হয় না, শীত বোধ এবং হস্ত পদাদির কম্পন উপস্থিত হয়। এইরূপ পীড়ায় বাতানু-লোমক ঔষধ হিতকর।

ক্ষুধার বেগ ধারণ করিলে, শরীরের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, বৈবর্ণ্য, অঙ্গ মর্দ্দ (হাত পা কামড়ান) এবং ভ্রম প্রভৃতি

উপস্থিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ লঘু ভোজন ইহাতে উপকারী।

পিপাসা নিগ্রহে কণ্ঠ ও আস্যের শোষ (শুকাইয়া যাওয়া), শ্রবণ শক্তির হ্রাস, শ্রমবোধ, শ্বাস ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি পীড়া জন্মে। ইহাতে শীতল পানাহার হিতকর।

রোদনবেগ রোধ করিলে প্রতিশ্যায় (মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব), চক্ষু-রোগ, হৃদ্রোগ, অরুচি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। ইহাতে নিদ্রা, মদ্য ও হিত কথা উপকারক।

নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে জৃম্ভা (হাই ওঠা), অঙ্গ মর্দ্দ, তন্দ্রা, শিরোরোগ এবং অক্ষি গৌরব (চক্ষু ভার বোধ) উপস্থিত হয়। নিদ্রা ও সংবাহন (গায়ে হাত বুলান) দ্বারা উহার শান্তি হয়।

সমধিক পরিশ্রম জন্য যে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে থাকে, উহা নিরুদ্ধ হইলে গুল্ম, হৃদ্রোগ, মোহ ও শ্রান্তি উপস্থিত হয়। এই পীড়ায় উত্তমরূপ বিশ্রাম, শয়ন ও বাতের অনুলোমক কার্য্য হিতকর।

ইমাংস্তু ধারয়েদ্ বেগান্ হিতৈষী প্রেত্যচেহ চ।
সাহসানা মশস্তানাং মনো বাক্কায় কর্ম্মণাম্
লোভ শোক ভয় ক্রোধ মানবেগান্ নিধারয়েৎ।
নৈর্লজ্জের্ষ্যাতি রাগাণা মভিধ্যায়াশ্চ বুদ্ধিমান্॥
পরুষস্যাতিমাত্রস্য সূচকস্যানৃতস্য চ।
বাক্যস্যাকালযুক্তস্য ধারয়েদবেগমুত্থিতম্॥
দেহপ্রবৃত্তির্যাকাচিদ্ বর্ত্ততে পরপীড়য়া।
স্ত্রীভোগ পরপীড়াদ্যা তস্য বেগান্ বিধারয়েৎ॥

বেগ ধারণ করিবে না এই প্রস্তাবে কোন্ কোন্ বেগ ধারণ করা ন্যায়সঙ্গত তাহা বলা হইতেছে।

ইহ পরকালে যিনি হিত কামনা করেন, তিনি অনুচিত সাহস, অনুচিত বাক্য এবং অনুচিত কার্য্যের বেগ ধারণ করিবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, মান, পরনিন্দা, নির্লজ্জতা, ঈর্ষ্যা, অতিরাগ এবং পরধন লোভের সমুপস্থিত বেগেরও নিগ্রহ করিবেন। অতি নিষ্ঠুর, মিথ্যা ও সময়ানুচিত বাক্যের বেগ ধারণ করা সঙ্গত এবং পরপীড়াজনক দেহ প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরস্ত্রী সংসর্গ, পরদ্রব্য অপহরণ ও পরহিংসা প্রভৃতি অতি যত্নপূর্ব্বক সকলেরই নিগ্রহ করা উচিত।

পুণ্যশব্দো বিপাপাত্মা মনোবাক্ কায়কর্ম্মণাম্।
ধর্ম্মার্থ কামান্ পুরুষঃ সুখী ভুঙ্‌ক্তে চিনোতি চ।

যে মহাত্মা মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্ম্মে নিষ্পাপ, তিনিই পুণ্য-কীর্ত্তি ও সুখী এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সঞ্চয় করেন।

ব্যায়াম।

শরীর চেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহব্যায়াম সংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ॥

যে শরীর চেষ্টা দেহের ইষ্ট ফল বিধান করে, স্থৈর্য্য সম্পাদন করে ও বলবর্দ্ধন করে, তাহাকে ব্যায়াম বলে। নিয়মিত-রূপে ও শক্তি অনুসারে ব্যায়াম করাই সঙ্গত।

ব্যায়াম এখন একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাড়াইয়াছে, সুতরাং অদ্য আমরা আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ব্যায়ামের উপ-কারিতা ও অপকারিতা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন করিতেছি। বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামা দুপজায়তে॥

ব্যায়াম দ্বারা মনুষ্যের শরীরের লঘুতা, কর্ম্ম সামর্থ্য, শারীরের স্থিরতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, প্রকুপিত দোষ অর্থাৎ বাতপিত্তাদির সমতা এবং পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি এই কয়েকটী গুণ জন্মে।

শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয় স্তৃষ্ণা রক্তপিত্তং প্রতামকঃ।
অতি ব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে॥

অনিয়মিতরূপে অতিশয় ব্যায়াম করিলে শ্রম, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দৃষ্টিশক্তির অল্পতা জন্মে।

ব্যায়াম হাস্য ভাষ্যাধ্ব গ্রাম্যধর্ম্ম প্রজাগরান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রয়া॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যায়াম, হাস্য বাক্য কথন, পথ ভ্রমণ, স্ত্রী সংসর্গ ও রাত্রি জাগরণ অভ্যাস থাকিলেও অতি মাত্রায় সেবন করিবেন না।

এতানেবংবিধাংশ্চান্যান্ যোঽতি মাত্রং নিষেবতে।
গজঃ সিংহ মিবাকর্ষণ্ সহসা স বিনশ্যতি॥

উল্লিখিত বিষয় সমস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয় যে ব্যক্তি অতিমাত্রায় সেবন করেন, তিনি সিংহাকর্ষণকারী গজের ন্যায় সহসা বিনাশ প্রাপ্ত হন।

উল্লিখিত এবং অপরাপর যে কোন অভ্যস্ত বিষয় সহসা ত্যাগ বা আরম্ভ করিলে অতিশয় বিপদে পড়িতে হয়, সুতরাং সুধিগণ অহিত বিষয় ক্রমশঃ ত্যাগ করিবেন এবং হিত বিষয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেন। ক্রমশঃ শব্দের অর্থ চতুর্থাংশ, অর্থাৎ সিকি পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হয়।

পরিভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্রব্যের মাত্রা।

স্থিতির্নাস্ত্যেব মাত্রায়াঃ কালমগ্নিং বলংবয়ঃ।
প্রকৃতিং দেশদোষৌচ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রকল্পয়েৎ॥
নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাল্পাম্বু মহানলম্।
দোষবচ্চাতি মাত্রং স্যাৎ শস্য মত্যুদকং যথা॥
মাত্রয়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
দ্রব্যাণা মতি যোগাচ্চ ব্যাপৎ সংজায়তে ধ্রুবম্॥

ঔষধের মাত্রা কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই, দেশ, কাল, বয়ঃক্রম, অগ্নি ও পীড়া বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হইবে। যেরূপ অল্প পরিমিত জল প্রবল অগ্নি নির্ব্বাণে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ঔষধের মাত্রা অল্প হইলেও ব্যাধি নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হয় না এবং যেমন অত্যন্ত অধিক জল দ্বারা শস্য নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

দ্রব্য প্রতিনিধি।

কদাচিদ্ দ্রব্য মেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্তদ্‌গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে॥
মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মতঃ।
পুরাতন গুড়াভাবে রৌদ্রে যাম চতুষ্টয়ম্॥
সংশোষ্য নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতন গুড়ৈষিণা।
ক্ষীরাভাবে ভবেন্ মৌদ্‌গো যূষো মাষুর এব বা॥
সিতাভাবে চ খণ্ডঃ স্যাৎ শাল্যভাবে চ ষষ্টিকঃ।
অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গাম্ভারী ফলমিষ্যতে॥
ন ভবেদ্দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ।
সৌরাষ্ট্র মৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্পটী॥
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে সিহলী জটা।
প্রয়োগে যত্র লৌহঃস্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ॥
সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ সহি সিদ্ধার্থ উচ্যতে।
তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যঃ সর্ষপো মতঃ॥

চবিকা গজ পিপ্পল্যো পিপ্পলী মূলবৎ স্মৃতে।
অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে॥
নিত্যং মুঞ্জতিকাভাবে তালমস্তক মিষ্যতে।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবে তু নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্‌বরৈঃ॥
মুক্তাভাবে শুক্তি চূর্ণং বজ্রে বৈক্রান্ত মিষ্যতে।
ধান্যকাভাবতো দদ্যাৎ শতপুষ্পাং ভিষগ্‌ বরঃ॥
বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
স্বর্ণ মথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে॥
তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে॥
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ।
পুষ্পাভাবে ফলঞ্চামং বেড়্ ভেদে বিল্বতঃ ফলম্॥
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দন মিষ্যতে।
রাস্নাভাবে চ বন্দাকো জীরাভাবে চ ধান্যকম্॥
কর্পূরস্যাপ্যভাবেঽপি সুগন্ধং মুস্ত মিষ্যতে।
রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বী ক্কাথং প্রযোজয়েৎ।
মেদোঽভাবেঽশ্বগন্ধা স্যান্মহামেদে তু সারিবা॥
জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী চ বিদারিকা॥
ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।
কাকোলী যুগলাভাবে নিক্ষিপেচ্চ শতাবরীম্॥
দেয়া মৃগমদাভাবে পূতিকা তদ্‌গুণা বুধৈঃ।
রোহিতকত্বচোঽভাবে পিচুমর্দ্দস্য গৃহ্যতে॥
কপোতং সর্ব্বমাংসানাং তুল্যং গুণকরং স্মৃতম্।
মাংস ক্কাথাপরিপ্রাপ্তৌ যূষো মৌদ্‌গঃ প্রদীয়তে॥
ধেন্বাঃ প্ররূঢ়বৎসায়াঃ ক্ষীরং কৃৎস্নপয়োগুণম্।
যত্র যদ্দ্রব্য মপ্রাপ্তং ভেষজে পর পূর্ব্বতঃ॥
গ্রাহ্যং তদ্‌গুণ সাম্যাত্তু ন তত্র কাপি দূষণম্।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় কতকগুলি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আর কতকগুলি দ্রব্য গৃহীত হইয়া থাকে। এস্থলে যে দ্রব্যের পরিবর্ত্তে যাহা গ্রহণ করিতে হয় তাহা বলা হইবে। পরিবর্ত্ত শব্দের অর্থ অভাব অর্থাৎ যেস্থলে কোন বস্তু একেবারে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইস্থলে তদ্‌গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য লইতে হয়, সম্ভবসত্ত্বে কোন-মতেই প্রতিনিধি দ্রব্য লওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাতে গুণের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মধু অভাবে পুরাতন গুড়, তদভাবে নূতন গুড় তাম্রপাত্রে রৌদ্রে ৪ প্রহর শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুদ্গ বা মসুরের যূষ, চিনির পরিবর্ত্তে খাড়, শালীর অভাবে ষষ্টিক ধান্য, দ্রাক্ষা অভাবে বৃক্ষাম্ল, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে পক্ক পর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে সিউলিছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডূর, শ্বেতসর্ষপ অভাবে সামান্য সর্ষপ, চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপ্পলী মূল, চাকুলিয়ার অভাবে শালপাণি, মুঞ্জতিকাভাবে তালের মেথী, কুঙ্কুমাভাবে হরিদ্রা, মুক্তাভাবে ঝিণুক ভস্ম, হীরক অভাবে বৈক্রান্ত, ধনিয়া অভাবে শুল্‌ফা, বারাহীকন্দাভাবে চামার আলু, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ, পৌষ্করমূলে কুড়, সৈন্ধবের পরিবর্ত্তে সামুদ্র বা বিট্‌লবণ, পুষ্পের অভাবে কচিফল, উদরাময়ে বিল্বের ফল, ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন, রাস্নার পরিবর্ত্তে বাঁদরা, জীরার অভাবে ধনিয়া, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুস্তক, রসোতের পরিবর্ত্তে দারুহরিদ্রার ক্কাথ, মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষ চাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর পরিবর্ত্তে শতমূলী, মৃগনাভির অভাবে খাটাশী, রোহিতক ছালের পরিবর্ত্তে নিমছাল, সকল মাংসের স্থলে কপোত মাংস, মাংস ক্কাথের অভাবে মুদ্গযূষ, এবং যাবতীয় দুগ্ধের স্থলে প্ররূঢ় বৎসা ধেনুর দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কোন ঔষধের তালিকা লিখিত দ্রব্য

সমূহের কোন দ্রব্যের অভাব হইলে, তদ্‌গুণ বিশিষ্ট পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে।

ভৈষজ্য বিজ্ঞান।

সূতিকা জ্বরে—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটিমূল, গন্ধভাদুলের মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা মিলিত ২ তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক তিন আনা একরতি লইয়া জলে ধৌত ও ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিবে ও অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে দাহ প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সূতিকা জ্বর প্রশমিত হয়। ইহার নাম সূতিকা দশমূল পাঁচন। বহুস্থলে ইহার স্থায়ী ফল দেখা গিয়াছে।

অশোক।



অশোক বৃক্ষটী দেখিতে যেরূপ সুন্দর, উহার গুণও তদ্রূপ সুন্দর। বোধ হয় অশোকের উপকারিতায় মুগ্ধ হইয়াই অশোকাষ্টমী ও দুর্গোৎসব প্রভৃতির সময় অশোকের পূজা করা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় অশোকের পুষ্প লোহিতবর্ণ ও এক জাতীয়ের পুষ্প মিশ্রিত শ্বেত লোহিতবর্ণ।

অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট এই সমুদায় অশোকের পর্য্যায়।

গুণ—শীতল, তিক্ত, গ্রাহী, বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, কষায় ও দোষঘ্ন। ইহা ব্যবহারে অপচী, তৃষ্ণা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষজপীড়া ও রক্তদোষ নিবারিত হয়। ইহার মূলের ত্বক্ অভাবে ত্বক্ ব্যবহার্য্য। চূর্ণের মাত্রা ১ মাষা।

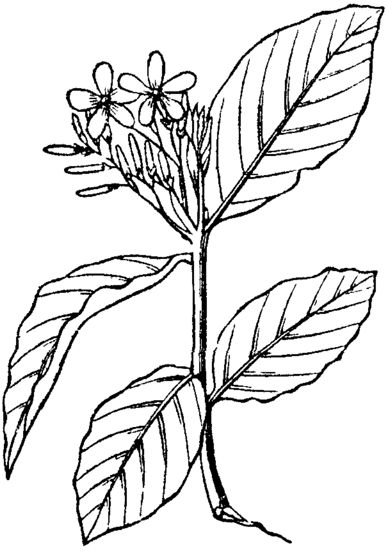
অশোকমূলের ছাল ২ তোলা, দুগ্ধ একপোয়া ও একসের জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট অর্থাৎ এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা পানে প্রবল রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

অশোকারিষ্ট।

অশোকছাল ১২॥০ সের, ২৫৬ সের জলে জ্বাল দিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ক্বাথ ছাকিয়া তাহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া ধাইফুল ২ সের, জীরা, মুতা, শুণ্ঠী, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপল মূল, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, আমের আঁটির শাঁস, কৃষ্ণজীরা, বাসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষেপ করিয়া

১ মাস যাবৎ ভাণ্ডে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে ছাকিয়া পরিষ্কার বোতলে রাখিয়া প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত, রক্তার্শঃ ও তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রশান্ত হয়। রক্তরোধে অশোক অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। এতদ্ভিন্ন অশোক ঘৃত প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধে অশোক ব্যবহৃত হয়।

কুড়চি।



কুটজ, কুটুজ, কোট, বৎসক, গিরি-মল্লিকা, কলিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকা পুষ্প, ইন্দ্রযব ফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুর দ্রুম—এই কয়েকটী কুটজের পর্য্যায়। কুটজের হিন্দি নাম কোরেয়া।

গুণ—ইহা কটু, রূক্ষ, অগ্নি-দীপক, কষায়, শীতল, তিক্ত ও সংগ্রাহী। অর্শঃ অতিসার ও রক্তপিত্ত রোগে ইহা প্রযোজ্য। ইহার ত্বকের মাত্রা ৩ মাষা।

রক্তামাশয়ে—কুড়চিছাল ১ তোলা ও দাড়িমের ছাল ১ তোলা অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিবে, ইহাতে রক্তামাশয় প্রশমিত হয়।

কুড়চিছাল /১ সের /৪ জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া পুনরায় ঐ ক্কাথ জ্বাল দিবে। এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ১ বা ২ তোলা, জায়ফল চূর্ণ ২ রতি সহ মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে ৪।৫ দিনের মধ্যে রক্তামাশয় প্রশমিত হয়। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় ইহা দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, নূতন অবস্থায় ইহা ব্যবহার করায় উপকার হয় না বরং অপকারই হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

অধুনিক বাঙ্গালানাটক—জনা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নায়িকার মায়াকানন। নায়িকা ও প্রবীর। নায়িকার সখীরা গাহিল, নায়িকা বচনচাতুরী প্রকাশ করিল, নিজেও গাহিল; প্রবীর কাজেই মজিল, কিন্তু নায়িকা যখন তাহাকে অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিল, তখন প্রবীর বলিল—

"রিপুজয় যতদিন না হয় সুন্দরী।
নিষেধ ত্যজিতে শরাসন,
বীর সাজ ত্যজিতে লো মানা,
কালি অরি প্রেরি হস্তিনায়
ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিব তোর পায়।
বল ধনি, তুমি তো আমার হবে?"

পাঠক! দেখিলেন, প্রবীর মুগ্ধ নহে; তাহার এখনও কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। সে অতীত বর্ত্তমান কিছুই ভুলে নাই! রতিকামের নাচ গাহনা, নায়িকার এত খেলা এখনও তেমন ফল উৎপাদন করে নাই; কেবল তাহাকে রূপের দাস, পরকীয়া রমণী ভোগেচ্ছু করিয়াছে মাত্র! তা এতটুকু করিবার জন্য রতি কামকে বা নায়িকাকে সশরীরে মর্ত্ত্যে না আনিলেও চলিত; কারণ মদনের অলক্ষিত শরসন্ধানেও এতটুকু হইয়া থাকে। তার পর নায়িকা প্রবীরকে টানিয়া লইয়া গেল। এই দৃশ্যে চারিটি গানের মধ্যে শেষ গানটি ভাল।

তৎপরে ২য় দৃশ্যে জনা ও নীলধ্বজ। নীলধ্বজ ও জনা ব্যাকুল হইয়াছেন; "বেলা দ্বিপ্রহর হইল, ছেলে কাল যুদ্ধে গিয়াছে, আজ এখনও আসিল না কেন" জনা প্রায় কাঁদিয়া বলিল—

"গেছে সেকি জাহ্নবী পূজিতে?
না-না সম্ভব ত নয়।
আমা বিনে সে কারে না জানে;
কার্য্যান্তরে রহি যদি ভোজন সময়
অন্ন নাহি খায়, মা বলে সঘনে ডাকে।
বধূরে রাখিয়ে একা আসে রজনীতে
কত ভুলাইয়ে
বাছায় পাঠাই পুনঃ শয়ন আগারে;
তবে কেন দুলাল আমার
মা বলে এলোনা ঘরে?

আমরাও জিজ্ঞাসা করি, তবে কেন দুলাল তোমার "মা বলে এলো না ঘরে?"

প্রবীর যে মাতৃভক্ত তাহার প্রমাণ এক মহাদেবের সার্টিফিকেট; এতদ্ব্যতীত (প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ ভিন্ন) প্রবীর এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে এমন কোন কার্য্য দেখান নাই, যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার মাতৃভক্তির পরিচয় পাই। বরং এই দৃশ্যে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার মাতৃভক্তির অভাবই দেখিতেছি। প্রথম রণজয়ের পর প্রবীর রণস্থল হইতে মাতার নিকট না আসিয়া রণস্থলের নিভৃত প্রদেশে চলিয়া গেল কেন? মাতৃভক্ত সন্তান রণরক্তে রঞ্জিত কলেবর হইয়া মাতার নিকট স্বীয় মুখে জয় সংবাদ দিয়া মাতার তৃপ্তি বিধান করিয়া আশীর্ব্বাদ লইতে ভুলিল কেন? বা তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল না

কেন? তখন তাহার সহিত নায়িকারও দেখা হয় নাই, রতি কামেরও দেখা হয় নাই। তবে যদি বলা যায় যে, দৈববশে প্রবীর ঐদিকে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইলে মদন রতি ও নায়িকাকে মর্ত্ত্যে আনিবার আবশ্যক কি?—দৈববশে যদি এতটা সম্ভব স্বীকার করি, তবে দৈববশে সব সারিলেই হইত। শিব, মদন, রতি, নায়িকা প্রভৃতিকে ব্যস্ত করিবার কোন আবশ্যক ছিল না।

তারপর প্রবীর বীর, প্রবীর যুবরাজ প্রবীর অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য পাত্র সেই প্রবীরের কার্য্য কি—না রাত্রে পত্নীর শয্যা ত্যাগ করিয়া মার কাছে আদর জানাইতে উঠিয়া আসেন, আর মা ভুলাইয়া আবার পাঠাইয়া দেন!—মাতৃভক্ত হইলে কি লোকে এইরূপে ন্যাকা কচিখোকা হয় নাকি? তারপর অগ্নির জনাকে প্রবোধ দান। জনা প্রসঙ্গক্রমে শিবপার্ব্বতী নিন্দা ও গঙ্গাকে প্রশংসা করিতে করিতে পুত্রান্বেষণে ছুটিল। অগ্নি একা পড়িল, বিদূষক আসিল। বিদূষক অনুরোধ করিল "তুমি দেব সর্ব্বজ্ঞ, অতএব রাজা রাণীর উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য বল, প্রবীর এখন কোথায়?" অগ্নি বলিলেন, আমি ভৈরবী মায়ায় আচ্ছন্ন দেবশক্তি হীন।" গিরিশ বাবুর হাতে পড়িয়া কোন দেবতারই আর নিস্তার নাই। অগ্নিদেবের অপরাধ যে, তিনি নীলধ্বজের জামাতা! তাই গিরিশ বাবু তাঁহার দৈবশক্তি হরণ করিয়া তাঁহার অবনতি বিধান করিয়াছেন। অগ্নির দেবত্ব নষ্ট হইয়াছিল, একথা গিরিশ বাবুর সৃষ্টি। কোথা পাইলেন? কাশীদাসে আছে, নীলধ্বজের যুদ্ধে অগ্নি অর্জ্জুনের সৈন্য দাহন আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন খাণ্ডব দাহনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নানা স্তব স্তুতি করিলে অগ্নি তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে স্বীয় তেজ হরণ করিবার উপদেশ দেন। অর্জ্জুন, উপদেশমত মহা অস্ত্র প্রয়োগে অগ্নির তেজ হরণ করেন, ইহাই শাস্ত্রীয় কথা। নতুবা শাঙ্করী মায়ায় অগ্নির দেবত্ব লোপ পৌরাণিক কথা নহে। কোন ব্যক্তি আর কখন দেবতার দেবত্ব লোপ করেন নাই। পুরাণে আছে বটে শিবরূপী বালকের দৃষ্টিতে ইন্দ্রের বজ্রক্ষেপ শক্তি নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তাহার দেবোচিত দৃষ্টি ও জ্ঞান, লোপ হইয়াছিল কি? আরও এক কথা, অগ্নিকে দিয়া যদি গিরিশ বাবু বিদূষককে শুনাইয়া দিতেন যে, প্রবীর এতক্ষণ অর্জ্জুনের হাতে মরিয়াছে (কারণ তখন বেলা দ্বিপ্রহর, আর প্রত্যুষে নায়িকা প্রবীরকে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে ও প্রাতঃকালের প্রথমেই অর্জ্জুনের হস্তে সে মরিয়াছে) তাহা হইলে কি ক্ষতি হইত বলিতে পারি না! তাহা হইলে বৃথা দেবতা অগ্নির অধঃপতন আঁকিয়া গিরিশ বাবুকে কলঙ্কগ্রস্ত হইতে হইত না।

তার পর তৃতীয় দৃশ্য—শিবিরে ভীম কৃষ্ণ উপস্থিত একজন শিবদূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, নায়িকার ছলনায় প্রবীর অস্ত্রহারা হইয়া শ্মশানে পড়িয়া আছে এবং সে নিজে "শিবের আদেশে ত্রিশূল পরশে, হরিয়াছে বল তার"—কি হইল? শিব, শক্তি হরণ করিবার জন্যইত নায়িকাকে পাঠাইয়াছিলেন, সে কি সেটুকু করিয়া উঠিতে পারে নাই, শিবের বিশ্ববিনাশী ত্রিশূলকেও আসিতে হইয়াছিল! তারপর কৃষ্ণ ভয় দেখাইলেন,

সাবধানে রক্ষাকর পুব-দ্বার,
আসে পাছে উন্মাদিনী পুত্র অন্বেষণে।
মাতা পুত্রে দেখা হলে পড়িবে প্রমাদ
মায়াবল নায়িকার তখনি টুটিবে।
মাতৃদরশনে
মাতৃভক্তি উদয় হইবে পুনঃ।
ভক্তিভাবে মাতৃ মন্ত্র জপিলে প্রবীর
শমনের অধিকার না রহিবে আর,
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর।"

"ভক্তিভাবে মাতৃমন্ত্র জপ"—কি? আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি "নমো জনায়ৈ" এই মন্ত্র নাকি? গিরিশ বাবু কি এইরূপ একটা মন্ত্রজপ করাইবার কল্পনা করিযাছেন নাকি?

তারপর শ্মশান, প্রবীর জাগরিত হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিল, সে নায়িকাও নাই, সে বনও নাই। শেষে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ আসিলেন, অর্জ্জুনের সহিত বাক্যুদ্ধ হইল! বাক্যুদ্ধে প্রবীর বেশ ফুটিয়াছে, যেমন ফুটা উচিত প্রায় তেমনি ফুটিয়াছে কিন্তু অর্জ্জুন কিছুই হয় নাই। অর্জ্জুন দেবতাগণের প্রবীর বধের মন্ত্রণা জানেন কি না, তিনি এখানে তাহাই উল্লেখ করিয়া আত্মশ্লাঘা করিলেন। ইহা বীরোচিত নহে। প্রবীর সমস্ত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন, প্রবীরের এই কথাগুলিও বেশ। তারপর প্রবীর মোহ বশতঃ যে কুকার্য্য করিয়াছে তজ্জন্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন,

"প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার
ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে
কামে মত্ত হইয়ে নিশায়!"

যে আক্ষেপটুকু করিল সেটুকু বেশ সুন্দর ও সঙ্গত। তারপর অর্জ্জুন নিরস্ত্র বীরকে অস্ত্রাদি দান করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, বৃষকেতু একগাছে উঠিয়া দূরে যেখানে যে ভাবে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন জনা রণে আসিয়াছে কি না। বৃষকেতু সংবাদ দিলেন "যমরূপী অস্ত্র দেখ জুড়িল কুমার" কিন্তু কৃষ্ণ সাহস দিয়া বলিলেন "শূন্যে হের, নন্দী অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে।" প্রবীরের উপর বিনা কারণে শিবের এতটা রাগ কেন? ছলে বলে কৌশলে প্রবীরকে মারিতে পারিলেই যেন তিনি কৃতার্থ হন, কেন? গিরীশ বাবু শিবের ভক্তবৎসলতা এইরূপে দেখাইতে চাহেন নাকি? ভক্ত অনুচর বহুদিন সঙ্গ ছাড়া, তাই তাহাকে যে উপায়ে পারা যায়, নিকটে আনিতে হইবে, ইহাই কি আশুতোষের চিত্র? তারপর বৃষকেতু সংবাদ দিল "উল্কা প্রায় আসে দ্রুতবেগে, নারী হেন হয় অনুমান!"

কৃষ্ণ শুনিয়াই মাথা বুক চাপ্ড়াইয়া উঠিলেনঃ—

"সঙ্কট পড়িল আজি অর্জ্জুনে লইয়ে
মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর
শিব বল ফিরিবে আবার।
কত দূরে নেহার ভীষণা?"

এই কথার পরই অর্জ্জুন ও প্রবীর যুদ্ধ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল, প্রবীর পড়িল। অর্জ্জুন প্রবীরকে জীবিত দেখিয়া বলিলেন,—

"হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায়?
আহা! বীরশ্রেষ্ঠ রণীন্দ্র প্রবীর!"

অর্জ্জুনের একটু মনুষত্ব একটু বীরোচিত দয়া দেখিলাম কিন্তু পূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ এই স্থানে গিরীশ বাবুর হাতে পড়িয়া কেমন দাঁড়াইয়াছেন দেখুন!"

"খেদ কর শিবিরে যাইয়া,
আসে জনা উন্মাদিনী
পুত্রবধ করেছ কৌশলে
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণ
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল।"

শ্রীকৃষ্ণের কি বিশ্বাস যে, শিবির মধ্যে গেলে আর জনার শাপ ফলিবে না? প্রবীর এইবার মরিল।

তার পর জনা আসিয়া কাঁদিল, দারুণ শোকে মূর্চ্ছা গেল না! মদনমুঞ্জরী আসিয়া দেখিল, দেখিয়াই মূর্চ্ছা গেল। তারপর জনা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাতে পুত্রের বিয়োগ জনিত শোকের আকুলতা নাই, কেবল প্রতিহিংসার কথা! জনা কি মমতাবতী নহে? বীরনারীর হৃদয়ে পুত্রস্নেহ থাকিলে তাহার বীরগৌরব নষ্ট হয় নাকি? বীরনারীর কি পুত্রশোক লাগে না? বীরনারী কি কেবলই প্রতিহিংসা-পরায়ণা হইলেই সুচিত্রিতা হয়?

তার পর মদন মুঞ্জরীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তিনি একটু কাঁদিলেন, কাঁদিয়া বলিলেন

"আজি এ শ্মশান পুনঃ বাসর আমার
বিবাহের দিনে
পতি প্রদক্ষিণ করেছিনু সাতবার
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে,
পদে করি নমস্কার।
করয়ে মঙ্গল ধ্বনি শকুনি গৃধিনী,
চিতাভস্ম ছড়াও পবন
মাঙ্গলিক ফুল সম।
শিবাগণে করয়ে আনন্দ ধ্বনি।"

তার পর আবার পড়িল আর মরিল।

আমরা বলি এ কি হইল? পতিব্রতা প্রমদা স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়া যদি মূর্চ্ছিতা হয়, তবে হয় সেই মূর্চ্ছা ভঙ্গে পাগলিনী হয়, নহে মারা পড়ে; কিন্তু এরূপে একবার মরিয়া উঠিয়া ছড়া কাটাইয়া আবার মরে না। বুঝি "গিরীশ বাবুর এই উপমা গুলি বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, তাই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মদনমুঞ্জরীকে বাঁচাইয়াছেন, তাহার মুখ দিয়া এই গুলি বলাইয়াছেন, আর যেই বলা শেষ হইল, অমনি আবার তাহাকে মারিয়াছেন।"

তার পর

"জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে।"

জনা কি পুত্রঘাতীর প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিতে চলিল!

ভীষণ জনা দেখিয়া কৃষ্ণও ইতি পূর্ব্বে বিচলিত হইয়াছেন, এখন উন্মাদিনী বামার ভয়ঙ্করী ছবি গিরিশ বাবুর অন্তরে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাকেও বুঝি বিভ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে! নহিলে তিনি যে উন্মাদিনী চিন্তাবলে অপূর্ব্ব চিত্র আকিবেন, শব্দের অর্থ পর্য্যন্ত বিকৃত করিবেন, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি! "প্রতিবিধিৎসা" অর্থে 'প্রতিবিধানের ইচ্ছা,' "প্রতিবিধিৎসিতে" অর্থে 'প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতে'—সুতরাং ইহা হইতে 'প্রতিবিধান করিতে' বা 'প্রতিশোধ দিতে এরূপ কোন অর্থ (যাহা গিরীশ বাবুর ইচ্ছা) হয় না। যাহা হউক অবশেষে জনা পুত্রহন্তাকে প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেল। যাত্রারদলে মৃতদেহ সরাইবার জন্য যেরূপ ভূত পাঠাইয়া ছেলে কাঁদাইয়া মেয়ে হাসাইয়া আসর জমান রীতি

আছে, সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে নব্য রঙ্গভূমিতে ভৈরবগণ আসিয়া নাচিল, গাহিল। শেষে দুই দেহ গঙ্গায় ফেলিয়া চলিয়া গেল।

তার পর চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্যে বৃষকেতু ও শ্রীকৃষ্ণ জনার কথা, যুদ্ধের কথা, যদুবংশ বৃদ্ধির কথা কহিতেছেন, এমন সময় দূত আসিয়া সংবাদ দিল

"চামুণ্ডারূপিণী
বসিলা অশ্বথ তরুমূলে
আচম্বিতে উঠিল গর্জ্জিয়ে
অর্জ্জুন বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস
শুকালো প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস অনলে।"

জনার নিশ্বাসের তেজ এত যে "প্রবীণ বৃক্ষও তাহার প্রবল শ্বাস অনলে শুকাইয়া যায় জনার নিজের মুখ ও নাসিকা অবিকৃত ছিল কি?

তার পর দ্বিতীয় দৃশ্যে বিদূষকের ও তাহার পত্নীর কথা। বিদূষক, গ্রাম্য-দেবতা লইয়া দীঘীর জলে ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ দেবতা পূজায় হরিদর্শন মিলে, অতএব তাহা বন্ধ করা উচিত। এখন ব্রাহ্মণীর ইতুভাঁড় কয়টি ফেলিতে পারিলেই হয়। এই লইয়া দুই স্ত্রী পুরুষে কথা কাটাকাটি বিদূষক ভাড় ছাড়িয়া দিল।

পর দৃশ্যে নীলধ্বজ পুত্রশোকে অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন। অগ্নি বুঝাইতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুন আসিয়া আতিথ্য ও সখ্য স্বীকার করিলেন। রাজা আনন্দোৎসবের আদেশ দিলেন। বিদূষক আসিল, বিদূষক এই দৃশ্যে বেশ ফুটিয়াছে। তার পর জনা আসিল। পুত্রহন্তার অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিয়া সে জলিয়া উঠিল। রাজাকে কতকগুলি গালাগালি দিল, শেষে চলিয়া গেল; বলিয়া গেল;—

"যাই রাজা কাল বয়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।"

রাজা বলিলেন "বৈশ্বানর ফিরাও রাজ্ঞীরে।"

অগ্নি বলিল—আমার কর্ম্ম নয়। তুমি এখন হরিদর্শনে চল। ও না ম'লে আর ওর নিস্তার নাই।

তার পর দৃশ্যে অর্জ্জুনাদির অভ্যর্থনা। অভ্যর্থনার আয়োজন মধ্যে একদল ব্রজগোপবালকবেশী কৃষ্ণলীলা গাহিয়া গাহিয়া পথে বেড়াইতেছিল। প্রথম গানটি বেশ। তার পর শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে লক্ষ্য করিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন—"

চল বাজা, মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম
দিবে চল মিষ্টান্নের হাঁড়ি।"

সকলে চলিয়া গেল। বালকেরা গাহিলঃ—

"ঘরে কি নাইক নবনী

*   *   *   *   *

ওরে পথে জুজু আছে বসে যেওনা যাদুমণি।"

শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছেন, আর যশোদা ব্রজধামে নবনী লইয়া "হাকৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেছে, এই বিষয়টি শ্লেষালঙ্কারে সাজাইয়া গিরীশ বাবু গানটি বাঁধিয়াছেন, কিন্তু "জুজুরভয়" দেখাইয়া ভাল করিয়াছেন কি?

তার পর প্রান্তরে পাগলিনী জনা সঙ্গে স্বাহা। পুত্র-শোকাতুরাপাগলিনীকে নীলধ্বজ প্রান্তরে ঘুরিতে দিলেন কেন? আবার সঙ্গে স্বাহাই বা কেন? রাজ-রাণীকে কি আট্‌কাইবার বা দেখিবার

লোক নাই? এখানেও জনা যাইবার সময়ে বলিয়া গেল "দূরে দূরে চল ত্বরা পুত্র-শোকাতুরা।'—তবু কেহ ধরিল না, কোথায় গেল কেহ জানিল না!

তারপর পঞ্চম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে শুষ্ক তরুতল। বিদূষক ও ব্রাহ্মণী আসিল, বিদূষকের পদরজ স্পর্শে শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, বিদূষক হরিদর্শন পাইয়া মুক্ত হইল, তাহার বাসনা পূরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-ধামে রাধাদামোদর মূর্ত্তি তাহাকে দেখাই-লেন। এখানে বিদূষক অতি উজ্জ্বল। তবে এখানে যতটা ন্যাকামী করিয়াছে, ততটা যদি গোড়া হইতে করিয়া আসিত, তাহা হইলে ভাল হইত, বিদূষক বেশ ফুটিত। পর দৃশ্যে রাজার নিকট অগ্নি বিদায় লইতে আসিয়াছেন। রাজা একস্থানে বলিলেন

"কহ অগ্নি, অভাগিনী জনা
গোবিন্দ পদারবিন্দ কেননা পাইল?

*   *   *   *   *   *

পুত্র হীনা উন্মাদিনী ধনী
স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বন পথে
রাণী হয়ে কাঙ্গালিনী।"

রাজার রাণীর উপর এতই যদি দয়া, তবে তাহাকে ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন না কেন? বা গৃহে যখন ছিল তখন আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই কেন? রাজার এই Pity করা দেখিয়া আমরাও রাজাকে Pity করিতে পারি না কি?

তারপর স্বাহা আসিয়া বিদায় চাহিল। স্বাহা বরাবর যেমন সুন্দর, এখানেও তেমনি সুন্দর আছে, কেবল এখানে তাহার মুখে "পিতা কতদিনে আর" হইতে "কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ" পর্য্যন্ত কয়েক পংক্তি দিয়া স্বাহার পিতৃগৃহ প্রিয়তা প্রকাশ না করিলে স্বাহা চিত্র নিখুঁত হইত।

তার পর গিরিশ বাবুর অপূর্ব্ব কল্পনা গঙ্গারক্ষকদ্বয় আপনা আপনি দুঃখ করিতেছে যে "গঙ্গা তাহাদের উপর এ কি অত্যাচার করিতেছেন! তাহারা অন্যান্য গঙ্গারক্ষকের মতএকটাও মানুষ মারিতে পায় না; কেবল জনাকে সাপ বাঘের মুখ হইতে বাঁচাইতেই তাহারা ব্যস্ত, আবার কাঁটাবনের পথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া দিতে হইবে।" এইখানে একটি বন্ধু বেশ কথা বলিয়া-ছিলেন, যে আহা! গঙ্গার কি স্নেহ দেখানই হইয়াছে। মা গঙ্গা ভক্তের গায়ে কাঁটার আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিতে দিতেছেন না! তারপর গঙ্গারক্ষকেরা আরও আপশোষ করিল যে, মানুষ মারিতে তো পাওযাই যায় না, তাহার পর মানুষ মনে করে গাছের দুটো ডাল ভাঙ্গবো তারও উপায় নেই; কারণ মাগী মাঠ আর বেতবন ভিন্ন চলে না! বাহবা! জনার জন্য এত বেতবনের সৃষ্টি কে করিল? আর এক কথা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে নারায়ণ পাপীর হিত কামনায় গঙ্গাভৈরবের সৃষ্টি করিয়া-ছেন আর গিরিশ বাবু গঙ্গারক্ষক নামে কতকগুলি হিংসাপরায়ণ, মানবের অহিতকারী, মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীর গ্রীবা-ভঙ্গপ্রয়াসী সুতরাং পাপী অথচ দেব-যোনি আঁকিয়াছেন! এসব চিত্র আঁকি-বার পূর্ব্বে হিন্দু নীতিশাস্ত্র, হিন্দু পুরাণ শাস্ত্র ২।১ পাত পড়া আবশ্যক, নতুবা কল্পনাবলে হিন্দুশাস্ত্রকে এ রূপে কলঙ্কিত করা গিরিশ বাবুর পক্ষে অতীব গর্হিত

হইয়াছে। তার পর জনা দেখা দিল। প্রাণের জ্বালায় কত উদ্দেশ্যহীন বচন আওড়াইল তার পর তাহার ভ্রাতা উল্মূক বুঝাইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে আসিল কিন্তু জনা অর্জ্জুন জাবিত আছে শুনিয়া ফিরিল না। তার পর গঙ্গায় জোয়ার আসিল, জনা ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল বলিয়া গেল—

তাপ হরা! হর এ দারুণ জ্বালা।

* * * * *

তোর জলে নিভাইতে স্মৃতি

* * * *

এসেছি মা বঞ্চনা ক'রনা
নন্দিনীরে নে গো কোলে।"

গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হয়ে শাপ দিলেন :—

"ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে
আর তোর নাহিক নিস্তার
শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নারিবে পামর!

* * *

ভক্ত পুত্রে করেছ নিধন
নিজ পুত্র-শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়।

তার পর অষ্টবজ্রকে বভ্রুবাহনের তূণে যাইতে ও বাণরূপে বসিতে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আর নীলধ্বজ কৃষ্ণের প্রসাদে কৈলাসে শিবলোকে প্রবীর ও মদন মুঞ্জরীকে দেখিলেন, গঙ্গালোকে জনাকে দেখিলেন। জনা ফুরাইল।

এখন দেখুন, প্রবীরকে অগ্নি যে বর দেন, তাহার মধ্যে ভুবন-বিজয়ী রথী অরিরূপে প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, কিন্তু আর কিছু মিলে নাই, সমরবাঞ্ছা মিটে নাই; কারণ প্রবীরকে অসহায় অবস্থায় নিরস্ত্র অবস্থায়, দেবমায়ায় মুগ্ধ অবস্থায়, শত্রুর ভিক্ষা দত্ত অস্ত্রসাহায্যে যুদ্ধ করিয়া মরিতে হইয়াছে; ইহাতে কি বীরের তৃপ্তি হয়—না ইহাতে অগ্নির বর দেওয়া সফল হইয়াছে বলিতে হইবে? আর যদি প্রবীরের বর প্রার্থনাসূচক কয়েক পংক্তির মধ্যে

"বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবন বিজয়ী রথী দেহ তবে অরি"

দুই পংক্তি কথিত বিষয়কেই বর বলিয়া গ্রহণ করা যায় আর তৎপরবর্ত্তী

"মরি কিম্বা মারি
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর"

এই দুই পংক্তিকে প্রবীরের আত্ম কথন বা সামান্য একটা উপেক্ষা সূচক অভিমত প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় অগ্নির বরদান প্রতিবর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে, কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারি কিরূপে? ইহার অপেক্ষা "মিটুক সমরবাঞ্ছা" ইহাও একটী প্রার্থনীয় বিষয় হইয়া পড়ে।

তারপর জনার প্রার্থনাও পূরণ হয় নাই। অন্তকালে গঙ্গাজলে প্রাণবায়ু ত্যাগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু সেকি পুত্রশোকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল? না, এইরূপে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার জন্যই বর লইয়াছিল! শুদ্ধ শব্দগত অর্থ দেখিতে গেলে গিরিশ বাবুকে কিয়ৎপরিমাণে বাঁচাইতে পারা যায় বটে কিন্তু ভাগবত অর্থ ধরিলে তাহা পারা যায় না। কেহ কেহ কূটতর্ক তুলিয়া ম্যাকবেথের বর্ণাম কানন চলিয়া আসিয়ার কথা ও রাবণের বরগ্রহণের কথা তুলিতে পারেন কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, বার্ণাম কানন চলিয়া আসিবার কথা

আপযোনির মুখের কথা আর জনার কথা দেবতার মুখের কথা; সুতরাং পার্থক্য থাকা আবশ্যক, আরও ম্যাকবেথের হৃদয়ে কিন্তু কথাটার উপর সন্দেহ ছিল, এখানে বরগ্রহীতাদের মনে সেরূপ সন্দেহ নাই। রাবণ বর গ্রহণকালে নরবানরের নাম করিতে ভুলিয়াছিল সুতরাং ব্রহ্মার দোষ কি?

গিরিশ বাবু যে দুইটি ভিত্তির উপর জনা ও প্রবীর গড়িয়াছেন তাহা এইরূপ অদৃঢ়। রাজার বরও পূর্ণ হয় নাই তিনি বাঁশরীবয়ান, ত্রিভঙ্গিমঠাম, নটবর, নবঘনকায় নবরূপী নারায়ণ দেখিতে চাহিলেন কিন্তু দেখিতে পাইলেন কি?—না, দেখিলেন অর্জ্জুনসখা, দ্বারকারাজ রাজবেশী শ্রীকৃষ্ণ! (৪ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

তারপর জনা হিন্দু স্ত্রী হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া, রাজ্যত্যাগ করিয়া "বনে বনে ফিরিতে গেল কেন? ইহাতে তাহার অর্জ্জুনবধের প্রতিজ্ঞাই বা সফল হইল কিরূপে আর "চলে জনা প্রতিবিবিৎসিতে"—তাহারই বা কি হইল? জনা মরিবার আগে এমন কিছু নিশ্চয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে গঙ্গা তাহার জন্য অর্জ্জুনকে শাপ দিবে! তারপর কাশীদাস জনাকে এরূপ স্বতন্ত্রা-করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার জনা "স্বামীকে শত্রুবশ্যতা স্বীকার করার জন্য অনুযোগ করিয়া নিজে জাহ্নবীতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইল, (গিরিশ বাবুর জনার মত স্বামী ত্যাগ করিয়া বনে বনে ঘুরিতে গেল না) তৎপরে যখন দেখিল, নীলধ্বজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুর সঙ্গে অশ্বরক্ষার্থ প্রস্থান করিলেন, তখন সে ভ্রাতৃসাহায্যে অর্জ্জুন বধার্থ পিত্রালয়ে গেল। তাহার ভ্রাতা উল্মুক উহা অসম্ভব জানাইল এবং সে উদ্দেশ্য হইতে নিবৃত্তা হইতে বলিল কিন্তু জনা না শুনায় স্বামীগৃহ ত্যাগের জন্য ও তাহারই পরামর্শে মাহিষ্মতীরাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে শুনিয়া বিস্তর অনুযোগ করিল। জনা ইহাতে ক্ষোভে, রোষে, আপমানে জর্জ্জরিতা হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। আমাদের মতে এই কাশীদাসের জনাই জনার প্রকৃত ছবি।

গিরিশ বাবু মাইকেলের "বীরাঙ্গনা" হইতে জনার ছবি লইয়াছেন বলিয়াই এতটা বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে। "গিরিশ বাবুব জনা যেরূপ প্রতিকার্য্যে লেডি ম্যাক্‌বেথের মত খিঁচাইয়া ধম্‌কাইয়া স্বামীকে স্বাভিমতাবলম্বী করিতে চাহে, তাহা আমরা হিন্দু স্ত্রীতে দেখিতে প্রস্তুত নহি" অথবা জনাকে "সাতরাজার ধন উজ্জ্বল মাণিক" বলিয়া গ্রহণ করিতে বা "জনা মিনার্ভার চন্দ্রমা" বলিয়া প্রশংসা করিতেও প্রস্তুত নহি বা তাহা বলিলেই জনার সমালোচনা হয় না। যাঁহারা এইরূপে একটি বিসদৃশ ব্যাপারকে আর্য্যরূপে সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন তাঁহারা সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ না করিয়া চাটুকারের কার্য্য করুণ, কার্য্যে অনেকাংশে সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।



স্বর্গীয় দেব ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

একে একে সকলেই চলিয়া গেল! ফুরাইল—ফুরাইল ভাই দরিদ্রের অমূল্য-ধন একে একে সব ফুরাইল। শতাব্দী শেষে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইলাম, ভাগীরথী তীরে, অশ্রুসঙ্গমে সেই প্রতিভা প্রদীপ্ত প্রশান্ত বদন শেষ দেখা দেখিয়াছি,—দেখিয়াছে শত শত বিরহ ব্যাকুল চক্ষু সযত্নে অশ্রুধারা মুছিয়া সেই অনন্ত শয়ন, প্রজ্জ্বলিত চিতায় প্রতিভাময়ের শেষ সৎকার ভাগীরথী বক্ষে দেখিয়াছি সেই চিতাভস্মের শেষ চিহ্ন যতক্ষণ দেখিতে পায়—আজি আবার নূতন শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গের স্বধর্ম্ম-পরায়ণ আদশ চরিত্র কৃতবিদ্য সুসন্তান ভূদেব চন্দ্রও চলিলেন।

পীড়া সেই সর্ব্বনাশী বহুমূত্র। ভূদেব বাবু বহুকাল হইতে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন। প্রায় একবৎসর হইতে পীড়া বড়ই প্রবল হইয়া উঠে। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শেষ পথের ব্যবস্থা হয়। তখন সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিয়া, তুলসী দলে বিভূষিত হইয়া

হরিনাম করিতে করিতে মার নাম লইতে লইতে মার ছেলে ব্রহ্মময়ী মার কোলে চিরশান্তি লাভ করিতে চলিল। তাঁহার দেহত্যাগের অনতিপূর্ব্বে বৈদ্য আসন্ন সময় জানিয়া অন্তর্জ্জলির কথা তুলিলেন. আর সংসার সংগ্রামে বিজয়ী বীর এই ত্রিতাপতাপিত মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া চির সুখ শান্তিময় সাধের রাজ্যে যাইবার জন্য সেই পরমক্ষণে অঙ্গুলি হেলাইয়া আদেশ করিলেন, "চল, এই স্থান হইতে উঠ, মার কোলে লইয়া চল!" আপনারা অন্তর্জ্জলির সঙ্কেত বা আদেশ করিতে পারেন, আজিকার দিনে এরূপ মৃত্যুজয়ী মহাপুরুষ আর দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। তাঁহার নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মিয়া তিনি স্বদেশ বাসীর জন্য সংসার যাত্রা পথে যে সকল বহুমূল্য সম্বল রাখিয়া গেলেন, এই দুঃসময়ে সেই সকলের সাহায্য লইলে অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারি।

ভূদেবচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। তাঁহার পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক ছিলেন। থানা-কুল কৃষ্ণনগরে ইহাঁদের আদিবাস কিন্তু ভূদেব বাবুর জন্মকালে তাঁহারা কলিকাতা মাণিকতলা হরীতকী বাগানে বাস করিতেছিলেন। ১৭৪৭ শকে (১২৩২ সালে) ২রা ফাল্গুন এই হরীতকী বাগানের বাটীতেই ভূদেবের জন্ম হয়। বিশ্বনাথের চতুষ্পাটী ছিল। বালক ভূদেব সুকুমার শৈশবে এই স্থানেই পাঠাভ্যাস করেন। কিন্তু দশম বর্ষীয় বালক চাণক্য শ্লোক বা ব্যাকরণ আওড়াইয়া তাহার পিতৃদেবকে আপনার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে নাই। পিতা পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষার সুফলের আশা না দেখিয়া তাহাকে ইংরাজী শিখিবার জন্য কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে পড়াইয়া অবশেষে কোনমতে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময়ে তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাঁহার পিতা কিরূপ লোক ছিলেন, সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণ স্বজাতীয়দিগকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, ভূদেব বাবুর স্বহস্ত লিখিত এই লিপি খানিতে তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাকেই পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজী-ওয়ালামাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না। আমি কোন কথা বলিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম, কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরি সহিল না, একেবারেই বাপের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! পৃথিবীর

আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন, বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "ঐ পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটী বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে "করতল কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম"। বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবাতো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন। এই দেখুন, তিনি বরং এই শ্লোকটিও পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল, তা তোমার বাবা বলিবেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয় তখন ক্লাসের একটী ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়। ·· ·· ছুটীর পর (সে) একেবারে আমার নিকট আসিয়া সেকহ্যাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার ইত্যাদি। ইনিই মধু।"

উপরি লিখিত পত্রে ৺ বিশ্বনাথ পণ্ডিতের কতক পরিচয় আছে। এতদ্ব্যতীত বিশ্বনাথ রামায়ণাদিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূদেবচন্দ্রের মাতাও রূপে গুণে অন্নপূর্ণা ছিলেন। পুত্রের সমপাঠীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাড়ীতে আসিলে সকলেই তাঁহার অসাধারণ স্নেহে মাতার আদর পাইত, তিনি যথাসাধ্য সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন, গায়ে মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন।

তাঁহার প্রতি এই সময়ই মধুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, মাইকেল মধুসূদন মান্দ্রাজ প্রবাসকালে ভূদেব বাবুকে পত্র লেখেন, আমার প্রণীত ক্যাপটিভ লেডী নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।"

এক্ষণে সে সময়ে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রসঙ্গক্রমে ভূদেব বাবুরই পত্রে দেখাইতেছি।

"আমরা উভয়ে (মধুর সহিত) যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০৲ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ। ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" মধু ক্ষুব্ধ হইয়া আপনার জলপানির টাকা হইতে তাঁহার মাহিনা দিবার প্রার্থনা

করিয়াছিল কিন্তু ঐ বৎসর জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া ভূদেব বাবুকে আর মধুর সাহায্য লইতে হয় নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, বন্ধুর নিকট টাকা লইতে তিনি যে কুণ্ঠিত হইতেন তাহা নহে।

হিন্দুকলেজের ৫ম শ্রেণীতে "জুনিয়র স্কলার্সিপ" পাইয়া ভূদেব, মধুস্থদন ও আর একটী ছাত্র একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

পর বৎসর সিনিয়র স্কলার্সিপ পরীক্ষায় সসম্মানে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইল।

ছাত্রজীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সসম্মানে সমাপন করিয়া এই বার তিনি সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে ছাত্রজীবন শেষ হইবার পর বৃত্তি বন্ধ হইলে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সুবিধামত কোন কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিতে পারেন নাই বলিয়া, পিতামাতার অৰ্দ্ধাশন ও কাতরতায় তিনি আত্মহত্যার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদুর ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তিও হয় না, বরং যিনি এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার বাক্য অতি রঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, বিদ্যা প্রচার করিবেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে স্কুল পাঠশালা করিয়া বিদ্যা বিস্তার করিবার সংকল্পে প্রথমতঃ কিছু দিন স্থানে স্থানে ঘুরিলেন। কিন্তু সেরূপে কতদিন চলিবে? গৃহ সচ্ছল নহে। অবশেষে মাদ্রাসা-কলেজে ৫০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে একজন সদাশয় কর্ণেল মাদ্রাশার পরিদর্শক ছিলেন। তিনি প্রধান শিক্ষকের বিপক্ষে পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। একদিন স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া প্রধান শিক্ষককে দেখিতে না পাইয়া ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রধান শিক্ষক কোথায়?

ভূদেব। আমি দ্বিতীয় শিক্ষক।

কর্ণেল। তাহা আমি জানি প্রধান শিক্ষক কোথায়?

কর্ণেল তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা কথা কহিতে লাইব্রেরী গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার মুখ হইতে প্রধাম শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ভূদেব বাবুকে সাদরে বলিলেন, যুবক! চিরদিন এইরূপ ব্যবহার করিও; তাহা হইলেই জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। কর্ণেল সেই দিবসেই তাঁহাকে হাবড়া স্কুলে ১৫০ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সময়েই তাঁহার "শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদশূন্য হওয়ায় এক প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। সেই বাল্যসুহৃদ মধুসূদন ও ভূদেব বাবু উভয়েই পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় ভূদেব বাবুই প্রধান হইয়া ৩০০৲ টাকা মাহিনায় উক্ত পদে নিযুক্ত হন। সদাশয় ভূদেবচন্দ্র মধুসূদনের বিফলতায় কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, উহার কথঞ্চিৎ অপনয়নের জন্য তিনি একখানি পত্রে আপনার লাঘবতা জানাইয়া লিখিয়াছিলেন, "মধু ও আমি যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, সকল

বারই উহার উপরে হইয়াছি বটে কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমরা জানিতাম।"

এই কার্য্য উপলক্ষেই ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ায় বাড়ী হইয়াছে। এখানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে ৪০০ টাকা বেতনে সহ স্কুল পরিদর্শক হইলেন। স্কুল ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ভূদেব বাবুর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব এই সময়ে প্রজা সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ৩০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু গুরুট্রেনিং স্কুল ও পাঠশালা সমূহে সেই অর্থ ব্যয়েব সমুচিত ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি এডিসনাল ইনিস্পেক্টর হইলেন। ভূদেব বাবুর জন্যই এই পদের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় ইনিস্পেক্টর হইলেন।

সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যে বন্ধুত্ব খুব কমই হইয়া থাকে, কিন্তু ভূদেব বাবুর উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অনেকের সহিতই তাঁহার প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল! ইউরোপীয়দের সহিত যেরূপ বন্ধুত্ব ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের হেতু—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি, কার্য্য কুশলতা এবং তেজস্বিতা। তাঁহার প্রশান্ত আর্য্যমূর্ত্তির জন্যও অনেক ইংরাজ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছিলেন। কোন দেশীয় বিদ্বেষী উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান স্পষ্টই এক সময়ে কাহারও সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আপনাদের আর্য্য আর্য্য বল, কিন্তু প্রকৃত আর্য্যের মূর্ত্তি এক ভূদেব বাবু ভিন্ন আর কোন দেশীয়তেই আমি দেখিতে পাই না।"

ভূদেব বাবু ১৮৬৪ খ্রীঅব্দে "শিক্ষা দর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত। এই পত্রিকাখানি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ছিল। ১৮৬৯ অব্দে সেই পুত্রটির সহিত সেই পত্রিকাখানিও বিসর্জ্জিত হইয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে ১৮৭২ অব্দে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। দারুণ শোক সন্তাপে অবিরত কার্য্য করিয়া এই সময় তাহার একবার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই সময়েও তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঠশালা পদ্ধতির যে রিপোর্ট লেখেন ভারত সচিব মুক্তকণ্ঠে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি পুষ্পাঞ্জলি ও পারিবারিক প্রবন্ধ উপহার লইয়া দেখা দিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই সময় তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন স্কুল ইন্‌স্পেক্টরিতে অসাধারণ দক্ষতা দেখিলেও কেবল বাঙ্গালী বলিয়াই তাঁহাকে স্থায়ী ডাইরেক্টর করা হয় নাই।

কিছুদিনের জন্য তিনি ছোটলাটের সদস্যও হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ভূদেব বাবু পেন্‌সন্ লইয়া এই প্রবীন বয়সে বারাণসী ধামে বেদান্তাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আসেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর শাস্ত্র আলোচনা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে আপনার শরীরের অবস্থা বুঝিয়া সংস্কৃত চর্চ্চার উন্নতি ও

দরিদ্রের চিকিৎসাদির সাহায্য জন্য এক লক্ষ ষাইট হাজার টাকা এবং বুধোদয় যন্ত্র ও এডুকেশন গেজেটের সমুদয় আয় দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ নীরব নিঃস্বার্থ দান তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। দুই দশ হাজার টাকা নয়, রাজা মহারাজা হইবার অভিপ্রায় নয়, দেশ বিদেশে কলরব তুলিবার অভিসন্ধি নয়, অথচ দেড়লক্ষেরও অধিক টাকা এককালীন দান! সুধু এই সকল দানের কথা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব পরিচায়ক নহে। তাঁহার পিতৃ ভক্তি অসাধারণ, মাতৃভক্তি অতুলনীয়, অতিশয় প্রগাঢ় সংসারপ্রীতি, আন্তরিক স্বজাতিপ্রিয়তা, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ। নীরবে নিভৃত আজীবন তাঁহার কর্ম্ম, দরিদ্রের অশ্রুধারা মুছাইতে তাঁহার অতুল আনন্দ, আতুরের রুগ্নশয্যা তাঁহার আশ্রয়, অবিরত নিরলসতা তাঁহার কার্য্যপ্রীতি। তিনি ধীর মিতব্যয়ী অসাধারণ বুদ্ধিমান অথচ দক্ষ, দাতা, বালকের ন্যায় সরল। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, এই অধঃপতিত আত্মহারা জাতির অনেক আশা থাকিবে।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূদেব বাবুর জীবন প্রকৃত আদর্শ জীবন। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতার প্রতি নিয়ত ভক্তি, বাল্যাবস্থায় রুগ্ন শরীর হইলেও অসাধারণ অধ্যবসায় সহ অধ্যয়ন, পরিবার প্রতিপালনে ও তাঁহাদের অন্ন সংস্থানে যত্ন; সহধর্ম্মিণীকে আপনার উচ্চ আদর্শে গড়িয়া লওয়া, পুত্রদিগকে সুশিক্ষা দান, কন্যা ও পৌত্রীদিগকে সৎপাত্রে প্রদান, বন্ধুবর্গের সহিত যাবজ্জীবন সমসৌহার্দ্দ্য, আত্মীয় স্বজনের পীড়ার চিকিৎসা বা অন্যবিধ সাহায্য, কাহারও সহিত কখন বিবাদ না করা, মাতৃ ভাষার প্রতি চিরকাল অনুরাগ, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতায় বিদেশীয় ইংরাজেরও শ্রদ্ধা উৎপাদন, হৃদয়ে স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি পোষণ, আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয়দিগের প্রতি একান্ত প্রীতিবশতঃ তাহাদিগের সুশিক্ষার জন্য বাক্য, ব্যবহার ও লিপি দ্বারা শেষাবস্থা পর্য্যন্ত অতুলনীয় যত্ন, পত্নীবিয়োগের পর দ্বাবিংশতি বর্ষকাল পুত্র কন্যাদির প্রতি মাতা পিতা উভয়েরই কার্য্য সুচারুরূপে পালন, দেশীয় শিল্পের সাহায্য জন্য বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবহার যথাসাধ্য সংকোচন, নিজ সমাজের হিতে অর্থাৎ দরিদ্রের চিকিৎসা সাহায্য ও সমাজের প্রাণস্বরূপ অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের রক্ষার জন্য সঞ্চিত অর্থের অনেকাংশ দান, কখন অসারতার সহিত সংস্রব না রাখা, সুদৃঢ় কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে নিয়ত অবিচলিত থাকা, তাঁহার সুগভীর দেশ হিতেচ্ছা প্রণোদিত রচনা এবং তাঁহার সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে তিনি সংসারের সকল বিষয়েই যথাযথ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল বিষয়েই আমাদের সমাজের অনুকরণীয় পুরুষ।

শোক-সংবাদ।

বিগত সোমবার অপরাহ্নে পাইকপাড়া রাজপরিবারের কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার পুত্র সন্তান নাই, একটিমাত্র কন্যা আছে। শুনিতেছি স্বীয় বিধবা পত্নীকে দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া একখানি উইল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত।

গত ৫ই মে শনিবার ৺ কাশীধামে ডুমরাওন মহারাজ স্যার রাধাপ্রসাদ সিং মহোদয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। মহারাজার বয়স হইয়াছিল ৫০ বৎসর মাত্র, মহারাজার অকাল মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়াছেন।

পিয়াস।

ফুটল ফুটল সখি! হেলা,
কিবা চাঁদ চকোর কি মেলা।
দীপ নিরাজন, বিশদ বিভাতি
শ্যামল কুঞ্জ গভীরে,
মিলই মৃদঙ্গে মৃদুকরতালি,
বাজত মধুর সুধীরে।
বনফুল সৌরভ—নিঠুর নিপীড়িত,
বোধ মরম নেহি মানে,
হাসে মলয় মৃদু অলক দুলায়ত
কাম কুসুম শর হানে।

সখিরে! প্রাণ বিকল মেরি ভেলো,
কালিয় দরশ পিয়াসে।
কাল বরণ সখি! নিদয় সো কালিয়,
মরম বেদন নেহি জানে,
কত নিশি যাপনু, হৃদয় হুতাশে,
রোয়নু গুরু অভিমানে।
নারীজনম ধিক, ধিক ধিক যৌবন,
ধিক ধিক পরকো পিয়াসা!
চিরতর চিন্তন, সফল না ভেল
বিফল বিকল মন আশা।

সহিলো! আয়ল রজনী বিঘোরা,
কাঁহা জীবন মন চোরা?
যাহ যাহ সখি! রাধা নিকুঞ্জে,
ভেটহ নিদয় পাষাণে,
প্রণমি চরণ যুগ, কহ কহ গোপন,
চন্দ্রা মরল অভিমানে।
নয়ন নীরদ নিতি, বরখত অবিরল
পেখত অসিত সলিলা,
শ্বাস প্রভঞ্জন পাতিত তনুপুর
ব্যবসিত জীবন লীলা।

সহিলো! ভেটহ নন্দকিশোর,
নিঠুর সো মাখন চোর।
মধুর মুরলী ধ্বনী, না শুনি শ্রবণপুর,
আজু সখি! বহুদিনু ভেলো।
রাস রসিকবর, গরব টুটায়ল
সরম ভরম কাঁহা গেলো।
শুনয়ু নিদাঘে যমুনাকি কুলুরব
বাদর বরষণ নাদ।
শরদিজলদ ধ্বনী, মধুময় মাধবে
কুহুরববিনু অবসাদ।

সহিলো! কোহিন বংশীসমান
বাঁশরী অমিয় নিধান।
গোপীজন রঞ্জন, রাধাজীবন ধন,
গাহে সো রাধিকা নাম
ব্রজপুর জানত, এক যুগলতনু
নটবর রাধা কি শ্যাম।
হামি অভাগিনী, গরব বিমোহিতা,
সাধন সরস না জানি।
প্রেম সুদুর্ল্লভ, পরম পিয়াসিত
বিরস স্বসুখ অভিমানী।

সখিরে! কালিয় প্রেমপিয়াসী,
হামি স্বসুখ অভিলাষী।
চল চল নাগরি! যতনে ফিরাইব
সাধি চরণ হৃদিচোরে,
কাল অঙ্গে পুনু নাহি দিব কাজর,
বাঁধব ভকতি কি ডোরে।

আজু পীতাম্বর যতনে পিনাহিব,
নীল বসন নেহি সাজে।
নখর দশন ক্ষত, শ্যাম শ্রীঅঙ্গ,
মরিলো স্বজনি! মরি লাজে।

সহিলো! শুন শুন বংশীনিনাদ,
আয়ে কুঞ্জেকালাচাঁদ।
রচহ কুসুম সর, বিনিস্থত গাঁথনি,
তঁহিপর অগুরু মিলাও,
আজু মহোৎসব, নাথ সমাগম,
তোরণে পলব ঝুলাও।
জানে হৃদয় সখি! অন্তরযামী
ভাব সহজ অভিলাষী,
দলতি চরণতল, কপট বিলোকন,
রসময় প্রেমপিয়াসী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পত্রিকা প্রকাশ হইতে যাইতেছে এমন সময় আমরা দারুণ শোক-সংবাদ পাইলাম, আমাদের ভূদেব বাবু আর ইহ জগতে নাই, অগত্যা পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করিয়া সাধারণকে এ সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে হইল, এই কারণ বশতঃ এবার আমরা অতিরিক্ত এক ফর্ম্মা অর্থাৎ আট ফর্ম্মার স্থলে নয় ফর্ম্মা প্রকাশ করিলাম, গ্রাহক অনুগ্রাহক মহোদয় আমাদের এই বিলম্ব জন্য ক্রটী মার্জ্জনা করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না।

পুঃ—আগামী বারে আমরা পুনর্ব্বার দুই সংখ্যা একত্র প্রকাশ করিব এবং শ্রাবণের শেষে সমীরণের বৎসর শেষ করিব। পুনরায় দ্বিতীয় বৎসরের নব উদ্যমে নূতন ধরনে কার্য্য করিতে ইচ্ছা আছে, উপাদেয় উপহারের ও বিশেষ আয়োজন করা হইতেছে। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের পরই সকলে ৯ম ও ১০ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

অনুগত
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক—

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

১ম খণ্ড। | সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

হিন্দুমহিলা।

প্রথম অধ্যায়।

উৎকৃষ্ট বৃক্ষের গুণ-গৌরবে যেমন উৎকৃষ্ট ফল প্রসূত হইয়া থাকে, এবং সেই উৎকৃষ্ট ফল যেমন ভাবী বৃক্ষ ও ফল সমূহের নিদান, সেইরূপ জননী-গণের গুণগৌরব গৌরবান্বিত পুত্রগণেরও ভবিষ্য বংশের আদি কারণ। ঋতু, জলবায়ু ও মৃত্তিকা যেমন সেই বৃক্ষের পোষণ ও উৎকর্ষ লাভে সহায়তা করে, যুগধর্ম্ম দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য সংবেষ্টক অবস্থানিচয় মানবচরিত্রের সংগঠনে সেইরূপ বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই জন্য স্থল-বিশেষে যেমন একজাতীয় বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক রমণী জাতিই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। সেই জন্য বাহ্য ও অন্তঃ-প্রকৃতির অবস্থায় উভয়েই মানবের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জল বায়ু আহার্য্য ও আবাসভূমি বাহ্য প্রকৃতির তিনটী প্রধান সাধন; অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব-ফল *। কেহ কেহ বলেন, পৈতৃক সংক্রমণ ও প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারাও মানবের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। যাহা হউক ঐ দুইটী প্রাকৃতিক অবস্থার উপরেই মানবের ও মানব সমাজের সুখ, দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্ত্রীগণ এই মানব সমাজের প্রধান মানদণ্ড; ইহাদিগকেই লইয়া সমাজ। ইহাদের উন্নতি ও অবনতির উপর সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে। একবার ভারতের সেই আদিম কালের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখ,—যখন মানব অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন,—পাশবী প্রবৃত্তির স্রোতে ভাস-মান, আত্মরক্ষণে অসমর্থ, আত্মচিন্তায় অপারগ, যখন সমাজবন্ধন সুদূর পরাহত,

* Buckle's Civilization in England vol. I. p. p. 16-39.

বহির্জগতের প্রভাবে মানব বাহ্য প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নকরূপে অবস্থিত ;— আদিম মানবের সেই শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, মনুষ্য সমাজ একদিন উন্নত হইয়া দেবতারও সমকক্ষ হইবে ? একদিন মানব বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিরও উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিবে ? ঋগ্বেদোক্ত সেই উর্ব্বশীর জঘন্য চরিত্রের আলোচনা করিয়া কে বলিতে পারে যে, লোপামুদ্রা, গার্গী, বিশ্ববারা, অক্ষমালা, অনুসূয়া, অপালা, মৈত্রেয়ী, শাণ্ডিলী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি মহামান্যা মহিলাগণ একদা জগতের রমণীজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সতী-মনস্বিনী ও বিদুষীগণের আদর্শ বলিয়া দেশবিদেশে কীর্ত্তিত হইবেন ? অবশ্য একদিনে এক ব্যক্তির উদ্যমে এবং বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির একটীমাত্র প্রভাবে এরূপ অভাবনীয় ভাবান্তর ঘটে নাই। যেরূপে তাহা ঘটিয়াছে এবং যে যে অবস্থা তাহার পরিস্ফুরণে সহায়তা করিয়াছে, আমরা ভারতীয় আর্য্য মহিলাগণের পবিত্র জীবনীর আলোচনা করিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে দেখিব।

অদিতি।

অদিতি জগতের সৌভাগ্যগগনের শ্রেষ্ঠ তারকা। যাঁহারা বিশ্বের মঙ্গল নিদান, যাঁহাদিগের প্রভাবে জগতের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল সূর্য্য সম্মুখে অন্ধকারের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, পুণ্যের প্রস্রবণ, সুখশান্তির অনন্ত নিকেতন সেই দেবগণ অদিতির পুত্র বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং যিনি এইরূপ পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি জগতের কত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায় ? ইহাঁর উৎপত্তি ও কার্য্য পরম্পরা সম্বন্ধে নানা প্রকার বিচিত্র বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ইনি ইন্দ্রের মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বর্ণিত আছে যে, ঋগ্বেদ ৪ মণ্ডল ১৮ সূক্ত, ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেবের রচিত *। কিন্তু উক্ত বেদের অন্য স্থানে (৫ মণ্ডল ৬২ সূক্ত) অদিতি শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় অত্রিনন্দন শ্রুতবিদ ঋষি মিত্র ও বরুণের উপাসনা করিয়া বলিতেছেন :—

"হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃ স্থূণ মুদিতা সূর্য্যস্য।
আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্ত্তমত শ্চক্ষাথে অদিতিং
দিতিং চ ॥"

অর্থাৎ হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা প্রত্যুষে সূর্য্যোদয় হইলে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর।

"এই অদিতি ও দিতি শব্দের নানারূপ অর্থ করা হইয়াছে। সায়ণ অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করিয়াছেন। মহীধর (শুক্লযজুঃ ১০।১৬) অদিতি অর্থে অদীন বিহিতানুষ্ঠাতা অর্থাৎ পুণ্যাত্মা এবং

---

* গর্ভস্থ বামদেব মাতার জননেন্দ্রিয় দিয়া বাহির হইবেন না এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবেন। তাঁহার জননী তাহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করিলেন। অদিতি স্বীয় পুত্র ইন্দ্রের সহিত আসিলেন।

দত্ত মহোদয়ের ঋগ্বেদানুবাদ ৬২৫ পৃষ্ঠা।

দিতি অর্থে দীন নাস্তিকাদি পাপাত্মা করিয়াছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী অদিতি অর্থে অখণ্ডিতা স্বীয় সেনা অথবা পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা পরসেনা অথবা পাপী করিয়াছেন।

অদিতি শব্দ দো ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রকৃত অর্থ অখণ্ডিত, অসীম, অনন্ত বিশ্বজগৎ। অতএব "দিতি" শব্দের প্রকৃত অর্থ জগতের খণ্ড বা সীমাবদ্ধ জগৎ। এইরূপ হইলে ঐ পদের প্রকৃত অনুবাদ বোধ হয় এই—হে মিত্র ও বরুণ। তোমরা তথা হইতে অসীম বিশ্বজগৎ ও সীমাবদ্ধ জগৎও অবলোকন কর।" *

ঋগ্বেদে অদিতি দক্ষের জননী ও কন্যা উভয় সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছেন। উক্ত বেদের ১০ম মণ্ডল ৭২ সূক্তে এইরূপ দেখা যায়ঃ—

"ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ংত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি॥"

অর্থাৎ উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। অতএব অদিতি দক্ষের জননী ও কন্যা। দেবগুরু বৃহস্পতি ঋষি এই সূক্তের রচয়িতা তিনি আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন ঃ—

"অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অম্বজায়ংত ভদ্রা অমৃতবংধবঃ॥"

অর্থাৎ হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন; ইহাঁরা কল্যাণমূর্ত্তি ও অবিনাশী।

এস্থলে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না যে, দেবতারা অদিতির পুত্র, কিন্তু তজ্জন্য আমাদিগকে অধিক অনুসন্ধান করিতে হইবে না; ১০ মণ্ডল, ৩৬ সূক্তে অদিতি মিত্র ও বরুণের জননী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

বিশ্বস্মানো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ॥
স্বর্বজ্জ্যোতিরবৃকং নশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে॥"

অর্থাৎ "ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী অদিতি দেবী তাবৎকাল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার অবিনাশী জ্যোতিঃ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।"

এইত গেল বেদের কথা। এক্ষণে বেদের শাখা ও প্রশাখা ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সমূহে অদিতির কিরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া পরে আমরা পৌরাণিক উপন্যাসের অবতারণা করিব।

তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অদিতি সম্বন্ধে একটী বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। বৃত্তান্তটী মূলে এক হইলেও উভয় গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে অল্প অল্প পার্থক্য লক্ষিত হয়। আমরা ক্রমে তাহা দেখিতেছি। তৈত্তিরীয় সংহিতা ঃ—"অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনমপচৎ। তে তস্মৈ উচ্ছেষণমদদুঃ। তৎপ্রাশনাৎ সা রেতোঽধত্ত। তস্মৈ চত্বার আদিত্যাঃ অজায়ন্ত। সা দ্বিতীয়মপচৎ। সাঽমন্যত উচ্ছেষণাৎ মে ইমেঽজনঁত। যদগ্রে প্রাশিষ্যামি ইতো মে বসীয়াংসো

* দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ ৭৭৯ পৃষ্ঠা।

জনিষ্যন্তে ইতি। সা অগ্রে প্রাশনাৎ সা রেতোঽধত্ত তস্য বৃদ্ধমণ্ডমজায়ত। সা আদিত্যেভ্যঃ এব তৃতীয়মপচৎ ভোগায় মে ইদং শ্রান্তমস্ত ইতি। তেঽব্রুবন্ বরং বৃণামহৈ যোঽতো জায়াতৈ অস্মাকং স একোঽসৎ। যোঽস্য প্রজায়াং ঋদ্ধ্যাতৈ অস্মাকং ভোগায় ভবেদিতি। ততো বিবস্বান্ আদিত্যোঽজায়ত। তস্য বৈ ইয়ং প্রজা যৎ মনুষ্যাঃ। তাস্বেক এব ঋদ্ধো যো যজতে স দেবানাং ভোগায় ভবতি।" অর্থাৎ অদিতি পুত্রলাভের ইচ্ছায় সাধ্য নামক দেবতাদিগের জন্য একটী ব্রহ্মৌদন পাক করিলেন ; তাঁহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে দিলেন। তাহা আহার করিয়া তিনি সসত্ত্বা হইলেন। তাঁহার চারিটী আদি-তেয় উৎপন্ন হইলেন। তিনি দ্বিতীয় ব্রহ্মৌদন পাক করিলেন এবং মনে মনে করিলেন যে, উচ্ছিষ্ট আহার করিয়া আমি এই চারিটী পুত্র পাইয়াছি, এইবার আমি অগ্রে আহার করিব, তাহা হইলে আমি অধিকতর তেজস্বী পুত্র লাভ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অগ্রে ভোজন করিলেন এবং সসত্ত্বা হইলেন। একটী অপরিণত অণ্ড উদ্ভূত হইল। আমার এই পরিশ্রম যেন ভোগের নিমিত্ত হয়, এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনি আদিত্যগণের জন্য তৃতীয় ব্রহ্মৌদন পাক করিলেন। তাঁহারা (আদিত্যগণ) কহিলেন, আইস আমরা এই বর লই যে, ইহা হইতে যিনি জন্মিবেন, তিনি যেন আমাদেরই হয়েন। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে যিনি সমৃদ্ধিশালী হইবেন, তিনি যেন আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত হয়েন। এইরূপে আদিত্য বিবস্বান্ জন্মিলেন। এই মনুষ্যগণ তাঁহার প্রজা। এই মনুষ্য-গণের মধ্যে যিনি যাগযজ্ঞ করেন, তিনিই দেবতাগণের ভোগের নিদান এবং তিনিই সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইহার এইরূপ বিবরণ দেখা যায় :—"অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনমপচৎ। তস্মৈ উচ্ছেষণমদদুঃ। তৎপ্রাশনাৎ সা রেতোঽধত্ত। তস্মৈ ধাতা চ অর্য্যমা চ অজায়েতাম্। সা দ্বিতীয়মপচৎ তস্মৈ উচ্ছেষণমদদুঃ। তৎপ্রাশনাৎ সা রেতোঽ-ধত্ত। তস্মৈ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ অজায়েতাম্। সা তৃতীয়মপচৎ। তস্মৈ উচ্ছেষণমদদুঃ। তৎপ্রাশনাৎ সা রেতোঽধত্ত। তস্মৈ অংশশ্চ ভগশ্চ অজায়েতাম্। সা চতুর্থ-মপচৎ। তস্মৈ উচ্ছেষণমদদুঃ। তৎ-প্রাশনাৎ সা রেতোঽধত্ত। তস্মৈ ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চ অজায়েতাম্।" ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই হইবে, অদিতি পুত্রলাভের ইচ্ছায় সাধ্য নামক দেবগণকে ব্রহ্মৌদন পাক করিযা দিয়াছিলেন। ইহা একবার নহে চারিবার। এই চারিবারই তিনি সাধ্যগণের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সসত্ত্বা হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারেই দুইটী করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, প্রথম-বারে ধাতা ও অর্য্যমা, দ্বিতীয়বারে মিত্র ও বরুণ ; তৃতীয়বারে অংশ ও ভগ এবং চতুর্থবারে ইন্দ্র ও বিবস্বান্ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অদিতি যে, সমস্ত দেবগণের মাতা, উদ্ধৃত ঐ দুইটী বচন হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইল। কিন্তু ইহার কোথাও আমরা কশ্যপের উল্লেখ পাইলাম না। অদিতি চরু পাক ও তাহা ভোজন করিয়াই গর্ভবতী হইলেন এবং ক্রমে

ক্রমে ধাতা প্রভৃতি অষ্ট দেবতাকে পুত্র-রূপে লাভ করিলেন। মহাত্মা সায়ণ যে অদিতির অর্থ অখণ্ডিত অনন্ত বিশ্বজগৎ করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এইখানে অদিতি মূল প্রকৃতি; আত্মাশক্তি সনাতনীরূপে অবতারিত হইয়াছেন।

ইহা উপনিষদের রূপক অলঙ্কার। ক্রমে যত কাল অতীত হইতে লাগিল পৌরাণিক দিগের তেজস্বিনী কল্পনা এই আদ্যাশক্তিকে বিশেষ বিশেষ গুণময় দেহের সহিত অবতারিত করিয়া কশ্যপের সহিত ইহাঁর বিবাহ দিলেন। অদিতি কশ্যপের স্ত্রী হইলেনঃ—

"প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ।
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনুমপিচ কালকাম্।"

ইত্যাদি রামায়ণোক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, অদিতি দক্ষের কন্যা এবং কশ্যপ তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারত ও পুরাণাদি হইতেও এইরূপ অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়; কিন্তু আদৌ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, অদিতি কি বাস্তবিক কাল্পনিক? বাস্তবিক কি রূপক অলঙ্কাররূপে ইহা বেদ ও উপনিষদাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি অদিতিকে অলঙ্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কশ্যপকেও নস্যাৎ করিতে হয়; কিন্তু কশ্যপত কাল্পনিক নহে। আজিও যখন তাঁহার বংশ ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে কাল্পনিক করিতে পারা যায় না। তবে কি অদিতি কাল্পনিক এবং কশ্যপ বাস্তব ঐতিহাসিক?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৭। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে কি না।

গীতা প্রক্ষিপ্ত কি না দেখিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে মহাভারতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে কি না। মহাভারতের প্রারম্ভ আলোচনা করিলেই আমরা দেখিব যে, ইহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। তাহার অর্থ এই যে, মহাভারতে এমন কতকগুলি অংশ ও শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা, অন্য কর্ত্তৃক রচিত হউক অথবা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হউক, অন্ততঃ মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রথমতঃ রচিত হয় নাই। কিন্তু মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত উল্লেখের সঙ্গে প্রক্ষেপকদিগেরও নামোল্লেখ করা হইয়াছে। যেস্থলে যে ঋষির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইস্থলে সেই ঋষির নামও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। যেখানে সৌতির নিজের কথা চলিতেছে, সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে "সৌতিরুবাচ" সৌতি বলিলেন। যেখান হইতে বৈশম্পায়নী ভারতসংহিতার আরম্ভ হইয়াছে সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে "বৈশম্পায়ন উবাচ" বৈশম্পায়ন বলিলেন। এই

বৈশম্পায়নী ভারতসংহিতাকে ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত বলিয়া আমরা গণ্য করিব, কারণ ব্যাসদেব জনমেজয়ের সর্প-সত্রে নিজে উপস্থিত থাকিয়া বৈশম্পায়নের দ্বারা ইহা বলাইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা সকাম ভাবকে কেহ বা নিষ্কাম ভাবকে রামায়ণ মহাভারতাদির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করাইবার প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেহ বা বলেন, প্রক্ষেপকগণ তাঁহাদের রচনা এই আশায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করেন যে, তাহা ভাল না হইলেও সেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামে চলিয়া যাইবে; কেহ বা বলেন, প্রক্ষেপকগণ জনহিতকর কোন রচনা করিয়া এই কারণে প্রক্ষিপ্ত করেন যে, সেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঙ্গে তাঁহাদের রচনাও লোকে পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, অন্ততঃ মহাভারতের পক্ষে এ কথা খাটিতে পারে না; কারণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষেপ্তারও নামোল্লেখ আছে। এই নামোল্লেখ না থাকিলে আমরা প্রক্ষেপকদিগের সকাম নিষ্কাম ভাবের সবিস্তার আলোচনা ও আন্দোলন করিতে পারিতাম।

মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা অন্ততঃ অশীতি সহস্রের উপর হইবে। সুতরাং এই অশীতি সহস্রের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক 'বেনামী' প্রক্ষিপ্ত থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই এত অল্প যে আমরা তাহা ন-ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিতে পারি। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত যদি থাকে, তাহা হইলেও নিতান্ত অল্প-সংখ্যক, আমার এই বিশ্বাসের কারণ ক্রমে প্রকাশ পাইবে। এখন দেখা যাউক যে প্রক্ষিপ্ত (অর্থাৎ যাহা অন্ততঃ মহাভারতের অংশ বলিয়া রচিত হয় নাই) বাদ দিয়া প্রকৃত (বৈশম্পায়নোক্ত বা ব্যাসরচিত) মহাভারতের আরম্ভ কোথা হইতে।

৮। অনুক্রমণিকাধ্যায়।

প্রচলিত মহাভারতের আদিপর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা অনুক্রমণিকাধ্যায় দেখিতে পাই। এই অধ্যায়ের কতকটা বৈশম্পায়নের উক্তি অথবা প্রকৃত মহা-ভারতের অন্তর্গত এবং কতকটা সৌতির উক্তি। সৌতি কে, তাহার বিষয় বোধ হয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে না। তিনিই জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়-নোক্ত ভারতসংহিতা শুনিয়া আসিয়া নৈমিষারণ্যবাসী শৌনক প্রভৃতি মুনি-দিগকে শ্রবণ করাইতেছেন এবং আনু-ষঙ্গিক প্রশ্নানুযায়ী দুএকটী অতিরিক্ত বিষয়ও বলিতেছেন।

এই অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের প্রথম ১০৭ শ্লোক উগ্রশ্রবা সৌতির উক্তি—ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে; ১০৭ম শ্লোকে সৌতি বলিতেছেন যে "বৈশম্পায়ন যে লক্ষশ্লোকময়ী ভারতসংহিতা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন।" ইহার পরে ১০৮ম হইতে ২৪৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বৈশম্পায়নোক্ত (অথবা ব্যাসদেব রচিত) ভারতসংহিতার কথা বলা হইল। ২৪৮শ শ্লোকের পর হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আবার সৌতির উক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং

অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ২৭১ শ্লোকের মধ্যে ১৪১ শ্লোক প্রকৃত মহাভারতের এবং অবশিষ্ট ১৩০ শ্লোক সৌতির উক্তি। কিন্তু এই অধ্যায়েই লেখা আছে যে ব্যাসদেব ভারতসংহিতা রচনা করিয়া "অধ্যর্দ্ধশত" শ্লোকে তাহার এক অনুক্রমণিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন;

"ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাং॥
আদি, অনুক্রং ১০২॥

এমনও হইতে পারে যে ১৫০ শ্লোক হইতে ৯ শ্লোক কোন কারণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমাদের মনে হয় যে, উক্ত শ্লোকে "অধ্যর্দ্ধশত" এই কথার অর্থ গোণাগুন্তি ১৫০ না হইয়া "শদেড়েক" অথবা ন্যূনাধিক দেড়শত হইবে। যদি "একশত এবং পঞ্চাশ' এইরূপ কোনো বিশেষ উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে গোণাগুন্তি ১৫০ বলা হইতেছে। যাই হোক, ১৩০ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বটে কিন্তু বেনামী নহে।

৯। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়।

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়। এই অধ্যায়টীও সৌতির উক্তি। সৌতি বলিতেছেন "হে শৌনক! আমি আপনার যজ্ঞে যে উৎকৃষ্ট আখ্যান বলিতেছি, ব্যাসশিষ্য ধীমান্ বৈশম্পায়ন তাহা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিস্তাররূপে কহিয়াছিলেন (আদি, ২অ, ৩৩)। সৌতি এইরূপ বলিয়া নিজেই বলিয়া চলিতেছেন যে, মহাভারতের কত পর্ব্ব, কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক এবং কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে বৈশম্পায়নের উক্তি একটীও নাই। সুতরাং ইহার পর যতক্ষণ তাঁহাকে "বৈশম্পায়ন উবাচ" বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই কথা বলিতে না দেখি, ততক্ষণ বুঝিব যে বৈশম্পায়নোক্ত প্রকৃত মহাভারত আরম্ভ হয় নাই। সমস্ত পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে "বৈশম্পায়ন বলিলেন" এই ভাবের কোন কথা নাই, অতএব আমরাও ধরিয়া লইতেছি যে এই অধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারতের অন্তর্গত নহে। বিশেষতঃ এই অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোকে আছে "বৈশম্পায়ন যে ভারতাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার আদিতে পৌষ্য পৌলোম এবং আস্তীক এই তিন পর্ব্ব (পর্ব্বাধ্যায়) আছে।" ইহাতেও এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে।

১০। পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক—তিন পর্ব্বাধ্যায়।

পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্বাধ্যায়ও প্রকৃত মহাভারতের অন্তর্গত নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে আছে—

"মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥

কেহ বা "নারায়ণং নমস্কৃত্য" প্রভৃতি হইতে কেহ বা আস্তীক পর্ব্বাধ্যায় হইতে কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে ভারত অধ্যয়ন করেন।

উপরিচর রাজার উপাখ্যান যখন সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইল এবং যখন তাহার পরে অন্য কোন স্থানের কথা বলা হয় নাই, তখন ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সৌতির সময়ে সকলেই অন্ততঃ উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে প্রকৃত মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিতেন। আর প্রকৃতই বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যান এই উপাখ্যান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এই উপাখ্যানের দুই অধ্যায় পূর্ব্ব হইতে বৈশম্পায়নের উক্তি আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, উক্ত দুই অধ্যায় তাঁহার নিজের উক্তি, ব্যাসরচিত ভারতসংহিতার অন্তর্গত নহে। একটীতে (ভারতসূত্রাধ্যায়ে) তিনি কতকটা অনুক্রমণিকার ন্যায় মহাভারতের ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; দ্বিতীয়টীতে (ভারত প্রশংসাধ্যায়ে) মহাভারত অধ্যয়ন শ্রবণ প্রভৃতির প্রশংসা করা হইয়াছে।

পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্বাধ্যায় যে বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারতের অন্তর্গত নহে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। (১) আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে শৌনকপ্রমুখ ঋষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সৌতি বলিতেছেন—

"ইতিহাসমিমং বিপ্রাঃ পুরাণং পরিচক্ষতে।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তং নৈমিষারণ্যবাসিষু॥
পূর্ব্বং প্রচোদিতঃ সূতঃ পিতা মে লোমহর্ষণঃ।
শিষ্যো ব্যাসস্ত মেধাবী ব্রাহ্মণেষ্বিদমুক্তবান্॥
তস্মাদহমুপশ্রুত্য প্রবক্ষ্যামি যথাতথং।
(আদি, ১৩ অ, ৬।৭।৮)

ইহার ভাবার্থ এই যে, এই ইতিহাসকে (আস্তীকোপাখ্যান) পুরাণ বলিয়া জানিবে। ইহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৌতিপিতা লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সেই কথাই তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। সৌতি তাহাই শুনিয়া এখন শৌনক প্রভৃতি ঋষিদিগের নিকট পুনরায় বলিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই আস্তীকোপাখ্যান জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে।

(২) পৌলোম পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে শৌনক সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তোমার পিতা সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ?" সৌতি তাহার উত্তরে বলিতেছেন "বৈশম্পায়নপ্রমুখ দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যে সকল বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ আমি আমার পিতার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছি" (আদি, ৫ম অধ্যায়)। এই কথার পরে শৌনকের প্রশ্নানুযায়ী সৌতি তাঁহার অধীত পুরাণলিখিত পৌলোম কথা বলিতে লাগিলেন। কাজেই পৌলোম পর্ব্বাধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে।

(৩) পৌষ্য পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে যদিও লেখা নাই যে সৌতি এই উপাখ্যান কোথা হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহারই উক্তি—বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে; আরম্ভেই লেখা আছে "সৌতিরুবাচ" সৌতি বলিলেন।

আমি বলিলাম বটে যে, উক্ত তিন পর্ব্বাধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে

সেগুলি একেবারেই ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। আমি এই পরিচ্ছেদে যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে বরঞ্চ অনুমিত হইতে পারে যে উক্ত তিন পর্ব্বাধ্যায় ব্যাসদেবের রচনা বটে। আস্তীকপর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়কে স্পষ্টই "কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তং" অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক রচিত নহে বলিবার বিশেষ কারণ দেখা যাইতেছে না। পৌলোম পর্ব্বের (অর্থাৎ পর্ব্বাধ্যায়ের) প্রারম্ভে সৌতি বলিতেছেন "বৈশম্পায়নপ্রমুখ দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন"। বৈশম্পায়ন এবং সৌতিপিতা উভয়েই প্রসিদ্ধ ব্যাসশিষ্য। সুতরাং আমরা পৌলোম পর্ব্বকেও ব্যাসরচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারি, এবং এইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত প্রমাণ পাইতেছি না। পৌষ্যপর্ব্বে যদিও তাহা কাহা কর্ত্তৃক রচিত, কে বলিয়াছে প্রভৃতি কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই, তথাপি পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বের সহিত ইহাও বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত অনুমান করা এমন কিছু অসঙ্গত নহে। যখন পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সৌতি বলিতেছেন যে, বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের আদিতে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্ব আছে, তখন সৌতির সময়ে যে এই তিন পর্ব্ব ব্যাসদেবের রচিত এবং মহাভারতের পূর্ব্বভাগ (prologue), কিন্তু বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে, বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বেশ্ বোধ হয়।

১১। সৌতির মহাভারত অধ্যয়ন।

পূর্ব্বে (১০ম পরিচ্ছেদে) বর্ণিত বিষয়গুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে আমরা আর একটী গুরুতর বিষয় জানিতে পারি—সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের মুখে শুনিবার পূর্ব্বেই সৌতি সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার নিকটে মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত আছে জনমেজয়ের সর্পসত্রের বহুপূর্ব্বে ব্যাসদেব লক্ষশ্লোক মহাভারত রচনা করিয়া এই মনুষ্যলোকে প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং জানা গেল যে, বৈশম্পায়ন, শুকদেব, লোমহর্ষণ প্রভৃতি ব্যাসশিষ্যগণ সর্পযজ্ঞের বহুপূর্ব্বেই মহাভারত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সৌতিপিতা লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন, তখন তাঁহাকে যে ব্যাসদেব মহাভারত শিখাইবেন না, ইহা সঙ্গত মনে হয় না। লোমহর্ষণ যদি মহাভারত সর্পযজ্ঞের বহুপূর্ব্বে পড়িয়া থাকেন, তবে সৌতিও অন্ততঃ সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট শুনিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার নিকটে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।১ সৌতির সর্পসত্রে ভারতাখ্যান শুনিবার পূর্ব্বেও যে মহাভারত অধ্যয়ন বেশ্

১ ৺বঙ্কিম বাবুও লিখিয়াছেন 'স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন" (কৃষ্ণ চরিত্র পৃঃ ৬৪ দেখ)।

প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অনুক্রমণিকাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা সপ্রমাণ হইবে ঃ—

"মন্বাদি ভারতং কেচিকাস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥"

এখানে 'অধীয়তে' অধ্যয়ন করেন, এই কথা আছে; সুতরাং সৌতির ভারতাখ্যান পড়িবার সময়ে মহাভারত অধ্যয়ন নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা না হইলে মহাভারত অধ্যয়নের কথাই আসিত না; সৌতি সর্পসত্রে ভারতাখ্যান শুনিবার পরেই তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত শ্লোকে বলিতেছেন যে, কেহ এইরূপে মহাভারত পড়েন, কেহ বা অন্যরূপে পড়েন—যেন এই মহাভারত অধ্যয়ন কিছু বেশীমাত্রায় প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সৌতির সর্পসত্রে ভারতাখ্যান শুনিবার পূর্ব্বেও মহাভারত অধ্যয়ন বেশ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সৌতি নিজেও যে শুনিবার পূর্ব্বে মহাভারত পড়েন নাই তাহা নহে—তিনিও তাঁহার পিতার নিকটে মহাভারত সবিস্তার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১২। পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যার সহিত প্রচলিত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা মিলে না কেন?

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে যদি সৌতি তাঁহার পিতার নিকট একবার লক্ষশ্লোক মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং যখন তিনি পুনরায় সর্পসত্রে সেই লক্ষশ্লোক মহাভারত শ্রবণ করিয়া শৌনক প্রভৃতিকে বলিয়াছেন, তখন তন্নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বসংগ্রহোল্লিখিত শ্লোকসংখ্যা প্রচলিত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যার সহিত মিলে না কেন? অনেকে বলেন যে, পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা প্রতি পর্ব্বের অতিরিক্ত শ্লোকগুলি খুব সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু আমার মতে সেই অতিরিক্ত শ্লোকগুলি পর্ব্বসংগ্রহোল্লিখিতের অতিরিক্ত বলিয়াই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে তাহার কোন কারণ নাই। বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে ভারতাখ্যানের পূর্ব্বে যদি পর্ব্বসংগ্রহের কোন কথা উল্লেখ করিতেন অথবা বলিবার কালে যদি তিনি শ্লোক গণিয়া গণিয়া বলিতেন, তাহা হইলেও বা অতিরিক্ত শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে পারিতাম। কিন্তু বৈশম্পায়ন সেরূপ কিছুই করেন নাই।

পূর্ব্ব (১১ম) পরিচ্ছেদে দেখাইয়া আসিয়াছি যে সৌতি সর্পসত্রে ভারতাখ্যান শুনিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার নিকট তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সৌতিই যখন পর্ব্বসংগ্রহ প্রভৃতি বলিতেছেন, তখন ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, বৈশম্পায়নকৃত ভারতাখ্যানের পূর্ব্বেই ব্যাসশিষ্যগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বসংগ্রহ প্রভৃতি প্রস্তুত এবং মহাভারতের সঙ্গে তাহার পূর্ব্বভাগরূপে পৌষ্য, পৌলোম প্রভৃতি উপাখ্যান সকল সংযুক্ত হইয়াছিল। আমার মনে হয় যে, সৌতি সর্পসত্রে বৈশম্পায়নকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব অবধি, তাঁহার পিতার নিকট যাহা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই শৌনক প্রভৃতিকে বলিয়াছেন এবং বৈশম্পায়নের উক্তি

হইতে বৈশম্পায়নেরই কথায় শুনাইয়াছেন। সুতরাং পর্ব্বসংগ্রহ রচিত হইবার পরেও যদি ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতের শ্লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করেন, তবে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় মধ্যে তাহার উল্লেখ কিরূপে থাকিবে? আমাব বিশ্বাস যে ব্যাসদেব এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং প্রচলিত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যার সহিত পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা মিলে না। এবং কাজেই আমরা কোন পর্ব্বে পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা অতিরিক্ত শ্লোক দেখিলে সহসা প্রক্ষিপ্ত বলিব না এবং পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোক সংখ্যা হইতে কম শ্লোক দেখিলে লিপিকর প্রমাদে ঘটিয়াছে, তাহাও সহসা বলিব না। আমরা বুঝিব যে ইহা ব্যাসদেবকৃত হইলেও হইতে পারে।

১৩। মহাভারতের গঠন প্রণালী।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা অনুমান করিয়া আসিলাম যে পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা প্রচলিত মহাভারতে যে অল্প বা অধিক শ্লোক দেখিতে পাই সেগুলি ব্যাসদেবের কৃত হইলেও হইতে পাবে এবং তাহা হওয়াও খুব সম্ভব। সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে যে ব্যাসদেব একবারেই সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে বুঝিব যে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমান মিথ্যা। সুতরাং এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ব্যাসদেব একবারেই তাঁহার মহাভারত এমনভাবে রচিয়াছিলেন কি না, যে, তাঁহাকে ইহাতে দ্বিতীয়বার হস্তার্পণ করিতে হয় নাই অথবা তিনি মহাভারতকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিয়াছেন। যদি তিনি মহাভারতকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া থাকেন, তবে আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমান খুব সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। আর আমরাও তো স্বরচিত গ্রন্থের এমন কতবার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলি। নিম্নে যে সকল কথা বলিতে যাইতেছি, তাহা দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইব যে, ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতকে তিন চারি স্তরে সুসংস্কৃত করিয়া গড়িয়াছেন।

১৪। মহাভারতের প্রথম সংস্করণ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন সবে আরম্ভ হইতেছে; যখন কুরুক্ষেত্রে বীরগণ সমরোন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। যুদ্ধের সূচনা হইতে না হইতে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এখন, যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অবশেষে, অন্যবিধ অনেক সান্ত্বনা দিবার পর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া গেলেন "হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই

কুরুপাণ্ডব সকলের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিব" (ভীষ্ম, ২অ, ১৩)। তবেই দেখিতেছি যে, এই সময়ে ব্যাসদেবের মনে মনে কুরুপাণ্ডবদিগের ইতিহাস লিখিবার কল্পনা উদয় হইয়াছিল, কিন্তু এখনও তিনি তাহা লেখেন নাই।

তাহার পর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ভগবান্ ব্যাসদেব সর্ব্বপ্রথম অতি অল্পসংখ্যক শ্লোকের দ্বারা তাঁহার ভাবী মহাভারতের একখানি কঙ্কাল বা বীজমাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। স্বর্গারোহণ পর্ব্বে সৌতি বলিতেছেন—

মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসঃ কৃত্বেমাং সংহিতাং পুরা।
শ্লোকৈশ্চতুর্ভির্ধর্ম্মাত্মা পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকং॥
স্বর্গারো, ৫ম, ৫৫।

ইহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বে ব্যাসদেব 'গোটাচারেক' (গোণাগুন্তি চারি নহে) অর্থাৎ অতি অল্পসংখ্যক শ্লোকের দ্বারা এই ভারতসংহিতা রচনা করিয়া স্বীয়পুত্র শুকদেবকে অধ্যাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেমন "অধ্যর্দ্ধশতং" অর্থে "শ' দেড়েক" ধরিয়াছি (৮ম পরিচ্ছেদ দেখ), সেইরূপ এখানেও "শ্লোকৈশ্চতুর্ভিঃ" অর্থে চলিত ভাষায় "গোটাচারেক" ধরিলাম ১। এই শ্লোকচতুষ্টয়ী ভারতসংহিতাই ভবিষ্যৎ মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ হইল।

১। এখানে যদি বলা যায় যে কেবলমাত্র চারিটি শ্লোকের দ্বারা প্রথম সংস্করণের ভারত সংহিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না; তবে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

১৫। মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই শ্লোকচতুষ্টয়ী ভারতসংহিতারূপ মহাভারতবীজ প্রস্তুত করিবার পরে পরাশরাত্মজ বেদব্যাস মনে মনে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া লইলেন, যে প্রণালীতে তিনি কৌরবদিগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিবেন। আলোচনা পূর্ব্বক সকল বিষয় স্থির করিয়া লইয়া তিনি লেখকশ্রেষ্ঠ গণেশকে আহ্বান করিলেন। গণেশ উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার 'মনঃ কল্পিত' ভারতের লেখক হও, আমি মুখে বলিয়া যাইব" (আদি, ১অ, ৭৭)। এইরূপে তিনি গণেশের দ্বারা একাদিক্রমে ন্যূনাধিক ২৪০০০ শ্লোক লিখাইয়া লইয়া (১) মহাভারত-বৃক্ষ প্রস্তুত করিলেন। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সৌতি বলিতেছেন—

"চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং।
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
আদি, ১অ, ১০১।

১। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যাসদেবের একাদিক্রমে ২৪০০০ শ্লোক বলিয়া যাইবার কথা শুনিয়া উপহাস করিবেন, তাহা জানি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বলি যে, তাঁহারা ইংলণ্ডীয় কবি শেলির কবিতা লিখিবার প্রণালী আলোচনা করিলেই বুঝিবেন যে ইহা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে। শেলী বলেন যে তিনি যখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার মনে এত বেশী ভাবপ্রবাহ ও কবিতা আসিয়া পড়িত যে তিনি সেই সকল সম্পূর্ণভাবে লিখিতে পারিতেন না। ইহা সত্ত্বেও তিনি চারি পাঁচ শত শ্লোকযুক্ত এক একটি কবিতা না থামিয়া একাদিক্রমে শেষ করিতেন। ব্যাসদেব পাছে লেখা

(প্রথমতঃ) ব্যাসদেব উপাখ্যানভাগ ত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক দ্বারা ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকেই ভারত বলিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে "উপাখ্যানৈর্ব্বিনা" অর্থাৎ "উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া" এই বিশেষণটুকু দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই "চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রী ভারতসংহিতা"ও প্রথম স্তরের শ্লোকচতুষ্টয়ী ভারতসংহিতার ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী বিস্তৃত বটে, সমগ্র মহাভারতের একটী আভাস (outline) মাত্র। উপরোক্ত শ্লোকেও "চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রীং" এই শব্দের অর্থ আমরা পূর্ব্বের ন্যায় গোণাগুন্তি ২৪০০০ শ্লোক না ধরিয়া চলিতভাষায় 'হাজার চব্বিশ' অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৪০০০ শ্লোক এইরূপ ধরিলাম। এই 'হাজার চব্বিশ' শ্লোকবিশিষ্ট ভারতসংহিতাই মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ। ব্যাসদেব এই দ্বিতীয় সংস্করণের মহাভারত কেবলমাত্র তাঁহার পুত্রকে নহে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের পরে অন্যান্য উপযুক্ত শিষ্যদিগকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের মহাভারতে কি ছিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ১৪১ শ্লোক (৮ম পরিচ্ছেদ দেখ) দেখিতে হইবে। এই অনুক্রমণিকাধ্যায়ই দ্বিতীয় সংস্করণ মহাভারতের সূচীপত্র স্বরূপ। ইহা বলিবার কারণ এই যে, উপরোক্ত শ্লোকে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রী ভারতসংহিতা রচনার উল্লেখ করিয়া তাহার পরের শ্লোকেই বলা হইল "অনন্তর বেদব্যাস সমুদয় পর্ব্ব ও বৃত্তান্তের সংক্ষেপ করিয়া সার্দ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করিলেন।" (আদি, ১অ, ১০২)।

১৭। মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণ।

এইবারে আমরা মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। অনুক্রমণিকা পর্ব্বাধ্যায়ে (১০৪-৭ শ্লোক) সৌতি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতিসাহস্রী ভারতসংহিতা রচনা করিবার পরে ষষ্টিলক্ষ শ্লোকযুক্ত অপর এক সংহিতা রচনা করেন, তন্মধ্যে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্রে লক্ষশ্লোকবিশিষ্ট ভারত কীর্ত্তন করেন এবং তাহাই পুনরায় সৌতি শৌনককে বলিতেছেন। ষষ্টিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে কতক অংশ দেবলোকে, কতক অংশ পিতৃলোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে এরূপও উল্লেখ আছে। এরূপ উল্লেখ করিবার গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা

তাঁহার কবিতাস্রোতের অন্তরায় হয়, এই কারণে ক্ষিপ্রহস্ত গণেশকে লেখক পাইয়া আনন্দিতমনে কবিতার উৎস খুলিয়া দিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার ২৪০০০ শ্লোক বলিয়া যাওয়া আর বিশেষ অসম্ভব কি? আমরা একাদিক্রমে দুই তিন শত শ্লোকও রচনা করিতে পারি না বলিয়া শেলীর চারি পাঁচ শত শ্লোক রচনা অবিশ্বাস করিব? ভরসা করি শিক্ষিতগণ শেলীর বিষয় অবিশ্বাস করিবেন না। তবে, আধুনিক কবিগণ একাদিক্রমে হাজার শ্লোকও রচিতে পারেন না বলিয়া কি ব্যাসদেবের ২৪০০০ হাজার শ্লোক রচনা আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে হইবে? এই যুক্তির যৌক্তিকতা কিছু অতিমাত্রায় যায়।

বুঝি নাই স্বীকার করিতেছি; কিন্তু বুঝি নাই, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। তাই বলিয়া লক্ষশ্লোক ভারতের কথাও আমাদিগের অবিশ্বাস করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই (১)। যে ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে ন্যূনাধিক ২৪০০০ শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতে পারেন, তিনি যে অবসর মত ভাবিয়া চিন্তিয়া আরও ন্যূনাধিক ৭৬০০০ শ্লোক রচনা করিতে না পারেন, তাহা কে বলিবে? সৌতি যখন স্পষ্ট করিয়া লক্ষশ্লোকের কথা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন আমাদিগের অবিশ্বাস করিবার কি কারণ আছে? ইহাও বড় আশ্চর্য্য যে, সৌতির কথা একস্থলে (যেখানে ২৪০০০ শ্লোকের কথা বলিবেন) বিশ্বাস করিব, আর অন্যস্থলে (কয়েক শ্লোক পরেই যেখানে লক্ষ শ্লোকের কথা বলিয়াছেন) অবিশ্বাস করিব। আমাদের কল্পনায় লক্ষশ্লোক দূরে থাক্, ২৪০০০ শ্লোক রচনা করাও এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া কি আমরা লক্ষশ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া দিব? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ন্যায় ব্যক্তি ২৪০০০ শ্লোকযুক্ত ভারত রচনা করিয়া, পরে সেই ২৪০০০ হাজার শ্লোকেই ভিত্তি করিয়া লক্ষশ্লোকযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছেন। বৈশম্পায়ন নিজেও বলিতেছেন—

ইদং শতসহস্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা॥
আদি, ৬২অ, ১৪।

অমিততেজস্বী সত্যবতীনন্দন এই শতসহস্র (লক্ষ) শ্লোকবিশিষ্ট ভারত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম ব্যাসদেবের পক্ষে ভাবিয়া চিন্তিয়া চব্বিশহাজারের অতিরিক্ত ৭৬০০০ হাজার শ্লোক রচনা করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। বৈশম্পায়নও বলিতেছেন যে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়াই এই লক্ষশ্লোক মহাভারত রচনা করিয়াছেন। তিনি এই লক্ষশ্লোক মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ॥
তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা।
আদি, ৬২অ, ৪০-১॥

ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যাণাং কৃতবানিদমদ্ভুতং॥
আদি ৬২অ ৫০॥

উপরোক্ত তিনটী শ্লোকের ভাব এই যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসর 'সতত উদ্যোগী' থাকিয়া এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াছেন। 'সতত উদ্যোগী' (সদোত্থায়ী বা নিত্যোত্থিতঃ) এই বিশেষণটুকু দিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহাভারত রচনা করিবার কালে ব্যাসদেব নিরলস হইয়া অবিশ্রামে তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এমন স্পষ্ট কথা থাকিতে আমরা ব্যাসদেবের লক্ষশ্লোক ভারত-রচনা কিছুতেই অসম্ভব মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

১। বঙ্কিম বাবু লক্ষশ্লোক রচনার কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত কৃঃ ৫৫ দেখ।

১৭। পর্ব্বসংগ্রহে কোন্ সংস্করণের বিষয় আছে।

এতক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতকে অন্ততঃ তিনবার সংস্কৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই তৃতীয় সংস্করণের মহাভারতবর্ণিত বিষয় গুলি পর্ব্বসংগ্রহে সৌতি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে (১৫ম পরিচ্ছেদে) দেখাইয়া আসিয়াছি যে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রী ভারতসংহিতার সূচীপত্রস্বরূপে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক অনুক্রমণিকা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সকলগুলি অনুক্রমণিকাধ্যায়ে উল্লিখিত হয় নাই; বরঞ্চ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে যাহা আছে, তাহা পর্ব্বসংগ্রহেও দেখিতে পাই। সুতরাং পর্ব্বসংগ্রহ যে মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণের পর যদি কোন সংস্করণ হইয়া থাকে, তবে তাহারই পর্ব্বসংগ্রহ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াও আসিলাম যে মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণের পরেও তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। অতএব পর্ব্বসংগ্রহে যে এই তৃতীয় সংস্করণের বিষয় সকল উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

ব্যাসদেব যে চব্বিশহাজারী সংস্করণের পর আর একটি লক্ষশ্লোক সংস্করণ করিয়াছিলেন এবং পর্ব্বসংগ্রহ যে সেই সংস্করণের পর্ব্বসংগ্রহ, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের শেষ পর্ব্ব স্বর্গারোহণপর্ব্ব; এই শেষ পর্ব্বের দুই তিন পর্ব্ব পূর্ব্বে অশ্বমেধ পর্ব্ব। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এই অশ্বমেধের বিষয় কিছুই উল্লেখ নাই কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহে আছে। এখন, বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—

"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥
প্রভুর্ব্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥
আদি, ৬৩অ, ৮৫ ৮৬।

অর্থাৎ ব্যাসদেব সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব এবং বৈশম্পায়নকে বেদ ও মহাভারত শিখাইয়াছিলেন; তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশ করিলেন। অশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রেও আছে যে, জৈমিনি ভারতকার এবং বৈশম্পায়ন মহাভারতকার। বেবর (Weber) সাহেব জৈমিনিভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব দেখিয়াছেন; আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে ১। তবেই দেখা যাইতেছে যে জৈমিনি এবং বৈশম্পায়ন উভয়েই ব্যাসদেবের নিকট স্বর্গারোহণপর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাভারত লাভ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহারা উভয়েই সাধারণভাবে কিরূপে অশ্বমেধ পর্ব্ব প্রভৃতির বিষয় রচিতে পারিলেন? এই সকল দেখিয়া আমাদিগের স্থির হইতেছে যে ব্যাসদেব মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণ করিয়াছিলেন এবং পর্ব্বসংগ্রহে এই তৃতীয় সংস্করণের পর্ব্বসংগ্রহ করা হইয়াছে।

১। কৃষ্ণচরিত্র পৃঃ ৬৪ দেখ।

সুরমা।

বিশাল গঙ্গার কায়া, তায় সন্ধ্যা রবি ছায়া
তরুণ তরঙ্গ ক্ষণে তায়
স্তন পানে সুখ ভরে, হেঁসে মাতা হৃদিপরে
শিশু যেন মস্তক উঠায়
বহে সুমধুর বায়, আন্দোলিত পতাকায়
নদী পরে তরী শোভা পায়
স্বগণে ডাকিয়া রবে, দলে দলে পাখী সবে
পর পারে নীরে উড়ে যায়
হেনকালে তরীপরে, বৃদ্ধা এক করে ধরে
তুলিয়া লইল সুরমায়
যোগী যথা যোগাসনে, ভাবিয়া হৃদির ধনে
প্রণয়ী বিনোদ বসি তায়
দোঁহে চায় দুই জনে, বৃদ্ধা ভাবে মনে মনে
তিন জনে অতি কুতুহল
ধীরে ধীরে দাঁড় পড়ে, কপোলে কুন্তল নড়ে
বায়ু ভরে অঞ্চল চঞ্চল
রাগে রবি ঢল ঢল, ঢল ঢল নদী জল
ঢল ঢল সুখ সুরমার
প্রেম দ্যুতি ভরা আঁখি, খেলিছে খঞ্জনপাখী
সজীব প্রতিমা সুরমার
যেজন না আত্মামানে, চাহিলে সে আঁখি পানে
রয় না সংশয় তায় তার
যখন যাহারে ফিরে, হৃদয়ের মেঘ চিরে
পিরীতের বিজুলি খেলায়
বিনোদ সে আঁখি চেয়ে, স্বর্গের আভাস পেয়ে
হৃদি সম্বরিতে নারে আর
সুরমা আমার কাছে, স্বপ্ন ইহা হয় পাছে
সত্য কহ প্রেয়সী আমার

কহরে আশ্বাস বাণী, হৃদয়ে প্রত্যয় মানি
সংশয়ে যে সর্ব্বসুখ হরে
এই যে প্রাচিনা যিনি, করুণা রুপিণী ইনি
মর্ত্ত পরে কৃপা বারি নরে
সুরমা বৃদ্ধায় চায়, বৃদ্ধা আঁখি ঠেরে তায়
বিনোদে চাহিয়া হেসে কয়
যে মেঘে গরজে যত, সে মেঘে না বর্ষে তত
মুখে যত হৃদে তত নয়
মধুর কথার ছলে, অবোধ বালিকা দলে
ভুলায় চতুর যুবাগণ
মধু শেষ হলে তার, নিকটে না যায় আর
পুরুষের ব্যাভার এমন
আমিত বালিকা নয়, বুঝি ছল সমুদয়
বুঝেছি যে পীরীতি তোমার
সুধু মধু লালসায়, অলি গুণ গুণ গায়
বাসি ফুলে পরসে না আর
অসির আঘাত প্রায়, হৃদয়ে বেদনা পায়
বিনোদ বৃদ্ধায় চাহি কয়
আমার হৃদয়ে যত, বাক্যে যদি ব্যক্ত তত
কেন তবে হৃদে ভাব রয়
কেন তবে দুঃখে জ্বলি, সদাই অপটু কলি
শতধিক দেই রসনায়
তরী নদী মাঝে আসে, দেখিয়া প্রাচীনা ভাষে
প্রেমী তবে বুঝিব তোমায়
এই আমি ফেলি জলে, তোল দেখি কুতুহলে
তোমার এ প্রেয়সীর হার
কণ্ঠহার ফেলে জলে, কণ্ঠহার পড়ে জলে
সুরমা কি কপাল তোমার

অগাধ অসীম জল, দুই রত্ন গেল তল
বুড়ি আহা বলে উচ্চ স্বরে
নিমিষেক সুরমার, ত্রিসংসার অন্ধকার
বাঁচে পুন নিমিষেক মরে
বুঝিল সে বিবরণ, বড় হল প্রিয়জন
হেয় প্রাণে পাছে ফেলে যায়
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িল না, কাঁদিলনা ভাবিলনা
নিমেষে লভিল বিজ্ঞতায়
প্রাচীনা চাহিয়া তায়, হেসে তুষে বলে হায়
গেল যাদু বালাই তোমার
তোমার জননী যিনি, দেখিব কি ধন তিনি
আমায় দিবে না পুরস্কার ?·
তোমার মাসীর ঘরে, মিলাইব পরস্পরে
বলে ছলে আনি দুই জনে।
দেশেতে কলঙ্ক রব, মাতা পিতা কাঁদে তব
সব জ্বালা ঘুচিল এক্ষণে।
তুমি হে সরলা অতি, বুঝনা লোকের মতি
পাগলে কি সঁপিবে তোমায় ?
না যদি পাগল হবে, কে হেন কোথায় তবে
ডুবে মরে লোকের কথায় !
পথে কথা কহিবানা, করিয়াছিলাম মানা
মর্ম্ম তার বুঝিলে এখন।
কি বুঝিবে যাদু ধন, হেন ক্ষিপ্ত কতজন
দেখিয়াছি যৌবনে তখন।
থাক গিয়া মাসী ঘরে, আনিব মাসেক পরে
সুখে বিয়া দিবে বাপ মায়
পাইবে সুন্দর বর, হেসে খেলে কর ঘর
মনে হবে তখন আমায়।
প্রাচীনা এরূপ ভাষে, শুনিয়া সুরমা হাসে
হাসি সে কি জানি না কেমন

না সন্তোষ রোষ তায়, নয় হাসি গরিমায়
সুধুমাত্র অধর কুঞ্চন।
তীরে উতরিল তরী, তরুণীর করে ধরি
নাবাইয়া বুড়ি লয়ে যায় ;
মন্দ মন্দ পদ পড়ে, নিতম্ব কুন্তল নড়ে
ছুরী বিঁধে সুরমার পায়।
সুরমা ফিরিয়া চায়, কারে না দেখিতে পায়
তবু যেন পিছনে কে বলে,
এরে কি পিরীতি বলে, আমায় ডুবায়ে জলে
অনায়াসে তুমি গেলে চলে।
মাসী ঘরে উতরিল, মাসী সব জেনেছিল
ধন্য প্রেম বিদ্বেষী সংসার ;
হৃদয়ে ধরিয়া নিল, মুখ চন্দ্র প্রচুম্বিল
ছল ছল আঁখি সুরমার।
হাসে ভাষে, পিয়ে খায়, এরূপে মাসেক যায়
গেছে রোগ ভাবে সব জন।
পূর্ণ তরণীর পরে, তরুণীর করে ধরে
তুলে বুড়ি চলে নিকেতন।
পুন সুমধুর বায়, গঙ্গা তরঙ্গিত কায়
পুন সন্ধ্যা রাগ ঢল ঢল।
ধীরে পুন দাঁড় পড়ে, কপোলে কুন্তল নড়ে
নড়ে পুন অঞ্চল চঞ্চল।
বিনোদ ঘুমায় যথা, পুন তরী এল তথা
সুরমা কহিল প্রাচীনায়।
এই তো সে স্থান মাসী, তবে আমি দেখে আসি
বলে অঙ্গ ঢালিল গঙ্গায়।
তথনি পশিল তল, ঘুরিল ফেনীল জল,
বুড়ি ভয়ে ধর ধর বলে।
নাবিক ডুবিয়া তায়, কিছু না খুঁজিয়া পায়
প্রেমিক কি রয় রসাতলে

ভালোরে প্রেমের লীলা,অপ্রেমীরে শিখাইলা
তুমি বালা শিখিলে কোথায় ?
বনে ফুল বিকসিত, গন্ধে পিক আমোদিত
কে তাহারে সৌরভ শিখায়।
সুরমার বাপ মায়, পেয়ে বার্ত্তা প্রাচীনায়
দৈত্যদলে গণিল আপনা।
তনু তরী যাতনার, ছেড়ে ডুবে হল পার
সুচতুর প্রেমী দুই জনা
অঙ্গ ঢেলে চন্দ্রিকায়, সে গবাক্ষে দুজনায়
এসে বসে ভাসিবে এখন।
পুরবাসী নিদ্রাভোগে,শুনিবে স্বপন যোগে
কিন্নরের সংগীত কেমন।
নিদ্রাগত জননীরে, সুরমা কহিবে ধীরে
কহিবে মা করনা রোদন।
তোমার অবোধ মেয়ে, দেখ মা বারেক চেয়ে
কত সুখী হয়েছে এখন

এখন এসেছি যথা, প্রেম নয় পাপ তথা
নাহি ধন মান অহঙ্কার।
সবে ফুল্ল মুখে হাসে, সবে সবে ভালবাসে
নাই মাগো গঞ্জনা প্রহার।
শোকে তাপে পরে পরে,মাতা পিতা মাসীমরে
সে প্রাচীনা লভেছে নিধন।
কেহ তারা নাহি আর,হেন প্রেম ঘটনার
আছে মাত্র স্মৃতির ঘোষণ।
অদ্যাবধি সেই স্থল, ঘুরে ঘুরে ফুলে জল
প্রণয়ীর হৃদির প্রকার।
তরী বেয়ে যারা যায়, ফুল চিনি ফেলে তায়
জিজ্ঞাসিলে বলে কর্ণধার।
বিনোদ সুরমা নামে,ছিল প্রেমী এই গ্রামে
ডুবে মল দুজনে হেথায়।
সে হতে এ দহ হয়, প্রেমদহ সবে কয়
পড়িলে উতরে উঠা দায়।

অভাগিনীর আত্মকথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কত কি ভাবনা!

যত দিন যাইতে লাগিল ভুবনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা তত বাড়িতে লাগিল। দিবারাত্রি একত্রে বাস করাতে দুইজনের হৃদয় যেন এক হইয়া আসিল; দুইটী নদী যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া একত্রে মিশিল; যেন উভয়েরই এক গতি, উভয়েরই সমান উদ্দেশ্য— কিন্তু ভাই কেশব! জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা তখন আমি তত বুঝিতে পারি নাই। আমি তখন এইমাত্র বুঝিয়াছিলাম যে, বুঝি কেবল কষ্টভার সহিবার নিমিত্তই আমি জগতে আসিয়াছি। ভুবনমোহিনীর সেই পদ্মের মত বড় বড় মনোহর চোক দুইটী সর্ব্বদাই জলে ভাসিতে দেখিয়া, সর্ব্বক্ষণই তাহাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, সেও আমার মত চিরদুঃখিনী। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,

আমাকে কাঁদিতে দেখিলেই সে কাঁদিয়া ফেলিত; আমার মুখ একটু মলিন হইলেই তাহার চক্ষু ছল ছল করিত। আমি সেইজন্য কাঁদিয়াও সুখ পাইতাম; ভাবিতাম—এ জগতে ব্যথার ব্যথি আছে। এই আশ্বাসে আমি ভুলিয়া রহিলাম, আসল কথা জানিতে চেষ্টা করিলাম না। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল;—এক এক দিন করিয়া ক্রমে এক মাস দুই মাস,—দেখিতে দেখিতে ছয় মাস ফুরাইল, আমি সেই মায়াপুরীতে মায়াময়ী ভুবনমোহিনীর সঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলাম। মায়াপুরী বলিলাম এইজন্য সেখানকার সকলই বিচিত্র। সেই বাটীর শোভাসৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি বাস্তবিকই সেটীকে মায়াপুরী বলিয়া মনে করিলাম। ভুবনমোহিনী সেই মায়াপুরীর অধীশ্বরী; দাসদাসী তাহারই আজ্ঞাবহ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন দাসদাসীকে আমি একদিনেরও জন্য কথা কহিতে দেখি নাই। আমি কত বার কত দাসীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমার কোন কথার উত্তর দেয় নাই। বড়ই সন্দেহ হইল; একদিন দিদিকে—তোমার মনে থাকিতে পারে যে, ভুবনকে আমি দিদি বলিতাম—একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম।

ভুবন বলিল,—"ইহারা সকলে বোবা, কথা কহিতে পারে না।"

আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম; ভাবিলাম এত বোবা কোথা হইতে আসিল? দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

দিদি বলিল,—"এখানকার সকল দাসদাসীই বোবা; বোবা ভিন্ন কেহই এখানে থাকিতে পায় না।"

"ইহার কারণ কি?"

"পরে জানিতে পারিবে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, আর অধিক জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কিন্তু সেই একটা বিষম সন্দেহ আমার মনোমধ্যে রহিয়া গেল। সেই দিন হইতে আমি সময়ে সময়ে ভাবিতাম বোবা ভিন্ন কেহই এখানে চাকুরী করিতে পারে না কেন? মনের আবেগ দমন করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু সে সেই একই কথা বলিত, "পরে জানিতে পারিবে।" সন্দেহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একদিন আমি দিদির কাছে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে একটা চাকর আসিয়া দিদিকে একখানি পত্র দিল। আমি দিদির মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম; দেখিলাম পত্র পাইবামাত্র তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে পত্রখানির আদ্যোপান্ত পড়িল। তাহার শুষ্কমুখ ক্রমে গম্ভীরভাব ধারণ করিল; সে চাকরের দিকে ভ্রূকুটী করিল। চাকর প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কেশব! তুমি জান আমি লিখিতে পড়িতে জানি না; সুতরাং পত্রখানি দেখিবার জন্য আমার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না। তবে সেই চিঠিখানি পড়িয়া দিদির মুখ তত ভারি হইল কেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; আমি দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। পত্রখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া দিদি একটা দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিল; তাহার পর আমাকে বলিল "ভগিনি! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই

আসিতেছি।” দিদি চলিয়া গেলে আমি অপার ভাবনায় ডুবিলাম। আমি কোথায় রহিয়াছি? এখানে এত লুকোচুরি কেন? কেন দিদি আমার কাছে সকল কথাই গোপন করিয়া রাখিয়া বলে “পরে জানিতে পারিবে?” আর কবে কি জানিতে পারিব? অভাগিনী—অকূল সাগরে একাকী হাবুডুবু খাইতেছি; যাহাদিগকে সহায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, অবশেষে তাহারাই কি কুম্ভীর হইয়া আমাকে গ্রাস করিবে? হায়! পিতা কোথায়? শুনিতেছি তিনি এই কারাগার মধ্যেই আছেন; কিন্তু এতদিন গত হইল, কৈ তাঁহাকে ত একবার দেখিতে পাইলাম না? তবে কি সকলই প্রতারণা? সমুদয়ই কি মায়াজাল? হায়! নারীর জীবন, কেন আসিস্? কেন থাকিস্? থাকিস্ ত স্বেচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া বুঝিয়া শুঝিয়া চলিস্ না কেন? পরের প্রলোভনে কেন ভুলিস্? এ জগতে কে তোর আপনার? পিতামাতা, ভাই বন্ধু, কেহই আপনার নয়; সময়ে সকলেই ত্যাগ করে। স্বার্থের অনুরোধে জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী জননী তোকে লালন পালন করেন। কন্যা সুখী হইলে, পিতামাতাকে সুখী করিতে পারিলে, তাঁহারা ভালবাসেন; কন্যা দুঃখিনী হইলে তাঁহারা তাহাকে ত্যাগ করেন। এই ত পিতামাতার স্নেহ; কিন্তু যিনি পরমাত্মীয় সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না; যিনি নিঃস্বার্থ প্রণয় ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না; সেই টুকু পাইলেই যিনি কৃতার্থ হয়েন; সেই রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব পতিদেবতা যাহার ছাড়িয়া গেছেন; তাহার আর বাঁচিয়া সুখ কি? সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিল; পিতামাতা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল; আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বিনা কারণে তাহার মাথায় পাপের পসরা চাপাইয়া দিল! তবে তাহার বাঁচিয়া সুখ কি? তবে তাহার জন্ম কিসের জন্য? হায়! আমি কেন—মরিলাম না—

“ছি! ভগিনি, কাঁদিতেছ কেন?” বলিয়া দিদি আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল এবং সস্নেহে চখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

আমি আরও কাঁদিতে লাগিলাম; বলিলাম, “দিদি! কাঁদিবার জন্যই অভাগিনীর জন্ম; তবে কাঁদিব না কেন?”

“তুমি এখন কি চাহ? কি হইলে তুমি এখন সুখে থাক?”

“আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। এ সুখঐশ্বর্য্যে আমার দরকার কি?”

“আর তোমার বাবাকে তুমি দেখিতে চাও না?”

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; আমি জানিতাম বাবা দেশে চলিয়া গিয়াছেন, এখন ভুবনমোহিনীর এই কথা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বাবা এখনও আমার মত এই কারাগারে আবদ্ধ আছেন। আমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; দিদির পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, “দিদি! আমি আর কিছুই চাহি না, আমার বাবাকে একবার দেখিতে দাও।”

ভুবন ক্ষণকাল ভাবিল, তাহার গোলাপের ন্যায় গণ্ডদেশের উপর দিয়া যেন মেঘের উপর মেঘ চলিয়া যাইতে লাগিল; পরক্ষণেই বলিল "কাঁদিও না, আজ রাত্রেই তোমার বাবাকে দেখিতে পাইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিতৃ সন্দর্শন।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, কতক্ষণে রাত্রি আইসে। দুঃখের দিন শীঘ্র ফুরায় না, কিন্তু সুখের রাত্রি যেন দেখিতে দেখিতে পোহাইয়া যায়। যাহাদিগের হৃদয় পাপে কলুষিত, তাহারা অন্ধকার ভালবাসে, তাহারা রাত্রির উপাসনা করে, কিন্তু আমার হৃদয়েত তখন কোন পাপের ছায়া পতিত হয় নাই, তবে আমার রাত্রি ভাল লাগিত কেন? আমি চিরদুঃখিনী, দিনের বেলায় সেই দুঃখ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিত, কিছুতেই সুখ পাইতাম না; সূর্য্যদেব যেন দুঃখ দেখিয়া বিকট হাস্য করিতেন, যাহারা সেবা শুশ্রূষা করিতে আসিত, তাহারা যেন মনে মনে হাসিত; দিবার প্রফুল্ল হাস্যে যেন সমস্ত জগৎ হাস্যময় বলিয়া বোধ হইত, কেবল একা আমি কাঁদিতাম। সেই হাস্যময় জগতে আমার সে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হইত না, সেই জন্য আমি রাত্রি ভাল বাসিতাম। রজনীর অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া জগৎ সংসার যেন আমারই জন্য আমার মত কাঁদিত; সেই জন্য আমার রজনীর অন্ধকার ভাল লাগিত। দিবসের আলো যত কমিয়া আসিত, আমার মনে যেন ততই একটু একটু আরাম বোধ হইত, হৃদয়ের শোকভার যেন ততই কমিয়া আসিত। আজি বাবাকে দেখিতে পাইব, সেই আনন্দে আমি রাত্রির মুখ চাহিয়া রহিলাম। সেদিন দিবসের পরিমাণ বাড়িয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাগানের দিকে যত চাহিতে লাগিলাম, ততই দিন বাড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বড় বড় গাছের ছায়ার দিকে চাহিলাম, বোধ হইতে লাগিল যেন ছায়া ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। ক্রমে মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল সেই সময়ে দিদি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল; তাহার মুখখানি যেন হাস্যময়। পাশেই একটী স্নান করিবার ঘর ছিল; দিদি আমার হাত ধরিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে হাসি দেখিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম "একি রঙ্গ!"

ঘরের ভিতর নানারকম গামলায় নানারকম জল তৈয়ারি ছিল;—কোনটীতে গরম, কোনটীতে ঠাণ্ডা, আবার অন্য কোন একটী গামলায় সুবাসিত—এই রকম নানাপ্রকার জল প্রস্তুত ছিল। দিদি সেই সকল গামলা থেকে নিজে জল লইয়া তোয়ালে দিয়া আমার গা রগড়াইয়া দিতে লাগিল,

তাহার পর নিজের হাতে গা ধুয়াইয়া ও মুছাইয়া দিয়া একখানি বেনারসী শাড়ী পরাইয়া দিল। তখন আমি বলিলাম "এ কি করিতেছ বিধবার আবার এ সজ্জা কেন? যাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহাকে কি শাড়ী পরিতে আছে?"

দিদি কোন উত্তর দিল না। আমি পুঁতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর সে একটী বাক্স হইতে নানারকম জড়োয়ার গহনা বাহির করিয়া আমাকে পরাইয়া দিল। মাথায় একখানি হীরার মুকুট পরাইয়া দিল, তাহার পর মুখের কাছে আরসি আনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "দেখ কেমন দেখাইতেছে। এ রূপ নইলে কি এসব গহনা শোভা পায়?" আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার মন তখন বাবার জন্য ব্যাকুল, সুতরাং এই সকল আড়ম্বরে সুখ দুঃখ কিছুই হইল না। ঐ কথা বলিয়া দিদি আমার হাত ধরিয়া আমায় ঘরের ভিতর আনিল;—দেখিলাম ঘরের চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে; ঘরের দেওয়ালে ছবি ও দেওয়ালগিরি, মাঝ-খানে ঝাড়,—সমস্তগুলিই বেলোয়ারির। ভাল ভাল কেদারা, মখমল দিয়া মোড়া, তাহাতে জরির কাজ করা, জরির বুটো দেওয়া; সকলগুলির মাঝখানে এক-খানি উঁচু কেদারা; সেখানি দেখিয়া সোণার বলিয়া বোধ হইল, বেশ কাজ করা, ফুলকাটা—লতাপাতা দেওয়া।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘরে যতগুলি ঝাড় লণ্ঠন ছিল, সমস্তই জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুন্দর সুন্দর টেবিলের উপর সোণার ফুলদানে নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের তোড়া সাজান রহিয়াছে, তাহাতে সমস্ত ঘর আমোদিত। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ভাবিলাম এত আড়ম্বর কেন? আমাকে একটু অন্যমন হইতে দেখিয়াই দিদি হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া সেই সোণার বড় কেদারায় বসাইল এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। তখনই বাহিরে মধুর হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিতে লাগিল এবং সেই মধুর সুরে মধুর কণ্ঠস্বর মিলাইয়া কতকগুলি সুন্দর রমণী গাহিতে গাহিতে আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সেই সুমধুর সঙ্গীত এখনও যেন আমার কাণের কাছে শুনিতেছি, গানের কথা-গুলি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু সেই স্বর্গীয় সুর ও মোহন দৃশ্য যেন আমি এখনও স্পষ্ট শুনিতেছি—স্পষ্ট দেখিতে পাই-তেছি। কতক্ষণ ধরিয়া সেই রকম গান হইল, মনে নাই, গানের মোহে আমি সকলই ভুলিয়া গেলাম। সকল গায়িকারই সমান বয়স, সমান রূপ, সমান বেশ বিন্যাস। সকলেরই ফুলের সাজ। তাহাদের সেই মনোহর বেশ ও স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি পরীরাজ্যে সমস্ত পরীর মধ্যে নন্দনকাননে বসিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ সমস্ত সঙ্গীত থামিয়া গেল, গায়িকামাত্রই আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন সময়ে বাবার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,—সেই ঘরের মধ্য হইতেই বাবা বলিলেন "মা মোহিনি!—"চকিত ভাবে উঠিয়া দাড়াই-লাম। বাবা সম্মুখে—তাঁহার কোলে উন্মাদিনী বালিকার মত পড়িলাম,—পড়িয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া

কাঁদিতে লাগিলাম। বাবার তখন কি সজ্জা ছিল, তাহা দেখি নাই, তাঁহার গলার স্বর শুনিয়াই আমি পাগল হইয়াছিলাম।

বাবা সস্নেহে আমার মুখ মুছাইয়া দিয়া সাদরে বলিলেন "মা! তুমি বাঁচিয়া থাক, তোমারই কল্যাণে আমার আজ এত গৌরব।" তখনই আমার চমক ভাঙ্গিল, বাবার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইলাম—দেখিলাম তাঁহার গলায় এক ছড়া রত্নমালা ঝাড়ের আলোয় ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, পরিধানে গরদের জোড়। গরীবের মেয়ে মুক্তার মালা বা হীরের কণ্ঠী কখন দেখি নাই, কিন্তু ভুবন দিদির অনুগ্রহে তাহা দেখিয়াছিলাম ও সাধ মিটাইয়া পরিয়াছিলাম। বাবার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, মুখখানি হাসি হাসি। তখন আমার মন সন্তুষ্ট হইল, বুঝিলাম—তবে তিনি সুখে আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমাকে কি একবার দেখা দিতে নাই?"

বাবা "আমি এই আশ্রমেই আছি, প্রত্যহ তোমার খবর পাই, তুমি সুখে আছ তাহাও শুনিয়াছি, সেই জন্য দেখা করিতে আসি নাই।"

"তবু কি একবার দেখা দিতে নাই।" বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বাবা মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা! আমি একটী বিশেষ ব্রতে প্রবৃত্ত ছিলাম, সেই জন্য আসিতে পারি নাই। এখন প্রত্যহ দেখা হইবে।"

বাবা বলিলেন "ব্রত"—"আশ্রম" আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ভাবিলাম "এই কারাগারে আবার আশ্রম বা ব্রতই বা কি?" হায়! অভাগিনী আমি, তখন বুঝিতে পারিলাম না যে, কি ব্রত;—বুঝিলে আজি আমার এ দুর্দ্দশা হইত না। আমি তাহা হইলে সেই জগতের পতি অনন্ত দেবকে পতিরূপে লইয়া অনন্তকাল পতিসোহাগিনী সধবা হইয়া থাকিতাম। হায় কেশব! প্রাণের ভিতর কি যে করিতেছে তাহা আর কি বলিব? এক দিন এই অভাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব, পতিতার সেই পাবনকর্ত্তা সেই স্বর্গীয় প্রভু ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ভাবিয়া দেখিলে, বুঝিয়া চলিতে পারিলে কেহই বিধবা হয় না। লোকে যেমন জীর্ণ বসন ছাড়িয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, পুরুষও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন—স্বর্গে তাঁহার অনন্ত ধাম, অনন্ত জগতে তিনি অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং রমণী ইচ্ছা করিলেই সেই পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধরিয়া দিবারাত্রি রমণ করিতে পারে, সেই জন্য পার্থিব পতিকেই পরমপতি বিশ্বপতি ভাবিয়া পূজা করা উচিত। এরূপ করিলে যদি কালে বা অকালে তাঁহার লোকান্তর হয়, রমণীকে কখনই বিধবা হইতে হয় না। সেই জন্য এ জগতে কোন রমণীই বিধবা নহে।"

হায়! তখন যদি ঐ অমূল্য কথার মহিমা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমি রাণীর রাণী হইতাম। তাহা হইলে কোটি কোটি লোক আজ আমাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। কিন্তু কেশব, আমি সেই স্বর্গীয় প্রভুর স্বর্গীয় বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। সেই জন্য বাবা সেদিন "ব্রত" "আশ্রম"

বলিয়া কি বলিলেন, তাহা আমার মনে প্রবেশ করিল না।

বাবা আমাকে বলিলেন "মা! তুমি ভাবিও না, ব্যাকুল হইও না। নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করিলে কাহারও বিপদ ঘটে না। আমি সুখে বা দুঃখে থাকি, তাহার জন্য আমি দুঃখিত হই না, কারণ আমি জানি মানুষের সকল অবস্থাই সমান। এই সমান জ্ঞান হইলে তাহাদের কষ্ট থাকে না। তুমি সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করিতে শিখিবে, তাহা হইলে তোমার সৌভাগ্যের দ্বার শীঘ্র খুলিবে, তুমি রাণীরও রাণী হইবে। আজ তুমি যে বেশ ধারণ করিয়াছ, আজ তোমার যেরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে, যদি আমার কথামত চিরকাল চলিতে পার, তাহা হইলে তোমার এ বেশ—এ গৌরব, কিছুতেই যাইবে না। কিন্তু বৎসে! অগ্রে ব্রত ধারণ করিতে হইবে, এবেশ তোমাকে এখনি ত্যাগ করিতে হইবে, এ সুখ ঐশ্বর্য্য এখনি ছাড়িতে হইবে—ছাড়িয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া মহাব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে। আমার গলে এই যে মুক্তার মালা ও হীরার কণ্ঠি দেখিতেছ, ইহা অতীব সামান্য, এই রত্নমালা ও পট্টবস্ত্র এখনি ত্যাগ করিব,—করিয়া কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইব। যদি জীবন থাকিতে সেই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিবে এইরূপ শত সহস্র রত্নমালা অম্লানভাবে অনন্তকালের জন্য আমার কণ্ঠে চিরবিরাজ করিবে। কল্য প্রাতে তোমার দীক্ষা হইবে। অদ্য অধিবাস, ভুবন তোমাকে সকল কথা বলিবেন।"

নবম পরিচ্ছেদ।

অধিবাস।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বাবা চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় আবার বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন "ভুবন যাহা বলিবে তাহাই করিবে, ভুবন যদি তোমাকে বিষ খাইতে বা আগুনে পুড়িতে বলে, তুমি তখনই তাহা করিবে; ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে—আমার মঙ্গল হইবে—দেশের মঙ্গল হইবে। আমার জন্য তুমি ভাবিও না, কল্য প্রত্যূষে আবার আমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

বাবার মুখে দিদির এত প্রশংসা শুনিয়া আমি একবারে তাহার একান্ত অধীন হইয়া পড়িলাম—ভাবিলাম এ সংসারসাগরে ইনিই আমার একমাত্র সহায়। ইনি ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। বাবা বলিলেন "কল্য প্রাতে দীক্ষা হইবে, আজ অধিবাস" দীক্ষা কি, অধিবাসই বা কি, তাহা আমি জানিতাম না। সেই জন্য দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি! এখন কি করিতে হইবে?"

দিদি বলিলেন "চল আমরা এখান হইতে যাই, আজ রাত্রি আমাদিগকে অনন্তের ঘরে থাকিতে হইবে।"

অনন্ত কে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি অনন্ত কে?"

"যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, বিষ্ণুরূপে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বভূত যাঁহার ইচ্ছায় বিকাশমাত্র। আজি তাঁহারই জন্য অধিবাস, কাল প্রত্যুষে তাঁহারই ব্রতে দীক্ষিত হইবে। এখন চল সেই পরম পুরুষ নারায়ণ অনন্তদেবের গৃহে যাই।" বলিয়া দিদি আগে আগে চলিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। সে সময়ে মনে কত কি চিন্তা হইতে লাগিল, তাহা মনে নাই, তবে এইমাত্র মনে আছে যে, তখন সংসারের কোন চিন্তাই রহিল না, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, ঘর দ্বার সবই ভুলিয়া গেলাম, প্রতিমুহূর্ত্তে কেবল সেই অনন্তের কথা ভাবিতে লাগিলাম, যাঁহাকে ভাবিলে জীবের সকল কষ্ট দূর হয়, যাঁহার বিপত্তারণ মধুসূদন নাম স্মরণ করিলে জীব অনন্ত বিপদ সাগর হইতেও পার হইতে পারে, আজ তাঁহার গৃহে যাইতেছি—আজি তাঁহাকে কি দেখিতে পাইব না? আজি তাঁহাকে দেখিয়া কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না? মন এতদূর একাগ্র হইয়াছিল যে, দিদি তখন আমার অঙ্গের সমস্ত আভরণ খুলিয়া আমাকে গেরুয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই—অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম। হায়! সেই একাগ্রতা যদি থাকিত, তাহা হইলে আমি রাণীর রাণী হইতাম, তাহা হইলে এই শ্মশান সৈকতে দাঁড়াইয়া আজি আমাকে এত কাঁদিতে হইত না, তাহা হইলে কত লোক আসিয়া আমার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা লইত। হায়! সেই একাগ্রতা যখন নষ্ট হইল, তখনই আমার মৃত্যু হইল না কেন? হায় সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ে যে পবিত্র ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, আজি তাহা ভাবিতে গেলেও এই পাপ কলুষিত পঙ্কিল মনও ক্ষণকালের জন্য স্বচ্ছ হইয়া উঠে। কিন্তু এখন কাঁদিয়া ফল কি?

অনন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে দিদির সঙ্গে আমি চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিলাম, কতদূর আসিলাম, কোন্ পথে কোন্ দিক দিয়া আসিলাম—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র বোধ হইল যেন হঠাৎ দাঁড়াইলাম। দিদি বলিলেন, "দাঁড়াও, দেখ এই অনন্তের গৃহ,—চারিদিকে অনন্তের ছবি—ভাল করিয়া দেখ।" দিদি বলিলেন, কিন্তু তাহা যেন দিদির কণ্ঠস্বর নহে; কে যেন অনন্ত আকাশের কোন স্থান হইতে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চারি দিকে অনন্তের ছবি—ভাল করিয়া দেখ।" চারি দিকে চাহিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়া আত্মহারা হইলাম—দেখিলাম অনন্ত মহাশূন্য—আধার নাই—অবলম্বন নাই—সীমা নাই;—সেই অনন্ত মহাশূন্যের অনন্ত গর্ভে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ সমেত ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে—ঘুরিয়া, ফিরিয়া, অনন্ত মহাকাশ ভেদ করিয়া অনন্ত দিকে ছুটিতেছে; ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরমাণুতে মিশিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সেই অনন্ত মহাকাশ গর্ভে সেইরূপ কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেইরূপে দেখা দিল, আবার সেইরূপ গতিতে

অনন্ত পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছুটিতে লাগিল; আবার পরস্পরের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরমাণুতে মিশাইয়া গেল। কতবারই যে এইরূপ দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পরিশেষে স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত দেহে যেমন মুহূর্ত্তের জন্য নয়ন মুদিলাম; অমনি সেই সকল দৃশ্য যেন ভোজবাজির মত হঠাৎ অদৃশ্য হইল। তখন যাহা দেখিলাম, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; কাঁদিয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু নিজের ক্রন্দনধ্বনি নিজেই শুনিতে পাইলাম না। দেখিলাম সর্ব্বত্রই অনন্ত মহাসাগর;—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ভূতল, রসাতল, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ—কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; দিগ্বিদিক্ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সর্ব্বত্রই সেই মহাসমুদ্র; আকাশ-পাতালের ব্যবধান নাই; সবই জলময়। সেই অনন্ত জলরাশির উপর আমি একাকী ভাসিয়া চলিয়াছি; কোন দিকে কেহই কোথাও নাই। নিজের দেহ কত ছোট, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভাসিতে ভাসিতে কতদূর চলিলাম, তাহা মনে নাই। কতক্ষণ পরে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া একটী ছোট বটপত্রের একপার্শ্বে গিয়া নামিলাম। আধার পাইয়াছি বুঝিতে পারিয়া বটপত্রের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—দেখিলাম সেই ক্ষুদ্র বটপত্রের এক কোণে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত এক শিশু শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই শিশু হাসিল; যেমন হাসিল অমনি তাহার মুখের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিলাম;—সেইরূপ অসীম অনন্ত মহাকাশে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র অনন্তপথে ছুটিতেছে; অনন্ত গ্রহনক্ষত্র অসীম বিরাট দেহে অগণ্য ধূমকেতুকে আবর্ত্তন করিয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইতেছে, আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মাথা ঘুরিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; কে যেন সেই আধারহীন অনন্ত মহাসাগর হইতে অনন্ত আকাশ-পথে আমাকে একটী অশ্বত্থবীজের মত ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। আমি বিকট চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম। কোথায় পড়িলাম; কি ভাবে পড়িলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; আমার চিত্ত তখন বিভ্রান্ত, মস্তিষ্ক আলোড়িত, চেতনা বিলুপ্ত। কতক্ষণ সে ভাবে পড়িয়া রহিলাম, বলিতে পারি না। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম আমি একখানি কুশাসনে বসিয়া রহিয়াছি,—পার্শ্বে এক অপূর্ব্ব যোগিনীমূর্ত্তি; তাঁহার মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। জটার সহিত, দুই কর্ণে, কণ্ঠে, বক্ষে, বাহুতে ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ ও তুলসী-মালা জড়িত। ললাটে সিন্দুর বিলেপিত;—তাহার নীচে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক; হস্তে প্রকাণ্ড ত্রিশূল। ভীম গম্ভীর বেশ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শশব্যস্ত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রণাম করিলাম; তিনি মৃদুগম্ভীর কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"পরম পতি বিশ্বপতির চরণে মতি হউক।"

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

৪। ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রজ্ঞাবাদ।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে কারণবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বপক্ষে অতি গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করে। এইবারে দেখিব যে প্রজ্ঞাবাদ বা শিল্পবাদও (Argument from Design) আর একদিক দিয়া তাঁহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে আমরা জগতে মানববুদ্ধির অতীত কৌশলপরম্পরাকে কার্য্য করিতে দেখিয়া সহজজ্ঞানের বলেই ঈশ্বরকে এই বিশ্বরচনার শিল্পী ও রচয়িতা বলিয়া উপলব্ধি করি। উদ্দেশ্য এবং তৎসাধনোপায় কৌশল স্থির করা আমাদের জ্ঞানের একটী অঙ্গ এবং এই অঙ্গটী থাকাতে আমরা সর্ব্বদাই জ্ঞানের পরিচায়ক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছি। আমরা উপযুক্ত উপায় বাছিয়া লইয়া আমাদের মানসিক ভাব সকলকে কার্য্যে পরিণত করি। এথানে দেখি যে আমাদের কৃত কার্য্যের আমরাই প্রকৃত কারণ এবং আমাদের জ্ঞান আমাদের ইচ্ছার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের জ্ঞান না থাকিলে আমরা অভিলষিত কার্য্য করিবার ইচ্ছাও করিতাম না এবং যদি বা ইচ্ছা করিতাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম না। আমরা যে কার্য্য করিতে গেলে জ্ঞানপ্রয়োগ প্রয়োজন, অন্য কোথাও সেই কার্য্যের অনুরূপ কোন কার্য্য ঘটিতে দেখিলেই স্থির করিয়া লই যে তাহা আমাদিগেরই ন্যায় কোন সজ্ঞান মনুষ্য কর্ত্তৃকই সংঘটিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সহজজ্ঞানসিদ্ধ, তর্কের দ্বারা উপনীত নহে। পরিমাণে অল্পই হউক বা অধিক হউক, আমরা কোন কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা, কৌশল বা উপযোগিতা দেখিলেই তাহাতে জ্ঞানের পরিচয় না দেখিয়া থাকিতে পারি না—ইহা আমাদের চিন্তার একটী নিয়ম। একটী প্রাসাদ দেখিলেও তাহাতে জ্ঞানের পরিচয় পাইব এবং একটী কুটীর দেখিলেও তাহাতে জ্ঞানের পরিচয় পাইব; এই দুই জ্ঞানের বস্তুগত সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। আমাদের সহজজ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে জ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদের অন্তরে আছে এবং আমাদের কৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ, কৌশলপূর্ণ প্রভৃতি কার্য্যের কারণ একমাত্র আমাদের এই জ্ঞান এবং এই কারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ, কৌশলপূর্ণ প্রভৃতি কার্য্য দেখিলেই আমরা জ্ঞান বা বুদ্ধিকে তাহার কারণ বলিয়া স্থির করি।

কৌশল, শৃঙ্খলা, উপযোগিতা প্রভৃতির কাবণ একমাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধি, এই সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখা যাউক যে প্রকৃতিতে কৌশল প্রভৃতির এবং সুতরাং জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় কি না। প্রকৃতি যে কৌশলের, শৃঙ্খলার, উপযোগিতার

দৃষ্টান্তরাশিতে পরিপূর্ণ. তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বায়ু, সমুদ্র, পৃথিবী এইরূপ দৃষ্টান্তে ডুবিয়া আছে। তাহারা আমাদের প্রশংসা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার নহে, প্রত্যুত ইহা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ 'শোভন সুন্দর'। এই ব্রহ্মাণ্ড যে এক জ্ঞানময় পুরুষের হস্ত-রচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইহা আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানবের এতদূর স্বভাবসিদ্ধ বা সহজজ্ঞানসিদ্ধ যে বর্ত্তমান যুগে নাস্তিক্যবাদের প্রধান প্রচারক ডেভিড্ হিউমকেও এই কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। একদিন মধুর সন্ধ্যা-বেলায় তিনি একটী বন্ধুর সহিত বাটী আসিবার কালে তাঁহাকে বলিলেন যে কেহই আকাশের দিকে চাহিলে না অনুভব করিয়া থাকিতে পারে না যে ইহা কোনো জ্ঞানময় পুরুষ কর্তৃক সজ্জিত হইয়াছে "No one can look up to that sky without feeling that it must have been put in order by an intelligent being." যে জ্ঞান এই সমগ্র প্রকৃতিকে শোভন-সাজে সজ্জিত করিয়াছে, সেই জ্ঞান কি আমাদের ন্যায় পরিমিত জ্ঞান? না, তাহা পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপের অনন্ত জ্ঞান।

স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ এই একটী নিতান্ত অযৌক্তিক আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যন্ত্রাদি মনুষ্য হস্তের দ্বারা সংগঠন করে কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য সকল সহস্র কৌশলময় হইলেও কাহারও হস্তের দ্বারা সংগঠিত হইতে দেখি না, আপনাপনি সংগঠিত হইতে দেখি, সুতরাং প্রকৃতির কার্য্যে জ্ঞানের পরিচয় স্বীকার করি কিরূপে? তাঁহারা সহজ-জ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কৌশলপূর্ণ প্রাকৃতিক কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানের কারণত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহা-দিগের কেহ কেহ বলেন যে একটা প্রাকৃতিক তত্ত্ব হইতে এই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তত্ত্বকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার কর্ত্তা আত্মা ব্যতীত তত্ত্ব যে কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমার একটা জলস্রোতকে উচ্চে উঠাইবার প্রয়োজন আছে। জলের এই একটী তত্ত্ব আছে যে চাপ দিলেই জল ঊর্দ্ধ-দিকে উঠিয়া থাকে। কিন্তু আমি যদি কোনো চাপ প্রয়োগ না করি, তাহা হইলে তত্ত্ব কি আপনাপনি কার্য্য করিতে পারে? না, তাহাকে নিযুক্ত করিবার কর্ত্তা চাই।

পূর্ব্বোক্ত মতের ন্যায় অপরাপর বৈজ্ঞানিক অপরাপর মত প্রচার করেন; কিন্তু সেইগুলি এত সুস্পষ্ট ভ্রমাত্মক যে তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই—দেখিলেই বুঝা যাইবে। এইবারে আমরা একটী মত আলোচনা করিয়া দেখিব, যাহা বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক একবাক্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং যাহা, অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, ঈশ্বরের জ্ঞান-স্বরূপের অপেক্ষা না রাখিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই বিশ্বচরাচরের উৎপত্তির কারণরূপে পরিগণিত হই-তেছে—এই মতটীর নাম অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution)। এই মতটী যে সর্ব্বাঙ্গীন সত্য বলিয়া প্রমাণিত

হইয়াছে, তাহা নহে; তবে ইহা যে অনেক অংশে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সত্য হইলেও যে জ্ঞানময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা ভ্রান্ত। যে সকল বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা ঈশ্বরকে নিরাশ করিতে যান, তাঁহাদের যুক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরমাত্র।

ঘোর অভিব্যক্তি বাদীদিগের মতে অভিব্যক্তির দুইটী সীমা সৃষ্টিবাষ্প ও মনুষ্য। সৃষ্টিবাষ্প হইতে অভিব্যক্তির আরম্ভ এবং মনুষ্যে অভিব্যক্তির শেষ। আমরা মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আরোহণ প্রণালীক্রমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে অভিব্যক্তিবাদটী কি। ডার্ব্বিন-প্রমুখ অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে এই উন্নত জীব মনুষ্যের উৎপত্তির মূল অতি নিম্নপদবীস্থ কোন জীব। শেষোক্ত জীবসম্প্রদায়, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যৌন নির্ব্বাচন (Natural selection and sexual selection) এই দুই প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া উন্নত জীবের জন্ম প্রদান করে, আবার তাহারা উন্নততর জীবের জন্ম প্রদান করে, এইরূপে কালক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীব জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদীগণ বিসৃষ্টিবাদকে অর্থাৎ ঈশ্বর যে প্রত্যেক বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এই মতকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করেন। তাঁহারা বলেন যে বিসৃষ্টিবাদই যদি সত্য হয়, তবে অনেক প্রাণীর অপ্রয়োজনীয় এবং অস্ফুট অঙ্গ সকল দেখিতে পাওয়া যায় কেন? মনুষ্যের আজি পর্য্যন্ত লাঙ্গুল অত্যন্ত অস্ফুট আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্তনচিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে একমাত্র অভিব্যক্তিবাদই এই সকল সমস্যা মীমাংসা করিতে পারে। অভিব্যক্তিবাদ বলে যে পূর্ব্বে এই সকলের প্রয়োজন ছিল কিন্তু ক্রমে প্রয়োজন চলিয়া যাওয়াতে সেই সকল অঙ্গের অব্যবহার হওয়ায় ক্রমে তাহারা অস্ফুট আকার ধারণ করিল।

ডার্ব্বিন তাঁহার গ্রন্থে (Origin of Species) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে যদি এমন একটী পদার্থেরও দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যাহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া তৎসংযুক্ত প্রাণীর অপ্রয়োজনীয় বা হানিকর হইয়াছে, তবে সেই একটী দৃষ্টান্তও অভিব্যক্তিবাদের বিপক্ষে অতি গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সুপ্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস, ডার্ব্বিনের এই মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে অভিব্যক্তিবাদ মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, আদিম মনুষ্যদিগের মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অনেক মস্তকের মস্তিষ্ক অতি সুসভ্য মনুষ্যদিগের মস্তকস্থ মস্তিষ্কের সহিত পরিমাণে ও গঠনে সমান। মস্তিষ্কই বুদ্ধির ও জ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সভ্য মনুষ্যদিগের সমান জ্ঞান অসভ্য মনুষ্যদিগেরও অন্তরে নিহিত আছে, তাহা বিকসিত হউক বা মুদ্রিত থাকুক। কিন্তু অসভ্য আদিম মনুষ্যদিগের এতটা জ্ঞান আবশ্যক নাই—সুতরাং স্বীকার

করিতে হইবে যে কোন জ্ঞানময় পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন জানিয়া তাহাদের অন্তরে নিহিত রাখিয়াছেন। আর প্রকৃতই আদিম মনুষ্যদিগের হৃদয়ে জ্ঞানবীজ সকল মুদ্রিত রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা জ্ঞানের কথা সকল ধারণ করিতে পারে এবং ক্রমে সভ্য অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

যাই হউক, এই অভিব্যক্তিবাদ মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে না খাটিলেও আমরা বিচারস্থলে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে মনুষ্য পশু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পরে অভিব্যক্তিবাদ আর একটু অগ্রসর হইয়া বলে যে পশুরাজ্যও ক্রমে উদ্ভিদরাজ্য হইতে অভিব্যক্ত হইযাছে। অভিব্যক্তিবাদীগণ তাঁহাদের প্রকটিত প্রণালী সকলের মূলে এই স্বীকার্য্য ধরিয়া লযেন যে প্রতি জীবের আপনা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন জীব প্রসব করিবার এক দৃঢনিহিত ভাব আছে। কিন্তু আত্মবাদীগণ জিজ্ঞাসা করেন যে এই ভাব দেন কে? এই ভাবের বলে উদ্ভিদ হইতে ক্রমে জীবজন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। এইখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি। বৃক্ষ হইতে যে বীজ সকল প্রস্তুত হয়, বা পক্ষীদিগের উদরে যে ডিম্ব হইয়া থাকে বা পশুদিগের উদরে যে শাবক প্রস্তুত হয়, তাহা তাহারা নিজে প্রস্তুত করে না এবং এমন কি তাহা যে কিরূপ হইবে তাহাও তাহারা জানে না; অথচ দেখিতেছি যে অবস্থার উপযোগী হইয়া বীজ, শাবক প্রভৃতি জন্মাইতেছে এবং ক্রমে তাহাদিগের হইতে উন্নত জীবেরা জন্ম গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া অস্বীকার করিব যে এক জ্ঞানময় পুরুষ এই সকলকে জগতের উন্নতিরূপ তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিয়মিত করিতেছেন? যাহাই হউক, যদিও বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তথাপি আমরা ইহাও স্বীকার করিলাম যে উদ্ভিদ হইতে জীবজন্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এইবারে আমরা প্রাণের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদীগণ কি বলেন দেখিব। অভিব্যক্তিবাদীদিগের কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে জড়পদার্থ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। হেকেল ও ব্যাষ্টিযান প্রভৃতির এই মত। কিন্তু হক্‌স্‌লি প্রভৃতি অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এই মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। টিণ্ডাল, পাস্তুর (Pasteur) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জড়পদার্থ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি অসম্ভব। পাস্তুর (সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি বৈজ্ঞানিক) ব্যাষ্টিয়ানকে পরীক্ষার দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যাষ্টিয়ান্‌ তাহাতে এক প্রকার পশ্চাৎপদ হইয়া গেলেন। ১ অধ্যাপক টেট্‌ (Professor Tait) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধীয় পুস্তকে যদিও অনুমান করিয়াছেন যে ভৌতিক তত্ত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণপদার্থ কি জানিলেও জানা যাইতে পারে কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি যে অসম্ভব

১ Calderwood's "Science and Religion".

তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন "but let no one imagine that, should we ever penetrate this mystery, we shall thereby be enabled to produce, except from life, even the lowest form of life." * এখন দেখিতেছি যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব এবং ইহাও দেখিতেছি যে এই জগতে প্রাণরাশি বিচরণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া কে অস্বীকার করিতে পারে যে এই প্রাণরাশি প্রাণদাতা মহাপ্রাণ হইতে আসে নাই? এই প্রাণময় জগত উচ্চৈঃস্বরে সেই মহাপ্রাণের অস্তিত্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। গীতাকার এই তত্ত্বটী সুন্দর হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়াছেন যে ভূমি জল প্রভৃতি ঈশ্বরের আট প্রকার অশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি এবং জীবস্বরূপ প্রকৃতিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি; †

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭ম, ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭ম, ৫

ভাল, যদি এমন হয় যে বিজ্ঞান একদিন প্রমাণ করিতে পারিবে যে জড় পদার্থ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি হয়, আমরা এই বিচার স্থলে তাহাও স্বীকার করিয়া লইলাম। এই বারে দেখা যাউক যে বিজ্ঞান এই জড়পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলে।

জড়পদার্থ হইতে যে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই প্রথম প্রাণ পঙ্কের ন্যায় সমুদ্রতলে বর্ত্তমান, এই কারণে বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নাম দিয়াছেন প্রাণপঙ্ক (Protoplasm)। প্রাণপঙ্কের এই কর্দ্দমভাব অধিক পরিমাণে জলগ্রহণ করিবার ফল। এখন এই জল উৎপন্ন হইল কিরূপে, ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞানের নানা জটিল প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল যেগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সেই গুলিরই সাধ্যমত অনুসরণ করিব। বিজ্ঞান যাঁহারা কিছুমাত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা বেশ্ জানেন যে এই পৃথিবী এক-সময়ে অতি উষ্ণ ছিল; সমস্ত জল ও সমস্ত পদার্থ একমাত্র বাষ্পাকারে আকাশে বিরাজ করিতেছিল। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা কোন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সৃষ্টিবাষ্পকে স্বীকার করিয়াছেন। ক্যাণ্ট, লাপ্লাস, হর্সেল প্রভৃতি প্রায় সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন; তন্মধ্যে সার উইলিয়ম টমসন প্রস্তরাদি কতকগুলি অতিরিক্ত পদার্থও স্বীকার করিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদীগণ লাপ্লাস কর্ত্তৃক সংশোধিত ক্যাণ্টের মতই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহাই সাধারণ-প্রচলিত, সুতরাং আমরা সেই মতেরই আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। সেই মতটী এই

* Recent Advances in Physical Science, p. 24.

† পরে লিখিত দুইটী শ্লোকে যে "প্রকৃতি" শব্দ আছে, ইহার অর্থে সচরাচর সংস্কৃতজ্ঞগণ 'স্বভাব' এই অর্থ ধরেন। কিন্তু প্রকৃতি = প্র + কৃতি = প্রকৃষ্ট কার্য্য এইরূপ ধরিলে আমার বোধ হয় অর্থের সুসঙ্গতি হয়। ভূমি, জল প্রভৃতিও তাঁহার প্রকৃষ্ট কার্য্য কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট কার্য্য জীবরূপ কার্য্য।

যে প্রথমে একমাত্র সূর্য্য তাঁহার উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই সূর্য্য ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইতে লাগিল। এবং সেই সময়ে কোন প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্য্যের বহির্ভাগে অবস্থিত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহাদির জন্মদান করিয়াছে। হার্ব্বাট স্পেন্সারও এই মতে সায় দিয়াছেন। তিনি বলেন "It will be better to descend to the more limited form of the nebular hypothesis which was enunciated by Laplace, and which assumes for the starting point a sun, the nucleus of which is already globular in shape." (First Principles, ch. XIX.) তবেই দেখিতেছি যে অভিব্যক্তিবাদীগণ সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল সৃষ্টিবাষ্প লইয়াই ক্ষান্ত নহেন, তৎসঙ্গে একটী সূর্য্যেরও অস্তিত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন, এই সূর্য্যকে কে প্রথম স্থাপিত করিয়াছিলেন? আর যদি ইহাও স্বীকার করিয়া লই যে সূর্য্যও ছিল না, কেবল একমাত্র সৃষ্টিবাষ্পই ছিল, তাহা হইলে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে এই সৃষ্টিবাষ্পের মধ্যেই এই শোভন সুন্দর জগতের উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টিবাষ্প হইতে জগতের উৎপত্তি কাহারও জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল—এই মহান্ জ্ঞান আমরা সেই অনন্তজ্ঞান পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কুত্রাপি দেখিবার আশা করি না। আমরা কারণবাদ আলোচনা কালে দেখাইয়াছি যে সৃষ্টিবাষ্প ইচ্ছাময় পুরুষের ইচ্ছার পক্ষে কেমন গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করে; আবার এখন দেখিতেছি যে সৃষ্টিবাষ্প জড়পদার্থ হইয়াও জ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানের পক্ষে কি সুন্দর সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিলাম যে অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্তিবাদীগণ কেবল জড়পদার্থেরই উন্নতি প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা সমস্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছি—সৃষ্টিবাষ্প হইতে জড়জগতের অভিব্যক্তি, জড়পদার্থ হইতে প্রাণপঙ্কের অভিব্যক্তি, প্রাণপঙ্ক হইতে জীবজন্তুর অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বশেষে জীবজন্তু হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি; বিজ্ঞান যদিও সমস্ত বিষয়টী অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিতে পারে নাই, কিন্তু আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে এককালে বিজ্ঞান এই সকল সপ্রমাণ করিলেও করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ এই সকল সপ্রমাণ করিলেও আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে একটী কথাও বলিতে পারে না। ইহা বড় আশ্চর্য্য যে অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিলেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ক সকল সমস্যাই মীমাংসিত হইবে অথচ জগতের একটী প্রধান অঙ্গ জ্ঞানের বিষয় কোন কথাই বলিতে চাহেন না; প্রত্যুত জ্ঞানকে তাঁহারা একটা দুরূহ সমস্যা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যে ভাবের কথা বলেন, তাহাতে বোধ হয় যেন এই জড় জগতে অভিব্যক্তিশক্তি নীরব ভাবে কার্য্য করিয়া চলিতেছে, জগতের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সন্দর্শন করিয়া কেহই আশ্চর্য্য হইতেছে না; সর্ব্বত্র প্রাণীগণ

প্রাণন কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে কিন্তু তাহারা তাহাদের সুখদুঃখ যেন অনুভব করিতেছে না; তাহাদের একটীরও যেন চিন্তাশক্তি নাই, কল্পনাশক্তি নাই,—সকলেই যেন এক মহা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে।

আমাদের যে জ্ঞান আছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বলিতে গিয়া যদি কেহ বলেন যে মস্তিষ্কপরমাণুর ন্যায় জড়পদার্থেরই সমষ্টি হইতে ইহার উৎপত্তি, যেমন চার্ব্বাক্ চুন ও হলুদের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড়পদার্থের সমষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত বিজ্ঞান একবিন্দুও জ্ঞান প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কেবল তাহাই নহে, জড়পদার্থের সহিত যে জ্ঞানের কি প্রকারে সংযোগ হইল, তাহাও বিজ্ঞানের অতীত এবং বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত এই সমস্যা পূরণ করিতে পারে নাই এবং পারিবে বলিয়া আশাও নাই। এই তত্ত্বটী অজ্ঞেয়-বাদীদিগের অন্যতম শিরোভূষণ টিণ্ডাল অতি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়া গিয়াছেন "The passage from the physics of the brain to the coresponding facts of consciousness is unthinkable. Granted that a definite thought and a definite molecular action occur in the brain simultaneously, we do not possess the intellectual organ, nor apparently any rudiment of the organ, which would enable us to pass by a process of reasoning from the one phenomenon to the other. They appear together, but we do not know why. Were our minds and senses so expanded, strenthened, and illuminated, as to enable us to see and feel the very molecules of the brain; were we capable of following all their motions, all their groupings, all their electric discharges, if such there be; and were we intimately acquainted with the corresponding states of thought and feeling,—we should be as far as ever from the solution of the problem—How are these physical processes connected with the facts of consciousness? The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable." যে জ্ঞান গ্রহনক্ষত্রাদির গতি আবিষ্কার করিতে যায়, সেপ্রকার জ্ঞানের কথা দূরে থাক্, একটী সামান্য অনুভূতিও জড়পদার্থের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং দেখিতেছি যে জড়-পদার্থ ও জ্ঞান এই দুইটী পৃথক্ পদার্থ; এই জ্ঞান যদি সেই জ্ঞানস্বরূপ ভূমা পরমেশ্বর মানবাত্মায় না প্রেরণ করিবেন, তবে আমরা পাইব কোথা হইতে?

আবার, কোন কোন অজ্ঞেয়বাদীর মতানুসরণ করিয়া যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে সৃষ্টিবাষ্পের মধ্যে জড়পদার্থের ন্যায় জীবজন্তু মনুষ্যগণ শক্তিগতভাবে বিরাজ করিতেছিল, তাহা হইলেও

আমরা তাহাতে জ্ঞানময় পুরুষের হস্ত ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাই না; কারণ, এক সময়ে যে অখণ্ড নিয়মে আবদ্ধ ও গিরিনদী, পর্ব্বত সমুদ্র দ্বারা পরিশোভিত এই সুন্দর জগত সেই অন্ধকার সৃষ্টিবাষ্পের মধ্য হইতে উত্থিত হইবে, এই মহান্ উদ্দেশ্য আর কোথা হইতেও আসিতে পারে না। সৃষ্টিবাষ্প এই জগত উৎপাদনের, শৃঙ্খলাবন্ধনের বীজ পাইল কোথা হইতে? কে অভিব্যক্তিনিয়মকে জগতরচনার পক্ষে নিযুক্ত করিল? আমরা মূল কারণ দেখিতে গেলে এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। অভিব্যক্তি একটী কার্য্যপ্রণালীমাত্র—ইহা কেবল বলিয়া দেয় যে কি উপায়ে কার্য্য হইতেছে। কিন্তু যখনি একটী কার্য্যপ্রণালীর কথা ভাবি, তখনি মনে প্রশ্ন আসে যে কাহার জ্ঞান এই প্রণালীকে নিয়মিত করিতেছে। যে অভিব্যক্তিরূপ মহান্ নিয়ম জগতে কার্য্য করিতেছে, সেই অভিব্যক্তি সেই মহাজ্ঞানই প্রেরণ করিয়াছেন।

যাঁহারা এই জগৎসৃষ্টিকে দৈবক্রমে সংঘটিত হইয়াছে বলেন, তাহাদের কথা একেবারেই গ্রাহ্য নহে। ইহা জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সমূলে ধ্বংস করিবে। যদি এই জগৎসৃষ্টি প্রকৃতই দৈবক্রমে সংরচিত হইত, তাহা হইলে ভাস্করাচার্য্যই বা জন্মগ্রহণ করিলেন কেন, আর গ্যালিলিও প্রভৃতি স্বীয় প্রাণদানেও উদ্যত হইলেন কেন? তাহা হইলে তাঁহারা গ্রহগণের গতির নিয়মাদি আবিষ্কার করিতে পারিতেন না; কারণ, যাহা দৈবক্রমে হইয়াছে এবং পুনরায় দৈবক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহার আবার নিয়ম কিসের? তাহা হইলে কেপ্লার গ্রহদিগের গতিসম্বন্ধীয় মহান্ সত্যত্রয় আবিষ্কার করিয়া বলিয়া উঠিতেন না,—"O God, I think Thy thoughts after Thee."

এইরূপে আমরা যে দিক্ দিয়াই দেখি, জ্ঞানময় পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার না করিলে কৌশলময় জগতের অস্তিত্বসমস্যা কিছুতেই মীমাংসিত হয় না। কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে জ্ঞানস্বরূপের নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিলে অবৈজ্ঞানিকের কার্য্য করা হয়। অধ্যাপক হক্স্‌লি ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞাবাদ, যে মতে ঈশ্বরকে প্রতি বস্তু পৃথক্ ভাবে সৃষ্টি করিতে স্বীকার করে, তাহাই বিজ্ঞানের অসম্মত; কিন্তু প্রশস্ত প্রজ্ঞাবাদ, যে মতে ঈশ্বরকে জগতের মূল নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা বিজ্ঞানের অসম্মত নহে। তিনি বলিয়াছেন, *—"No doubt it is quite true, that the doctrine of evolution is the most formidable opponent of all the coarser forms of teleology. The teleology which imagines that the eye, such as we find it in man or one of the higher animals, was made, with the precise structure it exhibits, for the purpose of enabling the animal who possesses it to see, has undoubtedly received its deathblow. But it is necessary to remember that there is wider teleology, which is not touched

* The Academy, October 1869.

by the doctrine of evolution, but is actually based upon the fundamental proposition of evolution. * * * The teleological and mechanical views of nature are not necessarily mutally exclusive. On the contrary, the more purely a mechanist the speculator is, the more firmly does he assume the primordial molecular arrangement, of which all the phenomena of the universe are the consequences; and the more completely is he thereby at the mercy of the teleologist, who can always defy him to prove, that this primordial molecular arrangement was not intended to evolve the phenomena of the universe."

নীতিবাদ।

এপর্য্যন্ত আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য যে, জ্ঞানময় পরমেশ্বরই এই জগতের নিয়ন্তা, সেই সত্যের সপক্ষে কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদ একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এই কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদ বহির্জগত হইতেই সাক্ষ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এইবারে অপর দুইটী বিষয় নীতিবাদ ও শ্রদ্ধাবাদ আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিব যে অন্তর্জগত হইতেও অর্থাৎ আমাদের আত্মা হইতেও "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরম পিতামাতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিঘোষিত হইয়া থাকে।

আমরা যেমন আত্মার সহজজ্ঞান হইতেই ইচ্ছাময় ও জ্ঞানময় পরম পুরুষের অস্তিত্ব জানিতে পারি, সেইরূপ সহজ জ্ঞান হইতেই সেই পরম পুরুষ যে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ তাহাও জানিতে পারি। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে আমরা পবিত্র থাকিবার, সুপথে চলিবার উপদেশ সর্ব্বদাই আত্মাতে অনুভব করি। এই সদসৎজ্ঞান এবং সৎকে গ্রহণ করিবার ও অসৎকে পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিই আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সাক্ষ্য দিতেছে। তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে এই সদসদাত্মক জ্ঞান আমাদের জ্ঞানেরই একটী অবস্থা মাত্র—সুতরাং ইহা হইতে আমাদের জ্ঞানমাত্র-গোচর ব্যতীত স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। একথা আমরা মানিতে পারি না। কারণ, আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে যদিও অনেক বিষয়, যেমন বাহ্যবস্তুর সত্তা প্রভৃতি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞানমাত্রগোচর, তথাপি আমরা সহজজ্ঞানের বলে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। এখানেও আমরা সহজজ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি যে আমাদের সদসদাত্মক নীতিজ্ঞান যে পরমপুরুষের অস্তিত্বে সাক্ষ্য দিতেছে, তিনি কেবলি আমাদের জ্ঞানের উপরেই তাঁহার অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে।

আমাদের আত্মাতে যে নীতিজ্ঞান আছে, সেই নীতিজ্ঞান স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে আমাদের অন্তরে সৎ ও

অসৎ উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই আছে। এই সদসৎ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া আজি পর্য্যন্ত কোন সমাজ গঠিত হয় নাই, কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। সকল ভাষায় "কর্ত্তব্য" একথার একটী গভীর আধ্যাত্মিক বল আছে। সদসৎ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই থাকে না। অধিক কি, এই সদসৎজ্ঞান থাকাতেই প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তরে এক দায়িত্ব-জ্ঞান আছে। প্রত্যেক মনুষ্যই জানে যে তাহার সৎকর্ম্ম করিবার বিশেষ অধিকার আছে এবং অসৎকর্ম্ম করিলে তাহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আত্মপ্রসাদ আসিয়া তাহাকে সৎকর্ম্মে উৎসাহিত করিতে থাকে এবং আত্মগ্লানি তাহাকে অসৎকর্ম্মের জন্য অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে থাকে। যথন কর্ত্তব্য-জ্ঞান ধারণা করাইয়া দেয় যে অমুক কার্য্য করা উচিত, সে কার্য্য না করিলে আত্মগ্লানি অমনি আসিয়া আক্রমণ করে। এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান থাকাতেই আমরা বুঝিতেছি যে নৈতিক নিয়ম বলিয়া পদার্থ আছে। দায়িত্বজ্ঞান যে কেবল মানসিক নহে, আমাদের যে প্রকৃত দায়িত্ব আছে এবং তাহা যে আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ, তাহা ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়া দেয়। সকল জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তিদাতা সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণা আছেই। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে দায়িত্ব-জ্ঞানের মূল নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব মানবমাত্রেই আছে, তবে ইহার উৎপত্তি লইয়া দার্শনিকগণ যতই কেন বিচার করুন না, তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হইতেছে না।

দার্শনিকদিগের কেহ কেহ নৈতিক নিয়মের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া তাহার অস্তিত্বও লোপ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তাঁহারা নীতিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে ইহা স্বার্থপরতার অভিব্যক্তি মাত্র। মানবজাতি বন্য অবস্থায় নীতিজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত; কিন্তু ক্রমে যথন তাহারা দেখিল যে কতকগুলি কার্য্য সমাজের পক্ষে উপকারী, তথন তাহারা ক্রমে সেই কার্য্য গুলিকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিল এবং যে গুলি তদ্বিপরীত, সেই গুলি ক্রমে অন্যায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্রমে বংশপরম্পরায় এই দুই ভাব চলিয়া আসিতে আসিতে মনুষ্যের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। এইরূপ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহারা সমগ্র নীতিজ্ঞানকে একবিধ স্বার্থপরতারই রূপান্তর মাত্র বলিতে চাহেন। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, যে কোন ভাবের বা যে কোন পদার্থের গুণাবলীকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের একএকটীকে সরাইয়া লইলে সেই ভাবের ভাবত্ব বা সেই পদার্থের পদার্থত্ব থাকে কি না। পদ্মপুষ্পের গুণাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সুরভিত্ব, তাহার মসৃণত্ব প্রভৃতি গুণ সকল একে একে সরাইয়া লও, দেখিবে পদ্ম পুষ্পের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু আমাদের সেইরূপ সরাইবার ক্ষমতা নাই। আমরা জানিতে পারি বটে যে পদ্মপুষ্পে এই এই গুণ আছে কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও জানি যে এই সকল গুণ পদ্মপুষ্পেরই। সেইরূপ

নীতিজ্ঞানকেও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার এক একটী গুণকে সরাইয়া লইতে পারি না। আমরা জানিতেছি যে সেই সকল গুণ নীতিজ্ঞানের সহিতই সম্বদ্ধ আছে। আমরা জানি যে নীতিজ্ঞান, নৈতিক নিয়ম সকল জগতে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই জগতের মঙ্গল হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া নৈতিক নিয়মগুলি ব্যক্তি-গতই হউক বা সমাজগতই হউক স্বার্থ-পরতা হইতে উৎপন্ন তাহা বলিতে পারি না। যখন পাপাচরণ গোপনে করিলেও লজ্জা ও আত্মগ্লানি আমাদিগকে গুরুতর আঘাত করিতে থাকে, আমি আমার সমাজের লোকের ক্ষতিকর কার্য্য করি-য়াছি ব'লে যে সেই আত্মগ্লানি আসিয়া-ছিল, তাহা নহে। সে ভাব সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপর ভাবের অতীত। যখন কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া হৃদয় মহান্ উন্নত-ভাব প্রাপ্ত হয়, সে ভাব এক, আর আমার সঙ্গীরা ভাল বলিবে, সেই অনু-সারে কার্য্য করিবার ভাব আর এক— উভয় ভাবের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে বীর সন্তোষের সহিত আপনার সমুদয় পার্থিব সুখসম্পদ বিস-র্জ্জন দিয়াও কর্ত্তব্য পালন করেন, সে বীরের কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহ কি মনু-ষ্যের কথা হইতে আসে? রোমীয় মনুষ্য-যুদ্ধের নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে সাধু রঙ্গস্থলে ঝম্প প্রদান করিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিলেন এবং যাঁহার পুণ্যবলে মনুষ্যযুদ্ধ উঠিয়া গেল, সেই সাধু পুরুষের বল কি নিষ্ঠুর মনুষ্য-দিগের কথার উপর নির্ভর করিয়াছিল? এরূপ মনে করা কেবল বাতুলতা মাত্র। নীতিজ্ঞান একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই আমাদের আত্মাতে রোপণ করিয়া দেন নাই। চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতা নীতিজ্ঞানকে সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে পারে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের বীজ না থাকিলে পরিস্ফুট হইবে কি? চর্চ্চা এবং অভিজ্ঞতা নীতিজ্ঞানেরই বল বা অন্য কোন জ্ঞানেরই বল, কিছুরই বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস তাঁহার পুস্তকে (Natural Selection) এই সত্য সমর্থন করিয়া পরে বলিতেছেন "Although the *practice* of benevolence, honesty or truth, may have been useful to the tribe possessing those virtues, that does not at all account for the peculiar *sanctity*, attached to actions which each tribe considers right and moral, as contrasted with the very different feelings withwhich they regard what is merely *useful.*" (P. 352).

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দায়িত্বজ্ঞান নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এইবারে দেখিব যে এই দায়িত্বজ্ঞান ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সহজজ্ঞানকে বিশেষ সমর্থন করে। আমাদিগের দায়িত্ব সজ্ঞান পুরুষেরই নিকটে সম্ভবে। অজ্ঞান জড়পদার্থের নিকটে সম্ভবে না। প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট আমাদের যে দায়িত্বের কথা বলি, তাহা কেবল কথার অলঙ্কারমাত্র। অমনোযোগিতা বশতঃ আমি অগ্নির উপরে হস্ত স্থাপন করিলাম, আমার হাত পুড়িয়া গেল এবং তজ্জন্য আমাকে যন্ত্রণাও সহ্য করিতে

হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি অগ্নির নিকটে নৈতিক অপরাধে অপরাধী রহিলাম না। আমি একটী বৃক্ষ কাটিলাম, আমি তাহার নিকট কোন নৈতিক অপরাধে অপরাধী হইলাম না। নৈতিক সম্বন্ধ সজ্ঞান পুরুষদিগেরই মধ্যে সম্ভবে।

এখন কথা এই যে আমি নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বটে, কিন্তু কাহার সহিত সম্বদ্ধ? আমার সহিত আমার সম্বদ্ধ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান; যেমন আমার আপনার নিকট আপনি ঋণী থাকা না থাকা উভয়ই সমান। আমি আপনার নিকট ঋণ লইলেও দরিদ্র হইব না এবং ঋণ পরিশোধ করিলেও বেশী ধনী হইব না। আমার সহিত আমার নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকা কেবল বৃথা জল্পনামাত্র। অপর মনুষ্যের সহিত আমার প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু তাহাও সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ উভয়ের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ঘটিয়া থাকে। যে সর্ত্তে সম্মতি প্রদত্ত হয়, সেই সর্ত্তের কেহ ব্যতিক্রম করিলেই সে জানিতে পারে যে অপর ব্যক্তির তাহার বিরুদ্ধে বলিবার এবং তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য চাহিবার অধিকার আছে। কিন্তু এই দায়িত্বজ্ঞানও আমাদের পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে স্বকৃত সম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব মনুষ্যের সহিত স্বকৃত সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে না। স্বকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেও আমাদের দায়িত্বভাব বিলুপ্ত হয় না। আমি কোন বন্ধুর সহিত সর্ত্ত করিলাম যে, যদি তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকের আচরণ করি, তবে তাঁহাকে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত মুদ্রা ধরিয়া দিব। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বীকৃত মুদ্রা প্রদান করিলেও, সুতরাং তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ রহিত হইলেও আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই দায়িত্ব-বিচ্ছিন্ন হইব না। ইহা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কেবলই অন্তরে সজোরে আঘাত করিবে ও বলিতে থাকিবে যে আমি অন্যায় করিয়াছি। অতএব দেখিতেছি যে অপর মনুষ্যের সহিত স্বকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেও দায়িত্ব বিলুপ্ত হয় না—দায়িত্বের এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। এই দায়িত্ব যে নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং এই দায়িত্ব যখন মিথ্যা পদার্থ নহে, সত্য পদার্থ, তখন নৈতিক নিয়মও সত্য পদার্থ—সত্য সত্যকেই প্রকাশ করে। কিন্তু এই নৈতিক নিয়মের বল আইসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সহজজ্ঞান দিতে পারে; সহজজ্ঞান বলে যে এই অপার্থিব বল সেই জ্ঞানময় ন্যায়বান্ পরাৎপর ত্রিভুবনপালকের নিকট হইতেই আসিয়াছে এবং এই কথায় আমাদের আত্মাও সম্পূর্ণ সায় দেয়। আমরা দেখিলাম যে কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদের ন্যায় নীতিবাদও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে।

শ্রদ্ধাবাদ।

এইবারে দেখিব যে শ্রদ্ধাবাদও ঈশ্বরের অস্তিত্বপক্ষে চিরসাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের আত্মাতে আধ্যাত্মিকতা বা শ্রদ্ধাভাব আছে। ইহা আমরা সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জানিতেছি। এই শ্রদ্ধাভাব কোন সঙ্কীর্ণ সীমার

মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; ইহা অনন্তস্বরূপের চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে চাহে। এই শ্রদ্ধাভাব থাকাতেই আমরা সেই মহান্ পরমেশ্বরকে আমাদের দয়াময় পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। এই সহজজ্ঞানসিদ্ধ শ্রদ্ধাভাবকে আশ্রয় করিয়াই আমরা আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া উপলব্ধি করি। এই শ্রদ্ধাভাবের দ্বারাই আমরা তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারি এবং জগতে তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া ভক্তিভরে নমস্কার করি। জগতে যে এক শক্তি মঙ্গলের পক্ষে কার্য্য করিতেছে, মনুষ্যকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়া দেবতুল্য করিতেছে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে পরিণামে সতেরই জয় এবং অসতেরই পরাজয় স্থির; এই কথা আমাদের আত্মার নিকট হইতেও সম্পূর্ণ সায় পায়—আমরাও সাধু ব্যক্তির প্রতি অহেতুকী প্রীতি করিয়া থাকি এবং অসাধুকে তাহার অসাধু কর্ম্মের জন্য ঘৃণা করি। মঙ্গলের জন্য, সাধুতার জন্য আমাদের এত স্পৃহা, এত আগ্রহ কেবল সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই আমাদের অন্তরে নিহিত হইয়াছে।

অনেক দার্শনিক যেমন নীতিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, সেইরূপ এই শ্রদ্ধাভাবকেও বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নীতিজ্ঞান দার্শনিকদিগের সহস্র বিষবাণ-সত্ত্বেও আমাদের অন্তরে অক্ষতভাবেই জীবিত আছে এবং এখানেও দেখিতেছি যে সহস্র বিষবাণের মধ্যেও আমাদের শ্রদ্ধাভাব জীবিত আছে। এই মতের দার্শনিকগণ বলেন যে, যখন সমাজের মধ্যে প্রচুর অন্নসংস্থান হইল, সাংসারিক উন্নতি দেখা দিল, তখন লোকেরা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর, উপাসনা, পূজা প্রভৃতির এক কাব্যমাত্র প্রস্তুত করিল। প্রকৃতপক্ষে ধরিলে এই সকল বিষয় পার্থিব প্রীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত কিছুই নহে। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরভক্তি, বলিতে গেলে, স্বার্থপরতা ও কল্পনার মিশ্রণে উদ্ভূত। যাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি নাই, তাঁহারা এপ্রকার কথা বলিতে পারেন। যাঁহাদের চক্ষু নাই, তাঁহারা যদি বলেন যে সূর্য্য নাই, তবে কি প্রকারে তাঁহাদিগকে বুঝাইব যে সূর্য্য আছে; যাঁহারা বধির, তাঁহারা যদি বলেন যে সঙ্গীত পদার্থ জগতে নাই, তবে তাঁহাদিগকে তাহার অস্তিত্ব বুঝাইতে আমরা অক্ষম। যাঁহারা স্বার্থপরতায় আপনাদের হৃদয়কে জড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবের পবিত্র আনন্দ কি প্রকারে উপলব্ধি করিবেন? যাহারা জগতে ঈশ্বরের সুন্দর পরিচয় দেখিতে চাহেন না, যাঁহারা আত্মাতে ঈশ্বরের নীরব উপদেশ শুনিতে চাহেন না; যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের মধ্যে মগ্ন হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন না, তাঁহারা যে আমাদের পবিত্র ভক্তিভাবকে কল্পনার উপর দাঁড় করাইবেন, স্বার্থপরতাকে তাহার ভিত্তি করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মভাবের—শ্রদ্ধাভাবের অভিজ্ঞ; যাঁহাদের ঈশ্বরস্পৃহা একবারও উদ্রিক্ত হইয়াছে; যাঁহাদের

আত্মা একবারও ঈশ্বরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই শ্রদ্ধাভাব নিতান্ত সত্য পদার্থ। ঈশ্বরভক্ত প্রেমিকেরা পৃথিবীর সমুদয় রোগশোকে আক্রান্ত হইলেও যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সেই রোগশোক সহ্য করিবার এক অপূর্ব্ব বল প্রাপ্ত হয়েন; যাঁহাকে সমুদয় বিত্ত হইতে প্রিয়তর, পুত্র কলত্র হইতে প্রিয়তর এবং অন্য সকল প্রিয় বস্তু অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া জানেন; যাঁহাকে হারাইলে তাঁহারা জগত সংসারকে অন্ধকার দেখেন, সেই প্রেমিক দিগের নিকটে এমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই বলিলে তাঁহারা স্পষ্টই জানিতে পারেন যে, নাস্তিকেরা নিজেই ঈশ্বর হইতে দূরে আছেন, তাই তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না অথবা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও তাঁহারা দেখিবেন না। আত্মার নীতিজ্ঞানের অস্তিত্বপক্ষে যাহা যাহা বলিয়াছি এই শ্রদ্ধাভাবের অস্তিত্ব পক্ষে সেই সকল কথা সম্পূর্ণই খাটে। সরলভাবে দেখিলেই হয় যে শ্রদ্ধাভাবের বীজ না থাকিলে তাহার পরিস্ফুরণ কখনই দেখিতে পাইতাম না। সমগ্র ধর্ম্মজগতের ইতিহাস জলন্তভাবায় ইহা-রই সাক্ষ্য দিতেছে। যে ভক্তিভাবের প্রাবল্যে এক কালে বৈদিক ধর্ম্ম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়া-ছিল, যাহার বলে ঋষিরা সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবৎপদসেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থনিহিত অমূল্য সত্য লাভ করিয়া-ছেন, এই সে দিন পর্য্যন্ত যে ভক্তিভাবের স্রোতে চৈতন্যদেব সমগ্র বঙ্গভূমিকে উন্মত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, সেই ভক্তিভাব—সেই শ্রদ্ধাভাব মিথ্যা নহে—ইহা আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ অতি গুরুতর সত্য এবং এই ভক্তিভাব যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, তিনিও পরম সত্য, পরম মঙ্গলস্বরূপ মহান্ আত্মা।

ব্রহ্ম অনন্তস্বরূপ।

আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসি-লাম, তাহার মধ্যে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে পরমেশ্বর অনন্তস্বরূপ। ইহা আমাদের সহজজ্ঞানই বলিয়া দিতেছে। আমরা অনন্তস্বরূপের অনন্ত ভাব সম্পূর্ণ-রূপে ধারণা করিতে পারি না বটে কিন্তু অনন্তের চিন্তা, অনন্তের ভাব যে আমা-দের জ্ঞানের, চিন্তার অপরিহার্য্য ধর্ম্ম একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারি-বেন না। সহজজ্ঞান যে সকল সত্য আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছে সে সকলই যখন সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইল, তখন এই সত্যকে কখনই মিথ্যা ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। স্পেন্সর বলেন যে, যিনি অনন্ত, সমস্তই তাঁহা হইতে অবিচ্যুত; সৃষ্টি করিলে যখন নূতন একটী ব্যাপার জন্মগ্রহণ করিল, তখন সেই সৃষ্ট পদার্থ তো তাঁহা হইতে অবিচ্যুত হইল না। স্পেন্সর এখানে নিতান্ত জড়বাদ আনিয়াছেন বা মানবীকরণ করিয়াছেন বলিতে পারি। দুইটী জড়পরমাণু হইতে একটী পরমাণু পৃথক্ করিয়া লইলে যেমন অপর একটী পরমাণু অবশিষ্ট থাকে অথবা সন্তান প্রসূত হইলে যেমন মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, স্পেন্সরও এখানে এইরূপ কোন ভাব গ্রহণ করিয়া নিতান্ত ভ্রমে

পড়িয়াছেন। আজ যাহা সৃষ্ট হইল, "তাহা মনুষ্যের পক্ষে যেন নূতন, সৃষ্টি-ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের যে কল্পনা আছে, তাহার পক্ষে যেন নূতন যুক্ত হইল; কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে তাহা নূতন নহে। তাঁহার অনন্তত্বসাগরে—অনন্তশক্তিসাগরে উক্ত নবসৃষ্ট পদার্থ চিরকালই বিরাজ করিতেছিল, শুধু আমাদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। যদি ঈশ্বরের শক্তি-সাগরে উহা নিমজ্জিত না রহিত, তবে কি তাহা কখনও সৃষ্ট হইতে পারিত? যাহা ঈশ্বরের শক্তিতে নাই, তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টি করা, আর না করা, সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীন। সৃষ্টি করিলেও কোন কিছু নূতন তাঁহাতে যুক্ত হইল না, সৃষ্টি না করিলেও তাঁহাতে কোনো কিছু বিযুক্ত রহিল না।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অনন্তের চিন্তা আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ একটী সত্য। এই অনন্তের ভাব এত স্বাভাবিক যে, আত্মবাদী দূরে থাক্‌, অজ্ঞেয়বাদীও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। অধ্যাপক হক্‌স্‌লি বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক যদি কার্য্যকারণতত্ত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি শক্তির পুঞ্জীকরণ স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি জ্ঞান স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্তজ্ঞানের অস্তিত্ব অন্ততঃ সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" * আমরা তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি। আমরা বলি যে, যদি তিনি প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে অনন্তপ্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়—কেবল সম্ভবমাত্র নহে; যদি তিনি মঙ্গলভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে অনন্ত মঙ্গলভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞেয়-বাদীগণ যদি এতটা স্বীকার করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে জ্ঞান, শক্তি, অস্তিত্ব প্রভৃতি কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে অথবা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তাঁহাদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করিব যে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি প্রভৃতি কি সেই অনন্ত পুরুষ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবিতে পারে? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব এবং সমস্ত জগৎ মুক্তকণ্ঠে বলিবে যে আমাদের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি সকলই সেই ভূমা অজ আত্মার সাক্ষীস্বরূপে দণ্ডায়মান।

উপসংহার।

আমরা চারিটী প্রস্তাবে দেখিয়া আসিলাম যে ঈশ্বর পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন; তিনি মঙ্গলময়, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ মহান্‌ পুরুষ। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এতগুলি বিষয় জানিলাম এবং জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে লোক হইতে লোকান্তরে গিয়া তাঁহার বিষয় আরও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারি। সুতরাং স্পেন্‌সারপ্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীগণ যখন বিজ্ঞতাচ্ছলে বলিবেন "The power, which the universe mani tests to us is utterly unscrutable" (First Prin. P. 46) তখন আমরা বলিব যে "আমরা তোমাদিগের ভ্রান্ত

* Essays upon Some Uncontroverted questions by Prof. Huxley, P. 220.

যুক্তি সকল অবলম্বন করিব না" ; আমরা বরঞ্চ তাঁহাদিগকে বলিব যে 'তোমরা ঋষিদিগের পথানুসরণ করিয়া সহজ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, তবেই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে।" আমরা তাঁহাদিগকে দেখাইব যে ঋষিরা যে সত্য অন্তরে প্রাপ্ত হইয়া জ্বলন্ত ভাষায় প্রচার করিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং"—সেই সত্য আজিও জগতের অনেক জাতি হতাশ-হৃদয়ে অন্বেষণ করিতেছে। ঋষিরাই প্রথম বলিয়া গিয়াছেন "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" আত্মাই পরমাত্মাকে দর্শন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ঋষিরাই বলিয়া গিয়াছেন

"তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্মবিদো বিদুঃ।"

আত্মজ্ঞেরাই সেই জ্যোতির জ্যোতি পরমাত্মাকে জানিতে পারেন।

আমরা এখন দেবভাষায় সেই পরমদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পূর্ণহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করি

"হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু" ॥

যিনি হংস সকলকে শুক্লপক্ষে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন, যিনি শুকপক্ষীদিগকে হরিৎবর্ণের আচ্ছাদন দিয়াছেন, এবং যিনি ময়ূর সকলকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন, সেই দেবদেব পরমদেব আমাদের প্রত্যেকের উপর প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

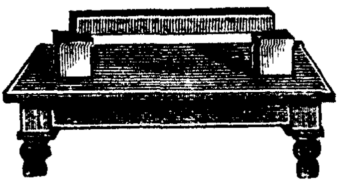
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

তাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

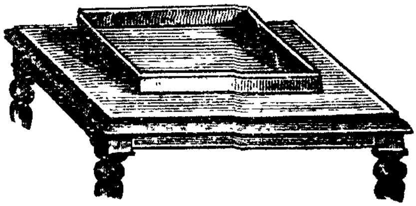
সকল পদার্থই তাতিলে বিস্তৃত হয় এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয় এবং সচরাচর সেই পূর্ব্ব উত্তাপে আসিলে সেই পূর্ব্ব আয়তনই প্রাপ্ত হয়।

কঠিন পদার্থের উপর উত্তাপের এই ফল দেখাইবার জন্য দুই সমান-আয়তন ধাতবীয় দণ্ডবিশিষ্ট একটী যন্ত্র চাই। ঐ যন্ত্র আর কিছুই নহে, একটী মোটা

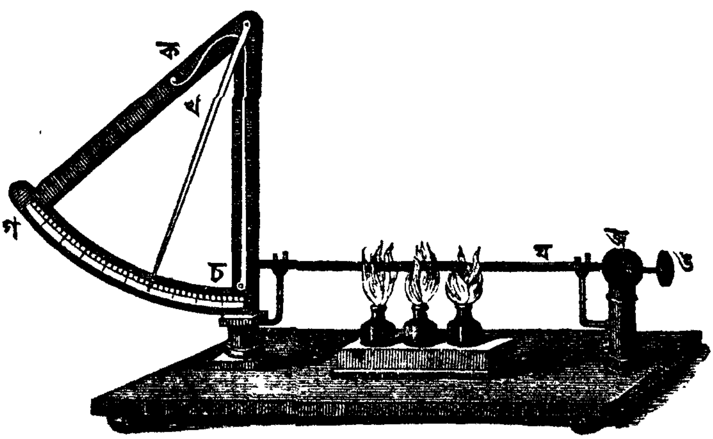


২য় চিত্র।

৩য় চিত্র।



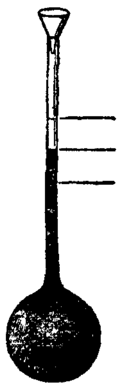
তক্তার দুদিকে ধাতুর হাতা পোতা আছে; বায়ুর সাধারণ উত্তাপে ঐ দণ্ডদ্বয় ঠিক ঐ হাতার ভিতর প্রবেশ করে, কিন্তু একটাকে একটু তাতাইলে আর সে উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না কিন্তু ক্রমে যখন শীতল হইয়া পূর্ব্ব উত্তাপে আসে, তখন অতিরিক্তায়ন আপনা আপনি খর্ব্ব হইতে হইতে উহা স্বয়ংই হাতার ভিতর পড়িয়া যায়।



৪র্থ চিত্র।

ফিক্‌নাযুক্ত বহ্নিমান যন্ত্র (৪র্থ চিত্র দেখ) দ্বারা সংকুচ্য, বিস্তার্য্য * এবং পূর্ব্ব দীর্ঘতা প্রাপ্ত হওয়া রূপ ঘটনাত্রয়কে বিস্তারিতরূপে প্রত্যক্ষ গোচর করান যাইতে পারে। ঘ ধাতুময় দণ্ড, যাহার উপর পরীক্ষা চলিতেছে, উহাকে নিম্নস্থ জলন্ত বারুণী (Alcohol) শিখা দ্বারা গরম করা যাইতেছে। ইহার এক মুখ ঘুর্ণিদণ্ড জ'তে লাগিয়া আছে, আর এক মুখ দুই ফিক্‌নাতে লাগিয়া আছে। ঐ লৌহশলার সংকোচ ও বিস্তৃতি দ্বারা ঐ ফিক্‌নাদ্বয় এগিয়া আসে অথবা পিছাইয়া যায়, এবং ক'তে একটা ছটকা লাগানো আছে, যাহা ঐ ফিক্‌নার খোলামুখে বরাবর ঠেকিয়া থাকিয়া ফিক্‌নাকেও সর্ব্বদা লৌহশলায় ঠেকাইয়া রাখিয়াছে; খ কাঁটা, পরিমাপক (quadrant) যন্ত্রের উপর ঐ ফিক্‌নাদ্বয়ের বিস্তারিত চলাচল নির্দ্দেশ করে।

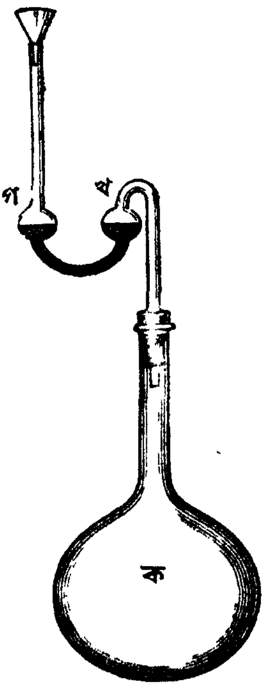
জলীয় পদার্থের, যেমন জলের, কি তৈলের, কি বারুণীর, কি পারার, বিস্তার্য্য দেখাইবার জন্য একটা কাচের পাত্রের মুখে একটা সরু ছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নল জোড়া দিতে হয়; পরে সেই নলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত জলীয় পদার্থে পূরিয়া তাহাকে একবার গরম জলে, একবার ঠাণ্ডাজলে চোবাইলে দেখা যাইবে যে, গরম জলে চোবাইবার সময় নলের ভিতরের জলীয় স্তম্ভ ধীরে ধীরে তকদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া স্থির হইয়া থাকিবে; আবার



৫ম চিত্র।

ঠাণ্ডা জলে চোবাইবার সময় উহা কতকদূর পর্য্যন্ত নামিয়া স্থিরভাবে থাকিবে; আবার যদি উহাকে বাতাসে খানিকক্ষণ রাখিয়া ভিতরের জলীয় পদার্থের উত্তাপকে চতুর্দ্দিকের উত্তাপের সমান আনা যায়, তাহা হইলে ঐ জলীয় স্তম্ভ পুনরায় আপনার প্রাথমিক তলে আসিয়া দাঁড়ায়। এমতে তরল পদার্থের আয়তন দ্বারাই তাহার উত্তাপ নিৰ্দ্দিষ্ট হয়।

বায়ুর প্রসার্য্য (expansion) দেখাইবার জন্য একটা বড় কাচের কুজা চাই; তার মুখে দুই সমতল ক্ষুদ্র ফানসবিশিষ্ট দোফেরা নল এমনিভাবে বসাইতে হইবে যে আশপাশ হইতে বায়ু না যাইতে



৬ষ্ঠ চিত্র।

* সংকুচ্য = contraction; বিস্তার্য্য = expansion.

পারে। ঐ দুই খ ও গ ফানসের নীচের অর্দ্ধেক ভাগ জলপূর্ণ করিয়া ভিতরের বাতাসকে বাহিরের বাতাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। এখন যদি ঐ কুজ্জার (ক) ফানসকে মদিরাসব প্রদীপ দ্বারা উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যস্থ বায়ু প্রসারিত হইয়া বক্রনলের জলের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া প্রথম (খ) ফানসের জলকে দ্বিতীয় (গ) ফানসে উঠাইয়া দিয়া ভিতর হইতে বুদ্বুদাকারে বাহির হইতে থাকে। উত্তাপ দিতে ক্ষান্ত হইলে কুজ্জার (ক) ফানস যখন শীতল হয়, ভিতরের বাতাস তখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তাহার স্থিতিস্থাপকশক্তি সমান থাকে না, সুতবাং বাহিরের বাতাস নলের দ্বিতীয় (গ) ফানসের জলকে বেগে হঠাইয়া প্রথম (খ) ফানসে আনিয়া ফেলে এবং তথা হইতে বুদ্বুদাকারে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে ভিতরের বাতাসের স্থিতিস্থাপকতা সমান করিয়া পূর্ব্ববৎ কুজ্জাকে পূর্ণ করে। এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, বাতাসের প্রসার্য্যতা জলীয় বা কঠিন পদার্থ হইতে অনেক অধিক।

সুতরাং যখন সকল পদার্থই দিনের বেলায় সূর্য্যতাপে গরম হয় এবং রাত্রিকালে ঠাণ্ডা হয়, তখন বলিতে হইবে, সকল পদার্থেরই আয়তনের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। যে সকল পদার্থ অত্যন্ত প্রতিযোগী * যেমন বাষ্পীয় শকটের লৌহবর্ম্ম সকল, ঝোলা সাঁকোর শিকল সকল, নির্ম্মিত বাটীর ইষ্টক প্রস্তরাদি, ইহাদের কাহারই আয়তন ধ্রুবনির্দ্দিষ্ট নাই; কঠিনতর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাসাদও এইরূপ পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে মুক্ত নহে; বায়ুর উষ্ণশীততানুসারে তাহাও হয় দীর্ঘ হইতেছে নয় হ্রস্ব হইতেছে, হয় উচ্চ হইতেছে নয় নীচু হইতেছে।

তাপ পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তন করে; ইহাই কঠিনকে তরল এবং তবলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে সক্ষম। জগৎশুদ্ধই তাপের এই সকল কার্য্য অবগত আছে। সকলেই জানে যে তাপই বরফ, মোম, গন্ধক, সীসা, পিতল, রূপা, সোনা, এই সকলকে গলায়, আবার তাহারাই ঠাণ্ডা হইলে অথবা তাহাদের কতক তাপাংশ হ্রাস হইলে তাহারাই পুনরায় কঠিন হয়। কিন্তু জলীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থায় যাওয়ার বিষয়ে সকলে মনোযোগ দেয় না বলিয়া সূক্ষ্মরূপে অত বুঝিতে পারে না; কেহই সন্দেহ করে না যে এক কিলোগ্রাম † বরফ, এক কিলোগ্রাম জলই দেয়; যে এক কিলোগ্রাম থান সোনা গলাইলে এক কিলোগ্রাম গলা সোনা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন জলের বলক উঠিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইতে হইতে ক্রমে জল অদৃশ্য হইতে থাকে, তখন সন্দেহ হইতে পারে যে, এক কিলোগ্রাম জল হইতে এক কিলোগ্রামই বাষ্প উদ্গত হয় কি না; যেহেতু অনেকে জানে না যে বাষ্পটা কি। বাষ্প হইতে

* "ঘন সংযুক্ত" অর্থে ব্যবহৃত ; Anything or object dependent upon another and not existing without it. Wilson's Sans—Eng. Dictionary.

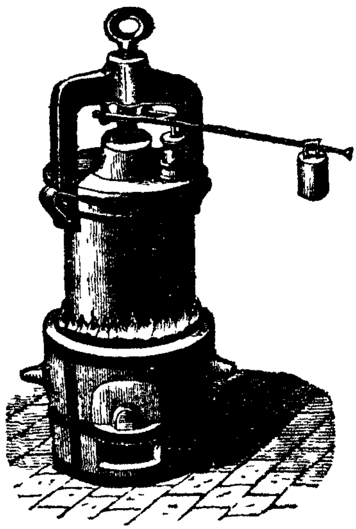
† কিলোগ্রাম = প্রায় ২ পাউণ্ড = প্রায় ১ সের।

যে জল হয়, তাহা অনেকে জানে; কিন্তু বাষ্পের যে কি প্রকার সত্তা, কিরূপে যে উহা অবস্থিতি করে, এবিষয় অনেকে অপরিজ্ঞাত।

গরম জলের উপর দিয়া ধোঁয়ার মতন বা কোয়াসার মতন যাহা বাহির হয়, তাহা বাস্তবিক বাষ্প বা ভাপ নহে; তাহা জমা বাষ্প অর্থাৎ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র জলকণারূপে অথবা সাবানের ফানসের মত দশম হইতে বিংশ মিলিমেটর (১) পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্বুদাকারে পরিণত হইয়া চক্ষুগোচর হয়, কিন্তু আদৎ বাষ্প যেটি, যাহাকে স্থিতিস্থাপক বা সূক্ষ্ম বাষ্প বলিয়া ঘনীভূত বাষ্প হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা বাতাসেরই ন্যায় স্বচ্ছ এবং অদৃশ্য।

এক কিলোগ্রাম জলকে বাষ্প করিলে সূক্ষ্ম বাষ্প এক কিলোগ্রামই হয়। ইহাতে জলের বস্তুতঃ পরিবর্ত্তন বা বিযুক্ততা হয় না, কেবল আকারগত ভেদ বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। বাষ্পের আয়তন পরিমাণ জল অপেক্ষা অনেক বেশী, কখনো বা শতাধিক গুণ বেশী, কখনো সহস্রাধিক গুণ বেশী, কখনো বা শতসহস্রাধিক পরিমাণে বেশী। বাষ্পের একটী বিশেষ লক্ষণ, তাহার স্থিতিস্থাপকতা অথবা প্রসারণী শক্তি, অর্থাৎ উহা নিরন্তর অধিকাধিক স্থান ব্যাপিবার জন্য চেষ্টা করে। এই বলকে উপযুক্তরূপে নিয়মিত করিলে ইহা বাষ্পীয় কলের চোঙার দণ্ডকে ঠেলিতে সমর্থ হয়; ইহাই বাষ্পীয় শকট ও তাহার সঙ্গে যাত্রী ও বোঝাই গাড়ি টানিয়া লইয়া চলে; ইহা লক্ষ লক্ষ মোন বোঝাই জাহাজ সকলকে সমুদ্রবক্ষ বিদারণ করিয়া লইয়া যায়; ইহা গুলি-গোলা নিঃক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়; ইহা জল গরম করিবার পাত্র সকল বিদারিত করিয়া তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাংশ সকলকে ঘোরবেগে অতি দূরে প্রক্ষেপ করে।

প্যাপাঁ * নামক ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত জল গরমের কল দ্বারা এই বলের ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা পুরু



৭ম চিত্র।

পিত্তলের পাত্র; ইহাকে দুই তৃতীয়ভাগ জলে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করিতে হয়। যখন ঐ জল উপযুক্ত পরিমাণে গরম হইল, তখন ছিপি খুলিয়া দিলে তাহা হইতে বেগে বাষ্প নির্গমনের দরুণ শীষের ন্যায় এমনি এক ভয়ানক

* Papin. (১) মিলিমেটর $=\frac{১}{২৫}$ ইঞ্চি; এই সকল পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত।

শব্দ নির্গত হয় যে, কাণে তালা ধরিয়া যায়; সেই সঙ্গে কোয়াসার ন্যায় ঘনীভূত বাষ্পকে অনেক দূর উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উচ্চ স্তম্ভাকারে উত্থিত হইতে দেখা যায়। কেবল ছিপির মুখের কাছে বাষ্পধারা এতদূর পর্য্যন্ত গরম থাকে যে, সেখানে উহা ঘনীভূত হইয়া ধোঁয়ার আকার ধারণ করে না, বাতাসের ন্যায় স্বচ্ছ ও অদৃশ্য থাকে।

তাপ দুই প্রকারে আপনাকে বিতস্ত করে। কখনো বা ক্রমে নিকট নিকট দ্বারা, থাকের পর থাকের দ্বারা, স্তরের পর স্তরের দ্বারা, অণুর পর অণুপ্রবেশ দ্বারা, মন্দগতিতে দ্রব্য মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে পৃথিবীর বক্ষমধ্যে প্রবেশ করে অথবা যদি কোনো এক বস্তু উননের আগুনের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহাতেও ঐরূপে প্রবেশ করে ইত্যাদি। এইরূপ তাপ-গতিকে সাধারণ তাপ বা অণুগত তাপ অথবা অণুপ্রবেশিক তাপ বা অনুক্রম তাপ কহে। কথনো বা লম্ফগতি বা মণ্ডূকগতি দ্বারা আলোকের ন্যায় দূর হইতে দূরে আপনাকে সন্তত করে। এবং আলোক যেমন স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাপও তাপাচ্ছরূপ (১) কতকগুলি পদার্থ ভেদ করিয়া বাহির হয়। এই মণ্ডূকগতি তাপকে রশ্মিময় তাপ বা কিরণতাপ বা প্লবক্রম তাপ (২) কহে।

সূর্য্য হইতে যে তাপ আমাদের নিকটে আইসে, তাহা প্লবক্রম তাপ। যে হেতু তাহা আলোকের ন্যায় ৪ কোটী লীগ্ অথবা ১৬ কোটী কিলোমেটর আকাশ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার আলোকের ন্যায় পৃথিবীর উপরিস্থ ২৫ লীগ্ বা শত কিলোমেটর স্থূল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া তবে আমাদের নিকটস্থ হয়। কিন্তু ঐ তাপকিরণ (৩) যখন পার্থিব বস্তু দ্বারা শোষিত হয়, তখন তাহাই অনুক্রম তাপ হইয়া ক্রমে নিকটে নিকটে বিস্তৃত হইতে হইতে তাহাদিগের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে উষ্ণ করে।

আমাদের উনন হইতে যে তাপ বিনির্গত হয়, তাহাও সূর্য্যতাপের ন্যায় কিরণতাপ; যেহেতু দূর হইতে এবং বাতাসের অন্তরালে থাকিয়াও সেই তাপ আমরা অনুভব করি এবং যদি উননের মুখে একটা অ-কলাই সার্সি (কাচ) রাখিয়া দিই, তাহার ভিতর দিয়াও আমরা অগ্নির তাপ অনুভব করিতে থাকি।

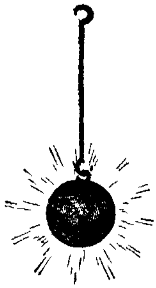
কিন্তু সূর্য্যতাপের ন্যায় পৃথিবীস্থ উননের কিরণতাপও যখন পার্থিব পদার্থ দ্বারা শোষিত হয়, তাহাও অনুক্রম তাপ হইয়া পড়ে। তেমনি আবার অনুক্রম তাপও বীতক্রম (প্লবক্রম) হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে এই দুই প্রকার তাপের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভিন্নতা নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে, তাহাদের বিস্তৃতির (Propagation) প্রকারভেদ আছে, তাহাদের স্বভাবের ইতরবিশেষ

(১) Diathermanous.

(২) Radiated heat.

(৩) Ray of heat or thermal or calorific ray.

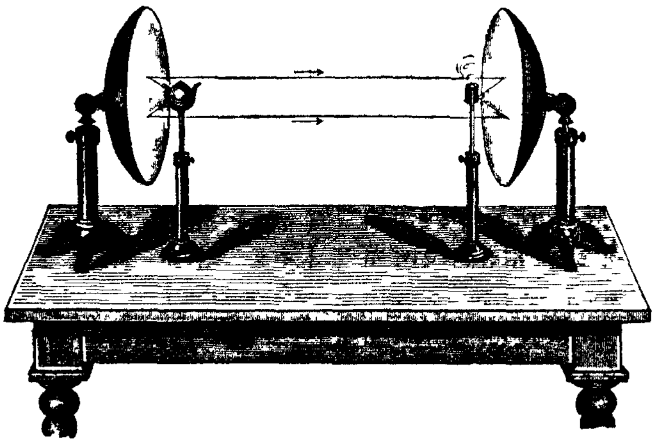
নাই। যদি কোন গোলাকে অগ্নিকুণ্ডে গরম করা যায়,তাহার সকল দিক হইতে এইরূপ কিরণতাপ বিনিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। যতক্ষণ উহা অগ্নি বা আলোকের দ্বারা প্রদীপ্ত থাকে, ততক্ষণই যে কেবল



৮ম চিত্র।

ঐরূপ হয় তাহা নহে; যখন উহা জ্বলন্ত থাকে না এবং অন্ধকারের মধ্যে যখন অদৃশ্য হয় তখনো হয়। যথার্থ বটে, প্রদীপ্ত সময়ে বায়ু ভেদ করিয়া বা সাধি ভেদ করিয়া যে পরিমাণ তাপ অনুভব করি, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত সময়ে ততটা করি না, তথাপি তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই তাপকিরণ, প্রদীপ্তই হউক বা তমসাবৃতই হউক, আলোকের ন্যায় আবার প্রতিফলিত হয়; কারণ দুই ন্যুব্জ দর্পণকে ৪।৫ গজ দূরে পরস্পরের প্রতি সম্মুখ করিয়া রাখিয়া তাহার একটার অক্ষে জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া



৯ম চিত্র।

আর একটার অক্ষে দিয়াশলাই প্রভৃতি জ্বলনশীল দ্রব্য ধরিলে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং যদি অঙ্গারের বদলে একদিকে অ-প্রজ্জ্বলিত অথচ গরম গোলা রাখা যায়, সেখান হইতে আস্তে আস্তে হাত সরাইতে সরাইতে অন্য আয়নার অক্ষে হাত ধরিলেই তীব্র তাপ অনুভূত হইবে। তাহা আর কিছুই নহে কেবল গোলার তাপ কিরণ, যাহা প্লবক্রমে নিকটস্থ আয়নায় বায়ুভেদ করিয়া পড়িয়াছিল; সেই তাপকিরণ সকল প্রতিফলিত হইয়া অপর আয়নায় গিয়া পুনর্ব্বার প্রতিফলিত হইয়া সেই আয়নার ন্যুব্জতা হেতু অক্ষে আসিয়া একত্রীভূত হইল।

যখন পদার্থ সকল উষ্ণ বা দহনোষ্ণ থাকে, তখনি যে তাহারা তাপকিরণ প্রস্তুত করিতে থাকে তাহা নহে, তাপকিরণ নিরন্তরই প্রস্তুত হইতে থাকে—

যখন তাহাদিগকে উষ্ণ বোধ হয় না, যখন তাহারা ঠাণ্ডা হয়, যখন বরফের মতন ঠাণ্ডা হয় অথবা যতদূর আমাদের সাধ্য ততদূর কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করি তখনও উহা প্রস্থত হয়। কেন্দ্রস্থিত তুষাররাশি, উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গ যাহা নিরন্তর তুষারাবৃত হইয়া পলিতকেশে স্থিতি করিতেছে, তাহারাও তাপভাগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই; এবং পৃথিবীস্থ এই সকল শীতলতম পদার্থেরাও নিরন্তর কিছু না কিছু তাপকিরণ বিনিঃসৃত করে, যাহা ভূলোকস্থিত বায়ু এবং অন্তরীক্ষস্থ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া অসীমরূপে প্রসারিত হইতে থাকে অথবা দ্যুলোকরাজ্যে আপনাকে অন্তর্হিত করে।

এইরূপে আমাদের ভূমণ্ডল যেমন আলোক দ্বারা তেমনি তাপ সহায়ে, যেমন দৃষ্টচর দ্বারা তেমনি অদৃশ্য মধ্যস্থের সহায়ে আমাদের সৌরজগতের অপরাপর গ্রহমণ্ডলের সহিত এবং যতদূর চক্ষু বা দূরবীন যায় সেই সকল নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত এবং তদ্ব্যতীত সেই সমুদয় জগৎমণ্ডল, যাহা অনন্ত আকাশের অসীম গভীরে ছড়াইয়া আছে, সেই প্রত্যেকের সঙ্গে, তাবতের সঙ্গে জ্ঞাতিকুটুম্বত্ব—গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা সম্বাদ লওয়ালওয়ি করে। আমরাও সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র পার্থিব ভাব হইতে, স্বার্থপর ভাব হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মকে মধ্যস্থ করিয়া দেবতাদের সঙ্গে সমান হইয়া বলিতে থাকি—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" হে দিব্য ধামবাসী অমৃতের পুত্রেরা, তোমরা যেমন দ্যুলোকে থাকিয়া ব্রহ্মকে জানিতেছ, আমরাও ভূমণ্ডলবাসী হইয়া এই অন্ধকারের অতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; তিনি যেমন তোমাদের পিতামাতা, সেইরূপ আমাদেরও পিতামাতা, অতএব তোমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন; তোমাদিগকে আমরা সম্বোধন করিতেছি।

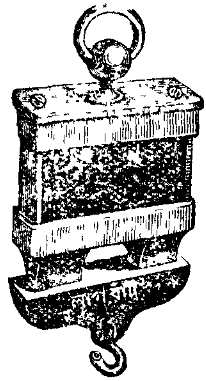
৪। চৌম্বক।

চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যে আকর্ষণ পরস্পরের প্রতি কার্য্য করে, তাহাকে চৌম্বক বলে। খনিজ চুম্বক অথবা চুম্বক প্রস্তর এক প্রকার লৌহভস্ম * (লৌহ-অক্সাইড), যাহা সচরাচর লৌহখনিতেই কখন বা এখানে ওখানে দুই এক ছোট খণ্ডে পাওয়া যায়, কখন বা বৃহৎ খণ্ডরূপে পাওয়া যায়,

* "কয়েক গ্রেণ লৌহখণ্ড একখানি কয়লার উপরি রাখিয়া তাহা ব্লোপাইপোত্তাপে কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে ইহা লোহিতোত্তপ্ত হয় ও উত্তাপ লৌহের অভ্যন্তরস্থ অণুতে পয্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। লৌহ শীতল হইলে বর্ণ গাঢ় হইয়া প্রায় কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় ও এই অক্সাইডের একটী কঠিন পিণ্ড উৎপন্ন হয়। লৌহ বায়ুতে বা অক্সিজেনে দগ্ধ হইলে যে যৌগিক উৎপন্ন হয় ইহাও সেই দ্রব্য। কর্ম্মকারের দোকানে লোহিতোত্তপ্ত লৌহ পিটাইবার সময়ে যে লোহিতবর্ণ স্ফুলিঙ্গগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় তাহা ম্যাগনেটিক (চৌম্বক) অক্সাইড। খনিতেও ইহা পাওয়া যায়। (কানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত রসায়ন বিজ্ঞান)।

এবং কখন বা স্থূল স্তরের পর স্তর সমস্তই চুম্বকের পর্ব্বতরূপে অবস্থিতি করে, যাহার প্রতি অংশই চুম্বকধর্ম্মোপেত ও লৌহকে আকর্ষণ করে। এখন, আকর্ষণ কেবল একের হইতে পারে না; আকর্ষণ সর্ব্বথা পারস্পরিক এবং লৌহও চুম্বককে ততটুকু আকর্ষণ করে, যতটুকু সে নিজে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণ-রূপ কার্য্যটী উভয়সম্বন্ধীয় কার্য্য; ইহার কারণ উভয় আকর্ষক ও আকৃষ্টপদার্থদ্বয়ে একই সময়ে বিরাজ করে। এই কারণ লৌহ এবং চুম্বক উভয় হইতে ভিন্ন; যেহেতু ইহার হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং ইহাকে নষ্ট ও পুনরুৎপন্ন করা যাইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য পদার্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এইজন্য উহাকে তরল পদার্থ বলা যাইতে পারে—ভারহীন তরল পদার্থ †; ইহাকেই চৌম্বক বলে।

সম্মুখে যে যন্ত্রের চিত্র দেখিতেছ,



১০ম চিত্র।

ইহা লৌহের পত্র-মারা স্বাভাবিক চুম্বক; ইহার দুই পায়াকে দুই কেন্দ্র বলে। উহাদের নীচে যাহা লাগিয়া রহিয়াছে,

† তাপ, চৌম্বক প্রভৃতি 'এক প্রকার ভারহীন তরল পদার্থ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শক্তিসমূহকে প্রকৃতপক্ষে তরল পদার্থ বলিয়া ধরা হয় নাই, কেবল আলোচনা সুবিধার্থেই ঐরূপ বলা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্যানো (Ganot) তাঁহার পুস্তকে চৌম্বক শক্তি তরল পদার্থ না হইলেও তাহাকে তরল পদার্থ (fluid) রূপে উল্লেখ করিয়া পরে বলিতেছেন, "Ordinarily the idea of a liquid is associated with a fluid; hence the use of this term to explain the phenomena of magnetism and electricity has produced a widely prevailing impression of the material nature of these two forces. The word fluid, it must be remembered, embraces gases as well as liquids, and here it must be pictured to the mind as representing an invisible, elastic, gaseous atmosphere or shall surrounding the particles of all magnetic substances. * * * The hypothesis of the two fluids is very convenient in explaining magnetic phenomena, and will be adhered to in what follows." (Atkinson's Translation of Ganot's Physics p. 537.) গ্যানো অন্যত্র তড়িতশক্তিকেও তরল পদার্থরূপে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "As has been already said, this theory is quite hypothetical; but its general adoption is justified by the convenient explanation which it gives of electrical phenomena." (ibid. p. 567.) চৌম্বক ও তড়িৎ যে ভাবে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যানো কর্ত্তৃক তরল পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ভাবে চৌম্বক ও তড়িতের সঙ্গে তাপও ভারহীন তরল পদার্থরূপে উল্লিখিত হইল।

উহাও লৌহেরই নির্ম্মিত—উহা দূর হইতে কেন্দ্রদ্বয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। দূর যত সংক্ষেপ হয়, আকর্ষণী শক্তি তত শীঘ্র সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে; এবং যখন ঝুলান দ্রব্য একবার চুম্বককেন্দ্র স্পর্শ করে, তখন তাহাকে অধিক বা অল্প বলে টানিলেও তাহা শীঘ্র খুলিয়া আইসে না। যদি চুম্বক মৃদু হয়, তাহা হয়তো কয়েক শত গ্রাম ‡ মাত্র ঝুলাইতে পারে; যদি তাহা বলবান্ স্বাভাবিক চুম্বক হয়, তাহা হইলে সংস্পৃষ্ট লৌহের নীচে আরও মণদুয়েক দ্রব্য ঝুলান যাইতে পারে। আবার কৃত্রিম চুম্বক এমন প্রস্তুত করা যায় যাহা ২০।২৫ মণ ওজনের দ্রব্য অনায়াসে বহন করিতে পারে।

দিগ্দর্শনের (দিগ্বীক্ষণ বা Magnetic Compass) কাঁটা কৃত্রিম চুম্বক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা একটী সুরম্য কৃষ্ণায়স্-পত্র, যাহাতে চুম্বকশক্তি উৎপন্ন করা গিয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে পৃথিবীর সকল স্থানেই, কি সমুদ্রের উপর, কি দেশবিদেশে, দিগ্দর্শনের কাঁটা একটী নির্দ্দিষ্ট দিকের পানে লক্ষ্য করে—ঠিক উত্তর দিকে নহে, কিন্তু উত্তর দিকের পানে লক্ষ্য করে; কোন কোন প্রদেশে ঐ কাঁটা উত্তরের একটু পূবের দিকে হেলে, অন্যত্র বা উত্তরের একটু পশ্চিমে হেলে। ইউরোপ খণ্ডে স্থান ও সময় বিশেষে অধিক বা অল্প পশ্চিমেই হেলিয়া থাকে। প্যারিস নগরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিগ্দর্শনকাঁটা ১৯·৪১´ পর্য্যন্ত পশ্চিমে হেলিয়াছিল।

যখন একটীতে নহে, দুটীতে নহে, পৃথিবীস্থ সকল দিগ্দর্শনেতেই এইরূপ সংঘটিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে এমন কোন সাধারণ চুম্বকী শক্তি আছে, যাহা একই সময়ে উহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছে; যাহা উহাদিগকে ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে এবং চালাইতেছে; যাহা উহাদিগকে একরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, নিমিষের জন্যও মুক্ত হইতে দেয় না। অতএব এই যে সাধারণ চুম্বকী শক্তি, ইহা ভূগোল-চৌম্বক, যেহেতু ভূমণ্ডল স্বয়ংই এক চুম্বক।

অনেকের মতে এখন পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনা হয় নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে পৃথিবী সূর্য্য হইতেই হউক বা সৌর জগতের অন্য কোন স্থান হইতেই হউক; অথবা কোন নক্ষত্র বা আকাশের অন্য কোন স্থান হইতে হউক, কোন চুম্বকী শক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নানা ঘটনা দ্বারা এখন সপ্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্যের মধ্যে যখন জ্বলনশীল দ্রব্য বেশীরূপে পোড়ে তখন মধ্যে মধ্যে দিগ্দর্শনের কাঁটার লক্ষ্য অন্যথাভাব ধারণ করে, অতএব বলিতে হইবে সূর্য্য হইতেও পৃথিবী সময়ে সময়ে চুম্বকী শক্তি প্রাপ্ত হয়।

‡ গ্রাম = Gram = $\frac{৮}{১২৫}$ কাঁচ্চা।

মালাগাঁথি।

মরমে মরমে মালা গাঁথি
মরমে শুকায়ে যায়
তুলে ল'য়ে আনি যুঁথি জাতি
পরাণেতে হায় হায়

সাঁঝের বহিছে বায় বনে
গাঁথিব ফুলের হার
বিরলে লইব আন মনে
মদির সুরভি সার

ভ'রে গেছে ফুলে তরুতলা
বকুল ফুলের রাশি
মনে পড়ে সেই সন্ধ্যেবেলা
বেজেছে মধুর বাঁশী

প্রণয়ের কোলে বুক পাতি
গেয়েছি কত কি গান
মরমে মরমে মালা গাঁথি
মরমেতে অবসান

আধ ফোটা ফোটা ফুল কলি
সুবাসে ভরিয়া গেছে
হৃদয়ের ভাঙ্গা সুর গুলি
বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে

জোছনা মগনা নদী তীরে
গাঁথিব একেলা মালা
ঢেউ গুলি যায় ভেসে ধীরে
ঘুমের কাহিনী ঢালা

মালাতে জড়ায়ে ধীরে ধীরে
প্রেমের বাঁধন দেব
শেষেতে ঝরিলে আঁখি নীরে
বুকের উপরে নেব

মরমে মরমে মালা গাঁথি
মরমে শুকায়ে যায়
তুলে ল'য়ে আনি যুঁথি জাতি
পরাণেতে হায় হায়

বালিকা ও বিধবা-বিবাহ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকযাত্রাবধি তাঁহার জীবনী-প্রসঙ্গক্রমে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন আবার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন পক্ষাপক্ষ ছিল না, সকলেই একবাক্যে তাহা অহিন্দু ব্যবহার বলিয়া নিন্দা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটী পূর্ব্বপক্ষের সৃষ্টি করিলেন।

তাঁহার হৃদয় অতি তরল ছিল। পরবেদনায় তিনি শীঘ্র কাতর হইয়া পড়িতেন। এজন্য হিন্দু বালবিধবাগণের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া তিনি গলিয়া গিয়াছিলেন। অকালবৈধব্য জনিত সামাজিক অনিষ্টপাত তাঁহার ধর্ম্মতেজ প্রণোদিত করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। হৃদয়বেদনায় তাঁহার বুদ্ধি উত্তেজিত হইয়াছিল। ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তিনি যুক্তিপথ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি যে এই উদ্দেশ্যেই যুক্তিপথাবলম্বী হইয়াছিলেন তাঁহার প্রচারিত বিধবা-বিবাহ-প্রস্তাবেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন দেশীয় আচার ব্যবহার তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। দেশাচারের প্রতীপগামী হইলে পাছে ঘোর সমাজবিদ্রোহ ঘটে, এজন্য তিনি সেই দেশাচারের মধ্য দিয়া একটি সূক্ষ্ম পন্থা বাহির করিয়া ছিলেন। দেশাচার অনেকাংশে বজায় রাখিয়া তিনি তাহার একটি বিশেষ অংশের বিরুদ্ধে গেলেন। তিনি শুদ্ধ পতিসংসর্গ-বিহীনা বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থনার্থ উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও চতুর। হিন্দুসমাজ বুঝিত, তাহার কোন নিয়ম ঘুণাক্ষরে শিথিল হইলে, সমুদয় সমাজ আমূল আলোড়িত হইবে। প্রথমে পতিসংসর্গহীনার বিবাহে আরদ্ধ হইয়া সমাজে সর্ব্ববিধ বিধবা-বিবাহই প্রচলিত হইবে। নিয়ম শিথিল হইলে আর রক্ষা নাই। এজন্য বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ তাঁহার বিশেষ নিয়মও অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। দেশাচার, প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তির তর্কজালে পরিবর্ত্তনীয় নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রসহায়তা ধরিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অনেক দিন পরে দেখিতে পাইলেন যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যত দেশাচারাধীন তত শাস্ত্রাধীন নহে। দেশাচারই হিন্দুসমাজের প্রাণ ও বল। একথা যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি যে অস্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, হয় ত সে অস্ত্র গ্রহণ করিতেন না। যখন তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন বুঝিলেন, কোনরূপে হিন্দু দেশাচারের প্রতীপগামী হওয়া বড় সহজ কথা নহে। হিন্দুসমাজের নিকট শাস্ত্রীয় তর্ক কোন কার্য্যকর হয় না। হিন্দুরা বুঝে শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম মীমাংসায় সমাজস্থ আচার ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। দেশাচার সামান্য শাস্ত্রীয় যুক্তির ফল নহে। শাস্ত্রকারগণ অনেক দূর দেখিয়া তবে দেশাচার প্রতিষ্ঠি-

করিয়া গিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ-প্রসঙ্গে একথা সপ্রমাণও হইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুরা দেশাচার হইতে একপদ বিচলিত হইবার পাত্র নহেন।

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশাচারকে শিথিল করিবার জন্য যে পক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

তিনি বলিয়াছিলেন, হিন্দুর নিকট বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, বেদের পর ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রের পর দেশাচার। দেশা-চার যদি ধর্ম্মশাস্ত্র বা বেদবিরুদ্ধ হয়, তবে দেশাচার পরিত্যজ্য। সুতরাং বিচার্য্য এই যে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে প্রচলিত দেশাচার ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ সম্মত কি না? যদি না হয়, তবে দেশাচার পরিহার করা উচিত। এজন্য, বিদ্যাসাগর মহা-শয় ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়া যে কোটি উত্থাপিত করি-লেন তাহা এইঃ—

(১) আমরা এক্ষণে কলিযুগে বর্ত্ত-মান রহিয়াছি। এই কলিযুগের বিশেষ উপযোগী কোন ধর্ম্মশাস্ত্র যদি থাকে, তবে তাহাই এ যুগের পক্ষে বিশেষ প্রামাণ্য। পরাশর-সংহিতাই সেইরূপ বিশেষ উপযোগী ধর্ম্মসংহিতা। অতএব মন্বাদি সংহিতা অপেক্ষা আমাদের কাছে পরাশরই সমধিক আদরণীয়।

(২) শুধু পরাশরকে প্রবল বলিলে চলিবে না, যে পরাশর-সংহিতায় বিধবা-বিবাহানুকুল বচন আছে সেই পরাশর সংহিতাকে প্রবল করিতে হইবে। তজ্জন্য আবশ্যক কি? পরাশর-সংহিতা বলিয়া যে অন্য একখানি সংহিতা আছে, যাহাতে সেরূপ অনুকুল বচনাভাব, সে সংহিতাকে অপ্রামাণ্য করা চাই।

এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃদ্ধ বা বৃহৎ পরাশরকে বাদ দিলেন, আর লঘু পরাশরকেই গ্রহণ করিলেন।

(৩) এ দেশে মনুর প্রতি লোকের ভক্তি অত্যন্ত অধিক। মনুকে বাদ দিয়া পরাশরকে গ্রহণ করিলে পরাশরের কথায় তত জোর হয় না। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন যে মনুও পরাশরের বিরুদ্ধে নহে।

(৪) বিবাহে আমরা কন্যাকে সম্প্রদান করি, ঘটি বাটির মত দান করি না, এজন্য কন্যাকে সম্প্রদান করিলেও তাহাকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করিবার অধিকার লোপ হয় না।

স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তিপথ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ আলোড়িত হইল। হিন্দুসমাজ তাঁহার যুক্তিকে অতি বিকৃত যুক্তি বলিয়া স্থির করিল। তাঁহার বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে মহা শাস্ত্রীয় বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। আজি পর্য্যন্তও সে বিবাদের তরঙ্গ থামে নাই। ইংরাজী-ওয়ালাদের সহিত হিন্দুদের বরাবর বিবাদ চলিয়াছে। সেদিনমাত্র কতিপয় পরিণত-বুদ্ধি ইংরাজীওয়ালারা হিন্দুপক্ষে জয় ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃষ্ট শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোটিগুলি সমস্ত ভ্রান্ত। আমাদের দেশাচার সম্পূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত। শুধু শাস্ত্রসম্মত নহে অপরাপর সর্ব্বদেশী দেশাচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সেদিন ময়মনসিংহ হইতে "বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ" বলিয়া একখানি গ্রন্থ

প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শর্ম্মা সেই বিস্তারিত গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমুদয় কোটি অতি তন্ন তন্ন বিচার করিয়া কাটিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিপথ এত সুন্দর, তাঁহার প্রমাণ-পরিচয় এত পরিষ্কার, তাঁহার সিদ্ধান্ত গুলি এত হৃদয়গ্রাহী যে আমরা তাহা সমস্ত ইংরাজীওয়ালাদের পড়িতে বলি।—এই গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিধবা বিবাহ যে ইংরাজী সাম্যবাদের উপর স্থাপিত, সে সাম্যবাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, শুদ্ধ কলিযুগের জন্য লঘুপরাশর নয়, তাহা সর্ব্বকালেরই প্রতিপাদ্য ধর্ম্মশাস্ত্র; লঘু-পরাশরের অনুকূল বচনের অর্থ ও প্রয়োজন স্বতন্ত্র, বৃহৎ পরাশর মন্বাদির ন্যায় অতি প্রামাণ্য শাস্ত্র, মনু বিধবা বিবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাঁহার মতে দ্বিতীয়বার কন্যাদান অসিদ্ধ। প্রসন্ন বাবু দেশাচার-পক্ষে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন তাহা অতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তদ্দ্বারা কোন ফল হইবে না; বরং প্রসঙ্গের অসম্পূর্ণতা বশতঃ কেবল মিথ্যাবিবাদ উৎপাদন করিবে। এজন্য তাঁহার যুক্তির সংক্ষেপ পরিচয় দিতে আমরা বিরত হইলাম। বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, বলিতেছি।

প্রথমতঃ। প্রসন্ন বাবু প্রমাণ করিয়াছেন, যে লঘু পরাশর সংহিতা শুদ্ধ কলিযুগের জন্য নহে; অন্যান্য সংহিতার ন্যায় সর্ব্বকালের জন্য। নন্দকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণও পূর্ব্বে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। আদি পুরাণ ও বৃহৎ নারদীয় পুরাণে যে সকল বিধি কলিযুগে অনাচরণীয় এবং অপর যুগে আচরণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা লঘু পরাশরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে আর পরাশরকে শুদ্ধ কলিযুগের ব্যবস্থা বলিয়া কিরূপে মান্য করা যায়? লঘু পরাশর যখন সর্ব্বযুগোপযোগী রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে শুদ্ধ কলিযুগোপযোগী বলিতে পারি না। মন্বাদির ন্যায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই লঘু পরাশর মতে বিধবা-বিবাহ প্রশস্ত পথ নহে। তাঁহার মতেও প্রশস্ত পথ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। পরাশরের নিজ মুখ হইতে যাঁহারা তাঁহার মত শুনিয়া তাহা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পরাশর-নন্দন ব্যাস এবং সুব্রত তাঁহাদের প্রচারিত সংহিতায় বিধবা-বিবাহ বৈধ বলেন নাই। লঘু পরাশর-কর্ত্তা অনেক কাল পরে কেবল লোক-স্মৃতি ধরিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক পরাশর উক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রসন্ন বাবু বলেন লঘু পরাশর-কর্ত্তা "নষ্টেমৃতে" * ইত্যাদি বচনে বিধবা বিবাহের বিধান করেন নাই। নারদ স্বীয় ব্যবহার-শাস্ত্রে দণ্ডবিধির উল্লেখ স্থলে তাহার নিপাতন স্বরূপ ঐ কথার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন মাত্র। এই নারদীয় ব্যবহার শাস্ত্র হইতে লঘু পরাশর কর্ত্তা তাহা গ্রহণ

* অনেকে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন —"যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তবে ঐ ভাবীপতি যদি নিরুদ্দেশ বা মরিয়া যায় ইত্যাদি"—সকল মতের সহিত পরাশরের সঙ্গতি রক্ষার্থ বোধ হয় এই কষ্ট কল্পনার সৃষ্টি।

করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যেরূপেই হউক, যখন লঘু পরাশরে ঐ বচন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে তাহা লঘু পরাশর কর্ত্তার মত। কিন্তু তাহা হইলেও কি সিদ্ধান্ত হয়? যখন একজন ব্যতীত সমস্ত শাস্ত্রকার মতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ,তখন অবশ্য বলিতে হইবে বিশজনের কথাই প্রবল। কারণ, বিশজনকে ছাঁটিয়া এক জনকে প্রবল করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যে যুক্তিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একজনকে প্রবল করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অপ্রামাণ্য। অতএব, বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নহে,যাহা শাস্ত্র-সম্মত নহে তাহা নিষিদ্ধ। দেশাচার অনুসারেও বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ। বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হওয়াতে প্রতীত হইতেছে, এরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজে মন্বাদির পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত না থাকে, তাহার প্রতিষেধ আবশ্যক হয় না। এক্ষণে যেমন ইউরোপীয় সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, হিন্দুসমাজেও এককালে তাহা প্রচলিত ছিল। সুতরাং হিন্দুসমাজের পুনঃ পুনঃ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাবার ন্যায় আর্য্যসমাজও সংস্কৃত। যখন সমাজ সংস্কৃত হইয়াছিল, তখন অবশ্য বিধবা বিবাহের পরিণাম ও কুফল বিলক্ষণ বিবেচিত হইয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহের নিষেধ বিবেচনার ফল,একদিনে কিম্বা হঠাৎ তাহা বিধিবদ্ধ হয় নাই। শাস্ত্রে সর্ব্ববিধ পুনর্ভূ পরিত্যাজ্য হওয়াতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা সামাজিক পাপ ও নিষিদ্ধ, বিধানশাস্ত্রে তাহার দণ্ড নিয়োজিত থাকে এবং যাহা পুণ্য বা সাধু ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার পুরস্কার বা সুফলের উল্লেখ থাকে। বিধবা বিবাহের নিষেধ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছে ঃ—

"কন্যাকে একবার দান করিয়া পুনর্দ্দান করিবে না। যে কন্যাকে একবার দান করা হইয়াছে, সে ক্ষতাই হউক বা অক্ষতাই হউক, তাহাকে পুনরায় অন্য পুরুষে অর্পণ করিলে সে পুনর্ভূ হয়। ঐ পুনর্ভূর গর্ভজাত সন্তান পতিত। পুনর্ভূ ও তৎপরিবারস্থ সকলে পতিত ও বর্জ্জিত।"

ব্যাস মহাভারতের বকবধ-আখ্যায়িকায়ও স্পষ্ট বলিয়াছেন ঃ—

"স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর অন্য পতিগ্রহণ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই।"

বিধবা বিবাহের এইরূপ নিষেধ থাকাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে হিন্দুসমাজ সংস্কৃত হইয়াছে। বিধান শাস্ত্রে কিছুরই যুক্তি প্রদত্ত হয় না, এজন্য কোন শাস্ত্রে এই নিষেধের যুক্তি দেখা যায় না।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারগণ লোকযাত্রা বিধান বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজনীতি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেন এবং সিদ্ধান্তানুযায়ী সমাজের সংস্কার বিধান করিতেন। সেই সিদ্ধপুরুষগণের সিদ্ধান্ত সকল অতি পরিশুদ্ধ ছিল। তাঁহারা বিধান শাস্ত্রে যুক্তিপ্রদর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থা সকলের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, তাহাদিগকে অতি পরিণত বুদ্ধিরই ফল বলিয়া প্রতীত হইতে

থাকে। তাঁহারা সেই পরিণত বুদ্ধিতে হিন্দুসমাজকে বালিকাবিবাহের স্থনিয়মে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই বালিকা বিবাহ বিধির সহিত বিধবা বিবাহের নিষেধ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত। উভা-দের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একের উৎসেধে অন্যের উৎসেধ সাধন হয়। কিরূপে হয়, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

তৃতীয়তঃ। যে সমাজনীতিতে বিধবা বিবাহ রহিত হইয়াছে, তাহাতেই বালিকা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বালিকা বিবাহ হিন্দুসমাজে যে রীতিতে প্রচলিত আছে, অন্য কোন সমাজে তাহা প্রচলিত নাই। হিন্দুসমাজে বালিকা কন্যার নির্দ্দিষ্ট কালে বিবাহ না দিলে পতিত হইতে হয়। অন্য সমাজে এত কঠিন নিয়ম নাই। মুসলমানাদি সমাজে বালিকা বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও সে সমাজের নিয়ম হিন্দুসমাজের মত অলঙ্ঘ-নীয় নহে। তাহার শৈথিল্য হইলে তত দোষ হয় না। হিন্দুসমাজে এই বালিকা বিবাহ প্রচলন করিবার প্রয়োজন আমরা পরে দেখাইব। এই বালিকা-বিবাহ হিন্দুসমাজের বিশেষ বিধি। হিন্দু-সমাজের হিন্দুত্ব সংযম, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা এই বালিকা বিবাহের উপর স্থাপিত। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়া-ছিলেন, যদি বালিকা বিবাহ সমাজের সমূহ মঙ্গলের কারণ হয়, তবে সেই বিশুদ্ধ নিয়ম কখনই পরিত্যাজ্য নহে। বরং তজ্জন্য অন্য ব্যবহার পরিত্যাজ্য তথাপি বালিকা বিবাহ পরিত্যাজ্য নহে। সেই ভিত্তি বজায় রাখিয়া তবে অন্যান্য ব্যব-হারের ব্যবস্থা। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন সমস্ত বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে গেলে, সমাজে বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত রাখিয়া যদি সমস্ত বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে হয়, তবে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর যেরূপ আধিক্য তাহাতে পুরুষের এককালীন বহুভার্য্যা না ঘটিলে উক্ত দ্বিবিধ বিধি চলিতে পারে না। কিন্তু বহুভার্য্যা লইয়া সংসার ধর্ম্ম করা এক প্রকার বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। সংসার তাহা হইলে নরক তুল্য হইয়া উঠে। সেরূপ নরক যন্ত্রণা নিয়োগ করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে। পুরুষ অপেক্ষা যখন সমাজে স্ত্রীসংখ্যা সমধিক, তখন সমস্ত কন্যার বিবাহ নিযোজিত করিতে হইলে, হয় বিধবা-বিবাহ রহিত করিতে হয়, না হয় পুরুষের বহুভার্য্যার বিধান করিতে হয়। বহুভার্য্যা যখন বাঞ্ছনীয় নহে, তখন অবশ্য বিধবা বিবাহই নিষিদ্ধ।

তাঁহাদের এই যুক্তি সমস্ত ভবিষ্য কালে সমর্থিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহা-দের যুক্তি বহুদর্শনের উপর স্থাপিত। বহুকাল মনুষ্য সমাজ দেখিয়া তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা পর-বর্ত্তী কালে কেন সমর্থিত হইবে না? তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা অধিক। এত অধিক, যে সমস্ত বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে গেলে, সমাজস্থ সমস্ত পুরুষের পরিণয় আবশ্যক। সমস্ত পুরুষের পরি-ণয় হইলেও অনেক স্ত্রীকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়, সেই অবিবাহিতার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য পুরুষের একাধিকবার বিবাহের নিয়োজন এবং চিররুগ্না, বা বিকলাঙ্গ কন্যার বিবাহ পরিত্যাগ করিতে

হয়। এরূপ না হইলে, ব্যাধিগ্রস্থ ও বিকলাঙ্গ ব্যতীত সমস্ত কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা মোক্ষ ধর্ম্মের জন্য যে রীতি অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সমাজনীতি ও লোক সংখ্যার অনুমান দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই মোক্ষ ধর্ম্মীয় বৈবাহিক রীতি চিরকাল সেই অনুমান দ্বারা সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। আর্য্যেরা সর্ব্ববিষয়ই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া গিয়াছেন। তা বলিয়া অসঙ্গত বিষয় ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয় নাই। হিন্দুসমাজ আজিও তাঁহাদের নৈতিক অনুমানের সঙ্গতি ও যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। সমাজ দেখিতেছে, যাহা ধর্ম্মানুমত, তাহা নীতি সঙ্গত। যে মুসলমান সমাজে বালিকা বিবাহ আছে, অথচ বিধবা বিবাহও বিদ্যমান সে সমাজে পুরুষকে এককালীন বহুভার্য্যা গ্রহণ করিতে হয়, তবে বিধবা বিবাহ চলে। হিন্দুসমাজ এক ভার্য্যা সত্ত্বে বহুভার্য্যা গ্রহণে পরাঙ্মুখ, কিন্তু ভার্য্যার অবর্ত্তমানে অথবা অপত্যার্থ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে, এজন্য সে সমাজে বিধবা বিবাহ ঘটিতে পারে না। বহুদর্শনে যাহা সিদ্ধ হইয়াছিল, বহু প্রমাণে তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

আমরা এবিষয় আরও বিশদ করিয়া দেখাইতেছি। মনুষ্য সমাজে যদি স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা অধিক হইত, তাহা হইলে কি ঘটিত? তাহা হইলে দেখা যাইত যে, যখন হিন্দুসমাজে সকল নারীর বিবাহ হইত তখন অনেক পুরুষের স্ত্রী জুটিত না! কিন্তু তাহা ত বাস্তবিক ঘটনা নহে। এ সমাজে সকল পুরুষের বিবাহ শাস্ত্রকারগণের সংকল্পিত এবং সেই সংকল্পনানুসারে বিহিত। শুদ্ধ বিহিত নহে, সংসারক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, সকল পুরুষের বিবাহ চিরকাল সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা অধিক নহে। যদি সমান হইত, তাহা হইলেও সকল নারীর বিবাহ সংঘটন হইত না, যেহেতু হিন্দুসমাজে পুরুষের একাধিকবার বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু যখন সে প্রথা সত্ত্বেও সকল বালিকার বিবাহ হইতেছে, তখন পুরুষের একাধিকবার বিবাহ জন্য অতিরিক্ত নারী সংখ্যা কোথা হইতে আসিবে? এই অতিরিক্ত নারী সংখ্যা আবহমানকাল বিদ্যমান আছে, কারণ আবহমানকালই হিন্দুসমাজে পুরুষের একাধিকবার বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। যখন পুরুষ সংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা ন্যূন নহে এবং সমানও নহে, তখন অবশ্য অধিক বলিতে হইবে।

হিন্দুসমাজের এক সামান্য অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা সপ্রমাণ হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ প্রথা বঙ্গদেশে বহুকাল চলিত ছিল এবং আজিও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কুলীনেরা বিশ ত্রিশটা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। এইরূপ করিতেন বলিয়া সমাজস্থ সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণের পুরুষ ও কন্যার বিবাহ হইত। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা সমধিক।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সমাজে যেরূপ, সকল নারীর বিবাহ বিহিত, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমে সকল পুরুষের বিবাহও বিহিত। কেবল দু চারিজন লোক নিতান্ত মোক্ষপথাবলম্বী হইলে চিরকুমার

থাকিয়া যাইতেন। শুদ্ধ সেই জন্য সনকাদির চিরকৌমার্য্য বিহিত। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিতে হইবে। পুরুষের চিরকৌমার্য্যবশতঃ উদ্বাহ সংস্কার না হইতে পারে, তা বলিয়া নারীগণের চিরকৌমার্য্য বিহিত হয় নাই, কারণ তাহারা মোক্ষপথাবলম্বিনী হইতে পারেন না। তাহাদের মোক্ষ পুরুষের সহায়তায়। গার্হস্থ্যধর্ম্মে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গার্হস্থ্যক্ষেত্রে যদি কোন পুরুষ বিবাহ না করেন তিনি শাস্ত্রসংকল্পিত পুরুষ নহেন। স্ত্রী পুরুষের একত্র সংযোগে শাস্ত্র সংকল্পিত পুরুষের সম্পূর্ণতা হয়। ধর্ম্মের জন্য সেরূপ সম্পূর্ণতার প্রয়োজন।

আর প্রমাণ, ইউরোপীয় সমাজ। সেখানে বালিকা বিবাহ নাই, পুরুষ বিবাহের তত আঁটাআঁঠি নাই, অথচ বিধবা বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে, সুতরাং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে সকল স্ত্রীর বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত, অথচ বালিকা বিবাহের শৈথিল্য যে সমাজে, সে সমাজে সকল কন্যার বিবাহ ঘটনা অসম্ভব। এইরূপ সমাজ ত প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সমাজের সমূহ অমঙ্গল নিবারণ জন্যই ত এক সময়ে বালিকা-বিবাহ বিধিবদ্ধ ও বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। আজিকার ইউরোপীয় সমাজ মন্বাদিপূর্ব্ব অসংস্কৃত আর্য্য সমাজের অমঙ্গলরাশির বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিতেছে। যাহা এক্ষণে ইউরোপীয় সমাজে ঘটিতেছে তাহা অবশ্য এককালে প্রাচীন আর্য্যসমাজে ঘটিয়াছিল। সমাজে অনেক স্ত্রীর আদৌ বিবাহ না হইলে সমাজের সুনীতি রহিত হওয়া কিরূপ সুকঠিন, তাহা আর্য্যগণ বিলক্ষণ প্রতীত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখনই বহুদর্শনে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে অনেক কন্যাকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়। এরূপ ঘটিবার কারণ, অবশ্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-সংখ্যার আধিক্য। লোক সংখ্যা দৈব নিয়ম, সুতরাং তাহা অলঙ্ঘনীয়। সমাজকে দৈব নিয়মের অনুগামী করিতে হইলে, যে ব্যবস্থা দ্বারা সামাজিক অমঙ্গল অনেকাংশে প্রশমিত হয় এমত সামাজিক ব্যবস্থাই প্রশস্ত। সেই সামাজিক ব্যবস্থাই বালিকা-বিবাহের বিধি এবং বিধবা-বিবাহের নিষেধ।

এখন কথা এই, বালিকা বিবাহ বিধিবদ্ধ করাতে কি সমগ্র স্ত্রীজাতির একেবারে স্বামী-বিহীনতা নিবারণ হইয়াছে? তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্ত্রীজাতির অনেক দুঃখ হ্রাস হইয়াছে। বৈধব্যবশতঃ অনেক কন্যাকে পতিহীনা হইয়া থাকিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত, আর ইউরোপীয় সমাজের অনূঢ়া এবং বিধবার সমষ্টিই বা কত? ইউরোপীয় সমাজে অনেক রমণীর একবারেই বিবাহ হয় না, হইবার যো নাই, এবং বৈধব্যবশতঃ বহু রমণীকে পতিহীন থাকিতে হয়। এই দ্বিবিধ কারণে ইউরোপীয় সমাজে পতিহীনার সংখ্যা হিন্দুসমাজের বিধবা সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। হিন্দুসমাজের বিধবাগণের মধ্যে অনেকেই সন্তানবতী। তন্মধ্যে বালবৈধব্য হেতু নিরপত্য বিধবার সংখ্যা ইউরোপীয় অবিবাহিতা নারীগণ অপেক্ষা অনেক অল্প।

যে সমাজে নির্দ্দিষ্টকালে প্রতি বালিকা কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, নহিলে পতিত হইতে হয়, সে সমাজে বিধবা বিবাহ হওয়া অসম্ভব। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়েব উদ্যোগ সফল হয় নাই। কুমারীকে ফেলিয়া বিধবায় রুচি হওয়া দুষ্কর। আর যখন সমাজস্থ সকলেই কুমারী-কন্যার বিবাহ জন্য ব্যতিব্যস্ত নহিলে জাতি যাইবে, তখন লোক কুমারীকে বিবাহ করিয়া অপরেব জাতি রক্ষা করিবে, না বিধবার বিবাহ কবিতে যাইবে? সকলেই কুমারীকে আদবেব সহিত গৃহে আনেন। কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য সকলেরই সমূহ চেষ্টা। পরব্যবহৃতা বিধবাকে বিবাহ করিতে অনেকেরই প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষতঃ যখন সে স্থলে অনূঢ়া কন্যা অনায়াস-লভ্যা।

চতুর্থতঃ বালিকা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজনও আছে। সমাজ মধ্যে সমস্ত কন্যার-বিবাহ আবশ্যক কেন? যখন স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষাপেক্ষা অধিক, তখন অতিরিক্ত স্ত্রীলোকের বিবাহ না হইলেও ত চলিতে পাবে? ইউরোপীয় সমাজে তাহা ত চলিতেছে? কিন্তু হিন্দুসমাজ-বাবস্থার একটী গূঢ় নীতি আছে। সমাজ মধ্যে স্ত্রীজাতিকে চির দিন পরাধীন থাকিতে হয়। পরাধীনার সহায় সম্পত্তির যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গলের কারণ। শৈশবে সকলেই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আশ্রিত। বিবাহ হইলে শ্বশুর কুলের অধীন হয়। পুরুষেরা স্বাধীন, এজন্য শ্বশুর কুলের বড় সম্বন্ধ রাখেন না; না রাখিলে ক্ষতিও নাই। কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্বশুর কুলই প্রধান অবলম্বন। এই অবলম্বন যত শীঘ্র ঘটে ততই স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গল। ইউরোপীয় সমাজে বহুসংখ্যক স্ত্রীর আদৌ বিবাহ না হওয়াতে তাহারা চিরকালই শ্বশুরকুলাশ্রয়বিহীনা হইয়া থাকেন। হিন্দুস্ত্রীজাতির সকলেরই বিবাহ হওয়াতে সেরূপ একেবাবে শ্বশুরকুলাশ্রয় বিহীনা হইতে হয় না। হিন্দুস্ত্রী বিধবা হইলেও তিন কুলেব মধ্যে এক কুলে দাঁড়াইতে পারেন। ইউরোপীয় সমাজেও তো স্ত্রীজাতির বিবাহ হয়, সেখানেও তো স্ত্রীজাতির শ্বশুর কুল ঘটে, কিন্তু সেখানে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে তাহাদের শ্বশুবকুলাবলম্বন তত প্রশস্ত হয় না। পতি নিজ সন্তান সন্ততিগণের জন্য যত ভাবেন, স্ত্রীব জন্য তত ভাবেন না। সাহেবরা নিজনিজ পুত্র কন্যা লইয়া ব্যস্ত; বিষয়, আশয় তাহাদিগেরই জন্য। স্ত্রী, সংসার মধ্যে যেন পর পর হইযা থাকেন। স্বামী জানেন, আমার অবর্ত্তমানে বিধবার অন্য একজন ভর্ত্তা জুটিবে, আমার সন্তান সন্ততিগণ আমার গৃহেই পড়িয়া থাকিবে। অতএব, সেই পুত্র কন্যাগণের ভরণ পোষণের উপায় করাই আবশ্যক। সেইরূপই ঘটিয়া উঠে। ইউরোপে বুড়ো বুড়ো আই বুড়ো মেয়েরা বাড়ী বসিয়া পিতৃ অন্নেই পালিতা হয়েন। তজ্জন্য সেখানে লোকের চিরদিনই কন্যা দায় থাকে, এমত কি কন্যা বিধবা হইলেও তাহাকে পিতৃকুলেই আসিয়াই দাঁড়াইতে হয়। হয় তো শ্বশুর কুলে তেমন উপায় নাই, স্বামী কোন উপায় করিয়া যান নাই। যে স্থলে পিতৃকুলের আশ্রয় না পায়, সে স্থলে বিধবাকে কাজে কাজেই পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে,

যে সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকে, সে সমাজে মাতৃকুল এবং প্রধানতঃ পিতৃকুলই রমণীজাতির অবলম্বনীয় হইয়া পড়ে। এইরূপ সমাজের সংস্কার-সাধন হইবার পর মনুপ্রবর্ত্তিত হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা নিয়োজিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাজ অপেক্ষা হিন্দু-সংসারে রমণীকুলের অবস্থা অনেক ভাল। হিন্দুমহিলার কি পিতৃকুল, কি মাতৃকুল উভয়ই সমান আদরের স্থান। মাতৃকুলে ও পিতৃকুলে বিবাহিতা কন্যা আদরের সামগ্রী। আদরের সামগ্রী কেন? যেহেতু তাঁহার গৃহ, তাঁহার বল, তাঁহার প্রধান দাঁড়াইবার স্থান শ্বশুরালয়। তিনি শ্বশুরকুলের গৃহিণী, আদরের বধূ, মানের মানিনী, দেবরের দায়াদ, শ্বাশুড়ীর কন্যাস্থানীয়া শ্বশুরের পুত্রতুল্য এবং সম্পত্তির স্বামিনী। এই আদরে, সম্মানে ও প্রভুত্বে হিন্দুরমণী বাল্যাবস্থা হইতে লালিত ও পালিত। কে বলে হিন্দু-রমণীর অবস্থা ইউরোপীয় রমণীর অবস্থা হইতে নিকৃষ্ট? যে বলে সে অন্ধ। যে শ্বশুরকুলে হিন্দুরমণীকে দাঁড়াইতে হইবে, সেই কুলের গৃহিণী করিবার জন্য বাল্যাবস্থা হইতে তাহাকে সেই কুলে আনা হয়। যেস্থলে তাহাকে চিরদিন থাকিতে হইবে, যেস্থলের তিনি স্বামিনী হইবেন, সেস্থলে অল্পবয়স হইতেই থাকা প্রশস্ত। অল্প বয়স হইতে না থাকিলে হিন্দুরমণী কি প্রকারে সর্ব্বরকমে শ্বশুরকুলে মিশিয়া যাইতে পারেন? অল্প বয়স হইতে যাহাতে তাহার স্নেহ মমতা সেই শ্বশুর-কুলে পড়ে, যাহাতে তাহার মন ভালরূপে বসে, সেই জন্যই তাহার বিবাহ অল্প বয়সেই নিয়োজিত হইয়াছে। আর বিবিরা যে পিতৃকুলে চিরদিন বিবি সাজিয়া থাকিবেন, সেই পিতৃকুলেই বাড়িতে থাকিবেন। তাহাদের স্নেহ মমতা সেই পিতৃকুলেই পড়ে। তাহারা দিনকয়েকের জন্য প্রবাসরূপ স্বামীগৃহে যান মাত্র। বিধবা হইলে আবার সেই বেলতলাতেই ফিরিয়া আসেন। হিন্দু বিধবা শ্বশুর-কুলের স্বামিনী, গৃহিনী, মানিনী, বধূ এবং দেবরের সহিত সমান স্বত্বাধি-কারিণী। তাহার ভাগ রাখিয়া তবে অন্য দায়াদের ভাগ। তিনি আবার স্ত্রীধনের অধিকারিণী ইউরোপে কি স্ত্রীধন আছে? তবে বল দেখি বিধবার ভাগ্য কোন দেশে ও কোন সমাজে ভাল? উত্তর অতি সহজ।

পঞ্চমতঃ। অল্পবয়সে হিন্দুরমণীর বিবাহ দিবার আবশ্যকতা কি, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হই-তেছে। কিন্তু বাল্যবিবাহের অন্য প্রয়োজনও আছে। আমরা একে একে তাহা বলিতেছি।

১। বাল্যাবস্থায় বিবাহ হওয়াতে হিন্দুরমণী অতি শৈশব হইতে শ্বশুরকুলের উপযোগিনী হইবার জন্য শিক্ষিতা হন। সে শিক্ষা পিতৃগৃহে অতি তরুণকাল হইতে আরব্ধ হয়। তদ্রূপ উপযোগিনী হইবার জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন সেই সমস্ত গুণে ভূষিতা করিবার নিমিত্ত তাহার শিক্ষা। সেই হেতু হিন্দুরমণীর ধৈর্য্য, সুশীলতা, মৃদুতা, লজ্জা, ভয়, সরলতা, বশ্যতা প্রভৃতি গুণ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। যাহারা অধিককাল, কি চির-কাল পিত্রালয়ে থাকেন, সে সকল রমণী কিছু অধিকতর স্বাধীন প্রকৃতি, নির্লজ্জ ও অবাধ্য হইয়া পড়ে। হিন্দুরমণী যে

সমস্ত গুণের আধার, ইউরোপীয় ললনায় সে সকল গুণ অত্যন্ত দুর্লভ।

২। বালিকা-বিবাহ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বৃদ্ধির কারণ। অতি তরুণকালে বালিকা-গণের সুকুমার হৃদয়ের প্রেমানুরাগ যেমন প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়, অমনি তাহারা পতিলাভ করে। তাহা-দের পূর্ব্বানুরাগ এজন্য যথাযোগ্য আধার পাইয়া ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। ভারতীয় হিন্দুসমাজে আমরা দাম্পত্য প্রণয়ের যত প্রগাঢ়তা দেখিতে পাই, অন্যত্র ততদূর দৃষ্ট হয় না। বালিকার পূর্ব্বানু-রাগ প্রগাঢ় হইয়া ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় পাতিব্রত্য ধর্ম্মে পরিণত হয়। বাল্যাবধি পুরুষ পত্নীর স্নেহ মমতায় জড়িত হইয়া পড়েন। বয়োধিকার বিবাহে এ সুবিধা ঘটিতে পারে না। এজন্য আমরা আর্য্য-সমাজে সতীত্ব ধর্ম্মের এত গৌরব দেখিতে পাই। আর্য্যসতী একদিন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অতি ধীরভাবে অম্লানবদনে সহমরণে পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন। এতদ-পেক্ষা পাতিব্রত্যের আর কি উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

ষষ্ঠতঃ। বালিকা-বিবাহ বশতঃ আর্য্যসমাজে ভ্রূণহত্যার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সমাজ হইতে পাপকে একেবারে তাড়ান অসম্ভব। পাপের স্রোত মন্দীভূত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। এসমাজে বালবিধবার সংখ্যা, ইউরোপীয় চিরকুমারীগণের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম, এজন্য ভ্রূণের সংখ্যাও কম। বিশেষতঃ আর্য্য সমাজে ব্রহ্মচর্য্য ও অবরোধ প্রথা, এবং বিধবা-গণের শ্বশুরকুলে অবস্থানবশতঃ পাপের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইউ-রোপীয় প্রধান প্রধান নগর (Foundling. Asylum) ভ্রূণাশ্রয় থাকাতে বরং পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরী ব্যতীত সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া যে কত ভ্রূণহত্যা ঘটে তাহা সংখ্যাতীত। তুলনা করিয়া দেখিলে হিন্দুসমাজে ভ্রূণের সংখ্যা ততো-ধিক ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যদি বল, অল্পসংখ্যক ভ্রূণও বিধবা-বিবাহ দিলে ত রহিত হইতে পারে? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, যে সমাজে প্রতি বালিকার বিবাহ দিতেই হইবে, নহিলে জাতপাত হয়, সে সমাজে বিধবা-বিবাহ চলিতে পারে না। তবে সামাজিক পাপ একেবারে নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। জন-সমাজে পুরুষ অপেক্ষা যখন স্ত্রীসংখ্যা অধিক, তখন বৈধব্য ঘটিত অল্পসংখ্যক ভ্রূণ ঘটিবেই ঘটিবে। যে সমাজে বালিকা বিবাহ নাই, অথচ বিধবা-বিবাহ আছে, সেরূপ সমাজের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আর্য্য সমাজের ব্যবস্থা যে অধিকতর সুনীতিসঙ্গত, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বিধবা-বিবাহ চালাইতে চাহ, বালিকা-বিবাহ শিথিল করিয়া বা উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে দাঁড়াইল কি?—সেই মন্বাদি পূর্ব্ব প্রাচীন ও বর্ব্বর আর্য্য সমাজ, যাহার সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। দাঁড়াইল, এক্ষণ-কার ইউরোপীয় সমাজ, যাহার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিয়া আবার কি পূর্ব্বতন বর্ব্বর সমাজে যাইতে চাহ? যদি না চাও তবে এক্ষণ-কার সমাজে সন্তুষ্ট থাক। তাহা মন্দের অনেক ভাল।



সপ্তমতঃ। সমাজের পাপ পরিমাণ হ্রস্ব, এবং পুণ্যের বৃদ্ধি করিবার জন্য হিন্দু বিধবাগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য নিয়োজিত হইয়াছে। আর্য্যনারীগণের শিক্ষাও এরূপ, যাহাতে তাঁহারা সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উপযোগিনী হইয়া আসেন। অধুনা ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে এই হিন্দু-নারীশিক্ষা ক্রমে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তদ্রূপ দূষিত শিক্ষা নিবারণ করা উচিত। প্রাচীন কালের নারী-শিক্ষা হিন্দুমহিলাগণকে সর্ব্বতোভাবে গৃহস্থোপযোগিনী করিয়া আনিত; ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিত; লজ্জাদি স্ত্রীসুলভ গুণের আস্পদ করিয়া আনিত; ধীরতা, পাতিব্রত্য, সহিষ্ণুতা, এবং স্ত্রীজনোচিত মাধুরী গুণে তাহাদিগকে ভূষিতা করিত। মহিলাগণ আশৈশব এই সমস্ত গুণের আধার হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিলক্ষণ সংযম করিতে পারিতেন। ব্রহ্মচর্য্যে যে সংযম, দেবভক্তি, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রতা আবশ্যক, আর্য্যনারীগণ অনায়াসে সেই সকল গুণে অলঙ্কৃতা হইতেন। তখনকার শিক্ষা প্রভাবে এসমস্ত গুণলাভ করা অনায়াস-সাধ্য ছিল। তাই ভারত চিরকাল রমণী-রত্নের লীলাভূমি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে একেবারে দুঃশীলা স্ত্রী ছিল না, আমরা এমত কথা বলিতে চাহি না। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, প্রাচীন কালের নারীশিক্ষা এরূপ ভাবে চালিত হইত, যদ্দ্বারা গ্রন্থাদি পাঠ না করিয়াও কেবল আচার গুণে আর্য্যরমণী-কুল ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিনী হইতেন। ব্রহ্মচর্য্যে যে সুখ, সে সুখ বুঝি আর কিছুতেই নাই। ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আনন্দ, ধর্ম্মের তেজ ও শান্তি মনুষ্যকে দেবোপম করে। সেই সুখে যাঁহারা

সুখিনী, তাঁহারা কি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ গ্রাহ্য করেন, না সে দিকে তাহাদিগের মন ধাবিত হয়? যে বিধবাগণ এই ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী, তাঁহারা দেবীরূপে প্রতীয়মানা হয়েন, পাপ তাঁহাদিগের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, তাঁহাদের ধর্ম্ম-তেজ ও পবিত্রতায় সকল পাপ ধ্বংস হইয়া যায়।

অষ্টমতঃ। যাহাদিগের পাশব ইন্দ্রিয়াসক্তি এত প্রবলা, যে তাহারা সমুদয় ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম, ধর্ম্মের পুণ্যপথ ও শিক্ষা এবং পারিবারিক ও সামাজিক শাসন অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইয়া পড়েন, তাহারা হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্র মতে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সেই দুই শ্রেণী নারদস্মৃতিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"পারপূর্ব্বা স্ত্রী সাত প্রকার, তাহার মধ্যে তিন প্রকার পুনর্ভূ, চারি প্রকার স্বৈরিণী। ৪৫।

"যে কন্যার পাণিগ্রহণ মাত্র হইয়াছে, পতিসংসর্গ হয় নাই, সে যদি পুনঃ সংস্কার দ্বারা পুরুষান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর পুনর্ভূ বলা যায়।" ৪৬।

"কৌমার পতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া যে স্ত্রী পতির নিকট আইসে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ।" ৪৭।

"দেবরের অভাবে যে স্ত্রী পতির সবর্ণ সপিণ্ডকে অর্পিত হয় সে তৃতীয় শ্রেণীর পুনর্ভূ।" ৪৮।

"যে স্ত্রী প্রসূতাই হউক আর অপ্রসূতাই হউক, অথবা পতি বর্ত্তমানেই হউক পুরুষান্তর গ্রহণ করে, সে প্রথম-শ্রেণীর স্বৈরিণী।" ৪৯।

"যে মৃত ভর্তৃকা স্ত্রী দেবরাদিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে আশ্রয় করে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী।" ৫০।

"যে স্ত্রী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্যের নিকট "আমি তোমার" বলিয়া উপগতা হয়, অথবা যে স্ত্রী কোন দেশ হইতে প্রাপ্ত অথবা ক্রীত হইয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তৃতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী।" ৫১।

"যে স্ত্রী ব্যভিচার দোষে দূষিতা হইয়াছে দেখিয়া তাহার গুরুজন কর্তৃক দেশ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অন্য পুরুষে প্রদত্তা হয় সে অন্ত্য স্বৈরিণী।' ৫২।

"পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীর বিধি বলা হইল। এই সকল স্ত্রী স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে পরপর ক্রমে উত্তমা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে অধমা।" ৫৩।—নারদ স্মৃতি। স্ত্রী পুং সংযোগ নামক দ্বাদশ ব্যবহার পদ।

ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাগণ উক্ত পুনর্ভূ এবং স্বৈরিণীকে সমাজ-বজ্জিত, পতিত ও অভোজ্যান্ন বলিয়াছেন। হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতি সর্ব্বকালেই পুরুষাধীন, গুরুজন, আত্মীয় স্বজন, এবং পুত্রাদির শাসনাধীন। তাহাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যও নিয়োজিত হইয়াছে। এ সমস্ত শাসন ও নিয়ম অতিক্রম করা স্ত্রীজাতির পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। যে গৃহে সেরূপ গর্হিত কার্য্য ঘটে, সে গৃহের ভদ্রস্থ নাই, তাহাতে ঘোর পাপ প্রবেশ করিয়া তাহার সমুদয় পারিবারিক পবিত্রতা বিনষ্ট করে। একজনের জন্য এরূপ পবিত্রতার বিনাশ সাধনাপেক্ষা তাহাকে পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূলাচরণ ব্যভিচার বলিয়া গণ্য। পুনর্ভূ-সংস্কার ও ব্যভিচার হিন্দু

সামাজিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি রক্ষার জন্য হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যভিচার পাতকের দণ্ড বিধান করিয়াছে। এই দণ্ড সমাজের স্বাস্থ্য সাধন করে, নহিলে ব্রহ্মচারিণীগণও কলুষিতা হইতে পারে এবং সমাজ ঘোর পাপস্রোতে প্লাবিত হইয়া পড়ে। এই অপবিত্রতা নিবারণ জন্য এবং ভ্রূণের সংখ্যা কমাইবার জন্য পুনর্ভূ ও স্বৈরিণীগণের সামাজিক দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়াছে। যদি পুনর্ভূগণ সমাজচ্যুত হয়, তাহা হইলে আর ভ্রূণহত্যার সম্ভাবনা নাই। কারণ সমাজের বাহিরে তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। ভদ্রকুলে ও ভদ্রসমাজে ব্যভিচারের দণ্ড ও শাসন প্রচলিত থাকাই সামাজিক মঙ্গলের কারণ। ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ ঘোর পাপে ও অন্যায়াচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এরূপ সামান্য প্রশ্রয়ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদনীয় নহে। সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতার প্রতি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পাছে উপেক্ষিত হয়, এজন্য হিন্দুসমাজের এত প্রবল শাসন। যে সামাজিক শাসন অতিক্রম করিতে সাহসী হয়, সে সমাজদ্রোহী। সমাজদ্রোহী অবশ্য দণ্ডার্হ। সমাজ শাসন গেলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। এজন্য হিন্দুসমাজে পতিতের দণ্ড বিধানিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ অতি পবিত্র বিষয়, সমাজ শাসন সেই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকে। সে শাসন অতিক্রম করিলে সমাজের অমঙ্গল ঘটে। সেই অমঙ্গল নিবারণার্থ হিন্দুজাতি শাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনি জাতিশাসনের ব্যাঘাত করিতে চান, যিনি জাতি না মানিতে চান, তিনি হিন্দুসমাজে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন।

যে স্থলে সমস্ত সমাজের মঙ্গলই লক্ষ্য, সে স্থলে এক ব্যক্তির ইষ্টের (যদি প্রথম শ্রেণীর পুনর্ভূকে ইষ্ট বল) জন্য যদি সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, এমত কার্য্য করা কখনই উচিত নহে। কারণ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য, দুচারি জনের স্বার্থ বিসর্জ্জন করাই সামাজিক নিয়ম। সর্ব্বসমাজ এই নিয়মাধীন। হিন্দুসমাজ কেন এ নিয়মের বশীভূত হইবে না। তোমরা বলিতে পার পতিসংসর্গবিহীনা বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহ দিতে হানি কি? হানি এই যে তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজস্থ বৈবাহিক রীতিকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই বৈবাহিক রীতির সমস্ত শাসন শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ আমূল আলোড়িত হয়। তাহা হইলে প্রতি হিন্দুকন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর; হিন্দু-বালিকা-বিবাহের সমস্ত প্রয়োজন সুসিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য। যে সমাজে সমস্ত বালিকা-কন্যার বিবাহ আবশ্যক, সে সমাজে কখন স্ত্রীগণের দ্বিতীয় বার উদ্বাহ-সংস্কার চলিতে পারে না। হিন্দুসমাজ যেরূপে গঠিত ও গ্রথিত বালিকা-বিবাহের শৈথিল্য করিয়া বিধবা বিবাহের প্রচলন করিলে তাহার সকল গ্রন্থী ও সমাজবন্ধনী শিথিল হইয়া পড়ে। যদি বল, বালিকা বিবাহ আছে বলিয়া পুরুষসংসর্গবিহীনা বিধবার সম্ভাবনা হইয়াছে, বালিকা-বিবাহ উঠিয়া গেলে সেরূপ সম্ভাবনা থাকে না। একথা সত্য বটে, কিন্তু বালিকা-বিবাহ উঠিয়া গেলে যে সমূহ অনিষ্ট, সেই সমূহ অনিষ্টের নিরসন হয় কই? বালিকা-বিবাহের

এক দোষ হইতে পারে যে, তাহাতে পুরুষ সংসর্গহীনা বিধবার সম্ভাবনা ঘটায়, কিন্তু সেই একদোষ পরিহার করিতে গেলে যে অপর অনেক দোষের পরিহার হয় না। এজন্য হিন্দুসমাজে বালিকা বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের হিন্দুঋষিগণের মস্তিষ্ক এত পরিষ্কার ছিল তাঁহাদের বুদ্ধি এত দূরদর্শিনী ছিল, যে তদ্দ্বারা তাঁহারা হিন্দুসমাজের একরূপ পরিপাটী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,যে সে ব্যবস্থার বিরোধে তোমার সমস্ত যত্ন শুদ্ধ তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়ম প্রভাবে বিফল হইয়া পড়িবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্ন এই জন্য বিফল হইয়াছে। হিন্দুসমাজে সকলেই বালিকা কন্যার বিবাহ দিতেই তৎপর, আবার বিধবা-বিবাহের জন্য কে ভাবিবে? বালিকা-বিবাহের ভাবনা কি যথেষ্ট নহে? বালিকা কন্যার বিবাহ ফেলিয়া কে অপরিশুদ্ধ, পরপূর্ব্বা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবে? হিন্দুসমাজ অপবিত্রতার লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। পরম রুচিবিশিষ্ট সংযত ও পরিশুদ্ধ আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহাদিগের সামাজিক ব্যবস্থায় কোনরূপ অপবিত্রতা প্রবেশলাভের পন্থা রাখেন নাই। আমরা কেন তাঁহাদের পবিত্র উদ্দেশ্য বিফল করিতে চেষ্টা করিব? তাহার ফলভাগী আমরাই ত। হিন্দুর সমাজ-গঠন বহু বহু সহস্র বৎসরের ফল। এত কালের ফলকে যিনি বিফল করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার অভিপ্রায় কখন সুসিদ্ধ হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। হিন্দুসমাজস্থ বালিকা-বিবাহের একরূপ অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে সেই নিয়মবলে তাঁহার কল্পনা-সৃষ্টি কোথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

বালিকা-বিবাহই হিন্দুসমাজের বল এবং বিধবা-বিবাহ নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা। বালিকা-বিবাহকে শিথিল করিয়া দাও, সমাজে যৌবন বিবাহ উপস্থিত হইবে। যুবতীরা, যত কাল ইচ্ছা অবিবাহিতা থাকিবে। অনেকে পিতৃগৃহের আদর, স্বাধীনতা ও প্রশ্রয় ছাড়াইয়া শ্বশুর কুলের শাসনাধীন হইতেই চাহিবে না, সুতরাং চিরদিন অবিবাহিতা থাকিবে। প্রথমে সংসর্গবিহীনা বিধবার বিবাহ দাও, ক্রমশঃ সর্ব্ববিধ বিধবার বিবাহ চলিত হইবে। তাহা হইলেই ইউরোপীয় অপবিত্র সমাজ উপস্থিত হইবে। সমাজের এইরূপ সমূহ অমঙ্গল নিবারণার্থ প্রাচীন কালে মন্বাদি ঋষিগণ হিন্দুসমাজের পবিশুদ্ধ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বালিকা-বিবাহের বিধি নানা বন্ধনে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই বিধির স্তম্ভোপরি সমগ্র হিন্দুসমাজ স্থাপিত। এ বিধি লঙ্ঘন করিলে সমস্ত হিন্দুসমাজ আলোড়িত হইবে। আর এই নিয়ম রক্ষা করিলে বিধবা-বিবাহ আপনা আপনি তিরোহিত হইবে। বালিকা-বিবাহ সত্তে কোনরূপ স্ত্রীর দ্বিতীয়বার উদ্বাহ-সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। তাই প্রথম-শ্রেণীর পুনর্ভূ স্বতঃই অপ্রচলিত হইয়াছে। কলিযুগে তাহা একেবারেই পরিত্যাজ্য। কারণ, কলিযুগে বালিকা-বিবাহ শিথিল করা কোন যুক্তিতে সুসিদ্ধ নহে। এ যুগে বালিকা বিবাহের নিয়ম শিথিল করিয়া যৌবন বিবাহ প্রচলিত করিলে সমাজে আর ব্যভিচারের ইয়ত্তা থাকিবে না। এজন্য

সুবিজ্ঞ রঘুনন্দন সর্ব্ববিধ পুনর্ভূ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বালিকা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন মনু এবং তৎপরবর্ত্তী সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পুনর্ভূ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা ইউরোপীয় সাম্যবাদ ধরিয়া বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রসন্ন বাবুর "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ" গ্রন্থের উপসংহার দেখিবেন।

সামাজিক ইষ্টই প্রতি জাতির প্রকৃত স্বার্থ। যেখানে তোমার নিজ স্বার্থ সামাজিক নিয়মের বিরোধী সেখানে সমাজ সে স্বার্থকে কখন প্রবল হইতে দিবে না। এজন্য ব্যবস্থাপকগণ সামাজিক দণ্ড বিধান করিয়া গিয়াছেন। রাজদণ্ড যতই কেন গুরুতর হউক না, তাহা সকলের নিকট সমান নহে। এজন্য হিন্দুসমাজে ত্রিবিধ শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা আছে। প্রথম রাজদণ্ড, দ্বিতীয় ধর্ম্মলঙ্ঘন জন্য পাতক এবং তৃতীয় জাতি শাসন। প্রথম দুই বিধ শাসন সর্ব্বসমাজে বর্ত্তমান। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রকর্ত্তাগণ দেখিয়াছিলেন সেই দুই বিধ শাসন যথেষ্ট নহে। রাজদণ্ড সত্ত্বেও সমাজে পাপনিবারণ হয় না। রাজদণ্ড সত্ত্বেও সমাজে চৌর্য্যবৃত্তি বিলক্ষণ প্রবল। ধর্ম্মশাসন আরও দুর্ব্বল। যাহাতে সমাজের সমস্ত শান্তি নির্ভর করিতেছে, সেই সামাজিক বৈবাহিক রীতির সংরক্ষণের জন্য অন্য এক প্রবলতর শাসনের একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রবলতর শাসন হিন্দু-সমাজের জাতিব্যবস্থা। এই জাতিব্যবস্থা হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্ব—তাহার দুর্গ, তাহার মহাস্ত্র, তাহার মহাশাসন। এ শাসন রহিত হইলে হিন্দুসমাজ আর হিন্দুসমাজ নহে। এই জাতি ব্যবস্থা হিন্দুসমাজের প্রাণ। হিন্দু বৈবাহিক ব্যবস্থাকে উক্ত ত্রিবিধ শাসনাধীন করিয়া হিন্দুব্যবস্থাপকগণ তাহা অলঙ্ঘ্য নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তুমি রাজদণ্ড সহিতে পার, ধর্ম্মহানি জনিত পাপ গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু জাতিচ্যুত হইতে পার না। অতি পাষণ্ড ও পামর না হইলে কেহ সমাজ বহিষ্কৃত হইতে পারে না। সমাজে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। সকলেই যাহাকে ঘৃণা করে সমাজে তাহার না থাকাই ভাল। জাতিচ্যুত হইলে এই-রূপ চণ্ডালত্ব ঘটে। এ শাসন বড়ই গুরুতর। এই ঘোর শাসনের উপর হিন্দুসমাজের বৈবাহিক ব্যবস্থা স্থাপিত। এ শাসন যিনি অতিক্রম করিতে পারেন তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়। তিনি সর্ব্বশাসনের বহির্ভূত। হিন্দুসমাজ তাহাকে চাহে না। হিন্দুসমাজের মঙ্গলার্থে তিনি পরিবর্জ্জনীয়। অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বসমাজে জাতি-শাসন আছে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের মত এমত পরিণত অবস্থায় জাতিশাসন-প্রণালী কোন সমাজে নাই। তাই হিন্দুসমাজের শাসন গৌরব এত অধিক। তাই এতদিন হিন্দু-সমাজের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, একবার তাহার পুনরালোচনা আবশ্যক। এক্ষণে বোধ হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে প্রাচীনকালে হিন্দুরা সমাজনীতি পর্য্যালোচনায় যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক সমাজনীতিরূপে শাস্ত্রে ব্যবস্থা করেন নাই। কারণ, সমাজনীতিরূপে রাখিলে তাহা নানা বিবাদ বিসম্বাদের

বিষয় হইতে পারে। যাহা বিবাদ বিসম্বাদের বিষয়ীভূত হয়, তাহার স্থিরতা থাকে না। কিন্তু মনুষ্যসমাজ এরূপ অস্থির ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। মনুষ্য সমাজে স্থির নিয়ম এবং নিয়োগের নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্য আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের স্থির সিদ্ধান্ত সমুদয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধানরূপে প্রাপ্ত হই। পাছে সেই সমস্ত নিয়োগের অলঙ্ঘ্যতা বিনষ্ট হয়, এজন্য তাহাদিগের বন্ধনী দেওয়া হইয়াছে।—

(১) ধর্ম্ম। সমস্ত সামাজিক বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। সেই সমস্ত বিধির সেবন এবং লঙ্ঘনে পাপ পুণ্য এবং পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গল। ধর্ম্মই পারত্রিক শাসন।

(২) জাতি-শাসন। জাতি-শাসন দ্বারা সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষিত।

(৩) রাজ-দণ্ড। জাতিচ্যুতি ও রাজ-দণ্ড এই দ্বিবিধ ঐহিক শাসন।

এই সমস্ত বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা সকল যুগযুগান্তর অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও জাতি শাসনের বন্ধনী শুদ্ধ হিন্দুসমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা হিন্দুসমাজের হিন্দুত্ব। মানবের নিজমোক্ষ, এবং মোক্ষের উপায় স্বরূপ তাহার পারিবারিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিয়ম সকলই সেই মোক্ষের অঙ্গীভূত; সুতরাং সকলই ধর্ম্মের অঙ্গ।

বিবাহ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়াতে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুশাস্ত্রে সকল পুরুষ এবং সকল নারীর বিবাহ ব্যবস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ নহিলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্ট হয় না।

এ নিয়মের নিপাতন স্বরূপ আমরা যেমন দেখিতে পাই, চিরব্যাধিগ্রস্থ বা বিকলাঙ্গ কন্যার পরিণয় না দিলে চলিতে পারে, তেমনি পুরুষের মধ্যেও যাহারা ক্লীব, বামন, জড়, জন্মান্ধ অথবা অন্যরূপে অক্ষম তাহারাও বিবাহ না করিলে চলিতে পারে। তবেই দাঁড়াইতেছে, স্ত্রীপুরুষ এই উভয় পক্ষ হইতেই বিকলাঙ্গ এবং চিরব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ বিবাহ সংস্কার হইতে বাদ যাইতেছে। সকলের বিবাহ করাই সাধারণ নিয়ম। এই সাধারণ নিয়মের উক্ত নিপাতন অবসম্ভাবী নহে। তাহা চলিতে পারে, নাও চলিতে পারে। কিন্তু এই নিপাতননিয়মও এক্ষণে চলে না। ক্রমে দেশাচার বশতঃ সকল পুরুষের ও সকল নারীরই বিবাহ নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্ম ও আচার মতে হিন্দুসাজে সংসার ক্ষেত্রে সকল স্ত্রী ও সকল পুরুষের বিবাহ আবশ্যক। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সমাজ-নীতি।

এই সমাজ-নীতি রক্ষা করিতে গেলে বিধবা-বিবাহ পরিহার্য্য হয়। পরিহার্য্য কেন হয় তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি।

বিধবা-বিবাহ যখন পরিহার্য্য, তখন স্ত্রীবিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা স্বতঃই উত্থাপিত হয়। নারীগণের কোন্ সময়ে বিবাহ হওয়া আবশ্যক? আর্য্যঋষিগণ স্থির করিয়াছিলেন যে সময়ে তাহাদের কন্যাবস্থা যৌবনের সীমায় না গিয়া পড়ে। এজন্য দ্বাদশবর্ষ মধ্যে বালিকা-বিবাহের নিয়োগ করিলেন। বালিকা-বিবাহ কি কি কারণে প্রয়োজনীয় তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কন্যার যৌবন-বিবাহ হিন্দুসমাজে চলে না।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দু-সমাজের বৈবাহিক ব্যবস্থা সমুদয় পরস্পর দৃঢ় গ্রন্থীতে গ্রথিত। তাহারা এক বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও জাতিশাসন তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। ধর্ম্ম সমুদয় সমাজকে রক্ষা করিতেছে, জাতিশাসন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছে এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া সমাজকেও রক্ষা করিতেছে। হিন্দুসমাজের গঠন এইরূপ। তাহার এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে সমুদয় সমাজ আলোড়িত হয়। অতএব বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিতে পারে না। তাহা চালাইতে গেলে হিন্দুসমাজের হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয়।

গোপাল নায়ক ও আমীরখস্রু।

১

সঙ্গীতে খুব ক্ষমতা না থাকিলে নায়ক উপাধি লাভ করা যায় না। নায়কের লক্ষণ কি? নায়কের লক্ষণ :—

"বিশেষজ্ঞস্তুর্য্য ত্রিতয়
নিপুণজ্ঞোঽভিনয়বিৎ
রসালঙ্কারজ্ঞঃ সকলগুণ
দোষৈকনিকষঃ
পরাভিপ্রায়জ্ঞো যশসি
বহুমানো ধৃতশুচিঃ
ক্ষমী দাতা বীরো জগতি
কথিতো নায়ক ইতি॥"

"ব্যাকরণাদিতে জ্ঞান থাকিবে মণ্ডিত
সঙ্গীত বিদ্যায় গণ্য পরম পণ্ডিত
জানিবেন অলঙ্কার পিঙ্গলাদি যত
গানে হইবেন যেন কিন্নরের মত
থাকিবে কবিতা শক্তি তাহে কবীশ্বর
বীণাদি তাবৎ যন্ত্রে হবেন তৎপর
মার্গদেশীদ্বয়ে বিজ্ঞ দেশী সৃষ্টিকারী
নৃত্য আদি নানা বিদ্যা নানা গুণধারী
অর্থাৎ সঙ্গীতের তাবৎ বিদ্যা জ্ঞাত
এই মত গায়ক নায়ক নামে খ্যাত॥"

পূর্ব্বকালে ভারতে অনেক নায়ক ছিলেন :—গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরা, আমীরখস্রু, লোহঙ্গ, ভুন্নু পাণ্ডবী, রাজ-মান, চরজু, ভগবান, ধুন্দি, দানো, বখস্থু, ধ্রুব, ছব, অনম ইত্যাদি। ইঁহারা সকলই সঙ্গীত রাজ্যে এক এক নেতা ছিলেন। ইঁহাদেরই নেতৃত্বে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতে একরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই প্রায় দিল্লীপতির সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে গোপাল নায়কের নাম এরূপ লোক প্রসিদ্ধ যে তাঁহাকে গোপাল নায়ক বা নায়ক গোপাল অর্থাৎ গোপাল কথাটীর সহিত নায়ক উপাধি যুক্ত করিয়া না বলিলে যেন চিনিবার উপায় নাই। বাস্তবিকই নায়কউপাধি তাঁহার গোপাল নামের সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই, গোপাল নায়ক নায়কত্বে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।

নায়ক গোপাল দাক্ষিণাত্যের লোক, জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার স্বভাবও ছিল। নানাস্থানে দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়াও তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ

হইযাছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। বাদসাহ বালবানের সময়—টোগলাক রাজত্বের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। সমস্ত ভারতে তাহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে গিয়া সঙ্গীত ওস্তাদদিগকে পরাজয় করেন। অনেক জয় লাভের পর তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল সঙ্গীত বিষয়ে ভারতের সপ্তখণ্ডের প্রভাব খর্ব্ব করিবেন, সঙ্গীতে সপ্তখণ্ড জয় করিবেন;—ছয়খণ্ড জয় হইয়াছে এখন রাজধানীটা জয় করিতে পারিলেই গোপাল নায়কের সর্ব্বতোভাবে জয়কার্য্য সমাধা হয় তাই দিল্লীতে আসিলেন।—অত্যন্ত প্রফুল্ল, মস্তকে তাঁহার ছয় তুম্বি * বাঁধা, বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে আসিয়া বাদসাহের সভায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহসহকারে ঘোষণা করিলেন "আমাকে কেহ জয় করিতে সমর্থ হইলে ছয়খণ্ড জয় কবিবার চিহ্নস্বরূপ এই ছয়টী তুম্বি খুলিয়া দিব নচেৎ আরেকটা তুম্বি আমাকে দিতে হইবে।" বাদসাহ ভারি বিড়ম্বনায় পড়িলেন, কি করিবেন, তাঁহার মনের ইচ্ছা নয় যে তাঁহার রাজধানী কোন বিষয়ে কাহারও নিকট পরাস্ত হয়, কিন্তু গোপাল নায়কের উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার মনে ঈষৎ শঙ্কা হইল, এমন গুণীকে কিরূপে পরাস্ত করাইবেন? তাহার সভায় কি এমন কেহ গুণী আছে যে নায়ক গোপালের সমকক্ষ হইতে পারে?—তাঁহার মনে বড় ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিয়া তেমন কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া গোপাল নায়ককে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতে বলিলেন। ইত্যবসরে বাদসাহ মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিয়াদিলেন। মন্ত্রীগণের মধ্যে একজন তাঁহাকে বলিল "আপনার আমীর খস্রুকে একবার ডাকিয়া পাঠান তিনি সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন"। বাদসাহ বলিলেন "তিনি কি সঙ্গীতেও সুনিপুণ? সঙ্গীতের বিষয়ে এপর্য্যন্ত তাঁহারত কোন কিছু শুনি নাই।" পরে সেই মন্ত্রী আমীর খস্রুর গুণের কথা আরও সবিশেষ বলিলে বাদসাহ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন—তাঁহার দিল্লীর সম্মান এতক্ষণে যেন নিরাপদ হইল। আমীর খস্রুকে তিনি গোপাল নায়কের পরাজয় সাধনের উপযুক্ত অস্ত্র মনে করিলেন।

আমীর খস্রু একজন পারস্য কবি ছিলেন। যখন জঙ্গীস খাঁ ও তাঁহার দলবল কর্ত্তৃক পারস্য, ইরাক, খোরাসান সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহ ভীষণরূপে আক্রান্ত হয় তখন সেই সেই দেশ হইতে যে সকল ধনী রাজপুত্র ও পণ্ডিত গুণীজনেরা পলাতক হইয়া ভারতে বালবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আমীর খস্রু তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজন। আমীর খস্রু অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন; অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, আয়ুঃশাস্ত্র, চক্ষুশাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ বিদ্যায় অধিকারী ছিলেন। তাঁহাকেই সম্রাট গোপালনায়ককে পরাজয় করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত। সম্রাট সভায় আসিয়াছেন। সভা জম্‌জমাট্। গোপাল

* পূর্ব্বে ভারতে সঙ্গীতের দ্বারা দিগ্বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তুম্বি (তাম্বুরার লাউ) ব্যবহৃত হইত।

নায়ক গান করিবেন, সভাস্থ জনেরা সকলেই আকুল হইয়া দিল্লীর জয় পরাজয় প্রতীক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্ব হইতেই বাদ্‌সাহের পরামর্শানুসারে তাঁহার সিংহাসনের তলে আমীর খস্রু নায়ক গোপালের গান শুনিবার জন্য গুপ্ত ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। গোপাল নায়ক গান আরম্ভ করিয়া দিলেন; একে একে গুপ্তভাবে সেই গান গুলি নিবিষ্ট মনে অভ্যাস করিয়া লইলেন। খস্রুর কি স্মৃতিশক্তি! শ্রুতিধরের ক্ষমতা তাঁহার রীতিমত ছিল। কিয়ৎকালের মধ্যে ঐরূপ গান শুনিয়া দ্রুত আয়ত্ত করিয়া লওয়া বড় সহজ কাজ নয়। আমীর খস্রু এইরূপে চকিতে গোপাল নায়কের গীত সমুদয়ের মূলাভাস আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে আরব ও পারস্যের বিদেশী রাগ অল্প বিস্তর মিশ্রিত করিয়া—নানা উপায়ে সত্বর বিচিত্র রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিলেন। সেই সকল রাগ রাগিণী পরে তিনি সভাব মধ্যে যাইয়া শুনাইলেন। শুনিয়া সমস্ত সভার লোক চমৎকৃত হইয়া গেল। এমন কি নায়ক গোপাল নিজেও আশ্চর্য্যান্বিত ও সঙ্গে সঙ্গে খুসিও হইলেন। তিনি তখন সরলভাবে ঈষৎ বিষণ্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন "উহাতো আমার ঘরের সামগ্রী, আমারই সামগ্রী লইয়া হইয়াছে।" গোপাল তখন যথার্থই খস্রুর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া সভার মধ্যে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক গোপাল নায়ক আমীর খস্রুর কৌশলে দিল্লীতে আসিয়া পরাজিত হইলেন, সমগ্র ভারতে সঙ্গীত বিষয়ে একাধিপত্য করিতে পারিলেন না। গোপাল নায়ক স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে দিল্লীতে তিনি এইরূপে পরাজিত হইবেন। তিনি যেরূপ গুণী ছিলেন, বাস্তবিকই তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে সমর্থ হইত না। তাঁহার সঙ্গীতে এতদূর ক্ষমতা ছিল যে তিনি যখন রাত্রিকালের রাগ 'কল্যাণ' প্রাতঃকালে বাদসাহের কাছে গাহিয়াছিলেন তখন তাহা শুনিয়া বাদসাহের দিনকে রাত্রি বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল!—বাদসাহ বলিলেন "কত রাত্রি হইয়াছে"? পারিষদেরা বলিল "আজ্ঞে এ রাত নয় এ দিন"। বাদসাহ রাগিয়া উঠিলেন। রাগিয়া নায়ক গোপালকে বলিলেন "এ বেয়াড়পি কাজ কেন করিলে"? তখন নায়ক ঈষৎ শ্লেষ সহকারে বলিলেন "আমার বেয়াড়পি কিছু হয় নাই, ইহা কল্যাণ, আপনার কল্যাণের জন্য গাহিয়াছি, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি"। বাদসাহ তাহাতে শান্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।—এরূপ শ্লেষোক্তি এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এরূপ ক্ষমতা নায়কেব উপযুক্ত বটে।—গোপাল নায়ক যথার্থই একজন অসাধারণ নায়ক ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ যশ কেবল আমীর খস্রুর কৌশলে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছিল। যাহা হউক তাহাতে এই একটী বিশেষ ফল ফলিয়াছিল যে গোপালের ব্রাহ্মণোচিত সারল্য সাধারণে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নায়ক গোপালের সহিত আমীর খস্রুর ব্যাপারে খস্রুর তীক্ষ্ণ, চাপাভাব এবং গোপাল নয়েকের সরল প্রাণখোলা মুক্তভাব, দুই নায়কের দুই চরিত্রগত বিশেষত্ব ও পার্থক্য জনসমক্ষে ধরা পড়ে—আমীর খস্রু গোপাল নায়ককে সঙ্গীতে কৌশলে পরাভূত করিয়া দিল্লীর প্রাধান্য

রক্ষা করিলেন। গোপাল নায়কের এরূপ পরাভব সম্ভবতঃ কখনই হইত না; যদি তিনি আমীর খস্রুর চাতুরীর—চতুরভাবের কণামাত্র পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিতেন। গোপাল অগ্র হইতে খস্রুর চতুরতার বিষয় কিছুমাত্র অবগত না হইয়া ভারি সফুর্ত্তির সহিত দিল্লী জয় করিতে ছুটিলেন। তিনি যখন চারিদিক সঙ্গীতে পরাস্ত করেন তখন সব ওস্তাদেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তিনি দিল্লীর কাছে পারিবেন না, সেখানে যাইয়া পরাভূত হইবেন। কিন্তু গোপাল কিছু বুঝিতে পারিলেন না যে কেন হারিবেন, বিশ্বাসও করিলেন না; তিনি বেশ জানিতেন যে দিল্লীতে তাঁহার মত সঙ্গীতে পারদর্শী কেহই নাই, তবে তাঁহাকে কিরূপে পরাস্ত করিবে? বাস্তবিক খস্রু তো তেমন সঙ্গীতবেত্তা ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতে তাঁহার বেশ বোধশক্তি ছিল। এবং বুদ্ধিবলে উপস্থিত বিপদের অনেকটা প্রতীকার করিতে সমর্থ হইতেন। গোপাল নায়কের ন্যায় তাঁহারও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণটী রীতিমত ছিল কিন্তু প্রভেদ এই যে, খস্রুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গোপালের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ কৌশলের দ্বারা পরিচালিত হইত। ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলেই নায়ক গোপাল পরাজিত হইলেন। খস্রু না থাকিলে গোপাল নায়ক ভারতবর্ষের সঙ্গীত রাজ্যে সম্রাট হইয়া পড়িতেন। খস্রু গোপালের সে শুভাদৃষ্টের প্রতিবন্ধক হইলেন। আমীর খস্রু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য দিল্লীশ্বরের একটী অমূল্য রত্ন ছিলেন। তিনি প্রখর বুদ্ধি বলে ভারতের সঙ্গীতে অনেকটা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কার্য্য করিতেন আপনার আনন্দে। ইহার জন্য তিনি রাজদরবারে বেতন লইতেন না।—আমীর খস্রুর হৃদয় আমীরের ন্যায়ই ছিল।—এই জন্য সঙ্গীতের ব্যবসায় করিতেন না বলিয়া তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে আতাইশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আতাই উপাধিধারী ছিলেন। তিনি আপন ইচ্ছাতে সঙ্গীত আলোচনা করিয়া সঙ্গীত রাজ্যে তেরেণাদিতে গাহিবার ধাঁচ প্রচলিত করিয়া যান। তিনিই প্রথমে এদেশে শ্রবণ সুখদায়ক রসনচৌকির সৃষ্টি করেন;—তাঁহার সহিত রাজ দরবারের গায়কদিগের তর্ক কোলাহলের দৌরাত্ম্যে কৌশল ক্রমে তাঁহা হইতে এদেশে রসনচৌকী বাজাইবার প্রথা জন্মলাভ করিল। আমীর খস্রুর সহিত সম্রাটের সভার গায়কগণের সহিত একবার এক বিতণ্ডা হয় সেই বিতণ্ডা হইতে দৈবক্রমে খস্রু কর্ত্তৃক রসনচৌকি বাদন প্রথা এদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। কিরূপে হয় তাহার সবিশেষ উপাখ্যানটী বলিঃ—একবার বাদ্‌সাহের সভায় খুব মজলিষ, সমঝদার সমূহে সভা ভরপুর, ওস্তাদেরা গাহিতেছেন। শুনিতে শুনিতে খস্রু বলিয়া উঠিলেন "একি? ভাল না"। তাহা শুনিয়া কাল্‌ওয়াতেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি গান জান? তাহার উত্তরে আমীর বলিলেন "গান জানি না বটে, বুঝি"। কালওয়াতেরা বলিলেন "তুমি গান জান না, তুমি আবার কথা কহিতে আস কেন?" খস্রু তাহাতে ধীরভাবে প্রত্যুত্তরে বলিলেন আচ্ছা ক্ষান্ত হও, আমি সাতদিনের মধ্যে শুনাইয়া দিব"। তিনি যাহা

বলিলেন কাজেও তাহা ঠিক দেখাইলেন। আমীর খস্রু বুদ্ধির প্রভাবে প্রায় সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন। তিনি গানে সেরূপ অভিজ্ঞ না হইলেও লোকের গান শুনিবামাত্র তাহা চট্ করিয়া ধরিতে পারিতেন, সত্বর ধরিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। সেই ক্ষমতার বলে তিনি কেমন মজা করিয়া বড় বড় ওস্তাদদিগকে হারাইতেন। কাল-ওয়াতেরা তাঁহাকে গানের অজ্ঞতা সম্বন্ধে কত কথা শুনাইলেন কিন্তু তিনি কিছু-অধীর না হইয়া ঐ যে ধীর স্পর্দ্ধিতভাবে বলিলেন "আচ্ছা তোমরা ক্ষান্ত হও, আমি সাতদিনের মধ্যে তোমাদিগকে গান শুনাইয়া দিব"—একেবারে সাত-দিনের মধ্যে রীতিমত প্রস্তুত হইয়া রাজ-সভায় সকলকে বাঁশী বাজাইয়া রাগ-রাগিণী সকল এমনি মধুর ভাবে শুনাই-লেন যে বাদ্সাহ সকল ওস্তাদদিগের অপেক্ষা তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, সভাশুদ্ধ মোহিত হইয়া গেল, কালওয়াত ওস্তাদেরা সব অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার পর হইতে দিল্লীতে, বাঁশীতে রাগরাগিণী আলাপ করিয়া শুনাইবার প্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে আমীর খস্রু হইতে রসনচৌকির উদ্ভব হইল; উদ্ভূত হইয়া এখনও পর্য্যন্ত ভারতে ব্যব-হার হইতেছে। আমীর খস্রু সঙ্গীতযন্ত্র সম্পর্কে আরও একটী বিশেষ কার্য্য করেন,—কচ্ছপী বীণার (লোকে কছুয়া সেতার বলিয়া প্রসিদ্ধ) সেতার নাম-করণ আমীর খস্রুই করিয়াছেন; ভারতে সেতার নাম দিয়া কচ্ছপীবীণার লোকে প্রচলন আমীর খস্রুর দ্বারাই হইয়াছে। সেতার নাম হওয়ার পর আর কেহ কচ্ছপীবীণা বলে না, সেতার বলিয়া আসিতেছে।

পারস্যকবি খস্রু ভারতের সঙ্গীত-রাজ্যে অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ পুরুষ ছিলেন। সাধ্য কি গোপাল নায়কের সরল প্রতিভা পারস্য কবির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির রহস্য ভেদ করিতে পারে? গোপাল নায়কের মন আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ও উন্মুক্ত কিন্তু আমার খস্রুর মন সূক্ষ্ম ও বহুদর্শী ছিল। সকল বিষয় ভেদ করিয়া দেখিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতার বলে খস্রুর নিকট গোপাল নায়ক পরাভূত হইলেন। যাহা হউক, কিন্তু এ জয় আমীর খস্রুর পক্ষে তেমন গৌরবজনক নয়। কারণ গোপালের যে সকল রাগরাগিণী ভাঙ্গিয়া খস্রু রাগ-রাগিণী তৈয়ারি করিলেন তাহারা কিঞ্চিৎ ভিন্ন ও শ্রুতিমধুর হইল বটে তথাপি তাহাতে গোপালের গীতের—রাগরাগি-ণীর প্রাধান্য রহিয়াছে। তাহার দুএকটী দৃষ্টান্ত দিতেছিঃ—গোপাল কল্যাণ গাহি-লেন, খস্রু কল্যাণ ভাঙ্গিয়া ইমন্কল্যাণ করিলেন। কিন্তু কল্যাণ ও ইমন কল্যাণ প্রায় একই জিনিষ। গোপাল খট্ গাহি-লেন, খস্রু খট্ ভাঙ্গিয়া জিলফ করিলেন। খট্ ও জিলফ অনেকটা একরূপ। গোপাল গৌড় সারঙ্গ গাহিলেন, খস্রু গৌড় সারঙ্গ ভাঙ্গিয়া সরফরদা করিলেন। যাঁহাদের রাগরাগিণীর বেশ বোধ আছে, তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিবেন যে সরফরদার মধ্যে গৌড় সারঙ্গের প্রাণ মন্দ বর্ত্তমান নয়।—সরফরদা যেন ঈষৎ কেন্দ্র ভ্রষ্ট গৌড় সারঙ্গ, ছায়ানটাদির সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত।

স্বর্গীয়

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। *

ভারতচন্দ্রের পর, সুরেন্দ্রনাথের পর বিহারীলাল বাঙ্গালার শেষকবি। বিহারীলালের কবিতা বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব ধন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালী কবির অপ্রতুল নাই কিন্তু বাঙ্গালার কবি বঙ্গদেশে বড়ই বিরল। মধুস্দন হইতে নগণ্য ক্ষুদ্র কবির লেখায় পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ কাব্যের ভাব প্রতিফলিত। যাহাতে জাতীয় জীবন জাতীয় ভাব প্রতিফলিত নাই তাহা জাতীয় কবিতা কি? কবিতার বলে এ সংসারে কয়জনে ফোটে? বিহারীলাল উকিল ছিলেন না, ব্যারিষ্টার ছিলেন না, ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না, জমিদার ছিলেন না—ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ! এমন প্রতিকূল অবস্থায় কয়জনে কবি হইতে পারে? ভেরী দুন্দুভির সহিত বিহারীলালের কবিতা পঠিত হয় না—কোমল বীণার মৃদুল ঝঙ্কারের সহিত বিহারীলালের কবিতাসঙ্গীত গীত হয়! বঙ্গকাননে এ কোকিলকূজন ভাল লাগে নাই, বাঙ্গালীর যুদ্ধ চাই প্রেম চাই অপঘাত চাই সংঘর্ষণ চাই বিহারীলালের এ সব ছিল না, ছিল শুধু—

প্রেমের সরসে চির বিকসিত নলিনী।

বিহারীলালের প্রেমসৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যের সৌভাগ্যসম্পদ। এমন অকপট প্রেম ইদানিং বাঙ্গালা ভাষায় আর দৃষ্ট হয় না। আজিকার দিনে মুক্তকণ্ঠে মুক্তপ্রাণে বিশ্বপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কোন্ কবি এমন প্রেম প্রচার করিতে পারিত? বিহারীলালের প্রেমের উদয় নারীপূজায়, পর্য্যবসন সারদা-সেবায়। কবি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সারদা পূজক ছিলেন তৎকৃত সারদা মঙ্গল এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ। যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সংসারে শত তাড়নায়ও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এসনা এ যোগীজনতপোবন স্থলে!

তিনি যদি মহৎ নন ত মহৎ কে?

১২৪২ বঙ্গাব্দে ৮ই জ্যৈষ্ঠ দীননাথ চক্রবর্ত্তীর ঔরষে কবি জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে কবি আপন বাল্যজীবন অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। কবির শিক্ষালাভ সংস্কৃত কলেজ হইতে হয়। সংস্কৃতে কবির বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বাল্মীকির রামায়ণ কবির প্রাণাধিক প্রিয় ছিল। কালিদাসের লেখা কবির বিশেষ

---

* মাসে মাসে আমাদিগকে এমন নূতন নূতন মৃত্যুসংবাদ দিতে হইতেছে কেন কে জানে! শোকসংবাদ সুখসংবাদ সমীরণ না বহন করিলে কে বহন করিবে? মালিনীর মালঞ্চের সমীরণ নদী সৈকতের বিকট শ্মশানে বয় না কি? যে 'সমীরণ' মৃত সুরেন্দ্রনাথকে অমর করিতে যত্নবান সেই 'সমীরণ' বিহারিলালের জীবনের যবনিকা পাতের সংবাদ ঘোষণা করিল, এ সুখ দুঃখ কালের অদৃষ্ট গহ্বরে প্রচ্ছন্ন ছিল, সময়ে প্রকাশমান হওয়ায় 'সমীরণে' ঘোষিত হইয়াছে, দোষ কাহারও নয় দুঃখ অনেকেরই বটে।

সম্পাদক।

ভাল লাগিত। ভবভূতি প্রভৃতি প্রায় অপরাপর সকল ভাল কবির গ্রন্থাদি কবি সমাদরে পাঠ করিতেন। সংস্কৃত কবিগণের প্রায় সকল উৎকৃষ্টাংশ কবির মুখাগ্রে ছিল। কবি, গৃহে আপনা আপনি ইংরাজী ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা করিতেন। এই চর্চ্চার ফলে সেক্সপীয়র মিন্টন শেলি বায়রণ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রায় সকল ভাল কবির গ্রন্থাদি কবি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। গত এক বৎসর কবি পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। পীড়া সেই বহুমূত্র রোগ! পাপ বহুমূত্র রোগে সবাই গেল! গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ৯ ঘটিকা ৪৫ মিনিটের সময় ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমে আত্মীয় পরিজনকে কাঁদাইয়া কবি মহাযাত্রা করিয়াছেন। কবির পঞ্চপুত্র বিদ্যমান। কবির মধ্যম ও তৃতীয় পুত্র হৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নবিশেষ। হৃষিকেশ এবার এম্ এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন আর শরৎচন্দ্র এবার বি, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। অন্তিমকালে বিহারীলাল এ আনন্দ অনুভব করিয়া মরণেও সুখী হইয়াছেন।

কলিকাতা নিমতলা ঘাটের শব সৎকার সম্বন্ধে কবি বরাবর বলিতেন—কলিকাতার দাহপ্রথা বড় জঘন্য, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র, ডোম সব জাতিরই এক শ্মশানে দাহ চলে, সাধু সচ্চরিত্র পুণ্যাত্মা মহাপাপীর সহিত এক শ্মশানে পুড়ে এ বড় কলঙ্কের কথা। কবির পবিত্র দেহ সৎকারার্থ যখন নিমতলা ঘাটে নীত হয় তখন এবং কবির দেহ দাহের শেষ পর্য্যন্ত অন্য কোন শব দাহ হয় নাই বা অন্য কোন শবদাহার্থ সে ক্ষেত্রে উপস্থিতও ছিল না। কবি, জীবনে বড় শূচী সচ্চরিত্র পবিত্র ছিলেন। পবিত্রতা জীবনে মরণে সমান পাঠক দেখিবেন। কবির পিতার সৎকার বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছিল। সে কথা বহু দিনের কথা, এত জনসংখ্যা তখন ছিল না এত ব্যাধির উপদ্রবও তখন ছিল না, তখনকার কথা আর আজিকার কথা এক কি?

জীবনী আদর্শ না হইলে জীবনীতে ফল নাই সুতরাং কবির বিস্তারিত জীবনী বিবৃত হইল না। কবির কাব্যজীবনের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে টুকু সম্বন্ধ আছে আমরা সেইটুকু লইয়া আলোচনা করিব। বিহারীলালের অধিকাংশ কবিতা বড় সরল, বালক বালিকার পর্য্যন্ত সহজ বোধগম্য। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' স্ত্রীপাঠ্য এবং বঙ্গমহিলার বিশেষ যত্নের সামগ্রী। বিহারী লাল আধুনিক বাঙ্গালার প্রবীন কবি। ৵ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের যে 'মহিলা' বঙ্গসাহিত্যে এখন আদর পাইতেছে সেই 'মহিলা' 'বঙ্গসুন্দরী' প্রচারিত হইবার পর রচিত হয়। ৵ ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎকালে এডুকেশন গেজেটে 'বঙ্গসুন্দরী'র সমালোচনা করেন। বঙ্গসুন্দরীর সমালোচনায় ভুদেব বাবু যে ইঙ্গিত করেন সেই ইঙ্গিতে সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা'র জন্ম। এ সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটে বঙ্গসুন্দরীর সমালোচনা দেখিলে চলিবে এখানে তাহার পুনরুল্লেখের বিশেষ আবশ্যক নাই। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' সরল স্ত্রীপাঠ্য বলিয়াছি কিন্তু বিহারিলালের 'সারদা-মঙ্গল' সরল

স্ত্রীপাঠ্য বলিতে পারি না। ‘সারদা-মঙ্গল’ বুঝিতে বিস্তৃত প্রাণ চাই। ‘সারদা-মঙ্গল’ কবি ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। এই জন্য বলিতে হয় বিহারীলাল কবির কবি। যিনি কবি হইবেন তিনি বিহারীলালকে বুঝিবেন। কবি না হইলে সারদা-মঙ্গলের কবির উন্মত্ততা যে সে বুঝিবে কেমন করিয়া? মহাপ্রাণতা কাব্যপ্রাণতা না থাকিলে যদি সারদা-মঙ্গল বুঝা যাইত যদি বাঙ্গালা পাঠক একবার পড়িয়া সারদা-মঙ্গলে কবির উন্মাদ প্রাণের উন্মাদ নৃত্য দেখিতে পাইত তাহা হইলে বিহারীলালকে কবির কবি বলিব কেন? মহাপ্রাণতার কার্য্য অনুভব করিতে মহাপ্রাণতা চাই। কবি সারদা প্রেমে-কতদূর বিভোর ছিলেন যদি জানিতে চাও তবে সারদা-মঙ্গল পাঠ কর।

বিহারীলাল কবি-জীবনে পরপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট আত্মপ্রসাদলাভ ঘটিয়াছিল। এই আপনার ভাবে আপনি ঢল ঢল, বাহ্য সুখ্যাতির অখ্যাতির আশা আশঙ্কা যিনি রাখিতেন না তিনি কতদূর আত্ম সমাহিত ছিলেন তাহা পাঠক বুঝিবেন। সাধারণ্যে কবিতাপ্রচারে তাঁহার বড় একটা লালসা ছিল না। অনেক অপ্রকাশিত কবিতা যদিচ কবির প্রকাশ করিবার ছিল তথাপি কবি প্রাণান্তে হ জ ব র ল করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতেন না। কবি স্পষ্ট বলিতেন—কবির কবিতার প্রাণ অনেক সময় থাকে না, সব সময় আসেও না সুতরাং যে প্রাণে লেখা হইয়াছে সেই প্রাণে আর একবার না দেখিয়া কিছু প্রচার করা কবির কর্ত্তব্য নয়। এক সময় কোন লেখক কোন বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার জন্য স্বর্গীয় কবির নিকট তাঁহার অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটিমাত্র কবিতা চাহিয়াছিল কিন্তু কবি তাহা প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য লেখককে কবি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বারংবার কবি এজন্য লেখক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শেষ স্পষ্ট বলেন—তুমি আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র বটে কিন্তু আমার কবিতা তোমার অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের, এমন অন্যায় অনুরোধ আমাকে আর করিও না। ইহাতে লেখক আপনাকে কিছুমাত্র অপমানিত বিবেচনা না করিয়া তাহার পুনঃপ্রার্থনা করিলে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমার ধনে আমার অধিকার নাই কি? লেখক তাহাতে উত্তর করিয়াছিল—আপনার ধনে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই কি? কবি বলিয়াছিলেন,—আমি বাঁচিয়া থাকিতে নহে আমার লোকান্তর প্রাপ্তিতে তুমি এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাহা করিবার করিও আমি দেখিতে আসিব না, আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে লইয়া টানা-ছেঁড়া করিও না। পাঠক দেখিবেন কবি আপনার কবিতার জন্য আপনাকে কতদূর দায়ী বিবেচনা করিতেন। অত বড় কবি না হইলে কি এত বড় অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন? আজি কালিকার কবিকে এ জাতীয় অনুরোধ উপেক্ষা করিতে হয় না, আপনার কৃতীত্বে তাঁহাদের এতদূর ধ্রুব বিশ্বাস যে অপ্রকাশিত কবিতা সাধারণ্যে না প্রচার করা আর পাঠকসাধারণকে বঞ্চনা করা একই কথা তাঁহারা বিবেচনা

করেন। এ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ছোট বড় অনেক কবি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক আবর্জ্জনা আনিয়া ফেলিয়াছেন। কত কালে যে এ আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবির কবিপদ ছাড়া সংসার-সম্ভ্রমের অন্য পদ ছিল না। এই পদ-সম্ভ্রমেই তিনি বাঙ্গালার বহুতর গণ্য মান্য লেখকের সম্মানিত বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণ-কমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন-চন্দ্র সেন সকলেরই নিকট প্রকৃত কবি বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল এবং আছে। বঙ্গের অনেক অস্তমান এবং উদীয়মান কবির তিনি প্রকৃত গুরু ছিলেন। বিহারীলালের লোকান্তরে বাঙ্গালা সাহিত্যের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা যে বিহারীলালকে না জানে সে কিছুই বুঝিবে না।

রাসমালা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজা ভূবর দেব।

বল্লভীপুর ম্লেচ্ছহস্তে পতিত হইল; হতভাগ্য শিলাদিত্যের সহিত তাঁহার রমণীয় রাজধানী ভগ্ন ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহার ধনরত্নাদি অর্থলোলুপ অসভ্য যবনগণ কর্তৃক অপহৃত হইল। তাঁহার আত্মীয় পরিজনগণ নরপিশাচ শত্রুকুলের কঠোর অত্যাচারে নিহত হইল; অনেকে সেই সর্ব্বসংহারী গ্রাস হইতে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করিল। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমল্লহরি কতিপয় পারিষদ সমভিব্যাহারে কচ্ছ উপসাগরের উপকূলস্থ পঞ্চাসর নামক নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বিবরণ অনুসরণ পূর্ব্বক সেই প্রদেশে উপস্থিত হইতে হইবে। এস্থলে কবিবর কৃষ্ণজি প্রণীত "রত্নমালা" * আমাদিগের প্রধান সহায়।

* কৃষ্ণজি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যে কোন্ সময়ে এবং কোন্ প্রদেশে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কোন বিবরণই কুত্রাপি পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, কৃষ্ণজি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১২২০—৫০ খৃঃ অব্দ) জীবিত ছিলেন। তিনি "রত্নমালা" ও "রত্নকোষ" নামে দুই খানি রাসা-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। রত্নমালার সূচনাতেই লিখিত আছে;—

"দধি মন্থন পূর্ব্বক নবনী সংগ্রহ করিয়া লোকে যেমন তক্র ত্যাগ করে;—

"ইক্ষুদণ্ড পেষণ পূর্ব্বক রসসংগ্রহ করিয়া লোকে যেমন অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করে;—

"ধূলি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া লোকে যেমন নূলা বর্জ্জন করে;—

সুপ্রসিদ্ধ কল্যাণ নগরে ভুবর নামে জনৈক নরপতি সম্বৎ ৭৫২ (খৃঃ ৬৯৬) অব্দে রাজত্ব করিতেন †। তিনি ভুবন-বিদিত শোলাঙ্কিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার অতুল প্রতাপ, অসীম ক্ষমতা, অনুপম গুণগ্রাম। তাঁহার অধীনে প্রতাপান্বিত ষোড়শ জন সর্দ্দার ছিল। তাহারা অনুদিন তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিত। তাহারা পরম বিশ্বস্ত এবং রাজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। নরপতির হিত-সাধনে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা মহা যোদ্ধা; যুদ্ধে কখন ভীত নহে এবং দশদিক্ পালের ন্যায় ঘোরতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহাদের নাম নিম্নলিখিত শ্লোকে গ্রথিত রহিয়াছেঃ—

"চন্দ দণ্ড, ভট্ট, বৈদ, বীর,
সিংহ, সিন্ধু, গিরি, ধীর,
সামৎ, ধীমত, ধন্বী, পত্নু,
ভীম, মহারথি, মির।"

ইঁহাদের মধ্যে মির প্রধান; রাজা তাহাকে কখনই কোন কার্য্যের নিমিত্ত দেশান্তরে প্রেরণ করেন না। যুদ্ধবিগ্র-হাদি উপস্থিত হইলেই অথবা দিগ্‌জয়ার্থে

'লোকে যেমন তুঁষ হইতে শস্য বাছিয়া লয়, সর্ষপ হইতে তৈল সংগ্রহ করে;—

"সেইরূপ প্রামাণিক ও সুললিত সকল গ্রন্থ পরিক্ষা করিয়া এই "রত্নমালা" সঙ্কলিত হইল।"

রত্নমালার গৌরব বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে কবি একস্থলে বলিয়াছেন :—

"যে ব্যক্তি সাগরে স্নান করে, তাহার যেমন সকল তীর্থে স্নান করা হয়, যে ব্যক্তি অমৃত পান করে, তাহার যেমন আর অপর খাদ্য আবশ্যক হয় না, যাহার নিকট স্পর্শমণি থাকে, সে যেমন সকল ধনের অধিকারী, সেইরূপ যে ব্যক্তি "রত্নমালা" পাঠ করিয়াছে, তাহার সকল গ্রন্থই পাঠ করা হইয়াছে। যাঁহার অসীম গবেষণা, তিনি যদি "রত্নমালা" পাঠ না করেন, তাহা হইলে তিনি বারিহীন মর্ম্মরকুণ্ডের অথবা চূড়াকলসহীন মন্দিরবৎ কোন কার্য্যেই আইসেন না।

† প্রসিদ্ধ কুমারপাল চরিতের একস্থলে লিখিত আছে, "কান্যকুব্জের অধীশ্বর রাজা ভুবরদেব চৌলুক্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় রাজপাট কল্যাণকটক হইতে আগমন পূর্ব্বক গুর্জ্জর জয় এবং তত্রত্য নৃপতিকে সংহার করিয়া তিনি নিজ সেনাবল তন্নগরে স্থাপন করেন এবং কল্যাণ নগরে প্রতিগত হয়েন।" কল্যাণ নগর মালবার উপকূলে আধুনিক বম্বের নিকটে অবস্থিত। তবে কি কনোজের শাসন পশ্চিম সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল? আবুলফজল ও মাসৌদী এই কূট সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়া কনোজের আধি-পত্য মালবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। রাজস্থান, ১ম খণ্ডে, প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শোলাঙ্কিকুলের আদিম বাসস্থান লোহকোট বা লাহোর। "সেই দূর পঞ্চনদ প্রদেশে চৌলুক্য-গণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরিশেষে গঙ্গাতীর উপনিবিষ্ট হয়েন এবং তথায় সুরু নামে একটী নগর স্থাপন করিয়া সমগ্র ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ রাজত্ব করিতে থাকেন।" তাহার পর বিক্রম সম্বতের সপ্তম শতাব্দিতে রাজা ও বিজা নামে দুইটী ভ্রাতা গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া গুর্জ্জরে আগমন করেন।" ভট্টগ্রন্থে এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; কিন্তু ঠিক কোন্ কারণ বশতঃ কি প্রকারে শোলাঙ্কিগণ কল্যাণ নগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার বিবরণ কোন রাসাগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ তাঁহারা বিক্রম সম্বতের সপ্তম শতাব্দিতেই কল্যাণ নগরে অধিষ্টিত হইয়াছিলেন।

অপর অপর সকলে দূর দুরান্তরে চারিদিকে গমন করিয়া থাকেন। দেশের প্রায় আর সমস্ত নরপতিই রাজা ভুবরের হস্তে পরাস্ত হইয়া পূজোপচার অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন; একমাত্র গুর্জ্জর রাজা জয়শেখর কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করেন নাই। মহারাজ জয়শেখর গর্ব্বোন্নত সৌরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি যেরূপ বীর ও গুণবান; ঈশ্বরানুগ্রহে সেইরূপ পরম গুণবতী ভার্য্যাও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বনিতার নাম রূপসুন্দরী। শ্রীমতী রূপসুন্দরী অনুপম রূপলাবণ্যবতী; তাঁহার গুণরাশির তুলনা নাই। ভগবানের প্রসাদে উপযুক্ত স্বামী লাভ করিয়া রূপসুন্দরী পরমসুখে পতিপদ সেবা করিয়া পরমানন্দে দিনযামিনী যাপন করিয়া থাকেন। পঞ্চাসর, মহারাজ জয়শেখরের রাজধানী। সৌররাজ যেরূপ পরম বিক্রান্ত, সেইরূপ শ্রীবান ও শাস্ত্রজ্ঞ। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ পারদশিতা। উপযুক্ত বিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার সহিত রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যকে উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কমলার প্রসাদে তাঁহার কোষাগার চিরকালই পরিপূর্ণ;—তাঁহার চতুরঙ্গিনী সেনা অগণনীয়। তিনি যে, রাজা ভুবরের হস্তে পরাজিত হয়েন নাই, শোলাঙ্কিরাজ তাহা অবগত নহেন। তাঁহার সর্দ্দারগণ জয়শেখরের প্রচণ্ড বীর্য্যবহ্নির সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া আপনাদের রাজার নিকট সেই সৌরবীরের কথা সতর্কভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের বৃথা তোষামোদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মনে করিয়াছেন, ভারতভূমে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই; তিনি অদ্বিতীয়,—অপ্রতিদ্বন্দ্বিক;—অনুপমেয়। এইরূপ বৃথা ধারণার বশীভূত হইয়া রাজা ভুবর মনে মনে কত কল্পনার লীলাতরঙ্গই গণনা করেন।

তাঁহার রাজধানী কল্যাণ পশ্চিম ভারতে অদ্বিতীয়। তাহা পরাজিত শত্রুকুলের লুণ্ঠিত ধনরাশিতে পরিপূরিত;—হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও রথাদিতে সুসজ্জিত। তাহা সৌন্দর্য্যের আধার;—কমলার বিলাসহাস্যে তাহার প্রতিগৃহ বিভাসিত। মণিকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণ তাহাতে বাস করিয়া নিজ নিজ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে। তথায় কি চিকিৎসা, কি ছন্দ, কি সঙ্গীত, কি তর্কণ, কি চিত্র—সকল শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। সকল প্রকার শিল্পশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট অধ্যাপনার নিমিত্ত তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপিত;—প্রত্যেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত অধ্যাপক প্রতিষ্ঠিত। বলিতে কি, তৎকালে কল্যাণের তুল্য সমৃদ্ধিশালী নগর ভারতভূমে আর দ্বিতীয় ছিল না। কনকময়ী লঙ্কানগরীর সহিত তুলনা করিবার জন্যই যেন ভগবান দিবাকর

উত্তরে ছয়মাস এবং দক্ষিণে ছয়মাস বিচরণ করিয়া থাকেন।

শোলাঙ্কিরাজ ভূবর সকল প্রকার মহোচ্চগুণে বিভূষিত। অপর অপর গুণগ্রামের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যই প্রধান। ছন্দ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। তিনি পণ্ডিতদিগকে এতদূর সমাদর করিতেন যে, তদানীন্তন ভারতের প্রায় সমস্ত বিদুষীগণই সময়ে সময়ে তাঁহার সভাস্থলে উপস্থিত হইতেন। সকলেই স্ব স্ব বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিয়া রাজসন্নিধানে বিপুল উৎসাহ লাভ পূর্ব্বক পরমানন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিতেন।

বাঙ্গালায় নাটক নভেল।

তোমাদের কার কি মত জানি না, আমি কিন্তু নাটক নভেল বড়ই ভালবাসি। দর্শন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব যে বুঝি না তাহা নহে। বলিতে কি, অনেক সময়ে আমি এতদুভয়কে একই চক্ষে দেখিয়া থাকি। তোমরা হাসিবে তাহা জানি, একদিন এজন্য আমার একটী বন্ধুর নিকট বিস্তর লাঞ্ছনাও সহিয়াছিলাম। একটী ছোটখাট আলমারিতে আমার কয়েকখানি বহি থাকে, আমার অপরাধ দর্শন পুস্তকগুলির সঙ্গে আমার বিশেষ প্রিয় কয়েকখানি নভেল মিশাইয়া রাখিয়াছিলাম—বন্ধু তাই দেখিয়া মিষ্ট ভৎর্সনার ছলে বেশ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। আমার তখন রাগ হইয়াছিল, কি উত্তর দিয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু স্মরণ আছে বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমার গৃহিণীকে এ আলমারি সাজাইতে বলিলে তিনি ইহা অপেক্ষা বেশ তোমার মনোমত করিয়া সাজাইতে পারিতেন, নাটক নভেল ভিন্ন বোধ হয় ইহাতে আর কিছুরই স্থান হইত না।' অবশ্য বন্ধুর সে কথা মত আমি কার্য্য করি নাই, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া আছি। নাটক নভেলকে আমি প্রাণের সামগ্রী বলিয়া জানি, সুতরাং তাহার নিন্দা শুনিতে আমি রাজি নহি। এ আমার দুর্ব্বলতা কি না তাহা আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বলিয়াছি দর্শন-বিজ্ঞানের মর্ম্ম যে একেবারে বুঝি না তাহা নহে, তবে মোটামুটি এই বুঝি যে, দর্শন-বিজ্ঞানের কার্য্য পরোক্ষভাবে, আর নাটক নভেলের কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে। দর্শন-বিজ্ঞান উপদেশ, নাটক নভেল উদাহরণ। দর্শন-বিজ্ঞান অশরীরী, নাটক নভেল শরীরবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম ও স্থূলে যে প্রভেদ, এতদুভয়ে আমি সেই প্রভেদ দেখিতে পাই। যাহাকে বুঝিতেছি, অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না তাহাই সূক্ষ্ম। আর যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি

নাড়িয়া চাড়িয়া অনুভব করিতে পারিতেছি, তাহাই স্থূল। নাটক নভেলকে আমি সেইরূপ স্থূল মনে করি। বস্তুতঃ স্থূল সূক্ষ্মের পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে পরমাণু অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির বিষয়ীভূত হইতে পারে না, তাহারই একত্র সমবায় ঘটিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। নাটক নভেল দর্শন-বিজ্ঞানের যেরূপ পরমাণুসমবায় বলিয়াই আমার ধারণা। আমার মোটা জ্ঞানে এই বুঝি যে, Philosophy শব্দের যদি abstract ও concrete বলিয়া দুইটা ভাগ করা যায়, তাহা হইলে নাটক নভেল সেই concrete Philosophy ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া। অল্লাধিক পরিমাণে এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে জগতের সকল বস্তুই সেই বৃত্তির উপর কার্য্য করিতেছে। ইহার মধ্যে, যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যত বেশি কার্য্য করে সেই তত তাহার বেশি আপনার বলিয়া বোধ হয়। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের এই জন্য এত আবশ্যকতা। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন অপেক্ষা মহাভারতের কাহিনী এই জন্য এত মর্ম্মস্পর্শী। সুখ কি দুঃখ কি, পাপ কি পুণ্য কি, জীবন কি জীবনের উদ্দেশ্য কি এ সব তত্ত্ব দর্শন যে ভাবে বুঝাইয়া দেয় তাহা বুদ্ধির অনমুমেয় না হইলেও বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় একটা কার্য্য করে না। নাটক নভেল সেই সব তত্ত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পায়, সুতরাং তাহা সহজে গিয়া বৃত্তির উপর ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত করে। এই সময়েই আমরা নাটক নভেলের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। নাটক নভেল বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এইরূপ কার্য্য করে বলিয়াই Reid, Abercrombie প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতে নাটক নভেল পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন, দরিদ্রের দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার মানুষের কর্ত্তব্য; কিন্তু নাটক নভেলে সেই এক কাহিনী নিরবচ্ছিন্ন পড়িয়া পড়িয়া আমাদের সহানুভূতি ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি গুলির উপর অবিরত ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও তাহার কোন অনুশীলন না হওয়ায় ক্রমে তাহারা নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহাঁরা এক একটী মহামনস্বী দার্শনিক সত্য; কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও শুনিয়াছি, এমনও ঘটনা নাকি অনেক ঘটিয়াছে যে নাটক নভেল পড়িয়া অনেক হতাশপ্রণয়ী আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই দুই মতের কোনটীরই উপর আমার ততটা আস্থা নাই। তবে এ দুটী মত পরস্পর বিরোধী হইলেও, ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নাটক নভেল মানুষের বৃত্তির উপর যেরূপ কার্য্য করে এমন আর কোন শাস্ত্রেরই দ্বারা সম্ভাবিত নহে। আমরা মানুষ, আমরা বৃত্তির দাস, সুতরাং নাটক নভেলকে নিতান্ত হেলাফেলার সামগ্রী ভাবা আমাদের অনুচিত।

তবে বলিতে পার, নাটক নভেল হইলেই কি হইল? তাই বলিয়া কি তার ইতরবিশেষ নাই? তা' কে বলিতেছে? ইতরবিশেষ আছে বই কি। গেটে শকুন্তলা পড়িয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এখন যে-সে নাটক পড়িয়া কি তাহাই বলিতে

হইবে? তবে ইহা স্বীকার্য্য যে সবাই কিছু কালিদাস বা সেক্ষপীর, গেটে বা হিউগো হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভবভূতি বা বাণভট্ট, লিটন বা ডিকেন্স, ডুমা বা গেবোরিও, স্কট বা ইলিয়টের আদর হইবে না এমন কিছু কথা নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সংমিশ্রণে যিনি পাঠকের মানসিক বৃত্তির উপর যতটা কার্য্য করাইতে পারিযাছেন তিনিই তত কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং সকলের নিকট আদর অভ্যর্থনার পাত্র হইতে পারিয়াছেন। এই জন্যই এই অধঃপতিত বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র আজ বিদেশীয়ের নিকটও সম্মাননার আস্পদ হইয়াছেন। এরূপ সম্মাননা ঐ সকল লেখকদিগের যথার্থপ্রাপ্য। ইহা না করায় প্রত্যবায় আছে। দুঃখের বিষয় অনেকে ইহা বুঝেন না, তাঁহারা নাটক নভেলের নাম শুনিলেই মুখ বাঁকাইয়া বসেন, তা যদি আবার বাঙ্গালা হইল তাহা হইলে আর তার দুর্গতির সীমা নাই। তাহা স্পর্শ করিতেও তাঁহারা ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু ভ্রমেও ভাবেন না যে তাঁহারা ইহাতে দেশের ও ভাষার কত অনিষ্ট করিতেছেন। প্রতিভার ক্ষুদ্র অঙ্কুরটী উদ্ভিন্ন হইতে না হইতে অনাদরের লোষ্ট্রাঘাতে দুদিনে শুকাইয়া মরিয়া যায়। শেষ হয় কি? কর্ষিত মৃত্তিকা কখনই পড়িয়া থাকে না, দেখিতে দেখিতে তাহা আগাছায় ভরিয়া যায়। আগাছার স্বভাব সে অল্পেই বাড়িয়া উঠে এবং কচিৎ কোন নিভৃত প্রান্তে বন্ধু বান্ধবের উৎসাহসলিল পাইয়া যদি কোন সুবৃক্ষের অঙ্কুর দেখা দেয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চারিদিক হইতে ছাইয়া ফেলিয়া মারিয়া ফেলে। একবার এই বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া দেখ, কথাটা কেবল কথার কথা কি না তাহা বুঝিতে পারিবে।

এখন যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখিতে পাই, দেশ আগাছায় পূর্ণ। রাধু মাধু সিধু সকলেই এখানে প্রসিদ্ধ নাটককার বা মহা মহা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। এই সব লোকগুলার বিজ্ঞাপনের জ্বালায় সংবাদপত্র পাঠ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদ পত্রগুলার দীর্ঘ দীর্ঘ বিজ্ঞাপনস্তম্ভগুলায় দেখিতে পাই, কেবল কেমিকেল সোনা, প্যাটেন্ট ঔষধ, আর এই সাহিত্যের আবর্জ্জনা। এ তিনটী সম্যক বিভিন্ন পদার্থ হইলেও আমি প্রকারে ইহাদিগকে একই বুঝি। এদেশের ইহার অপেক্ষা আর অধঃপতন কি হইবে? এখানে খাঁটীসোনা না লইয়া লইতে হইবে কি না গিল্টিকরা পিতল; ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থা না লইয়া খাইতে হইবে কি না হাতুড়ের হাত ধোয়া জল; আর সুলেখকদিগের সদ্গ্রন্থ সকল না পড়িয়া কিনিতে হইবে কি না হীরু গিরুর এওতা ছাই ভস্ম! হায়রে ব্যবসা, সংবাদ পত্রগুলা দেশের হিত সাধন করিতেছে ভাল! তাই ভাবি, যে দেশের নীতি—যেস্থানে আপনার প্রশংসা হইতেছে দেখিবে তদ্দণ্ডে তাহা পরিত্যাগ করিবে, সেই দেশের এতই অধঃপতন ঘটিয়াছে যে লোকগুলা অন্যে কে কি বলিবে তাহা না ভাবিয়াই খবরের কাগজে সচ্ছন্দে আপনাকে আপনি একজন মহারথী বলিয়া বিজ্ঞাপনের ঢাক বাজাইতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ

করে না। এখন যে-সে রকমে আপনাকে সলেজ্জ বলাইতে পারিলে আর সলাজ কথাটার কেহ বড় একটা ধার ধারিতে চাহেন না। কিন্তু ক্রেতারাও ধন্য, তাহারা একটীবারের জন্য ভাবে না যে সাহিত্যের বাজার সত্য সত্য মেছোহাটা নয়। অনেকে বংশীরবে হরিণের ন্যায় বিজ্ঞাপনের এই ঘটটঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বৎসরেকের মধ্যেই যে অপদার্থ পুস্তকেরও পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পক্ষান্তরে, যে লেখকের কিছুমাত্র আত্মাদর বোধ আছে, আত্ম প্রশংসায় একটুমাত্রও কুণ্ঠাজ্ঞান আছে, তিনি দুই বৎসরেও তাঁহার প্রথম পুস্তকখানির প্রেসের দেনা শোধ করিতে না পারায় হতাশচিত্তে দ্বিতীয় পুস্তকখানির কাপি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন। তাহা আর এ জন্মে সূর্য্যালোক দেখিল না। ইহা হইতেও দেশের আর অধঃপতন কাহাকে বল?

যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ইহাতে যে হঠাৎ আবার কোন ভাল পুস্তক পাঠ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে এমন আশা তো নাই। কিন্তু এ দোষ কার? লেখকের? সে বেচারার অপরাধ কি? সে উৎসাহ পায় না, পরিশ্রমের এক পাইও পুরস্কার পায় না—সে করিবে কি? তবে যাহার সচ্ছল অবস্থা সে না হয় সখের খাতিরে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা কয় জনের? যাহার পেটের খরচ কুলাইবার সঙ্গতি নাই, সে বহি ছাপাইবার খরচ যোগাইবে কি করিয়া? তবে দোষ কি পাঠকের? অবশ্য তাঁহারা যদি জানিয়া শুনিয়া মুড়ি মিছরির এক দর করেন, রূপা ফেলিয়া রাঙ্গের আদর করিতে যান তবে তাঁহাদের দোষ নয় তো কি বলিব? কিন্তু দর যাচাই করা যার তার পক্ষে সহজ নয়। এজন্য একদল ব্যাপারি আবশ্যক। তাঁহারা কষ্টিতে ফেলিয়া সহজেই রূপাকে রূপা ও রাঙ্গকে রাঙ্গ বলিয়া দিতে পারেন। সকল বাজারেই যখন এই অবস্থা তখন সাহিত্যের বাজারেও যে ইহা হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছু নাই। কাজেই পাঠকদিগকে আমি তত দোষ দিই না, যত দোষ দিই সমালোচকদিগকে। সমালোচকদিগের সংখ্যা আমাদিগের মধ্যে অতি সামান্য। যাঁহারা আছেন তাঁহারাও যে ঠিক নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করেন সে বিশ্বাস আমার নাই। তাঁহারা প্রথম দেখেন—কে লিখিল?—"অমুকাখ্য মিত্র মম"—অমনি প্রশংসার ভেরি বাজাইয়া দিলেন। ধন্য লেখনী, ধন্য প্রতিভা, ধন্য রচনাশক্তি! চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। পক্ষান্তরে যদি দেখিলেন, লেখক তাঁহার বা তাঁহার বন্ধুবর্গের অপরিচিত, অমনি সে পুস্তকের ভিতর না দেখিয়াই বাহির হইতেই তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ লইয়া সমালোচনা করিতে বসিলেন। বড় অনুগ্রহ হইল তো বলিলেন—লেখক অভ্যাস রাখিলে কালে লিখিতে শিখিলে শিখিতে পারেন। তবে যদি লেখক তোষামোদ বা সুপারিশ চালাইতে পারিল, তবে তাহার ভাগ্য কতক সুপ্রসন্ন হইল। গম্ভীর চালে সমালোচক মহাশয় তাহাকে আপনার শিষ্য করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

অনেক সময় ভাবি কেন এমন হয়? যাঁহাদিগের হস্তে তুলাদণ্ড দিয়া আমরা বিচারাসনে বসাইয়াছি তাঁহারা কেন এমন পক্ষপাতিতা করেন? যে সে লোকে সমালোচনা করিলে আমি এত হাবড়-হাটি বকিতাম না। সমালোচনা আজ কাল অনেকেই করিতেছেন, কিন্তু সে সব সমালোচনার কথা ধরি না। ধরিবার যোগ্যও বিবেচনা করি না। কিন্তু যাঁহারা প্রবীণ খ্যাতিবিশিষ্ট লব্ধনামা সুলেখক—যাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করি, যাঁহাদিগের কথা সকলের নিকট গ্রাহ্য ও মান্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারাও যে এই অসন্মার্গ অবলম্বন করেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপ আর কি আছে? তবে তাঁহাদের এরূপ করিবার একটা কারণ বুঝিতে পারি। তোমরা আমাকে গালি দিও না; আমার বোধ হয় তাহা—বিদ্বেষ। নবীন প্রবীণ লেখকদিগের মধ্যে আজ কাল দলাদলি আমাদের দেশে খুব চলিয়াছে। অবশ্য সকল প্রবীণ লেখক সম্বন্ধেই আমি একথা বলি না, কিন্তু এক শ্রেণীর প্রবীণ লেখকের দল আছেন তাঁহারা নবীন লেখকদিগের উপর বড়ই বিরক্ত। বুঝি তাঁহারা ভয় পান, জানি কি যদি কোন রকমে এই লেখকটা কালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্য তাঁহারা কাহাকেও মাথা তুলিতে দেখিলেই সমালোচনার ডাঙ্গশ লইয়া তাড়াইয়া আসেন। তাঁহারা জানেন, তাঁহারাই এ বাজারে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। যাহাকে বলিবেন, থাক—সে থাকিবে; যাহাকে বলিবেন যাও—সে যাইবে। একজন হয়ত পঞ্চাশ কড়ায় সাড়ে বার গণ্ডা বলিল, অমনি তাহাকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বনে পাঠাইলেন। আর একজন পঞ্চাশ কড়ায় পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া বলিল, মহা হৈ চৈ তুলিয়া তাহাকে রাজা করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাকেই কি ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহার বলে? তাঁহারা কি মনে করেন, তাঁহারা যতদিন আর বাঙ্গালা ভাষার পরমায়ুও ততদিন? তাঁহাদের অবর্ত্তমানে এ ভাষার সম্যক লোপ হইবে? এদিকে তো আবার দেখিতে পাই "সুকুমার সাহিত্য" "সুকুমার সাহিত্য" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের গলা ভাঙ্গিয়া যায়! এই কি সেই সাহিত্যের উন্নতি কামনা? ছি! ইহাতেও আর দলাদলি কেন?

আমাদের আর একটা দোষ, আমরা লেখকের বিচার প্রায় তাঁহার পদমর্য্যাদা দেখিয়াই করিয়া থাকি। তা কে জানে কাব্য ইতিহাস, আর কে জানে নাটক নভেল। অমুক এম এ বি এল, তা তিনি বাঙ্গালায় খুঁট আখুরেই হউন আর ণত্ব-ষত্ব-বোধহীনই হউন, আমরা অবশ্য আগে তাঁহার লেখার আদর করিব। আর এক ব্যক্তি তাহার টাইটেল নাই—উপাধি নাই—কিন্তু সে চিন্তাশীল, ভাষাজ্ঞান অতি সুন্দর—সেই একই বিষয় লিখিয়াছে কিন্তু ভাষা কত মনোহর, চিন্তা অত গভীর, আমরা হয়ত তাহার লেখা পাঠযোগ্যই মনে করিব না। তিনি মস্ত একজন নামজাদা উকীল, কবিতা লিখিয়াছেন তাঁহাকে আগে আসন দিতে হইবে, আর একজন Mute inglorious Milton, সে লিখিবার প্রয়াস করিয়াও চিরকাল Mute রহিয়া গেল। উনি বড়

মানুষের ছেলে বা রাজসরকারে উচ্চ-বেতনের কর্ম্ম করেন, নভেল লিখিয়াছেন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আর পতিত ঘোষ খাইতে পায় না, কিন্তু তাহার যেমন রচনা তেমনি ভাষা, তেমনি গল্পের জমাট—তা হইলে কি হয়, পতিত পতিতই রহিয়া গেল। সত্য ইহা সামান্য আক্ষেপের কথা নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশে তেমন প্রকাশকও নাই যে এই সব লেখক-দিগকে উৎসাহ দিয়া তাহাদিগের সেই ক্ষমতার বিকাশ করাইতে পারেন। যখন সবাই নামের চটকে ভুলে, তখন তিনি না ভুলিবেন কেন? ব্যবসা করা তাঁহার উদ্দেশ্য, কোথায় কোন্ লেখক একখানি ভাল বহি লিখিল আর তাহা কাটাইতে না পারিয়া মনের দুঃখে একেবারে নীরব হইয়া গেল তাহার জন্য তিনি কেন মাথা বকাইতে যাই-বেন? তিনি দেখেন বড় লোকের বহি বড় কাটে, কাজেই সেদিকে তাঁহার ঝোঁক। পাঁচজনের পরামর্শে ভগ্নচিত্তে কোন লেখক তাঁহার নিকট যদি যত্নের বহিগুলি বেচিতে গেল তিনি তাহার বেশভূষার অপারিপাট্য ও মালিন্য দেখিয়া অমনি মুখ বাঁকাইয়া বসিলেন। বড় অনুগ্রহ করিলেন তো দর দিলেন সিকি সিকি। গ্রন্থকার বড় কষ্টে চোখের জল চোখে মারিয়া ভাবিল, হকারকে বেচিলে যাহা হইত তাহার অপেক্ষা দুই চারি টাকা বেশি হয়—যথালাভ। অগত্যা সেই পুস্তকগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল আশা উত্তম চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া ভগ্নহৃদয়ে চলিয়া আসিল।

তা শুধু প্রকাশকের দোষ কেন দিই? যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের মাথা বলিয়া বড়াই করেন তাঁহারাও দেখিতে পাই ঐ নামের চটক লইয়া বিব্রত। আমাদের দেশের সম্পাদকদলও নামজাদা লোকের লেখা পাইলে তাহা আগে না ছাপাইয়া আর অপরের লেখা দেন না। একব্যক্তি হয়ত বিস্তর মেহন্নত করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাতে জানিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে, লেখাও অতি পরিপাটী, সম্পাদক মহাশয়, দেখিলেন সিবিলিয়ান, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এম এ বিএলের অনেক লেখা হাতে মজুদ আছে, তিনি সে প্রবন্ধ না পড়িয়াই টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। তবে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারিলেন না, কি জানি—তায় তাঁর বেশ জ্ঞান আছে, টানাটানির সময়ে সজিনা শাকেরও আদর করিতে হয়। এই সম্পাদকীয় ব্যাপারে আরও একটা বিষয় দেখিয়া আমরা বড় দুঃখেও না হাসিয়া থাকিতে পারি না। কাগজ খানি যেই বাহির হইল, অথবা বাহির হইবার পূর্ব্বেই, অমনি লেখকগণের এক প্রকাণ্ড তালিকা দেওয়া হইল। তাতে সেই থোড়বড়িখাড়া ও খাড়াবড়িথোড়—চিরপরিচিত বাল্যকালশ্রুত নামগুলি ভিন্ন আর অন্য নাম প্রায় দেখা যায় না। কেন? আর কি লেখক হইবে না? না, হইতে পারে না? তাহাই যদি মনে মনে স্থির ধারণা করিয়া থাক তবে ভাষার ও সাহিত্যের হইল কি? এই নখাগ্রগণ্য মুষ্টিমিত লেখক গুলির অভাবে কি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের অকালমৃত্যু ঘটিবে? সম্পাদকতা করিতে গিয়া যদি পূর্ব্ব

হইতেই এই স্থির করিয়া বসিয়া থাক, যদি নূতন লেখক বাছিয়া না লইতে পার—যদি নূতন লেখক তৈয়ার করিবার ক্ষমতা না থাকে—তবে তোমার এ বিড়ম্বনা কেন? সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই মাসিক পত্রিকাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। লেখকের বৃদ্ধি না হইলে সাহিত্যের বৃদ্ধি অসম্ভব। যদি কাগজ করিয়া তাহাই করিতে না পারিলে তাহা হইলে তোমার কাগজ থাকিল বা না থাকিল তাহাতে কি আসিল গেল? সম্পাদকের দল, এ ক্ষুদ্র লেখককে মার্জ্জনা করিবেন। একবার স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখিবেন, কথাটা ঠিক্ কি না।

আমি কি ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিলাম? বোধ হয় তাহাই। বোধ হয় বা তাহা না হইলেও হইতে পারে। আমার মূল প্রস্তাবের সহিত একথা গুলা নিতান্ত অসম্বদ্ধ নহে। সাধারণ রচনা সম্বন্ধে যখন বলিলাম তখন নাটক নভেল সম্বন্ধেও তাহা না খাটিবে কেন? লেখামাত্রেরই যখন এই অবস্থা তখন নাটক নভেলের যে দুর্দ্দশা হইবে তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতা নাই। নভেলের নাকি নামজাদা লেখক খুব কম, যে দুই একজন আছেন তাঁহাদের লেখা পাওয়াও নাকি সকলের পক্ষে অতি কঠিন, অথচ মাসিকে ধারাবাহিকরূপে একটী গল্প না দিলে পাঠকেরও মন ভুলে না, কাগজের ও পৃষ্ঠা পূরে না—কাজেই মাসিক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে নভেল বাহির হইতে দেখা যায়। কিন্তু নাটক আমাদের দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। এক সময়ে দেশময় এই নাটকের একটা বড়ই প্লাবন আসিয়াছিল। সেই প্লাবনের মুখে যাঁহারা বড়ই সন্তরণশীল তাঁহারাই টিকিয়া গিয়াছেন; আর বাকি সব কেহ ভাসিয়া গিয়াছে, কেহ জল গিলিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ বা ঢেউ লাগিয়া চরের উপর গিয়া কাদা মাখিয়া দাঁত সিটকাইয়া পড়িয়া আছে। যে দিন আসিয়াছিল তাহাতে কালে “ছারপোকা নাটক” বা “বলদ মহিমা নাটক” যে জন্মিত না সে বিশ্বাস আমার নাই। বর্ষার বন্যা চলিয়া গেলে যেমন আর তাহার বড় একটা চিহ্ন থাকে না, এখন আমাদেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। বলিয়াছি তো যাহা আছে তাহার অল্প সংখ্যক ছাড়া সমস্তই না থাকার মধ্যে। আর নাটক লিখিতে কাহাকেও যত্ন পাইতে দেখি না। লিখিতে যে কেহই পারেন না তাহা নহে। মনে করিলে অনেকে ভাল ভাল নাটক রচনা করিতে পারেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তিও নাই, সে উৎসাহও নাই। উৎসাহ হইবে কোথা হইতে? যত্ন করিয়া লিখিয়া যদি গ্রন্থের আদর না হইল তবে সে জন্য যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট, তাহা অনাদৃত গ্রন্থকার মাত্রেই অবগত আছেন। অথচ যে কোন রঙ্গালয়ে যাইলেই বুঝিতে পারা যায় ভাল নাটকের যে নিতান্তই অভাব হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই অভাব দূর হয়, আমার বোধ হয়, যদি রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ সাধারণকে উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁহারা যে আপনাদের মধ্যে একটা গণ্ডি কাটিয়া তাহার বাহিরে আর যাইবেন না এমনই সংকল্প করিয়াছেন ইহা বড়ই ভুল। ইহাতে দেশের ক্ষতি, ভাষার ক্ষতি, এবং তাঁহাদেরও যে নিজের ক্ষতিও

নাই তাহাও নহে। তাঁহাদের নিজের ক্ষতি এই জন্য বলি যে সং সাজাইয়া রং করিয়া, কি পরী নাচাইয়া, বা বড়জোর ভূত প্রেত দানা দৈত্য আনাইয়া নাচ গান ঠাসিয়া যোড়াতাড়া দিয়া এক হযবরল নাটক লিখিয়া লোকের মন কত দিন ভুলাইতে পারিবে? মাঝে মাঝে এক আধদিন তাহা ভাল লাগিলে লাগিতে পারে। কিন্তু রোজ রোজ তা বলিয়া অসহ্য। কিন্তু দর্শকের মনতো আকর্ষণ করিতে হইবে। এই জন্য অভিনয় যত হউক না হউক—আর নাটক ভাল না হইলে তাহার অভিনয় ভাল কিসে হইবে?—সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের আড়ম্বরের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাহাতে এত অধিক খরচ পড়ে যে একখানা বহি এক বৎসর ধরিয়া অভিনয় না করিয়া আর নূতন বহি আরম্ভ করিতে অনেকে পারেন না। থিয়েটারের দলের মধ্যে আজ কাল যে সব নাটক অভিনীত হয় তাহার অধিকাংশ এইরূপ—"নাটক, না মিষ্টি"। বস্তুতঃ তাহাদের নিজের সৌন্দর্য্য থাকিলে আর এত ঘসিয়া মাজিয়া রূপ বাড়াইবার দরকার হইত না। তবে তাই বলিয়া এমন কথা বলি না, যে থিয়েটারে নাটক আদৌ হয় না বা হয় নাই। বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, তরুবালা ও নরমেধযজ্ঞ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল ভাল নাটকের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু নিত্য যত রাশি রাশি পুস্তকের অভিনয় হইতেছে তাহার তুলনায় সে সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। অবশ্য এক ব্যক্তির সব নাটকগুলিই যে ভাল হইবে ইহা সম্ভবপর নয়, এমন আশা করাও অন্যায়। সে আশা আমরা করি না। নাটকের গুরু সেক্ষপীয়র—তাঁহারও Hamlet, Othelo, King Lear, Romeo Juliet পড়, আর Two Gentlemen of Verona পড়—কত তফাৎ। বাণীবরপুত্র স্বভাব কবি কালিদাসেরও শকুন্তলা এবং বিক্রমোর্ব্বশীতে কত প্রভেদ! যে ভবভূতি উত্তর চরিত লিখিয়া মহা যশস্বী হইলেন, তাঁহার প্রণীত মালতীমাধব কালপ্রিয়নাথের মন্দিরে যখন অভিনীত হইল লোকে দেখিয়া অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া উঠিল। সহস্র ক্ষমতাশালী হইলেও এক ব্যক্তির সব পুস্তকগুলি কখনই লোকের সমান সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগের ইহা মস্ত ভুল। ভুল নয়তো কি বলিব? তোমরা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছ তাহার অভাবে তোমাদের কি হইবে তাহা একবার না ভাব কেন? প্রত্যক্ষ তো দেখিতেছি, সেই চর্ব্বিতচর্ব্বণ ভিন্ন এখন অনেকেরই অন্য উপায় নাই। ব্যবসার হিসাবে ধরিলে তাহাতে কি লোকসান নাই? তবে এ গণ্ডি কেন? তোমরা মনে করিলে অনেক ভাল ভাল নাটককার তৈয়ার করিতে পার। একটা উপহার রজনী বা একটা নিরূপিত পুরস্কার ঘোষণ করিয়া দাও, দেখিবে কত লেখা আসিয়া জমিবে। তার মধ্যে ভাল মন্দ অবশ্য সবই থাকিবে—বাছিয়া তোমরা যেখানা ইচ্ছা মনোমত করিতে পার। তাহা হইলে লেখকগণ উৎসাহ পাইয়া ভাল ভাল নাটক প্রণয়ন করিতে যত্নশীল হইবেন। ইহাতে তোমাদিগকে আর অভিনেয় বিষয়ের জন্য ভাবিতে হইবে

না। অথচ দেশেরও একটা মহদুপকার সাধিত হইবে। ভাষার যে অঙ্গহানি হইতে বসিয়াছিল তাহা না হইয়া আবার তাহার পুষ্টি সাধন হইতে থাকিবে।

আর নভেল? সে বিষয় সাহিত্যের মহারথীগণ একটু বিশেষ মনোযোগী হইলে যথেষ্ট সুফল ফলিতে পারে। পাঠকগণকেও বলি তাঁহারা যেন অতটা পরের মুখে ঝাল না খাইয়া আপনারা ভাল মন্দ বিচার করিতে আরম্ভ করেন। তবে তাঁহারা বলিতে পারেন, সেরূপ পুস্তক বাহির হইল কি না তাহা জানিতে না পারিলে তাঁহারা কি করিবেন? কথাটা সঙ্গত বটে। সে জন্য প্রকাশকের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু সেরূপ প্রকাশক আমাদের দেশে আজও হয় নাই, কতদিনে হইবে তাহাও জানি না। আমাদের দেশের প্রকাশকগণ পুস্তক-বিক্রেতা। তাঁহারা ব্যবসা করেন, লাভ খোঁজেন। তবে পাঠকগণ যদি এমন ভরসা দেন যে ভাল পুস্তক হইলে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয় ব্যবসাদার প্রকাশক ব্যবসার খাতিরে সেরূপ বহি সকল কাটাইবার ভার ঘাড়ে লইলে লইতে পারেন। তার পর যখন তিনি বুঝিবেন অমুক লেখকের বহি বেশ কাটে, বেশি দিন তাহা লইয়া কষ্ট পাইতে হয় না, তখন তিনি কমিসনের কারবারে না গিয়া আপনা হইতে লেখকের সঙ্গে নগদ টাকায় অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইহাতে লাভ সকলেরই। প্রকাশক বিলক্ষণ ব্যাপার পাইবেন, লেখক পারিশ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে যশঃলাভ করিবেন। পাঠক ভাল ভাল উপন্যাস পড়িতে থাকিবেন, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আর আমি—ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র লেখক আমিও এক কোণে থাকিয়া মনে করিব এতদিনে সমীরণে আমার এই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার সার্থকতা হইল।

মোক্ষমূলার ও বাল-বিধবা।

মহামতি মোক্ষমূলার হিন্দু বাল-বিধবা সম্বন্ধে বিলাতি টাইম্‌স্ পত্রিকায় যে পত্র লেখেন বিগত ২৯শে মে তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যানে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ষ্টেটস্‌মান সম্পাদক কেবল উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপন মতও প্রকাশ করিয়াছেন। মহামতি মোক্ষমূলার ও ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের মতের উপর আমাদের কিছু বলিবার আছে।

মোক্ষমূলার সাহেবের মতে হিন্দু বাল-বিধবাগণ হিন্দু সমাজে অত্যন্ত নিগৃহীত হন। সেই নিগ্রহের প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, হিন্দুসমাজে কখন কখন দু একটী বিধবাকে আত্মহত্যা করিতেও শুনা যায। এরূপ একটী আত্মহত্যার দৃষ্টান্তও তিনি দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন এই নিগ্রহে পীড়িতা হইয়া অনেক বাল-বিধবা অসৎপথাবলম্বিনী হয়। সেই বাল-বিধবাগণের নিগ্রহ আইন ও দণ্ডবিধি দ্বারা নিবারণ করিতেই তিনি একান্ত অভিলাষী; কিন্তু যখন তাহা হইবার যো নাই, তখন সেই বাল-বিধবাগণের সামাজিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি সাধন হয়, যাহাতে তাহারা কোন ব্যবসা ও কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, এরূপ উপায় নিরূপণ করিতে হিন্দু-সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিগণকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই কথাগুলি ও অনুরোধ কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহার বিচার করা যাইতেছে।

আইন করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত, তাহার আবশ্যকতা আছে কি না? যদি নিগ্রহই না থাকে তবে আইন কি নিবারণ করিবে? আমরা একে একে দেখাইতেছি, হিন্দু বালবিধবার অবস্থা নিগ্রহের অবস্থা নহে। সুতরাং কোন দণ্ডবিধিরও প্রয়োজন নাই।

প্রথমতঃ। পুরাতন হিন্দুসমাজে হিন্দু-বাল-বিধবার আত্মহত্যার কথা তত শুনা যাইত না; কারণ হিন্দুর চক্ষে আত্মহত্যা মহাপাতক। তখনকার কালে হিন্দু রমণীগণের যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ছিল তাহাতে তাহারা এরূপ ঘৃণিত মহাপাতকে লিপ্ত হইতে যাইত না। আত্মহত্যার বিষম পরিণাম স্মরণ করিয়া তাহারা সে কার্য্য হইতে বিরত হইত। যে সমস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরমণীমণ্ডলীপরিবৃতা হইয়া তাহারা থাকিত, সেই ধর্ম্মনিরতা রমণীগণের ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার ভাব তাহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত। সে ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে অধর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া বড় সহজ নহে। অধর্ম্মাচরণ দূরে থাকুক অধর্ম্মের চি[ন্তা] পর্য্যন্তও তাহাদের মনে বড় আসিত ন[া]। পারিপার্শ্বিক ধর্ম্ম-কার্য্যানুকরণের ব[শ]বর্ত্তী হইয়া তাহারা ধর্ম্ম কার্য্যে নিযু[ক্ত] থাকিত। কাজেই পূর্ব্বকালে এখনকা[র] ন্যায় আত্মহত্যার কথা তত শোন[া] যাইত না। এখন যে সময়ে সময়ে দু একটী আত্মহত্যা ঘটে, তাহার কার[ণ] অনেকাংশে পূর্ব্বতন ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব[।] এক্ষণে আমাদের সমাজ ও গৃহমধ্যে অনেক ইংরাজী ভাব ও আচারে ব্যবহ[ারে]

প্রবেশ-লাভ করিয়াছে; তজ্জন্য পুরাতন ধর্ম্মশিক্ষা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজিভাবে মনুষ্যের স্বাধীন বৃত্তির স্ফুরণ হয়। সেই স্বাধীন-বৃত্তির স্ফূর্ত্তিতে ধর্ম্মতেজের হ্রস্বতা ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হ্রস্বতার সঙ্গে সঙ্গে নানা কুপ্রবৃত্তি আসিয়া স্থান লাভ করে এবং আপনাদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট করিয়া তোলে। ইংরাজী ভাব হিন্দুরমণী-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে থাকিতে ও স্বাধীন ভাবে জীবনোপায় উদ্ভাবন করিতে উত্তেজিত করে। যে স্থলে ইংরাজীভাবাপন্ন বিধবাগণ স্বাধীন ভাবে থাকিতে বা কার্য্য করিতে বাধা পায় বা সুবিধা বোধ না করে এবং আত্ম-হত্যা-পরিণামের ভীষণ চিত্র-কল্পনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারে, সেই স্থলেই প্রায় আত্মহত্যা করিয়া বসে। যে গৃহে ইংরাজী ভাবের প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে সেখানে বাল-বিধবার আত্ম-হত্যা ঘটিবার বড় সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুরমণী, আত্ম-হত্যা করা মহাপাতক কথা কখন মন হইতে অপসারিত করিতে পারে না। ধর্ম্মস্বভাবা রমণী পল্লী মধ্যে থাকিয়া হিন্দু বিধবাগণ রূপ শিক্ষা লাভ করে যে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে দ্বিরুক্তি করে না। ব্রহ্মচর্য্য-পালনে কঠোর যন্ত্রণাপূর্ণ নিয়ম-পালন বিবেচনা করে না। তাহারা বরং তাহাতে গৌরব মনে করে এবং এক স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে। যাঁহারা তাহাতে গৌরব না মনে করেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা সেই অভুক্ত-পূর্ব্ব আনন্দ হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদের ভালরূপ শিক্ষা হয় নাই; তাই তাঁহারা সে সুখের অধিকারিণী হইতে পারেন না। এ শিক্ষা গ্রন্থ পাঠে সঞ্জাত হয় না, এ আর একরূপ শিক্ষা। শত শত বৎসর ধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া যে ধর্ম্মপ্রাণ না হয়, এক বৎসর সাধু সঙ্গে বাস করিয়া তাহা লাভ করা যাইতে পারে। এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এবং হিন্দু বাল-বিধবার শিক্ষাও সেইরূপ শিক্ষা। এই শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দুরমণী ব্রহ্মচর্য্যে নিযুক্তা হন। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া আত্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে যে আমরা দু একটি আত্ম-হত্যার কথা কখন কখন শুনিতে পাই, তাহা অনেকাংশে এইরূপ দূষিত শিক্ষার ফল। আত্ম-হত্যা কি কেবল বাল-বিধবারা করে, সধবারা করে না? তাহা কি বিধবা না সধবার মধ্যে অধিক? সধবাদের আত্ম-হত্যা কিসের ফল? ইউরোপীয় সমাজে কি রমণী জাতির মধ্যে আত্ম-হত্যা ঘটে না? যদি ঘটে, তবে তাহা কিসের ফল? আপনার গায়ে হাত দিয়ে কথা কওয়াই উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। সমাজ নিগ্রহের দ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ মহাত্মা মোক্ষমূলার অনেক বিধবার অসৎবৃত্তির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপক্ষেও আমাদের বক্তব্য এই যে ভারতে ব্যভিচার দোষের কারণ কি কেবল বাল-বৈধব্য? আমাদের বিশ্বাস সকল দেশে যে যে কারণে রমণীগণ ব্যভিচারিণী হয় আমাদের দেশেও সেই সেই কারণে হয়। তিনি কি বলিতে চাহেন, সধবারা ব্যভিচারিণী হয় না?

ব্যভিচারিণী হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রধান কারণ আমাদের বোধ হয় দারিদ্র দুঃখ। সকল দেশেই দরিদ্রতা আছে এবং সকল দেশেই ব্যভিচার আছে। যেখানে দারিদ্র্যের প্রবলতা ও ইংরাজী ধরণ ধারণ, সেই খানেই ব্যাভিচারিণীর সংখ্যাও অধিক। ইউরোপেও যে কারণে ব্যভিচার ঘটে ভারতেও সেই কারণে ব্যভিচার ঘটে। বাল-বৈধব্যই যে ব্যভিচারের বিশেষ কারণ এমত প্রমাণিত হয় না। মনে করুন এসমাজে যদি বাল-বৈধব্য না থাকিত এবং ইউরোপীয় সমাজের মত যদি অধিক বয়সে যৌবন বিবাহ অথবা চির কৌমার্য্য প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি এখানকার ব্যভিচার-পরিমাণ কিছু কম হইত? আমরা বলি অধিক হইবারই সম্ভাবনা। হিন্দু আচার ব্যবহারে অভ্যস্তা, হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রণালীতে শিক্ষিতা এবং হিন্দুরমণী-মণ্ডলী-পরিবৃতা বাল-বিধবার ব্যভিচার প্রায় ঘটিতে পারে না। যে স্থলে ঘটে, সে স্থলে ঐ সকল কারণের অসদ্ভাব নিবন্ধনই ঘটে। যদি মোক্ষমুলার হিন্দু বাল-বিধবার দুঃখ মোচন জন্য তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে আমরাও দেখাইতাম যে, হিন্দু সমাজে সে উপায় অবলম্বিত হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিফল হইয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সেই জন্যই তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার উল্লিখিত পন্থা এই, যে যখন বিধবা হইয়া থাকিতেই হইবে, তখন সেই হিন্দু বাল-বিধবাগণ যাহাতে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে তাহাদিগের জন্য এরূপ কোন কার্য্য বা বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দেওয়া হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। ষ্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদকের কথার ভাবে প্রকাশ, যে বাল-বিধবাগণ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিলে তাহাদের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হইবে। আমরা বলি তাহাতে তাহার ঠিক বিপরীত ফল হইবে। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজী শিক্ষায় তাহারা বরং অধিকতর স্বাধীন-চেতা এবং হিন্দু-আচার ব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে। যদি হিন্দু বিধবাগণকে কোন গ্রন্থাদি পাঠে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় বলি[illegible] বোধ হয়, আমরা বলি সেরূপ গ্রন্থ হিন[illegible] ধর্ম্মীয় পুরাণাদি শাস্ত্র এবং সেরূপ শি[illegible] তাহারা অল্পাধিক পরিমাণে [illegible] প্রাপ্ত হয়। [illegible] পুরাণের দেবতুল্য চরিত্রাদি [illegible] বিশেষ শিক্ষোপযোগী। এই জন্যই ব্যাস সাধারণ আবাল বৃদ্ধ ব[illegible] পাঠার্থ পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়[illegible] সুতরাং হিন্দু সমাজেও গ্রন্থাদি [illegible] শিক্ষা লাভের উপকরণ বিলক্ষণ বি[illegible] আছে। সে শিক্ষার জন্য ইংরা[illegible] সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। হিন্দু বা[illegible] বিধবার ইংরাজী-শিক্ষা-প্রণালীর ব্য[illegible] করিলেই এবং তাহাদিগকে স্বাধী[illegible] পন্থায় নিয়োজিত করিলেই সমস্ত হি[illegible] সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। কার[illegible] হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতিই সমুদয় সংসারিক পারিবারিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা[illegible] শৃঙ্খলার মূল; তাহারা স্বাধীন-বৃত্ত[illegible] লেই সে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে। [illegible] হইলেই আর একটী ইংরাজী [illegible] গঠিত হইয়া উঠিবে। যে ইং[illegible]

সমাজের দূষিত চিত্র সকলের মনে বর্ত্তমান, সেই চিত্র তাহা হইলে অন্তরে বাহিরে—চতুর্দ্দিকে বিগুমান হইবে। ইংরাজী শিক্ষায় স্বাধীন-ভাব প্রণোদিত করিলে, ইংরাজী বিধবারা এবং ইংরাজী চিরকুমারীরা সমাজে যেরূপ স্বাধীন ভাবে থাকেন, আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত-হিন্দুমহিলাগণও সেই ভাবে থাকিবেন। যাঁহারা এখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহারাই একথার দৃষ্টান্ত স্থানীয়।

চতুর্থতঃ। আমাদের শাস্ত্রকারগণ হিন্দু বিধবা দিগের জন্য যে শিক্ষার ;বস্থা করিয়াছেন তাহা স্বাধান বৃত্তি সাম্যভাব-প্রণোদিত ইংরাজী শিক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচর্য্যই সেই । হিন্দু বিধবাগণকে যখন .বধব্য অবস্থায় কালাতিপাত বে, তখন তাহাদিগকে সেই রূপে পালন করিতে হইবে। ্য ব্রত—যে ব্রত মনঃস্থৈর্য্যের প্রধা-য়—যাহা শান্তি লাভের সাধনা— ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপক—সেই ব্রতই ‌ম্বন করিতে হইবে। হিন্দুললনার থন স্বামী জীবিত থাকেন তখন তিনিই 'হার একমাত্র দেবতা। এই দেব ৰ্ত্তি—এই স্বামী দেবতা—তাহার হৃদয়ে ঙ্কিত থাকে। এই মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি খিয়া হিন্দুললনা সংসারে সর্ব্ব কার্য্যে তী।• সেই দেবতার অন্তর্দ্ধানে তাহার হৃদয় শূন্য থাকিতে পারে না। হিন্দু-'লীমত শিক্ষার গুণে সে নিজেই দেবীর ধ্যান ধারণা করিতে যত্নবতী তাহার হৃদয় শূন্য রাখাও উচিত । শিক্ষা দিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যে করাই উচিত। ,হিন্দু সংসারে স্ত্রীজাতি পরাধীন। বিধবাগণ যাঁহাদের অধীন, তাঁহারা তাহাদিগকে সেই ব্রহ্মচর্য্যে নিয়োজিত করেন। এতদপেক্ষা কোন্ সমাজিক ব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে? বিধবাকে পারিবারিক ও ধর্ম্মীয় শাসনে রাখাই একান্ত আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষগণ অবশ্য ভাবিয়া দেখিবেন যে, যে বাল-বিধবার অন্তরে স্বামীদেবতার মূর্ত্তি দৃঢ় অঙ্কিত হয় নাই সে অন্তর অধিকার করিবে কে? সে অন্তরের অধিকারী কেবল দেবতা মাত্র। স্বাধীন হইবার, অথবা পৃথিবীর কলুষিত ব্যাপারে লিপ্ত হইবার মত শিক্ষা দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।' যত জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত করিবে তত জাগতিক ভাব সমূহ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট করিবার জন্য ভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক। স্বামীসেবাই ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সংসার ধর্ম্ম ত ফুবায নাই। সংসার ধর্ম্মে ও গৃহস্থাশ্রমে যে সমস্ত প্রবৃত্তি বলবতী হয় সে সকল প্রবৃত্তি তো সেইরূপ বলবতীই আছে। তাহাদের গতি রোধ করিতে হইবে। সেই মানসিক গতির রোধ করিতে হইলে বাল-বিধবাকে আর ঘোর প্রবৃত্তি পথে থাকিলে চলিবে না। তাহাকে অনেক প্রবৃত্তির গতি রুদ্ধ করণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট উপায় সংযম। মানসিক সংযম সাধন জন্য শারীরিক সংযমের প্রয়োজন; কারণ শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শারীরিক সংযম আরম্ভ না করিলে প্রবৃত্তির দুর্দ্দম্য প্রবলতা নিবারিত হইবে না। শারীরিক সংযম মানসিক সংযমের অনেক সহায়তা করে। সেই শারীরিক সংযম না করিলে স্ত্রীলোকের

পক্ষে মানসিক সংযম প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়ে। শারীরিক সংযমের প্রধান অভিপ্রায় শারীরিক রসের প্রশমতা-সাধন। সেই প্রশমতা সাধন করিতে হইলে তিথি অনুসারে আহারের নিয়ম পালন করিতে হইবে। শরীরের রসাধিক্য হইলেই মনশ্চাঞ্চল্যের আধিক্য উপস্থিত হয়। সেই আধিক্য বশতঃ মানসাবেগ জনিত পাপ-প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা নিবারণার্থই উপবাসাদির ব্যবস্থা। যৌবন কালে বাল-বিধবাগণের স্বভাবতঃই শারীরিক রসাধিক্যের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সংযম নিষ্ঠুরতা নহে কিন্তু তাহা আত্ম-শাসনের উপায়। কু কে শাসন করাই সংযমের উদ্দেশ্য। হিন্দুব চক্ষে এ· নিষ্ঠুরতা নহে। আত্ম-শাসন করিতে যে টুকু কঠোরতার প্রয়োজন সেই টুকু কঠোরতা। দুঃখ না করিলে সুখার্জ্জন কোথাও হয় না। অভ্যাসক্রমে সে কঠোরতা অনেক অপনীত হয়। যাহা পুণ্যার্থ আচরিত ও অনুষ্ঠিত, হিন্দুললনার কাছে তাহার কঠোরতা কোথায়? হিন্দুললনা অতি সহিষ্ণুতার সহিত সে আচরণ অভ্যাস করিতে শিখে। পুণ্যার্থ উপবাসের অভ্যাস করে। হিন্দুরমণী কি বৈধব্যে, কি সধবাবস্থায়, কি বাল্যে, কি যৌবনে, সকল সময়েই স্বেচ্ছায় একাদশী ব্যতীত আরও অনেক ব্রতনির্দ্দিষ্ট উপবাসাদি করিয়া থাকে। মোক্ষমূলার বোধ হয় উপবাসাদিকে এই ভাবে না দেখিয়া সমাজ-নিগ্রহ বলিয়াছেন। তিনি কি মনে করেন প্রাচীন হিন্দুঋষিদিগের নিষ্ঠুরতা বুঝিবার হৃদয় ছিল না, তাই তাঁহারা এই নিষ্ঠুরতা কোমল নারীদিগকে পালন করাইবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন? যত হৃদয়-কোমলতা কি আজ আমরা ইংরাজী-শিক্ষাপ্রভাবে লাভ করিতেছি? একাদশীর উপবাস যে সংযমীর পন্থা, এরূপ ভাবে যিনি না ধরেন, তিনি হিন্দুসমাজের নিয়মাদি কিছুই বুঝিতে পারেন না। এইরূপ উপবাসাদি দ্বারা শরীরের দূষিত রস প্রশমিত হইলে দেহ আরও স্ফূর্ত্তিলাভ করে এবং শরীরের কান্তি-বৃদ্ধি হয়। এজন্য ব্রহ্মচর্য্যের কান্তি আমরা সকল সন্ন্যাসীর গাত্রে উজ্জ্বলবর্ণে দেখিতে পাই। পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণের গাত্রে সেইরূপ জ্যোতিঃ বিনির্গত হইত। আজিও অল্পাধিক পরিমাণে এই ব্রহ্মচর্য্যের কান্তি, দেহের পরিপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের নিদর্শন আমরা ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণেব গাত্রে দেখিতে পাই। একাদশীব উপবাসাদি যদি বাস্তবিকই কষ্টকর ও শরীর-বিনাশোপযোগী হইত, তাহা হইলে এ সুফল ফলিত না। এই উপবাসাদির নিমিত্তই আমাদের বিধবাগণ অপেক্ষাকৃত অনেক নিরোগিণী। এই উপবাসাদির ব্যবস্থা বহুকালের পরীক্ষা এবং দশনের ফল। যাঁহারা কখন রোগ ভিন্ন উপবাস করেন না, তাঁহারা সংযম-নিয়মের উপকারিতা কি বুঝিতে পারিবেন? এই উপকারিতা আছে বলিয়া তাহা ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছে এব ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবার জন্য নিয়োজি হইয়াছে। বালবিধবাগণ হিন্দুসমাজে ক্রমে ক্রমে এই উপবাসাদির নিয়মে অভ্যস্ত হইয়া আসে। এদেশে শৈশব হইতেই রমণীকুল ব্রতাদি-নির্দ্দিষ্ট উপব করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং তাহ কষ্ট তাহাদের তত উপলব্ধি হয় না।

প্রাচীনকালের আর্য্যসমাজ সর্ব্বাবয়বী ও সম্পূর্ণ ছিল। মুনিঋষিগণ সে সমাজের কোন অঙ্গের অভাব রাখিয়া যান নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই, হিন্দু বিধবার জন্য পবিত্র ও শান্তিময় ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা নিয়োজিত হইয়াছে। তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সুখকর কার্য্য বা বৃত্তি আর কিছুই হইতে পারে না। এব্যবস্থা দ্বারা আমাদের সাংসারিক এবং গৃহস্থলীর শৃঙ্খলা আরও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। বিধবাগণ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সেই সংসারকে সুনিয়মিত করেন এবং নিজ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিবারমণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করেন। যে সংসারে একজনমাত্র বিধবা আছেন, সে সংসার ধর্ম্মকর্ম্মের লীলাভূমি হয়। পূজা, আহ্নিক, জপ, তপ, বার, ব্রত প্রভৃতি ভক্তিকার্য্যের ক্রিয়া কলাপ, উৎসব ও উৎসাহে সে সংসার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। দেবদেবীর পূজা এবং ভক্তিপথের অনুষ্ঠানাদি এই বিধবাগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বোধ হয়। এ সমস্ত কার্য্য কি বিধবার পক্ষে যথেষ্ট নহে? যে ইংরাজী সংসারে এই সমস্ত ভক্তির ক্রিয়া কলাপের অভাব আছে, সেখানে বিধবাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বৃত্তির আবশ্যকতা হইতে পারে। কিন্তু হিন্দু-সংসারে ও হিন্দুসমাজে বিধবার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। হিন্দু-বিধবাগণ নিজ নিজ কর্ত্তৃপক্ষের শাসনাধীন থাকিয়া এই ব্রহ্মচর্য্য চিরদিন অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। তাহাই তাঁহাদের জীবনকে শান্তি ও সুখময় করিয়া তুলিয়াছে। বাল-বিধবাগণ অতি তরুণকাল হইতে এই ব্রহ্মচর্য্যে নিয়োজিতা হয়েন। সেই কারণেই তাহারা আরও বিশেষরূপে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিনী হয়েন। কারণ, যে শিক্ষা অতি তরুণকাল হইতে আরব্ধ হয়, সে শিক্ষা অতি সহজ হইয়া আইসে এবং বিশেষ ফলপ্রদ হইবারই সম্ভাবনা। বাস্তবিক তাহাই ঘটে। তবে যদি কখনও কাহারও পদস্খলন হয়, তাহা সকল সুপথেই সম্ভব। যদি সেই শান্তিপথাবলম্বিনী হইয়া অন্ততঃ শতকরা ৯০ জন বিধবা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে পথকে অবশ্য সুপথ বলিতে হইবে। বাকী শতকরা ১০ জনের জন্য সে নিয়ম অতিক্রম করা কখনই বিহিত হইতে পারে না।

অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের বাল-বিধবার অবস্থা তত কষ্টকর নহে। আমাদের সমাজেও এমত নিয়মাদি এবং ব্যবস্থা আছে যাহাতে হিন্দু-বিধবা ইউরোপীয় বিধবা অপেক্ষা অনেকাংশে সুখিনী। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া যখন বিহিত নহে এবং অল্প বয়সে নারীগণের বিবাহ দেওয়া যখন কর্ত্তব্য, তখন বাল-বৈধব্য অনিবার্য্য। অনিবার্য্য বলিয়া বাল-বিধবাগণকে চিরসুখিনী করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের মুনিঋষিগণ অতি সুবিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ ব্যবস্থা সমুদয় বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলে কি দাঁড়াইবে? দাঁড়াইবে স্ত্রীজাতির বিধবা বিবাহ এবং তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বয়সাধিক্যে যৌবন বা প্রৌঢ় বিবাহ, অথবা একেবারে বিবাহ না হওয়া। তাহা হইলেই ইউরোপীয় সমাজ আসিয়া পড়িল। সে

সমাজে স্ত্রীজাতির অনেকেরই বিবাহ হয় না, অনেকে চিরকুমারী রহিয়াছেন। সে সমাজের এই চিরকুমারীগণ এবং বিবাহের পূর্ব্বে অন্য কুমারীগণ যেরূপ স্বামীবিহীনা, আমাদের বাল-বিধবাগণও তদ্রূপ কিন্তু ইউরোপীয় কুমারীগণের তুলনায় আমাদের বাল-বিধবাগণের অবস্থা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যিনি সে শ্রেষ্ঠতা দেখিতে না পান, দূষিত তাঁহার দৃষ্টি, কলুষিত তাঁহার বুদ্ধি এবং অপবিত্র তাঁহার হৃদয়। তিনি হিন্দু-সমাজ বুঝিতে নিতান্ত অসমর্থ।

দাদা মহাশয়ের স্বর্গলাভ।

জয় বাবুকে কলিকাতার সেকেণ্ড ক্লাশ Aristocratদের মধ্যে গণ্য করিলে ক্ষতি হয় না। সকলে কথাটা স্বীকার না করিলেও তাঁহার পক্ষের অনেকেই তাঁহাকে বনেদি বড়মানুষ বলিয়া বুঝিত ও বুঝাইবার চেষ্টা করিত। তাঁহার পিতামহ এ বনেদ আরম্ভ করেন মাত্র, পিতা উহা শেষ করেন, আর তিনি স্বয়ং উহা বজায় রাখিয়া উহার উপর ইমারত তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। জয় বাবুর মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে একবার খুব সমারোহ কাণ্ড হয়। অর্থও বিস্তর খরচ হয়। বড় উঠানের একদিকে সোনার ষোড়শ, যুপ কাষ্ঠে বাঁধা বৃষ, উঠানের চারিদিকে লোক থৈ থৈ করিতেছে। সকলের মুখে এক কথা, এরূপ দানসাগর কেহ কখন দেখে নাই। বেনারসী সাড়ী পরা, মাথায় সোনার ঝাপ্টা আঁটা ষোড়শী কীর্ত্তনওয়ালী, আকনুই সোণাঢাকা হাত দোলাইয়া কীর্ত্তন ধরিয়াছে "আমি সেই সাগরে হংসীছিলাম, কভু ডুবিতাম, কভু ভেসে যেতাম।" সুর বড় জমিয়া গিয়াছে—লোকের গোল অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে—দর্শকের ভিতর সকলেই কীর্ত্তনওয়ালীর তারিফ করিতেছেন—কিন্তু কেহ তাহার সাড়ীখানা; কেহ মাথার ঝাপ্টাখানা, আর অনেকেই তাহার চুড়ীপরা গোল হাতখানা, হাসি-হাসি গালে টোলখাওয়া মুখখানা তারি করিবার জন্য যে লোকের অভাব ছি সে কথা আমি বলিতেছি না—তবে সু শ্রোতা যে বড় অল্প ছিল সেটা f এদেশের দর্শকদের ঐটুকই বিশে বারইয়ারীতলা হইতে ফিরিয়া আ অনেকে এক সপ্তাহ ধরিয়া ঁ বড় রাক্ষসীর কথা কহিয়া লো বিরক্ত করিয়া তুলেন এবং কা তাহার চৌদ্দপুরুষ মায় কৃষ্ণনগর থানার সুখ্যাতি করিয়া মাথা ধ কিন্তু তিন দিন বারইয়ারিতলায় এবং সমস্ত দিন সেখানে কাটাইয়াও হয়ত অনেকের প্রতিমা দেখিবার অবসর হয় না। ঐ গুণ আছে বলিয়াই আমরা থিয়েটরে গিয়া "সীতার বনবাস" সরলার পর "বেল্লিকবাজারের" ই করি। যাহাহউক. যখন জয় উঠানে শ্রোতাদের এইরূপ অবস্থা সহসা এক জোড়া শাল জয় বাবুর

হইতে আসোরের মাঝখানে কীর্ত্তন-ওয়ালীর পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কীর্ত্তনওয়ালি হাসি হাসি মুখ খানা বাবুর দিকে ফিরাইল, কোমল করতলে একবার ললাট স্পর্শ করিল—তার পর ধীরে ধীরে, সেই সুকোমল, সুগঠন, বাহুলতা অবনত করিয়া যত্নে শাল ভূমি হইতে তুলিয়া লইল। একটা আছাড়ের বিনিময়ে, অতটা সৌভাগ্য লাভকরা যায় দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে কাহারও তুর্লভ মানবজন্ম ছাড়িয়া শাল-জন্ম লাভ করিবার বাসনা জন্মিয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু, আমি জানি ঐ জাতীয় সৌভাগ্য মরীচিকার পাছু ছুটিতে গিয়া অনেক মানবমৃগ সাংঘাতিক াছাড় খাইয়াছেন, অস্থি চূর্ণ হইয়া য়াছে এবং অবশেষে শালের জনয়িতা মেষত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে াবনের-কটাদিন কাটাইয়া পর জন্মে .লাক প্রাপ্ত হইযাছেন।

গৃহিতার মনে যাহাই হউক, দাতার সিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বর আমরা রাখি। শুধু একটা মিষ্ট হাসি আর একটা সেলাম কি জাড়া শালের দাম হইতে পারে? া জানি, তখন জয়বাবু সেই শাল-র ভিতর অনেকখানি কল্পনাবাষ্প পুরিয়া, সেটাকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া উহাতে একটা বড় বেলুন তৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং কঠিন বন্ধুর ভূমির র দিয়া পথ হাঁটিয়া শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, সুদূর, সুদুর্গম রাজ্যে পৌঁছিবার সমস্ত যত্ন ও কে এক মুহূর্ত্তে ফাঁকি দিবার ইচ্ছায় াপূর্ণ স্ফীত গোলোকটার সাহায্যে শূন্যপথে ঐ দেশে যাইবার বাসনা করিতেছিলেন।

যাঁহারা জয়বাবুর পিছনের ও পার্শ্বের তাকিয়ার কাছে বা অনতিদূরে অন্ততঃ তাঁহার আলবোলার নলের দৈর্ঘ্যপরিমিত স্থানের ভিতর ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে লাগিলেন "এরূপ মুক্ত হস্ততা তাহারা কখন দেখে নাই। সহরের প্রসিদ্ধনামা নিত্যানন্দ মিত্র পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে শাল গায়িকাকে দান করিয়াছিলেন তাহা এ শাল অপেক্ষা অনেক নিরেশ—তবে আশ্চর্য্য কিছুই নহে—জয়বাবু বনেদি ঘরের ছেলে, এ দান তাঁহারই যোগ্য" ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলা দেখিতে দেখিতে অনেক দূর ছড়াইয়া পড়িল এবং অনেক উর্ব্বর জিহ্বার উপর পতিত হওয়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যে উহাদের অসম্ভব বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন জয় বাবুর বেলুনটার ভিতর বাষ্প বড় জোর করিতেছিল আর সেটা অধীর হইয়া তুলিতেছিল।

পাড়ার হরিহর বন্দো, তাকিয়া ও আলবোলা হইতে অনেক দূরে বসিয়া একমনে কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে ডাবা হুঁকার দুঃখহারিণী শক্তির পরিচয় লইতে ছিলেন। কাণের আশে পাশে সেই সদ্যোজাত মুহূর্ত্তজীবী কথা শিশু দিগের কিচি কিচি শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি হুঁকা রাখিয়া এক বার জয় বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর পার্শ্বের ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া অল্প হাসিমুখে বলিলেন—ব্রজ বাবু আমাদের জয় বাবুর বনেদি ঘর বটে, তবে বেশী বর্ষার জল এখনও খায় নাই বলিয়া

বনেদ কত শক্ত ঠিক বুঝা যায় না—কিন্তু বনেদের উপর উনি যে অশথ চারার প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছেন তার শিকড়ে বনেদ খুব জমাট হইবে, ভিটায় অনেক গুলি পশু পক্ষী আশ্রয় পাইবে; সেটা কম সৌভাগ্য নয়।" যাহাকে উল্লেখ করিয়া এই অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত ভাষা প্রযুক্ত হইল, সে একটা নবোদ্গত-শ্মশ্রু-গুম্ফ রেখাবিশিষ্ট যুবা। সেকস্‌পীরিয়ান কলার আঁটা, কামিজ গায়ে, সিল্কের রুমাল হাতে একটা বড় তাকিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সম্বন্ধে জয় বাবুর দৌহিত্র। কথাগুলা জিহ্বার নাগর দোলায় পাক খাইতে খাইতে, উদ্ধপদ হেঁটমাথা কতকটা ডিগবাজী খাওয়া ভাবে জয় বাবুর কাছে গিয়া পৌছিল। তাহার সেই আশমানী বেলুনে সহসা একটা ছিদ্র হইয়া বাষ্প বাহির হইবার উপক্রম হইল—সেটা বুঝি বাস্তবিকই একটা বিরাট দেহ, বিশাল বাহু অশথ গাছের উপর পড়িয়া ফাসিয়া যায়। কিন্তু তাহার চারি পাশের তাকিয়ার Pin-Pad এর গায়ে অনেক গুলি মানব-জিহ্বারূপী ছুচ আটকান ছিল। অবস্থা বুঝিয়া অসম্ভব উৎসাহের সহিত তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্যে মন দিল। দেখিতে দেখিতে ছিদ্র মুখ বন্ধ হইল। "পৌত্র অবর্ত্তমানে দৌহিত্রই পিণ্ডাধিকারী ও প্রকৃতপক্ষে বংশ রক্ষক" ইত্যাদি ভাবের মিহি সুতার টানা পোড়েনে এক খানি বেশ তালি নির্ম্মিত হইল।

জয় বাবুর সন্তান সন্ততির মধ্যে একমাত্র আদরিণী কন্যা নবদুর্গা। কন্যা জন্মিবার পর ষোল বৎসর তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। একদিন পূজার নবমীর শেষরাত্রে—তখন জয়বাবুর কন্যার বয়স ষোলবৎসর—বাড়ীতে প্রভাস-যজ্ঞ যাত্রা হইতেছে। রাঙাচেলি ও পিতলের পৈঁচা পরা একটা নপুংসক মূর্ত্তি পুরুষ যশোমতি সাজিয়া "বাপ নীলমনি! একবার ক্রোড়ে এসে দুঃখিনীর তাপিত প্রাণ শীতল কর বাপ্" ইত্যাদি কথার হাতুড়া, শ্রোতাদের মধ্যে অনেক গুলি নিদ্রিত, স্বপ্নপোরা মাথার ভিতর ও জাগ্রত, রুদ্ধ হৃদয়ের উপর বার বার সজোরে আঘাত করিতেছিল। জয় বাবুর গৃহিণী বাবাগুায় চিকের আড়ালে, অসংখ্য নিমন্ত্রিত আত্মীয়া কুটুম্বিনীর মাঝে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বুকের পার্শ্বে বেদনা বোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিয়া অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। তিনি শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু সেই তার শেষ শয্যা হইল। যাত্রা বন্ধ হইল; ডাক্তার আসিল, রোগ দেখিয়া বিমর্ষ হইল। দুই তিন বার রক্ত বমনের পর নাড়ী ছাড়িল। দেবী প্রতিমা ও গৃহিণীর এক সময়ই বিসর্জ্জন হইল।

অনেকেই দুঃখ করিয়া বলিলেন গৃহলক্ষ্মীর বিসর্জ্জন হইল। কিন্তু সেটা বাচালতা মাত্র। যেখানে পুরুষের অষ্টম, নবম, দশম, সহস্রবার পত্নীগ্রহণের ব্যবস্থা আছে, যেখানে গৃহলক্ষ্মী কুমার পাড়ার পুতুলের ন্যায় ঘর সাজাইবার দ্রব্যরূপে বিক্রীত হয়—সেখানে পত্নী বিয়োগে গৃহলক্ষ্মী কিছুমাত্র চঞ্চলা হন না। ভয় কি? এক লক্ষ্মীর স্থানে দশ লক্ষ্মী আসিবে। তোমার মুখে আজ কত হাসি, তোমার আজ কত আনন্দ—কি সুখময় পুলক, কি মোহময় হৃদয়স্পন্দন। এত অধিক

সুখ যে তুমি আত্মসম্বরণে অসমর্থ—তোমার উদ্দাম, অধীর আনন্দ, উন্মাদ কাব্যোচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হইয়া নিরস, অধীর মানবহৃদয়ে আপনার প্রবল প্রবাহ ঢালিতে চায়। একি কুহকী পরিবর্ত্তন! কাল তুমি দরিদ্র ছিলে, আজ তোমার সেই কণ্টকাবৃত তিলমাত্র বাসভূমি সহসা কার চরণস্পর্শে উষালোকোদ্ভাষিত, প্রভাতকলরবমুখরিত শ্যামলা, প্রাচুর্য্য সম্পদভূষিতা, আনন্দ-কল্যানদায়িনী, চির-প্রবাহিতা নদীমাতৃক বিস্তীর্ণ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে এ আনন্দ সংবাদ তুমি ঘরে ঘরে প্রচার করিতেছ, তুমি আজ সহস্রমুখ। কিন্তু হায়! আজ একি? কোথা সেই অধীর আনন্দউচ্ছ্বাস, কোথা সেই তরঙ্গিত, হিল্লোলিত কবিতাপ্রবাহ—কোথা সেই নূতন রাজা—আর রাজ্যের মহীয়সী সাম্রাজ্ঞী; আর—আর একে? কে আসিয়া আজ সেই পূর্ণ লক্ষ্মীর শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছে—তুমি আজ কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া আপনার দান শীলতার গর্ব্ব করিতেছ—বলিতেছ "এ সকলি তোমার, দেখ তোমায় এত খানি দিতেছি, তুমি শুধু ঐ শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়া বসিয়া থাক।—ঠিক কথা! ঐ শূন্যতা পূর্ণ করা এত সহজ বটে? দানবের দেশ আর কোথা!

যাহারা জয় বাবুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও আপনার বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সকলেই তাঁহাকে সংসারের পোদ্দারির খাতার জমা খরচ, লাভালাভ বুঝাইয়া দারান্তর গ্রহণের পরামর্শ দিল। কিন্তু জয় বাবু স্বয়ং ভিন্নরূপ বুঝিয়াছিলেন। তিনি সে ব্যবস্থায় বড় সায় দিলেন না—তাহারা ক্রমে আপনা হইতেই পিছাইয়া পড়িল। শেষ একদিন দীর্ঘ অলস সায়াহ্নে, যখন জয়বাবু সংসার ও আপনার সহিত একটা কাল্পনিক হিসাব নিকাশ করিতেছিলেন—মেয়ে আসিয়া বলিল "বাবা তুমি সৎমা ঘরে আনিয়া আমাকে পর করিও না।" জয় বাবুর সংকল্প সেইদিন দৃঢ়তর হইল।

মেয়ে বড় আদরের। জয় বাবুর পুত্র বা অন্য সন্তান নাই। অন্তরে বাহিরে মেয়ে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বিবাহ দিলে "পরের ঘরে যাইবে, কতদূরে যাইবে, হয়ত ক্রমে এত মমতা সব ভুলিয়া যাইবে" এই সব কথা মনে উদয় হইলে জয়বাবু বড় বিব্রত হইয়া পড়িতেন। প্রাণের ভিতর কেমন একটা বড় অসোয়াস্তির ভাব আসিত। ঘরের চারিপাশে সহস্র সহস্র স্নেহশীল পিতার অসামান্য ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া বল সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিতেন—কিন্তু প্রায় যত্ন বিফল হইত। যখন মেয়ে বড় হইল, বিবাহের যোগ্য হইল, তখন তিনি অনেক খুঁজিয়া পল্লীগ্রাম হইতে একটী কুলীন সন্তান আনিয়া কন্যার সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিলেন। সেই অবধি সে ঘরে রহিল তাঁহারও ভাবনা দূর হইল। কিন্তু বিধি লিপি খণ্ডন হইবার নয়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে জামাতা একটী ছয় মাসের শিশুর হাতে আপনার সমস্ত কৌলীন্য ও অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের ভার দিয়া সংসার হইতে অবসৃত হইলেন। যখন জয় বাবুর পত্নীবিয়োগ হইল তখন শিশু এক বৎসরের। দৌহিত্রের জন্মের পর জয় বাবুর সংকল্প অটল হইল।

হৃদয়ের যে স্থান শূন্য ঠেকিত কোথা হইতে একটী ছোট শিশু আসিয়া ক্রমে তাহা পূর্ণ করিতে লাগিল—বুকের যেথানে বড় অন্ধকার, একটী কচি ঠোঁটের হাসির কিরণে সহসা তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। ছোট ছোট দুটী টলাটলা পায়ের তালে তালে প্রবাহহীন, নস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে আবার নূতন হিল্লোল উঠিতে লাগিল! বিগত, বিস্মৃতপ্রায, মৃত অতীত যেন নবীন জীবন, নূতন যৌবন লাভ করিয়া নব উৎসাহ, নব আনন্দ, নব আশা, তাহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তাহার কি সুখময় অনুভূতি! এ নূতন সুখের কি অপূর্ব্ব আস্বাদ! কে জানিত একটী ক্ষুদ্র শিশুর এত বল!—সে দুর্জ্জয় শক্তিতে জয় বাবুর ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কোথা হইতে আসিল এ বামনদেব, এ যে ত্রিপাদ ভূমির ছলনায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সব কাড়িয়া লয়! সংসার অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান প্রৌঢ় জয় বাবু একটী বোধহীন ধূলিমাখা, উলঙ্গ শিশুর কাছে হার মানিলেন।

নিশ্চিন্ততা, অভাবহীনতার ভিতর দিয়া স্বর্ণপালঙ্কের উপর শিশু বাড়িতে লাগিল। জগতের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যত কিছু অপূর্ণতা তাহার নিকট পৌঁছিত না—তাহার চারি-পাশে স্নেহরচিত নিবিড় ব্যূহ ভেদ করিবার তাহাদের শক্তি ছিল না। গৃহ মধ্যে রৌদ্রাতপহীন, শ্যামল, নিভৃত নিকুঞ্জ—তাহার ভিতর চিরপ্রবাহিত স্নেহপ্রস্রবণ। সে যেন জগৎ হইতে বিভিন্ন—সংসারের সুদীর্ঘ কঠিন পথ, ধূলি, রৌদ্র, কঠোরকর্ত্তব্য, ক্ষুদ্রবড় সংগ্রাম, নিয়মের শাসন, চেষ্টা, বিফলতা, এ সকল যে অভাগারা তাহার গৃহের বাহিরে জন্মিয়াছে তাহাদেরই জন্য—শিশু এইরূপ বুঝিত—মাতা ও মাতামহ উভয়ে এইরূপই বুঝিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বোধ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। শিশু, বালক হইয়া বুঝিল জীবন অর্থে অলস, বৈচিত্রহীন দিনের সমষ্টি—কর্ত্তব্য অর্থে—অবিশ্রান্ত আমোদ ও স্বেচ্ছাচারিতা।

দস্তুর মত সব হইল। যথা সময়ে মাতামহ শিশুকে স্কুলে পাঠাইলেন। যে শিক্ষা গৃহে লাভ হইয়াছিল বালক দেখিল স্কুলের শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে মাতার কোমল বাহুর পরিবর্ত্তে কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ বেত আছে—দাদামহাশয়ের সেই স্নেহ কোমল, চিরপ্রসন্ন মুখের পরিবর্ত্তে শিক্ষকের কুঞ্চিতভ্রূ, অপ্রসন্ন, গভীর রেখাঙ্কিত ললাট প্রায় দেখা যাইত। সুতরাং এরূপ মমতাহীন স্থানে থাকিবার বড় সুবিধা হইল না। দিন কতক ইস্কুলের শিক্ষা অপেক্ষা আপনার গৃহলব্ধ শিক্ষাকে প্রবলতর করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া বালক স্কুল ছাড়িল। যাঁহারা জগতে ভবিষ্যৎ জীবনে যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই বাল্য-জীবন উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণ। যখন দৌহিত্রের স্বেচ্ছারিতাস্রোত তাঁহার গৃহের প্রাচীর ছাড়াইয়া আশে পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়িত—এবং কখন কখন তাঁহার বিকারহীনা গভীর প্রশান্তি ঈষৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, তখন জয়বাবু ঐ কথাই স্মরণ করিতেন। স্কুলে পড়িবার সময় একবার দৌহিত্রের কঠিন পীড়া হয়। বড় বড় ডাক্তার আসিয়া সকলেই ভ্রূ কুঞ্চিত

করিল। মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল বাবা, খোকা কি তবে বাচিবেনা।” জয় বাবু ডাক্তারকে আড়ালে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন “আমার সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিতেছি, তুমি শিশুকে বাচাও।” ডাক্তার হাসিয়া বলিল—“শিশু বাচুক তার সম্পত্তি তারই থাকিবে। আমি প্রাপ্য ভিজিটেই সন্তুষ্ট আছি—তাহার অধিক চাহিনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যত্নের ত্রুটী হইবে না—তবে অদৃষ্টের উপর আমাদের হাত নাই।

এখন বালক যৌবনে উপনীত হইয়াছে। নাম যাহাই হউক সঙ্গীরা নাম দিয়াছে রাজাবাবু। অর্থের অসদ্ভাব নাই—দাদা মহাশয় ব্যাঙ্ক আছেন। এখন অনেক গুলি নূতন কাজও আসিয়া জুটিয়াছে। টাকার আবশ্যক হইলে শুধু একবার দাদা মহাশয়কে জানাইলেই হয়। তিনি হাতে চাবি ফেলিয়া দিবার পর একবার হয় ত বলিলেন “কেন হে?” নাতি উত্তরে বলিত “এমন কিছু নয়।” বাহিরে আসিয়া রাজা বাবু হাসিয়া বলিত “যার দাদামশায় আছে, তার আর কায কি?” সঙ্গীরা মাথা নাড়িয়া, সমস্বরে বলিত “স্ফূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি।”

আজ দুই মাসের উপর হইল জয় বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার চুকিয়া গিয়াছে। রাজাবাবু ও সঙ্গীদের ভিতর কিন্তু প্রতিদিন এক একটা নূতন ব্যাপার চলিতেছে। শেষ নাই, বিরক্তি নাই, নিরবচ্ছিন্ন আমোদ চাই—সঙ্গীরাও প্রতিদিন নূতন নূতন আমোদের পন্থা বাহির করে, অর্থের ভাবনা নাই, রাজা বাবু আছেন। পাড়ার লোকে বুঝিল রাজাবাবু অর্থে রাসেলাসের ছোট সংস্করণ।

আজ বাগানে বড় ঘটা। একদিন এক জন সঙ্গী বলিয়াছিল “রাজা বাবু যদি আজ তোমার মাতামহের স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তুমি কি কর?” তখনও সমস্ত হৃদয়ে পক্ষাঘাত হয় নাই। রাজা বাবু না ভাবিয়া বলিল “বড় কষ্ট হয় আহা! দাদা মহাশয়, বড় ভাল বাসেন।” সঙ্গী হাসিল, বলিল “সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি পুরুষ, তাহার উপযুক্ত দৌহিত্র, বংশের তিলক, শুধু স্ত্রীলোকের ন্যায় শোক করিয়া কি তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, উহা ছাড়া কি আর কর্ত্তব্য নাই?” রাজা বাবুর বুদ্ধি আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না—সে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বন্ধু বলিল “আমি তাঁহার সম্পত্তির কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার ত আর পুত্র নাই, বুঝেছ বুদ্ধিবাজ।” এতক্ষণে কথাটা স্পষ্ট হইল। রাজা বাবু চট্ করিয়া বলিল “একথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি যখন বিষয়ের উত্তরাধিকারী তখন পিণ্ডেরও অধিকারী দাদা মহাশয় মাতৃ শ্রাদ্ধে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন, আমি চারি গুণ চল্লিশহাজার টাকা খরচ করিব।” দলের ভিতর উল্লাস ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিল Bravo! কেহ বলিল “বীর বট।” যখন হর্ষবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল—তখন এক জন বলিল “রাজাবাবু, কিন্তু সে অনেক দূরের কথা—তত দিনে আমরা কোথায় থাকি—কে বা দেখিতে আসিবে। আজ স্ফূর্ত্তির মুখে যাহা এত জোর করিয়া বলিলে, কাযের সময় তাহার কিছুই দেখিব না।”

রাজা। আমি পুরুষ! দাদা মহাশয়ের উপযুক্ত দৌহিত্র।

সঙ্গী বলিল "আজ তাহার পরিচয় দাও! মনে কর জয় বাবুর স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে আর তুমি বিষয়ের অধিকারী— দাও, আজ তাঁহার শ্রাদ্ধের rehearsal দাও"।

সকলেরই কথাটা বড় মজার বলিয়া বোধ হইল। প্রতিদিন নূতন আমোদের জন্য এত মাথা কুটাকুটী—আজ মাথার ভিতর একি বুদ্ধি যোগাইয়াছে—বাহবা! যে এ প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার পিঠে অসংখ্য থাবড়া বৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিল "হরিশ! তুই! ক্ষণজন্মা"।

অন্যের নিকট কথাটা যত আমোদ-জনক বোধ হউক রাজা বাবুর কাছে কিন্তু ভিন্নরূপ বোধ হইল। এ বড় নিষ্ঠুর, বড় হৃদয়হীন খেলা। দাদা মহাশয়ের স্নেহ কমনীয় করুণ মুখখানা মনে পড়ায় তাহার স্ফূর্ত্তির তেজ ম্লান হইয়া পড়িতে-ছিল—কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। সে প্রাণ খুলিয়া সায় দিতে পারিতে-ছিল না। কিন্তু এ বিস্তীর্ণ মরু ভূমির মাঝে তপ্ত বালুকারাশির তলে, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষীণ প্রস্রবণের কতটুকু পরমায়ু। শেষ সঙ্গীদেরই জয় হইল।

তখন সঙ্গীদের মধ্যে একজন দাদা মশাই সাজিল। মৃত্যুর ভান করিল শোকধ্বনী উঠিল—বাগানের দীর্ঘিকা-গাঙ্গিনীর তীরে তাহাকে তীরস্থ করা হইল। তখন জয়বাবু, বাড়ীতে মেয়ের সঙ্গে নাতির জন্য কিরূপ সুন্দরী বৌ ঘরে আনিবেন ও বিবাহে কিরূপ ধুমধাম খরচ পত্র করিবেন, খুব উৎ-সাহের সহিত তাহার একটা পরামর্শ করিতেছিলেন।

আজ বাগানে বড় ঘটা। আজ শ্রাদ্ধের দিন। প্রকৃত শ্রাদ্ধের ন্যায় প্রায় সকল উপকরণই সংগ্রহ হইয়াছে। রাজা বাবু উত্তমরূপ কোঁচান মিহি রেলির থান পরিয়া নান্দীমুখ করিতে বসিলেন— দ্রাক্ষারসে আচমন হইল সঙ্গীদের মধ্যেই একজন মন্ত্র পড়াইলেন।

অগ্রদানী, ভাট, ভিক্ষুক, সে সবই সাজিয়াছে সঙ্গীরা। দানের আড়ম্বর কম নয় রূপার ষোড়শ। আর ঘটার চূড়ান্ত কীর্ত্তনওয়ালি। সেই কীর্ত্তন ওয়ালি আজ বাগানে আসিয়াছে। সঙ্গীরা তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে। সে ছোট মিহি স্বরে জয়দেবের ললিত পদ গাহি-তেছে। আমোদ খুব জমিয়া আসিয়াছে। বার বার আচমনে তখন রাজা বাবুর মাথার ভিতর ও জিহ্বায় জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। সাঁচ্চার কাজ করা কল্কাদার একখানা বহুমূল্য শাল লইয়া তিনি কীর্ত্তনওয়ালির পায়ের কাছে রাখিয়া কম্পিত বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "অয়ি! স্মরগরল খণ্ডন! অধমের দান গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। দাদা মহাশয়ের শ্রাদ্ধের Rehearsal এ আজ এই কিঞ্চিৎ পাদ্যার্ঘ্য দিলাম—তুমি বেঁচে থাক"—এমন সময় সিঁড়ির উপর কাহার পদ শব্দ হইল।

বাগানের মালির মুখে জয় বাবু ঘরে বসিয়া একটা উৎকট আমোদের বার্ত্তা পান। কাণ্ড কি—শুধু কৌতুহল বশে জানিবার জন্য তিনি আজ বাগানে আসিয়াছেন উপরে উঠিবার সময় কথা গুলা তিনি শুনিতে পান নাই—কিন্তু এখন তিনি প্রায় ঘরের দ্বারের কাছে—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাঁহাকে সব শুনিতে হইবে। তখন রাজাবাবু কীর্ত্তনওয়ালির হাত দুটা ধরিয়া বলিতেছেন "তুমি বেঁচে থাক—আজত এ ছেলেখেলা—দাদা বাবুর সত্যকরা শ্রাদ্ধ অবধি তুমি বেঁচে থাক—আজকার একখানা শাল কি, তখন তোমায় কাশ্মীরের রাণি করে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা বিকট হাসির তরঙ্গ উঠিল।

জয় বাবুর বোধ হইল তাঁহার পদতল হইতে সহসা পৃথিবী সরিয়া পড়িতেছে—আর তিনি শূন্যে দাঁড়াইয়া, তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাছাকাছি হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহার চারিপাশে বেগে ঘুরিতেছে—বেগ এত তীব্র—এত উন্মাদ আবর্ত্তন যে তিনের মধ্যে প্রভেদ বুঝা যায় না, সব একাকার। তিনি সজোরে দরজার উপর গিয়া পড়িলেন।

শব্দে সকলের চমক ভাঙ্গিল। প্রথমে বিস্ময়ের আতিশয্যে সকলেই স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া রহিল। রাজাবাবুর কীর্ত্তনওয়ালির হাত ছাড়িয়া দিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না। তারপর যখন বিস্ময়ের ঘোর কাটিল—তখন যাহাকে জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত সম্পদ, সকল চিন্তা, সকল আশা, সকল কর্ত্তব্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—সেই চির স্নেহপালিত, হৃদয়ের শোণিতে বর্দ্ধিত প্রিয় দৌহিত্র অস্থিরচরণে দাদামহাশয়ের কাছে আসিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "দাদামহাশয়! তুমি বাড়ী যাও, রাগ কর না—আজ আমি তোমার কীর্ত্তিকুশল নাতি, কীর্ত্তির কায়দার কসরৎ করিতেছি।"

আয়ুর্ব্বেদ।

সন্নিপাত জ্বর-বিজ্ঞান।

সন্নিপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দোষ সমুদয়ের অবস্থাভেদে উক্ত সন্নিপাত জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার।

একোল্বণাস্ত্রয় স্তেষু দ্ব্যুল্বণাশ্চ তথেতি ষট্।
ত্র্যুল্বণশ্চ ভবেদেকো বিজ্ঞেয়ঃ স তু সপ্তমঃ॥
প্রবৃদ্ধ মধ্য হীনৈস্ত বাত পিত্ত কফৈশ্চ ষট্।
সন্নিপাত জ্বরস্যৈবং স্যু র্বিশেষা স্ত্রয়োদশ॥

একোল্বণ তিন প্রকার—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ ও কফোল্বণ। দ্বিদোষোল্বণ তিন প্রকার—বাত-পিত্তোল্বণ, বাত-শ্লেষ্মোল্বণ ও পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। ত্রিদোষোল্বণ অর্থাৎ বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মোল্বণ এক প্রকার। এই সমুদয়ে সাত প্রকার। বাত পিত্ত কফের প্রবৃদ্ধ, মধ্য ও হীনতা-ভেদে সন্নিপাত জ্বর আর ছয় প্রকার যথা—প্রবৃদ্ধ বায়ু মধ্যপিত্ত ও হীনকফকৃত এক, মধ্যবল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও হীনবল কফকৃত এক, দুর্ব্বল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও মধ্য-বল কফকৃত এক, প্রবল বায়ু, দুর্ব্বল পিত্ত ও মধ্য-বল কফকৃত এক। হীনবল বায়ু, মধ্যবল পিত্ত ও প্রবল কফকৃত এক এবং মধ্যবল বায়ু, হীনবল পিত্ত ও প্রবল কফকৃত এক। উল্লিখিত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

শ্বাসঃ কাসো ভ্রমো মূর্চ্ছা প্রলাপো মোহ-বেপথূ।
পার্শ্বস্য বেদনা জৃম্ভা কষায়ত্বং মুখস্য চ॥
বাতোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
এষ বিস্ফারকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥

বিস্ফারক নামক বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে—শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্ববেদনা, জৃম্ভা ও মুখে কষায়াস্বাদ এই সমুদয় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অতিসারো ভ্রমো মূর্চ্ছা মুখপাক স্তথৈব চ।
গাত্রে চ বিন্দবো রক্তা দাহোঽতীব প্রজায়তে॥
পিত্তোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয় মাশুকারী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

আশুকারী নামক পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে—অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক, গাত্রে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নোৎপত্তি ও অতিশয় দাহ এই সমুদয় লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জড়তা গদ্‌গদা বাণী রাত্রৌ নিদ্রা ভবত্যপি।
প্রস্তব্ধে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্য মেব চ॥
কফোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয় মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥

কম্পন নামক সন্নিপাতে—শরীরের জড়তা, গদ গদ বাক্য, রাত্রিতে অগাধ নিদ্রা, নয়নদ্বয় স্তব্ধ অর্থাৎ নিমেষ-রহিত ও মুখে মধুরাস্বাদ এই সমুদয় লক্ষণ সংঘটিত হয়।

বাতপিত্তাধিকো যস্তু সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য জ্বরো মদ তৃষ্ণা মুখশোষঃ প্রমীলকঃ॥

আধ্মানারুচি তন্দ্রাশ্চ কাস শ্বাস ভ্রম শ্রমাঃ।
মুনিভি র্বক্রুনামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥

বক্রু নামক সন্নিপাত জ্বরে—মত্ততা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, প্রমীলক অর্থাৎ চক্ষুর মুদ্রণ, আধ্মান, (উদর স্ফীতি) অরুচি, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাত শ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য শীতজ্বরো মূর্চ্ছা ক্ষুত্তৃষ্ণা পার্শ্বনিগ্রহঃ॥
শূল মস্বিদ্যমানস্য তন্দ্রা শ্বাসশ্চ জায়তে।
অসাধ্যঃ সন্নিপাতোঽয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে॥
ন হি জীবত্যহোরাত্রমেতেনাবিষ্টবিগ্রহঃ।

বাত-শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে—শীতজ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষুধা, তৃষ্ণাবাহিত্য, পার্শ্ববেদনা, অঙ্গে শূলবেদনা, স্বেদাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস এই সমুদায় লক্ষণ দেখা যায়। শীঘ্রকারী সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য, ইহা একদিন রাত্রির মধ্যেই রোগীর জীবন নাশ করে।

পিত্তশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
অন্তর্দাহো বহিঃশীতং তস্য তৃষ্ণা প্রবর্দ্ধতে॥
তুদ্যতে দক্ষিণে পার্শ্বে উরঃ শীর্ষ গলগ্রহঃ।
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্ম পিত্তঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ কোঠশ্চ জায়তে॥
বিড়্ভেদ শ্বাস হিক্কাশ্চ বর্দ্ধন্তে সপ্রমীলকাঃ।
ঋষিভি র্ভল্লুনামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥

ভল্লু নামক পিত্ত-শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে—অন্তর্দাহ, বাহ্যশীত, অতিশয় তৃষ্ণা, দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবৎ বেদনা, হৃদয়ে, মস্তকে ও গলদেশে বেদনা, কষ্টের সহিত পিত্তশ্লেষ্ম নিষ্ঠীবন, গাত্রে কোঠ নামক চিহ্নোৎপত্তি, মলভেদ, শ্বাস, হিক্কা ও প্রমীলক প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সর্ব্ব দোষোল্বণো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
ত্রয়াণামপি দোষাণাং তস্য রূপাণি লক্ষয়েৎ॥
ব্যাধিভ্যো দারুণ শ্চৈব বজ্র শস্ত্রাগ্নি সন্নিভঃ।
কেবলোচ্ছ্বাস পরমঃ স্তব্ধাঙ্গ স্তব্ধলোচনঃ॥
ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য জন্তোর্হরতি জীবিতম্।
সন্নিপাত মিমং প্রাহুর্ভিষজঃ কূটপালকম্।

কূটপালক নামক ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে—কুপিত দোষত্রয়েরই লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই পীড়া বজ্র, শস্ত্র ও অগ্নির ন্যায় অতীব ভীষণ ও যন্ত্রণাদায়ক। ইহাতে নিরন্তর রোগীর ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে। অঙ্গ সমুদায় ও নয়নদ্বয় স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। এই রোগে তিন দিবসেই মৃত্যু নিশ্চিত। ইহার ভয়াবহ লক্ষণ দর্শন করিয়া অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, অবেলাচারী রাক্ষস, মাতৃকা, যক্ষিণী, ব্রহ্মরাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক বা অন্য কোন যোনি বিশেষের ধর্ষণ ও আবেশ হেতু ইহার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করে কুলদেবতার যথাবিধি অর্চ্চনা না করাতেই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কেহ নক্ষত্র পীড়া, কেহ বা বিষ প্রয়োগ এই অনিষ্টের কারণ মনে করেন। বাস্তবিক ঐ সমস্ত ইহার কারণ নহে, কেবল রোগের ধর্ম্মেই ঐরূপ ভীষণ লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রবৃদ্ধ মধ্য হীনৈস্তু বাত পিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগা স্ত এবোক্তা যথা দোষ বলাশ্রয়াঃ॥
প্রলাপায়াস সংমোহ কম্প মূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ।
এক পক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপ্যেতে বিশেষতঃ॥
এষ সংমোহকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ।

প্রবৃদ্ধ বায়ু, মধ্যাবস্থ পিত্ত ও দুর্ব্বল কফকৃত সংমোহক নামক সন্নিপাত জ্বরে বায়ুর কার্য্য প্রবল, পিত্তের কার্য্য অনতিপ্রবল ও কফের কার্য্য হীন-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ইহাতে প্রলাপ, আয়াস,

মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা অস্বস্থচিত্ততা, ভ্রম ও পক্ষ বধ (একাঙ্গ নাশ) প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

মধ্য প্রবৃদ্ধ হীনৈস্তু বাত পিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগা স্তু এবোক্তা যথাদোষ বলাশ্রয়াঃ॥
মোহ প্রলাপ মূর্চ্ছাঃ স্যু র্মন্যাস্তম্ভঃ শিরোগ্রহঃ।
কাসঃ শ্বাসো ভ্রমস্তন্দ্রা সংজ্ঞানাশো হৃদি ব্যথা॥
খেভ্যো রক্তং বিসৃতিশ্চ সংরক্ত স্তব্ধনেত্রতা।
তত্রাপ্যেতে বিশেষাঃস্যু র্মৃত্যু বর্ব্বাক্ ত্রিবাসরাৎ॥
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং কথিতঃ পাকলাভিধঃ।

মধ্যবল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও হীনবল কফকৃত পাকল নামক সন্নিপাত জ্বরে বায়ু-কৃত কার্য্য অনতি প্রবল, পিত্ত কৃত কার্য্য প্রবল ও কফ-কৃত কার্য্য হীনবল হইয়া থাকে। এই ব্যাধিতে মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, মন্যাস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, হৃদয়ে বেদনা, নাসা প্রভৃতি রন্ধ্র সমস্ত হইতে রক্তস্রাব এবং চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও স্তব্ধ হয়। প্রায়শঃই এতাদৃশ রোগীর তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

হীন প্রবৃদ্ধ মধ্যৈস্তু বাতপিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগা স্তুএবোক্তা যথাদোষ বলাশ্রয়াঃ॥
হৃদয়ং দহ্যতে চাস্য যকৃৎ প্লীহান্ত্র ফুস্ফুসাঃ।
পচন্ত্যত্যর্থ মূর্দ্ধাধঃ পূয় শোণিতনির্গমঃ॥
শীর্ণা দন্তাশ্চ মৃত্যুশ্চ তত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ।
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং যাম্যো নাম্না প্রকীর্তিতঃ॥

দুর্ব্বল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও মধ্যবল কফকৃত যাম্য নামক সন্নিপাত জ্বরে বায়ুকৃত লক্ষণ সমস্ত দুর্ব্বল, পিত্তকৃত লক্ষণ সমস্ত প্রবল ও কফকৃত লক্ষণ সমস্ত মধ্যবল সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার পীড়ায় হৃদয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্ফুসের পচন ও তজ্জন্য ঊর্দ্ধাধঃ পথ দিয়া পূয় রক্ত নির্গম এবং দন্ত সকল পতিত হইয়া যায়। ঐরূপ দন্ত পতন হইলেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

প্রবৃদ্ধ হীন মধ্যৈস্তু বাতপিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্তু এবোক্তা যথা দোষ বলাশ্রয়াঃ॥
প্রলাপায়াস স মোহ কম্প মূর্চ্ছাবতি ভ্রমাঃ।
মন্যাস্তম্ভেন মৃত্যুঃ স্যাৎ তত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ॥
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং ক্রকচঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।

প্রবল বায়ু, দুর্ব্বল পিত্ত ও মধ্যবল কফকৃত ক্রকচ নামক সন্নিপাত জ্বরে বাতিক লক্ষণ প্রবল, পৈত্তিক লক্ষণ দুর্ব্বল ও কফকৃত লক্ষণ মধ্যবল হয়। এইরূপ পীড়ায় প্রলাপ, শ্রান্তিবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, অসুস্থ-চিত্ততা, ভ্রম ও মন্যা-(ঘাড়ের শিরা) স্তম্ভ উপস্থিত হয় এবং মন্যাস্তম্ভ হইলেই রোগীর মৃত্যু সংঘটিত হয়।

মধ্য হীন প্রবৃদ্ধৈ স্তু বাতপিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগা স্তু এবোক্তা যথাদোষ-বলাশ্রয়াঃ॥
তত্রেদ হো বিশেষোঽত্র নচ বক্তুং স শক্যতে।
রক্তমালক্তকেনেব লক্ষ্যতে মুখমণ্ডলম্॥
পিত্তেনাকর্ষিতঃ শ্লেষ্মা হৃদয়ান্ন প্রসিচ্যতে।
ইষুণেবাহতং পার্শ্বং তুদ্যতে খণ্ড্যতে হৃদি॥
প্রমীলক শ্বাস হিক্কা বর্দ্ধন্তে তু দিনে দিনে।
জিহ্বা দগ্ধা খরস্পর্শা গলঃ শূকৈরিবাবৃতঃ॥
বিসর্গং নাভিজানাতি কূজেচ্চাপি কপোতবৎ।
অতীব শ্লেষ্মণা পূর্ণঃ শুষ্ক ওষ্ঠৌষ্ঠ তালুকঃ॥
তন্দ্রানিদ্রাতিযোগার্ত্তো হতবাঙ্ নিহতদ্যুতিঃ।
ন রতিং লভতে নিত্যং বিপরীতানি চেচ্ছতি॥
আযমাতে চ বহুশো রক্তং ষ্ঠীবতি চাল্পশঃ।
এষ কর্কটকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥

মধ্যবল বায়ু, দুর্ব্বল পিত্ত ও প্রবল কফ কৃত কর্কটক নামক সন্নিপাত জ্বরে—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের বলাবলানুসারে তত্তদ্দোষকৃত পীড়া সমস্তের বলাবল দৃষ্ট হয় অর্থাৎ বায়ুকৃত

লক্ষণ মধ্যবল, পিত্তকৃত লক্ষণ দুর্ব্বলও কফকৃত লক্ষণ প্রবল হয়। ইহাতে অতীব যন্ত্রণাদায়ক অবক্তব্য অন্তর্দাহ, মুখমণ্ডল অলক্তক-(আল্‌তা) রসাক্তবৎ লোহিতবর্ণ হয়। পিত্তকর্ত্তৃক আকৃষ্ট থাকাতে হৃদয় হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে পারে না। নিশ্বাস প্রশ্বাসে পার্শ্বদেশ বাণাহতবৎ ও হৃদয় শল্যাদি দ্বারা নিখাতবৎ বোধ হয়। নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা নিমীলিত থাকে। ঐ নেত্র নিমীলন, শ্বাস ও হিক্কা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও খরস্পর্শ হয়, গলদেশ ধান্যশূকাদি দ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয়, মল মূত্রাদির নির্গম হয় না, কণ্ঠ হইতে কপোত ধ্বনির ন্যায় অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইতে থাকে। দেহ কফব্যাপ্ত এবং মুখ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া যায়। সর্ব্বদা তন্দ্রা, নিদ্রা, বাক্‌রোধ, শ্রীহীনতা, অধীর চিত্ততা, বিপরীত ইচ্ছা, দেহে আকর্ষণবৎ যাতনা ও মুহুর্মুহুঃ অল্প অল্প রক্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। এই পীড়া অতীব দুশ্চিকিৎস্য।

হীন মধ্য প্রবৃদ্ধৈস্তু বাত পিত্ত কফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগা স্তু এবোক্তা যথাদোষ বলাশ্রয়াঃ॥
অল্পশূলং কটীতোদো মধ্যে দাহো রুজা ভ্রমঃ।
ভৃশং ক্লমঃ শিরো বস্তি মন্যা হৃদয় বাগ্রুজঃ॥
প্রমীলক শ্বাস কাস হিক্কা জাড্যং বিসংজ্ঞতা।
প্রথমোৎপন্ন মেনস্তু সাধয়ন্তি কদাচ ন॥
এতস্মিন্ সন্নিবৃত্তে তু কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
পিড়কা জায়তে জন্তো র্যথাকৃচ্ছ্রেণ জীবতি॥
স বৈদারিকসংজ্ঞোঽয়ং সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ।
ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য ব্যর্থ মৌষধকল্পনম্॥

হীনবল বায়ু, মধ্যবল পিত্ত ও প্রকৃষ্ট বল কফকৃত বৈদারিক নামক সন্নিপাত জ্বরে—বাতাদি দোষত্রয়ের বলাবলানুসারে তত্তদ্দোষ-কৃত লক্ষণ সমস্তের বলাবল দৃষ্ট হয়। ইহাতে অল্প শূল, কটিদেশে সূচিবেধবৎ যাতনা, অন্তর্দাহ, অঙ্গবেদনা, ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি, মস্তক, বস্তি, মন্যা ও হৃদয়ে ব্যথা, বাক্যোচ্চারণে অত্যন্ত ক্লেশ, নেত্র নিমীলন, শ্বাস, কাস, হিক্কা, জড়তা ও চেতনা লোপ এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম হইতে বিশেষ মনোযোগ করিলে কদাচিৎ এই পীড়া প্রতীকার হইতে দেখা যায়। পীড়া নিবৃত্তির পর কর্ণমূলে যদি শোথ জন্মে তবে তাহা দুশ্চিকিৎস্য। ইহাতে প্রায়ই রোগীর বিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। রোগোৎপত্তির তিন দিবস পরে ঔষধ প্রয়োগ নিষ্ফল অর্থাৎ তিন দিবসের মধ্যে সাবধান হইয়া চিকিৎসা না করাইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তন্ত্রান্তরে বাতোল্বণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরকে শীতাঙ্গ, তন্দ্রিক, প্রলাপক, রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, জিহ্বক, সন্ধিগ, অন্তক, রুগ্‌দাহ, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক ও কণ্ঠকুব্জক নামে অভিহিত করা হয়। লক্ষণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্যও দেখা যায়, সে জন্য ঐ নাম ও লক্ষণগুলি ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

শীতাঙ্গ নামক সন্নিপাত জ্বরে—রোগীর শরীর অতিশয় শীতল, শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, কফ ও বায়ুর প্রকোপাধিক্য, অল্প দাহ, বমি, গাত্রবেদনা ও স্বরবিকার প্রভৃতি লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়।

তন্দ্রিকাখ্য সন্নিপাত জ্বরে—অতিশয় তন্দ্রা, তৃষ্ণা, অতিসার, অধিক শ্বাস, কাস, গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ, গলদেশে শোথ,

কণ্ডূ, হৃদয়াদিতে কফ-লিপ্ততা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির অল্পতা ও দাহ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

প্রলাপক নামক সন্নিপাত জ্বরে—সহসা কম্প, গাত্রে বেদনা, পতন অর্থাৎ অঙ্গ সমুদায়ের নিশ্চেষ্টতা, দাহ, সংজ্ঞা-লোপ ও সর্ব্বদা প্রলাপ বাক্য বলা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তষ্ঠীবি জ্বরে—রক্ত নিষ্ঠীবন, শরীরে লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, শ্বাস, অতিসার, ভ্রম, আধ্মান, সংজ্ঞা-লোপ, পতন, হিক্কা ও গাত্রে অতিশয় পীড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকটিত হয়।

ভুগ্ননেত্র নামক সন্নিপাত জ্বরে—নয়নের অতিশয় বক্রতা, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, প্রলাপ, মত্ততা, কম্প, শ্রবণশক্তির অল্পতা ও মোহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অভিন্যাস সন্নিপাত জ্বরে—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষই প্রবলরূপে কুপিত হয়। এই জ্বরে মোহ, ইন্দ্রিয় সকলের চেষ্টারাহিত্য ও বৈকল্য, অতিশয় শ্বাস, বাগ্‌রোধ, দাহ, মুখের চিক্কণতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ সংঘটিত হয়।

জিহ্বক নামক সন্নিপাত জ্বরে—জিহ্বা মলকণ্টক সমূহে ব্যাপ্ত, সম্পূর্ণভাবে বাক্‌রোধ, শ্রবণশক্তির লোপ, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও সন্তাপ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সন্ধিগ নামক সন্নিপাত জ্বরে—সন্ধিস্থান সকলে শোথ ও অতিশয় বেদনা, মুখ কফব্যাপ্ত, নিদ্রানাশ ও কাস এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অন্তক নামক সন্নিপাত জ্বরে—নিরন্তর মস্তক সঞ্চালন, কাস, গাত্র-বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, শোথ, সন্তাপাধিক্য, চিত্তবৈষম্য ও প্রলাপ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রুগ্‌দাহ নামক সন্নিপাত জ্বরে—অত্যন্ত দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ, মন্যা ও হনুদেশে বেদনা, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ বিশেষের নির্গমন ও শ্রান্তি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

চিত্তবিভ্রম নামক সন্নিপাত জ্বরে—রোগী নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে থাকে, প্রলাপ বাক্য বলে, বিকৃত দর্শন করে ও মোহ প্রাপ্ত হয় এবং দাহ, ব্যথা ও ভয়ে অত্যন্ত কাতর হয়।

কর্ণিকাখ্য সন্নিপাত জ্বরে—কর্ণমূলে শোথ ও বেদনা, কণ্ঠ-বেদনা, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, স্বেদ-নির্গম, মোহ ও দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কণ্ঠকুব্জক জ্বরে—কণ্ঠ বহুশূকাবরুদ্ধবৎ বোধ, অত্যন্ত শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, গাত্র-বেদনা, তৃষ্ণা, হনুস্তম্ভ, শিরোবেদনা, মোহ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

এই ত্রয়োদশ প্রকার জ্বরের মধ্যে সন্ধিগ নামক জ্বর সাধ্য, তন্দ্রিক, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক, জিহ্বক ও কণ্ঠকুব্জ এই পঞ্চবিধ সান্নিপাতিক জ্বর অতিশয় কষ্ট-সাধ্য, রুগ্‌দাহ জ্বর অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য এবং রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, শীত-গাত্র, প্রলাপক, অভিন্যাস ও অন্তক এই ষড়্‌বিধ সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য।

তন্ত্রান্তরে এই বাতোল্বণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের অপরাপর নাম ও

লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে লাক্ষণিক কথঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও এক বলিয়াই প্রতীতি হয়, কেবল নামের পার্থক্য মাত্র। যাহা হউক এ প্রবন্ধে আর অধিক বলা হইল না, সময়ান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের দেশে যাহাকে ঘোর বিকার জ্বর বলে, উহাই সন্নিপাত জ্বর, "জ্বর বিকার অপর কোন ব্যাধি নহে। এই প্রবল পীড়ার দুর্দ্ধর্ষ প্রভাবে যে কত শত মনুষ্য অকালে কাল ভবনে প্রেরিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশে ইহার ন্যায় ভয়ঙ্কর ব্যাধি আর আছে কি না সন্দেহ। এই ভীষণ ব্যাধির চিকিৎসা অতীব জ্ঞান সাপেক্ষ, ইহার প্রথম হইতেই কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে রোগীকে ন্যস্ত করা সঙ্গত। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা এই রোগে অত্যাশ্চর্য্য ফল হইতে দেখা যায়।

বিষম জ্বর চিকিৎসা।

বিষমেষু জ্বরেষ্বাদৌ ক্রিয়াং সংশোধনীং চরেৎ।
সংশোধন মৃতে ব্যর্থং জ্ঞেয়মৌষধকল্পনম্॥
ব্যাধিক্ষীণস্য জীর্ণস্য দুর্ব্বলস্য জরাবতঃ।
শর্ম্মণে ন তু জায়েত বমনং বা বিরেচনম্॥

সকল প্রকার বিষম জ্বরে প্রথমতঃ সংশোধন ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। সংশোধন ঔষধ ব্যতীত অপর ঔষধ কল্পনা বিফল। ব্যাধি-ক্ষীণ, জীর্ণ, দুর্ব্বল, গর্ভিনী, শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তির বমন বা বিরেচন হিতকর নহে। সংশোধনের জন্য এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টার অয়েল) অর্দ্ধ ছটাক, হরিতকী চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা কিম্বা তেউড়ী চূর্ণ ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে ২।৩ বার ভেদ হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হয়। অনন্তর সংশমনার্থ (সংশমন শব্দের অর্থ, যাহাতে বিকৃত দোষ সমতাপ্রাপ্ত হয়) গুলঞ্চ, শুঠ, চিরাতা, নিমছাল, নাটা ও পটোল পত্র দ্বারা ক্বাথোক্ত বিধি অনুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পিপুল চূর্ণ ৵০ আনা সহ সেবন বিধেয়।

জ্বর-কালীন মিঠাসংযুক্ত অণু বটিকা ও বিরাম কালে হরিতাল সংযুক্ত ত্রিলোচন রস প্রভৃতি বটিকা সেবনে অতি সত্বর উপকার হইতে দেখা যায়। বিষম ও জীর্ণ-জ্বরোক্ত ক্বাথ সমুদায়ে সংশোধনক ও সংশমনক গুণ থাকায়, উহা দ্বারা সত্বরই সুফল লাভ করা যায়। সুতরাং বিষম ও জীর্ণ-জ্বরে ক্বাথ প্রয়োগই হিতকর ও সুবিধা জনক।

পূর্ব্ব সংখ্যায় বিষম জ্বরের নাম ও লক্ষণ যথা-যথ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় উহার চিকিৎসা ও পীড়া-প্রশমক নিয়ম সমুদায় প্রদর্শিত হইতেছে। ক্বাথ অর্থাৎ পাচন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। তন্মধ্যে জীর্ণ-জ্বরাদিতে উক্তরূপ চিকিৎসা যে আরও আশু সুফল বিধান করে, বোধ হয় ইহা কাহারও অবিদিত নহে। বিশেষতঃ ইহা অল্পায়াস ও অল্পার্থ-সাধ্য এবং ধনী, নির্ধন, গ্রাম, নগর ও পল্লিবাসী সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক। পরন্তু আমরা (আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ) এই অসীম শক্তি-সম্পন্ন ঔষধের মাহাত্ম্যে অন্যান্য প্রণালীর চিকিৎসা অপেক্ষা বহু বহু স্থলে অভাবনীয় যশোলাভ করিয়া

আসিতেছি, সুতরাং আজ উহা পাঠক বর্গকে জ্ঞাপন করিব।

কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
পটোলং শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী॥
নিম্বং পটোলং মৃদ্বীকা ত্রিফলা মুস্তবৎসকৌ।
কিরাত তিক্ত মমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্॥
গুড়ূচ্যামলকং মুস্ত মর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চ বিধান্ জ্বরান্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যু স্তৃতীয়ক চতুর্থকান্।

উল্লিখিত শ্লোক দ্বারা মহর্ষি পাঁচটী ক্বাথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহার এক এক অর্দ্ধ শ্লোক লিখিত দ্রব্য দ্বারা এক একটী ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয় এবং ইহার এক একটী ক্বাথ যথাক্রমে এক একটী বিষম-জ্বরের মহৌষধ।

ইন্দ্রযব, পটোল পত্র ও কটকী * মিলিত ২ তোলা, অর্থাৎ প্রত্যেক ৷৷৵১০ আনা। অর্দ্ধ সের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে সন্ততাখ্য (অবিচ্ছেদ) বিষম জ্বর উপশমিত হয়।

পটোল পত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদি ও কট্‌কী মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু-প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সততক অর্থাৎ দ্বৈকালিক জ্বর আরোগ্য হয়।

নিমছাল, পটোল পত্র কিস্‌মিস্, ত্রিফলা, * মুতা ও ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা; জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্যেদ্যুষ্ক (প্রতিদিন একবার যে জ্বর হয়) জ্বর প্রশমিত হয়।

চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা পানে তৃতীয়ক (এক দিন অন্তর যে জ্বর হয়) জ্বর নিবৃত্ত হয়।

গুলঞ্চ, আমলা ও মুতা এই তিন দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে ক্বাথ প্রস্তুত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক (দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয়) জ্বর বিনষ্ট হয়।

উক্ত পাঁচটী ক্বাথ পঞ্চবিধ বিষম-জ্বরের মহৌষধ। এই মহৌষধের গুণে বহুতর রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

---

* কটকী প্রভৃতি বিরেচক ঔষধের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান হইতে পারেনা, সুতরাং স্থল বিশেষে বিবেচনা পূর্ব্বক মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এস্থলেও প্রয়োজন মতে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা হয় অর্থাৎ কোষ্ঠ কাঠিন্যে ৷৷৵১০ আনা কটকী দিয়া তাহাতেও যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে আরও ৵০—৷০ আনা বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপ ৷৷৵১০ আনা দিলে যদি তরলভেদ হইতে থাকে, তবে মাত্রা কম করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বত্রই চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন।

* কোন কোন চিকিৎসক ত্রিফলা বা ত্রিকটু প্রভৃতি শব্দদ্বারা উল্লিখিত থাকিলে, তিনের সমষ্টিতে অপরাপর দ্রব্যের তুল্য অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের পরিমাণ যত থাকে, ত্রিফলা বা ত্রিকটুর মিলিত অংশও তত গ্রহণ করেন, আমাদের মতে উহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, অথবা গ্রন্থকারের ঐরূপ অভিপ্রায় বলিয়াও প্রতীতি হয় না। তিনটী নাম না করিয়া একটী কথা দ্বারা তিনটীকে বুঝাইবার অভিপ্রায়েই ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মতে—অপর প্রত্যেক দ্রব্যের ভাগ যদি ১ তোলা হয়, তবে ত্রিফলা অর্থাৎ হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদেরও প্রত্যেকের এক এক তোলা করিয়া তিন তোলা গ্রহণ করা সঙ্গত। ত্রিকটু, ত্রিসুগন্ধি প্রভৃতি স্থলেও ঐরূপ নিয়ম।

পটোল পত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও বাসকছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, (পূর্ব্বেই বলিযাছি আয়ুর্ব্বেদ মতে ৬৪ তোলায় সের হয়) শীতল হইলে ইক্ষু চিনি ২।৩ আনা এবং মধু ২।৩ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্যেদ্যুষ্ক অর্থাৎ ঐকাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহার নাম পটোলাদি ক্বাথ।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধন্যা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ও চিনি। এই ক্বাথ পানে তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়। ইহাব নাম মহৌষধাদি ক্বাথ।

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরিতকী ও শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা। পূর্ব্ববৎ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ক্বাথ শীতল হইলে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বর আরোগ্য হয়। ইহার নাম বাসাদি ক্বাথ।

গোরক্ষ চাকুলের মূল ১ তোলা ও শুঁঠ ১ তোলা দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সমস্ত প্রকার বিষম জ্বর ২।৩ দিনে প্রতিকৃত হয়। এই ক্বাথের নাম মহাবলাদি।

গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, আমলা, কণ্টকারী, শুঁঠ, বিল্বমূলের ছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা মিলিত ২ তোলা পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও দ্বন্দ্বজ প্রভৃতি চিরোৎপন্ন রাত্রি জ্বর বিনষ্ট হয়।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলা, ধন্যা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোল পত্র, পূর্ব্ববৎ কাথ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি দারুণ বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্ ভার্গ্যাদি।

বামনহাটী, হরিতকী, কটকী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল গণিযারীছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঁঠ—মিলিত ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। এই কষায পান করিলে ধাতুগত সন্ততাদি পঞ্চবিধ বিষমজ্বর, বহিঃস্থ ও শীত সংযুক্ত জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয়। ইহার সুধাময় ফল অনেকেই অবগত আছেন।

দাস্থাদি।

নীলঝাঁটী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, শুঁঠ, বেণারমূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গা, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরল কাষ্ঠ, সাজিনারছাল, বালা, বৃহতী, হরিতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড় মিলিত ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে মধু ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই ক্বাথ পানে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষ জনিতজ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিকজ্বর, কাম

বা শোকজনিত জ্বর, বমি ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব সহিত জ্বর, ক্ষয় জ্বর, ও দুঃসাধ্য যকৃৎ প্লীহা সংযুক্ত জীর্ণ জ্বর নিবৃত্ত হয়।

দার্ব্ব্যাদি।

দারু হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাকস মূল, সরল কাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাঁড়ভাঙ্গা, চিরাতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কটুকী, পিপুল ও ধন্যা মিলিত ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ।।০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক ও সতত প্রভৃতি বিষম জ্বর, অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ ও দৈর্ঘরাত্রিক প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর ও আনুষঙ্গিক শীত, কম্প, দাহ, কাশ্য, ঘর্ম্ম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হলীমক প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বোধ হয় ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিতে কাহারও বাকি নাই।

ভাবনা।

দ্রবেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্ বরৈঃ॥
ভাব্যদ্রব্য সমং কাথ্যং কাথ্যাদষ্টগুণংজলম্।
অষ্টাংশ শেষিতঃ কাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা॥
দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ।
শুষ্কং চূর্ণী কৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ॥

চূর্ণদ্রব্য দ্রব পদার্থে ভিজাইয়া দিবসে রৌদ্রে শুষ্ক ও রাত্রিতে শিশির সিক্ত করাকে ভাবনা দেওয়া কহে। অনুক্ত স্থলে ৭ দিবস ঐরূপ ভাবনা দেওয়া বিহিত। যে পরিমিত দ্রবে চূর্ণ সকল উত্তমরূপে আর্দ্র হয়, ভাবনা ক্রিয়ায় দ্রবের পরিমাণ তাঁহাই জানিবে। কোন দ্রব্যের ক্বাথে ভাবনা দিতে হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য, ভাব্য দ্রব্যের সমান পরিমাণ লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংস অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দেওয়া বিধেয়।

জ্বর কুঞ্জর পারীন্দ্র, জয়মঙ্গলরস, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, জ্বরান্তক রস, বিষম জ্বরান্তক লৌহ ও পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ প্রভৃতি ধাতু ঘটিত ঔষধ বিষম ও জীর্ণ জ্বরে অতীব হিতকর।

জ্বর কুঞ্জর পারীন্দ্র রস।

মূর্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা, সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্নবা, গণিয়ারী, ভুঁই আমলা, ঘোষালতা, চিরাতা, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতা ফট্‌কী, মুগানি ও গন্ধভাদুলে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার একটী বটিকা প্রতিদিন প্রাতে পান বা যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষম ও জীর্ণ জ্বর প্রশমিত হয় এবং শ্বাস, কাস, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু,

কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয় রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

জয়মঙ্গল রস।

হিঙ্গুলোথ রস, গন্ধক, সোহাগারখই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণ মাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ প্রত্যেক ৪ মাষা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৪ মাষা ও রৌপ্য ৪মাষা, সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতূরাপত্ররসে, শেফালি পত্র রসে, দশমূলের কাথে ও চিতার কাথে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরক চূর্ণ ও মধু। এই জয়মঙ্গল রস সেবনে আরোগ্য না হয় এরূপ জ্বরই দেখা যায়না। ইহা বিষম ও জীর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রস অর্থাৎ পারদ সম্বন্ধে কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় কথা এস্থলে লিখিত হইতেছে, ইহা সর্ব্বত্রই স্মরণ রাখা আবশ্যক। রস বা পারদ শব্দ উল্লেখ থাকিলেই শোধিত বুঝিতে হইবে। শোধিত পারদ রোগ শান্তির পক্ষে যেরূপ অনুকূল, অশোধিত পারদ আবার তেমনি বহুবিধ রোগের কারণ। সুতরাং বিশেষ করিয়া উল্লেখ না থাকিলেও উহা শোধিতই বুঝিতে হইবে।

ঘৃত কুমারী, চিতামূল, রক্ত সর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহার রস বা কাথের সহিত ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্ব দোষ বিনির্ম্মুক্ত হয়। কেবল রশুনের রসের সহিত মর্দ্দনেও উহা নির্দ্দোষ হয়। এইরূপ দোষ শূন্য পারদকে শোধিত পারদ বলা হয়।

যে প্রক্রিয়াদ্বারা পারদের ব্যাধিঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা বা মূর্চ্ছা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকর্কোটকী, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কাথের সহিত এবং চিতা, মেষলোম, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারীর দ্রব, আকন্দপত্র রস ও ধুস্তূরপত্র রস এই সকলের সহিত ৭ বার মর্দ্দন করিলে রসের কঞ্চুক সমূহ দূরীভূত হয়। ইহার নাম মূর্চ্ছন, এইরূপ পারদকে মূর্চ্ছিত পারদ বলে। পারদের ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি শব্দ থাকিলেও ভস্ম বুঝিতে হইবে।

বিষম জ্বরান্তক লৌহ।

চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, চাকুলে, মনঃশিলা, শুঁঠ, পিঁপুল, বলাডুমুর, গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, মূর্ব্বামূল, খর্পর ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক জারিত লৌহ এই সমস্ত জলে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে। চিরাতার কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, যকৃৎ ও শোথাদি উপদ্রব সম্পন্ন যাবতীয় জ্বর প্রশমিত হয়।

পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক লৌহ।

হিঙ্গুলোথ রস ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিবে। উহার সহিত স্বর্ণ ২ মাষা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা বঙ্গ ও গেরিমাটী প্রত্যেক ॥০ তোলা, মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তি ভস্ম প্রত্যেক ২ মাষা, এই সমুদায় মিশ্রিত

করিয়া জল দিয়া খলে মাড়িয়া পিণ্ডবৎ গোলাকৃতি করিবে, অনন্তর ঐ গোলক ঝিনুকের মধ্যে রাখিয়া উপরিভাগে আর একখানি ঝিনুক রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া ২০।২৫ খানি ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। শীতল হইলে সাবধান পূর্ব্বক মধ্যস্থ গোলক লইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। ইহার সাধারণ অনুপান পিপুলচূর্ণ ২ রতি, হিঙ্গু ২ রতি ও সৈন্ধব ২ রতি। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িয়া উক্ত অনুপানের সহিত সেব্য। ইহা বিষম জ্বরের মহৌষধ। উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য ও শুদ্ধ পুটিত হরিতাল ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা ও কান্তলৌহ ৮ তোলা একত্র উচ্ছেপাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেতপাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, গুলঞ্চের রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিশিন্দাপত্র রস, পুনর্নবার রস ও আদার রস এই সমুদায় দ্বারা যথাক্রমে ৭বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার সাধারণ অনুপান পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি ও পুরাতন গুড়। ইহাতে সপ্তাহ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় তৈল একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আধুনিক সভ্যসমাজে ইহার যথোচিত সমাদর না থাকিলেও কিন্তু অতুলনীয় শক্তি আমরা অনেকস্থলে দেখাইয়া আসিতেছি, সুতরাং আমরা নিতান্তই ইহার পক্ষপাতী। গুণ কাহারও অপ্রকাশিত থাকে না। বাতব্যাধি প্রভৃতি কতকগুলি রোগে বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসকদিগকেও এই তৈলের প্রশংসা করিতে হইয়া থাকে।

তৈলাভ্যঙ্গ যে সমস্ত জ্বরের পক্ষেই হিতকর তাহা নহে। জীর্ণজ্বরে যখন শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকে না, কেবল বায়ুর প্রকোপই পরিলক্ষিত হয়, দিবসের শেষ ভাগে শরীর অল্প উষ্ণ বোধ হয় এবং চক্ষু ও হস্ত পদাদির জ্বালা হয়, সেই সময়েই তৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বর।
লভন্তে সুখ মঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে ॥

জীর্ণজ্বরে অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন) প্রলেপ, স্নেহপান ও স্নানাদি স্থলবিশেষে শীতল স্থলবিশেষে উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্য পথস্থিত জ্বর সত্বর উপশমিত হয় এবং শরীর সুস্থ ও বল বর্ণাদি উৎপন্ন হয়।

অঙ্গারক তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের, কল্কদ্রব্য যথা—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা রাখালশসারমূল, বৃহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। কল্ক পাকার্থ জল ১৬ সের। পাক সিদ্ধ হইলে ছাকিয়া লইয়া তাহাতে কর্পূর ২ তোলা, শিলারস

২ তোলা ও নখী ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারক তৈল।

শুষ্ক মূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারক তৈলোক্ত কল্ক সমুদায়, মিলিত ১ সের, মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা মর্দ্দনে জ্বর, শোথ, ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

লাক্ষাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, পুরাতন কাঁজি ১৬ সের, কল্কার্থ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারণ হয়।

মহা লাক্ষাদি তৈল।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের) দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুল্ফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কর্পূর ২ তোলা, শিলারস, ২ তোলা ও নখী ২ তোলা তৈলে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বিষম ও জীর্ণ জ্বরাদি বিনষ্ট হয়।

শারীর বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রজ্জু।

অস্থ্নাং সংযোজিকাঃশুভ্রাঃ সৌত্রিকা রজ্জবো মতাঃ।
কাশ্চিৎ স্থূলাঃ প্রশস্তাশ্চ দীর্ঘা বহুবিধা স্তথা ॥
মধ্যকায়ে তথা বাহ্বোঃ সক্থ্নো রেব চ তাঃ স্থিতাঃ।
অস্থীন্যাভি র্নিবদ্ধানি স্বস্থানান্ন চলন্তি হি ॥

অস্থিদিগের পরস্পর সংযোজক শুভ্র বর্ণ সূত্রময় পদার্থ বিশেষকে রজ্জু কহে। কোন কোন রজ্জু স্থূল, কোন রজ্জু প্রশস্ত ও কোন রজ্জু দীর্ঘ ইত্যাদি নানা প্রকার। মধ্যকায়ে বাহুদ্বয়ে ও শকৃথিদ্বয়ে রজ্জু সকল অবস্থিত। ইহাদিগের দ্বারা নিবদ্ধ থাকাতে অস্থি সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে না।

এই রজ্জু অঙ্গুলী সমুদায়ের পর্ব্বদিগকে পরস্পর যোজনা করিয়া রাখে, অঙ্গুল্যস্থির সহিত করভাস্থিদিগকে, করভাস্থির সহিত মণি বন্ধাস্থিদিগকে এবং মণিবন্ধাস্থিদিগকে পরস্পর বন্ধন করিয়া রহিয়াছে। রজ্জুই মণিবন্ধ সন্ধির যোজক, প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের পরস্পর যোজক, কফোণি সন্ধির যোজক, স্কন্ধ সন্ধির যোজক, অংসাস্থির যোজক, অংসাস্থি ও জত্রূস্থির যোজক এবং জত্রূস্থি ও উরোস্থির যোজক। এই সমুদায় রজ্জু এক বাহুতে বিদ্যমান আছে অপর বাহুতেও এইরূপ রজ্জু আছে।

রজ্জু দ্বারা পাদাঙ্গুলি পর্ব্ব সকল পরস্পর যোজিত আছে, অঙ্গুল্যস্থির সহিত প্রপদাস্থি, প্রপদাস্থির সহিত গুল্ফাস্থি, এবং গুল্ফাস্থির সহিত গুল্ফাস্থি সংযোজিত আছে।

গুল্‌ফ সন্ধি, জঙ্ঘাস্থিদ্বয়, জানুসন্ধি ও বঙ্ক্ষণ সন্ধি রজ্জু সমূহ দ্বারা সংযোজিত। অপর শকৃথিতেও ঐরূপ রজ্জু আছে।

মধ্যকায়ে নিম্নলিখিত রজ্জুগুলি আছে, যথা উপরিস্থ সাতটী পর্শুকার সহিত বক্ষোঽস্থির সংযোজক, বক্ষোস্থি খণ্ডত্রয়ের যোজক, কশেরুকা ও পর্শুকাদিগের যোজক, কশেরুকাদিগের পরস্পর যোজক, করোটীর পশ্চাদস্থির সহিত উর্দ্ধস্থ কশেরুকাদ্বয়ের যোজক, হন্বস্থির যোজক, পৃষ্ঠ বংশাস্থি ও বস্ত্যস্থিদিগের যোজক এবং বস্ত্যস্থি সকলের পরস্পর সংযোজক।

পেশী।

পেশ্যস্তু লোহিতাঃ সৌত্রাঃ সর্ব্বকায় সমাশ্রিতাঃ।
তাঃ সংকোচনশীলাশ্চ সমন্তাৎ কলয়াবৃতাঃ॥
স্পন্দনাদি-প্রবর্ত্তিন্যো দ্বিধা তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ইচ্ছাধীনাশ্চ কাশ্চিৎ স্যুঃ স্বাধীনাঃ কাশ্চি দেব চ॥
সক্‌থি বাহ্বাদিষু জ্ঞেয়া ইচ্ছাধীনা স্তথাপরাঃ।
অন্ত্রোপস্থাদিষু প্রোক্তা মুনিভি র্দেহবেত্তৃভিঃ॥
ধমন্যস্থি শিরা স্নায়ু সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্।
পেশীভিঃ সংবৃতাঃ সর্ব্বে ভবন্তি বলিনো দৃঢ়াঃ॥

শরীরস্থ পেশী সমুদায় লোহিতবর্ণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু সূত্রময় ও কলা দ্বারা সমাবৃত। পেশী সমুদায় সংকোচনশীল ও দেহের স্পন্দনাদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। পেশী দ্বিবিধ—ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন। শকৃথি ও বাহু প্রভৃতিতে ইচ্ছাধীন পেশী অবস্থিত আছে। জীবগণের অস্থি, ধমনী, শিরা, স্নায়ু ও সন্ধি সকল পেশী দ্বারা আবৃত থাকাতে সুরক্ষিত ও সবল থাকে, পেশীর অপর নাম মাংস। ছাগাদির যে মাংস আহার করা যায়, ঐ মাংসই পেশী।

পঞ্চ পেশী শতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারি শতানি শাখাসু। কোষ্ঠে ষট্‌ ষষ্টিঃ। গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ।

সুশ্রুত বলেন মনুষ্য দেহের পেশী সংখ্যা পাঁচ শত। শাখা সমুদায়ে চারি শত, কোষ্ঠে ছেষট্টি এবং গ্রীবার উর্দ্ধে চৌত্রিশ।

কেষাঞ্চিৎ মতে—মানবদেহে চত্বারি পেশী শতানি সন্তি, তাসাং কতিচিদ বিশেষেণোচ্যন্তে।

মানব দেহে পেশী সংখ্যা চারি শত। তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে। অবিকল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিতে গেলে, প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং যথাযথ বঙ্গভাষা এবং আবশ্যকমত অল্প অল্প সংস্কৃত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পেশী সংস্থান অস্থি সংস্থান হইতেও কঠিন ব্যাপার। পেশী সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদও এই কারণে ঘটিয়া থাকে।

মূর্দ্ধদেশে উপরিভাগে একখানি পাতলা পেশী আছে। ইহা করোটীর পশ্চাদস্থি ও শঙ্খাস্থিদ্বয় হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকের উপরিভাগ ব্যাপ্ত করিয়া এবং ঐস্থানে কণ্ডরা সদৃশ হইয়া ললাটের অধোভাগস্থ পেশী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। এই পেশীখানি মধ্যে কণ্ডরাময় ও প্রান্তদ্বয়ে মাংসময়। এই পেশী দ্বারা ভ্রূযুগ উর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এক এক কর্ণপ্রদেশে তিনখানি করিয়া পেশী আছে। ইহারা যথাক্রমে কর্ণের পশ্চাৎ উর্দ্ধ ও সম্মুখদিকে অবস্থিত থাকিয়া উহাদিগকে পশ্চাৎ উর্দ্ধ ও সম্মুখদিকে আকর্ষণ করে।

চক্ষুর পাতা বেষ্টন করিয়া একখণ্ড পেশী অবস্থিত আছে, ইহার দ্বারা নেত্র

নিমিলিত হয়। নেত্রপুটের নিম্নে এক খণ্ড পেশী আছে, তদ্দারা ভ্রূদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। আর একখণ্ড পেশী অশ্রু নাড়ীকে অন্তর্ভাগে আকর্ষণ করে। দুই চক্ষুতেই এইরূপ পেশী বিদ্যমান আছে।

চক্ষুতে আর কয়েকটী পেশী আছে। উহার একটী দ্বারা চক্ষুর উপর পাতা উপরদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। অপর একটী দ্বারা নেত্রমণ্ডল উৰ্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হয়, একটী দ্বারা অধোদিকে, আর একটী দ্বারা বহির্দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী পেশী দ্বারা চক্ষু অভ্যন্তর ও অগ্রভাগে এবং তলস্থ একটী পেশী দ্বারা পশ্চাৎ ও বহির্ভাগে ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। ঘ্রাণদেশে তিনটী পেশী বিদ্যমান থাকিয়া উহার নমনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ওষ্ঠদেশবর্ত্তি পেশীদিগের মধ্যে কোনটী দ্বারা মুখ সংবরণ, কাহারও দ্বারা ওষ্ঠ ও নাসিকার উৰ্দ্ধাকর্ষণ, কোনটী দ্বারা মুখপ্রান্তদ্বয়ের অন্তরাকর্ষণ, কাহারও দ্বারা উহাদের উৰ্দ্ধাকর্ষণ, কাহারও দ্বারা হাস্য ক্রিয়া এবং কাহারও দ্বারা নাসাপুট সংবরণ সাধিত হইয়া থাকে। অধরভাগস্থ পেশীদিগের মধ্যে কোনটী দ্বারা অধরের নিম্নাকর্ষণ, কোনটী দ্বারা উৰ্দ্ধাকর্ষণ এবং কোনটী দ্বারা মুখপ্রান্তদ্বয়ের নিম্নে আকর্ষণ হইয়া থাকে।

হনু ও ঊৰ্দ্ধ হনুস্থ পেশীদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা হন্বস্থির ঊর্দ্ধাকর্ষণ, কাহার দ্বারা মুখ সঞ্চিত জলাদির বহির্নিক্ষেপ এবং কাহারও দ্বারা হন্বস্থির ইতস্ততঃ চাঞ্চল্য প্রভৃতি ক্রিয়া সমাহিত হইয়া থাকে।

গ্রীবাদেশস্থ পেশীদিগের মধ্যে কোনটী দ্বারা চিবুকের অধঃস্থিত চর্ম্মের অধোনমন, কোনটী দ্বারা মুখমণ্ডলের ইতস্ততঃ সঞ্চালন (এই দুইটী পেশী দ্বারা শিরোমণ্ডলের অভিমুখ নমন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে) কাহারও দ্বারা জিহ্বা মূলাস্থি ও কণ্ঠের অধোনমন, কাহারও দ্বারা মুখব্যাদান, কাহারও দ্বারা জিহ্বা ও চিবুকের অধোনমন, কাহারও দ্বারা গলাধঃকরণ ক্রিয়া, কাহারও দ্বারা তালুর অধোনমন, কাহারও দ্বারা উহার উর্দ্ধে আকর্ষণ, কাহারও দ্বারা উপজিহ্বার নমন, কাহারও দ্বারা পর্শুকাদিগের উৰ্দ্ধাকর্ষণ, কাহারও দ্বারা পৃষ্ঠবংশের নমন এবং কাহারও দ্বারা শিরোমণ্ডলের আঘূর্ণন ইত্যাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠস্থ পেশীদিগের মধ্যে কোনটী দ্বারা স্কন্ধের পশ্চাৎ ও উর্দ্ধে আকর্ষণ, কাহারও দ্বারা মধ্য কায়ের সম্মুখে আকর্ষণ এবং কাহারও দ্বারা পৃষ্ঠ বংশের ঋজু করণ ইত্যাদি ক্রিয়া সমাহিত হয়।

বক্ষঃস্থলের এক এক পার্শ্বে পর্শুকাদিগের বহির্দেশ ব্যাপ্ত করিয়া একাদশটী করিয়া পেশী আছে। ইহাদের একএকটী পার্শ্বস্থ দুই দুইটী পর্শুকা ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছে। এইরূপ পর্শুকাদিগের অন্তর্দিকে প্রত্যেক পার্শ্বে আর একাদশটী করিয়া পেশী আছে। উরোহস্থিতে এক খণ্ড পেশী আছে, ইহা ঐ উরোহস্থির নিম্ন ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্শুকার তরুণাস্থি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। বক্ষস্থলের নিম্ন ভাগে উদরের ঊর্দ্ধে একখানি পেশী আছে, ইহার দ্বারা উদর ও বক্ষঃ

পৃথক কৃত হয়। উল্লিখিত পেশীদিগের দ্বারা নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও শোণিত যন্ত্র ধারণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

উদরস্থ পেশীদিগের দ্বারা বমন, রেচন, মূত্রণ ও সন্তান প্রসবাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। গুহ্যদেশস্থ পেশীদিগের দ্বারা মুত্রণ, রেচন, গুহ্য সংকোচন ও লিঙ্গোত্থাপন প্রভৃতি ক্রিয়ার আনুকূল্য হইয়া থাকে।

উরোহস্থি, জত্রু, পর্শুকা, স্কন্ধ, প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ, কর ও অঙ্গুলি প্রভৃতিতে বহুতর পেশী অবস্থিত থাকিয়া শ্বাস ক্রিয়া, আলিঙ্গন, বাহুচালন এবং দ্রব্য গ্রহণ ও ক্ষেপণ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে।

শ্রোণিস্থ পেশীদিগের মধ্যে একটী পেশী অতি স্থূল। ইহা ত্রিক ও শ্রোণ্যস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ব্বস্থির ঊর্দ্ধাংশে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রোণি প্রদেশে আরও কতিপয় পেশী আছে। এই সমুদয় পেশীর দ্বারা সুখোপবেশন, উর্ব্বস্থির বহিরাকর্ষণ, পাদ বিক্ষেপণ এবং এবম্বিধ অন্যান্য কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে।

ঊরু, জঙ্ঘা, পাদ ও পাদাঙ্গুলীতে অবস্থিত পেশীদিগের দ্বারা সক্থি সঞ্চালন, দণ্ডায়ন, ও নমন প্রভৃতি কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়। পাদতলে, পৃষ্ঠে ও গ্রীবাদেশে পেশীগণ উপর্য্যুপরি ভাবে অবস্থিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

পেশ্যঃ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি নিখিলানি শরীরিণাম্।
গোপয়ন্তি চ কুল্যানি জনয়ন্তি সুখানি চ॥
না ভবিষ্যন্নথৈতা শ্চেদ্ গতি স্পন্দ বিবর্জ্জিতাঃ।
কাষ্ঠভূতা মৃতপ্রায়া অভবিষ্যন্ হি দেহিনঃ॥
ভারবাহো গতিঃ স্পন্দো ব্যায়ামঃ শ্বসনং স্থিতিঃ।
আশ্লেষোপগূহনং হাস্যং গীতি নর্ত্তন বাদনে॥
বিহারা হার নির্হারা শ্চ স্বনং শয়নং রতিঃ।
গর্ভোৎপত্তি সুৎসবনং সর্ব্বং পেশীকৃতং মতম্॥
অথ কিং বহুনোক্তেন প্রাণিনাং প্রাণধারণে।
কারণানি প্রধানানি পেশ্য এবেতি নিশ্চিতম্॥

পেশী সমুদায়ই শরীরীদিগের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা অস্থিদিগকে রক্ষা করে এবং বিবিধ সুখের কারণ। পেশী না থাকিলে জীবগণ নিঃস্পন্দ, গতি শক্তি হীন, কাষ্ঠীভূত ও মৃত প্রায় হইয়া থাকিত। ভার বহন, গমন, স্পন্দন, ব্যায়াম, শ্বাস ক্রিয়া, দণ্ডায়ন, উপবেশন, আলিঙ্গন, হাস্য, গীত, নৃত্য, বাদ্য, বিহার, আহার, মল মূত্রোৎসর্গ, চুম্বন, শয়ন, শৃঙ্গার, গর্ভোৎপত্তি ও অপত্য প্রসব ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই পেশী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রাণিদিগের প্রাণ ধারণ বিষয়ে পেশীগণই মুখ্য কারণ।

পরিভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

স্নেহ পাকের সাধারণ নিয়ম।

তিল তৈল মূর্চ্ছাবিধি।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তর বিমলে মন্দ মন্দানলৈস্তৎ, তৈলং নিষ্ফেনভাবং গত মিহ যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব। মঞ্জিষ্ঠা রাত্রি লোধ্রৈর্জ্জল ধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ, শুচি পত্রা ম্বু নীরৈরুপহিতমথিতৈ র্গন্ধযোগং জহাতি॥

তৈলস্যেন্দু কলাংশিকৈক বিকসা ভাগো-হপি মূর্চ্ছাবিধৌ, যে চান্যে ত্রিফলা পয়োদ রজনী হ্রীবের লোধ্রান্বিতাঃ। শুচি পুষ্প বটাবরোহ নলিকা স্তল্যাশ্চ পাদাংশিকা, দুর্গন্ধং বিনিহন্তি তৈলমরুণং সৌরভ্য মাকুর্ব্বতে॥

কোন দৃঢ়তর কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে, ঐ তৈল যখন ফেন রহিত হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। কিঞ্চিৎ শীতল হইলে পিষ্ট হরিদ্রা জলে গুলিয়া সাবধান পূর্ব্বক ক্রমে উহাতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর কুট্টিত ও জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ তৈলে প্রদান করিবে। তদনন্তর লোধ, মুথা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরিতকী, কেয়ার মূল, বটের ঝুরি ও বালা এই সমুদায় শিলা-পিষ্ট ও জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ দিবে এবং ঐ তৈলে, তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যকে মূর্চ্ছা দ্রব্য কহে। তৈলের পরিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ, অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ।

তৈলের পরিমাণ যদি ১৬ সের হয়, তবে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ ১ সের, এবং হরিদ্রা ও লোধ প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১ পোয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়া উত্তম সৌগন্ধ্য ও অরুণ বর্ণ ধারণ করে। তৈলের সহিত ক্বাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছা দ্রব্য সমস্ত ছাকিয়া ফেলা উচিত।

কটুতৈল মূর্চ্ছা।

দৃঢ় পাত্রে তৈল জাল দিয়া নিষ্ফেন ভাব প্রাপ্ত হইলে প্রথমে হরিদ্রা ও তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা তিলতৈল মূর্চ্ছার ন্যায় প্রদান করিবে, পশ্চাৎ আমলা, মুতা, বেলছাল, দাড়িম ছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া প্রদান করিবে। তৈল ৪ সের মঞ্জিষ্ঠা ১ পোয়া ও অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ১৬ সের, কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন রাখিয়া দিবে।

এরণ্ডতৈল মূর্চ্ছাবিধি।

এরণ্ড তৈল নিষ্ফেন হইলে প্রথমতঃ হরিদ্রা, তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা প্রদান করিয়া মুতা, ধন্যা, ত্রিফলা, জয়ন্তী পত্র, বালা, বনখেজুর, বটের ঝুরি, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার মূল, দধি ও কাঁজি প্রদান করিবে। তৈল ৪ সের এবং মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের প্রত্যেক ৪ তোলা।

ঘৃত মূর্চ্ছা।

হরিতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা, হরিদ্রা ও লেবুর রস এই সমুদায় ঘৃতের মূর্চ্ছা দ্রব্য। প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে লেবুর রস ও তদনন্তর অন্যান্য দ্রব্য তৈল-মূর্চ্ছার ন্যায় ঘৃতে নিক্ষেপ করিতে হয়। ৪ সের ঘৃতে, মূর্চ্ছা দ্রব্য সকলের প্রত্যে-কের পরিমাণ ৮ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের।

বাতনাশক তৈলের বিশেষ মূর্চ্ছাবিধি।

বায়ুরোগ নাশক বিষ্ণু তৈলাদির মূর্চ্ছা ক্রিয়া উল্লিখিত সাধারণ নিয়মে সম্পাদন করিয়া পঞ্চ পল্লব জলে পুনরায় শোধন করিয়া লইতে হয়। তৈলের পরিমাণ যত হয়, তাহার অষ্টমাংশ পঞ্চ পল্লব

(আম, জাম, কয়েত‍্‍ বেল, টাবা লেবু ও বিল্ব) চতুর্গুণ জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া মূর্চ্ছিত তৈলের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিয়া লইতে হয়।

মূর্চ্ছা স্যাৎ সপ্তভিঃ সিদ্ধা রাত্রিভি র্বুধসম্মতা।
ব্রীহি প্রাণ্যঙ্গয়োঃপাকঃ সদ্যঃ সিদ্ধ্যতি নান্যথা॥
স্যাৎ পাকঃ পয়সো দ্বাভ্যাং স্বরসাদেস্ত তিসৃভিঃ।
দধিকাঞ্জিক তক্রাণাং সিদ্ধো ভবতি পঞ্চভিঃ॥
মূত্রাদীনা মেকয়া স্যাৎ ততঃ কল্কস্ত সপ্তভিঃ।
গন্ধানাং পঞ্চভি র্জ্ঞেয়ঃ স্নেহপাকে ক্রমোঽপ্যয়ম্।

তৈলাদির মূর্চ্ছা ক্রিয়া ৭ দিবসে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা দ্রব্য সমুদায় তৈলে প্রদান করিয়া পাকানন্তর ৭ দিবস উহাতে রাখিয়া দিবে, অনন্তর ছাকিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মূর্চ্ছা ক্রিয়ার পর কলায় প্রভৃতির ক্বাথ ও তদনন্তর মাংসাদির ক্বাথ সহ স্নেহ পাক কর্ত্তব্য। ইহাদের সহিত এক এক দিবসেই পাক সম্পন্ন করা উচিত। অনন্তর দুগ্ধ সহ পাক ২ দিবসে, তৎপরে স্বরস ক্বাথের সহিত ৩ দিবসে পাক, তদনন্তর দধি, কাঁজি ও তক্র ইহাদের পাক পাঁচ পাঁচ দিবসে, তৎপরে কল্ক পাক ৭ দিবসে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উহা পাক করিয়া ৭ দিন পরে ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়। সর্ব্ব শেষে গন্ধ পাক উহা ৫ দিবসে সম্পন্ন হয়। দুগ্ধ, দধি, কাঁজি ও তক্রের সহিত পাক এক দিবসে সম্পন্ন করা ও রীতি আছে।

ক্বাথ জলের পরিমাণ।

নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েৎ তোয়ং ক্বাথ্য দ্রব্যা চ্চতুর্গুণম্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহস্তেনৈব সাধয়েৎ॥
চতুর্গুণং মৃদু দ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্।
মৃদ্বাদি ক্বাথ্য সংঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ॥
অত্যন্ত কঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্।

অনেক তৈল ঘৃতের সহিত ক্বাথ পাক করিতে হয়, সুতরাং ক্বাথ পাকের প্রণালী লিখিত হইতেছে। ক্বাথ্য দ্রব্য মৃদু হইলে চারিগুণ জলে, মধ্যবিধ অর্থাৎ নাতি মৃদু নাতি কঠিন হইলে আট গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ষোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থ, অষ্টম ও ষোড়শাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হয়। প্রস্তুত ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক।

অন্যচ্চ—
কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবৎ ভবেদষ্টগুণং পয়ঃ॥
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুর্গুণম্।

ক্বাথ প্রস্তুত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে ষোড়শ গুণ জলে, কর্ষের উর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত হইলে অষ্ট গুণ জলে এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত হইলে চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিতে হয় ও চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়।

তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা।

অনুক্ত স্থলে দ্রব্যের পরিমাণ ১২॥ সের হইলে ৬৪ সের জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। তদ্রূপ জলের পরিমাণ ৬৪ সের হইলে ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ ১২॥০ সের বুঝিতে হইবে।

অনির্দ্দিষ্ট প্রমাণানাং স্নেহানাংপ্রস্থ ইষ্যতে।
জল স্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্॥
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম্॥

স্নেহ সিদ্ধৌ দ্রবেষ্বযুক্তে সর্ব্বত্রাম্ভ শ্চতুর্গুণম্।
গন্ধদ্রব্যাণি চেচ্ছন্তি কল্কস্যার্দ্ধাংশিকানি চ॥

যেস্থলে বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকে সেস্থলে স্নেহের পরিমাণ ৪ সের বুঝিতে হইবে। জল, স্নেহ ও কল্কের পরিমাণ লিখিত না থাকিলে, কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ স্নেহ ও কল্ক পাকার্থ জলের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। স্নেহ পাক কার্য্যে দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে সকল স্থলেই চতুর্গুণ জল দ্বারা পাক বুঝিতে হইবে। তৈল পাকে গন্ধ দ্রব্যের পরিমাণ কল্ক পরিমাণের অর্দ্ধেক।

স্নেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকস্তু কথ্যতে।
তোয়াদীনা মনির্দ্দেশে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্॥
দ্রবান্তরেণ যোগেতু ক্ষীরং স্নেহসমং বিদুঃ॥

স্নেহ পাক কার্য্যে যদি দুগ্ধ ভিন্ন অপর পদার্থ না থাকে অর্থাৎ কেবল দুগ্ধের দ্বারা পাক করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে দুগ্ধের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। পাক কার্য্যে জল বা অন্য দ্রব পদার্থের নির্দ্দেশ থাকিলে দুগ্ধের পরিমাণ স্নেহের সমান লইতে হইবে।

বৃন্দ বলেন—

স্বরস, দুগ্ধ বা দধি দ্বারা পাক করিতে হইলে কেহ কেহ চতুর্গুণ জল সংযোগ করিয়া পাক করেন, তাহার তাৎপর্য্য দুগ্ধাদির গাঢ়তা হেতু সম্যক্ পরিমাণে কল্ক দ্রব্যের রস নিঃসৃত না হওয়াতে সুন্দররূপে পাক সমাধা হয় না।

পঞ্চ প্রভৃতি যত্র স্যু র্দ্রবাণি স্নেহসন্বিধৌ।
তত্রস্নেহসমান্যাহু রর্ব্বাক্‌চ স্যাচ্চতুর্গুণম্॥

স্নেহপাক কার্য্যে পাঁচ বা ততোধিক দ্রব পদার্থ থাকিলে, প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের সমান হওয়া আবশ্যক, পাঁচের ন্যূন অর্থাৎ এক হইতে চারি পর্য্যন্ত দ্রব পদার্থ থাকিলে তাহাদের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ জানিতে হইবে।

অম্বুক্বাথ রসৈ র্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠ মষ্টমম্॥

জল দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্ক দ্রব্যের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, ক্বাথ দ্বারা পাক করিতে হইলে কল্ক পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ এবং স্বরস দ্বারা পাক করিতে হইলে স্নেহের অষ্টমাংশ হওয়া আবশ্যক।

দুগ্ধ, দধি, স্বরস বা তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে স্নেহের অষ্টমাংশ কল্ক এবং কল্কের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

কেবল ক্বাথ দ্বারা স্নেহ পাক উক্ত থাকিলে ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্কও স্নেহের সহিত পাক করিতে হইবে। কল্ক ব্যতিরেকেও স্নেহ পাক হইয়া থাকে, তাদৃশ স্থলে ক্বাথ ভিন্ন অন্য দ্রব পদার্থের সহিত অর্থাৎ স্বরসাদির সহিত পাক করা যায়।

পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহ স্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কঃপ্রযুজ্যতে॥

কল্ক দ্রব্য যদি পুষ্প হয়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে। পাকার্থ জল স্নেহের চতুর্গুণ।

আদৌ কল্কঃপ্রদাতব্যো গন্ধ দ্রব্যং ততঃ পরম্।
তৈলমূর্চ্ছায়াং দাতব্যং শিহ্লকংকুঙ্কুমং নখম্॥
গন্ধ চন্দন কর্পূর মেলাবীজং লবঙ্গকম্।

এতাবতা স্থির হইল যে প্রথমতঃ তৈলের মূর্চ্ছা পাক, অনন্তর ক্বাথ পাক ও তৎপরে কল্ক পাক এবং সর্ব্বশেষে গন্ধপাক করিতে হয়। কল্ক সমষ্টির

পরিমাণ যত হইবে, গন্ধদ্রব্য সমুদায়ের মিলিত পরিমাণ তাহার অর্দ্ধেক। গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া স্নেহের দ্বিগুণ জল দ্বারা পাক শেষ করিতে হয়। নিম্নলিখিত কতকগুলি গন্ধদ্রব্য স্নেহের সহিত পাক না করিয়া নামাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। ঐ সমুদায় দ্রব্য যথা—শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, ছোটএলাইচ ও লবঙ্গ।

গন্ধ দ্রব্য।

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, শঠী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কর্পূব, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গ ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য কহে।

বিশেষ সাবধানতার সহিত স্নেহ পাক সমাধা করিতে হয়, কারণ পাকের মৃদু, মধ্য ও খরতা অনুসারে গুণেরও পার্থক্য সংঘটিত হয়। কল্ক অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির ন্যায় হয়, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে চটপট্ শব্দ হয় না, তখন জানিতে হইবে যে, স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে। যখন তৈলে ফেনোদ্গম ও ঘৃতে ফেন নিবৃত্তি হয় এবং উপযুক্ত বর্ণ, গন্ধ ও রসের উৎপত্তি হয়, তখন জানিবে পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে। কল্কদ্রব্য ঈষৎ সরস থাকিলে মৃদু, কোমল অথচ নীরস হইলে মধ্য এবং ঈষৎ কঠিন হইলে তাহাকে খরপাক বলা যায়। ইহারও অতিরিক্ত হইলে তাহাকে দগ্ধপাক কহে, তাদৃশ স্নেহ কার্য্যোপযোগী নহে। পরন্তু খরপাক স্নেহকে বস্ত্বন্তর বা ক্রিয়ান্তর দ্বারা দৃশ্যতঃ স্বাভাবিকের ন্যায় করিয়াও ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে।

নস্যার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে মৃদু পাক ও অভ্যঙ্গার্থে খরপাক স্নেহই প্রশস্ত। মধ্যপাক স্নেহ সর্ব্ব কার্য্যোপযোগী, সুতরাং স্নেহের মধ্যপাকই উৎকৃষ্ট ও বিধেয়। ঘৃত, তৈল ও গুড় প্রভৃতির পাক এক দিবসে সম্পন্ন করা উচিত নহে, কারণ উষিত (বাসি) পাক বিশেষ ফলদায়ক।

কাল।

(ঋতুচর্য্যা) পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আদান দুর্ব্বলে দেহে পক্তা ভবতি দুর্ব্বলঃ।
স বর্ষাস্বনিলাদীনাং * দূষণৈর্বাধ্যতে পুনঃ॥
ভূবাষ্পান্মেঘনিস্যন্দাৎ পাকাদম্লাজ্জলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নিবলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ॥
তস্মাৎ সাধারণঃ সর্ব্বো বিধির্বর্ষাসু চেষ্যতে।

আদান (শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম) কালে স্বাভাবিক রৌক্ষ্য হেতু দেহ দুর্ব্বল ও তন্নিবন্ধন পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া

* গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে সন্তাপিত ভূমি হইতে বর্ষাকালে বৃষ্টিজল সংস্পর্শে একরূপ বাষ্প উত্থিত হয়। ঐ বাষ্পের স্বাভাবিক রৌক্ষ্যগুণে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হয়। অর্থাৎ বর্ষাকালে নিরন্তর বৃষ্টিপাত জন্য বায়ু তুষার মগ্ন ও সহসা শীতল হওয়াতে দৈহিক বায়ু দূষিত হয় এবং বর্ষাস্বভাবে জল সমুদায়ে একটী অম্লবিপাকরূপ গুণ উৎপন্ন হয়, ঐ জল পানে অন্যান্য বস্তু ও অম্লরসে পরিপাক হইয়া পিত্তকে প্রকুপিত করে। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত করে ও অগ্নিমান্দ্যহেতু কফ কুপিত হয়।

পড়ে। সেই দুর্ব্বল পাচকাগ্নি বর্ষাকালে দুষ্ট বায়ু কর্তৃক দূষিত হইয়া বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। এই সমস্ত কারণে পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া বায়ু প্রভৃতিকে আরও প্রকুপিত করে। এই বর্ষাকালে সেজন্য সাধারণ বিধি অর্থাৎ যে বিধি অবলম্বন করিলে জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়, দোষত্রয়ের সমতা সাধিত হয়, ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ঈদৃশী ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে।

উদমন্থং দিবা স্বপ্নমবশ্যায়ং নদীজলম্।
ব্যায়াম মাতপঞ্চৈব ব্যাবায়ঞ্চাত্র বর্জ্জয়েৎ॥

বর্ষাকালে উদমন্থ (উদক প্রধান মন্থ অর্থাৎ অত্যধিক জল মিশ্রিত শক্তু) দিবা নিদ্রা, হিম সেবন, নদীর জল, ব্যায়াম, রৌদ্র সেবন, ও মৈথুন, পরিত্যাগ করিবে।

বর্ষাকালে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত মরিচাদি সংযোগে প্রস্তুত মাংস রস, জাঙ্গল মাংস, মুগ ও দাড়িমাদি দ্বারা প্রস্তুত যূষ, পুরাতন মাধ্বীক মদ্য ও অরিষ্ট, সচল লবণ, পঞ্চ কোল চূর্ণ, দধির মাত, মেঘজল, কূপজল ও সিদ্ধ শীতল জল উপকারক। অত্যন্ত বাত বর্ষাকুল দিবসে অম্ল, লবণ ও স্নেহ সংযুক্ত, পরিশুষ্ক মধু সংযুক্ত লঘু দ্রব্য ভোজন করিবে। নিরন্তর বারি বর্ষণে ভূমি কর্দ্দমময় ও আর্দ্র থাকে এই বর্ষা ঋতুতে যান-(পাল্কি, গাড়ি, নৌকা প্রভৃতি) যোগে গমনাগমন করা কর্ত্তব্য। সতত পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধারী ও সুগন্ধ দ্রব্য সেবী হইয়া বাষ্প, জলকণা ও শীত-শূন্য হর্ম্যমধ্যে বাস করিবে। আমাদের দেশে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণের পক্ষে উল্লিখিত নিয়ম প্রতি পালন সুকর নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ লোক আর্দ্র ভূমিতেই অবস্থান করে। ঐ সমুদয় মনুষ্য স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে উদাসীন হইয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং অস্মদ্দেশে অর্থ কৃচ্ছ্রও একটী পীড়া বাহুল্যের কারণ।

আমাদের মতে যাহারা অসঙ্গতিপ্রযুক্ত আর্দ্রস্থানে বাস করেন, তাহারা বংশমঞ্চ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে পারেন। বর্ষাকালে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সর্পভয় উপস্থিত হয়। ঐরূপ মঞ্চ প্রস্তুত করিলে ঐ ভয় হইতেও অনেকটা অব্যাহত থাকিতে পারা যায়। বাসস্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালী (জল সরিবার নালা) সমুদায় পরিষ্কৃত রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। নচেৎ বৃষ্টিজল ভূমিতে বসিয়া নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে। শ্রমজীবী মনুষ্যদিগের প্রায়শঃই বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া কার্য্য করিতে হয় ও হস্ত পদ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, ঐ সমুদায় লোকের সন্ধ্যার পর কার্য্য হইতে অবসর পাইলে, হস্ত পদ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে সর্ষপতৈল মর্দ্দন কর্ত্তব্য। এই সময়ে অল্প অল্প ভিজা কাপড় ও ভিজা জুতা ব্যবহার করা বড়ই অনিষ্টজনক, সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন অতীব অবিধেয়।

বর্ষা শীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মি ভিঃ।
তপ্তানা মাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরদি কুপ্যতি॥
তত্রান্ন পানং মধুরং লঘুশীতং সতিক্তকম্।
পিত্তপ্রশমনং সেব্যং মাত্রয়া সুপ্রকাঙ্ক্ষিতৈঃ॥

বর্ষা ও শীত ঋতুতে শরীর একরূপ ধর্ম্ম ভোগ করে,অনন্তর সহসা শরৎকালে প্রখর সূর্য্য কিরণে সঞ্চিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া উঠে। সুতরাং শরৎকালে পিত্ত প্রশমন তিক্ত দ্রব্য, লঘু, শীতল ও মধুর অন্নপান মাত্রা পূর্ব্বক সেবন হিতকর। এই ঋতুতে তিক্ত ঘৃত পান, বিরেচন ও রক্ত-মোক্ষণ, হিতকর। রৌদ্র সেবন কদাপি করিবে না এবং বসা, তৈল, হিম, ঔদক ও আনূপ মাংস, ক্ষার দ্রব্য, দধি, দিবা নিদ্রা ও পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন অহিতকর।

শরৎ কালে নদী সরোবর প্রভৃতির জল দিবসে সূর্য্য কিরণে সন্তপ্ত ও রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মি দ্বারা সুশীতল ও নির্ম্মল হয়। বর্ষাকালে নানাবিধ বিষাক্ত ও পূতি দ্রব্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে দোষ উৎপাদন করে, শবৎকালে চন্দ্র সূর্য্য কিরণে ঐ দোষ দূরীকৃত হয়, সুতরাং শারদীয় নির্ম্মল জল, স্নান, অবগাহন ও পান বিষয়ে অমৃত সদৃশ ফলদায়ক হয়। শরৎকালে শারদীয় পুষ্প মাল্য ও শুভ্র বস্ত্র পরিধান বিধেয়। সন্ধ্যা কালীন চন্দ্রকিরণ মনুষ্যাদিগের অতীব আহ্লাদ জনক ও হিতকর। আহার বিহার বিষয়ে শরৎ একটী শ্রেষ্ঠ ঋতু এই জন্য কবিগণ শরৎ বসন্তের পক্ষপাতী। বাস্তবিকই শরৎকালটী মনুষ্যগণের সুখ-জনক।

নাড়ী পরীক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গুল্মেন কম্পোঽথ পরাক্রমেণ
পারাবতস্যেব গতিং করোতি।

গুল্মরোগে নাড়ী কম্পিত হইয়া বল সহকারে পারাবতের ন্যায় গমন করে।

ব্রণেঽতি কঠিনে দেহে প্রয়াতি পিত্তকং ক্রমম্।
ভগন্দরাসুরূপেণ নাড়ীব্রণনিবেদনে॥
প্রয়াতি বাতিকং রূপং নাড়ী পাবকরূপিণী।

ব্রণরোগের অপক্কাবস্থায় নাড়ীর গতি পৈত্তিক নাড়ীর ন্যায় হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ রোগে উহা বাতিক নাড়ীর ন্যায় গতিবিশিষ্ট ও অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে।

বান্তস্য শল্যাভিহতস্য জন্তো-
র্বেগাববোধাকুলিতস্য ভূয়ঃ।
গতির্বিধত্তে ধমনী গজেন্দ্র-
মরাল মালেব কফোল্বণা চ॥

বমিত, শল্যাভিহত ও বেগরোধী ব্যক্তির নাড়ী ও কফোল্বণা নাড়ী হস্তী ও হংসাদির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়।

দোষ সাম্যাচ্চ সাদৃশ্যা দমুক্তাস্বু রুজাস্বপি।
জ্ঞাতব্যা ধমনীধর্ম্মা যুক্তিভি শ্চানুমানতঃ॥

যে কয়েকটী রোগে নাড়ীর প্রকৃতি লিখিত লইল, তদ্ভিন্ন ব্যাধি সমস্তে নাড়ীর প্রকৃতি কিরূপ হয়, তাহা অনুমান ও যুক্তি দ্বারা বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। যে রোগের সহিত যে রোগের সাদৃশ্য অথবা যে রোগে প্রকুপিত দোষ সকলের সহিত অপর কোন রোগের প্রকুপিত দোষ সকলের সাদৃশ্য থাকে, তত্তৎরোগ সমস্তে নাড়ীর গতি একরূপ হইয়া থাকে।

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ী গরিষ্ঠতা।

আনাহ (মলমূত্রের আবদ্ধতা) ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে নাড়ী গুরুতর হয়।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্লবেন.
সদাতিবক্রা হি শিবা বহন্তী।
জ্বালাময়ী পিত্ত বিচেষ্টিতেন
সামেন শূলেন চ পুষ্টিরূপা॥

বাতজনিত শূলরোগে বায়ুর প্রখরতা বশতঃ নাড়ী সর্ব্বদা অতিশয় বক্র হইয়া গমন করিতে থাকে। পৈত্তিক শূলে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ এবং আমশূলে পুষ্টি-যুক্ত হয়।

প্রমেহে গ্রন্থিরূপাচ সুতপ্তা চামদূষিতা।

প্রমেহ রোগে নাড়ী গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ নাড়ীতে গাইট গাইট বোধ হয়। উহাতে আমদোষ বিদ্যমান থাকিলে, নাড়ী সর্ব্বদা উষ্ণ বলিয়া প্রতীত হয়।

উৎপিৎস্বরূপা বিষারিষ্ট কালে,
বিষ্টম্ভ গুল্মেন চ বক্ররূপা।
অত্যর্থ বাতেন অধঃস্ফুরন্তী
উত্তানভেদিন্য সমাপ্তিকালে॥

বিষভক্ষণ বা সর্পাদি দংশন জন্য অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তৎকালে নাড়ী দেখিলে বোধ হয় যেন উহা নূতন উৎপন্ন হইতেছে। বিষ্টম্ভ ও গুল্ম-রোগেও নাড়ী ঐরূপ, অধিকন্তু বক্র হইয়া থাকে। এই পীড়াদ্বয়ে অতিশয় বায়ুর প্রকোপ থাকিলে, নাড়ী অধো-দিকে স্ফুরিত হয় এবং ইহাদের অসং পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ পূর্ব্বরূপ কালে নাড়ী অতিশয় ঊর্দ্ধগতি হয়।

ভৈষজ্যতত্ত্ব।

মূলতানি হিং, মুসব্বর, রেউচিনি, কাবাবচিনি প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃত-কুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া মস্যুর কলায়ের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ১টী উষ্ণ জলসহ সেবন করিবে। ইহাতে ক্রিমি ও তদানুষঙ্গিক অজীর্ণ, উদরাধ্মান ও তরল ভেদ নিবৃত্ত হয়। ইহার অমোঘ ফল অনেকস্থলে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

প্রস্তরপাত্রে স্তন্যদুগ্ধে হরিতকী ঘসিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে অঞ্জন দিবে এবং প্রাতে ১।২ বার পানের রসে বটের কচি পাতা (কুঁড়ি) বাটিয়া চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে প্রলেপ দিবে। ৬।৭ দিন এইরূপ করিলে রাত্র্যন্ধতা (রাতকানা) নিশ্চয় আরোগ্য হয়।



হিঙ্গু।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদও অন্যান্য প্রণা-লীর চিকিৎসায় হিঙ্গু সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, সুতরাং হিঙ্গুর বিষয় আজ কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

হিঙ্গু উর্দ্ধ প্রদর্শিত আকৃতিমান্‌বৃক্ষের নির্যাস। সজীব বৃক্ষের মূলে আঘাত করিলে যজ্ঞডুমুর ও বট প্রভৃতির ন্যায় নির্যাস নির্গত হয়, কিন্তু ইহা আঁটা নহে। আফগানিস্থান ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

সচরাচর হিঙ্গুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ও বৃহৎ খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশই পাটলবর্ণ, ইহার পিণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলে মধ্যে শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কালে উহা পাটলবর্ণ হইয়া যায়।

সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এইগুলি হিঙ্গুর পর্য্যায় বা অপর নাম।

গুণ—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃ-প্রবর্ত্তক। হিঙ্গু সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ (মুদো) ও ক্রিমি নষ্ট হয়। মাত্রা ৪ রতি।

হিঙ্গুর আস্বাদ তিক্ত ও রুক্ষ, হিঙ্গু দুর্গন্ধযুক্ত, সেবন করিলে মল মূত্রাদিতেও দুর্গন্ধ হয়। অগ্নি সন্তাপে ইহা দ্রব হয় না কিঞ্চিৎ কোমল হয় মাত্র। মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি পরিস্কৃত সুরাতে ইহাকে দ্রব করা যায়। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ২।১ রতি হিঙ্গু জলসহ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মহীলতার ন্যায় ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

হিঙ্গুর অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে হিঙ্গু ৵০ ছটাক পরিস্কৃত সুরা মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিবে, ১ সপ্তাহ এইরূপে রাখিয়া ছাকিয়া লইবে ও আবশ্যকমত সুরা সংযোগ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১০।১৫ রতি। ইহাতে রজোরোধ, ক্রিমি, অগ্নি মান্দ্য, অজীর্ণ ও শূল প্রভৃতি অনেক পীড়া প্রতিকৃত হয়।

ঔষধে ব্যবহারের পূর্ব্বে হিঙ্গু গব্য ঘৃতে ভাজিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়, এইরূপ শোধিত হিঙ্গুই সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।

ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। উত্তমরূপ চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। ৪ রতি হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত ইহার মাত্রা। ভোজনকালে প্রথমেই ঘৃত মিশ্রিত অন্নসহ সেবনে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ভানুদাস বলেন—অন্নের উপরিভাগে এই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য। আধুনিক প্রণালীতে ২।১ বার তরল ভেদের পরও যদি উদরে মল সঞ্চয় অনুমান হয় এবং পেটফাঁপা অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমাশয়াদিরোগে এক বা দেড় আনা চূর্ণ উষ্ণ জলসহ প্রদান করা হয়, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ সুফল হইতে দেখা যায়।



দারু চিনি।

দারু চিনি যৌগিক নাম। দারু অর্থাৎ কাষ্ঠের বল্কলে চিনির ন্যায় মিষ্টত্ব আছে বলিয়া ইহার নাম দারুচিনি হইয়াছে। ইহা সিংহল দ্বীপ ও চীন প্রভৃতি দেশে জন্মে, ইহার আকৃতি উপরি ভাগে প্রদর্শিত হইল। স্বাদুত্বক্‌, গুড়-ত্বক্‌ ও দারু সিতা এই গুলি দারু চিনির নাম। দারু চিনি স্বাদু, তিক্ত, সুগন্ধি, শুক্র জনক ও শরীরের উৎকৃষ্ট বর্ণ সাধক। দারু চিনি আগ্নেয়, উত্তেজক, বায়ু নাশক ও ঈষৎ সংকোচক, কেহ কেহ ইহাকে জরায়ু সংকোচকও বলেন। অধিক রজঃ-স্রাব রোগে ইহার তৈল বিবেচনা মত ১ হইতে ৪ বিন্দু পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইলে এই তৈলের ১৷২ বিন্দু ঐ স্থানে প্রদান করিলে আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়।

চিকিৎসা বিষয়ক হিতোপদেশ।

আজ প্রসঙ্গক্রমে চিকিৎসকের অবশ্য চিন্তনীয় কয়েকটী সদুপদেশ চরক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মহর্ষির এই সদুপ-দেশগুলি স্মরণ করিলে যে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত সুফল লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক চিকিৎসক চিরকাল চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন, জ্বর উপস্থিত হইলেই স্নান আহার বন্ধ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু কেন করিতেছেন, কোন্‌ প্রমাণ অনুসারে করিতেছেন, জ্বরাদি প্রচলিত পীড়া ব্যতীত কোন একটী নূতন পীড়া উপস্থিত হইলেই বা কি উপায় অবলম্বন করিবেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অক্ষম। আমরা অনেকস্থলে ইহা প্রত্যক্ষ করি-য়াছি। একদিন কোন একটী প্রাচীন চিকিৎসকের সহিত আমার কিছুক্ষণ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আলাপ হয়, তিনি একজন মান্য গণ্য চিকিৎসক। কিন্তু অবশেষে তিনি বলিলেন বাপু! এখন চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি নানারূপ পুস্তকের নাম শুনিতেছি, আমাদের সময়ে উহা কিছুই ছিলনা, তোমার চরকে কি বিষয় লেখা আছে বাপু! আমি তাহাকে যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এই সমস্ত লোক যে সদুপদেশ লাভ করিয়াছেন, সেজন্য আজ চরক সুশ্রুতের নাম না শুনিয়াও চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। চিকিৎসা বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসক অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ আধু-নিক চিকিৎসকগণ পূর্ব্বের ন্যায় গুরুর

উপদেশ লাভ করেন না। পল্লব গ্রাহীর ন্যায় কতক গুলি পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতবিদ্য মনে করেন, বস্তুতঃ অভিজ্ঞতা লাভ ক জনার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি আবার অনুবাদ দেখিলেই বিরক্ত হইয়া উঠেন, আমরা কিন্তু তাঁহাদের মত সমর্থন করিতে পারিলাম না। যখন সংস্কৃত আমাদের মাতৃ ভাষা ছিল, ছোট বড় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিত ও অনায়াসে বুঝিত, সেই সময়েই সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়াছে। সাধারণের বোধের জন্যই বৈদিক ভাষায় না লিখিয়া সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। আমারা সেই জন্য বলি; এখন আমরা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, সুতরাং সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারে দোষ কি? কালীদাসের সাহিত্য নয় যে, রসভঙ্গ হইবে। ভাষা যাহাই কেন হউক না, আমাদের পদার্থ লইয়া বিষয়, পরন্তু অনুবাদ করিলে পদার্থের কোন দোষই ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায়না। অনেকে ভাবেন সাধারণে বুঝিতে পারিলে গৌরব থাকিবেনা। ইহাও কি সম্ভবে?

দেখিতে গেলে অনুবাদের অভাবে সাধারণের অনবগতিও একটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবনতির অন্যতম কারণ। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব যে, কত কত মহামূল্য উপদেশ রত্ন আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ অকিঞ্চিৎকরবৎ পড়িয়াছিল। এখন প্রকৃত অনুসরণ করা যাউক।

দোষ দূষ্য নিদানানাং বিপরীতং হিতং ধ্রুবম্।
উক্তানুক্তান্ গদান্ সর্ব্বান্ সম্যগ্ যুক্তং নিযচ্ছতি॥

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—চিকিৎসিত স্থান প্রভৃতিতে যে সমুদায় রোগ বলা হইয়াছে ও হয় নাই, সমস্ত রোগেই দোষ দূষ্য ও নিদানের বিপরীত ঔষধ সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই ব্যাধির বিনাশ হয়।

বসন্তে শ্লেষ্মজা রোগাঃ শরৎকালেষু পিত্তজাঃ।
বর্ষাসু বাতজাশ্চৈব প্রায়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি॥
নিশাদৌ দিবসান্তে চ বর্ষান্তে বাতজা গদাঃ।
প্রাতঃক্ষপাদৌ কফজা স্তযোর্মধ্যে তু পিত্তজাঃ॥
জীর্ণান্তে বাতজা রোগা জীর্য্যমাণে তু পিত্তজাঃ।
শ্লেষ্মজা ভুক্তমাত্রে তু লভন্তে প্রায়শো বলম্॥

শ্লেষ্মজ রোগ বসন্তকালে, পিত্তজ শরৎকালে এবং বায়ুজনিত রোগ বর্ষাকালে প্রায়শঃই উৎপন্ন হয়। রাত্রির প্রথমভাগে, দিবসের শেষভাগে ও বর্ষান্তে ঐরূপ বায়ুজনিত রোগ, রাত্রিশেষে শ্লৈষ্মিক রোগ ও রাত্রির মধ্যভাগে এবং দিবসের মধ্যভাগে পৈত্তিক রোগ প্রাদুর্ভূত হয়। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে বায়ুজনিত রোগ, জীর্ণ হইতেছে এরূপ সময়ে পিত্তজনিত রোগ এবং ভোজন করিবামাত্র শ্লেষ্মজ রোগ বললাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়।

নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাপোঽল্পা মহানলম্।
দোষবচ্চাতি মাত্রং স্যাৎ শস্যস্যাত্যুদকং যথা॥
সম্প্রধার্য্য বলং তস্মাদাময়স্যৌষধস্য চ।
নৈবাতি বহুলাত্যল্পং ভৈষজ্যমবতারয়েৎ॥

যেরূপ অল্প জল দ্বারা বহু অগ্নি নির্ব্বাণ করা যায় না, সেইরূপ ঔষধের মাত্রাও অল্প হইলে ব্যাধি বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু পীড়া বৃদ্ধিই হয়। আবার যেমন অধিক জল শস্যের অনিষ্টকর, সেইরূপ অধিকমাত্রায় ঔষধও বিশেষ অনিষ্টজনক, সুতরাং রোগের ও ঔষধের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

নিবৃত্তোঽপি পুনর্ব্যাধিঃ স্বল্পেনায়াতি হেতুনা।
ক্ষীণে মার্গীকৃতে দেহে শেষঃসূক্ষ্ম ইবানলঃ॥
তস্মাত্তমনুবধ্নীয়াৎ প্রয়োগেনানপায়িনা।

ব্যাধিকর্ত্তৃক দেহক্ষীণ হইলে অতি সামান্য কারণে পুনরায় রোগোৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা, সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত দেহ বলিষ্ঠ না হয়, ততদিন ঔষধ সেবন ও পথ্যাদি সেবন কোনক্রমেই ত্যাগ করা সঙ্গত নহে, কিন্তু এরূপ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রদান করিতে হইবে, যেন ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট না ঘটে।

ঔচিত্যাদ্যস্য যৎ সাত্ম্যং দেশস্য পুরুষস্য চ।
অপথ্যমপি নৈকান্তাত্তৎ ত্যজন্‌ লভতে সুখম্‌॥

যে বস্তু যাহার বা যে দেশের নিতান্ত অভ্যস্ত, তাহা একেবারে ত্যাগ করা বিধেয় নহে। একান্ত অভ্যাসবশতঃ ঐ সাত্ম্যবস্তু ত্যাগ করিলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ঘটিয়া থাকে।

সাত্ম্যাসাত্ম্য বিচার করিয়া কার্য্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্য চরক কতক গুলি দেশ সাত্ম্য নির্দ্দিষ্টও করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

মাংস, গোধূম, মাধ্বীক, শস্ত্র ও বৈশ্বানর প্রভৃতি বাহ্লীক, পহ্লব, চীন, শূলী, যবন ও শক দেশ বাসীদিগের সাত্ম্য পদার্থ। পূর্ব্ব দেশ বাসীরা দুগ্ধ সাত্ম্য। সিন্ধু প্রদেশীয় লোক মৎস্য-সাত্ম্য। অশ্মক ও আবর্ত্তক বাসীগণ তৈল ও ঘৃত সাত্ম্য। মলয় পর্ব্বত বাসীরা স্কন্দ, মূল ও ফলসাত্ম্য। দক্ষিণ দেশবাসীরা পেয়াসাত্ম্য। উত্তর পশ্চিম দেশবাসীরা মন্থ-সাত্ম্য। মধ্য দেশবাসীরা বিশেষরূপ যব, গোদুগ্ধ, ও গোদুগ্ধ সাত্ম্য। যে দেশের যাহা সাত্ম্য সেই দ্রব্য দ্বারা তাহার পথ্য বিধান করা সঙ্গত, কারণ ঐ সমস্ত সাত্ম্য পদার্থই তাহাদের বল কর হয়। মাত্রা অধিক হইলেও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে না। চিকিৎসক এজন্য দেশ কাল ও সাত্ম্যের বিষয় সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত না হইলে কেবল ঔষধ দ্বারা সুফল লাভ করিতে পারেন না।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান

এবং

সমীরণ।

১ম খণ্ড। } সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। { ১১শ সংখ্যা।

৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিত কবিতা।

গান।

প্রভাত হয়েছে নিশি,
আসি ভাই!
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইবনা পথ-হারা,
ওই জ্বলে শুক তারা!
দূর—অতিদূর বাশরী শুনিতে পাই।
কল্পনা-ললনা-বুকে
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই।
আসি হে জগতবাসী,
ভালবাস, ভালবাসি!
চারি দিকে হাসি রাশি, এমন সুদিন নাই।

গান।

ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে, (আমার)
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে
তবু যেন চারি পাশে
সদাই সৌরভ ভাসে,
সুদূরে সংগীত ধ্বনি; কেন গো কে জানে।
ঘুমঘোরে ভুলি ভুলি
স্বপনে এনেছি তুলি
এ মায়া কুসুমদাম করুণ নয়ানে—
হের দেবী করুণ নয়ানে!

মহাভারত।

মহাভারত অতি বিস্তৃত সমুদ্র সদৃশ প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক কাব্য। এরূপ বহু বিস্তীর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন ভাষায় রচিত হয় নাই, এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। কাব্যাংশেও এই গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইহা লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট। তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে কুরুপাণ্ডবীয় ইতিহাস বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৭৬ সহস্র শ্লোক "দেশ, নদী, পর্ব্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, নগর ও পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রাদি বর্ণন; দুর্গ, ব্যূহ, সেনা রচনাদি যুদ্ধ কৌশল; ধর্ম্ম রহস্য, কামরহস্য ও বেদ চতুষ্টয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব কীর্ত্তন; যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, মোক্ষধর্ম্ম, আপদধর্ম্ম, রাজনীতি, আত্মতত্ত্ব নিরূপণ, উপনিষদাদির ব্যাখ্যা, চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম ও আচারাদি কথন; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও কালত্রয় নিরূপণ প্রভৃতি সংসারযাত্রা বিধায়ক নানা শাস্ত্র; বিবিধ শ্রুতি, ইতিহাস ও পৌরাণিক উপাখ্যান কথন ও অখিল সংসার পরিব্যাপক পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তনে" পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই, হিন্দুর জ্ঞাতব্য এমন বিষয় অতি অল্পই আছে; এই নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে এই ভারতে যাহা কথিত হইয়াছে অন্যত্র তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিষয় ইহাতে কীর্ত্তিত হয় নাই, অন্য কোন স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এই ইতিহাসরূপ প্রদীপ, মোহরূপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া অখিলভুবনরূপ গৃহ আলোকিত করিয়াছে। যেরূপ পঞ্চভূত হইতে লোকত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ ভারতেতিহাস হইতে কবিত্ব বুদ্ধি জন্মে" (১)। এই গ্রন্থ ভারত সংহিতা নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম "জয়"। যথা—

"জয়োনামেতিহাসোহয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।"
ম, ভা, ৬২ অধ্যায়।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই ঐতিহাসিক মহাকাব্যের রচয়িতা। ইঁহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে ইঁহার জন্ম হয় বলিয়া ইঁহাকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলে। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের বলে সনাতন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ইনি বেদব্যাস (ব্যাস=বিভাগকর্ত্তা) এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। পরাশরের পুত্র বলিয়া ইনি "পারাশর্য্য" নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সত্যবতী নাম্নী কোন ধীবর-পালিতা কন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। সত্যবতীর কন্যকাবস্থা কালে ব্যাসদেব জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে কন্যকাবস্থায় জাত পুত্রকে কানীনপুত্র বলে।

বেদব্যাসের ন্যায় অতিমানুষী ধারণাশক্তি ও সর্ব্বগ্রাহিণী প্রতিভা লইয়া আর কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে

(১) উদ্ধৃত চিহ্নান্তর্গত বাক্যগুলি মহাভারত (রাজবাটীর বঙ্গবাসী সংস্করণ) হইতে গৃহীত হইল।

জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্নতা হেতু ইনি মহাভারত (শান্তি ৩৪৯ অঃ) হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বেদান্তদর্শন নামক সুপ্রসিদ্ধ মহামূল্য গ্রন্থের ইনিই প্রণেতা। অষ্টাদশ পুরাণ ইঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই "সত্যবতী তনয় পারাশর্য্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস" কুরু পাণ্ডবগণের বিচরণ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী এক ভারত সংহিতা রচনা করেন (ক)। তখন ইহাতে উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত ছিল। পরে মূল ঘটনাকে বিশদ করিবার জন্য ও গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনার্থ নানাবিধ উপাখ্যানাদি রচনা করত ইহাতে সংযোজিত করিয়া ইহাকে লক্ষ শ্লোকযুক্ত করেন। এই লক্ষ শ্লোক রচনা করিবার জন্য ব্যাসদেবকে তিন বৎসরকাল সতত উদ্যোগী হইয়া খাটিতে হইয়াছিল (২)। বস্তুতঃ এক লক্ষ শ্লোক রচনা করা দু চার দিনের কাজ নয়।

এই গেল বৈশম্পায়নের মত। এতৎ সম্বন্ধে লোমহর্ষণতনয় পৌরাণিক সৌতি (ক) বলেন,—"গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে বেদব্যাস উহার লিখনকার্য্য সমাধা করিবার জন্য উপযুক্ত লেখকের অভাব বোধ করায় সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপদেশানুসারে গণনায়ক গজাননদেবকে তাঁহার মনঃসংকল্পিত মহাভারতের লেখকতাকার্য্যে বরণ করিলেন। গণেশ তহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "আমার লেখনী যদি ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে, তবে আমি এই গ্রন্থের লেখক হইতে পারি"। ব্যাস কহিলেন "আপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না"। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও ব্যাসদেব মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত নূতন শ্লোক রচনার্থ অবকাশ লইবার জন্য ব্যাসদেব স্থানে স্থানে এরূপ কূটার্থপূর্ণ জটিল ও দুর্জ্জেয় শ্লোক সমূহ রচনা করিতেন যে, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও গণেশকে অর্থবোধের নিমিত্ত চক্ষু মুদিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিতে হইত; সেই অবকাশে ব্যাসদেব

(ক) ব্যাসদেব প্রথমতঃ ২৪ সহস্র শ্লোকময়ী যে ভারতসংহিতা রচনা করেন, উহা অষ্টাদশ পর্ব্বযুক্ত ছিল বোধ হয় না। কারণ, সৌতি বলেন যে ২৪ সহস্র শ্লোকযুক্ত ভারতাখ্যান রচনার পর ব্যাসদেব উহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া ১৫০ শ্লোকে এক অনুক্রমণিকা রচনা করেন। এখন এই অনুক্রমণিকায় স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসনাদি শেষের আটটি পর্ব্বের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌতি প্রথম অধ্যায়ে নৈমিষারণ্যীয় মুনিগণের নিকট মহাভারতকে বৃক্ষরূপে বর্ণনকালে মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণিক পর্ব্বের উল্লেখ করেন নাই। তথাচ স্বর্গারোহণিক পর্ব্বে,

ত্রিভির্ব্বর্ষৈরিদং পুণ্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতঞ্চেদং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥

৫ম অধ্যায়।

(২) আদিপর্ব্বের ৬২ অধ্যায়ে বৈশম্পায়নোক্তি —ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নোমুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্॥

(ক) জনমেজয়ের সর্পসত্রে মহাভারত শ্রবণ করিয়া আসিয়া সৌতি নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের নিকট উহা কীর্ত্তন ও তাহার পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরিচয় দান প্রসঙ্গে এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য বহুশ্লোক রচনা করিতেন।' ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, অত্যল্পকালের মধ্যে সমগ্র মহাভারত রচিত ও লিখিত হইয়াছিল, সৌতিপ্রোক্ত এই বিবরণ নিতান্ত অনৈসর্গিক ও পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈশম্পায়নোক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

সৌতি আরও বলেন,—"চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ভারত সংহিতা রচনার পর ব্যাসদেব ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারত সংহিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে ও লক্ষ শ্লোক মনুষ্যলোকে প্রচারিত হয়।" এই কথার সমর্থন করিতে পারে এরূপ কোন ব্যাসোক্তি বা বৈশম্পায়নোক্তি এ পর্য্যন্ত মহাভারতে আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। এই গ্রন্থের "মহাভারত" এইরূপ নাম করণের কারণ কি? ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন বলেন,—"ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে কীর্ত্তিত আছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ অবগত আছেন, তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংশ হয়, যেহেতু ইহাতে ভরতকূলের মহাদ্ভুত ইতিহাস বর্ণিত আছে।" (আদি ৬২ অঃ) কিন্তু সৌতি বলেন,—"পূর্ব্বকালে দেবগণ মিলিত হইয়া তুলাদণ্ডের একদিকে চারি বেদ ও অপরদিকে এই ভারত রাখিয়া পরিমাণ করায় সরহস্য চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা ভারতই গুরুতর হইল। এই নিমিত্ত লোকে ইহাকে "মহাভারত" বলে। মহত্ত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহা মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের এই যথার্থ অর্থ অবগত আছেন, তিনি সর্ব্ব-পাপ বিমুক্ত।" (আদি ১ম অধ্যায়ের উপসংহার)। এখানে বলা আবশ্যক যে, পৌরাণিক সৌতির উক্তি অপেক্ষা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের কথার মূল্য অনেক বেশী।

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের স্থানে স্থানে যে সকল অতি দুর্ব্বিগাহ অর্থ-পূর্ণ জটিল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে "ব্যাসকূট" বলে। মহাভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮ হাজার ৮ শত ব্যাসকূট আছে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ ২।৩ কূটশ্লোক উদ্ধৃত হইল।

অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
কেশশূলাস্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥
বনপর্ব্ব ১৮৮ অঃ

এখানে "অট্ট' অর্থে অন্ন, "শিব" অর্থে বেদ, 'চতুষ্পথ' অর্থে ব্রাহ্মণ ও 'কেশশূলা' অর্থে রূপব্যবসায়িনী, গ্রহণ করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিতে হইবে, যথা,—হে রাজন্! যুগক্ষয়কালে জনপদ সকল অন্নাভাবে আর্ত্ত, ব্রাহ্মণগণ বেদ-শূন্য ও নারীগণ রূপব্যবসায়িনী হইবে।

নদীজ! লঙ্কেশবনারিকেতু-
র্নগাহ্বয়ো নাম নগারিসূনুঃ।
এষোহঙ্গনাবেশধরঃ কিরীটী
জিত্বাহব যংনেষ্যতি চাদ্য গা বঃ॥
বিরাটপর্ব্ব ৩৯ অঃ।

এই শ্লোকের শেষ চরণটীই জটিল। উহার অন্বয় এইরূপ হইবে, যথা,—"যং দুর্য্যোধনং জিত্বা কিরীটী অদ্য বঃ যুষ্মাকং গাঃ নেষ্যতি তং অব।" দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মকে বলিতেছেন,—হে নদীজ! (গঙ্গানন্দন) লঙ্কেশবনারিকেতু (কপিধ্বজ) নগাহ্বয় (বৃক্ষ নামে খ্যাত অর্জ্জুন)

নগারিস্থমু (ইন্দ্রনন্দন) অঙ্গনাবেশধারী কিরীটী যে দুর্য্যোধনকে জয় করিয়া অদ্য তোমাদের গো সমূহ লইয়া যাইবে, তাহাকে রক্ষা কর।

এই শ্লোকের অনুবাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের বঙ্গবাসী সংস্করণে দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় (C. I. E.) মহাশয় বলেন, এই শ্লোকটি মহাভারতের সকল পুঁথিতে দৃষ্ট হয় না। বোম্বাই সংস্করণে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। আর একটি শ্লোক এই,—

গোকর্ণা সুমুখীকৃতেন ইষুণা গোপুত্র সংপ্রেষিতা
গোশব্দাত্মজ ভূষণং সুবিহিতং সুব্যক্ত গোসুপ্রভং।
দৃষ্টা গোগতকং জহাব মুকুটং গোশব্দ গোপূবি বৈ
গোকর্ণাসনমর্দ্দনশ্চ ন যযাবপ্রাপ্য মৃত্যোর্বশং॥

কর্ণ ৯০ অ° ৪২ শ্লোক।

এই শ্লোকের অর্থ অতিশয বিকট ও দুরবগাহ। বোধ হয় স্বয়ং গজাননকে ইহার অর্থ আবিষ্কারের জন্য বহুক্ষণ মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে হইয়াছিল। ইহার মর্ম্ম এই যে, অর্জ্জুন বধের জন্য কর্ণ যে বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অর্জ্জুনের কিরীট মাত্র হরণ করিল—তাঁহার প্রাণনাশে সমর্থ হইল না (৩)। এই সমস্ত কূট শ্লোক মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্ধর অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহাভারত কাব্য, না ইতিহাস? গ্রন্থকার বেদব্যাস মহাভারতকে কাব্য নামেই পরিচিত করিয়াছেন। বেদব্যাস ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—হে ভগবন্! আমি এইরূপ এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি, ("কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতং") যাহাতে বেদের রহস্য, ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য বিবিধ আবশ্যকীয় বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।" কিন্তু সৌতি ও বৈশম্পায়ন ইহাকে পুনঃ পুনঃ ইতিহাস নামেই অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের উক্তি অপেক্ষা ব্যাসদেবের নিজের উক্তিই সমধিক প্রামাণিক। "এই কাব্যে পুরাণ ও ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে," (ইতিহাস পুরাণানাং উন্মেষং নির্ম্মিতং চ যৎ।" মহর্ষির এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা প্রবন্ধারম্ভে মহাভারতকে "ঐতিহাসিক মহাকাব্য" আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

মহাভারত শতসহস্র শ্লোক বিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই "শতসহস্র শ্লোক" অর্থে কি, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের এক লক্ষ কবিতা? না—৩২ অক্ষরে এক শ্লোক, এই হিসাবে এই গ্রন্থ লক্ষশ্লোক অর্থাৎ ৩২ লক্ষ অক্ষর বিশিষ্ট, বুঝিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় রূপে নির্দ্ধারণ

(৩) গোকর্ণা=সর্পিণী; গোপুত্রসংপ্রেষিতা=সূর্য্যপুত্র কর্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত; সুমুখীকৃতেন ইষুণা=সুতীক্ষ্ণকৃত বাণের দ্বারা; দৃষ্টা গোগতকং=অর্জ্জুনকে অশ্বরশ্মিস্থানে অবনতমস্তক দেখিয়া; মুকুটং জহার=অর্জ্জুনের মুকুট হরণ করিল। কীদৃশ মুকুট? গোশব্দাত্মজ ভূষণং=অদিতি (গো=অদিতি) নন্দন ইন্দ্রের ভূষণস্বরূপ; সুবিহিতং=সুনির্ম্মিত; সুব্যক্ত গো সুপ্রভং=উদ্ভাসমান সূর্য্যের ন্যায় প্রভান্বিত। গোশব্দগোপূবি=স্বকীয় প্রভাদ্বারা দিকসমূহ উজ্জ্বলকারী। গোকর্ণাসনমর্দ্দনঃ=গোকর্ণ শৈলনিবাসী নিবাত কবচাদি দৈত্য নিধনকারী অর্জ্জুন; অপ্রাপ্য=সর্পিণীর সংসর্গ না পাইয়া মৃত্যোর্বশং ন যযৌ=মৃত্যুর বশীভূত হইলেন না।

করা যায় না। আদি পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৌতি কর্ত্তৃক প্রতি পর্ব্বের যে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইয়াছে, তাহার সমষ্টি ৮৪৮৩৬ এর অধিক হয় না। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত লক্ষ শ্লোক অর্থে ৩২ লক্ষ অক্ষর হওয়া সম্ভব। সে যাহা হউক, এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মহাভারত "শ্লোকময়" বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও উহার স্থানে স্থানে গদ্যময় রচনার নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয় না।

মহাভারত ১৮ ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক ভাগকে পর্ব্ব বলে। প্রত্যেক পর্ব্ব আবার কতকগুলি করিয়া পর্ব্বাধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক বিষয় অবলম্বনে রচিত কতকগুলি অধ্যায় লইয়া একএকটি পর্ব্বাধ্যায় হয়। কোনও কোনও পর্ব্বাধ্যায় এক অধ্যায় বিশিষ্টও দৃষ্ট হয়।

মহাভারতের সহিত ১৮ সংখ্যার অতি আশ্চর্য্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। (১ম) গ্রন্থ খানি ১৮ পর্ব্বে বিভক্ত (২য়) এই গ্রন্থে যে সর্ব্ব লোকক্ষয়কর যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাপ্তিকাল ১৮ দিবস। (৩য়) এইযুদ্ধে উভয় পক্ষে ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। (৪র্থ) এই গ্রন্থের অন্তর্গত "শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা" নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণটি ১৮ অধ্যায় সমন্বিত। (৫ম) দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর তৎ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ১৮ বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। (৬ষ্ঠ) ভারত সমরের পর মহারাজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ১৮ × ২ = ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহাভারতের অপর নাম "জয়" এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৪)। লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে, "ক" অবধি "ঞ" পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি যথাক্রমে ১,২,৩,৪,৫, ৬,৭,৮,৯,০ এই কয় সংখ্যার বাচক। সেইরূপ, "ট" অবধি "ন" পর্য্যন্ত অক্ষরগুলিও যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দশটি সংখ্যার বোধক; এবং য র ল ব প্রভৃতি বর্ণগুলির দ্বারা যথাক্রমে ১,২,৩,৪, প্রভৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতদনুসারে "জ" ও "য়" যথাক্রমে ৮ ও ১ এই দুই সংখ্যার দ্যোতক। অতএব "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই বিধান মতে "জয়" শব্দ ১৮ সংখ্যার বোধক হইতেছে। এতাবতা মহাভারতের সহিত ১৮ সংখ্যার অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে।

---

(৪) এই নিমিত্তই প্রত্যেক পর্ব্বের প্রারম্ভে

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরংচৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

এইরূপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ,— নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া "জয়" অর্থাৎ মহাভারত কীর্ত্তন করিবে।

সোমনাথ পত্তন।

কোন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, "রত্ন প্রসূতাই ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ। ঐশ্বর্য্যশালিনী, ধনরত্ন পূর্ণা বৈজয়ন্তী সমৃদ্ধিময়ী প্রাচীন জগতের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ভারত ভূমি যদি হীরকের খনি বক্ষে ধারণ না করিয়া কণ্টকাকীর্ণ রুক্ষ প্রান্তরে, বা বালুকাময় মরুভূমিতে পরিপূর্ণা হইতেন, তবে আজও হয় ত ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণাবস্থায় থাকিত।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য—সুলতান মামুদ হইতে, নাজির সাহ পর্য্যন্ত যে কেহ এই ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্যের মূলে অপর যাহা কিছু নিহিত থাকুক না কেন, লুণ্ঠনই যে তাহার মূলমন্ত্র তদ্বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

অন্যান্য বৈদেশিক আক্রমণকারীদের মধ্যে সুলতান মামুদই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অহিত সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্ত লেখকেরা—এই আক্রমণের মূলে একটা আন্তরিক ধর্ম্মানুরাগের দোহাই দিয়া গিয়াছেন। কথাটা আমরা অস্বীকার করিতে চাহি না, কিন্তু সেই ধর্ম্ম যুদ্ধের মূলে যে ঘোর পাশবতা শক্তি নিহিত ছিল তাহা স্পষ্টতই পরিদৃশ্যমান হয়।

১০০১ খৃঃ অব্দ হইতে—১০২৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এই ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে সুলতান ত্রয়োদশ বার উপর্য্যুপরি ভারতাক্রমণ করেন। ইহার প্রত্যেক বারেই অসংখ্য ধন রত্নাদি অপহৃত ও লুণ্ঠিত হইয়া গজনীর শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে মামুদ স্বয়ং তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া অতীত দুষ্কার্য্যের জন্য অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

সোমনাথ আক্রমণের সহিত, মামুদের বিজিগীষা শক্তি, অনেকাংশে কমিয়া আসিয়াছিল। ইহার পর ছয় বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে আর একবার মাত্র ভারতে প্রবেশ করেন। আমাদের মতে বোধ হয় তাঁহার অন্য বারের সমস্ত আক্রমণের প্রচুর সৈন্যক্ষয় ও পরিশ্রম একমাত্র সোমনাথ ক্ষেত্রেই বিশেষ ফলবতী—হইয়াছিল।

সাধারণ ইতিহাসে সোমনাথ আক্রমণের কথা কেবল মাত্র সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভিতর জানিবার অনেক কথা আছে বলিয়া, স্বতন্ত্র ভাবে সেই প্রস্তাবের আলোচনা করিতেছি।

সোমনাথ মন্দির গুজরাটের সীমার মধ্যে কাটিবাবের সমুদ্র কূলে। ইহার ঐশ্বর্য্য প্রবাদ ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য কিম্বদন্তী—সম্পূর্ণরূপে ঔপন্যাসিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। সোমনাথ পত্তন তখন, ভারতীয় সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের কেন্দ্ররূপে ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া সোমনাথের নাম, দিগদিগন্ত বিশ্রুত হইয়াছিল। সোমনাথ জাগ্রত দেবতা—এই বিশ্বাসে, অন্যান্য তীর্থ ক্ষেত্রের অপেক্ষা সোমনাথে শৈবযাত্রীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। যাত্রী দিগের প্রদত্ত অর্থে ভারতের

হিন্দুরাজগণের সহায়তায় সোমনাথ দেবের আয় সম্পুর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিকে ইহার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রবাদ প্রচার করিয়াছিল।

সোমনাথ মন্দির শ্বেত ও লোহিত প্রস্তরের সংমিশ্রণে নির্ম্মিত ছিল। সেই গগণস্পর্শী চুড়া সমন্বিত মন্দিরদ্বার চন্দন কাষ্ঠময়।* মন্দির ভিত্তি রৌপ্য মণ্ডিত,—মন্দিরের আশে পাশে বিস্তৃত দর-দালান, ও প্রমোদাগার। তাহা আবার রাজোচিত সজ্জায় সজ্জিত। দুই সহস্র গ্রামের আয়, সোমনাথের *দৈনিক সেবার জন্য ব্যয়িত হইত।* সোমনাথের পূজক ব্রাহ্মণেরাই মন্দিরের অধিকারি। বহু মূল্য ধন রত্নাদি পূর্ণ মন্দির সজ্জা ইহাদেরই জিম্মায় থাকিত। প্রতিদিন সুপবিত্র গঙ্গাজলে সোমনাথ দেব স্নাত হইতেন। দ্বাদশ শত ক্রোশ দুর হইতে বহুল ব্যয়ে প্রতিদিন গঙ্গোদক আনাইবার বন্দোবস্ত ছিল। মন্দিরের সম্মুখে, স্বর্ণ শৃঙ্খলে বিলম্বিত দুইশতমণ স্বর্ণে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঘণ্টা দোদুল্যমান ছিল চারিদিকে মৃদু গম্ভীর শব্দ বিকীরণ করিয়া ইহা প্রতিদিন যাত্রী আহ্বান করিত। প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ সোমনাথ মন্দিরের আয়ে প্রতিপালিত হইত। মন্দিরের মধ্যে পাঁচশত নর্ত্তকী তিনশত বাদ্যকর ও তিন শত ক্ষৌরকারও বৃত্তি পাইয়া প্রতিপালিত হইত। নর্ত্তকীগণ প্রতি দিন সন্ধ্যার আরতির পর সোমনাথের গুণ কীর্ত্তনকারী সঙ্গীত সমূহের দ্বারায় সাধারণের মনোরঞ্জন করিত। মাঝে নাট্যাভিনয়ও চলিত। এই সকল মন্দির মধ্যস্থ অভিনেত্রীগণের চরিত্রের পবিত্রতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। কেননা অনেক ভারতীয় সামন্ত রাজগণ শিবব্রত অবলম্বন জন্য স্বস্ব কুমারি কন্যা গণকে এই মন্দির মধ্যে প্রেরণ করিতেন *তাঁহারা সোমনাথের সেবিকা রূপে বয়ঃ* সন্ধির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করিতেন। অথবা চিরজীবন সোমনাথের সেবায় চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া কাটাইতেন।*

১০২৪ খৃঃ অব্দের আশ্বিন মাসে, প্রায় ত্রিশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া, গজনী হইতে কেবল মাত্র "সোমনাথ লুণ্ঠন উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষিত করিয়া—দুরাচার সুলতান দ্বাদশবার ভারতে প্রবেশ করে ধনলোভে ও লুণ্ঠনানুরক্তিতে গজনী ও তুর্কিস্থানের অনেক—উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির

* অতীত স্মৃতির একমাত্র চিহ্নস্বরূপ সোমনাথের মন্দির দ্বার দুইটী আজও শোকময় কাহিনী লইয়া আগরা দুর্গ মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। যাঁহারা আগরা দুর্গ মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ ময় এই বিশাল কক্ষ দ্বার দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহার—বিরাট ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দ্বার দুইটী আজও অতীত শিল্পের চরমোৎকর্ষময়ী উদাহরণ স্বরূপে সোমনাথের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

* সুলতান মামুদ এই দ্বার দুই খানি, গজনীতে লইয়া যান। তাহার পর ইহা আরও দুই একবার ভারতবর্ষে গতায়াত করিয়া ছিল। সর্ব্বশেষ কাবুল যুদ্ধের সময় লর্ড অকলণ্ডের আমলে ইহা পুনরায় ইংরাজ রাজের হস্তগত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্মরণীয় শাসন কর্ত্তা সারজন ষ্ট্যাচির তত্ত্বাবধারণে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ইহা আজও দেখেন নাই তাঁহারা যেন আগরায় গিয়া একবার ইহা দেখিয়া আসেন।

লোক বিনাবেতনে, এই সৈন্য দলে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ছিল। মূলতান প্রদেশের মরুভূমি পার হইয়া মামুদ সর্ব্ব প্রথমে আজমীরে প্রবেশ করেন। আজমীরে আসিলে আজমীরাধিপের সৈন্যগণ তাঁহার পথরোধ করে। পরিনামে মামুদেরই জয় লাভ হয়। আজমীর দুর্গ অধিকার ও নগর লুণ্ঠন করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে মামুদ একবারে সোমনাথ পত্তনে উপস্থিত হন।

সোমনাথ মন্দির নিতান্ত অরক্ষিত ছিল না। ইহার চারিদিকে পরিখা মালা দ্বারা বেষ্টিতছিল। সোমনাথ মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও পোস্তা গুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত ছিল, যে তাহা দুর্গের কার্য্য করিত। অতিবিক্ত ঐশ্বর্য্য প্রবাদে পাছে দস্যু ও তস্করদের দ্বারা মন্দিরের কোন বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পাণ্ডারা এই ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভীষণ সঙ্কটময় সময়ে তাহা বিশেষ কার্য্যে আসিল।

মামুদের আগমণ সংবাদেই অস্ত্রধারী রাজপুত ও গুজরাটী সৈন্যগণ ও মন্দিরের নির্দ্ধারিত বেতন ভোগী সৈন্যেরা দুর্গ প্রাকারে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সম্পুর্ণ প্রস্তুত ছিল।

সোমনাথ আক্রমণ সম্বন্ধে—মামুদ প্রথমে যতদুর সহজ ব্যাপার ভাবিয়া ছিলেন, সোমনাথে সৈন্যের আয়োজন দেখিয়া পরিশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি হিন্দুর বাহুবলের পরিচয় প্রতি আক্রমনেই পাইয়াছেন। সোমনাথের মন্দিরের চারিপার্শ্বে ব্যূহাকারে সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন—ব্যাপার বড় সহজ নহে।

তিন দিন ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দিনে দিনে মামুদের বলক্ষয় হইতে লাগিল। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে রাশি রাশি মুসলমানের শব জমিতে লাগিল। মামুদ শত সহস্র চেষ্টাতেও ধর্ম্মানুরাগী রাজপুতের দুর্ভেদ্য ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। হিন্দুস্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পূর্ব্বে তিনি প্রতিবারেই বলিয়া আসিতেন যে—"ধর্ম্মযুদ্ধে মরিতে যাইতেছি।" এতদিন তাঁহার মরিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান স্থলে তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন হয় "মৃত্যু" না হয় "জয়" ইহাদের একের আশ্রয় ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

ধীরে ধীরে সেই সংক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ উত্তেজিত সৈন্য রাশির মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া—সুলতান—আকাশের দিকে করজোড়ে—চাহিয়া—যুদ্ধে জয় প্রার্থনা করিলেন। পার্শ্বে তাঁহার বিশ্বস্থ প্রধান সৈনিক আবুল হোসেন। উভয়েই সেই সমরাঙ্গণে উত্তেজিত সৈন্য কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এই প্রকার ধর্ম্মানুপ্রাণতায়—তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যচয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের উত্তেজনা—পরের স্তরে সংক্রামিত হইল। পুনরায় ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া—সেই চতুর্থ দিনে মুসলমান সেনা—প্রায় সাত সহস্র রাজপুতকে নিহত করিল।

এইবার রাজপুত হঠিল। মামুদ বাহির হইতে আক্রমণ করিয়াছিলেন—বাহির হইতে হিন্দুসৈন্যের প্রবেশ পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ। রাজপুত তিন দিন তিনগুণ পরিমিত যবন সৈন্যের সহিত

যুঝিয়াছে। এবারে তাহাদের শক্তিক্ষয় হইল। তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত অধিনায়ক ছিল না, তাহারা যে এতক্ষণ যুঝিতেছিল—সে কেবল প্রবল ধর্ম্মানুরাগে। তাহাদের হৃদয়ের পবিত্রতম প্রদেশস্থিত—সোমনাথ বিগ্রহ যবনের করস্পৃষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় তাহারা—অসুর বলের সহিত লড়িতেছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনে একবারে—সৈন্য ক্ষয় হওয়াতে অনেকেই—নৌকা করিয়া—আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিল।

আত্মরক্ষা পরায়ণ রাজপুত সৈন্যের অনুধাবন করিয়া—জয় গর্ব্বিত মুসলমানেরা তাহাদের নৌকা সমূহ নিমজ্জিত করিয়া দিল। এক্ষণে প্রতিযোগিতা বিহীন হইয়া সুলতান, ওমরাহ ও নিজের পুত্রগণ বেষ্টিত হইয়া মন্দিরের প্রশস্ত দালানে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুর পবিত্র মন্দির দুরাচার যবনের পদস্পর্শে—কলুষিত হইয়া উঠিল। সোমনাথের বিগ্রহ—উৰ্দ্ধে ছয় হাতের উপর ছিল। মামুদ ক্ষুদ্রকায় ছিলেন—তিনি হস্তস্থিত অস্ত্রের সহায়তায় বিগ্রহের মুখের উপর আঘাত করিলেন। বিগ্রহকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গজনীতে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল। সোমনাথ ব্যতীত, মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ চত্বরের প্রকোষ্ঠে অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বর্ণ রজতময় বিগ্রহগুলি ছিল, সেগুলির ধাতব উপকরণ গলাইয়া, তাল প্রমাণ স্বর্ণ রৌপ্য গজনীতে চালান দেওয়া হইল। তারপর দুরাচার মামুদ হিন্দু বিগ্রহের যে প্রকার অবমাননা করিলেন হিন্দু সন্তান হইয়া তাহার বর্ণনা করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না!

যে সময় ম্লেচ্ছ মামুদ মন্দির মধ্যে এই প্রকার অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত বহাইয়া—হিন্দুর পবিত্র মন্দির কলঙ্কিত করিয়া তাহাদের মর্ম্মাঘাত করিতেছিলেন সেই সময়ে পাণ্ডারা—এই দূষণীয় কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হন। উঁহার সমীপবর্ত্তী ওমরাহেরাও তাহাকে বুঝাইলেন—একস্থানের দেবমন্দির ভঙ্গ ও প্রতিমা লুণ্ঠন করিলে—সমস্ত ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু বলদর্পিত, জয়োল্লাস উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত মামুদ সগর্ব্বে বলেন "সাধারণের নিকট আমি প্রতিমা বিক্রেতা বলিয়া পরিচিত হইতে আদৌ ইচ্ছুক নহি।"

ইহার পর সুলতান আর একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শেষ আক্রমন। ১০৩০ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসে, ৬৩ বৎসর বয়সে পাথরীরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। গজনীর "কৈসর ফেরোজী" নামক বিখ্যাত উদ্যানে তাঁহার সমাধি হয়।

সুলতান মামুদের শরীর সুগঠিত ও খর্ব্বাকার ছিল! তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলে বসন্ত চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। জীবনে তিনি কখনও দর্পণে মুখ দেখেন নাই। একবার মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সহসা দর্পণে নিজ কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! আমার মুখ এতদূর কুশ্রী ও দোষে পরিপূর্ণ কিন্তু আমি অপর সাধারণের দোষ দেখিবার জন্য শত চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া থাকি। সম্রাটের মুখ সাধারণের উপমার আদর্শ স্থল হওয়া উচিত! কিন্তু আমার

মুখ দেখিলে আমি নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়ি।

ধনলোলুপ—অত্যাচারী—ম্লেচ্ছ—সুলতান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজকোষের সমস্ত ধন রত্নাদি তাঁহার সম্মুখে এক্ষণে স্তূপাকার করিতে আদেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী ১৩০০ হস্তী তাঁহার সম্মুখে প্রদর্শিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অতীতের অনুশোচনায় অনুতাপিত হইয়াছিল। মামুদ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিয়াছিলেন—"আমি এই সমস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য কত শত নিরীহ জাতিকে চিরপরাধীন করিয়াছি। হিন্দুদিগের পবিত্র শোণিতে আমার তরবারি কলঙ্কিত করিয়াছি। হায়! ইহার কিছুই আমার সঙ্গে চলিল না।"

সুলতান মামুদের ন্যায় অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত বিজেতা—আমাদের মাতৃভূমির যে পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছেন—তাহা আর ইহজন্মে পূরণ হইবার নহে। আজও গজনীর অনেক প্রাসাদ, ভগ্ন-হিন্দুদেবমন্দিরের প্রস্তরাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে মিশ্রিত ও গ্রথিত থাকিয়া—আমাদের অতীত কলঙ্কের ঘোষনা করিতেছে।

অভাগিনীর আত্মকথা।

দশম পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা।

অধিবাসে যাহা দেখিলাম, জীবনে আর কখনও তাহা দেখিনাই। যদি সেই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহাহইলে আর এ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। অনন্তের মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সেই মহাদেবের চরণ তলে আশ্রয় লইতাম। কিন্তু তাহা হইল না; সেই দৃশ্য হঠাৎ কোথায় মিলাইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমারও চেতনার পুনরুদয় হইল। আমি দেখিলাম সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছি;—পার্শ্বে সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী! সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে দুই তিনবার চাহিলাম,—চিনিতে পারিলাম না। সেই মুখ পূর্ব্বে যেন কতবার দেখিয়াছি; যেন কতবার সেই মুখ লইয়া খেলা করিয়াছি আবার দেখিলাম,—আর কথা সরিল না, একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি—এ যে ভুবনমোহিনী! আমি চিনিতে পারিয়াছি দেখিয়া দিদি আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং সেই রুদ্রাক্ষজড়ান ভস্মমাখা হাত দিয়া আমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভগিনি! তোমার মাথা এখনও ঠিক হয় নাই; চল স্নান করিতে চল। প্রত্যুষে তোমার দীক্ষা।"

দিদির সঙ্গে স্নান করিতে গেলাম, তখন রাত্রি পোহাইয়াছে; পূর্ব্বদিক খুব ফরসা হইয়াছে; পাখিগুলা কলরব করিয়া উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা জানিতে পারিলাম না। বোধ হইতে লাগিল যেন এই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছি। স্নান করিয়া নব পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলাম, রুদ্রাক্ষ, তুলসী ও পদ্মবীজের মালা পরিলাম এবং সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত করিলাম। তাহার পর দিদির সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলাম। এবার আর একটী নূতন ঘরে আসিলাম। ঘরখানি ঝাড় লণ্ঠনে সেরূপ সুসজ্জিত না হউক কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত মনোরম। ঘরের চারিদিকে অনেকগুলি চিত্রপট ঝুলিতে ছিল, তাহাতেই ইহার সৌন্দর্য্য। চিত্র পট গুলি অতীব মনোহর,—দেখিলে আর চক্ষের পাতা ফেলিতে ইচ্ছা হয় না। সম্মুখের দেওয়ালে একখানি অনন্তদেবের ছবি। ভগবান্ ক্ষীরসাগরে অনন্তশয়নে রহিয়াছেন; আগ্যাশক্তি মহামায়া লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁহার পূজা করিতেছেন; ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও ঋষিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতেছেন। ছবিখানি খুব বড় সম্মুখদিকের প্রাচীর ঢাকিয়া রহিয়াছে; অন্যান্য দিকেও এইরূপ কতকগুলি ছবি; সেগুলি তত বড় নহে। কিন্তু সকল গুলিতেই অনন্ত দেবের এক একটী মূর্ত্তি চিত্রিত। ঘরে পূজা ও হোমের আয়োজন।

আমরা দুজনে যখন ঘরে ঢুকিলাম, তখন সে ঘরে আর কেহই ছিল না। সম্মুখে সারি সারি তিনখানি আসন পাতা ছিল; দিদি আমাকে বাম দিকের আসনে বসিতে বলিলেন এবং আপনি অপর দিকের আসনে বসিলেন, মাঝের আসন খালি রহিল। দিদি বসিয়া আচমন করিলেন; তাহার পর সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণপরে তিনি বলিলেন, ভগিনি! আজ তোমার দীক্ষা। দীক্ষা না হইলে কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার জন্মে না। তুমি অনন্তের ব্রত গ্রহণ করিতে যাইতেছ, অগ্রে দীক্ষা। দীক্ষা না হইলে তুমি ভগবান্‌কে বুঝিতে পারিবে না। গতরাত্রে তুমি ভগবানের অনেক লীলা দেখিয়াছ; আজ সম্মুখের ঐ চিত্রখানি দেখ। ঐ দেখ সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অনন্ত নাগের শরীর শয্যায় একটী পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; ঐ নাগরাজের অনন্ত ফণাশিরস্থ রত্ন সমূহের প্রভায় অনন্ত সাগরের অনন্ত জল রাশি আলোকিত হইয়াছে। ঐ পুরুষের স্বীয় অসীম লাবণ্যে মরকতশিলাময় পর্ব্বতের শোভা হার মানিয়াছে। সন্ধ্যাকালের মেঘ বসনরূপে মরকত পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করে সত্য, কিন্তু ঐ পুরুষের পীতবসনের শোভার সম্মুখে পর্ব্বতের সন্ধ্যাভ্র শোভা মলিন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ বিরাট মূর্ত্তি ভগবানের চরণ ও ভুজের অনুপম শোভায় উহাঁর গলদেশস্থ রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পমালা এবং কিরীটস্থ রত্ন নিচয়ের অতুল আলোকের নিকট জগতের আর সকল শোভাই অধঃকৃত হইয়াছে। উহাঁর দেহ দৈর্ঘে ও বিস্তারে অবিচ্ছিন্ন; স্বর্গ, মর্ত্ত, ও পাতাল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঢাকিয়া রহিয়াছে। আহা ভগবানের বদনের কি চমৎকার শোভা! উদ্দীপ্ত কুণ্ডলদ্বয় উত্তমরূপে বিভাষিত হইতেছে, এবং ওষ্ঠাধর বিম্বের

শোণবর্ণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে মনোহর নাসা ও ভ্রূযুগলের শোভা দ্বিগুণিত হইয়া অনন্ত জগতের সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইতেছে। ইঁহার বক্ষে কৌস্তভ ও শ্রীবৎস চিহ্ন, চতুর্হস্তে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম; ভগবানের পদতলে আদ্যাশক্তি মহামায়া মূলা প্রকৃতি লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন।"

আমি একান্ত মনে ভগবানের সেই অনন্ত মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম; হৃদয় ভক্তি রসে আপ্লুত হইল, দুই চক্ষে দর-দরবেগে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বলিলাম, দিদি! উনিই ভগবান অনন্ত; উনিই কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিপালন ও সংহারকর্ত্তা? কিন্তু উনি গোলোক ছাড়িয়া এই অনন্ত সমুদ্রে ও সর্পের উপর শয়ান কেন?

দিদি বলিলেন, ইহাই ভগবানের আদি মূর্ত্তি। ইহার বিশেষ অর্থ আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতেছ, কালে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়; লোকে সেই পরিবর্ত্তনকেই নাশ বা ধ্বংশ বলে। কিন্তু বাস্তবিক কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়, কেবল অনন্ত মহাকাল ও অনন্ত মহাকাশের পরিবর্ত্তন নাই। মহাকাল যেরূপ অনাদি ও অনন্ত, মহাকাশও সেইরূপ অনাদি ও অনন্ত। এই দুইয়ের সৃষ্টি বা লয় কেহ কখনই দেখে নাই। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে বিলীন হয়, কাল ও আকাশ তখন বিশ্বের বীজ আপনাদের অনন্ত গর্ভে ধারণ করিয়া এইরূপই থাকে। পুরুষ ও প্রকৃতি সেই অনন্ত মহাকাল ও অনন্ত মহাকাশের সর্ব্বত্র অনন্ত বিরাট মূর্ত্তিতে ব্যাপ্ত থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবার কল্পনা ও সৃষ্টি করেন। যে মহাসর্পের উপর ভগবান্ শয়ান রহিয়াছেন, ইহা সেই অনাদি ও অনন্ত মহাকাশ এবং এই মহা সর্প যে সমুদ্রের উপর ভাসমান রহিয়াছে, ইহা অনাদি ও অনন্ত মহাকাল। বুঝিতে পারিলে?

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সেইজন্য চুপ করিয়া রহিলাম। দিদি পুনর্ব্বার বলিলেন, মহাকাল ও মহাকাশ ঐ সমুদ্র ও নাগরূপে কল্পিত হইয়াছে;—ইহা ভক্তের কায, একে একে বুঝাইতেছি। কাল অনাদি ও অনন্ত; কেহ কখন কালের সৃষ্টি বা ধ্বংশ দেখে নাই; মহাসাগরও অনাদি ও অনন্ত; কেহই বলিতে পারে না যে, ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস দেখিয়াছি। কাল জগৎ ভক্ষক; বজ্রসারময় কঠিন পদার্থও কাল সহকারে জীর্ণ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মহাসাগর অগণ্য রাজ্য ও নগরী গ্রাস করিয়াছে; বিরাট পর্ব্বতমালাও ইহার অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য মহাকাল মহাসাগর! সেইরূপ আবার মহাকাশ ও মহানাগ বাসুকি এক। মহাকাশ অনাদি ও অনন্ত; ইহা ঘটাকাশ ও পটাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখায় জগতে ব্যাপ্ত, পরন্তু ইহা এক ও অদ্বিতীয়। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল সকলই ইহার উপর অবস্থিতি করিতেছে এবং ইহা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অনন্ত মহানাগ, ইহারই রূপক। সর্প ভিন্ন অপর কিছুই কোন বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রাখিতে পারে না। মহাকাশ যেমন ঊর্দ্ধ, অধঃ, তীর্য্যক্ প্রভৃতি সমস্ত দিক্ বিদিকই

ঢাকিয়া রহিয়াছে, সর্পও সেইরূপ স্বীয় শরীর ও ফণা দ্বারা সকলকে সকল দিকে বেষ্টন ও আবরণ করিতে পারে। স্বয়ং মহাকাশ ইহার অনন্ত দেহ, এবং ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতি অংশ সকল ইহার অসংখ্য ফণা, ঘটাকাশ পটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে পৃথক্ নহে, ফণাসমূহও সেইরূপ অনন্ত মহাসর্পের বিরাট দেহের সহিত সংযুক্ত। এই জন্য এই অনন্ত মহাকাশের অনন্ত মহানাগরূপ কল্পনা হইয়াছে। এই অনাদি অনন্ত মহাকালরূপ মহাসাগরের উপর অনাদি অনন্ত মহাকাশ সদৃশ মহাসর্পের উপর পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি নারায়ণ ও লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। পুরুষ চিরকালই জড়, প্রকৃতি নিত্য ক্রিয়াশীল; ইহাই শক্তি। এই শক্তির মহাযোগেই পুরুষ সৃষ্টি আদি করিয়া থাকেন। শক্তি হারাইলে তাঁহার আর কোন কার্য্যক্ষমতা থাকে না। অতএব পুরুষ জড় এবং প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, সেই জন্য ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান এবং ভগবতী কমলা নিত্য, জাগ্রত ও চঞ্চলা। ভগিনি! ভাবিয়া দেখ, ইহা ভিন্ন ভগবান্ অনন্ত দেবের আর কি উৎকৃষ্ট কল্পনা হইতে পারে? ইহা ভিন্ন আর কোন মূর্ত্তিতে ভক্তের মন পরিতৃপ্ত হয়? নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রত্ব, তৃণ হইতেও নিচত্ব ভাবিয়া দেখ, আর এই অনাদি অনন্ত মহাদেবের চরণতলে প্রণত হও।" বলিতে বলিতে তাঁহার দুটীচক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে সেই খানে প্রণাম করিলাম।

মাথা তুলিয়া দেখিলাম আমার পাশের আসনে কে বসিয়াছে :—দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম—বাবা। বাবা সস্নেহে আমার মাথা ঘ্রাণ করিয়া বলিলেন "মা! অনন্তের কিছু বুঝিতে পারিলে? উনিই ভগবান্ আদিদেব। ভক্তগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে উঁহাকে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডাকিয়া থাকে। উঁহার অসংখ্য মূর্ত্তি, সেইজন্য অসংখ্য নাম। ঐ অসংখ্য মূর্ত্তিতে তুমি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত নিসর্গ দেখিতে পাইবে। উঁহাতে তুমি আছ, আমি আছি, তোমার দিদি আছেন, তোমার স্বর্গীয় স্বামী আছেন—" স্বর্গীয় স্বামী আছেন শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম; একবার প্রাণভরিয়া ঐ অনন্তের রূপ দেখিয়া লইলাম, কিন্তু তন্মধ্যে সেই শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হতাশ হইয়া বাবার মুখ পানে চাহিলাম। বাবা বুঝিতে পারিলেন; সাদরে বলিলেন, মা! তোমার এখনও সে দিন আসে নাই। লোকে বহু তপস্যা করিয়া ভগবানে আপনাকে অথবা আপনাতে ভগবান্‌কে দেখিতে পায়। তাঁহারা বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া যে মার্গ অতিক্রম করেন, তুমি আজি, সেই পথে প্রবেশ করিবে মাত্র; ক্রমে তোমার অধিকার জন্মিবে। এক্ষণে যাহা বলিতেছি—শুন।

মূলে স্ত্রীপুরুষে কিছুই প্রভেদ নাই। আকাশ যেমন সকল বস্তুতেই সমভাবে ব্যাপ্ত আছে, পরমাত্মা সেইরূপ সকল দেহেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; স্ত্রীপুরুষ স্থূল শরীরের প্রকার ভেদ মাত্র। যতক্ষণ মায়াবন্ধন থাকিবে, ততক্ষণ স্ত্রীপুরুষ ভেদ জ্ঞান দূর হইবে না; মায়ার বন্ধন

নষ্ট হইলেই সকলই আত্মময় দেখিবে।” আমি বিহ্বল ভাবে বাবার উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। তিনি যত কথা বলিলেন, সমস্ত মনে নাই। হায়! যদি সেই সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, যদি সেই মত কাজ করিতাম, তাহা হইলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হইত না। হায়, এখন যদি বাবার মত গুরু পাই, তাহা হইলে জীবনের পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পরমপথে আরোহণ করিতে পারি। কিন্তু সে আশা বৃথা। যাহা একবার অবহেলা করিয়াছি, আর তাহা পাইব কেন?

সেই দিন বাবা কত যে শিক্ষা দিলেন তাহার আর সীমা নাই। সেই সমস্ত শিক্ষার পর দীক্ষা। আমি বাবার কাছে দীক্ষিত হইলাম, দীক্ষায় কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। সেই ঘরে বাবা, দিদি ও আমি কেবল এই তিন জন। দীক্ষার পর হোম। হোম শেষ হইলে বাবা বলিলেন, মা! এইবার তোমাকে অধিরাজের আশীর্ব্বাদ লইতে হইবে।”

“অধিরাজ কে?”

বাবা। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন কাজ হয় না। তাঁহার আশীর্ব্বাদ না হইলে কাহারও দীক্ষা সম্পন্ন হয় না।

“কে লইয়া যাইবে?”

বাবা। আমি,—চল আমরা তিনজনেই যাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অধিরাজ সন্দর্শন।

হোমের ফোঁটা লইয়া আমরা তিন জনে অধিরাজের নিকট চলিলাম। তখন বেলা প্রায় ১১টা। তত বেলা হইয়াছিল কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই। দীক্ষার মন্ত্র মনে মনে অভ্যাস করিতে করিতে অধিরাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। অধিরাজ নাম শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, না জানি তিনি কেমন অট্টালিকাতেই বাস করেন, তাঁহার কতই বা আড়ম্বর। কিন্তু আজ দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে, দোতোলার উপরে আমাদের বাসা ছিল। দোতোলা হইতে নামিয়া আসিলাম; দুই তিনটী মহল পার হইয়া একটী বাগানে পড়িলাম। বাগানটীতে কেবল নিম্ব ও বটগাছ; মাঝে মাঝে সুপারিগাছের ঝোঁপ। তাহার মধ্যে একটী কুটীর; সেটী দেখিতে ঠিক একখানি রথের মত। আমি প্রথমে মনে করিলাম সেটী কাঠের কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম মাটীর; তাহার উপর খড়ের ছাউনি। তবে চূড়াগুলি কাঠের। প্রত্যেক চূড়ায় এক একটী নীল ধ্বজা এবং কুটীরের মাথার উপর একটী লাল ধ্বজা উড়িতেছিল। এই ধ্বজাটী খুব বড়। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এক প্রকাণ্ড বেদীর উপর এক প্রকাণ্ড দেবীমূর্ত্তি,—প্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, হস্তে খর্পরখস্তা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলজিহ্বা বিকট দশনা,—যেন ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িয়া হস্তস্থ খর্পর হইতে মুহুর্মুহু রক্ত পান করিতেছেন; দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি দেখিয়াছি,—দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম ইনি তারা। আমি

একমনে সেই মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম; এমন সময়ে বাবা বলিলেন "দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া অধিরাজের চরণ বন্দনা কর।"

চাহিয়া দেখিলাম প্রতিমার সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মে এক মহাপুরুষ আসীন। তাঁহার মস্তকে জটাভার; মুখাভ্যন্তরে দীর্ঘ শ্মশ্রু। সকলই সাদা ধপ্ধপে। তাঁহার ললাটে বিশাল ত্রিপুণ্ড্রক, গলে বাহুতে ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা পরিধানে বাঘাম্বর। তিনি একাসনে ধ্যানে নিমগ্ন। বাবা ও দিদি অগ্রে দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, আমিও সেইরূপ করিলে অধিরাজ আমার মুখের দিকে চাহিয়া "নারায়ণ সুমতি দিন!" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমায় সম্মুখে বসিতে বলিয়া বলিলেন "আজ তোমার শুভ দিন; আজ তুমি নূতন জীবনে প্রবেশ করিলে। মানব জন্ম যে সার্থক করিতে পারিবে, আজি তাহার উপায় চিন্তিত হইল। এতদিন তুমি যেন পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলে, কিন্তু আজি তোমার নিকট সকল দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; তুমি আশ্রমের সর্ব্বত্র বেড়াইতে পারিবে, কেহই তোমাকে বারণ করিবে না, কেহই তোমাকে বাধা দিব না। এই লও ত্রিশূল লও—"

ত্রিশূল খানি প্রণাম করিয়া লইলাম। দেখিলাম সেখানি রূপার। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই ত্রিশূল লইয়া তুমি এই আশ্রমের যেখানে যাইবে, যে তোমাকে দেখিবে, প্রণাম করিবে। এই ত্রিশূলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব নিত্য বিরাজ করিতেতেছেন, দেখিও ভ্রমেও ইহার অবমাননা করিও না। যে মুহূর্ত্তে ইহার অবমাননা করিবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার পতন হইবে, আর কেহ তোমার দিকে ফিরিয়া দেখিবে না। কেহই তোমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে না।"

কি করিলে ত্রিশূলের সম্মান রক্ষা হয়, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল; কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন,—পারিয়া বলিলেন, নিম্নপ্রস্তাবিত বিষয়ে তোমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১। সদা সত্য পথে থাকিবে,

২। সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকিবে,

৩। বিপন্ন ব্যক্তিকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

৪। সুখে দুঃখে সমান জ্ঞান করিবে।

৫। ভোগ বিলাস ত্যাগ করিবে।

৬। ভয় বিসর্জ্জন দিবে।

এখন তুমি যাও, আহার করগে। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সন্ন্যাসি মেলা দেখিতে পাইবে। বৎসে! মনে রাখিও মায়ের হস্তে ঐ যে খর্পর দেখিতেছ, একদিন শত্রুরক্তে অথবা নিজের হৃদয়রক্তে উহা পূর্ণ করিতে হইবে। অন্যথা করিলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।"

ঐ কথেকটী কথা বলিয়াই অধিরাজ নীরব হইলেন, আমি তাঁহার চরণ ধূলি লইয়া পশ্চাতে চাহিলাম, বাবা কিম্বা দিদি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন আর বিলম্ব না করিয়া আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যে পথে গিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিয়া আসিলাম। দিদি আমার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন; আমি আসিলে দুজনে একত্রে হবিষ্য করিলাম।

বিহারীলাল।

কবির উপর শমনের অধিকার নাই কবির মৃত্যু নাই এ কথা বলিতে আর ভরসা হয় না। এ দর্প বুঝি কৃতান্তের সহিল না; শতবাহু বিস্তারে কৃতান্ত সরস্বতীর প্রিয়পুত্রগণকে আকর্ষণ করিতেছে। বাণীর পদ্মাসন বিচলিত হইয়া উঠিযাছে। এ দীন বঙ্গের অতি দীন সারস্বত কুঞ্জে শমনের এই অকাল অত্যাচারে আমরা সকলেই পীড়িত। শমনের এই অকাল অত্যাচারে অনেক কবিকে অপূর্ণ জীবনে অমর হইতে হইযাছে, পূর্ণ জীবনে অমর হইবার কেহ অবসর পাইল না।

শমনের এই অকাল অত্যাচারে আমরা বিহারীলালকে হারাইয়া ফেলিলাম। বিহারীলাল বাঙ্গালাপাঠকের নিকট বিশেষ পরিচিত নহেন, পরিচিত নহেন কবি আপনার দোষে নয়,—পাঠকের দোষে। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি উন্নতি শুধু লেখকের শক্তিসাপেক্ষ নহে পাঠকেরও আনুকূল্যসাপেক্ষ।

মন্দ হৌক ভাল হৌক সাহিত্যে যখন যে স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তাহাতে সকলেই ভাসিয়া যান। শক্তিশালী পুরুষই সাহিত্যের বহমান স্রোত উজান বহাইতে সমর্থ। শক্তিশালী পাঠক বা সমালোচকে স্রোতের প্রতিকূলে কখন কখন উজান বহিয়া যাইবার অবসর অন্বেষণ করেন। ইহাই সাহিত্যের যুগান্তর। নির্জ্জীব সাহিত্যের ইহাই সঞ্জিবনী মহৌষধী।

বাঙ্গালাসাহিত্যের চলিত স্রোতের প্রতিকূলে তিনজন দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিহারীলালের গীতিকাব্য বঙ্গসাহিত্যের যুগান্তরের কথা। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অতিবিস্তারেও ত্রিপদি পয়ার প্রভৃতির মর্য্যাদা নষ্ট হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ অনুসরণ কঠিন হইলেও বাঙ্গালা ভাষা বঙ্কিমিভাষায় লীন হইতে চলিয়াছে।

অধুনা বাঙ্গালাকাব্যের গতি গীতিকাব্যের পথে পড়িয়াছে শুধু বিহারীলালের বাঙ্গালায় গীতিকাব্যের প্রবর্ত্তনে। এতদিনে বাঙ্গালি আপন প্রাণের সুর ধরিয়াছে। এতদিনে বাঙ্গালি আপন অবস্থা অদৃষ্ট বুঝিয়া ভারত উদ্ধারের আশা ছাড়িয়াছে। বাঙ্গালির এই মৃত প্রাণের নিভৃত নীরব রোদনের নাম গীতিকাব্য। বাঙ্গালী, কাব্যে এই রোদন করিতে শিখিয়া বহুবিধ রোদনে বাঙ্গালাকাব্য পরিপূর্ণ করিতেছে। হতাশ প্রণয়ের মর্ম্মান্তভেদী করুণ ক্রন্দন, বিরহবাসরের আকাঙ্খার অপূর্ণ উচ্ছ্বাস, প্রেমানুরাগের সুষমাময়ী ক্রীড়া ব্রীড়া দেখিবে কোথায়?—গীতিকাব্যে। এই গীতিকাব্যের প্রবর্ত্তক বিহারীলালকে বাঙ্গালার পাঠক বিশেষরূপে চিনিল না। যে সরল সত্য, বাঙ্গালাকাব্য প্লাবিত করিয়াছে, সে সরল সত্যের উপাসক বিহারীলালকে বাঙ্গালার পাঠক না

চিনুক, বাঙ্গালাকাব্যের যদি কখন ইতিহাস লিখিত হয় বিহারীলালের নাম ইতিহাসের শীর্ষ স্থানে থাকিবে। এই সত্য এই অক্ষুণ্ণ সত্য বহুশতাব্দি ধরিয়া বাঙ্গালাকাব্যে বিরাজমান থাকিবে। বাঙ্গালাকাব্যে ইহা প্রয়োজনীয়, এ প্রয়োজন বাঙ্গালার ছোট বড় সকল কবি বুঝিবেন।

বঙ্গের গৌরব রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য আজি আর কাহারও নিকট অপরিচিত নাই, অবিদিত নাই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বিহারীলালের অনুগামী শিষ্য বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে স্বয়ং এই রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই; সম্ভবতঃ সুকবি রাজকৃষ্ণ রায় জীবিত থাকিলেও সমস্বরে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র এ কথায় কি উত্তর করিবেন বলিতে পারি না।

বিহারীলালের কবিতায় যেমন বিহারীলালের প্রাণ প্রতিফলিত দেখিবে তেমনি আবার নিসর্গের সুষমা বিহারীলালের প্রাণে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। হিমালয় বর্ণনায় কবির অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বঙ্গের নগণ্য কবিসম্প্রদায় আপন আপন কবিত্বশক্তির পরিমাণ নির্ণয় করুন।

অসীম নীরদ নয়;
ওই গিরি হিমালয়!
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার!
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয় পিণাক রাব বাজেনা শ্রবণে।

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিযা সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত অনল ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন জ্বালা মালা শোভে গলে।

কালের করাল হাসি
দলকে দামিনী রাশি,
কড়্কড়্ দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ;
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন!

ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফ রাশি
যুবন্ তপন করে ঝক্ ঝক্ করে।
উপরে বিচিত্র রেখা,
চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে।

ওই কিবে ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর।
দাঁড়াইয়ে পাদদেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জ রাজি সাজে থরেথর

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ,
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন।

ওই গণ্ডশৈল শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময়।
তৃণ তরু লতাজাল,
অপরূপ লালেলাল;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়।

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচ মুখে উচ কাণে
চরিয়া বেড়ায় সব চমর চমরী,
সুচিকণ শুভ্রকায়
মাছি পিছলিয়া যায়,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা লহরী॥

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হেথায়।
কেমন পাকম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায়।

মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে,
যেন ধূমকেতু ওঠে,
ফরফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল;
কত রকমের পাখী
কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে. আহ্লাদে আকুল।

জলধারা ঝরঝর,
সমীরণ সরসর,
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারিদিকে;—
চমকি আকাশ-ময়
ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিখে।

একি স্থান অভিনব।
বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে দাঁড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে আমায়;
গায়ে তরু লতা পাতা
থোলো থোলো ফুল গাঁথা,
বরফের—হীরকের টোপর মাথায়।

তলভূমি সমুদয়
ফুলে ফুলে ফুলময়,
শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান;
আকাশ পড়েছে ঢাকা,
আর নাহি যায় দেখা
তপনের সুবর্ণের তরল নিশান,

* * * *

ওই ওই ভৃগু ভূমে,
আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে
রয়েছে আকাশে মিশে অপরূপ স্থান!
আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায়
গুহা গোমুখের প্রায়,
পাতাল ভেদিয়া তায় ধায় যেন বান।

ফেনিল সলিলরাশি
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে;
সুধাংশু প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে!—
অসংখ্য শীকর্‌ শিলা ছোটে চারি ভিতে।

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লক্ষে লক্ষে ঝেঁকে ঝেঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার।

আবরিয়ে কলেবর
ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন!
যেন ভৈরবের গায়
আহ্লাদে উথুলে ধায়
ফণা তুলে চুলবুলে ফণী অগণন।

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায়,
ঝরঝর কলকল
ঘোররবে ভাঙে জল
পশু পক্ষী কোলাহল করিয়ে বেড়ায়।

সিংহ দুটি শুয়ে তটে
আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে,
আলসে তুলিছে হাই,
কা'কেও দৃক্‌পাত নাই,
গ্রীবাভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদীপানে।

কিবে ভৃগু পাদমূলে
উথুলে উথুলে দুলে
ট'লে ট'লে চলেছেন দেবী সুরধনী
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিত পাবনী।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা!
জুড়াও প্রাণের জ্বালা।
জুড়াও ত্রিতাপ-জ্বালা মা তোমার জলে।

যে কণ্ঠে কোকিলের পঞ্চমরাগ উথলিয়াছে সেই কণ্ঠেরই এ উচ্ছ্বাস! এমন অসাধারণ কাব্যশক্তি বাঙ্গালাপাঠক বুঝিল না ইহা বাঙ্গালাপাঠকের দুর্ভাগ্য। অপর কবিসাধারণের অনুভূতি কল্পনা-কাল পর্য্যন্ত কিন্তু বিহারীলালের সহস্র অনুভূতি সহস্রধারায় অবিরাম প্রাণ হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিত, কল্পনা কবির নিকট কল্পনাবোধ থাকিত না সবই মহান্ নিসর্গের মহান্ সত্য জ্ঞান ছিল।

কাব্যানন্দ বিহারীলাল কাব্যরসে এতদূর বিভোর ছিলেন, সারদাপূজায় এতদূর নিমগ্ন ছিলেন, সৌন্দর্য্যময়ী ধরিত্রীর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যশোভায় এতদূর উন্মত্ত ছিলেন, বাহ্য সুখ্যাতির অখ্যাতির কোনরূপ শক্তি আছে তাহা কবির অল্পই বিশ্বাস ছিল। যে প্রকৃত সমাধিস্থ তার সুনাম যশে প্রয়োজন কি? আজিকার দিনে এইরূপ ফলাকাঙ্খাশূন্য হইয়া কেবল কবিতার জন্য কবিতা কয়জনে লিখিয়াছে? নিভৃতে কাব্যের এই নির্ম্মল রসপানে যিনি বিভোর ছিলেন তিনি যে প্রকৃত কাব্যযোগী ছিলেন এ বিষয়ে সংশয় নাই। বিহারীলালের গীতিকাব্য বঙ্গভাষার অমূল্য ধন হইয়াও বাঙ্গালাপাঠকের নিকট যথন যথাযথ সম্মান পায় নাই অধিকন্তু বাঙ্গালাপাঠকের নিকট বিহারীলালের গীতিকাব্য যখন তেমন পরিচিত নহে তখন তাহার কিছু কিছু অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলে অন্যায় হইবে না ভাবিয়া উদ্ধৃত করা গেল।

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম-লতা।

পুরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, উষার আলা,
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব নীরদ-মালা।

প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর
করুণা নিঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

নাহি মণিময় যে রাজপ্রাসাদে
তোমার প্রতিমা বিরাজমান,
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্য শ্মশান।

* * *

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায় ;
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায়।

অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস কমল কানন ভারতী,
জগজন মন নয়ন লোভা!

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো ক'রে আছে আলয় যার ;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার!

* * *

নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালীন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।

শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব,
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ;
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব,
যমুনার জল উজান বয়।

কোকিল কুহরে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
সুধীর মলয় সমীর বায় ;
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে,
শ্যাম কালশশী হেরিতে ধায়।

না হেরি সেথায় সে নীল কমলে,
নেহারে সকলে বিকল মনে,
চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতলে,
বাজিছে নূপুর সুদূর বনে।

* * *

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতে ছিলেন খেদের গান।

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় ;
মধুকর কুল আকুল ব্যাকুল,
গুনুগুনু রবে উড়ে বেড়ায়।

স্বভাব সুন্দর চারু কলেবর,
বিকসে সুষমা কুসুম রাজি ;
সুরসীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি!

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পরিজাত হার,
মধুর তোমার মানের বেশ।

* * *

ছাতের উপরে চাঁদের কিরণে,
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে ;
রূপে দশ দিশ করেছে আলা।

বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন,
চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা ;
ধুয়ে গেছে যেন তপন আপন
এ মূরতিমতী মরীচিঘটা।

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে ;
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়িছে ধরণী পরে।

হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন,
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে ;
কভু যেন লাজে নমিতলোচন,
পলক পড়েনা শতেক পলে ;—

কভু কভু যেন চমকিয়ে ওঠে,
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়,
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে,
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ,—

কখন বা যেন হয়েছে তাহায়
সুধার প্রবাহ প্রবহমাণ,
যেথা দিয়ে যায়, অমৃত বিলায়,
জুড়ায় জগত জনের প্রাণ।

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ,
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগত জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।

আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
অমনি লাজের উদয় হয় ;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
আনত আননে দাঁড়ায়ে রয়।

আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন,
আধই অধরে মধুর হাসি ;
আধ ফোটো ফোটো হয়েছে কেমন,
কপোল গোলাপ মুকুলরাশি !

আননের পানে সরমগম্ভীর,
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে ;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

এস গো সকল ত্রিলোকসুন্দরী,
এখানে তোমরা এস গো আজি ;
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি
আপন মনের মতন সাজি !

ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী,
দাঁড়াও সকলে সহাস মুখে ;
কমল কানন বিলোচন তুলি,
চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে।

এমন সরেস নিখুঁত আনন,
বিধি বুঝি কভু গড়েনি কারো ;
এমন সজীব তেজাল নয়ন
—মদির—মধুর—নাহিক আর।

*　　*　　*

এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
এই দেখি ফের শুকায়ে যায় ,
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল,
না ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায়।

এই দেখি হাসে চাঁদিনী যামিনী,
পোহাইয়ে যায় তাহার পর ;
এই মেঘমালে দলকে দামিনী,
পলক ফেলিতে সহেনা ভর।

*　　*　　*

কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়।
না দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চায়—
তবু কেন দেখিতে না চায় !

আপনি দেখিতে গেলে,
কত যেন নিধি পেলে,
আদর করিতে এসে কেঁদে চ'লে যায়।
কাঁদিয়ে ধরিলে করে,
থরথর কলেবরে
চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায়।

সহসা চমুকে ওঠে,
সভয়ে চৌদিকে ছুটে,
আবার সমুখে এসে কাঁদিয়ে দাঁড়ায়—

ছলছল দুনয়ন,
ম্লান চারু চন্দ্রানন,
আকুল কুন্তল জাল, অঞ্চল লুটায়।

আবার সমুখে নাই;
কেবল শুনিতে পাই,
হৃদি-ভেদি কণ্ঠধ্বনি ওঠে উভরায়।

সাধে কে সাধিল বাদ!
কেন হেন পরমাদ—
কেন রে বেঘোরে মোরা মরি দুজনায়।

* * *

ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল,
বিকসিল ফুল সকল ঠাঁই;
ফুলের আলোকে কানন উজল,
ফুল বই যেন কিছুই নাই!

* * *

কে জানে রে ভালবাসা, শেষে প্রাণনাশা হবে।
শান্তির সাগরে আহা প্রলয় পবন ববে।

* * *

আচম্বিতে চোরাবাণে
বিষম বেজেছে প্রাণে,
এখনো প্রেমের ধ্যানে ভোলা মন তবু ম'জে রয়,

হা আমি যাহার লাগি
হয়েছি ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগী,
মোরে যদি সে বিরাগী; অনুরাগী কেন তবে।

এত চাই ভুলিবারে,
ভুলিতে পারিনে তারে;
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে?—

বিরাগের আশঙ্কায়
হৃদে শেল বিঁধে যায়,
তবু হায় স'য়ে তায় কাঁদে রে নীরবে?

* * *

সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি,
পূরণিমা শশী প্রকাশ পায়;
সুধাকর সুধা চির অভিলাসী
চকোর চকোরী নেহারে তায়;

আমার অন্তর আর একতর,
আমি ভালবাসি মলিন মুখ;
হেরে তব ম্লান মুখ মনোহর,
জনমে হৃদয়ে স্বরগ সুখ।

ভালবাস কি না, ভাবিনি কখন,
আপনার ভাবে আপনি ভোর;
আপনার স্নেহে আপনি মগন,
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর।

আহা কেন কেন এ ঘুম ভাঙাও,
কি লাভ দুখীরে করিলে দুখী!
দাও দাও আরো ঘুমাইতে দাও,
স্বপনের সুখে হইতে সুখী।

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মোপাসনা।

হিন্দুজাতির মত প্রাচীন জাতি আর পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই। মিশর, ব্যাবিলন, এসিরিয়া প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন দেশের ধ্বংশ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে তত্তদ্দেশীয় সমস্ত জাতিরও ধ্বংশ সাধন হইয়াছে। কেবল প্রাচীন হিন্দুজাতি আজিও রহিয়াছে। রহিয়াছে কেবল তাহার সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্ম্মপ্রণালীর জন্য। হিন্দুরা নিজ সমাজ ও ধর্ম্ম নিজেরাই গড়িয়াছে এবং তাহারই বলে আজিও তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে। যে বীজ সত্য যুগে উপ্ত হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া একটি বৃহৎ সমাজ ও ধর্ম্ম-বৃক্ষরূপে সঞ্জাত হইয়াছে। সেই বৃক্ষ অসংখ্য শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে আসিয়া এক সুবিশাল বনস্পতিরূপে পরিণত হইয়াছে। এক শাখা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মিল, জন্মিয়া সে গাছ আবার এত বড় সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, যে মূল বনস্পতিকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। বনস্পতি অসীম বলে আবার সমুদয় ভারত আচ্ছন্ন করিল। বৌদ্ধেরা ছুটিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে গেল। তৎপরে যবনেরা আসিল। যবনদিগের অস্ত্র—তরবারি ও অগ্নি। কিন্তু যাহা জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান আছে, তাহা অস্ত্রবলে সমূলে বিনষ্ট হইবার নহে; যবনেরা জ্ঞানবলে হিন্দুর ন্যায় প্রবৃদ্ধ নহে, সুতরাং জ্ঞানে হিন্দুর নিকট পরাভূত রহিল। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ যবনকালে অক্ষুণ্ণ ছিল। শুদ্ধ জোর জবরদস্তিতে কতকগুলি লোক মুসলমান হইয়াছিল। তাহাদেরই বংশধরেরা আজি ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতেছে। তার পর শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানেরা আসিয়াছেন। পার্থিব জ্ঞানবলে খৃষ্টানেরা বড়ই বলবান। সেই পার্থিব জ্ঞান লইয়া খৃষ্টানেরা হিন্দুদিগের সম্মুখীন হইয়াছেন। যতদূর সাধ্য, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিতেছেন; সাপ্, ব্যাঙ, বিছা কত কি বলিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে আপনাদের খৃষ্টীয় বাদিবুলি আওড়াইতেছেন। মিথ্যা জ্ঞানবলে খৃষ্টানেরা হিন্দুদিগকে হটাইতে চাহেন। জাঁক ষোল আনার উপর আঠার আনা। সেই জাঁকে বলিয়া বেড়াইতেছেন, হিন্দু তোমাদের সমস্তই মন্দ;—আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ক্রিয়া, কর্ম্ম, সমাজ, ধর্ম্ম সকলই মন্দ; ভাল যা তা আমাদের। হিন্দুরা এখন যবনের তরবাল ও অগ্নির সম্মুখে নহেন। সে অগ্নি পরীক্ষায় সীতার উদ্ধার হইয়াছে, সে তরবালে হিন্দুবনস্পতির সমস্ত শাখা প্রশাখা ছেদিত হয় নাই। তরবাল অপনীত হইয়াছে, বনস্পতি আবার পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে জ্ঞানবলে হিন্দুরা এতকাল দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বিপক্ষে এখন খৃষ্টীয় জ্ঞানের মহাস্ত্র সমুদিত। খৃষ্টানের আমাদিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, তারপর, নিজ পার্থিব জ্ঞানে হতবল করিয়া আমাদিগকে তাহাদিগের ধর্ম্মেও আনিতে চাহেন। এ বড় সামান্য পরীক্ষা নহে। এখন

আমাদিগের নিজের জ্ঞানবল দেখিতে হইতেছে; আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ফুটাইতে হইয়াছে। যাঁহারা তৎসাধনে অসমর্থ, তাঁহারা খৃষ্টানের জ্ঞানে নতশির হইয়া তাঁহাদের দলে মিশিতেছেন, অথবা মিশিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ সময়ে আমাদের স্থির থাকা উচিত নহে। এক সময়ে এই দ্বন্দ্বে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের শিশুবোধ মাত্র পড়িয়া জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহারা ব্যাস বাল্মীকির ধর্ম্মকে, কপিল জৈমিনির দর্শনকে, মনু যাজ্ঞবল্কের স্মৃতিকে তুকথায় হটাইতে চাহেন। ক্ষুদ্রতরী, মহাসমুদ্রের পোতের নিকট দাঁড়াইতে চাহে। খৃষ্টানেরা হিন্দুকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইতে আসেন। রামমোহন সেইজন্য বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার্থে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, শুদ্ধ পৌরাণিক জ্ঞান যথেষ্ট নহে। সেই পুরাণ যে আদি ব্রহ্মজ্ঞানস্রোত হইতে নিঃসৃত, সেই স্রোতোমুখে যাওয়া আবশ্যক। নহিলে, তাহার রহস্য সকল উদ্ঘাটিত হইবে না। সেই রহস্য উদ্ঘাটিত না হইলে শুদ্ধ পুরাণজ্ঞানে বলবান হওয়া যায় না। প্রকৃত জ্ঞানবলে বলবান না হইলে, প্রতিদ্বন্দ্বীর কুতর্কজালের নিরসন হয় না। এজন্য তিনি ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। সেই আলোচনার ফল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাহির হইতে লাগিল। শুদ্ধ বিদ্যালোচনা নয়, উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিষয়ক মানস-উপাসনাও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। করাতে তৎকালে অনেক উপকার দর্শিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাবধি খৃষ্টান হওয়া অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহনের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত যদি প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা হইত, তাহা হইলে তাঁহার সাধু সংকল্প সিদ্ধ হইত। হিন্দুসমাজ তাহা হইলে বৈদিকজ্ঞানে এতদিনে বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইত, বৈদিক উপাসনা-প্রণালী হিন্দুসমাজের সমস্ত স্তরকে এক নূতন ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিত। তাহা হইলে হিন্দুসমাজ আজি বুঝিতে পারিত :—

"যিনি অধিকারী না হইয়াই কর্ম্মকাণ্ড সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বোপাস্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে 'জ্ঞানিদ্বৈনরকম্' অর্থাৎ কেবল জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলে নরক হয় ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে নারকী হইতে হয়; ফলতঃ তাহার প্রকৃতফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন-বিধির অনুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ সকল এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, যিনি ইহজন্মে হউক বা জন্মান্তরেই হউক, স্বর্গাদিজনক কাম্যকর্ম্ম ও যাগাদি এবং নরকজনক নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও ব্রহ্মহত্যাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সন্ধ্যা বন্দনাদি স্বরূপ নিত্যকর্ম্ম, পুত্র-জননকালাদি কর্ত্তব্য জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত এবং ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শাণ্ডিল্য বিদ্যানুসারে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস-উপাসনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত নির্ম্মল করিয়া পরিশেষে সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া

অভ্রান্ত হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারই ঐ ইচ্ছা অচিরাৎ ফলবতী হয়। আমাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করা দরিদ্রের রাজ্যাভিলাষের ন্যায় উপহাসাস্পদমাত্র! ইহা প্রাচীন বৈদান্তিক মহাশয়েরাই স্ব স্ব গ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।" *

সে যাহা হউক, মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া বেদমূলক হিন্দুধর্ম্মীয় উচ্চ অঙ্গের উপাসনা-প্রণালীই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কেবল প্রভেদ এই, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-কার্য্য খৃষ্টীয় চর্চ্চ-প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, আর হিন্দুর উপাসনা নির্জ্জন স্থানে একাকী সম্পন্ন হয়। যে উপাসনায় আত্মা, পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হয় তাহা নির্জ্জনেই সুসম্পন্ন হইতে পারে, হিন্দু এই মন্ত্রে দীক্ষিত; কিন্তু খৃষ্ট ইউরোপীয় মন্ত্র অন্যবিধ। সে মন্ত্রে সামাজিক উপাসনা-প্রণালারই আদর অধিক। কোন্ সাধনায় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা আমরা এস্থানে বিচার করিতে চাহি না। সাধনার সিদ্ধি অনেকাংশে ভক্তির উপরই নির্ভর করে। সেই ভক্তি, ইউরোপীয় চর্চ্চ প্রণালী, কি হিন্দুর নির্জ্জন সাধনায় অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা সাধকগণ অনায়াসে বিচার করিয়া লইতে পারেন। সে যাহা হউক, রামমোহন রায় যে উপাসনা পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক মন্ত্রেই সম্পাদিত হইত, বেদ অবলম্বনে সে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার দেহ বৈদিক কিন্তু তাহার আকার খৃষ্ট ইউরোপীয় চর্চ্চানুমত। এইরূপ প্রণালীতে যতদূর হিন্দুত্বের সম্ভাবনা, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী ততদূরই হিন্দু, তদধিক নহে কিন্তু রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু বলি এই জন্য যে, তিনি বেদকে মান্য করিয়া গিয়াছিলেন। যিনি দেশাচার মান্য করেন,—যে দেশাচার ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদানুবর্ত্তী, তিনি বেদকেই মান্য করেন। যেমন মুসলমান ধর্ম্মের প্রামাণ্য কোরাণ, যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রামাণ্য বাইবেল, তেমনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য বেদ। বেদেই সমস্ত হিন্দুত্ব নিহিত আছে, এবং হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সেই বেদমূলক। অপৌরুষেয় কোন বাক্য-শাসন স্বীকার না করিলে কোন ধর্ম্মের সামাজিক হইবার অধিকার জন্মে না। মনুষ্যের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অস্থিরতা ও পরিবর্ত্তনীয়তা হেতু তাহা সমাজ শাসনে সমর্থ নহে। ধর্ম্মবিষয়ক সত্যাসত্য নির্ণয় করা সামান্য মনুষ্যের সাধ্যাতীত। এজন্য সকল সামাজিক ধর্ম্মেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তাহা কেবল ঈশ্বর-বাক্য দ্বারা নিরূপিত হইবে। অলৌকিক বিষয় সমস্ত মনুষ্যের সামান্যজ্ঞানাতীত। ধর্ম্মের মূল সেই অলৌকিক বিষয়। সেই অলৌকিক বিষয় সমস্ত যেরূপ নির্ণীত হইবে, ধর্ম্মের গতি সেইরূপই হইবে। বেদ অলৌকিক বিষয় সকল স্থির করিয়া দিয়া তদনুযায়ী হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। রামমোহন রায় তাহাই বুঝিয়া বেদের প্রামাণ্য শিরোধার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন। যিনি বেদকে অস্বীকার

* শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।
সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে শাঙ্কর দর্শন।

করেন নাই, তিনি হিন্দুধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেবল দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া হিন্দু আচারকে সামান্যরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। একবিধ রূপান্তর তাহার উপাসনা-পদ্ধতি; অন্যবিধ রূপান্তর বৈদিক অধিকার তত্ত্বের অস্বীকার। উপাসনা-পদ্ধতির রূপান্তর কিরূপ তাহা আমরা দেখাইয়াছি, অধিকার-তত্ত্বের অস্বীকার কিরূপ তাহা পরে বলিতেছি। এই দ্বিবিধ রূপান্তরই দেশ, কাল ও পাত্রোপ-যোগী ছিল বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। সেরূপ রূপান্তর না করিলে, তিনি ভাবিয়া থাকিবেন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না। ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুগণকে হিন্দুধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত রাখা যাহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজের গঠন অবশ্য ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণের রুচি অনুযায়ী হওয়া চাই। সেই রুচির পরিতোষার্থ হিন্দু ব্যবহারের রূপান্তর আবশ্যক। সেরূপ রূপান্তর না করিলে ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের প্রবৃত্তি চরি-তার্থ হইবে না। চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহারা খৃষ্টান হইয়া যাইবে। কিন্তু একবার ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবিষ্ট হইলে বৈদিক আলো-চনায় ক্রমে যখন তাহাদের প্রবৃত্তি ফিরিয়া যাইবে, তখন তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে হিন্দুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের কৌশল এই।

হিন্দুধর্ম্মও লোকের রুচি অনুসারে সাধনা-প্রণালীর সংগঠন করিয়াছে! জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর জন্য বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্ম অধিকার-ভেদ স্বীকার করিয়াছে। জ্ঞানীর জন্য যে সাধনা প্রণালী ব্যবস্থিত হওয়া আবশ্যক, অজ্ঞানী তাহা গ্রহণে অসমর্থ। সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে কি হইবে, মূর্খেরা তাহা গ্রহণ করিবে না। গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না। তাই হিন্দু ধর্ম্ম, জ্ঞানীর জন্য যে সাধনা-প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছে, মূর্খের জন্য তাহা করে নাই। হিন্দু ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ সাধনপথ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রবৃত্তিপথ সামান্য জনগণের জন্য; নিবৃত্তিপথ জ্ঞানী-দের জন্য। প্রবৃত্তিপথে কাম্যসাধনা, নিবৃত্তিপথে নিষ্কাম ধর্ম্ম। প্রবৃত্তিপথের অধিকার একরূপ, নিবৃত্তিপথের অধিকার অন্যবিধ। প্রবৃত্তি পথের লোক স্বর্গাদির অধিকারী, নিবৃত্তিপথের লোক জীবন্মুক্তি ও ব্রহ্মপদের অধিকারী। এই অধিকার ভেদ যখন সংসারে বাস্তবিক বিদ্যমান, তখন তদনুযায়ী ধর্ম্মসাধন প্রণালী সংগঠন না করিলে কখন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্ম সমগ্র সমাজকে গড়িতে চায়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম এই অনিবার্য্য সামাজিক অধিকার স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী জ্ঞানপথ বিভাগ করিয়া দিয়াছে। দ্বিজগণ যাহার অধিকারী স্ত্রী ও শূদ্রগণ তাহার অধিকারী নহে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এ ভেদাভেদ রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, ব্রাহ্মসমাজ প্রধা-নতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণের জন্য। শূদ্রাশূদ্র অভেদে যে ইংরাজী শিক্ষা পূর্ব্বেই দান করা হইয়াছে, সেই ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত জনগণকে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানা-লোচনায় প্রবেশ করিতে না দিলে বিষম ফল ফলিবারই ত কথা। সেই বিষময় পরিণাম নিবারণার্থ রামমোহন রায় সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীভুক্ত

জনগণকেই বেদ ও হিন্দু শাস্ত্রের জ্ঞানদ্বারে প্রবেশাধিকার দিলেন। হিন্দু বৈদিক ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বজনালোচ্য হইল। তিনি জানিতেন, যাহাদিগের অধিকার জন্মিয়াছে, তাহারা ভিন্ন অন্য লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রালোচনার অধিকার সকল লোককে দেওয়াই ভাল। যাহাদের উচ্চ জ্ঞানাধিকার জন্মিয়াছে তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা হিন্দু ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইলে, তাহারা আপনিই সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া যাইবে। যাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিল তাহারা আপনিই হিন্দু বলিয়া গৌরব করিবে। এখন তাহাই ঘটিয়াছে। অনেক ব্রাহ্ম এক্ষণে হিন্দু হইয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের এই নিগূঢ় কৌশল। এই কৌশল পাতিয়া তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা হিন্দু ধর্ম্মের দ্বারস্বরূপ হইল। যত দিন ইংরাজাধিকারে বা অপর বিজাতীয় অধিকার ভারতে থাকিবে, ততদিন ঐরূপ একটি সমাজের একান্ত আবশ্যকতা দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজকে নিত্য ভিত্তি দিয়া গেলেন।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজকে যে ভাবে গড়িয়া গিয়াছিলেন, সে ভাবে তাহাকে বজায় রাখিলে তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই প্রতিপোষক হইত। সেই জন্যই রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দুস্থাপনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রামমোহন বিলক্ষণ বুঝিতেন, লোকের সহিত ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিতে হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-গ্রন্থের বাক্য-শাসন স্বীকার করিয়া না লইলে কোন কথা চলে না।* কারণ, সামান্য লোকের বাক্য ধর্ম্মালোচনায় প্রামাণ্য নহে। যেখানে পরলোক, ঈশ্বর, এবং তদ্রূপ লোকাতীত বিষয় লইয়া কথা, সেখানে তুমি আমি কে? স্বয়ং ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া যাহা সমাজে গ্রাহ্য, তাহাই ধর্ত্তব্য ও প্রামাণ্য। এজন্য রামমোহন যখন যে ধর্ম্মীয় লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তখন সেই ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থের কথা ব্যতীত কোন কথার উল্লেখ করিতেন না। হিন্দুর নিকট বেদবাক্য, মুসলমানের নিকট কোরাণ এবং খৃষ্টানের নিকট বাইবেল ধরিয়াই তিনি ধর্ম্মালাপ করিতেন। তিনি এক দিনের তরে সর্ব্বলোকমান্য ধর্ম্মগ্রন্থের মানহানি করিতে উদ্যত হয়েন নাই। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, খৃষ্ট, মহম্মদীয়, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মে যখন একই ঈশ্বরের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন সে সম্বন্ধে কোন বিবাদ বিসম্বাদের কারণ নাই। যাহা সর্ব্ব সাধারণরূপে বিদ্যমান, সেই এক ব্রহ্মের উপাসনা লইয়া তিনি ঈশ্বরোপাসনালয় স্থাপন করিলেন। এবং তৎসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রীয় নানা গ্রন্থাবলি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম বিদ্যালোচনার উপায় করিয়া গেলেন।

খৃষ্টান, মুসলমান এবং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরোপাসনার তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, যে আর্য্যধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতির বিলক্ষণ স্বতন্ত্রতা আছে। আর্য্য ধর্ম্মের উপাসনা তাহার মুক্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তি বেদোক্ত ব্রহ্মনির্ণয়ের উপর স্থাপিত। বেদে ব্রহ্ম নির্গুণ অথচ সগুণ জগৎরূপে বর্ত্তমান। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কি? নির্গুণের উপাসনাই হিন্দুর ব্রহ্মোপাসনা। কে বলে

নির্গুণের উপাসনা নাই? নির্গুণেরই প্রশস্ত উপাসনা।

হিন্দু মতে নির্গুণ পরব্রহ্মই বিশ্বরূপে বর্ত্তমান। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা। সমগ্র বিশ্বই তিনি। সুতরাং তিনি সমস্ত জীবের আত্মা। মানবের জীবাত্মাও তিনি। জীবাত্মাই দেহী, জীবাত্মাই জ্ঞানী। তিনি দেহ ও জ্ঞানের নিত্যবস্তু। সেই জীবাত্মা সংসারী হইয়া অনিত্য সুখে লিপ্ত থাকিয়া ঘোর দুঃখ ভোগ করে। জীবাত্মার এই অবস্থাকে তাহার বদ্ধাবস্থা কহে। কেন জীব এরূপ দুঃখের বশবর্ত্তী হয়, কেন তাহার এ শোচনীয় অবস্থান্তর ঘটে, একথার মীমাংসা নাই। একথার মীমাংসা নাই, নির্গুণ ব্রহ্ম কেন সগুণ ব্রহ্মাণ্ডরূপে বর্ত্তমান, একথারও মীমাংসা নাই। এ কথার মীমাংসা করিতে গেলে আরও কথা উঠে, আমাদের জ্ঞানে সগুণ ব্যতীত অন্য কিছু উপলব্ধি হয় না কেন? যখন আমাদের জ্ঞানে সগুণ ব্যতীত অন্য উপলব্ধি হয় না তখন নির্গুণ পরম পুরুষ কেন জীবাত্মারূপে সুখ দুঃখের ভাগী হন এ কথার মীমাংসার কারণও উপলব্ধি হইতে পারে না বলিয়া, তাহার মীমাংসা নাই। কিন্তু এ কথা স্থির যে, জীবের বদ্ধাবস্থা নিশ্চয় আছে, কারণ তাহার মুক্তাবস্থা আছে। তাহার যে মুক্তাবস্থা আছে যোগই তাহার অকাট্য প্রমাণ। যখন যোগ প্রমাণ করিতেছে যে জীবাত্মার মুক্তাবস্থা ঘটে, তখন তাহার সংসারাবস্থা অবশ্য বদ্ধাবস্থা। জীবের সংসারাবস্থা যে আত্যন্তিক দুঃখের বশবর্ত্তী, সেই দুঃখের অপনয়নার্থ সাধনাই, সগুণকে নিস্ত্রৈগুণ্য করিবার উপাসনা। ত্রিগুণাত্মক জীবের নিস্ত্রৈগুণ্য সাধন জন্য হিন্দুধর্ম্মের মুক্তি-পথ স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র উপাসনা এই—এই উপাসনা, পাপ, তাপ ও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া উঠিবার পন্থা।

এই মুক্তি পথ সহজ পন্থা নহে। বদ্ধাবস্থা হইতে জীবকে মুক্ত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত জীবনব্যাপী আরাধনার আবশ্যকতা। জীবনব্যাপী সাধনায়ও তাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন; জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সে সাধনা করিতে হয়। এ জন্মে হয় তো কিয়দ্দূর হইল, আবার হয় তো জীবের পতন, পুনরায় তাহার উন্নতি, উন্নতি করিতে করিতে সহস্র জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় তবে হয় তো জীব এক জন্মে সিদ্ধ হইল। না হয় তো চিরকালই পতিত রহিয়াছে, চির কাল তাহার সংসারাবস্থা ঘটিতেছে। কিন্তু এক জন্মে না এক জন্মে কখন জীবাত্মার মুক্তি সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। জীব নিস্ত্রৈগুণ্যের সামীপ্য লাভ করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মপদে উপনীত হয়। যদি বল, একথার প্রমাণ কি? তাহার উত্তর, যোগ। যোগ করিয়া দেখ, জন্মজন্মান্তর তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যোগ প্রমাণ করিয়া দিবে, জীবাত্মা নিত্যবস্তু, শরীর ও বুদ্ধি তাহার আবরণ মাত্র, তাহার জন্ম জন্মান্তর আছে, এবং তাহার আত্যন্তিক দুঃখের অপনয়ন অসম্ভাবিত নহে। সিদ্ধগণই যোগের প্রমাণ, অসিদ্ধগণ যোগের প্রমাণ নহে, সিদ্ধগণ ব্যতীত যোগ সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার অন্যের অধিকার নাই। এই সিদ্ধগণই বেদ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং

বেদেরও প্রমাণ যোগ। বেদ যোগের প্রত্যক্ষীভূত সত্য। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ বেদ; বেদের প্রমাণ যোগ; যোগের প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। অতএব হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ জ্ঞান-চক্ষের আত্মপ্রত্যক্ষ।

কিন্তু এই যোগোক্ত সমাধি-অবস্থা সামান্য সাধনায় ঘটিবার নহে। এই সমাধি ঘটাইবার জন্য জীবকে অনেক প্রয়াস পাইতে হয়। এই সাধন পথের নাম উপাসনা। এ উপাসনা জ্ঞান মাত্র নহে, বিশ্বাস মাত্র নহে, কিন্তু ধারাবাহিক অনুষ্ঠানপথ। হিন্দুধর্ম্ম এই জন্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে অনুষ্ঠান। অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসনার সহিত আর্য্যধর্ম্মীয় উপাসনার প্রভেদ এই। কিন্তু এই উপাসনার এক অঙ্গের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসনার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। সে অঙ্গ আর্য্যধর্ম্মীয় উপাসনার এক নিম্ন স্তর। সেই নিম্ন সাধনাবস্থার নাম ঈশ্বরোপাসনা। আমরা এই সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি।

আর্য্যধর্ম্মের সাধনপথ ত্রিবিধ প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। প্রথমে তাহার উচ্চতম জ্ঞানযোগ। এই যোগে জীবের নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত হয। এই পথে জীব চরম গতি লাভ করিয়া মুক্ত বা বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানপথে, অতি কঠিন যোগাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া ক্রমে জীবাত্মা নিজ স্বরূপ দেখিতে পায়। সেই স্বরূপ ব্রহ্মপদ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার। নিজ পূর্ণ স্বরূপে উপনীত হইয়া আত্মা পরিপূর্ণ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হয়। তখন তাহার সমস্ত বদ্ধাবস্থা ঘুচিয়া যায়। যে কঠিন তপস্যায় এই পদ-লব্ধ হয় তদপেক্ষা কঠিনতর তপস্যা জীবের যোগ সাধনার দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগে জীব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে থাকে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন পায়, ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করে। জীব আনন্দময়কে দেখিয়া সেই আনন্দময়ের সহিত নিয়ত সহবাসসুখে ভোর হইয়া সমস্তই তাঁহাকে সমর্পণ করে। সমস্ত কর্ম্ম, প্রাণ, মন, ঈশ্বর পদে উৎসর্গ করে। এই অবস্থায় জীব আসিবার জন্য যে সাধনা করে, তাহার নাম ভক্তিময় নিষ্কাম সাধনপথ। এই পথের তপঃসাধনায় কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে। কর্ম্মসন্ন্যাসী জীব কর্ম্মময় সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হয়। ঈশ্বরসর্ব্বস্ব জীব এখনও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে নাই। সেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য জীব জ্ঞানময় মুক্তিপথাবলম্বী হয। ভক্তি, জ্ঞান দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া পরাভক্তিতে উপনীত হয়। পরাভক্তি আনন্দময় হইয়া যায়। আনন্দময় তাই সুখ দুঃখাতীত নির্গুণত্ব। যাহা সুখ দুঃখের অতীত তাহাই নির্গুণ, তাহাকেই অনন্ত নিত্যানন্দ কহে। সুখ দুঃখাতীত অনন্ত নিত্যানন্দময় নির্গুণত্ব লাভের জন্য ভক্ত মুক্তি-প্রয়াসী হয়। জীব প্রথমতঃ তত মুক্তি প্রয়াসী থাকে না। কিন্তু যত ঈশ্বরারাধনায় অগ্রসর হইতে থাকে, তত তাহার মুক্তির প্রতি আসক্তি জন্মে। কেহ কেহ জীবের নিষ্কাম অবস্থার নাম জীবন্মুক্তিও বলিয়া থাকেন। এই নিবৃত্তি-পথের প্রারম্ভে প্রবৃত্তির শেষ। যেখানে প্রবৃত্তির শান্তি হইতে থাকে সেইখানে নিবৃত্তির প্রারম্ভ হয়। যে পথে প্রবৃত্তিরই পরাক্রম, সেই পথের নাম কাম্য পথ। তৃতীয় পন্থা এই কাম্য পথ। এই পথ কর্ম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ। এই

কাম্যপথে জীব অনিত্য সুখের অভিলাষী হইয়া স্বর্গসুখ-ভোগ জন্য সৎপথাবলম্বী হয়। যখন দেখে স্বর্গসুখ অনিত্য, তখন জীব নিত্য সুখাভিলাষী হইয়া নিবৃত্তি পথে প্রবেশ করে। কারণ নিবৃত্তি পথই নিত্য সুখের আশ্রয়স্থান। এই কাম্যপথেও জীব ঈশ্বরোপাসক। তাহার ঈশ্বরোপাসনা গৌণীভক্তিমূলক ভজনার সাধন। এই মহা প্রবৃত্তি-পথেই সাধারণ জনগণ সমস্তই আছে। সেই সাধারণ জনগণের থাক হইতে অল্পসংখ্যক জীবই নিবৃত্তি পথের পথিক হয়। নিবৃত্তি পথের পথিক হইতে হইলে জীবকে অতি কঠিন সাধনা করিতে হয়। ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে জীবকে যে কঠিন সংযম অভ্যাস করিতে হয় তাহা এই ভজনাময় কাম্য পথের কঠোর তপস্যা। এই তপস্যায় সিদ্ধ হইলে জীব নিবৃত্তি পথে প্রবেশ করিতে পারে। কি সকাম কি নিষ্কাম উভয় বিধ ভক্তিপথের উপাস্য ঈশ্বর। ঈশ্বরোপাসনা সাকার ও নিরা-কার ভেদে দ্বিবিধ। সাকার উপাসনা সকাম পথেই অধিকতর প্রচলিত। পাপ হইতে মুক্ত হওয়া এই সকাম প্রবৃত্তি পথের প্রধান সাধনা। যাহা খৃষ্ট ধর্ম্মের মুক্তি তাহা এই পথেই রহিয়াছে।

এই ত্রিবিধ পথ, আত্মার সম্পূর্ণ গতি পথ। একে একে এই পথে অগ্রসর হইয়া আত্মা চরম গতি ব্রহ্মপদ লাভ করে। সুতরাং হিন্দুর সমস্ত গতিপথই এক উদ্দেশ্য লাভের জন্য সৃষ্ট ও সংকল্পিত। কিন্তু এই পথবিভাগ সকল পরস্পর এত সুদূরস্থ যে, প্রত্যেক পথই তৎসাধকের নিকট যেন বিভিন্নরূপে প্রতিপন্ন হইতে থাকে। সেইজন্য যাহা আদৌ এক লক্ষ্যে অনুসৃত, তাহা ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের পরস্পরে এত বিবাদ বিসম্বাদ ও তর্ক-বিচার। নিরা-কার ও সাকার উপাসকের বিবাদ কেবল স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞান ভেদের বিবাদ মাত্র। কারণ, নিরবয়ব ব্রহ্মই মন্ত্র বা শব্দ ব্রহ্ম মাত্র ব্রহ্মের স্থূল দেহই দেবতা। সাকার উপাসক বাদীদের মধ্যে বিবাদও তদ্রূপ রূপাসক্তি এবং রুচিভেদের বিচার মাত্র। নহিলে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, কোন পথই স্বতন্ত্র নহে, সমস্ত পথই এক সূত্রে আবদ্ধ। জীবাত্মা এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, যতদিন না তাহার জীবভাব ঘুচিয়া গিয়া নিত্য, কূটস্থ, অপরিণামী পূর্ণতার বিকাশ হয় ততদিন তাহার গতি এবং উপাসনার বিরাম নাই।

যেস্থলে প্রবৃত্তিপথের বিস্তার এবং নিবৃত্তিপথের উপক্রম সেইস্থলেই অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের সাদৃশ্য। এই-স্থলে আর্য্যসাধক ভক্তিপথে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং তজ্জন্য খৃষ্ট, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মীয় উপাসকের সঙ্গে একস্থানে দণ্ডায়মান। নির্গুণের ব্রহ্মাণ্ডভাব বিদ্যমান থাকাতে তাহারই অষ্টৈশ্বর্য্য সম্ভাবিত হইয়াছে। আত্মাও যোগপথে সেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়া কূটস্থ আত্মা নিজ অপরিণামী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্লেশ কর্ম্মাদি সংসার ভাবের অতীত হয়। এতদ্ব্যতীত, জীবাত্মা এবং জগৎ হইতে স্বতন্ত্র একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, ইচ্ছাময় ও করুণাময় ঈশ্বর-পুরুষসত্তা,

সূক্ষ্মবুদ্ধি কপিল, মিল প্রভৃতি দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। কারণ তাহা যুক্তিতে অসিদ্ধ। কিন্তু দার্শনিকেরা স্বীকার না করিলেও পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যতীত একজন স্বতন্ত্র পুরুষ যে ঈশ্বর-রূপে বিদ্যমান আছেন, উপাসনার্থ নিম্ন শ্রেণীর ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন। ভক্তিপথে দ্বৈতমত গ্রাহ্য। এইখানে রামমোহন দেখিলেন, হিন্দু, যবন ও খৃষ্টান ঈশ্বরোপাসক মিলিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের উপর স্তরে যে ঘোর অদ্বৈত-বাদ, যে অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড এক, তাহা হিন্দুধর্ম্মের নিম্নস্তরে অদৃশ্যপ্রায়; যদি থাকে, তবে এমত প্রচ্ছন্ন ও গূঢ়ভাবে আছে যে সামান্য জনগণের বোধাতীত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মীয় ঈশ্বর-জ্ঞানে ঈশ্বর জগদতীত স্বতন্ত্র পুরুষ। রামমোহন এই দ্বৈতমত গ্রহণ করিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের নিম্নস্তরের দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সেই স্তরের স্থূল মূর্ত্তি পূজার উপাসনা লইলেন না। কারণ মূর্ত্তি পূজার উপাসনা খৃষ্ট ও মহম্মদীয় মতবিরুদ্ধ। এত নির্ব্বাচন করিয়া তবে তিনি তিনকে এক করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত কৃতবিদ্যগণ যে খৃষ্ট ধর্ম্মীয় ঈশ্বর-জ্ঞানে সম্পন্ন, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সেই ঈশ্বরজ্ঞান পাইলে তবে তাহাতে আসিয়া যোগ দিবেন। একবার যোগ দিলে তাহারা হিন্দু ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় সেই দ্বৈতমত হইতে অনায়াসে অদ্বৈত-মতে উঠিতে পারিবে। প্রথমে "একমেবা দ্বিতীয়মের" যেরূপ অর্থে এক ব্যতীত দুই নয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বিভিন্নার্থে "এক ব্যতীত দুই নয়" হইয়া যাইবে। তাহাদের সাহায্যার্থ সমাজের ঈশ্বরোপাসনার মধ্যেই অদ্বৈত বাদ প্রতিপোষক অনেক স্তবস্তুতিও নিহিত আছে। হিন্দু দর্শনও তাহা-দিগকে সহায়তা করিবে। তাহারা দেখিতে পাইবে, যাহা ইউরোপীয় শুষ্ক Pantheism তাহা সরস ধর্ম্ম-প্রণালী-রূপে গঠিত হইয়াছে।

হিন্দুসাধনাপথে এইরূপ সর্ব্ববিধ মতামত পরিদৃষ্ট হয়; কারণ হিন্দু সাধনা সর্ব্ববিধ অধিকারীর জন্য। যিনি যেরূপ জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন না কেন, হিন্দু সাধনপথে একস্থানে না হয় অন্য স্থানে তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন। মানব জ্ঞানের যত ভেদাভেদ হউক না কেন, সর্ব্ববিধ প্রপঞ্চ দিয়া আত্মাকে উঠিতে হইবে। আত্মা সেই প্রপঞ্চের * পঞ্চবিধই ভেদজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু অবশেষে যখন সেই প্রপঞ্চ স্বরূপ ভেদা-ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইবে, তখন আত্মা নিজ স্বরূপ দেখিতে পাইবেন।

বেদে ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম নিম্নতর ভক্তের জন্য, পরব্রহ্ম জ্ঞানী ভক্তের জন্য। যে ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত নির্গুণ পরমাত্মা, যাহা বিশ্বাত্মা রূপেই কেবল অনুভূত, তাহাই পরব্রহ্ম। ব্রহ্মই পরব্রহ্মের সগুণ মূর্ত্তি। (Phenomenon) বা ঐশ্বর্য্য। আর যাহা ব্রহ্মভাবের অতীত তাহাই পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের সূক্ষ্ম দেহ ব্রহ্ম, এবং স্থূল দেহ এই ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মও কখন কখন পরব্রহ্ম অর্থেও ব্যবহৃত হইতে

* জীব হইতে ঈশ্বর ভেদ, জড় হইতে ঈশ্বর ভেদ, জীব হইতে জড়ের ভেদ, জীবের পরস্পর ভেদ এবং জড়ের পরস্পর ভেদ।

দেখা যায়। আত্মা যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করে। তৎপরে পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম ভাবে উপনীত হয়। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায়। ক্ষুদ্র নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতি-পথই আত্মার গতি—অনন্ত সাগরে গতি। সেই গতি, সকল ধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতিতে আছে,—হিন্দু সকাম ও নিষ্কাম উপাসনায় আছে—দেবদেবীর উপাসনা-মন্দিরে আছে—চর্চ্চে আছে, মসিদে আছে, মঠে আছে, চৈত্যে আছে, ব্রাহ্ম সমাজে আছে,—সর্ব্বধর্ম্মে আছে, সর্ব্ব পথেই আছে। কিন্তু কেবল হিন্দু সাধনায় সেই পথের শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য ধর্ম্মে যে পথের কেবল অংশ মাত্র প্রতীত, হিন্দুধর্ম্মে সেই পথের সম্পূর্ণ রেখাপাত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম এইজন্য সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। যিনি যেরূপে ব্রহ্মোপাসনা করুন না কেন, সমস্ত উপাসনা সেই এক দিকেই অগ্রসর হয়, অগ্রসর হইয়া কেবল হিন্দু মুক্তিপথেই তাহার চরম গতি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদগীতায় এই মহাতত্ত্বের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর মুক্তিপথ এতই প্রশস্ত। সে পথে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সী, শিখ, ব্রাহ্ম, সকলেই আছেন। ইউরোপীয় Pantheism দার্শনিক তত্ত্বমাত্র, আর্য্য Pantheism বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-প্রণালী।

যাহার রুচি যে পথ অবলম্বন করুক না কেন তাহাতে ক্ষতি নাই। জোর করিয়া রুচির পরিবর্ত্তন করা যায় না—করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। কিন্তু সর্ব্বরুচি একই উপাসনামুখী হইয়া আছে। হিন্দুর কার্য্য, কেবল উন্নতির পথ দেখাইয়া দেওয়া। হিন্দুর উপাসনা পথের সীমা নাই, গতির সীমা নাই; অনন্ত তাহার গতি, অনন্ত তাহার উপাসনা;—হিন্দু তাহাই প্রদর্শন করিবেন। কারণ, বেদে ও হিন্দুশাস্ত্রে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। রামমোহনও সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্য ধর্ম্ম আত্মার গতিপথের শেষ দেখাইয়া দেয়। কারণ অন্যধর্ম্মের ঈশ্বর আত্মা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু অসীম যাহার গতি, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিলে, তাহার সন্তোষ হইবে কেন? সকল ধর্ম্মই এজন্য সীমা বিশিষ্ট, অসম্পূর্ণ ও নীরস। যাহাতে আত্মার অনন্ত ভাব সাধন হয়, তাহাই আত্মাকে পূর্ণতায় আনে। আত্মার পরিপূর্ণতা কি, তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্মই প্রকাশ করে। সেই পরিপূর্ণতা সাধনের বিশিষ্ট উপায় কেবল হিন্দু ব্রহ্মোপাসনা এবং হিন্দু ব্রহ্মোপাসক ভিন্ন আর কেহই সে পূর্ণতায় উঠিতে পারে না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সে পূর্ণতায় উঠিতে হইলে এই হিন্দু-পথ দিয়াই যাইতে হইবে।

রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ কোন সামাজিক ধর্ম্মরূপে আদৌ সংকল্পিত হয় নাই। তাহা উপাসনা-সমাজ মাত্র। উপাসনার সহিত অনুষ্ঠানের যোগ না হইলে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাই রামমোহন হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ ধ্যান ও স্তব স্তুতি নহে। হিন্দুধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম প্রণালীও বটে। ঈশ্বরের পূজার সহিত হিন্দু সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানই তাঁহার উপাসনার সম্পূর্ণতা সাধন করে। সমগ্র সমাজ লইয়া

ঈশ্বর। মানব শুদ্ধ ভক্তি নহে, মানব শ্রদ্ধা, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা, দম্ভ, বীরত্ব, মৃদুতা, সহিষ্ণুতা, আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতি সকলই। এই সমস্ত বৃত্তির আনুষ্ঠানিক উপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচারের শাসনে সেই অনুষ্ঠান সকল শাসিত, নিয়মিত এবং নিয়োজিত। হিন্দুর আনুষ্ঠানিক উপাসনার বিরোধী রামমোহন ছিলেন না। তিনি সদনুষ্ঠানের সহায় ও মিত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু অনুষ্ঠান বিরহিত ছিল না। হিন্দুর আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানই হিন্দুকে হিন্দু করিয়াছে। রামমোহন নিরাকার উপাসনা মাত্র স্থাপন করিয়া হিন্দু অনুষ্ঠান সকল বজায় রাখিয়া চলিতেন বলিয়া অনেকগুলি হিন্দুর মিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে হিন্দু অনুষ্ঠানের ও আচার ব্যবহারের ক্রমে ত্রুটি পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ বেদ ও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অমান্য করিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দু রীতি নীতি এবং আচার ব্যবহারও পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাই হিন্দুর অশ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মসমাজের অবনতির কারণ হইল।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শনে যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহারই ক্রমে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত বৈদিক বেদী অধিকার করিয়া বসিলেন। যে হিন্দু উপনিষৎ, দর্শন, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা নিহিত, তাহা দেখিবার দর্শনশক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াই নিজ নিজ ইংরাজী জ্ঞান গৌরবে স্ফীত হইয়া বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলেন। বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইলেই সমস্ত অলৌকিক বিষয়ের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইল, এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্মের মূল ধ্বংস হইল, একথা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। আত্মজ্ঞান গৌরবে স্থির করিলেন, ধর্ম্মের প্রামাণ্য বেদ নহে, মানুষের সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি। ইংরাজী শিক্ষার জ্ঞানচক্ষে ও সহজজ্ঞানে তাঁহারা জগৎসংসার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। স্থূলদর্শী খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ন্যায় সগুণ ঈশ্বরের সূক্ষ্মমূর্ত্তি উপাসক ব্রাহ্মগণ, স্থূল মূর্ত্তি পূজার সাধনা ও উপাসনা প্রণালীকে দুহাতে লাঠি মারিয়া বসিলেন যে বেদের প্রামাণ্য চিরকালই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে—যাহা প্রাচীনকালে বেদব্যাস, কপিল, অক্ষপাদ, মনু, যাজ্ঞবল্ক, বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহাজ্ঞানীগণ স্বীকার করিয়া লইয়া বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রামাণ্য ব্রাহ্মগণ অস্বীকার করিয়া কোথায় দাঁড়াইলেন? দাঁড়াইলেন যেস্থানে তাহার ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নহে। সুতরাং বাত্যাতাড়িত পোতের ন্যায় ব্রাহ্মগণ সংসার সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। যে বিচিত্র সহজজ্ঞান ও অন্ধ মনুষ্য-বুদ্ধির উপর তাঁহারা ধর্ম্মকে স্থাপন করিলেন তাহার স্থিরতা অভ্রান্ততা ও প্রামাণ্য আজিও কেহ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। বেদ পরিত্যক্ত হওয়াতে, ব্রাহ্মগণের গুরু হইলেন পার্কার ও নিউম্যান। ব্রহ্মবিদ্যার আদিদেশ পরিত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র পারে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষুদ্র পাঠশালে নব্য ব্রাহ্মগণ হাতে খড়ী দিলেন। তাঁহাদের অন্ধ সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি দেশীয়হিন্দুধর্ম্মে কিছুই

খুঁজিয়া পাইল না। বিলাতী ও মার্কিন ব্রহ্মবিস্থায় পারদর্শী হইয়া তাঁহারা একেবারে গগন ফাটাইয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের তরঙ্গের বল দেখিয়া মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ নিভৃতে একাকী নীরব হইয়া বসিলেন। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, সকলই ব্রাহ্মনিনাদে থরথরি কম্পবান। নূতন সুরা হিন্দুসমাজের পুরাতন বোতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ফল এই দাঁড়াইল যে, যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার আলোচনা এবং সমর্থনার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সেই ধর্ম্ম ওসমাজের প্রতিকূল হইয়া উঠিল। নব ব্রাহ্মদলেরা সর্ব্ব ধর্ম্মমতেরই বিরোধী হইয়া এক নবধর্ম্মের সূত্রপাত করিতে গেলেন। ইংরাজী-শিক্ষা-প্রণোদিত সহজ জ্ঞান এবং প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় যাহা ঘটিবার তাহা আজি ঘটিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুঋষিগণের সমীচীন বৈদিক জ্ঞান ও প্রবৃত্তির সহিত আধুনিক ইংরাজীওয়ালাদের সহজজ্ঞান এবং প্রবৃত্তির যে অনেক বৈলক্ষণ্যঘটিবে,তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। কতিপয় নব্য ব্রাহ্ম একরূপ বিধান বাহির কবিয়া হিন্দু আচার ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্য ব্রাহ্মেরা তাহা গ্রহণ করিলেন না। কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইল। রামমোহন রায়ের হিন্দু উপাসনা-সমাজ অহিন্দু আচারে পরিপূর্ণ হইল। ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মণের নিদর্শন অর্থপূর্ণ যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিলেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের হিন্দু ব্রাহ্ম-সমাজকে ধ্বংস করিয়া সমাজের বহির্দ্দেশে একধারে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে নবমত স্থাপন করিয়াছেন সেই পর্য্যন্তই তাঁহাদের উন্নতি; আর নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। তাঁহারা এখন নিতান্ত নির্জীব হইয়া রহিয়াছেন; সে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ আর নাই। কেবল বৎসরান্তে একদিন জানা যায়, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি আজিও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজের আদি সংকল্প যাহা ছিল, তাহা যদি ব্রাহ্মগণ বজায রাখিয়া চলিতেন তাহা হইলে আজি তাঁহারা অনন্তপথের যাত্রী হইতেন। তাঁহাদের উপাসনায় ভক্তি ও জীবন সঞ্চারিত হইত। কিন্তু তাঁহারা সে পথও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা খৃষ্ট এবং অন্য কোন ধর্ম্মীয় উপাসনা পথও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা লৌকিক খৃষ্ট ধর্ম্মের ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু খৃষ্টানদের মুক্তিপথ-নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি আশ্রয় করেন নাই। বাস্তবিক, আধুনিক নব্য ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট। ধর্ম্মের যে সমস্ত প্রধান লক্ষণ, তাহা নব্য ব্রাহ্মদল প্রণীত নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মে কিছুই নাই। আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন করিতেছি ঃ—

১। তাহাতে কোন মুক্তিপথ নির্দ্দিষ্ট নাই। মুক্তিপথই সকল ধর্ম্ম প্রণালীর প্রধান লক্ষণ। মুক্তিপথ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তদনুসাধক কোন উপাসনা-পদ্ধতি সম্ভবিতে পারে না। কোন সাধনা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে সমাজের সহিত ধর্ম্ম মিশিতে পারেনা এবং ধর্ম্মের জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয় না।

২। ধর্ম্মকে লৌকিক করিতে হইলে শুদ্ধ যে নির্দ্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজন এমত নহে, লোকের অনুশাসনার্থ

আপ্তবাক্যের আবশ্যকতা। নব ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন আপ্তবাক্যের শাসন স্বীকার করে না। যদি বল, প্রতি লোকের আন্তরিক আপ্তবাক্যই গ্রাহ্য, তাহা হইলে প্রতি লোকেই এক এক বেদ-বেত্তা হইয়া বসেন এবং পৃথিবীকে মতভেদের কলহ ও কলরবে পরিপূর্ণ করেন। অধুনিক ব্রাহ্মসমাজ এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। কোন ধর্ম্মগ্রন্থের শাসন না থাকিলে ধর্ম্ম সামাজিক হইতে পারে না। যাহার উদ্দেশ্য লোক-রক্ষা ও হিত-সাধন করা তাহা যদি সামাজিক না হইল, তবে তাহার প্রচার কিরূপে সম্ভবিতে পারে? যাহা সংসারী ও গৃহীর কার্য্যাবলি নিয়মিত না করিতে পারে, তাহা কিরূপে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম হইবে? ধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক না হইলে তাহা সমাজ চালনে অসমর্থ। এই অনুষ্ঠান সকল কোন ধর্ম্মগ্রন্থানুমত হওয়া চাই। কারণ তোমার আমার কথা সাধারণ লোক গ্রাহ্য করিবে না। তাহারা চায় ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যবস্থা। সেরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্পূর্ণ অভাব।

৩। যদি ইংরাজী শিক্ষিত কৃতবিদ্যগণের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়, তবে তাহার ঐশ্বরিক জ্ঞান সুবিশুদ্ধ হওয়া চাই। যে ঐশ্বরিক জ্ঞান যুক্তিতে তিষ্ঠিতে পারে না, সে জ্ঞান কখন সূক্ষ্ম বুদ্ধিশীল ব্যক্তিগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিপোষক আপ্তবাক্য আছে, তাই খৃষ্টধর্ম্মে সেরূপ ঐশ্বরিক জ্ঞান শোভা পাইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে সে শাসন কোথায়? যদি সে শাসন পরিত্যক্ত হইল তবে যুক্তিবলে যাহা সিদ্ধ হইবে তাহাইতো লোক গ্রাহ্য করিবে। কিন্তু নব্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহীত ঐশ্বরিক জ্ঞানের যখন যুক্তিবলও নাই তখন তাহা কৃতবিদ্যগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। ঐশ্বরিক জ্ঞানের কোন পাকা ভিত্তি আবশ্যক।

৪। শুদ্ধ যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের পাকা ভিত্তি আবশ্যক এমত নহে ধর্ম্ম যে সকল পারলৌকিক বিষয়ের উপরে স্থাপিত, ব্রাহ্মধর্ম্মের সে সমস্ত পারলৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কি? সহজজ্ঞান না ঈশ্বরজ্ঞানকে স্থাপন করিতে পারে, না পারে লৌকিক বিষয় সমস্ত বিকাশ করিতে। পরলোকে জীবাত্মার গতিপথ ও অবস্থা কি সহজজ্ঞান নির্দ্দেশ করিতে পারে? পারিলে ভাবনা ছিল কি? ঈশ্বরকে যদি সহজজ্ঞানে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে এত তপস্যার সৃষ্টি কেন? সহজজ্ঞানে যদি পরলোক প্রতীতির সাম্যজ্ঞান হইত, তবে লোকের আপ্তবাক্যের আবশ্যকতা হইত না। বুদ্ধি যেমন অন্ধ, সহজজ্ঞান তদপেক্ষাও অন্ধ। সুতরাং সহজজ্ঞান সকল লোককে কোন নির্দ্দিষ্টপথে আনিতে পারে না। আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান ও সংস্কারকে সহজজ্ঞান বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এজন্য অনেক দার্শনিকেরা সহজজ্ঞানের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। মানবের সমস্ত জ্ঞানকে অর্জ্জিত জ্ঞান বলেন। কোন্ জ্ঞান অর্জ্জিত, কোন্ জ্ঞান সহজ, তাহা নিরূপণের উপায় কি? ব্রাহ্মগণ এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার ও অর্জ্জিত জ্ঞানকে সহজজ্ঞানরূপে ধরিয়া লয়েন। তদ্রূপ ভ্রান্তি ছাড়িয়া দিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের কোন ধর্ম্মজ্ঞানই নাই। আশৈশব শিক্ষা প্রভাবে তাঁহারা যে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন আজি সেই

সমস্ত জ্ঞান লইয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রণালী গড়িতে চান। কিন্তু সে পথে নেতা হইবে কি? ভ্রান্তিরাশি হইতে সত্য উদ্ধার করিবার উপায় কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি কি হইতে পারে এজন্য আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু বৈদিক হিন্দু ধর্ম্মে পারলৌকিক পথ সমস্ত অতি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। কর্ম্মফল বাদ সেই ধর্ম্মের একটি মহা পারলৌকিক রত্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগই তাহার অকাট্য প্রমান। সেই কর্ম্মফলবাদ হিন্দুধর্ম্মে জীবনীশক্তি এবং হিন্দুসমাজের ধর্ম্মনৈতিক প্রাণ। তাহা পাপের দমন, পুণ্যের উৎসাহদাতা, শোকের সান্ত্বনা, রোগের শান্তি, দুঃখীর পরিতোষ, সন্তাপের মহৌষধি, কর্ম্মের উদ্বোধন এবং সমাজের জীবন। তদ্রূপ কোন পারলৌকিক কথা ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ তাহা সহজজ্ঞানের অতীত। পারলৌকিক কোন জ্ঞানই ব্রাহ্মধর্ম্মকে উত্তপ্ত ও রঞ্জিত করিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক জ্ঞানমাত্র; নীরস ও উৎসবহীন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কেন বলি? তাহা ধর্ম্ম নামের নিতান্ত অযোগ্য। ধর্ম্মের কোন লক্ষণ তাহাতে বর্ত্তিতে পারে না।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মে উপাসনার আবশ্যকতা কি? যখন পরকাল নাই, ঈশ্বর কি তাহাই ঠিক নাই, তখন আবার কাহার উপাসনা? কিসের উপাসনা? যদি ঈশ্বর থাকেন সেই ঈশ্বরের সহিত মানবের ইহকালের সম্বন্ধ। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার পারলৌকিক গতি নিরূপিত হইতে পারে না। ইহজন্মে সুখদাতা, মঙ্গলদাতা, দণ্ডদাতাই ঈশ্বর। তদ্ভিন্ন ঈশ্বরের সহিত অন্য সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিতেই পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ নাই। যদি থাকে তবে সে সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা কোন্ উপায়ে স্থির করিবেন? আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত মানবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহকালীন সুখদাতার নিকট কেবল সুখের জন্যই প্রার্থনা সম্ভবে। সে প্রার্থনা কি তিনি শুনিবেন? জগৎ কেবল কতকগুলি নিয়মাধীন মাত্র। সেই নিয়ম পালনের উপর সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তবে আর ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ কি? বৌদ্ধধর্ম্মে এই নিয়মই বিধাতা। বৌদ্ধেরা জাগতিক নিয়মের পূজা করেন, স্তব স্তুতি করেন। ব্রাহ্মগণেরও সেই পর্য্যন্ত উপাসনা হইতে পারে। অন্য সম্ভবে না। তাঁহারা জোর করিয়া এক জন ঈশ্বর খাড়া করিয়াছেন, খাড়া করিয়া পিতা মাতা ভাই বন্ধু বলিয়া তাঁহার পরিতোষ সাধনে উদ্‌যোগী হন। উদ্‌যোগী হন, কেবল ইহজন্মে সুখী হইবার জন্য। গোটাকতক মিষ্ট কথা বলিয়া মিষ্টান্ন ভুলাইয়া লইতে চান। কিন্তু জগতের নিয়ন্তা সে পাত্র নহেন। অখণ্ড নিয়ম ব্রাহ্মগণের জন্য রাখিয়াছেন। সেই নিয়মে একদিকে যেমন সুখ, অন্যদিকে তেমনি উদ্যত বজ্রনিপাত—অশান্তি, ক্লেশ, সন্তাপ, দুঃখ, দণ্ড, মোহ, যন্ত্রণা। তাঁহাকে ভালবাসিতে যাইবে, না ভয় করিবে? প্রীতির সহিত ভয়ের সামঞ্জস্য কোথা! পৃথিবীতে অবিমিশ্র মঙ্গল এমত কিছু নাই, যে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় ও করুণাময় বলিবে। করুণাময় বল, আবার

তাঁহাকে ঘোর নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদাতা বল। মঙ্গলের সহিত যেমন অমঙ্গল মিশ্রিত, তেমনি অমঙ্গলের সহিত মঙ্গল মিশ্রিত, যাহা একের মঙ্গল তাহা অন্যের অমঙ্গল, যাহা আমার মৃত্যু তাহা গৃধিনীর ভোজ। যদি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল পাইয়া তাঁহাকে মঙ্গলময় বল, তবে সেই একই ন্যায়ে মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল পাইয়া তাঁহাকে অশিবদাতা বলিতে হইবে নহিলে বল জগতে মঙ্গলামঙ্গল কিছুই নাই, অথবা তোমার বুঝিবার শক্তি নাই। তবে তুমি দাঁড়াও কোথায়? তোমার ঈশ্বরের স্বরূপ কি? যদি মানিতে হয় মান, নিয়মই সর্ব্বশক্তিমান্। তবে বৃথায় তোমার ভজনা, বৃথায় তোমার উপাসনা! ব্রাহ্ম নিরাশ! সহজজ্ঞান ঈশ্বরে উপনীত করিতে পারিলে না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে আশা উজ্জল সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত। এজগৎ ঘোর দুঃখময় বলিয়া হিন্দু অগ্রেই ধরিয়া লইয়াছেন। সেই সংসারের পাপ তাপের শান্তি সাধনাই হিন্দুর মুক্তিপথ ও উপাসনা। পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মে এ উপাসনা-পদ্ধতি নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম বল? তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা মাত্র।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে, ধর্ম্মে যাহা যাহা আবশ্যক, সামাজিক ধর্ম্ম-প্রণালীর যে সমস্ত লক্ষণ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহা নাই; সম্ভবিতেও পারে না। তাই দেখিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক্ষণে কৃতবিদ্যগণের অশ্রদ্ধার বিষয় হইয়াছে। তাহাতে মানব আত্মা সন্তৃপ্ত হইতে পারে না। তাহাতে ধর্ম্ম পিপাসা নিবারণ হইতে পারে না। তাহা হইতে বরং নাস্তিকতা-বিষ সম্ভূত হইবারই সম্ভাবনা। অন্যান্য ধর্ম্মে সমুদ্র মন্থনে অমৃত পাইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মে সমুদ্র মন্থনে গরল উঠিবে। বেদ মন্থনের ফল অমৃত আর মানব বুদ্ধি ও জ্ঞান-মন্থনের ফল কালকূট। পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের রূপক এই। জ্ঞানী মহাভারতের টীকাকার গণেশ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ কি একথা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা হয় তো পুরাণের নাম শুনিবামাত্র কাণে অঙ্গুলি দিয়া বসিবেন। আমাদের পুরাণ অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট পুরাণের চৌদ্দপুরুষ বাইবেল ভাল, কোরাণ ভাল। হা অন্ধতা! তুমি কোথায়! তোমার কি রূপ এই!!

ব্রাহ্মধর্ম্মে যে নাস্তিকতার গরলোদ্ভাবনের সম্ভাবনা, কেবল হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ-জ্ঞানে সেই নাস্তিকতার নিরসন হয়। সেইজন্য ইংরাজীশিক্ষিত কৃতবিদ্য নাস্তিক আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া তিনি নাস্তিকতার নিরসন করিয়া এক শান্তিময় সুখদেশ দেখিতে পান। সেই দেশ হিন্দুধর্ম্মোক্ত মুক্তিপথ। এই মুক্তি পথেই রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। আজি নব্য ব্রাহ্মগণ যদি ফিরিয়া সেই মাতৃক্রোড়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে নবজীবন সঞ্চারিত হয়। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া না

যাইবেন তো কোথায় যাইবেন? যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মপ্রণালী রূপে দাঁড়াইতে পারে না, যখন তাহার স্বতন্ত্র জীবন অসম্ভব, তখন ব্রাহ্মগণকে হিন্দু-ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই যোগ যত শীঘ্র সিদ্ধ হয়, ততই মঙ্গল, ততই ভ্রষ্টাচার নিবারিত হইয়া আসিবে। আর ভ্রষ্টাচার দেখা যায় না! ভ্রষ্টাচার নিবারিত হইলে হিন্দুসমাজের শান্তি বিধান হইবে।

জীনৎ মহল।

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লীশ্বরী।

পূর্ব্বে যে নগরী ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, যাহার সিংহাসন জন্য প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময়াবধি ঘোরতর সংগ্রামে, ভারতীয় ইতিহাসের ঘোরতর পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে, যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে এপ্রবন্ধে তদ্বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যরবি যখন কেন্দ্রস্থ হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রোজ্জ্বল প্রতিভা বিকীরণ করিত, তখন দিল্লী নগরী প্রায় বিংশতি লক্ষ মানবের অধিবাস ভূমি ছিল। পরাক্রমশালী দুর্দ্দান্ত উরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হইলে, মোগল সম্রাটগণ নামমাত্র ভারতের অধীশ্বর রহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ও তৎপরে ইংরাজগণের আশ্রয়াধীনে থাকিয়া মোগল সম্রাটের রাজেন্দ্র ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল; দিল্লীও কালের প্রভাবে এমন নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে জীনৎ মহল যখন ইহার অধীশ্বরী তখন উক্ত রাজধানী কেবল দুইলক্ষ মাত্র অধিবাসীর বাসভূমি হইল। *

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঘোরতর বিদ্রোহে যে সমুদয় প্রভাবশালী ব্যক্তির অভ্যুত্থান হয়, তন্মধ্যে সুন্দরী জীনৎ মহলের নাম সুবিখ্যাত। ঘোরতর দুর্দ্দিনে, যখন সাধারণ ব্যক্তি মাত্রকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়, জীনৎ মহলের তৎকালীন স্থিরবুদ্ধি ও অবিচলিত অধ্যবসায় সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিত। এই রমণীর অটল পতিভক্তি ও গৃহকার্য্যে অনুরক্তি, তাঁহার বৃদ্ধ স্বামীর নিরতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। অশেষ সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়া, অপরিসীম দুরবস্থার কঠোর ক্লেশ, তিনি যেরূপ সহিষ্ণুতা ও সাহসের সহিত সহ্য

* History of the Indian Mutiny Vol 1. p. 71.

করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ, প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। এই অশেষ গুণ সম্পন্ন রমণী ভাতনির রাজের আদরের দুহিতা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ভাতনির রাজগৃহ আলোকিত করিয়া জীনৎ জন্ম গ্রহণ করেন। ভাতনির আজমিরের উত্তর পূর্ব্ব বিভাগে স্থিত। জীনৎ এর পিতা দিল্লী রাজ দরবারে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন সম্রাট আকবরসাহের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মির্জ্জা আবুজাফর যদিও ষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি ভাতনির রাজের নিকট তাঁহার সুন্দরী তনয়ার পানি গ্রহণের প্রস্তাব করিলে, ভাতনির রাজ এই প্রস্তাব দুর্লঙ্ঘ্য বোধে স্বীয় তনয়াকে এ সমুদয় জ্ঞাত করিলেন। জীনৎ এ সময়ে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। জনকের নিকট যদিও তিনি জানিলেন, যে যাঁহার সহিত তাঁহার ভবিষ্য জীবন ও অদৃষ্ট,অবিচ্ছিন্নরূপে আবদ্ধ হইবে, তিনি বৃদ্ধ, তথাপি ভবিষ্যতে দিল্লীশ্বরী হইব, এই মোহিনী আশায়, তাঁহার জীবন সহচরের বার্দ্ধক্যে দৃক্‌পাত করিলেন না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে জীনৎ মহল বৃদ্ধ যুবরাজের সহিত পরিনীত হইয়া সম্রাট প্রাসাদে আনীত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও অশেষ গুণ গ্রামে, বৃদ্ধ স্বামী মুগ্ধ হইয়া জীনৎকে মহল উপাধি দিলেন। সেই অবধি এই রমণী জীনৎ মহল নামে অভিহিত হইতেন। অল্পকাল মধ্যেই জীনৎ সপত্নীগণ মধ্যে স্বামীর প্রিয়সী হইয়া উঠিলেন।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ২৮ এ সেপ্টম্বরে আকবর সাহ পরলোক গত হইলে; যুবরাজ মির্জ্জাআবুজফর ৬৪ বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহন করিয়া, মহম্মদ সুরাজ উদ্দিন সাহ গাজী নামধারণ করিলেন। সংক্ষেপে ইহার নাম ইতিহাসে মহম্মদ বাহাদুর নামে খ্যাত, আমরাও এই প্রবন্ধে এই নামেই উল্লেখ করিব। মহম্মদ বাহাদুর সম্রাট সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে। জিনৎ মহলের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি এখন দিল্লীর সম্রাজ্ঞী। যদিও দিল্লীর সম্রাটগণের পূর্ব্বগৌরব ও প্রতিভা লোপ পাইয়াছিল, তথাপি সম্রাট নামের মাহাত্ম্য তখনও ভারতীয়গণের হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই। তখন ভারতীয় অন্যান্য নরপতিগণ, এক প্রকার স্বাধীন হইলেও, দিল্লীর সম্রাটকে সম্মান সূচক কর দান করিত। এই মহোচ্চ গৌরবভূষিতা হইয়া জিনৎ মহল আপনাকে ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার সদ্‌গুণ সমুদয় কিছুই বিলুপ্ত হয় নাই, প্রত্যুত সম্রাটের প্রিয়তমা ভার্য্যা হইয়া, সপত্নী গণ মধ্যে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াসে অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া, কিসে বৃদ্ধ পতির ক্লেশ মোচন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইলেন। স্বামীসেবারূপ মহৎ ব্রতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। স্বামীর নিরতিশয় প্রিয় হইয়া, তিনি সপত্নীগণের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই অশেষ গুণবতি সুন্দরী কামিনী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলে, বৃদ্ধ স্বামীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তিনি স্নেহভরে এই সন্তানের নাম জুমাবখৎ রাখিলেন।

জিনৎ মহল ক্রমশঃ স্বামীর এত প্রিয় হইয়া উঠিলেন, যে সম্রাটের সমুদয় কার্য্য—কি সাংসারিক, কি রাজনৈতিক কিছুই তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত সম্পাদিত হইত না। জীনৎ মহল অতি শীঘ্রই জানিতে পারিলেন—যে তাঁহার স্বামী ইংরাজ রাজের প্রতি বড় অনুরক্ত নহেন। কেন ইংরাজের প্রতি সম্রাটের এই ভাব উপস্থিত হয়, তাহা জানিতে হইলে ঔরঙ্গজেবের পর, দিল্লী সম্রাট্গণের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৈমুরবংশ ও ইংরাজরাজ।

মহারাষ্ট্র বিজয় বৈজয়ন্তীর সম্যক্ অবমাননা সাধন করিয়া যখন সুবিখ্যাত বৃটিস সেনানী, ১৮০৩ খৃঃ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরে দিল্লী প্রবেশ পূর্ব্বক, ঔরঙ্গজেবের পুত্র বৃদ্ধ ও অন্ধ সাহআলমকে মহারাষ্ট্রগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন, তখন ইংরাজরাজ, সম্রাট সম্বন্ধে কি বন্দোবস্ত করিবেন তদ্বিষয়ে ভাবিত হইলেন। সম্যক্ বিবেচনার পর ইহা স্থির হইল যে সম্রাট কেবল দিল্লী রাজপ্রাসাদের অধীশ্বর থাকিবেন, তত্রত্য অধিবাসীর মরণ জীবন তাঁহার উপর নির্ভর করিবে। সম্রাট তাঁহার ও তাঁহার পরিবারগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৭৬,৫০০৲ টাকা পাইবেন, তন্নিমিত্ত দিল্লীর কতকগুলি জমির খাজনা-নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল এবং ইহাও স্বীকার করা হইল, যে ঐ নির্দ্দিষ্ট জমির খাজনা বর্দ্ধিত হইলে, এই বৃত্তিও সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইবে। *

এইরূপে যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়া, জগতের শ্রেষ্ঠতম রাজেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত, আজ কালের কুটিলপ্রভাবে তাঁহাদের বংশধর, বণিকশাসকগণের বৃত্তিভোগী হইলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার স্বাধীন ক্ষমতার লোপ হইল, তাঁহার সাম্রাজ্য নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। *

১৮০৬ খৃঃ অব্দে ১৮ই ডিসেম্বরে সাহআলম ইহজগত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সংসারের সকল জ্বালা এড়াইলেন। তাঁহার পুত্র আকবরসাহ সম্রাটপদে অধিরূঢ় হইবার কিছুকাল পরে, ইংরাজরাজ-প্রদত্তবৃত্তি ১ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হয়, তন্মধ্যে ৭০০০ টাকা যুবরাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্ধারিত রহিল। †

---

* Mill's History of British India, continued by H. H. Wilson, fifth edition. Vol. viii p. 17

* History of the Sepoy War by Sir John Kaye Vol. 11 pp-5-6 Our Indian Empire by R. Montgomery Martin vol. III p 105.

† Governor General's Minute 17th June, 1809.

কিন্তু আকবরসাহ বহুল জ্ঞাতি, পরিবার ও অনুচরগণের ভরণপোষণার্থ উক্ত বৃত্তি যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন না। রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে প্রায় দ্বাদশ সহস্র জীবের ভরণপোষণ জন্য উক্ত বৃত্তি অত্যল্প-জ্ঞানে তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে বলিলেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন রাজপরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ যে ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যখন উহার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ইংরাজের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত তাঁহার প্রাপ্য বৃত্তি আরও বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। একবার এ বিষয় ইংলণ্ডে উত্থাপন করিবার বাসনায় সম্রাট সুবিখ্যাত বাঙ্গালি রামমোহন রায়কে, রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া, ইংলণ্ডে তাঁহার পক্ষ সমর্থন জন্য, দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলে, ভারত রাজসভার সভ্যগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্টাচার, ভদ্রতা, গভীর জ্ঞান ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। *

রামমোহন রায় এইরূপ মহোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৌত্য ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারলের অননুমোদিত হওয়ায়, ভারত-রাজসভা দিল্লী সম্রাটের বিষয় হস্তক্ষেপ করা, বিধি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। পরন্তু তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, দিল্লী সম্রাট যদি ইংরাজ রাজের নিকট তাঁহার সমুদয় স্বত্ব ও দাবী ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা অধিক দেওয়া যাইবে। সম্রাট এই প্রস্তাব অবমাননাকর বোধে অগ্রাহ্য করিলেন এবং আরও বলিলেন যে, সন্ধি অনুযায়ী তাঁহার ও তাঁহার পরিবারমণ্ডলীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পদবীর উপযোগী বৃত্তি পাইতে তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু ইহাতে কিছুই ফল হইল না। সম্রাট অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় অদৃষ্টে দোষারোপ করিলেন। যদিও ঔরঙ্গজেবের বংশধরগণ প্রভাবশূন্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের গৌরব ও মহত্ত্ব কেবল আড়ম্বর ও বেশভূষায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তথাপি ভারতবর্ষের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সামন্ত নৃপতিগণ, দিল্লী সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও যুবরাজকে নজর দিতেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাদের আশ্রয়াধীন থাকিলেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে এই নজর দিতে হইত, ইংরাজের সামরিক বা রাজশাসন সংক্রান্ত সমুদয় সমুচ্চ কর্ম্মচারীগণ এই সম্মানসূচক উপঢৌকনে দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দাবধি মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটের অভিমত ও তাঁহার সনন্দ ব্যতিরেকে কোন নূতন রাজ্য অধিকার করিতেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দাবধি ভারতবর্ষে মোগল টাকা প্রচলিত ছিল। * এমন কি ইহার

* Mills, History of British India continued by H. H. Wilson, vol. ix p. 255.

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol II. p. 12, Martin's Indian Empire

পর বৎসর পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারলও দিল্লীশ্বরকে নজর দিতেন।

টাইমস পত্রিকার সুযোগ্য লেখক অপক্ষপাতী রসল সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৬খৃষ্টাব্দাবধি "আমাদের প্রতিনিধিকে রুদ্ধশ্বাসে, বিনীতভাবে, এমন কি অনাবৃত মস্তক ও নগ্নপদে, আমাদের আশ্রয়াধীন নৃপতির নিকট আসিতে হইত। রাজপ্রাসাদের রক্ষকগণের নেতা কাপ্তেন সাহেব যখন দিল্লীশ্বরের নিকট আহূত হইতেন, তাঁহাকে অনাবৃত মস্তকে আসিতে হইত, এমন কি একটি ছত্রও হস্তে বা শিরোপরি ধারণ করিয়া তিনি প্রাসাদাঙ্গণ মধ্য দিয়া যাইতে আদিষ্ট ছিলেন না; এই সম্মান এমন কি রাজশরীর রক্ষকগণের প্রত্যেক কর্ম্মচারী পর্য্যন্তও উপভোগ করিত।"

এই সমুদয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক চার্লস বল লিখিয়াছেন যে "দিল্লী রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে আমাদের এই নীচ অধীনতাসূচক আচার ব্যবহারের সহিত, প্রাসাদ বহির্ভাগে ইউরোপীয় সমাজের অসহনীয় ও গর্ব্বিত প্রভুত্বের তুলনা করিয়া দেখিতে পাই, প্রতি মুহূর্ত্তে সুচতুর ও বুদ্ধিমান ভারতীয়গণের নিকট ইংরাজের অসততার পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এইরূপ কপট ও গর্ব্বিত ব্যবহারে আমরা কখনই আমাদের আচরণের পরিণামে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি না। *

ক্রমশঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সম্রাটের নাম মাত্রাবশিষ্ট সম্মানোপরি হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনানী সম্রাটকে যে নজর দিতেন, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট রেসিডেণ্টের হস্তে দিয়া যে নজরাদি দিতেন ও দিল্লীশ্বরীকে যাহা দেওয়া হইত তৎ সমুদয় রহিত হইল। এবং এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তে সম্রাটকে বাৎসরিক দশ সহস্র টাকা দিবার বন্দোবস্ত হইল। ভারত রাজত্বের উপর সম্রাটের যেটুকু ক্ষমতা ছিল, তাহাও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট বাৎসরিক পঞ্চদশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া ক্রয় করিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট মাননীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নাম মাত্র প্রজাভাব এই সময় হইতে ঘুচিয়া গেল। সেই সময় হইতে সম্রাটের ক্ষমতা প্রাসাদপ্রাচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল। সম্রাটকে দিল্লীর বহির্ভাগে যাইতে দেওয়া হইত না। রাজকুমারগণের সম্মানসূচক তোপ বন্ধ করা হইল—এবং অন্যান্য সম্মান সমুদয় তাঁহারা পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন। এই সমুদয় রূঢ় আচরণ যখন সম্পাদিত হয়, তখন সম্রাটপরিবার ইংরাজের পরম মিত্র ছিলেন, এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বিচিত্র সম্মান সমুদয় আপনাদের মধ্যে রক্ষা করিতেছিলেন! যদিও সম্রাট এইরূপ অবমাননার গভীর তলে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তথাপি তাঁহার প্রভাব ভারতবাসি গণের

Vol 111 p. 106, Chambers, History of the Revolt in India p. 67.

* Russel's Diary in India in the year '858-9 Vol.

* Ball's History of the Indian Mutiny Vol 11 p. 379.

হৃদয় হইতে বিলীন হয় নাই। রাজকীয় ছিন্ন পরিচ্ছদ ও ব্যক্তি মাত্রেই সম্মানার্হ ও পূজার্হ ছিলেন।

এইরূপ নানা প্রকারে ব্যথিত ও মর্ম্ম পীড়িত হইয়া, আকবর সাহ প্রাণ ত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র বৃদ্ধ বয়সে দিল্লীর নিরানন্দময় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অশেষ গুণসম্পন্না পত্নীর প্রগাঢ় পতিভক্তি ও সেবায় হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ ক্লেশ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেন। *

কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর মহম্মদ বাহাদুরকে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় দারুণ ব্যথিত হইতে হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ দারাবক্তের প্রাণ বিয়োগ হইল। যুবরাজের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণ ও জানানা মহলে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। যদিও এখন কুমার ফকির উদ্দিন সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ তথাপি জিনৎ মহল স্বীয় তনয়ের পক্ষ লইয়া স্বামীর নিকট অনুরোধ করিলে, সম্রাট প্রিয় পত্নীর বাক্যে সম্মত হইলেন। কিন্তু বৃটিস শাসক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, ফকির উদ্দিনকে ভবি-ষ্যতে দিল্লী সিংহাসনাধিকারী স্থির করিয়া বলিলেন, যে, সম্রাটের মৃত্যুর পর ফকির উদ্দিন তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সম্মান ও রাজকীয় ক্ষমতা কিছুমাত্র পাই-বেন না। এমন কি তিনি সম্রাট পদবী হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন। লর্ড ডেল-হাউসি আর একটী কঠোর আচরণের সম্পাদনে উদ্যত ছিলেন। যত শীঘ্র হয় সম্রাট ও রাজকীয় পরিবারকে, সুবিখ্যাত দিল্লীর রাজ প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, দিল্লীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে কুতব নামক এক স্থানে তাঁহাদের প্রেরণ করা যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, বিলাতস্থ ভারত রাজ সভার অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন। তথায় ঐ বিষয় লইয়া এক ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ গভর্ণর জেনারলের মন্তব্য কঠোর "ও রাজনীতি বিরুদ্ধ" বলিয়া নিন্দা অপরে তাঁহার মতের সমর্থন করিলেন। বিলাতে এই বাক্‌বিতণ্ডার বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া, ডেলহাউসী তাঁহার পূর্ব্ব মন্তব্য ত্যাগ করিয়া অশেষ আলোচনার পর পুনরায় এক নূতন মন্তব্য বিলাত রাজ সভায় প্রেরণ করিলেন। এই মন্তব্যে লেখা হইল যে বর্ত্তমান সম্রাটের জীবদ্দশায় আর কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না। তাঁহার মৃত্যুর পর কুমার ফকিরুদ্দিন সম্রাট পদাভিষিক্ত হইবেন বটে, কিন্তু সেইসময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাগণের দাবীর বিষয়, উল্লেখ করিয়া, যত টুকু সুবিধা লওয়া যাইতে পারে, লওয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে তাঁহাকে দিল্লী রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কুতবে স্থানান্তরিত হইতে বলা যাইবে। ইহার নিমিত্ত যদি তিনি বর্দ্ধিতবৃত্তি প্রার্থী হয়েন তাহাও দেওয়া হইবে। বিলাতে ভারতরাজসভায় লর্ড ডেল-হাউসির যুক্তি অনুমোদিত হইলে, স্যার টমস্ মেটকাফকে ফকিরুদ্দিনের নিকট প্রেরণ করা হইল। বহু যুক্তির পর স্থির হইল যে, ফকির উদ্দিন সম্রাট পদবী ধারণ করিবেন ও রাজকীয় বাহ্যিক

* **Russell's Diary in India vol. II pp 64, Martin's Indian Empire Vol. II p. 10.**

সম্মানে সম্মানিত হইবেন। মেটকাফ ডেলহাউসির যুক্তিমতে এই সর্ত্তে ফকির উদ্দিনের সম্মতি লইলেন। অনন্যোপায় হইয়া হতভাগ্য ফকিরউদ্দিন "অতিমাত্র ঘৃণাসহকারে" এবিষয়ে সম্মতি দিলেন। এই ঘটনা প্রাসাদে প্রচারিত হইলে সকলেরই ক্রোধ ও বিরক্তি উৎপাদন করিল। জীনৎ মহল অপেক্ষা কেহ অধিকতর বিরক্ত হন নাই।

সহসা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ জুলাই যুবরাজ ফকিরউদ্দিন প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু ওলাউঠা বা বিষপ্রয়োগে ঘটিয়াছে এইরূপ বিভিন্ন জনশ্রুতি আছে। ফকিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর সম্রাট জীনৎ মহলের প্রেরোচনায় তাঁহার কনিষ্ঠ তনয় জুমাবক্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবার বাসনা, ইংরাজ প্রতিনিধি মেটকাফকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারল সম্রাটের এ বাসনা পূরণ করিতে পারিলেন না—কারণ জুমাবক্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ তখনও জীবিত ছিলেন। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কুমারগণ মধ্যে তৎকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ মির্জ্জাকোরসকে সম্রাটের উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন, এবং তাঁহাকে ইহাও জ্ঞাত করিলেন যে ভবিষ্যতে সম্রাটের পদবী তিনি ধারণ করিতে পারিবেন না—সাহাজাদা বলিয়া তিনি অভিহিত হইবেন। তাঁহার সন্তান দিল্লী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইল না, এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর কেহই সম্রাট পদবী ধারণ করিতে পাইবেন না, এই সমুদয় অবগত হইয়া জীনৎ অতিমাত্র দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন! মহম্মদ বাহাদুর যখন শুনিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ সম্রাটপদ ও প্রাসাদ হইতে বঞ্চিত হইবেন, তিনি কেবল মৃত্যুকে, তাঁহার এই অপরিসীম যাতনার নিবারণার্থ কায়মনোবাক্যে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে দুঃখের চরমসীমা অবধি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। জগৎবিখ্যাত তৈমুর বংশের দুরবস্থা সম্বন্ধে উদারচেতা রসলসাহেব লিখিয়াছেন। "বিদ্রোহ ঘটিবার পূর্ব্বে সম্রাটের অবস্থা অসহনীয় ও অতিমাত্র ক্লেশজনক ছিল। তাঁহার আবাস বস্তুতঃ কারাগার স্বরূপ; যে কতিপয় শোচনীয় ও অলীক সম্মানে তিনি ভূষিত ছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তৎসমুদয়ে বঞ্চিত হইবে, এমন কি তাহারা তাহাদের নিজ প্রাসাদ হইতে বিদুরিত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। আমরা সম্রাটের পরিবারগণকে আমাদের গভর্ণমেণ্টে কর্ম্ম করিতে দিই নাই, আমরা তাঁহাদিগকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত দশায় শোচনীয় জীবন অতিবাহিত করিতে দিয়াছিলাম, এবং পরিশেষে আলস্য, কুস্বভাব ও লাম্পট্য নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে ত্রুটি করি নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের সামরিক ব্যাপারে তাঁহাদের যোগদান রুদ্ধ করিয়াছিলাম, আমরা অন্যান্য কোন কর্ম্মেও তাঁহাদিগকে আসিতে দিই নাই। কিন্তু আমাদের সংবাদ পত্র ও সমাজ অলস ও লম্পট দিল্লীরাজকুমারগণের

* Kaye's History of the Sepoy War Vol II pp. 18, 26, 27.

বিরুদ্ধে কটুক্তি প্রয়োগে ক্ষান্ত হয় নাই। এরূপ জঘন্য ঘৃণার্হ জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়ঃ। (Diary in India Vol. 11 p. 51.) সিপাহি বিদ্রোহ ঘটিবার পূর্ব্বকালাবধি সম্রাটের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল। তিনি প্রাসাদাভ্যন্তরে, সম্মান ও ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া, নৈরাশ্যে ও অসুখে কালযাপন করিতেছিলেন। যাঁহাদের হস্তে তাঁহার রাজেন্দ্র ক্ষমতা এখন গিয়াছে তাঁহারা সম্রাটের এ অবস্থা ও অসুখে কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখেন নাই। এই অনবধানতার কি বিষম পরিণাম ঘটে এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

ক্রমশঃ—

কবি কুঞ্জ।

অলকদাম।

১

সুন্দরীর শিরে আমি সুখে করি বাস ;
অলসে পড়িয়া খসি
চুম্বি তার মুখশশী ;
যৌবন, মাধুরী, কান্তি, আমাতে প্রকাশ,
কামিনীর কমনীয় করি কেশপাশ।

২

যুবতীর আমি বড় যতনের ধন।
সতত পরশি করে,
আদরে আমারে ধরে,
দর্পণে আমার কান্তি করে দরশন ;
কত সাধে সাধি মোরে সাজায় বদন।

৩

কালরূপে এত আলো কে কোথা দেখেছে
তুলনা কি কাদম্বিনী,কোলে যার সৌদামিনী
দেখ রূপ বলি যবে গর্জ্জিয়া ডেকেছে,
ক্ষণেকের তরে সে যে সেরূপ ধরেছে।

৪

শোভি আমি রূপসীর বদন কমল।
সেই শোভা জিনিবারে
গর্বে ভ্রমর ঝঙ্কারে,
চুম্বে বধূ সরোজিনী রূপে ঢল ঢল,
হয় তাই রূপদর্পে নলিনী চঞ্চল।

৫

ধরিয়া আমার শোভা উঠে শশধর।
থাকি আমি সংগোপনে,
তাই সে জগত জনে
দেখায় আমার রূপ কত মনোহর!
হিংসার কলঙ্ক পরি তবু সে সুন্দর।

৬

কুঞ্চিত আমার কান্তি অতি অপরূপ।
দূর গঙ্গা, পাশে ভাল—
কালিন্দীর রেখা কাল,
তরঙ্গের চিত্র লেখা সুবিচিত্র রূপ,
পবিত্র সঙ্গম শোভে আমার স্বরূপ।

৭

আদরে নাচায় মোরে মলয় সমীর।
বদন-বসন ঠেলি,
প্রেমানন্দে ছুলি হেলি,
থেকে থেকে নৃত্য করি আসে মৃদু ধীর,
সেই লীলা তরে বায়ু সদাই অস্থির।

৮

সমীরের সঙ্গে আমি নাচি রঙ্গে ঢলি,
ছুলি যেন তীরে লতা,
পদ্মময় সরঃ যথা;
কিম্বা রে গগণে দূর যেন যায় চলি—
ধর-ধর শেতাম্বর বলাকা আবলি।

৯

চিকণ তরঙ্গে কাল আমি নৃত্য করি।
সুচারু বদন বিভা,
শোভে সে নর্ত্তনে কিবা!
বৃন্দাবন-বাসে যেন নাচেন শ্রীহরি,
বঙ্কিম মুরারি মাঝে—চৌদিকে ঘাঘরী।

১০

নব বধূ মোর কান্তি ঢাকে মুখবাসে।
সরায়ে বসন তার,
উঁকি মারি যতবার,
ততবার রূপসীর মুখপদ্ম হাসে।
থাকিতে পারিনে আমি রূপের উল্লাসে।

১১

কেন তবে রাখ বধূ আমারে আবরি?
দাও মুখ-বাস খুলে,
ছুধারে নাচিব ছুলে,
যে নাচে জিনিতে পারে স্বর্গের অপ্সরী,
বনবাসে থাক্ নাচি বনের বল্লরী।

১২

কে পারে রোধিতে মোরে বাঁধিয়া কবরী?
কুন্তলের আশে পাশে,
আমার তরঙ্গ ভাসে,
সীমন্তে সিন্দূর রেখা স্বর্ণদী সুন্দরী,
অলকনন্দার ঝরে অলক লহরী।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শিশির।

শ্যামল দুর্ব্বার গলে হীরকের হার।
কেবে সে লুকায়ে এসে, পরায়ে রজনী শেষে,
চলে গেছে কোন্ দেশে দেখা নাই আর!
কেমন প্রণয় তার! প্রেম খেলা বোঝা ভার!
রোজ এসে নিশি শেষে কেঁদে চলে যায়।
কিছুই চায় না আর, নয়নের জলে যার
গাঁথি মনোমত হার প্রিয়ারে সাজায়।
দুর্ব্বার কঠিন মন, তাই সে অমূল্য ধন,
যারে পায় হেসে হেসে তারেই বিলায়।
ওই দেখ রবিকরে,, দিতেছে সোহাগ ভরে,
সমীরণ গায়ে কত আনন্দে মাখায়!
কত বা রেখেছে ফেলে, যায় লো'ক পায় দলে,
ছি, ছি দুর্ব্বা! নারী হয়ে এমন কঠিন!
প্রেম অশ্রু উপহার, এই পরিণাম তার!
তবু এসে তোর পাশে কাঁদে সেই লীন!!

শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী।

চমকিত।

এলোমেলো এই হৃদয় আমার
আজো গুছাতে পারিনে;
এথা ওথা কত ভেঙে প'ড়ে আছে,
আমার, মনে প'ড়ে গেছে জানিনে!

ব'স মুছে ফেলি নয়নের জল,
পুরাণ প্রাণেরে ডাকি,
এযে প'ড়ো বাড়ী দেহে বরিষার ধ'রা
একি জানে তুমি যে কি ?

যেন দেবতার মত চকিতে
এলো আকাশ হইতে নামিয়া,
আমি নয়নের জলে হাসি মুখ
বল কোন প্রাণে দেই ধরিয়া !

আমি দুঃখ বল কোথা রেখে আসি
তুমি হাসি দিয়ে সব ঘিরেছ
আমি হাসি কান্না দিয়ে সাজাব
যদি হৃদয়ের মাঝে ব'সেছ !

শুনি আমা তরে কভু কেঁদেছিলে
আমি তখনি উঠিব হাসিয়া
বল আমি কোন সুখে কাঁটা নই
আমি চরণে পড়িব লুটিয়া।

শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সমীরণ! চিরদিন রও!

সমীরণ! চিরদিন রও!
বঙ্গভূমে চিরদিন সৌরভ ছুটাও!
টুটে দাও হৃদি-ব্যথা,
নিদাঘের প্রখরতা,
চিরতরে মানবের জীবন জুড়াও!
মধুর গুঞ্জন স্বনে,
মধুর মধুর তানে,
ধীরে এসে চিরদিন পরাণ মাতাও!
নির্ঝর নীচগে ভ্রমি,
কুসুম কুঙ্কুমে চুমি,
মেদুর হিল্লোলে চির সে সুধা বিলাও!
ফুটাও কুমুদ হ্রদে,
কল্পনা কবির হৃদে,
মধুর ঝঙ্কারে চির শ্রবণ জুড়াও!
বহি কভু তপোবনে,
কুহুরব-কুহু-সনে,
নিগূঢ় ধরম-কথা মানবে শুনাও!
হৃদয়ের তমো নাশি,
জ্ঞানালোক পরকাশি,
সযতনে মানবেরে সুপথ চিনাও!
দিওনা দরিদ্রে ক্লেশ,
ক'রনা কাহার দ্বেষ,
ধীরে ধীরে বহে যাও হ'ওনা উধাও!
বসনা বিটপী' পরে,
অভিমানে ক্রোধ ভরে,
ধীরে ধীরে লতিকার শরীর দোলাও!
করনা বিক্রমে হত,
প্রমত্ততা অসংযত,
ধীর ভাব চিরদিন সবারে দেখাও!
কুসুম-পরাগ মেখে,
সে রভ সন্তার বুকে,
সমীরণ! চিরদিন গৃহে গৃহে যাও!
দয়াময়-কৃপা-গুণে,
দয়া করি দীন জনে,
সমীরণ! চিরদিন বঙ্গভূমে রও!
বঙ্গের আঁধার নাশি,
উজলিয়া দশদিশি,
সমীরণ! চিরদিন শরীর জুড়াও!
সমীরণ! চিরদিন রও!

শ্রীকুঞ্জবিহারি বসাক।

কেন ?

(কোন ইংরাজী কবিতার ভাব লইয়া।)

১

শরতের কোলে সখী,
পাতাগুলি ঝরে !
আকুল স্বননে সমীরের সনে
কেঁদে মরে
হেমন্ত নীহারে !

২

পাখীগুলি একে একে
কোথা উড়ে যায় ?
কেন ভেসে যায় ওই মেঘপুরে ?
বহে যথা
শিশিরের বায় !

৩

কি যেন পায় না ওথা
ফিরে আসে তাই
ধীরে ধীরে ধীরে অলস মন্থরে
মৃদু হেসে
নীলিমার ঠাঁই !

৪

সরসীর কোলে কাঁদে
একটী নলিনী !
(কহে) ভ্রমরা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
তোরে সখী
"কিছুই বলিনি !"

৫

ওথা জলদের কোলে
হাসিলে বিজলী
নাচে শিখিসহ শিখিনী সুখিনী
শাখে শাখে
কানন উজলি !

৬

তবে, কেন ছোট হিয়াখানি
কাঁদে অবিরত ?
কেন ভেসে যায় অনন্তের পানে—
লক্ষ্যহীন
জীবনের মত !

৭

জগতের হাসি মাখা
প্রতামার কোলে
কি যেন কি নাই !—কি যেন ভাসিছে
তটিনীর
মৃদুল কল্লোলে !

৮

বাহু প্রসারিলে সে যে
সরে যায় দূরে !—
প্রাণের মাধুরী কেন করে চুরি ?
কেন যায়
দূর মেঘপুরে ?
কল্পনার তুষার-প্রান্তরে !

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ভাব।

উষার অধরে হাসি নাহি ধরে
চারি দিকে যবে পড়েগো ফুটে
সলিলে কমল সুখে ঢল ঢল
সোহাগে সৌরভ বেড়ায় ছুটে।
সুধা ঢালে তরু শোভিত সুচারু
নূতন পাতায় ঢাকিয়া শাখা
নবীন বাসনা কুসম ভূষণা
কনক লতিকা হৃদয়ে রাখা।
কিরণ মাখিয়া জাগরিত হিয়া
স্নেহময় নীড়ে পুলকে পাখি
এযে মনোহর সুনবীন স্বর
হাসে চরাচর কিরণ মাখি।
দুঃখ নিশি শেষে নবীন আবেশে
সুখ প্রভাকর প্রকাশে কর
হেরি প্রভা তার নিমেষ আঁধার
পলাইয়া যায় পাইয়া ডর।
যেন এ প্রভাতে তোমার ডাকেতে
চমকিত চিতে জাগিয়া চাই
অন্তরে অন্তরে আছো আলো করে
অমনি পুলকে ভরিয়া যাই।
জগত ভিতরে যত কিছু ধরে
যাহার যা কিছু নূতন আছে
মনে মনে হয় পায় পরাজয়
আমার নূতন ভাবের কাছে।

পুরাতন যত নূতন করিয়া
বাঁধিয়া সকলি নূতন ভাবে
বল বল শুনি ভাব কি আমার
এ হৃদি যেমন তোমারে ভাবে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

প্রতাপ।

প্রস্তাবনা—পঞ্চনদে।

প্রথম সর্গ।

ভারতের শিরোদেশ পবিত্র করিয়া,
হিমাদ্রির পদপ্রান্ত করি প্রক্ষালন,
চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিতস্তা বিপাসা
শতদ্রু সখীর সনে বাঁধে প্রাণ মন।

গলা ধরাধরি করি পঞ্চ গরবিনী
হৃদয়ে হৃদয় রাখি চলিতে চলিতে,
মাতিয়া যৌবনমদে হেলিয়া দুলিয়া
রঙ্গে চলে সিন্ধু অঙ্গে জীবন সঁপিতে।

একা সিন্ধু এই পঞ্চ জীবন প্রবাহ
কেমনে সহিবে বল সুস্থির পরাণে?
দারুণ জীবনভার বিসর্জ্জন আশে
ব্যাকুল হইয়া চলে সাগরের পানে।

পঞ্চ নদী সিন্ধু সঙ্গে মিশিয়াছে ব'লে
(তরুকোলে যেন পঞ্চ নবীন বল্লরী।)
পঞ্চ-নদ নামে খ্যাত সুরম্য প্রদেশ
আর্য্যকীর্ত্তি কাননের কুসুম মুঞ্জরী।
নায়কের কার্য্যক্ষেত্র শিখ-জন্ম-ভূমি
গুরু গোবিন্দের পূজ্য ধর্ম্ম লালাস্থল,
পুণ্যময় পঞ্চনদ চির বীর-প্রসূ
আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে সদা অতুল প্রবল।

হায়রে! অবোধ আমি গাইব কেমনে
পঞ্চনদ কীর্ত্তিগান ভারতে আবার!
কোথা কীর্ত্তি সেদেশের তেজো বীর্য্য কোথা
বিপক্ষ চিত্রিত হায়! ইতিবৃত্ত যার?

ইতিবৃত্ত! তব কথা চাহি না শুনিতে,
জানি পক্ষপাতী তুমি, করি না বিশ্বাস।
বিজেতার পদতলে যে দেশ লুণ্ঠিত
কোথা পাবে সে দেশের সত্য ইতিহাস?

কবি-কুল চিরারাধ্যা অয়ি কুহকিনি,
তোমার অসীম শক্তি কল্পনা সুন্দরি,
তুমি মোর পুরাবৃত্ত, তুমি জান সব
পঞ্চনদ-কীর্ত্তিকথা কহ কৃপা করি।

অথবা বিরতি যদি পঞ্চনদে তব
কহ দেবি, কহ কীর্ত্তি রাজপুতানার।
প্রতাপের পরাক্রম অতুল ভূতলে
সহিষ্ণুতা মহিষীর করগো প্রচার।

গাও দেবি গান কর যে গান শুনিলে
অচল ধমনী মম নাচিবে উল্লাসে।
চির বিষাদিত মন সন্তোষ লভিবে
দেখিব উজ্জ্বল তারা ভারত-আকাশে।

আঁধারে আবৃত অবনী আকাশ
মাঝে মাঝে হয় বিজলী বিকাশ
আকাশে হাসিয়া আকাশে লুকায়
দ্বিগুণ আঁধার প্রকাশ পায়।

যেন অন্ধকার দেখাবার তরে,
প্রকৃতি সুন্দরী স্বর্ণ দীপ ধরে
কাঁপে প্রকৃতির কমনীয় কর
প্রদীপ পড়িয়া নিবিয়া যায়।

অশনি নিনাদ পবন নিস্বন !
ভয়ঙ্করী নিশা দ্বিগুণ ভীষণ
বিন্দু মাত্র নাই বারি বরিষণ
আলোকের চিহ্ন কোথাও নাই।

ইরাবতী তীরে কানন মাঝারে
এহেন নিশায় এঘোর আঁধারে
বিদ্যুৎ আলোকে থেকে থেকে অই
কাহার মূরতি দেখিতে পাই ?

উষাকালে শশী নিষ্প্রভ যেমন
তেমনি মলিন ও চারু বদন
বিষাদে নিশ্বাস ফেলে মাঝে মাঝে
কে ও বরাঙ্গনা নদীর কাছে !

অপূর্ব্ব প্রতিভা বদন মণ্ডলে
অশ্রু বিন্দু চিহ্ন নাহিক কপোলে
বিষাদে ব্যথিত মরমে পীড়িত
কে ওই কামিনী দাঁড়ায়ে আছে ?

বরষা সঙ্গমে জলদের মত
গম্ভীর সুস্থির স্তব্ধ জ্ঞান হত
বাহ্য জগতের কোন চিন্তা নাই
দাঁড়ায়ে রয়েছে নিশ্চল হয়ে।

জীমূত মন্দ্রিছে স্বনিছে পবন
অশুভ আরাব করে শিবাগণ
পাশে শিশুপুত্র করিছে রোদন
দৃক্ পাত নাই দেখেনা চেয়ে।

নয়নের জল রয়েছে নয়নে
ঝরে না, রমণী বিষণ্ণ বদনে
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে একই ভাবে
প্রস্তর নির্ম্মিত মূরতি যথা।

সমস্ত জগৎ যাক্ রসাতলে
ডুবে যাক্ বিশ্ব প্রলয়ের জলে
পড়ুক অশনি স্বনুক পবন
কাঁদুক বালক কে কবে কথা ?

রয়েছে রমণী নীরব নিশ্চল
টানিছে বালক বসন-অঞ্চল
মধুমাখা স্বরে ডাকিছে মাতারে
শুনে না সে কথা, দেখে না ফিরে !

জননীর পাশে আঁধার নিশায়
সেই বনস্থলে অনাথের প্রায়
শিশু কতক্ষণ করিবে রোদন
নয়ন মুদিল ঘুমের ঘোরে॥

ক্রমে সুনিদ্রিত ধরণী শয্যায়
হইল বালক। কে দেখেছে হায়
অবিচল চিত্তে কখন এমন
মর্ম্মভেদী দৃশ্য অবনী মাঝে ?

আদরের ধন পড়িয়া ধূলায়
বারেক ফিরিয়া সম্ভাষে না তায়
নির্জ্জন কাননে শিশু-সুত সনে
বিষাদ প্রতিমা দাঁড়ায়ে আছে।

জীবিতের চিহ্ন সুদীর্ঘ নিশ্বাস
না থাকিলে কভু হতোনা বিশ্বাস
এ নারী যে নহে প্রস্তর মূরতি
এরূপ নিষ্পন্দ নিশ্চল দেহ।

সীমন্তে সিন্দুর অঙ্গে আভরণ
পরা বহুমূল্য সুন্দর বসন
নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত কুলের মহিলা
কিন্তু সহচরী নাহিক কেহ।

নির্ব্বাণ উন্মুখ অই হুতাশন
জ্বলিছে সুদূরে—নারীর নয়ন
সেই দিকে চেয়ে আছে অবিরত
কি যেন দেখিছে তাহার মাঝে।

নিবিল অনল, দূরস্থ সে চিত্র
হলো অন্তর্হিত; ধূমমাত্র (ও) তার
ঘোর অন্ধকারে দেখা নাহি যায়
যে দিকেতে চাও তিমির রাজে।

তখন রমণী চমকি উঠিল
বিষাদে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল
সহসা তাহার হৃদয় কাঁপিল
চাহিয়া দেখিল শিশুর পানে।

যেন কোন তীব্র বৈদ্যুতিক বল
অচল মূরতি সহসা চঞ্চল
করেছে এখন। হেন ভাবান্তর
হইল হঠাৎ কেন-কে জানে?

যেন অকস্মাৎ চমকিল মন
চিন্তা দূরে গেল ভাঙ্গিল স্বপন
সাদরে শিশুরে অঙ্কে তুলে লয়ে
বদনে সহস্র চুম্বন করে।

মনোদুঃখ যেন প্রত্যেক চুম্বনে
উঠিল উথলি, যুগল নয়নে
চির সম্বরিত বারিধারা বহে
থামে না, সে অশ্রু নিয়ত ঝরে।

মত্ত মেঘমালা আবরি আকাশে
যেন বহুক্ষণ থাকি অবশেষে
মুষলের ধারে বরিষণ করে
নিয়ত, কারো না নিষেধ মানি।

"দুখিনীর ধন"—বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ শ্বাস—নয়ন হইতে
শতগুণ বেগে ঝরে অশ্রুজল
রুদ্ধকণ্ঠস্বর না সরে বাণী।

হায়রে এ দৃশ্য দেখেছে যে জন
সেই জানে ইহা পবিত্র কেমন
এই অশ্রুজল কত নিরমল
সেই সে ভাবুক বুঝিতে পারে।

সহসা কাননে অশনি গর্জ্জিল
নিদ্রাগত শিশু চমকি উঠিল
সভয়ে জননী নিজ বক্ষস্থলে
নয়নের মণি লুকায়ে ধরে॥

সহসা তখন উজলিল বন
কাঁপে পঞ্চনদ কাঁপিল কানন
চাহিয়া রমণী উত্তর শিয়রে
দেখে দেবীমূর্ত্তি আলোকময়ী।

সহসা সুরভি হলো দিক্‌দশ
প্রকৃতির অঙ্গ সহসা অবশ
আকাশ মণ্ডলে হলো দৈব-বাণী
"হবে পুত্র তোর জগৎজয়ী॥

সৌর করজাল জিনি সুপ্রভায়
শশীর মাধুরী হরিয়া হেলায়
বাসন্ত আমোদে মাতায়ে কানন
কিরণ মালিনী উরিলা দেবী!

দেখি দেবী-মূর্ত্তি ভাতিল অম্বর
বাজিল স্বর্গীয় বাদ্য মনোহর
ইঙ্গিতে কহিল বিশ্ব চরাচর—
"চিরদিন যেন চরণ সেবি।"

ভূষণ শিঞ্জিতে রূপের প্রভায়
তুষি, দিলা দেখা, অনন্ত মায়ায়
তিন ভুবনের ভাবনা ভুলায়ে,
ভুবন-মোহিনী নগেন্দ্র বালা।

কহিলা ভবানী শিব সীমন্তিনীঃ—
বিধির বিধানে লো বরবর্ণিনী
মহাসিংহ বীর পঞ্চনদ পতি
সহিলা অকালে মরণজ্বালা।

দেহ ভস্ম শেষ ত্রিদিবে জীবন
কি করিবে তুমি কাননে এখন
বিষাদে তোমার টলিল আসন
এলেম তোমায় প্রবোধ দিতে।

তুমি পতিহীনা কালের মায়ায়
জানি আমি, সেই দারুণ জ্বালায়
মর্ম্ম গ্রন্থি তব হয়েছে শিথিল
তুষের অনল জ্বলিছে চিতে।

জানি এ বৈধব্য বড় ভয়ঙ্কর
এ শোকে রমণী জ্বলে নিরন্তর
দুঃসহ এ জ্বালা সহকর বালা
ত্বরায় প্রাসাদে ফিরিয়া যাও।

কি করিবে আর এ পুত্র রতনে
লালন পালন করগে যতনে
যেন পিতৃ নাম করে সমুজ্জ্বল
যথাবিধি তারে সুশিক্ষা দাও।

বহু রণে জয়ী হবে রণজিৎ
কুলের গৌরব গর্ব্বের সহিত
এই পঞ্চনদ করিবে উদ্ধার
বিশ্বজয়ী হবে তনয় তব।

পুত্র মুখচেয়ে মুছ দুনয়ন
কর সতী এবে শোক সম্বরণ
এই পুত্র তব যশস্বী হইবে
আশীর্ব্বাদ করি কি আর কব!

বলিতে বলিতে ত্রিদিব সুন্দরী
করে বিমোচন সুদীর্ঘ কবরী
ভ্রমর-লাঞ্ছিত কৃষ্ণ কেশদামে
চমকে বিবিধ রতন আভা।

কৃষ্ণকেশগুচ্ছে মণিজাল মরি!
যেন কৃষ্ণপক্ষে অসিতা শর্ব্বরী
তারকা ভূষিতা চারু অলঙ্কৃতা
ধরে অপরূপ অতুল শোভা।

বামেতর করে সহাস বদনে
লইলা খুলিয়া দেবী সযতনে
অন্যতম মণি কবরী হইতে
কর পদ্মে মণি দ্বিগুণ শোভা।

"ধর এই মণি"—কহে মহামায়া,
তব পুত্র শিরে দিও পরাইয়া
কিরীটের সহ শুন সুবদনে
রাজগণ চেয়ে দেখিবে লোভে।

"কোহিনুর" নাম দিলাম ইহার
জগতের দীপ্তি জগৎ মাঝার
এ হেন প্রস্তর জানিও বিরল
এখন প্রাসাদে ফিরিয়া যাও।

বিলম্ব করোনা এ নিশীথে আর
লঙ্ঘন করোনা আদেশ আমার
গুরু শোকভার করি সম্বরণ
যুগল নয়ন তুলিয়া চাও।

কি যাতনা তুমি সহেছ বলনা
এর শত গুণ কতই ললনা
কত ক্লেশ কত অকথ্য যন্ত্রণা
সহেছে সব কি বলিতে পারি?

বিশাল জগতে এই পঞ্চনদ
সমান বিস্তৃত কত জনপদ
কত রাজ্য আছে,—প্রতি রাজ্য মাঝে
জন্মেছে কতই দুখিনী নারী।

দুর্নিবার বেগে দুঃখের তরঙ্গ
কত রমণীর সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ
করেছে জগতে, কোরকে কতই
শুকায়েছে ফুল বিষাদ তাপে।

তা সবার মাঝে জনেকের কথা
ভাবিলেও ভুলি নিজ মনোব্যথা
পরের বেদনে হইবে কাতর
ভাবিলে আমারও হৃদয় কাঁপে।

ভাবিওনা ভ্রমে তোমার জীবন
উদ্দেশ্যবিহীন অসার এখন
এই সুকুমার শিশুর শিক্ষার
তোমার উপরে রয়েছে ভার।

বীরের কাহিনী বীরত্ব আখ্যান
শৌর্য্য বীর্য্যমাখা বীরকীর্ত্তি গান
শুনায়ে শিশুরে বীরত্বে মাতায়ে
শুধিও পতির প্রেমের ধার।

এই রণজিৎ নন্দন তোমার
বয়স্থ না হয় যত দিন আর
তত দিন তুমি অয়ি চারুশীলে
বীরকীর্ত্তিগান শুনিতে পাবে।

আমার কৃপায় কবি এক জন
প্রতাপ চরিত তোমার সদন
নিত্য নিশাকালে বীণা বাজাইয়া
স্বর্গহতে আসি শুনায়ে যাবে।

পাবে উপদেশ সহ্য হবে ক্লেশ
ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা শিখিবে অশেষ
মানব জীবনে কত কষ্ট সহে
পারিবে বুঝিতে সে গান শুনে।

এত বলি দেবি লুকাইলা, হায়!
জলবিম্ব যথা জলে মিশে যায়
শূন্যে সুর-বালা তেমতি বিলীন
আঁধার কানন সে রূপ বিনে।

সেই সুধামাখা দেবী-কণ্ঠ-স্বর
জনশূন্য সেই কানন ভিতর
এখনও যেন পরিশ্রুত হয়
প্রতিধ্বনি যেন সে গীত গায়।

ত্যজি সে কানন শিশু সঙ্গে লয়ে
চলে বিষাদিনী বিহ্বল বিস্ময়ে
মাঝে মাঝে মুছি চারু নেত্র যুগ
সেই দিক্‌পানে ফিরিয়া চায়।

* * * *

নিভৃত প্রকোষ্ঠে আজি রতন খচিত
রাজহর্ম্ম্য মাঝে
সপ্ত তারে সপ্ত গ্রাম সঞ্চালিত করি
চারু যন্ত্র বাজে।
বাজিছে পরিবাদিনী গাইছে গায়ক
মাতিয়া উল্লাসে।
শুনিতেছে বিষাদিনী মহাসিংহ-জায়া
বিধবার বেশে॥
সপ্ত সিন্ধু জল যেন উঠিছে উথলি
সে মধুর তানে।
সুধামাখা বীর-কীর্ত্তি কাহিনী কথিত
অপরূপ গান।

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

জনা সমালোচনার সমালোচনা।

সমালোচনার প্রারম্ভেই আছে—"নাটকাভিনয়ে একত্র সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হয়। এই সকল কারণে নাটকের আলোচনা করা সাহিত্যসেবীর একটী কর্ত্তব্য।" এক প্রভৃতি কথায় সব সারা হইয়াছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের উন্নতি নাটকাভিনয়ে হয়, মনুষ্য চরিত্রের উন্নতি নাটকাভিনয়ে হয় না কি? নাটকাভিনয়ের উচ্চ উদ্দেশ্য প্রভৃতির গহ্বরে প্রচ্ছন্ন রহিল কেন? নর নারীর চরিত্রগঠন নাটকের লক্ষ্য, শুধু অলস বিলাসের উন্নতি বিধান নহে। নাটক সুনীতির দুর্নীতির উজ্জ্বল পরিণাম প্রদর্শনে সংসারের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

জনার সমালোচনা নাটক সমালোচনা না বলিয়া গ্রন্থ সমালোচনা বলাই ভাল। রামনারায়ণ, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, হরলাল রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল বসু, সকলকেই সমালোচক নাটককার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থকারগণ যে সব গ্রন্থ নাটক বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন সমালোচক সে সকল গ্রন্থকেই নাটক বলিতে প্রস্তুত দেখিতে পাই; যাঁহার নাটকজ্ঞান এরূপ, নাটক সমালোচনে তিনি অধিকারী নহেন সুতরাং জনার সমালোচনা নাটক সমালোচনা না বলিয়া গ্রন্থ সমালোচনা বলাই ভাল।

সমালোচক জনার উপাখ্যান ভাগ কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের ও জৈমিনী ভারতের উপাখ্যান ভাগের সহিত তুলনা করিয়া পরস্পরের পার্থক্য দেখাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান রাজবাটীর ও কালীসিংহের অনুবাদিত মহাভারতেও যে তাঁহার দৃষ্টি আছে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। এই পার্থক্য প্রদর্শনে বিশেষ গুণপনার কিছুই নাই তবে সমালোচক জনার সমালোচনার প্রসঙ্গচ্ছলে যদি আপন বহুদর্শনের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া থাকেন তাহা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তীর উপাখ্যানভাগ পরবর্ত্তী যে নাটকে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিবে না সমালোচকের কাছে এ কথা নূতন শুনিলাম। ব্যাসের শকুন্তলা কালিদাসের শকুন্তলায় রূপান্তরিত হয় নাই কি? সেক্সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথ নাটকের উপাখ্যান ঐতিহাসিক ম্যাক্‌বেথের উপাখ্যানভাগের সহিত বিস্তর প্রভেদ, আবশ্যকমত কবি ইতিহাস বিপর্য্যয় পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

জনার গল্পে নাটকত্ব আছে কি না (অর্থাৎ গ্রন্থের Plot Dramatic কি না) সে বিচার সমালোচক করেন নাই, জনার চরিত্রাবলীর বিচার করিয়াছেন।

এই চরিত্রবিচারে যে বিচারবিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহাও নাটক কাকে বলে তাহা না জানা থাকার দরুণ অধিকাংশ স্থানে ঘটিয়াছে। সংস্কৃত নাটকের উপকরণে বাঙ্গালা নাটক হইতে পারে না। বাঙ্গালায় ভাল ভাল রঙ্গালয় বিদ্যমান, এখনকার বাঙ্গালা নাটক, রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত হইতেছে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে বাঙ্গালা নাটক হইলে তাহা রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইবে না। ইংরাজী নাটকের উপকরণ অনুকরণে বাঙ্গালা নাটক জন্মিতেছে এবং রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত করিতে হইলে ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সমালোচকের প্রথম অভিযোগ নাটকের প্রথম দৃশ্যে অগ্নিকে কল্পতরুরূপে দাঁড় করাইয়া নীলধ্বজ পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিকে যে সব অভীষ্ট বর দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। নাটকের প্রথম দৃশ্যে, সকল দৃশ্যের এবং নাটকের পরিণামের আভাষ, দেওয়া ভাল কি মন্দ তাহার বিচার সমালোচনায় নাই সুতরাং আমরাও করিব না। সমালোচক এ কথাটা এখানে পত্তন করিয়াছেন ইহার কোনরূপ মীমাংসা করেন নাই; যথা সময়ে তাঁহার মীমাংসাক্ষেত্রে আমরাও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। ইহার পর বিদূষকের বিচার হইয়াছে, এ বিচারে বিশেষ বলিবার কিছু নাই, তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না বিবাদের মাধবের সংস্করণ—জনার বিদূষক।

তৃতীয় অভিযোগ—"তাহার পর দ্বিতীয় দৃশ্য—উদ্যানে মদনমুঞ্জরী ও সখিগণ। প্রবীর অনেকক্ষণ কাছছাড়া! কাজেই বীরপত্নী প্রেমিকা মদনমুঞ্জরী বিরহে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন ইত্যাদি।" বীরপত্নী হইলে বীরাঙ্গনা হইতে হইবে এ বা কি কথা। কবিবর হেমচন্দ্রের কৃত বৃত্রসংহার কাব্যে রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা-চিত্র সমালোচক দেখেন নাই কি? ভুবনবিজয়ী বীর রামচন্দ্রের পত্নী সীতা বীরপত্নী হইয়া কোমলতার পূর্ণ আদর্শ হইলেন কেন? বীরাঙ্গনা হইলেন না কেন? সকল বীরপত্নী যদি সুভদ্রা বা দ্রৌপদী হইত তাহা হইলে কাব্যজগতে বৈচিত্র্য থাকিত না, সমালোচকেরও একটা বই অধিক সমালোচনার অবসর ঘটিত না। মদনমুঞ্জরীর ক্ষণ বিরহ নির্দ্দেশ করিয়া বিবেচক সমালোচক অবলা সখীগণের দুই এক কথা লইয়া বড়ই অন্যায়রূপে অবলাপীড়ন করিয়াছেন। আক্রমণের কথা এই:—

"প্রাণ কেমন কেমন করে স্বজনি!
কেন এল না গুণমণি।

এত নাচ গানের মধ্যে প্রাণ কেমন কেমন করিতেছে ন্যাক্কারের উদ্রেক-বোধে জ্বর না কোন অব্যক্ত পীড়া?" সখীরা মদনমুঞ্জরীর তাৎকালীন মনোভাব সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, ইহা লইয়াই ত নাচ গান। এই গানই প্রথম গান। "নাচ গানের মধ্যে" কথার তাৎপর্য্য বুঝাইবার সমালোচকের সাধ্য আছে কি? অন্ধ আক্রমণের লক্ষ্য প্রায় এইরূপেই স্থির হয়। মদনমুঞ্জরী স্বয়ং কি কথা বলিয়া সমালোচক কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছেন পাঠক জনা সমালোচনার প্রথম অংশ আর একবার পড়িয়া দেখিবেন। ভাবী অশুভের কখন কখন বর্ত্তমানে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় এ কথা সমালোচক অনুগ্রহ

করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচক বলিয়াছেন হিন্দুস্ত্রীর পতি-প্রেম,—"তোমার অনেক আছে আমার তুমি হে কেবলি" অর্থাৎ পতি, পত্নীর একমাত্র সর্ব্বস্ব ধন কিন্তু পত্নী, পতির নহে। "তোমার অনেক আছে আমার তুমি হে কেবলি" কথাটাই বা কোন্ হিন্দু স্ত্রীর তাহাত আমরা জ্ঞাত নহি। মদনমুঞ্জরী নিস্বার্থ প্রেমিকা কি না "সন্ন্যাসিনী প্রেমিকা" কি না এ কথায় এ বিচার আসে কি? মদনমুঞ্জরী আপন ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে যে আমরণ তন্ময় হইতে বাধ্য, ইহা বহু বিবেচনার কথা। পতিদুঃখকাতরা অবলা বালিকার প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের কথা দার্শনিকের কথার মত যে বিচার্য্য, তাহা জনা সমালোচনার পূর্ব্বে কেহ জানিত ইহাত বোধ হয় না। * ইহার পর মদনমুঞ্জরীর নিকট প্রবীর আসিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন; সমালোচক পত্নীকে ছাড়িয়া পতিকে ধরিলেন। আক্রমণের ঘটাটা পাঠক সমালোচকের উদ্ধৃতাংশের অভাবে বুঝিবেন না ভাবিয়া অগত্যায় চর্চ্চিত চর্ব্বণ হইল—"পত্নী জিজ্ঞাসা করিল,—

তুমি পাশে তবু কেন হতাশে পরাণ কাঁদে
বল বল কি হ'ল আমার।

প্রবীর উত্তর দিলেন

বিলম্ব কি হেতু শুনলো প্রেয়সী।
(গ্রন্থে যে হেতু আছে।)

ধান ভানিতে শিবের গীত বোধ হয় ইহাকেই বলে যাহা হউক প্রবীর বিলম্বের কারণ বলিল,—

রাজপথে করিতে ভ্রমণ
সর্ব্ব সুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে।
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে।
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল হারে সাজি!
সাধ হ'লো ধরে, আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে॥

সমালোচকের ন্যায় প্রবীর, মদনমুঞ্জরীর পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞাত ছিলেন কি, যে তাহার উপরোক্ত উত্তর অসঙ্গত হইয়াছে? দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবের অশ্বমেধের যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া পত্নীর একটা ছোট কথা না বুঝিয়া বা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া প্রবীর যদি মত্ততায় বা চঞ্চলতায় এ উত্তরটুকু দিয়া থাকেন তাহাতে কি, ব্যাসের না হউক জৈমিনির মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? পরিত্রাণ কিছুতেই নাই সমালোচকের অভিযোগ,—স্বহস্তে রাজপুত্র ঘোড়া ধরিলেন কেন? * প্রেমময়ী পত্নীকে প্রেম উপহার দিতে প্রেমিক রাজপুত্র যদি স্বহস্তে ঘোড়া ধরিয়া চান্দ্রায়ণের কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে বেচারা নিতান্ত নাচার! উপায় নাই। কাশিদাসী মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনায় দেখান হইয়াছে প্রবীর মদনমুঞ্জরী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ঘোড়া ধরেন। কাশিদাসের প্রবীর দুর্নীতি-পরায়ণ তাহার সহিত গিরীশ চন্দ্রের প্রবীরের এ অংশে তুলনা করা ঠিক হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের প্রবীর স্ত্রীর প্রাসাদাকাঙ্খী বলিয়া সমালোচকের কাছে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। স্ত্রীর প্রসাদাকাঙ্খা স্বামীর পক্ষে ধর্ম্মবিগহিত, না, হিন্দুনীতি বিগর্হিত? যে দুর্নিতিপরায়ণ সেই স্ত্রীর প্রসাদাকাঙ্খা করে না; ইহা কিছু সুখ্যাতির কথা নহে। অভিযোগের উপর অভিযোগ,—গিরিশচন্দ্রের প্রবীর

ধর্ম্মরত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এ হেন প্রবীর জানিয়া শুনিয়া এমন অহিত কর্ম্মে হাত দিলেন কেন? *প্রবীর, অর্জ্জুনকে মহাবীর বলিয়া জানিতেন কিন্তু আপনার বীরত্বের প্রতি প্রবীরের অল্প বিশ্বাস ছিল না, কাজেই অর্জ্জুনের প্রতিকূলতা আর শমনের প্রতিকূলতা একই কথা, প্রবীর স্থির করেন নাই। ক্ষত্রিয়ের দম্ভে ক্ষত্রিয়ের আহ্বানে ক্ষত্রিয়-পুত্র যজ্ঞাশ্ব ধরিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই। ইহাতে প্রবীরের ধর্ম্মবিপর্জ্জয় কর্ত্তব্যবিপজ্জয় কি করিয়া ঘটিল তাহাত বুঝা গেল না। ক্ষত্রিয়ের রণকামনা অহিত বা কিসের? হানাহানিটা বাঙ্গালী সমালোচকের সুবিবেচনায় বড় অহিত বড় অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বিবেচনায় হয় কি? ক্ষত্রিয়বিক্রমসমালোচনায় সমালোচকের মত বাঙ্গালির নিতান্তই অনধিকার। পরকালে ব্রহ্মহত্যা পাতকে যে দণ্ড অনধিকার চর্চ্চায়ও সেই দণ্ড আছে এ কথা সমালোচক জ্ঞাত নহেন কি? ইহার পর প্রবীরের উপর সমালোচকের কিছু করুণা বর্ষিয়াছে, প্রবীর একটু বাহবা পাইয়াছে। কিন্তু প্রবীর-চিত্রণের আদর্শ আগাগোড়া সমান হয় হয় নাই তাহা ঠেস দিয়া বলা হইয়াছে, অথচ কিসে সমান হয় নাই তাহা বলা নাই। ইহার পর ক্ষুদ্র অভিযোগ, সে প্রসঙ্গ তুলিব না। * ইহার পরে চতুর্থ দৃশ্য—জনার কক্ষে জনা ও প্রবীর। নাটককার সঙ্কিক্ষেত্রে মাতা পুত্রে একত্র করিয়াছেন। কি পিতৃ আজ্ঞা, কি ক্ষত্রিয়-গৌরব, কোনটাই উপেক্ষার নহে দেখিয়া বড় সঙ্কটেই প্রবীর মার নিকটে আসিয়াছেন। প্রবীর যে পরিমাণে মাতৃভক্ত সেই পরিমাণে পিতৃভক্ত নহেন সমালোচক দেখিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরোধী কোন কথা ক্ষত্রিয়মাতা ক্ষত্রিয় পুত্রকে বলেন নাই, ক্ষত্রিয়পিতা বলিয়াছেন; সমালোচক ইহা কি জ্ঞাত নহেন? ইহারও পরিমাণনির্ণয়ে যে বিড়ম্বনা জন্মে এ নিতান্তই শোচনীয় ব্যঙ্গ। তবে যদি সমালোচকের মতে পিতৃআজ্ঞা মাতৃআজ্ঞা মাত্রই পালনীয় হয় সে কথা স্বতন্ত্র। * ইহার পর ক্ষত্রিয়কন্যা ক্ষত্রিয়-পত্নী ক্ষত্রিয়প্রসবিনী জনা, প্রবীরকে যুদ্ধে পাঠাইতে স্বীকৃতা হইয়া সমালোচকের বিষনয়নে পড়িয়াছেন। সমালোচক এজন্য জনাকে স্বেচ্ছাচারিণী স্বাতন্ত্র্যাবলম্বিনী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা স্বেচ্ছাচার, না, ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মাচার? রাজাকে এ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জনা, আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নির্ব্বোধ পুত্র উদ্ধতস্বভাববশে যাহা করিতে চাহিতেছে ইহা তাহার প্রতিপোষণ কি? কথাটা না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

> চাহে পুত্র ক্ষত্র ধর্ম্ম করিতে পালন
> মা হয়ে কি হেতু কহ করিব বারণ।
>
> * * *
>
> ক্ষত্র ধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ
> তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ। *

জনার চিত্র হিন্দুরমণীর চিত্র নহে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বিনীর চিত্র বলিয়া সমালোচক খেদ করিয়াছেন। বঙ্গকুলবধূগণের আদর্শে জনাকে সমালোচক স্বেচ্ছাচারিণী বলিয়াছেন কিন্তু দ্রৌপদীর আদর্শে বলিতে পারিতেন কি? ইহার পর অনেক ছোট ছোট কথা তাহা ধর্ত্তব্য নয়। * সমালোচকের ঝাল সকলেরই

উপর, কিন্তু জনার উপর কিছু বেশী দৃষ্ট হয়। জনার প্রতি আক্রমণ জনার চরিত্র লইয়া সর্ব্বথা নহে, স্থানবিশেষ জনার অভিনয় লইয়া আক্রমণ দেখিতে পাই।—

"জনা যে স্থলে রাজার নিকট হাত মুখ নাড়িয়া কেশরাশি ফুলাইয়া (অভিনেত্রীর কেশপাশ পর্য্যন্ত সমালোচকের তীক্ষ্ণ সমালোচনায় রেহাই পায় নাই।) স্বরের পরিধি বাড়াইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে স্বামীর কথা অবহেলা করিয়া যুদ্ধ পণ করিতেছে। * *

অভিনেত্রীবিশেষের উপর সমালোচকের যদি কোন গুপ্ত আক্রোশ ছিল তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য তাঁহার এই অবসর গ্রহণ করা নিতান্ত কদর্য্য কার্য্য হইয়াছে। * ইহার পর গঙ্গারক্ষকের কথা, সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। ইহার পর জনার সেনাপতি মন্ত্রী প্রভৃতিকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য উৎসাহবাণী। জনার এই সময়কার "প্রায় নিশা অবসান" কথায় সমালোচক নাটকের Unity of timeএর (সময়ের সমতা সম্বন্ধে) কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। একটা রাত্রি কি এত বড় উৎসাহে বিপদে কাটে না?' * ইহার পর সমালোচক জনার মিথ্যা কথা ধরিয়া ফেলিয়াছেন,—

"গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর
যাও শীঘ্র আজ্ঞা জাহ্নবীর"

জাহ্নবীর আজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে কোন্ সূত্রে কখন জনা পাইল তাহার কোনরূপ উল্লেখ নাটকে না থাকায় জনার কথা মিথ্যা হইয়া পড়িয়াছে! পূর্ব্ব দৃশ্যের নেপথ্যববাহিতকালে যে সব ঘটনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘটে সমুদায়ই কি পরদৃশ্যের অঙ্ক গর্ভাঙ্কে অবশ্য বর্ণনীয়? নাটক ইহা দেখায় না এবং নাটক কাকে বলে যিনি জানেন তিনি ইহা দেখিতে চাহিবেন না। ঐরূপ দেখান বোঝান আখ্যায়িকার কর্ম্ম। একেই বলে না,— মোল্লার দৌড় মসজিদ্ অবধি? আখ্যায়িকার বিচারে নাটক বিচার করিলে এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটে। * ইহার পর জনা, প্রবীরের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রবীরকে জাগাইলেন। ইহাতে সমালোচক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"যাহার দুয়ারে শমন সম শত্রু দাঁড়াইয়া সে প্রত্যুষে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে কিরূপে?" প্রবীর আপনাকে অর্জ্জুনের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না ঠাওরাইলে বলদর্পে অশ্ব ধরিতেন না, পিতৃনিষেধেও যুদ্ধে উৎসুক হইতেন না, আর বাঙ্গালী সমালোচকের সম্মুখে সচ্ছন্দে শয্যায় অঙ্গ ঢালিতে পারিতেন না। ইহার পর দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ এ স্থলে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। *

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নায়িকার মায়াকানন, নায়িকা ও প্রবীর। নায়িকার সখীরা গাহিল নায়িকা আপনি গাহিল বাক্‌চাতুরি বিস্তার করিল; প্রবীর মায়াকাননে নায়িকার মায়ায় মজিল, সমালোচক বলিয়াছেন "কাজেই মজিল"। আক্রমণের ভঙ্গীটা পাঠক গত পূর্ব্ববারের সমালোচনার প্রথমাংশ আর একবার পড়িয়া দেখিবেন। প্রবীর মায়াকাননে নায়িকার মায়ায় একবারে মুগ্ধ নহেন দেখিয়া রতি কাম নায়িকাকে সশরীরে মর্ত্তে না আনিলেও চলিত সমালোচক মীমাংসা করিয়াছেন। সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'তা

এতটুকু করিবার জন্য রতি কামকে বা নায়িকাকে সশরীরে মর্ত্ত্যে না আনিলেও চলিত, কারণ মদনের অলক্ষিত শর-সন্ধানেও এতটুকু হইয়া থাকে।" নায়িকার অবতারণা পর্য্যন্ত যদি না হইত তাহা হইলে মদন ফুলবাণ ছাড়িতেন কার উদ্দেশে ? যদি এলোবাণই একান্ত মদনের ছাড়িলে চলিত, মদনের শর খাইয়া প্রবীর মদনমুঞ্জরীর গৃহে ঢুকিলে প্রবীরের পতন হইত কি? * সমালোচকের অভিযোগ,—যুদ্ধজয়ের পর প্রবীর, মার নিকটে না আসিয়া আপনার মাতৃভক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। যুদ্ধ জয়ের পর প্রবীর যে ভাবে মায়াকাননে মদনের সন্ধানে নায়িকার মায়ায় গিয়া পড়েন তাহা কি জীবনের মহানাটকের কথা নহে? কোনরূপ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বীরত্বের পুরস্কারের আশায় ক্লান্তি শান্তির জন্য উৎসবার্থে মায়াকাননে প্রবীর যান নাই। জীবনের অদম্য অচিন্তিত বেগবলে পবিত্রতার কূল হইতে ব্যভিচারস্রোতে ভাসিয়া যান। এ কার্য্যে প্রবীরের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। এ কথারও প্রতিবাদ করিতে হয় ইহাই আশ্চর্য্য। * সমালোচক নাটককারের ব্যবহারে শেষ দুঃখিত হইয়া খেদ করিয়াছেন,—"গিরীশ বাবুর হাতে পড়িয়া কোন দেবতারই আর নিস্তার নাই। অগ্নিদেবের অপরাধ যে তিনি নীলধ্বজের জামাতা! তাই গিরিশ বাবু তাঁহার দৈবশক্তি হরণ করিয়া তাঁহার অবনতি বিধান করিয়াছেন। অগ্নির দেবত্ব নষ্ট হইয়াছিল, এ কথা গিরিশ বাবুর সৃষ্টি। কোথা পাইলেন ? কাশীদাসে আছে, নীলধ্বজের যুদ্ধে অগ্নি অর্জ্জুনের সৈন্যদাহন আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নানা স্তব স্তুতি করিল অগ্নি তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে স্বীয় তেজ হরণ করিবার উপদেশ দেন। অর্জ্জুন উপদেশমত মহা অস্ত্র প্রয়োগে অগ্নির তেজ হরণ করেন, ইহাই শাস্ত্রীয় কথা। নতুবা শাঙ্করী মায়ায় অগ্নির দেবত্ব লোপ পৌরাণিক কথা নহে।" এ ত কাশিদাসের কথা, জৈমিনির ভারতে ইহার কোনরূপ আভাষ নাই। সমালোচকের কল্যাণে কবি কাশিদাস শাস্ত্রকার হইয়া পড়িলেন। কাশিদাসের অগ্নির আর গিরিশচন্দ্রের অগ্নির উভয়ের কথার তুলনায় পাঠক দেখিবেন একজন দেবত্বহীন সর্ব্বজ্ঞেয়তায় বঞ্চিত হইয়া, অন্যজন দেবত্বহীন পক্ষপাত দোষে কর্ত্তব্যবিমুখতায়, দেবত্বহীন দুজনেই। *সমালোচকের তীব্র সমালোচনা প্রতি অঙ্কের প্রতি গর্ভাঙ্কের প্রতি দৃশ্যে সমান চলিয়াছে। এমন এক টানা একঘেয়ে নিন্দা করায় সমালোচকের যে, ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই ইহা বড় বিচিত্র। অসামান্য সহিষ্ণুতার ফল জনা সমালোচনা। অগ্নির বর কোন্ কোন্ অংশে পূরণ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ অংশে অপূর্ণ রহিল তাহার বিচার করিয়া এবং জনাচরিত্রের আলোচনা করিয়া সমালোচনার সমালোচনা শেষ করিব।

সমালোচকের পূর্ব্বপত্তনের মীমংসা এইখানে হইয়াছে। অগ্নিদেবের বরের সম্পূর্ণতার অসম্পূর্ণতায় বিচার এইখানে হইয়াছে,—

"মরি কিম্বা মারি
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর"

প্রবীরের পরিণাম দেখিয়া প্রবীরের শেষ অভিষ্ট অপূর্ণ রহিল সমালোচক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে মুহূর্ত্ত-কাল অর্জ্জুনের সহিত প্রবীরের যুদ্ধ দেখিয়া নেপথ্যকালের যুদ্ধকাল অনুমান করিয়া আভিনয়িক কাল আর প্রকৃত ঘটনা ঘটিবার কাল যিনি এক অনুমান করেন তিনিও নাটকবিচারে প্রবৃত্ত, এ দুঃখের কথা নয়—লজ্জার কথা। যুদ্ধ-যাত্রাকালে প্রবীর জনার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে জনা অসাবধানতায় 'যাও পুত্র' বলিয়া পুত্রকে বিদায় দেন। নাটককারের এই কৌশলের ভিতর দিয়া প্রবীরপতন দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইবে। * অন্তকালে গঙ্গাজলে প্রাণবায়ু ত্যাগ করা জনার অভিষ্ট ছিল বলিয়া আত্মহত্যা জনার প্রার্থনীয় ছিল না এ কথা সত্য। সমালোচক এ ধূয়ায় বরের অসম্পূর্ণতা দেখাইতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তা পণ্ড হইয়াছে, কারণ বরদাতার বর প্রদানের এবং বর পূরণের সহিত সহৃদয়তার কোনরূপ সম্বন্ধ বাঁধাবাঁধি ছিল না। ·এ সম্বন্ধে সমালোচক যে শাস্ত্রীয় নজির তুলিয়া রাবণের বর-প্রার্থনায় ব্রহ্মার দোষ খণ্ডন করিতে বসিয়াছেন, হিরণ্যকশিপুর বরপ্রার্থনায় ব্রহ্মার সে দোষ খণ্ডিত করিতে পারিতেন কি? নৃসিংহাবতার ব্রহ্মার বরের একটা উৎকট হেঁয়ালি নহে কি? রাজার বরেরই বা অসম্পূর্ণতা কিসে ঘটিল বুঝিতে পারিলাম না। রাজা যদি সারথীবেশী কৃষ্ণদরশনে সন্তুষ্ট না হইতেন রাখালবেশী কৃষ্ণদরশন যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বিদূষকের মত রাজার একটা কিনারা হইত নাকি? *

জনার চরিত্র সম্বন্ধে বলিবার বিস্তর ছিল স্থানসংক্ষেপবশতঃ অনেক কথা অব্যক্ত রহিল। * জনার চরিত্রচিত্রণ যে একেবারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছে তাহা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও বলিবেন না।

নাটককারের তুলিকায় বীরাঙ্গনা কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে পাঠক দেখুন,—

জনা—

* * *

বীরদম্ভে ফেবে ল'য়ে বাজী,
যেন কহে,
আছ কেবা কোথা শক্তিমান
আগুয়ান হও রণে।
হেন রণ আবাহন উপেক্ষা যে করে
শত ধিক্ হেন অস্ত্র ধরে!
মৃত্যু শ্রেয় হেয় প্রাণ হ'তে!

জনা—

* * *

পাণ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি রবে,
যমজয়ী মাহেশ্মতী সেনা।
বীরদম্ভে অশ্বভালে দিয়েছে লিখন,
বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে?
নির্ব্বীর নহে ত বসুন্ধরা।
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ,
মাখিয়ে কলঙ্ককালি অপমান স'য়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ?
যাও যাও প্রবেশ আহবে,

কোন্ সাহিত্যে কোন্ কবির কোন্ সৃষ্টি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নিখুঁত আছে? নিন্দা করিব বলিয়া নিন্দা করিলে উপায় নাই, সমালোচকের সিদ্ধান্তে স্বাহার পিতৃগৃহপ্রিয়তা দোষের হইয়াছে, বিদূষকের ন্যাকাম সর্ব্বত্র সমান না হওয়ায়

প্রবীরের সমরবাঞ্ছা মিটিয়াছে কি না পাঠক বিচার করুন,—

ভীম—

রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদ্ দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ,
কিন্তু এ হেন বিক্রম
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান।
বল মোরে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত।

অর্জ্জুন—

(২)

বীর্য্যবান্ রথীশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে।
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে;
কীর্ত্তি গান চিরদিন রহিবে ধরায়,
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ দেহ বাজী ফিরে।

অর্জ্জুন—

শোক ত্যজ মহীপাল,
দিক্ পাল সম তব আছিল নন্দন,
পাণ্ডব বিমুখ যার বাণে,
এত দিনে ঘুচেছে বিজয় নাম;
আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন নরনাথ,
যম সম শত্রু হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিব,
সে গর্ব্ব হ'য়েছে খর্ব্ব কুমারের বাণে।

দোষের হইয়াছে, পুত্রবিয়োগে জনা বিনাইয়া না কাঁদায় দোষের হইয়াছে। জনা সমালোচনায় সমালোচকের আক্রমণ শুধু গিরিশচন্দ্রের উপর নহে মধুসূদনের উপর পর্য্যন্ত। সমালোচকের স্পর্দ্ধবাক্যটা এই,—"গিরিশ বাবু মাইকেলের বীরাঙ্গনা হইতে জনার ছবি লইয়াছেন বলিয়াই এতটা বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে।" মধুসূদনের জনার এই ছবি বিসদৃশ কি?—

পুত্রস্নেহবর্জ্জিতা প্রতিহিংসাপরায়ণা বীর নারীর চিত্র কি এ?—

জনা—

* * *

অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত আত্মা তার
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা,
পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো।

* * *

হা পুত্র,
হা স্বর্ণ গিরি চূড়া।
যাই যাই বৈরী নির্য্যাতনে।
দেখে যাই শেষ দেখা,
আহা বাপধন,
পলক পোড়োনা চোখে নেহারি বাছারে।

এখানে জনা কতদূর উজ্জ্বল পাঠক দেখুন,—

জনা—

আনন্দ উৎসব
দেখিলাম নগরে রাজন্।
মহোৎসব, মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা, গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা, দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ।) নিঃসন্তানা করিল আমারে।
তুমি পতি, ভাগ্য দোষে বাম মমপ্রতি
তুমি। কোন্ সাধে প্রাণধরি ধরাধামে?
হায়—রে এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে। এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে। *

জনাচরিত্রের দোষভাগ ছাড়িয়া দিয়া গুণভাগের প্রতি দেখ দেখিবে,—জনা, পুত্রপ্রাণতায় অদ্ভুত ফুটিযাছে। এই পুত্রপ্রাণতার স্রোতে স্বামী, সুখ, সৌভাগ্য, সম্পদ সব ভাসিয়া গিয়াছে। মার প্রাণে কতদুর পুত্রস্নেহধরে, অপত্যপ্রেমবাসনার সমুদ্র জননীর প্রাণে কেমন করিয়া উদ্বেলিত হয় তাহা যদি দেখিতে চাও তবে জনার অন্তরঙ্গ অভিনয় দেখ। একটা বই প্রাণ নাই, এক প্রাণে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা যে দুজনকে লইয়া হয় না এ তত্ত্বের মীমাংসা দেখিবে—জনায়। পুত্রের জীবনে যে পুত্রস্নেহ, পুত্রের মরণেও সেই পুত্রস্নেহ, তবে পুত্রবিয়োগে ঘোর প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত দেখিতে পাই। জনার অপমৃত্যু লইয়া সমালোচক দুকথা কহিয়াছেন। পঞ্চপুত্রহত্যায় দ্রৌপদীর

বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার?
কিম্বা রাজা সাজিছে বাহিনী
পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে।
পুত্রঘাতী অরাতি অর্জ্জুনে
বাঁধিয়া কি আনিতেছে সেনাপতি তব?
পরাজিত পাণ্ডব
কি ফিরিল হস্তিনা মুখে?

* * *

ধন্য ধন্য মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু।
রাখিলে ক্ষত্রিয়কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাস।
ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা,
ধন্য ধন্য জীবন প্রয়াস্!
অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ?

* * *

জনা—

দূরে—দূরে—ভীষণ প্রস্তরে
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার মাঝারে,
পর্ব্বত শিখরে চল।
চল পাপ রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল পুত্র শোকাতুরা—
চল, বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল।
চল যথা অগ্নের ভূধর,
নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে
উগারে অনল রাশি।
চল যথা বাসুকীর শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্ দিগন্তর।
চল যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয় অনল
লক লকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।
দূরে দূরে—
হেথা তোর, নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা।

প্রায়োপবেশন করিবার কথা কি সমালোচকের মনে পড়ে না? যেখানে অনন্ত পুত্র-স্নেহ, অসহ্য পুত্র-বিয়োগ যন্ত্রণা, সেখানে গৃহধর্ম্ম ভাল লাগে কি? সেখানে মৃত্যু বই, কি পরিণাম সম্ভবে? এ মৃত্যু—এই স্বেচ্ছামৃত্যু, কি অপমৃত্যু? ইহাকে এক রকম পরিত্রাণ বলা যায়। *

প্রতিহিংসাপ্রাণা জ্বালাময়ী জনার স্নেহময়ী প্রেমময়ী গনেশজননী রূপ এই! সেই বীরাঙ্গনা জনা কি এই? পাঠক ইহাঁকে চিনিতে পারেন কি?

জনা—

জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেই দিন হ'তে
দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি মাঝে,
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে করে স্তন্য পান;
জাগে মার মনে—
খুলে দুটী প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধু মুখে মৃদু হাসি।
জাগে মার মনে—
আধ ভাষে মাতৃ সম্ভাষণ,
চুম্বন গ্রহণ আশে লহর তুলিয়ে
ঘন ঘন চাহে শিশু,
মার মনে জাগে নিরন্তর।
করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ডরে হেরে মায়ের বদন,
জাগে সে নয়ন মনে।
ধূলায় ধূসর
ক্ষুধা পেলে মা ব'লে বালক ধেয়ে আসে।
জান কি মায়ের মন?
অসহায়, শত্রু অস্ত্র ঘায়
কুমার লোটায় বিকট শ্মশান ভূমে!
হত পুত্র শত্রুর কৌশলে
পতি প্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়,
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি।
জান না, ধরনি গর্ব্ভে তারে,
জান না জান না,
কি বেদনা বেজে আছে বুকে।

কবির কথায় ইহা বলিয়া সমালোচনার সমালোচনার ইতি করিলাম।—

"বাঁধ বুক ত্যজ ভয়
পুণ্য এ পাতক নয়,
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।" *

লেখক।

"সমালোচনার সমালোচনা" সম্বন্ধে

সম্পাদকীয় মতামত।

"যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বৃথা তর্ক মিটাইবার জন্যই আমরা এই প্রবন্ধটীতে সামঞ্জস্যবিধায়িনী টিপ্পনী সংযোগ করিতে বাধ্য হইলাম।

৭০৩ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা—

আমাদের মতে নাটকাভিনয়ে চরিত্রের উন্নতি হয় না,—চরিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মেমাত্র। সাহিত্যগত অভিজ্ঞতা, কার্য্যে প্রতিফলিত করিতে পারিলে যে ফল হয়, তাহা সাহিত্য-সেবার ফল, তাহা পুস্তক পাঠেও হয়, নাটকাভিনয়-দর্শনেও হয়। সে বিচার এস্থলে করা হয় নাই বলিয়া, আমরা সমালোচকের বিশেষ হীনতা দেখিতে পাই না; কারণ তিনি যে ভাবে জনার চিত্রগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি যে চরিত্রগত উন্নতি ও অবমতি বা চরিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা তাঁহার আছে।

৭০৩ পৃষ্ঠা ২য় প্যারা—

"নাটক সমালোচনা" বলায় "জনা" বা তৎশ্রেণীর ও তৎসাময়িক অপর গ্রন্থগুলিকে যে বিশুদ্ধ নাটক বলিয়া সমালোচক কোথাও স্বীকার করিয়াছেন, তাহাত আমরা দেখি নাই, বরং যে ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-বিকাশ লইয়াই নাটক হয়, সমালোচক তাহারই ন্যায়ানুমত দোষগুণ বিচার করিয়া প্রকারান্তরে "জনা"কে অনাটকই বলিয়াছেন। তাঁহার লিখিত নাটক সমালোচনার অর্থ, নাটক নামে খ্যাত গ্রন্থগুলির সমালোচনা।

৭০৩ পৃষ্ঠা ৩য় প্যারা—

বহুদর্শনের পরিচয় দিয়া সমালোচক প্রায়শ্চিত্তার্হ কোন কর্ম্ম করেন নাই, বরং পৌরাণিক বিষয়ের পৌরাণিক মূল আলোচনা করিয়া বিষয়টির প্রকৃত তথ্য প্রকাশে সফল হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কবি পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য বা ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী লইয়া নাটকাদি লিখিতে পারেন এবং নিজ ইচ্ছামত ঘটনায় ফেলিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া লইতে পারেন। ইহা স্বাধীন ক্ষমতার কার্য্য বটে; কিন্তু এই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে গিয়া, পরবর্ত্তী কবি যদি পূর্ব্ব কবির চিত্রগুলি নষ্ট করেন, তাহা হইলে কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারে না এবং সে স্বাধীনতাকে যথেচ্ছাচারিতা বা পরবর্ত্তী কবির অক্ষমতা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। সমালোচক গিরীশবাবুর হস্তে জনা কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে ৪০৬ পৃষ্ঠায় তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

৭০৩ পৃষ্ঠা ৪র্থ প্যারা—

জনার plot dramatic একথার আলোচনা সমালোচক কিছু করেন নাই বটে, সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারও

এবিষয়ে দ্বিধা নাই। জনার plot dramatic তিনি স্বীকার করেন বলিয়াই, সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া একবারে নাটকের মূলভিত্তি চরিত্র-বিকাশসম্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। নাটক সংস্কৃত উপকরণেই হউক আর ইংরাজী উপকরণেই হউক, তাহা অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যদি নাটকোক্ত চরিত্রাবলী চিত্রণে দোষ থাকে, তাহা কোন দিনই আদৃত হয় না। জনার দশাও তাহাই ঘটিয়াছে, সমালোচক নাটক কাহাকে বলে, তাহা না জানার জন্য ঘটে নাই।

৭০৪ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা—

বিদূষকের বিচারে প্রতিবাদক যে কথাটি বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধে না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাহা ভুল। জনার বিদূষক বিষাদের মাধবের সংস্করণ নহে, 'রাজা ও রাণীর' দেবদত্তের গালে কতকটা কৃষ্ণভক্তির কলি ফিরান মাত্র।

৭০৪ পৃষ্ঠা ২য় প্যারা—

এস্থলে প্রতিবাদক সীতা, সুভদ্রা, দ্রৌপদী বা ইন্দুমতীর কথা তুলিয়া যে সকল প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তাহার একটি কথাও সমালোচকের কোন একটি কথার প্রতিবাদ নহে বা ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই; ইহা একটি বৃথা তর্কমাত্র। মদনমুঞ্জরী বীরাঙ্গনা কিনা, সমালোচক সেকথা তুলেন নাই, তাঁহার বীরাঙ্গনা হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও কোথাও বলেন নাই। গ্রন্থকার মদনমুঞ্জরীকে প্রেমিকা-চরিত্রে চিত্রিত করিয়া ছেন, তাহাতে কতটা কি হইয়াছে এবং কিরূপ বিসদৃশভাবে মদনমুঞ্জরী চিত্রিতা হইয়াছেন, সমালোচক তাহাই দেখাইয়াছেন এবং ৪০০ হইতে ৪০২ এই তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া তাহাই বুঝিয়াছেন। বুঝিবার বা না বুঝিবার দোষ সমালোচকের নহে। সীতা বা দ্রৌপদীর সহিত মদনমুঞ্জরীর অবস্থা মিলে না সুতরাং সে তুলনায় ফল নাই। ইন্দুমতী স্বামীর জন্য যেহেতুতে কাতর মদনমুঞ্জরীর কাতরতা সেই হেতু-মূলক নহে; সুতরাং উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া বিচার চলে না।

৭০৪ পৃষ্ঠা ৩য় প্যারা—

"তোমার অনেক আছে" ইত্যাদি কথাটি প্রেমময়ী রাধার। প্রতিবাদক এস্থলে আত্মকথার প্রতিবাদক হইয়া পড়িয়াছেন। "সই! নহি আর প্রয়াসী তাঁহার"—ইত্যাদি কথায় "ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে আমরণ তন্ময়ত্বের ভাব" ফুটিয়াছে কি? না, সমালোচকের কথাগুলি সত্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতেছি সমালোচক এস্থলে হিন্দু পত্নীর মনোভাব পতির অদর্শনে যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার যে বিচারটি করিয়াছেন, প্রতিবাদক তাহার মর্ম্মাবধারণ না করিতে পারিয়া এতগুলা বৃথা বকিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সমালোচনাটি আর একবার ধীরভাবে পড়িতে বলি। দার্শনিকের কথার মত অবলা বালিকার কথাগুলি বিচার্য্য না হউক, কিন্তু নাটকের চিত্র যে মনোবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের বহির্ভূত করিয়া চিত্রিত করিতে হইবে আর চিত্রকরকে তজ্জন্য পটু চিত্রকর বলিতে হইবে বা চিত্রটিকে সুন্দর বলিতে হইবে, এই বা কোন কথা?